ভারতী



শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত।

ত্রয়োদশ খণ্ড।

১২৯৬ সাল।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সুচী পত্র।

বেদান্ত-দর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, তাহা ঈশ্বরেরই ঐশী-শক্তি—মায়া। পরমাত্মাই সৎ-স্বরূপ—অর্থাৎ অনন্য-সাপেক্ষ নিরবলম্ব স্বয়ম্ভূ সত্য; প্রকৃতি সদসদাত্মক—অর্থাৎ আপেক্ষিক সত্য—ছায়া-সত্য। সাংখ্য-দর্শনের মতে প্রকৃতি সত্ত্ব রজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা। আমরা অতঃপর দেখাইতেছি যে, সদসদাত্মক এবং ত্রিগুণাত্মক এ দুইটি বাক্যের অর্থ একই—কি? না আপেক্ষিক সত্য।

সত্ত্বরজস্তমোগুণ আমাদের দেশের আপামর সাধারণ সকলেরই মুখে অনর্গল শুনিতে পাওয়া যায়। কথায় কথায় লোকে বলে—অমুকের বড় তমো হইয়াছে; সাত্ত্বিক আহারে শরীর বড় ভাল থাকে; রাজসিক আচার ব্যবহার যোদ্ধাদেরই মানায় ভাল; ইত্যাদি। কিন্তু বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি—সত্ত্বরজস্তমোগুণ যে ব্যাপারটা কি, কেহই তাহা আমাদিগকে আজ পর্য্যন্ত বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না। আমরা প্রামাণিক রকমে বুঝিতে চাই, তাঁহারা আমাদিগকে শাস্ত্রীয় রকমে বুঝা'ন;—অমুক টীকাকার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, অমুক ভাষ্যকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—কেহ বলেন উহা আর কিছু নয়—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, কেহ বলেন—জল বায়ু অগ্নি,—এই পর্য্যন্তই সার। ভাগ্যে কাণ্ট্ এবং তাঁহার পরে হেগেল্ জন্মিয়াছিলেন—তাই রক্ষা। লোকে বলে শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি, আমরা আজ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি—আমরা দেখিতেছি যে, হেগেলে কপিলে কোলাকুলি। হেগেলের এবং কপিলের দোঁহার দুইটি মূল কথার মধ্যে পরমাশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিয়া আমাদের চক্ষু ফুটিয়াছে—সত্ত্ব রজস্তমো যে, ব্যাপারটা কি, এখন তাহা আমাদের নিকট জলের ন্যায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে—তাহা এই;—

হেগেল্ তাঁহার প্রসিদ্ধ দর্শন-পুস্তকের গুণ-শিরস্ক প্রথম অধ্যায়ে অতীব নিপুণ-রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, সত্তা (Being) অসত্তা (nothing) এবং বুভূষা (হইবার চেষ্টা (Becoming) এই তিনটি গুণ সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল উপাদান। যাঁহার চক্ষু আছে তিনি এক মুহূর্ত্তেই দেখিতে পা'ন যে, হেগেলের সত্তাগুণ এবং কপিলের সত্ত্ব-গুণ—হেগেলের অসত্তা-গুণ এবং কপিলের তমোগুণ—হেগেলের বুভূষা গুণ এবং কপিলের রজোগুণ—একই ব্যাপার। যদি জিজ্ঞাসা কর যে, সত্ত্ব-রজ স্তমো গুণ বস্তুটা কি, তবে নিম্নে তাহা ভাঙিয়া বলিতেছি;—

বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণ আছে; যেমন মনুষ্যের মনুষ্যত্ব গুণ, কীটের কীটত্ব গুণ, ইত্যাদি। কিন্তু পশুত্ব-গুণের ভিতর মনুষ্যত্ব-গুণের অভাব রহিয়াছে, কীটত্ব-গুণের ভিতর পশুত্ব-গুণের অভাব রহিয়াছে; প্রত্যেক বস্তুতেই একদিকে যেমন গুণ-বিশেষের সত্তা আছে, আর এক দিকে তেমনি গুণ বিশেষের অভাব আছে; আবার যাহারই অভাব আছে, তাহারই অভাব-পূরণের একটা-না-একটা চেষ্টা আছে (উদ্ভিদের যেমন—মৃত্তিকা ভেদ করিয়া আলোকে উত্থান করিবার চেষ্টা); এইরূপে

পাওয়া যাইতেছে যে, নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বস্তুতেই সত্তা, সত্তার অভাব এবং অভাব-পূরণের চেষ্টা তিনই পরিমাণ-বিশেষে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সত্তাই সত্ত্ব-গুণ, সত্তার অভাবই তমোগুণ এবং অভাব-পূরণের চেষ্টাই রজোগুণ। দীর্ঘ-প্রস্থ-বেধ যেমন পরস্পর-সাপেক্ষ, সাংখ্য-মতে সত্ত্ব রজ স্তমো গুণ সেইরূপ পরস্পর-সাপেক্ষ। পুষ্করিণী কত হাত দীর্ঘ, ইহা মাপিয়া দেখিলেই কিছু কার পুষ্করিণী মাপা হয় না; তা ছাড়া—তাহা কত হাত চওড়া ও কত হাত গভীর তাহাও মাপিয়া দেখা আবশ্যক। তেমনি, কোন-একটি বস্তুকে জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে হইলে তাহাতে সত্তা (সত্ত্বগুণ) কতটুকু তাহা শুধু জানিলে চলিতে পারে না; তা ছাড়া—তাহাতে সত্তার অভাব (তমোগুণ) কতটুকু এবং সেই অভাব-পূরণের চেষ্টাই বা কতটুকু, তাহাও জানা চাই। যেমন; মনুষ্যে সত্তার ভাগ—সত্ত্ব-গুণের অংশ—পশু-অপেক্ষা বেশী; কেননা, পশুতে মনুষ্যত্ব নাই; কিন্তু মনুষ্যে পশুত্বও আছে এবং তা ছাড়া পশুত্বের নিয়ামক মনুষ্যত্বও আছে; সুতরাং সত্তার ভাগ পশু অপেক্ষা মনুষ্যে দ্বিগুণ বেশী। মনুষ্যে, যেমন, পশু অপেক্ষা সত্তার ভাগ বেশী, তেমনি, দেবতা-অপেক্ষা সত্তার ভাগ কম; কেননা, পশুতে যেমন মনুষ্যত্বের অভাব রহিয়াছে, মনুষ্যে তেমনি দেবত্বের অভাব রহিয়াছে; এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, পশুর তুলনায় মনুষ্য সত্ত্ব-গুণাত্মক, দেবতার তুলনায় তমোগুণাত্মক। আবার, মনুষ্যেতে দেবত্বের সেই যে অভাব, তাহার পূরণ-চেষ্টা বিষয়ী লোক অপেক্ষা সাধক-মণ্ডলীতে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়; এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, দেবতার তুলনায় সাধক রজোগুণাক্রান্ত—বিষয়ী তমোগুণাক্রান্ত। মনুষ্যের সম্বন্ধে এ যেমন দেখা গেল, তেমনি—জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই সত্ত্বরজো এবং তমোগুণ অপেক্ষাকৃত ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সাংখ্যের মতানুযায়ী মূল প্রকৃতি এবং দৃশ্যমান জগৎ দুয়ের মধ্যে ভেদাভেদ বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত উপমাটির প্রতি প্রণিধান করিলেই তাহা পরিষ্কার-রূপে বোধগম্য হইতে পারিবে;—

মনে কর একটি জ্যোতির্বিন্দু হইতে তিন বর্ণের তিনটি কিরণ-পুচ্ছ ত্রিধা বিকীর্ণ হইয়া দেয়ালের গাত্রে নিপতিত হইয়াছে;—একটি পুচ্ছ পীত-প্রধান, দ্বিতীয়টি লোহিত-প্রধান, তৃতীয়টি নীল-প্রধান। আবার, যে-টি পীত-প্রধান, তাহার মুখ্য অংশ সুপীত, মধ্যম অংশ রক্তিম পীত, শেষাংশ নীলিম পীত; যেটি লোহিত প্রধান, তাহার মুখ্য অংশ সুলোহিত, মধ্যম অংশ পীতিম লোহিত, শেষাংশ নীলিম লোহিত; যেটি নীল-প্রধান তাহার মুখ্য অংশ সুনীল, মধ্যম অংশ রক্তিম নীল, শেষাংশ পীতিম নীল। আবার সুপীতের মধ্যেও মুখ্য সুপীত, রক্তিম সুপীত, এবং নীলিম সুপীত রহিয়াছে; সুলোহিতের মধ্যেও মুখ্য সুলোহিত, পীতিম সুলোহিত, নীলিম সুলোহিত রহিয়াছে; সুনীলের মধ্যেও মুখ্য সুনীল, রক্তিম সুনীল, এবং পীতিম সুনীল, রহিয়াছে। অতএব

সুনীলও ঐকান্তিক নীল নহে, সুপীতও ঐকান্তিক পীত নহে, সুলোহিতও ঐকান্তিক লোহিত নহে,—সমস্তই আপেক্ষিক ব্যাপার। সংক্ষিপ্ত নাম করণের অনুরোধে আমরা পীত-প্রধান পুচ্ছটিকে পীত বর্ণ বলি, সত্ত্ব-প্রধান গুণকে সত্ত্বগুণ বলি; নীল-প্রধান বর্ণকে নীল-বর্ণ ও তমঃপ্রধান গুণকে তমোগুণ বলি; লোহিত-প্রধান বর্ণকে লোহিত বর্ণ এবং রজঃপ্রধান গুণকে রজোগুণ বলি। জ্যোতির্বিন্দু হইতে যেমন তিন বর্ণের তিনটি কিরণ পুচ্ছ বিকীর্ণ হইয়া কোথাও বা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ভাবে কোথাও বা অপেক্ষাকৃত বিমিশ্রভাবে দেয়ালের গায়ে নিপতিত হইয়াছে; মূল প্রকৃতি হইতে তেমনি সত্ত্বরজস্তমো-গুণ বিকীর্ণ হইয়া কোথাও বা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ-ভাবে কোথাও বা অপেক্ষাকৃত বিমিশ্র ভাবে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ঐ যে তিন বর্ণের তিনটি কিরণ-পুচ্ছ, যাহা দেয়ালে নিপতিত হইয়াছে, তাহা জ্যোতির্বিন্দুর অভ্যন্তর হইতেই তিন রঙা হইয়া বাহির হইয়াছে; সুতরাং জ্যোতির্বিন্দুর অভ্যন্তরেও বিভিন্ন বর্ণত্রয় বর্ত্তমান রহিয়াছে—বলিতে হইবে; কিন্তু সেখানে কি ভাবে বর্ত্তমান- বিকীর্ণ ভাবে না সংকীর্ণ ভাবে? বিভিন্ন বর্ণত্রয় সেখানে অবশ্য অতীব সংকীর্ণ ভাবে—সমাহিত ভাবে—অবস্থিতি করিতেছে; কাজেই সেখানে বর্ণ-ত্রয় মিলিয়া মিশিয়া শ্বেত বর্ণে একাকার। এইরূপ ন্যায়ে, দৃশ্যমান জগতে গুণত্রয় বিকীর্ণ ভাবে অবস্থিতি করিতেছে; মূল প্রকৃতিতে গুণত্রয় একাকারে সমাহিত রহিয়াছে। সাংখ্যকার তাই বলেন যে, মূল-প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ একাকার ভাব। হেগেল্‌ও তাঁহার দর্শন গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, বুদ্ধির মূল-প্রদেশে সত্তা এবং অসত্তা একীভূত।

সাংখ্য যেমন বলেন যে, প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক, বেদান্ত তেমনি বলেন যে, মায়া সদসদাত্মক; সদসদাত্মক—অর্থাৎ প্রাকৃতিক সত্তা অসত্তা-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন—সত্ত্বগুণ তমোগুণ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। অতএব সাংখ্য এবং বেদান্ত উভয়েরই এক বাক্য এই যে; প্রাকৃতিক সত্তা আপেক্ষিক সত্তা—স্বতন্ত্র সত্তা নহে। বেদান্তের মতে পরমাত্মাই বিশুদ্ধ সৎ পদার্থ—তিনিই সৎ স্বরূপ। যেমন মনুষ্য এবং মনুষ্যত্ব, তেমনি সৎ এবং সত্ত্ব; একটি বস্তু—আর-একটি গুণ। অসত্তার প্রতিযোগিতা (Contrast) ব্যতিরেকে কোন গুণই প্রকাশ পাইতে পারে না;—অন্ধকারের প্রতিযোগেই আলোক অভিব্যক্ত হয়, পশুত্বের প্রতিযোগেই মনুষ্যত্ব অভিব্যক্ত হয়, ইত্যাদি। এই জন্য, প্রাকৃতিক সত্তার মধ্যে—সত্ত্বগুণের মধ্যে—রজস্তমোগুণের প্রতিযোগিতা অন্তর্ভূত। সাংখ্য ভাষায়—প্রাকৃতিক সত্তা ত্রিগুণাত্মক; বৈদান্তিক ভাষায়—প্রাকৃতিক সত্তা সদসদাত্মক; আধুনিক ভাষায়—প্রাকৃতিক সত্তা আপেক্ষিক সত্য।

কিন্তু জীবাত্মার অন্তরে সমগ্র সত্যের ভাব রহিয়াছে—পরিপূর্ণ সত্যের ভাব রহিয়াছে, এই জন্য কোন আপেক্ষিক সত্যেই তাহার সত্য-জিজ্ঞাসার আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না; আধ পেটা অন্নে কাহারো পেট ভরে না। জীবাত্মা তাই তৃষিত নয়নে

ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির যবনিকা ভেদ করিয়া পরমাত্মার মুখাবলোকন করিতে সচেষ্ট হয়; ইহারই জন্য জীবাত্মার তপজপাদি যত কিছু সাধন। অতঃপর সাধন কিরূপ এবং মুক্তিই বা কিরূপ তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যা'ক।

সাধনের প্রথম সংকল্প চিত্ত-শুদ্ধি; এবং চরম সংকল্প ঈশ্বরের সহিত আনন্দ উপভোগ। প্রকৃতিকে সংগ্রামে পরাস্ত করাই সাধনের প্রথম সংকল্প। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রকৃতিকে ভাল করিয়া চেনা আবশ্যক। আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্র-মতে শুদ্ধ যে কেবল পঞ্চভূতই প্রকৃতি, তাহা নহে; আমাদের অন্তরস্থিত মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কারও প্রকৃতিরই অন্তঃপাতী।

সাংখ্য-দর্শনের মতে মূল-প্রকৃতি হইতে সর্ব্ব প্রথমে "মহৎ" উৎপন্ন হয়। মহৎ এই শব্দটি শুনিবা মাত্রই অপরিচ্ছিন্ন অনিরুদ্ধ সর্ব্বগত সত্তার ভাব মনে উদিত হয়; কিন্তু প্রকৃতির অভ্যন্তরে সেরূপ সত্তা কোথায়? প্রকৃতির সকল সত্তাই তো পরিচ্ছিন্ন সত্তা। এমন কি সমস্ত জগতের মূলে যে এক সর্ব্বময়ী প্রাকৃত সত্তা বর্ত্তমান রহিয়াছে, সংখ্য শাস্ত্রে যাহার নাম মূল-প্রকৃতি, বেদান্ত-মতে তাহাও সদসদাত্মিকা আপেক্ষিক সত্তা—এই জন্য তাহাও সৎশব্দের বাচ্য নহে। বেদান্তশাস্ত্রে প্রকৃতি রূপকচ্ছলে পরমাত্মার চতুর্থাংশের একাংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা,—"একাংশেন স্থিতো জগৎ;" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরমাত্মার অসীম শক্তির কণাংশ মাত্র জগৎ কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। অতএব প্রকৃতি হইতে "মহৎ" যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে অপরিচ্ছিন্ন সত্তা নহে—তবে কি? না তাহা অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছিন্ন সত্তা অর্থাৎ তাহা প্রকৃতি জাত আর আর সত্তা অপেক্ষা অপরিচ্ছিন্ন; যেমন—মৃত্তিকা অপেক্ষা জলের সত্তা অপরিচ্ছিন্ন, জল অপেক্ষা বায়ুর সত্তা অপরিচ্ছিন্ন, সেইরূপ প্রকৃতি-জাত আর আর সকল বস্তু অপেক্ষা মহতের সত্তা অপরিচ্ছিন্ন, এই পর্য্যন্ত। মহৎ সত্ত্ব-গুণ প্রধান - অর্থাৎ তাহাতে সত্তার ভাগই অধিক; কিন্তু সে যে তাহার সত্ত্বগুণ—তাহাও রজস্তমোগুণের সহিত কতক না কতক অংশে জড়িত। এই মহত্তত্ত্বটির আর এক নাম বুদ্ধি। পাঠক হয় তো বলিবেন যে, এ আবার কিরূপ কথা! পাঠক একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি—সন্দেহ নাই; তিনি অবশ্য লাপ্লাসের আভ্রিক-সিদ্ধান্ত (Nebular Theory) অবগত আছেন; তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন যে, "প্রথমে অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বময় সত্তা—মোটামুটি ধর যেন একটা ধূমাকার সত্তা—এটা বেস্ বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু তাহা যে, বুদ্ধি, এ কথার তো কোন অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না!" তাঁহার এ বোধ নাই যে, তিনি তাঁহার আপনার প্রশ্নের আপনিই উত্তর দিবা বসিয়া আছেন! তিনি বলিয়াছেন "প্রথমেই অপরিচ্ছিন্ন সত্তা—এটা বেস্ বুঝিতে পারা যায়" তবেই হইল যে, অপরিচ্ছিন্ন সত্তা বুদ্ধিতে প্রকাশ পায়, এখন দেখিতে হইবে যে, অপরিচ্ছিন্ন সত্তা শুদ্ধ কেবল বুদ্ধিতেই প্রকাশ পায়—তা' ভিন্ন—পরিচ্ছিন্ন সত্তার ন্যায় তাহা

ইন্দ্রিয়-সন্নিধানে প্রকাশ পায় না। বর্ণগুণ বলিবামাত্রই বুঝায়—দৃষ্টিগোচর বর্ণ; সত্ত্বগুণ (বা সত্তা গুণ) বলিবা-মাত্রই বুঝায়—বুদ্ধি-গোচর সত্তা। বর্ণ দৃশ্য-বস্তুর দৃষ্টি-গ্রাহ্য গুণ, সত্তা বস্তু-মাত্রেরই বুদ্ধি-গ্রাহ্য গুণ। অদৃশ্য বর্ণের যেমন কোন অর্থ হয় না, অবোধ্য সত্তারও তেমনি কোন অর্থ হয় না। অতএব সত্ত্ব-গুণ-প্রধান মহৎ—যাহা ঈশ্বরের তুলনায় পরিচ্ছিন্ন কিন্তু প্রকৃতি-জাত সমস্ত বস্তুর তুলনায় অপরিচ্ছিন্ন—সেই অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বময়ী প্রাকৃত সত্তা—বুদ্ধিরই অন্তর্ভূত। সকল প্রাকৃত বস্তুই বুদ্ধি-দ্বারা ব্যাপ্য কিন্তু বুদ্ধি আর কোন প্রাকৃত বস্তু-দ্বারা ব্যাপ্য নহে; সুতরাং আর আর সমস্ত প্রাকৃত সত্তা অপেক্ষা বুদ্ধির সত্তা অপরিচ্ছিন্ন; এই জন্যই বুদ্ধি মহৎ শব্দে সংজ্ঞিত হইয়াছে। কিন্তু ছায়া বা বর্ণ-বৈচিত্র্যের প্রতিযোগিতা (Contrast) ব্যতিরেকে আলোক অভিব্যক্ত হইতে পারে না; তেমনি অসত্তার (তমোগুণের) প্রতিযোগিতা ব্যতিরেকে সত্তা (সত্ত্বগুণ) অভিব্যক্ত হইতে পারে না। অতএব, সত্ত্ব-গুণ প্রধান মহতের অভিব্যক্তির জন্য তমোগুণ-প্রধান একটা কিছু আবির্ভূত হওয়া আবশ্যক;—সাংখ্যদর্শনের মতে সত্ত্বগুণ-প্রধান মহৎ (কি না বুদ্ধি) হইতে তমঃপ্রধান অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। চলিত ভাষাতেও—তমো বলিতে অহঙ্কার বুঝায়। বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে সত্তার ভাগ এত অধিক যে, তাহাতে তমো নাই বলিলেই হয়, আর, অহঙ্কারে অসত্তার ভাগ এত অধিক যে, তাহাতে সত্ত্ব নাই বলিলেই হয়। অভাব না থাকার নামই আনন্দ; এই জন্য সকল শাস্ত্রেই সত্ত্ব গুণ আনন্দাত্মক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের মতে—জগতের মূলস্থিত সেই যে, আনন্দাত্মক সত্ত্ব গুণ-প্রধান মহৎ, তাহা ঈশ্বরেরই প্রভাব—ঐশীশক্তি বা মায়া; আর, বিষাদাত্মক তমোগুণ-প্রধান সেই যে অহঙ্কার, তাহা জীবের মর্ম্ম-গত অভাব—অবিদ্যা। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বেদান্ত মতে মায়া এবং অবিদ্যার মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, সাংখ্য মতে মহৎ এবং অহংকারের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ; যথা, সাংখ্য মতে—প্রকৃতির মধ্যে যাহা অপেক্ষা-কৃত অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বময় সত্তা তাহাই মহৎ কি না বুদ্ধি; আর, যাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরিচ্ছিন্ন তাহাই অহংকার; বেদান্ত মতে—মায়া সমষ্টি-উপাধি, অবিদ্যা ব্যষ্টি উপাধি—অর্থাৎ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পরিচ্ছিন্ন। বুদ্ধিতে তমোগুণ সত্ত্বগুণের উদরস্থ হইয়া রহি-য়াছে—অহঙ্কারে সত্ত্বগুণ তমোগুণের উদরস্থ হইয়া রহিয়াছে; অর্থাৎ অহঙ্কারে তমো-গুণেরই (অভাবেরই) সবিশেষ প্রাবল্য। অভাবের প্রাবল্য হইতে অভাব পূরণের চেষ্টা উৎপন্ন হয়,—সাংখ্যদর্শন তাই বলেন যে, তমঃপ্রধান অহংকার হইতে রজঃপ্রধান মন উৎপন্ন হয়; মন আর কিছু নয়—অভাব পূরণের জন্য আঁকবাঁকু—অধীর কামনা—সংকল্প বিকল্প—ছট্‌ফটানি। অহঙ্কার বুদ্ধির আলোক হইতে অপসৃত হইয়া আপনাটি এবং আপনারটি লইয়া, বিষাক্ত ফণীর ন্যায় গর্ত্তে ঢুকিয়া, অন্ধকারে জড়সড় হইয়া, চুপ করিয়া অবস্থিতি করে; আর, যখনই আলোকে বাহির হয়, তখনই সকলকে শত্রু জ্ঞান

করে, ও অল্প কিছুতেই ফণা ধরিয়া উঠিয়া ফোঁস্ ফাঁস্ আরম্ভ করে। মন নীড়-স্থিত পক্ষি শাবক—আলোকে উড্ডয়ন করিবার জন্য সর্ব্বদাই পক্ষ বিস্তার করিতে থাকে—কিন্তু বারবার ভূতলে আছাড় খায়। আর অধিক চরিত্র বর্ণনা আবশ্যক করে না—ফল কথা এই যে, অভাব হইতে অভাবের পূরণ চেষ্টা উৎপন্ন হয় -অহঙ্কার হইতে মন উৎপন্ন হয়; সর্প হইতে পক্ষী উৎপন্ন হয়। মন অভাব-পূরণের জন্য অধীর; আর, তাহার প্রণালী পদ্ধতি এইরূপ; যথা;—পরিচ্ছিন্ন সত্তা-সকলের—একের যাহা আছে—অন্যের তাহা নাই; আবার, একের যাহা নাই অন্যের তাহা আছে;—সকলে যদি সদ্ভাবে সম্মিলিত হয়, তবে পরস্পরের সাহায্যে সকলেরই অভাব পূরিত হইতে পারে; অতএব অভাব পূরণের পদ্ধতি দুইরূপ (১) পরিচ্ছিন্ন সত্তা-সকলের মধ্যে যোগ-বন্ধন—ইহাতে করিয়া সমষ্টির প্রভাব-দ্বারা ব্যষ্টির অভাব-পূরণ হয়; এবং (২ মূল সত্তার প্রভাব স্ফুরণ—ইহাতে করিয়া সমষ্টির অভাব-পূরণ হয়। নীচে যোগ-বন্ধন হয় এবং উপর হইতে প্রভাব-স্ফুরণ হয়—দুইই এক সঙ্গে হয়—ইহাতেই ক্রমে ক্রমে অভাবের পূরণ হয়। অহঙ্কার আত্ম-পরের মধ্যস্থলে প্রাচীর সংস্থাপন করিয়া অভাবে আক্রান্ত হয়; মন আত্ম-পরের মধ্যে যোগাযোগ সংঘটন করিয়া অভাব পূরণের জন্য ব্যস্ত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সাংখ্য দর্শনের মতে বুদ্ধি অহঙ্কার এবং মন প্রকৃতি হইতে উত্তরোত্তর-ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং সকলেই তাহারা প্রাকৃত পদার্থ। বেদান্ত দর্শনের মতেও, শরীর, প্রাণ, মন,বুদ্ধি, আনন্দ, সমস্তই প্রাকৃত ব্যাপার; ঐ পাঁচটি ক্রমান্বয়ে বেদান্তের অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ; ও-গুলি আত্মার উত্তরোত্তর উপাধি মাত্র—তা ভিন্ন স্বতন্ত্র কিছুই নহে। এ বিষয়ে কাণ্ট্ কি বলেন পরে দেখা যাইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হাসি।

পড়েছে রজত রেখা রক্তিম অধরে,
মরমের ভাষা যেন হয়েছে বিকাশ।
জ্যোছনার স্নেহ যেন গোলাপের পরে
ফুটায়ে দিতেছে তার সুষমা সুবাস।
কোন্ শুভ দিবসের চুম্বনের স্মৃতি
অধরের রাঙিমায় হয়েছে বিলীন;
কোন্ সুখরজনীর চাঁদের কিরণ
অধর-পরশে এসে আপনা বিহীন।
দুইটী তরঙ্গ মাঝে শুভ্র রশ্মি রেখা,
তরঙ্গের গতি যেন গিয়াছে থামিয়া।
দু'টী সুখস্মৃতি যেন আপনা ভুলিয়া
সহসা অধর কোণে মিশেছে আসিয়া।
পড়েছে রজত রেখা রক্তিম অধরে
মরমের ভাষা যেন গিয়াছে গলিয়া।

হিমে।

হিমসিক্ত রজনীর তিমির বসনে
ঘুমায়ে পড়েছে দু'টী চাঁদের কিরণ,
পত্রহীন পুষ্পহীন শীতের পরশে
নিস্পন্দ অবশতনু তুষার মতন।
নীরবে ধরণীবুকে ঝরিছে শিশির,
বিলাপ গাহিয়া যায় নিশীথের বায়,
সাড়া নাই, শব্দ নাই, স্তব্ধ চারিদিক,
হিম কলেবর দু'টী জড়ায়ে দোঁহায়।
মেদিনীর প্রাণ হ'তে উঠিছে নিশ্বাস,
মৃত্যুর অঞ্চল যেন পরশিয়া যায়;
স্বপনে শিহরি' উঠে পৃথিবী আকাশ—
বিরহের ভয়ে যেন কণ্টকিত কায়।
চাঁদের কিরণ দু'টী তিমির শয্যায়
হিমক্লিষ্ট স্মৃতি রেখে ধীরে ম'রে যায়।

স্নেহলতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় একজন সঙ্গতিপন্ন লোক। তাঁহার পিতাও তাঁহার জন্য কিছু বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, আর তিনি নিজে ডাক্তারি করিয়া দু পয়সা উপার্জ্জনও করিয়াছেন? জগচ্চন্দ্রের বহির্বাটী তাঁহার অর্থ স্বচ্ছলতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করে, কিন্তু তাঁহাব অন্তঃপুর—যেখানে তাঁহার গৃহলক্ষ্মী বিরাজমান সেখানে লক্ষ্মী দেবতার আবির্ভাব অনুভব করা সহজ নহে।

সাধারণ বাঙ্গালী বাটীর যেরূপ দস্তুর, অন্তঃপুরের ঘরগুলি সবই ছোট ছোট, ঘরের সাজ সজ্জা অতি সামান্য, কিছু নাই বলিলেই হয়—বরঞ্চ বিপরীত যথেষ্ট আছে। ঘরের দেয়ালে কালীর চিহ্ন, তেলের চিহ্ন, কোন কোন স্থলে পানের পিকের চিহ্নের অভাব নাই, জানালা দরজাগুলির অবস্থাও ইহা হইতে ভাল নহে, আশে পাশে এই সকল অপরিস্কারের মধ্যে বারান্দা ও গৃহতল কেবল আশ্চর্য্যরূপ তক তক করিতেছে।

আপাততঃ জগৎ বাবুর শয়নকক্ষে আমরা প্রবেশ করি। বাড়ীর মধ্যে এই ঘরটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়, ঘরের এক দিকে পালঙ্ক, পালঙ্কের পাশেই একখানি কৌচ। অন্য দিকের দু দেয়ালে ছোট বড় দুইটি আলমারি, আলমারির মাথায় একরাশ করিয়া জিনিস পত্র, গৃহের মধ্যভাগের একধারে একটি টেবিল, জগৎ বাবুর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে তাহা পূর্ণ, অন্যধারে জগৎ বাবুর স্ত্রীর কাপড়ের আনলা, আনলার একপাশে দেয়ালের গায় একটা মস্ত হুকে কতকগুলি ছেঁড়াচুল টাঙ্গান। অন্য পাশে কৃষ্ণ রাধিকার একখানি পট, অন্য দেয়ালে কোন খানে পটও আছে, কোন খানে দু-এক খানি ছবিও আছে, তাহার মধ্যে জগৎ বাবু ও তাঁহার প্রথম স্ত্রীর বহুদিনের তোলা অস্পষ্ট ফোটোগ্রাফ দুখানি দুই দেয়ালে সম্মুখা-সম্মুখি টাঙ্গান রহিয়াছে। ছবির ঠিক নীচেই এক একটি কোলঙ্গা। একটি কোলঙ্গায় লক্ষ্মীর একটি প্রতিমূর্ত্তি, আর একটি কোলঙ্গায় কিছুই নাই, কিন্তু তেলে জলে ইহার এমন অবস্থা হইয়া আছে যে এইখানেই যে রাত্রে প্রদীপ দেবীর অধিষ্ঠান হয় পাঁজি পুঁথি হাতে না লইয়াও তাহা অনুমান করা যায়। কিন্তু গৃহের আসল লক্ষ্মী ঘরের অপর স্থানে স্থিত—ঘরের এক কোনে ছোট বড় দুইটি লোহার সিন্ধুক, তাহাতে তেলসিন্দুরের নানা চিত্র থাকায় তাহার টস্‌টসে লাল রঙ্গে সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাহার উপরে বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গৃহিণী প্রচুর তৃপ্তিলাভ করেন। ছোট সিন্ধুকটির দুইটি চাবির একটি গৃহিণীর কাছেই থাকে, আর বড়টির চাবি জগৎ বাবু তাঁহার নিজের কাছে রাখেন। এই ত এ গৃহের আসবাব সাজ-সরঞ্জাম। ইহা ছাড়া একখানি মাদুর আপাততঃ এই গৃহ

তলে শোভা পাইতেছিল বটে, কিন্তু উক্ত আসবাবগুলির মত ইনি চিরস্থায়ী বন্দবস্তরূপে এ ঘরটিকে ভোগ দখল করিতে পান না, অন্যের আবশ্যক মত একবার এ ঘরের মাটীতে পড়েন, আবার এখান হইতে উঠেন। অনবরত এইরূপ তরঙ্গের জীবন অভিনয় করিতে বাধ্য হইয়া ইনি যে বিশেষ সুখজনক জীবন বহন করিতেছেন না তাহা ইহাঁর জীর্ণ দশা প্রাপ্ত শরীর দেখিলেই বুঝা যায়। জগৎ বাবুর ইচ্ছামত কাজ হইলে অনেক দিন যাবৎ এই মাদুরখানি ইহার কষ্টকর কর্ত্তব্যের হাত হইতে অব্যাহতি পাইত, তাঁহার ইচ্ছা গৃহমধ্যে শতরঞ্চ জাজিমের বিছানা হয়, কিন্তু কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম এখানে হইবার নহে, গৃহিণী যিনি কর্ত্তারও কর্ত্তা—তিনি ইহাতে নিতান্তই নারাজ। তিনি বলেন "ও সকল বাবুগিরি একালের মেয়েদেরই পোষায়—ও সকল তাঁহা দ্বারা হইবে না।"

জগৎ বাবু ইহার উত্তরে একদিন বলিয়াছিলেন—"কেন তুমিত আর আয়ি ঠাকরুণ নও, তুমিও ত একেলে"।

সেই দিন হইতে এক সপ্তাহ কাল গৃহিণী জগৎ বাবুর সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন নাই, কেবল তাহা হইলেও রক্ষা ছিল, একদিন কথা কহিতে গিয়া চক্ষের জলের বন্যা বহাইয়া জগৎ বাবুকে শুদ্ধ ভাসাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। অনেক কষ্টে বাঁচিয়া তিনি সেই অবধি নাকে খৎ দিয়াছিলেন—ওরূপ কথা আর তুলিবেন না।

আমরা বলিয়াছি মাদুরখানি গৃহে শোভা পাইতেছিল, এইখানে বলা আবশ্যক, তাহার নিজের শোভায় নহে, এই মাদুরের উপর বসিয়া চারিজন রমণী তাস খেলিতেছিলেন।

জগৎ বাবুর স্ত্রীর হাতে অনেকগুলি রং আসিয়াছে, তিনি ইসারা করিয়া তাঁহার সাথীকে জানাইয়া দিলেন—রং খেলিলেই ঠিক হয়। সাথী রং খেলিয়া দিলেন, বেদলের একজন বলিয়া উঠিলেন—"বৌ ইসারা করেছে, রং খেলতে দেব না"।

বৌ কথা কহিতে গিয়া মাদুর জোড়া শরীর দুলাইয়া এবং বড় বড় মুক্তা পরান নথ নাড়াইয়া বলিলেন "ইসারা আবার কখন করলুম!" তাঁহার আট বৎসরের কন্যাটি তাঁহার পাশে বসিয়া তাস লইয়া মাঝে মাঝে নাড়া চাড়া করাতে ইতিপূর্ব্বে তিনি তাহাকে ঘর হইতে উঠিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন—তাই এতক্ষণ সে গোঁ হইয়া বসিয়াছিল, এবার তাহার প্রতিশোধের পালা, সে বলিল—"হ্যাঁ মা যে ইসারা করলি" মা ইহাতে রাগিয়া বলিলেন—"পোড়ারমুখী এখান থেকে যা না!" মেয়ে বলিল—"না আমি যাব না" মা বলিলেন—"এমন লক্ষ্মীছাড়া দেখেছ?"

টগর মাকে যে বড় ভয় করিত তাহা নহে, কেন না মা তাহাকে যদিও যখন তখন বকিতেন, মারিতেন, কিন্তু তাহার পরেই আবার এতটা আদর দিতেন, তাহার ন্যায়ান্যায় খেয়াল সে তখন আরো এমন অবাধে পরিতৃপ্তি করিতে পাইত যে এরূপ মার

পিঠে গৃহিণীর ক্ষণিক ক্রোধ পরিতৃপ্ত হওয়া ব্যতীত অন্য লাভ কিছুই ছিল না, বরঞ্চ লোকসানই সম্পূর্ণ হইত। ইহাতে মায়ের কথার উপর টগরের অভক্তি বাড়িত তাঁহার শাসনের আর তাহার নিকট কোন মূল্য থাকিত না, ইহাতে দিন দিন সে অধিকতর অবাধ্যতা শিক্ষা করিত। সুতরাং মা যখন তাহাকে বলিলেন "লক্ষ্মীছাড়া" সে ও ছাড়িয়া কথা কহিল না? সে বলিল—"লক্ষ্মীছাড়া বই কি, তুই লক্ষ্মী ছাড়া।" বলিয়াই সে মায়ের নিকট হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইল, সে জানিত এরূপ সময়ে তাঁহার নিকটে থাকা তাহার পক্ষে বড় সুবিধার নহে। যদিও এরূপ বিবাদস্থলে গৃহিণীই প্রকৃত দোষী—কেননা তাঁহার দৃষ্টান্তই সে অনুকরণ করে মাত্র—কিন্তু গৃহিণী তাহা বুঝিবার পাত্র নহেন। 'জোর যার মুলুক তার' এই বাক্যটির অনুসরণ করিয়া এরূপ যুদ্ধে তিনি বরাবরি একতরফা জয় লাভ করেন। টগর দেখে মা গালাগালি দিয়া বেশ পার পাইয়া যায় সে কখনো পার পায় না। মার খাইয়া তাহার যত কষ্ট না হয়—এই অবিচারে তাহার ততোধিক কষ্ট হয়।

কিন্তু টগর যদি বুঝিত—বাস্তবিক তিনি পার পাইতেছেন না, তিনি কেবল এইরূপে তাঁহার ভবিষ্যতের কষ্ট সৃজন করিয়া রাখিতেছেন, যদি নিজের ক্ষুদ্র কর্ম্মের বৃহৎ প্রতিফল ভোগ করিবার জন্য আপনার কন্যার হস্তেব শাস্তির দণ্ড নির্ম্মাণ করিতেছেন,—মেয়ে হইয়া নিজে সে একদিন তাহার মায়ের উপর সেই দণ্ড নিক্ষেপ করিবে—তাহা হইলে কি ভাবিত জানি না। টগর মাকে গালি দিয়া যখন সরিয়া দাঁড়াইল—তখন ভাবিল আজ তাহার মা ফাঁকিতে পড়িলেন। মা যে তাস খেলা ফেলিয়া আবার তাহাকে মারিতে উঠিবেন ইহা তাহার মনে হইল না। কিন্তু টগর ভুল বুঝিয়াছিল, রাগের চোটে গৃহিণীর মোটা শরীরও হালকা হইয়া আসিল, তিনি হাতের তাস গুলা তাড়াতাড়ি মাদুরে ফেলিয়া টগরের নিকটে উঠিয়া আসিয়া তাহার পিঠে গুমগুম করিয়া কিল বসাইতে লাগিলেন, টগর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। পুরাণ বাড়ীর ঠাকুরঝি তখন 'মেরোনা মেরোনা' বলিতে বলিতে মেয়ের হাত ধরিয়া মায়ের কাছ হইতে সরাইয়া লইলেন। মেয়ে সরিয়া আসিয়া ভূমে পা ছড়াইয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল, ঠাকুরঝি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। মাও তখনি প্রায় নিকটে আসিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন—"চুপ কর কাঁদিসনে"। টগর তখন আরো প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল, তিনি বলিলেন—"লক্ষ্মী মা চুপ কর—পয়সা দেব এখন"। মায়ের কথার উপর মেয়ের ভরষা বড়ই কম—সে বলিল—"দাও পয়সা—আমি খাবার কিনিব"

মা বলিলেন—"খাবারওয়ালী আসুক দেব এখন"

মেয়ে বলিল—"না এখনি দে"

মা আলমারী হইতে দুটি পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন। তাহার কান্না থামিল, সে এবার খাটের উপর গিয়া বসিল, গৃহিণী ও তাঁহার ঠাকুরঝি পূর্ব্বে-

কার মত মাদুরে আসিয়া বসিলেন, আবার খেলা আরম্ভ হইল, ঠাকুরঝি তাস ভাঁজিয়া ধরিলেন—বৌ কাটাইলেন—ইস্কাবনের সাহেব। কাটাইয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন—"ঠাকুরঝির অদৃষ্টে খেলাতেও লাল উঠে না"।

জীবনের মা গৃহিণীর সাথী এবং বৃত্তিভোগী, জীবনের পড়ার খরচ জগৎ বাবু দেন, সুতরাং গৃহিণীর পক্ষ হইয়া কথা কহিতে পারিলে তিনি ছাড়েন না, তিনি বলিলেন—"সত্যি—নিজে লাল হয়ে যার ভাগ্যে লাল নেই তার বড়ই দুরাদৃষ্ট বলতে হবে"

ঠাকুরঝি বলিলেন—"কাল যদি হতেম ত লাল মিলত, পৃথিবীর গতিকই ঐ, সব উল্টা পাল্টা" তিনি ঠাট্টাটা ঘুরাইয়া জগৎবাবুর স্ত্রীর উপর ফেলিলেন—কেননা জগৎ বাবু গৌরবর্ণ তিনি শ্যামলা। গৃহিণী ইত্যবসরে রং খেলিয়া বলিলেন "আরে বাবু এইরূপেই ত ভুলেছে,আর রূপে দরকার কি? আর তোমার ভাইও ত আর ইংরেজ পুরুষ নন। দিগা যাও"। বৌ ভুলিয়া গেলেন ভাই হাজার কেন ইংরাজ পুরুষ না হউন, আর বৌ কেন স্বর্গের বিদ্যাধরী হউন না—তবু বোনের কাছে বৌ কখনও ভাইয়ের সমযোগ্য নহেন।

ঠাকুরঝি তাস দিলেন—গৃহিণীর যা সম্পর্কীয় যিনি তিনি ঐ দিক হইতে বলিলেন—"দিদি বেশ বলেছ, দেত ভাই, আরো দু কথা শুনিয়ে, ভাইয়ের গরবেই গেলেন পিটটা নে"

~~ঠাকুরঝি~~ বলিলেন—"আর তোরা যে নিজের গরবেই গেলি?"

জীবনের মা বলিলেন—"কেন গরব করবে না—অমন ঘোরাল চেহারা কটা দেখেছ বল দেখি? আচ্ছা করলে কি বৌ দশটা দিলে? ওদের যাচ্ছে যে।"

ঠাকুরঝি। "আমিত বলি—আর একটু কম ঘোরাল হলে ভাল হোত। বৌ সত্যি তুমি বড় মোটা হয়ে পড়েছ"।

যা। "না মোটার জন্য না, মাথায় টাক পড়ে দিদি এখন খারাপ হয়ে গেছে"—

জীবনের মা। "আর বর্ণটাও একটু মলিন হয়ে পড়েছে"

গৃহিণী বলিলেন—"মাও সে দিন বলছিলেন যে আমার তারার আর সে বর্ণ নেই সে ~~চেহারা~~ নেই না টগর?"

ঠাকুরঝি। "কিন্তু আমরাত বাপু বর্ণ ত চিরকালই ঐ এক দেখছি—তবে ছেলেবেলার কথা বলতে পারিনে।"

টগর এতক্ষণ খাটে বসিয়া পয়সা লইয়া খেলিতেছিল, সে বলিল—"হাঁ দিদি মা বলছিল মা বড় শুকিয়ে গেছে, আর মলিন হয়ে গেছে—দিদিমা কবে আসবে মা? আমার পুতুল—"

ঠাকুরঝি হাসিয়া বলিলেন—"বৌ তুই তবে আরো একটু মোটাহ? তোর সরু মুখে নথ মানায় নি কেমন?"

জীবনের মা বলিলেন—"ও মুখে নথ মানায় নি—ত মানিয়েছে কোথা ?"

গৃহিণী কিছু কহিলেন না, কেবল একটু আহ্লাদের হাসি হাসিলেন আর চোখটা নীচু করিয়া একবার নথের দিকে দেখিলেন। গৃহিণীর বয়স যদিও ৩০।৩২ শের অধিক নয়, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহাকে একালের মেয়ে বলিলে তিনি বড় রাগ করেন, আর আসলও ধরণধারণ চাল চলন তাহার সকলই সেকালের, সুতরাং তাঁহার মাথা পোরা সিন্দুরে ও মুখভরা নথে তাঁহাকে মানায় বলিলে তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন। একালের নব্য মেয়েদের নথে খোঁটা সিন্দুর পরা, নথ হীন মুখ, আর জামা জোড়া আঁটা শরীর দেখিলে তিনি জ্বলিয়া যাইতেন—এমন কি তাহার মেয়েকে তিনি পূজা পার্ব্বনের সময় ইংরাজি ফ্রক ও বনেট পরাইয়া নিমন্ত্রণে পাঠাইতে আপত্তি করিতেন না কিন্তু জগৎ বাবু যদি বলিতেন, 'টগরকে ফ্রক না পরাইয়া সাড়ীর সঙ্গে জ্যাকেট প্রভৃতি পরাইয়া দাও'—তাহা হইলেই তিনি সমস্ত দিন গণগণ করিতে থাকিতেন, তাহার মনে হইত জগৎ বাবু মেয়েকে মেম করিয়া ফেলিবেন, তাঁহাকে ত অনেক করিয়া মেম করিতে পারেন নাই, বুঝি সেই শোধ মেয়ের উপর দিয়া তুলিবেন। এই সব খুঁটি নাটি লইয়া তাঁহাদের অনবরত ঝগড়া চলিত, বলা বাহুল্য অবশেষে গিন্নিই জয়ী হইতেন।

জীবনের মা দেখিলেন গৃহিণী তাঁহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তিনি আবার বলিলেন—"মুক্তা দেওয়া নথটি মুখের উপর পড়েছে আর পান খেয়ে ঠোট দুটি টুক্‌টুক্ করছে—কেমন মানিয়েছে বলদেখি" ?

তাহার যা বলিল—"দিদি তুমি একলাই যে পান গুলো ফুরোলে, আর পান কই ?"

গৃহিণী তখন তারার মা হারার মা করিয়া বার কতক ডাকিলেন—না পাইয়া মেয়েকে বলিলেন—"মা যাও গোটা কতক পান সেজে আন ত ?"

মেয়ে বলিল—"আমি পারিনে"

গৃহিণী বলিলেন—"আবার দুষ্টামি"

মেয়ে বলিল—"সব কথা আমাকে, কেন কনে-দিদিকে বল না"

গৃহিণী বলিলেন—"সত্যি সে যে কোথায় তার ঠিক নেই। রাতদিনই কি খেলা করে বেড়াবে ? ডাকত তাঁকে"।

টগর ইহাতে আপত্তি করিল না—উঠিয়া কনে দিদি দিদি করিয়া ডাকিতে লাগিল—উত্তর হইল 'যাই'। অল্প ক্ষণের মধ্যেই একটি কৃশকায় বালিকা এই গৃহে আসিয়া দাঁড়াইল। টগর তীব্রস্বরে বলিল "এতক্ষণ কোথায় ছিলি ? সেই অবধি মা পান পায় নি"। অন্য সময় হইলে গৃহিণীর স্বর টগর হইতেও সুতীব্র হইয়া উঠিত, কিন্তু এত লোক জনের সাক্ষাতে সেটা ভাল দেখায় না, সুতরাং গৃহিণী চাপা রাগিণীতে সুর

টানিয়া বলিলেন "সারাদিনই কি খেলা করবি বাছা, দেখছিস লোকজন এয়েছে, এদিকে একবার আসতে হয়। গোটা কতক পান নিয়ে এস।"

বালিকা অল্পক্ষণের মধ্যেই পান লইয়া আসিল। গৃহিণী তখন বলিলেন—"দেখ বাছা তিন খানা জলখাবারের জায়গা করগে, খাবার গুছিয়ে ডেকে নিয়ে যেয়ো।"

বালিকা চলিয়া গেল, টগর চীৎকার করিয়া বলিল—"দিদি আমাকে আগে এক গেলাশ জল দিয়ে যা"

বালিকা তাহার জন্য জল লইয়া আসিল, তাহার খাওয়া হইলে গ্লাস লইয়া চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে খেলোয়ারদের একখানা ছক্কা হইল, জগৎ বাবুর স্ত্রীই জিতিলেন, তিনি ছক্কা খানি লইয়া বেদলের ঠাকুর জামাই ও দেবরকে ভাগে জলপান করাইয়া তাঁহাদিগের উত্তমার্দ্ধদিগকে আসল জল পান দিবার মানস করিতেছেন—এই সময় শ্যামী ঘটকী এই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্যামী ঘটকী জাতিতে কায়স্থ—ব্যবসায় ধরিয়াছে ব্রাহ্মণের। কিন্তু ব্যবসায়ের নাম সে বেশ বজায় রাখিয়াছে। তাহার হৃষ্ট পুষ্ট শরীর, তাহার লম্বা লম্বা পা ফেলিবার ভঙ্গী, তাহার 'গজগিরি' বাঁধুনীর কথা বার্ত্তা সমস্তই 'আমি একজন' ভাবে পূর্ণ। শ্যামী সধবা কি বিধবা বলা যায় না—তাহার মাথায় সিন্দুর নাই—কিন্তু হাতে রুলি ও পরণে চওড়া লালপেড়ে সাড়ি। সে সদর্পে গৃহে প্রবেশ করিয়া মাদুরের নিকট উর্দ্ধ হাঁটু হইয়া বসিয়া বলিল—"বলি বৌ মা ডেকেছিলে কেন?

সকল দেশের স্ত্রীলোকেরাই বিবাহের গল্প করিতে ভালবাসে, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা ইহা পাইলে ত আর কিছুই চাহেন না।

গৃহিণীর অনুরোধে তখন তাঁহার আত্মীয়গণ অন্য গৃহে জলপানে কেহ বা যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কেহ বা খাইতে আপত্তি করায় গৃহিণী তাঁহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে আতিথ্য গ্রহণের কর্ত্তব্য বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিতেছিলেন—ঘটকী আসায় এ সকলি বন্ধ হইল, যিনি উঠিয়াছিলেন তিনি ত তখনি বসিয়া পড়িলেন, গৃহিণীও আতিথ্যের অনুনয় ভুলিয়া গিয়া আত্মীয়ার হাত ছাড়িয়া দিলেন, এবং আবার রীতিমত মাদুরে আড্ডা জমাইয়া বসিয়া ঘটকীকে বলিলেন—

"এত দিন কি আর আসতে নেই ঘটক ঠাকরুণ?"

ঘটকী বলিল—"কাজ থাকে ত আসি। এই ত কমাস আগে এলুম তা বিয়ের নাম করাতেই বাবু রেগে আগুণ। তোমরা মেয়ের বিয়ে দেবে না ত তোমাদের মেয়ে

তোমরা নিয়ে থাক, আমি আর এসে কি করব। তা ডাকলে যে আবার? বাবুর মত হয়েছে নাকি?"

গৃ। "বাবুর কথা রেখে দাও—ওর কথায় সব কাজ করলেই হয়েছে।"

ঘটকী। "তা এই বুঝি মেয়ে?"

গৃ। "না গো না এটি এখন না, পরের মেয়ে যেটিকে ঘরে রেখেছি—আগে সেইটির সম্বন্ধ কর, কি বল ভাই? পরের মেয়ে রেখে আপনার মেয়ের আগে সম্বন্ধ করা কি ভাল?"

জীবনের মা বলিলেন—"বৌদিদির আমাদের ধর্ম্মের শরীর"

ঘটকী বলিল—"তোমার ছেলের সঙ্গে তাহলে আর হোল না?"

গৃ। "ছেলের সঙ্গে? পোড়া কপাল? বাপ মা খেকো মেয়ে, ওর সঙ্গে ছেলের বিয়ে!"

ঠাকুরঝি। "জ্যেঠাইমার কিন্তু বড় ইচ্ছা ছিল—তিনি ত কণে কণে করে ডাকতেন।"

যা। "বড় ঠাকুরেরও শুনতে পাই নাকি ঐ ইচ্ছা।"

গৃ। "তা ইচ্ছা হ'লে কি করব? আমি কিন্তু আমার ছেলের বিয়ে ওর সঙ্গে দেব না।"

ঘটকী। "তবে ওরি সম্বন্ধ আগে। তা দেবে থোবে কি বল? বাপ মা খেকো মেয়ে, বুঝে দেখো অমনি হবে না।"

গৃহিণীর মাথার কাপড় একটু সরিয়া পড়িয়াছিল—তিনি বাম হাত দিয়া টাক ঢাকিয়া মুখ নাড়িয়া বলিলেন "বাছা পরের মেয়েকে এতদিন খাওয়ালুম পরালুম মানুষ করলুম, আবার বিয়ে থাওয়াও দেব—কিন্তু তাই বলে ত ওর উপর সর্ব্বস্ব ঢালতে পারিনে, আমাদের নিজেরও ছেলে মেয়ে ত আছে"?

এইখানে বলা আবশ্যক উল্লিখিত কন্যাটি বৎসর দুই মাত্র জগৎ বাবুর পরিবার ভুক্ত হইয়াছে।

ঘটকী। "তা হলে কিন্তু ভাল ঘরে বর মিলবে না, তাতে কি বাবু রাজি হবেন?

গৃ। "রাজার ঘর আর কে চাচ্ছে? অমনি গৃহস্থ ঘর হলেই চলবে। আর আমরাও যে কিছু দেব না তাত নয়। গহনা পত্রও দেব নগদ টাকাও কিছু দেব। (গৃহিণীর ইচ্ছায় কর্ম্ম হইলে অবশ্য এরূপ হইত না কিন্তু তিনি বেশ জানিতেন এস্থলে জগৎ বাবু তাঁহার কথা সম্পূর্ণ শুনিবেন না) তবে আমার মেয়েটিকে যেমন দেব তেমনটি কি আর একে দিতে পারব কি বল ভাই তোমরা?

ঘটকী। "তোমার মেয়ে হলে ত কথাই নেই, মুখের কথা বার করতে না করতে তাহলে ২০০শ বর জুটে যায়।"

ঠাকুরঝি। "কেন ঘটক ঠাকরুণ, ও মেয়েটিওত দেখতে মন্দ নয়, তবে কেবল পয়সা নেই এই যা বল, আমার ছেলে থাকলে আমি বিয়ে দিতুম, দিব্যি মেয়েটি।"

জীবনের মাও মনে মনে মেয়েটিকে বৌ করিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন, কেবল কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিলেন না, কি জানি গিন্নি আবার কি মনে করেন।

ঘটকী বলিল "আজ কাল সুন্দর আর কাল নেই, আজ কাল কেবল রেস্ত।"

গৃহিণীর যা বলিলেন—"কিন্তু দিব্যি মেয়েটি।"

গৃহিণী বলিলেন—"কিন্তু আমাদের টগরের মত ত আর নয়! রংখানা ফ্যাকাসে হলেইত হয় না, কি বল ঘটক ঠাকরুণ?"

ঘটকী। "তা বই কি, এ মেয়ের নাক মুখ ঠিক যেন পটের রাধিকা ঠাকরুণ, আর গড়ন পিটনও কেমন গোল গাল।"

'পটের রাধিকা ঠাকরুণ'! আমাদের এ তুলনাটা মনে আসিত না স্বীকার করি—কিন্তু কথাটা নিতান্ত মন্দ বলে নাই। পটের ছবির মত টগরের 'পটল চেরা চক্ষু' নহে বটে, কিন্তু তাহার ছোট কপাল, জোড়া ভ্রু, তীক্ষ্ণ নাসা, ভারী ভারী মানানসই মুখ—সম্ভবতঃ পটকারগণ আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিত। তবে ইহা সত্ত্বেও এক বিষয়ে এ তুলনাটা আমাদের সঙ্গত মনে হয় না। পটের রাধিকার মুখে কোন একটা ভাব পাওয়া যায় না—তাহাতে যদি কোন ভাব থাকে ত একটা ভোঁতাভাব অর্থাৎ ~~কোন~~ ভাবের অভাবের ভাব, কিন্তু টগরের মুখের আর যে দোষই থাক এ দোষ নাই, তাহার সমস্ত মুখে একটি ধারাল রুক্ষ ভাব পরিব্যাপ্ত। যদি তাহার চুলগুলি শিথিল ভাবে কপালে পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে হয়ত এই রুক্ষ ভাব অনেকটা কোমলতর হইতে পারিত, কিন্তু তাহার আঁটিয়া বাঁধা খোঁপার দোষে ইহার মধ্যেই তাহার সিঁথি ফাঁক হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, আর সেই আট বৎসরের বালিকার কচি মুখ আঁটির মত পাকা দেখাইতেছিল। কিন্তু ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।

গৃহিণীর আবার অন্য রকম চুল বাঁধা পসন্দ হয় না। তিনি স্নেহলতাকে দিয়া গৃহের সব কাজই করান—কেবল তাহাকে টগরের চুল বাঁধিতে দেন না,—কেননা সে তাঁহার ~~মত অমন~~ আঁটিয়া বাঁধিতে পারে না। চুল বাঁধিবার এই অপূর্ব্ব কৌশল গৃহিণী যে নিজের মধ্যেই চিরদিন আবদ্ধ রাখিবেন এমন অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না, স্নেহলতাকে উহা শিক্ষা দিবার জন্য তিনি কিছুমাত্র চেষ্টা যত্নের ক্রটি করেন নাই, তাহাকে কাছে বসাইয়া এমন কতদিন টগরের চুল বাধিয়া দিয়াছেন—কিন্তু কিছুতেই কি সে ইহা শিখিবে না! সে চুল বাঁধিতে গেলেই কি আলগা বাঁধিয়া বসিবে! ১০ বৎসরের মাগী হইতে চলিল এইটুকু কি তাহার আর গায়ে জোর নাই, সব দুষ্টামি! তাহার মতলবখানা যে নিজের মত টগরকেও বিশ্রী করিয়া সাজান, আর বিবি করিয়া তোলা ইহা আর গৃহিণীর বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু জগৎ বাবুর মত বোকা কি তোমরা সংসারে দেখি-

য়াছ! তিনি যদি ইহা কিছুতেই বোঝেন! তাহা যেন নাই বুঝিলেন একটু কি ছাই তাঁহার পসন্দও নাই? স্নেহলতা যে দিন টগরের বিশ্রী করিয়া চুল বাঁধিয়া দেয় সেই দিন কি না তিনি প্রশংসা করেন! পোড়াকপাল অমন প্রশংসার! তাই ছাই শুধু প্রশংসা করিয়াই চুপ করুন, তাহা না—তিনি আবার গৃহিণীর চুল বাঁধার দোষ ধরেন! বলেন কি না—"আর কিছুদিন ঐরূপ আঁটিয়া বাঁধা চলিলে গৃহিণীর মত টগরের মাথায়ও টাক পড়িবে। একথা শুনিয়া গৃহিণীর পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি আগে যদিই বা কখনো দুই এক দিন স্নেহলতাকে টগরের চুল বাধিতে দিতেন, তাহার পর হইতে সে টগরের মাথায় হাত পর্য্যন্ত দিতে পাইত না, সহস্র কাজ ফেলিয়াও গৃহিণী নিজে টগরের চুল বাঁধিয়া দিতেন। টগরেরও আঁট চুল বাঁধা এত অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে মা না বাঁধিয়া দিলে তাহারও পসন্দ হইত না।

আপাততঃ টগরের রূপের প্রশংসায় তাহার দিকে সকলের চোখ পড়িল—সে হাসিয়া মায়ের পিঠে মুখ লুকাইল—ঘটকী আসিতেই আবার সে মায়ের কাছে আসিয়া বসিয়াছিল। এই সময় স্নেহলতা গৃহে আসিয়া বলিল "অনেকক্ষণ জলখাবার ঠিক হয়েছে"। গৃহিণী তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন "দেখেছ কি লম্বা হয়েছে—গায়ে মাংস নেই—দিন দিন কেবল তালগাছ হচ্ছে" যেন ইহাও তাহার দোষ, ইচ্ছা করিলে সে লম্বা না হইয়া মোটা হইতে পারিত। সকলেই তাহার দিকে চাহিল। দুই বালিকার মধ্যে কি প্রভেদ? স্নেহলতা সত্যই তন্বঙ্গী—বয়স অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ—কিন্তু [illegible] তাহাকে বরঞ্চ ভালই দেখাইতেছিল; তাহার দেহ সুগঠিত সুকোমল ভাবপূর্ণ; তাহার প্রতি অঙ্গুলীতে কোমলতা বিরাজিত, মুখশ্রী খুঁতাইয়া দেখিলে টগরকে হয়ত সমালোচিকাগণ নিখুঁৎ বলিবেন, কেননা স্নেহলতার নাক টগরের মত ধারাল নহে, তাহার ভ্রু অমন কাল কুচকুচে নহে, তাহার কপাল একটু বড়, কিন্তু ছোট ছোট কাল চুলের রাশ কপাল খানির আশ পাশে শিথিল ভাবে শুইয়া পড়িয়াছিল, চোখে একটি করুণ ভাব, বয়সের অপেক্ষা একটা গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইতেছিল, আর তাহার প্রশান্ত, অতি স্নিগ্ধ, ম্লান, পাণ্ডুবর্ণ—সমস্ত মুখে একটি কোমল লাবণ্য প্রদান করিয়াছিল। মাটি-মাখা জুঁইফুল হঠাৎ যেমন চোখে পড়ে না—কিন্তু একবার চোখে পড়িলে তখন তাহার ম্লান সৌন্দর্য্য যেরূপ হৃদয় দ্রব করে—স্নেহলতাকে দেখিয়া সেইরূপ সকলে আর্দ্র হইল। ঘটকী বলিল "মেয়ে রূপসী বটে—নাত্‌নি বর মিলবে লো মিলবে"।

কথাটা স্নেহলতার দিকে চাহিয়াই ঘটকী বলিল—সুতরাং স্নেহ লজ্জিত ভাবে সেখান হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল, এই সময় টগর নিকটে আসিয়া বলিল—"দিদি তোর হাতে কি বই, আমার বই নিয়েছিস বুঝি"? বলিয়াই সে চিলের মতন তাহার হাতের উপর ছোঁ মারিল। কিন্তু স্নেহলতা বইখানি বেশ আঁটিয়া ধরিয়াছিল, সুতরাং সে কাড়িতে পারিল না; কেবল স্নেহলতা আরো সাবধান হইয়া ক্রুদ্ধস্বরে

বলিল "না টগর আমার বই" বলিয়া সে তাহাকে ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল—টগরও কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পশ্চাৎ ছুটিল, গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন "রকম দেখ না! মেয়েকে কাঁদায় দেখ! দেনা বই খানা,—সত্যিইত কদিন থেকে ওর বইখানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা, তাইত ভাবি রোজ বইই এত কোথায় যায়—দে বলছি"

স্নেহলতা বলিল "না মাসীমা আমি দেব না এ আমার বই, টগর এখনি ছিঁড়ে দেবে,—এই দেখ আমার নাম"—সে নাম দেখাইতে যেমন বই নীচু করিল--অমনি টগর আবার তাহা ধরিল, দুই জনে টানাটানি করিতে করিতে বইয়ের মলাট আধখানা ছিঁড়িয়া গেল, আর আধখানা ছিঁড়িবার ভয়ে স্নেহলতার হাত সহসা আপনি আলগা হইয়া পড়িল, অমনি টগর বইখানি টানিয়া লইল। লইয়াই সে মায়ের কাছে পলাইল, স্নেহলতার অত্যন্ত রাগ হইল, কিন্তু এই নিরুপায় ক্রোধে তাহার দুই চক্ষু কেবল জলে ভরিয়া গেল, সে কাঁদিয়া বলিল "মাসীমা, আমার বই, টগর কেন নেবে ?

ঠাকুরঝি বলিলেন "বাছা টগর—তুমি কেন ওর বইখানি নিলে"—

গৃহিণী বলিলেন "ওনার বই! যেন বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছেন!"

স্নেহলতা আর ইহার উপর হঠাৎ কোন কথা কহিতে পারিল না, তাহার চোখের জল আরো উথলিয়া উঠিল।

ঠাকুরঝি বলিলেন "বৌ তুমি কি ক্ষেপেছ? ছেলেমানুষকে নিয়ে এত কেন?"

গৃহিণী আবার বলিলেন "একখানা বইয়ের জন্যে এত, আজ কাল যে কি হয়েছে—যেন সব পাকড়ি বেঁধে আফিসে যাবে" স্নেহলতা ফুলিয়া ফুলিয়া বলিল "মাসীমা আজ আমার এখনি পড়া মুখস্থ করতে হবে মেশমশাই আফিস থেকে এসে পড়া নেবেন বলেছেন।"

গৃহিণী। পড়া নেবেন, মিন্সে যেন হতবুদ্ধি হয়েছে, বিয়ের বর খোঁজ—ধেড়ে মেয়ে হয়ে উঠলো—তা নয়! নেকা পড়া নিয়ে কি ধুয়ে খাবে নাকি!"

এই সময় একটি বালকএই দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল—গোলমাল দেখিয়া বলিল কি হয়েছে? টগর বই হাতে করিয়া মায়ের কাছে সরিয়া দাঁড়াইল—যেন একটু ভয় পাইল। স্নেহলতা "বলিল চারু, টগর আমার বই নিয়েছে"

টগর বলিল "না আমার বই"

চারু বলিল "আচ্ছা কার দেখি?" বলিয়া টগরের চীৎকার ও বল প্রকাশ এবং গৃহিণীর অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও বই খানি টগরের হাত হইতে কাড়িয়া লইল এবং স্নেহলতার বই দেখিয়া তাহাকে প্রদান করিল। কিন্তু এই হুড়ামুড়িতে বালকের হাতের কুনাই লাগিয়া টেবিলের ঘড়িটি নীচে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, সকলে হাহুতাশ করিয়া উঠিল; টগর কেবল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "বেশ হয়েছে আমি বাবাকে বলে দেব কে ভেঙেছে"

বালক বলিল "তাহলে আমিও বলে দেব তুই স্নেহের বই ছিঁড়েছিস—আর লজঞ্জুস দেব না"

টগর বলিল "তবে দাও লজঞ্জুস"

চারু পকেট হইতে লজঞ্জুস বাহির করিয়া দুই বালিকাকেই কিছু কিছু প্রদান করিল তাহার পর বলিল"- "মা খাবার" স্নেহ বলিল "চারু ছোট ঘরে তোমার খাবার গুচিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখেছি চল দিয়ে আসি" চারু বালিকার সহিত চলিয়া গেল। গৃহিণী বলিলেন—"দেখেছ এক গুঁয়ে মেয়ে—মেয়েটাকে কাঁদালে—ঘড়িটা ভাঙলে—এক খানা বই নিয়ে কত কাণ্ডই করলে।"

ঠাকুরঝি বলিলেন "মেয়েটির দেখছি পড়তে শুনতে বেশ যত্ন আছে"

গৃহিণী বলিলেন তা ও কি আমাদের টগরের মত? এর মধ্যে টগরকে কত বই যে আনিয়ে দিয়েছি তার ঠিক নেই। আমি বলি—অত পড়ে কি হবে চাকরী ত আর করবিনে—তা বাছা শুন্‌বে না—বুঝি লীলাবতী হবেন।

টগর বলিল—"মা জিজ্ঞাসা করলে কি বলবো?"

গৃহিণী। "কি আবার জিজ্ঞাসা করবে

টগর। "এই ঘড়ির কথা"

মা বলিলেন "বলিস এখন, আপনি ভেঙেছে নইলে বাছা তোর দাদাকে বকবে যে,—ও কথা কি বলে?"

আবার নূতন করিয়া স্নেহলতার উপর ক্রোধের ঝাল ঝাড়িতে ঝাড়িতে গৃহিণী আত্মীয়াগণকে লইয়া জল খাবার ঘরে আসিয়া পৌঁছিলেন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জগৎ বাবু সচরাচর সন্ধ্যার বড় বেশী আগে বাড়ী আসিতেন না; আজ একটু শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী ফিরিলেন। স্নেহলতা কাজ কর্ম্ম সারিয়া প্রতিদিনকার মত অন্তঃপুর ও বহির্বাটীর বারান্দা গৃহের একটি বন্ধ জানালার খড়খড়ি খুলিয়া তাঁহার পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল, দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার আর আনন্দ ধরিল না। জগৎ বাবুর মা মরিয়া গিয়া অবধি জগৎ বাবুই স্নেহলতার পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধু, সুতরাং এ বাড়ীর মধ্যে জগৎ বাবু স্নেহলতার জীবনের যেমন আবশ্যক—এমন আর কাহারো নহেন। জগৎ বাবু বারান্দায় আসিবামাত্র সে প্রফুল্ল মুখে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল—"মেশমশায় আজ ত তুমি বেশ শীগ্‌গির এসেছ, রোজ কেন এমনি আসনা?"

জগৎ বাবুর ডান হাত বেদখলে, তিনি বাঁ হাত দিয়াই স্নেহলতার গালে আস্তে আস্তে

চড় মারিয়া হাসিয়া বলিলেন—"লতির আমার এমনি মতলব খানাই বটে! কিন্তু এক দিন শীগ্‌গির এলে রোজই যে আসতে হবে—এ কোন শাস্ত্রে পেলি বল দেখি বুড়ি"?

বুড়ি তাঁহার কথার উত্তরে কেবল একটু হাসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

এই সময় টগরও এই বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং জগৎ বাবুকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া তাঁহার বাকী হাতটা পাকড়া করিল, জগৎ বাবু উভয়ের মধ্যে ষষ্ঠী বুড়ি হইয়া অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন। এরূপ আনন্দের সময় মুখ বন্ধ রাখিলে স্নেহ লতার আনন্দ সম্পূর্ণ হয় না—সে চলিতে চলিতে বলিল "মেশমশায় আজ আমি নিজের হাতে মোহনভোগ তৈরি করেছি।"

টগর বলিল "আঁ্যা কণে দিদি হারার মা যে সেখানে দাঁড়িয়েছিল" স্নেহলতা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—"হঁ্যা হঁ্যা হারার মা আমাকে দেখিয়ে দেয়েছিল,—নইলে আমি কাঁচা থাকতেই নামাচ্ছিনুন। সে কিন্তু নাড়াচাড়া করেনি। সবটা খেতে হবে কিন্তু মেশ মশায়।"

জগৎ বাবু বলিলেন "তাহলে কি দিবি বল?"

স্নেহ। "কি দেব—আরো খানিকটা মোহনভোগ। তাও কিন্তু খেতে হবে"

জগৎ। "তাও খেতে হবে?"

লতা। হঁ্যা—তা পর একটা পান দেব"

জগৎ। "পান যেন দিবি—কিন্তু প্রাণটা তা পর দিতে পারবিনেত বুড়ি?"

টগর। "না বাবা তুমি অত মোহনভোগ খেয়োনা তাহলে লুচি খেতে পারবে না। তাহলে মা রাগ করবে আর তুমি বকুনি খাবে—"

জগৎ বাবু বলিলেন—"বেশ মনে করিয়া দিয়েছিস বুড়ি, ঐটে ছাড়া আমি আর সব খেতে রাজি আছি—"

টগর খুব হাসিল, কিন্তু স্নেহলতার হাসি আসিয়া অধর প্রান্তে তাহা মিলাইয়া গেল, বকুনি খাওয়াটা যে কি বিষম ব্যাপার তাহা সে বেশ জানিত সুতরাং সেটা সে হাস্যজনক বলিয়া অনুভব করিল না।

জগৎ বাবু বাড়ী আসিয়া বাহিরে মুখ হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া লইয়াছিলেন বাড়ীর মধ্যে আসিয়াই খাইতে বসিলেন। স্নেহলতা তাঁহার আহারের সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিল, তিনি আসনে বসিলে তাঁহার সম্মুখে খাদ্যাদি ধরিয়া দিয়া নিকটে বসিল। গৃহিণী তখন সে ঘরে ছিলেন না,—টগর বারান্দায় গিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল—"মা উপরে আয় বাবা এসেছে।"

জগৎ বাবু এত সকাল সকাল প্রায় আসেন না, সুতরাং গৃহিণী ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি যখন কাপড় ছাড়িয়া উপরে আসিলেন—তখন জগৎ বাবুর খাওয়া

শেষ হইয়াছে--তিনি জল খাইতেছেন। কিন্তু গৃহিণী দেখিলেন তখনো তাঁহার পাতে দুইখানা লুচি ও দেড়খানা আন্দাজ সন্দেশ পড়িয়া আছে। তিনি লুচির থালা হইতে স্নেহলতার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন "বলি একটু আগে কি ডাকতে নেই—আজ দেখছি বাবুর কিছু খাওয়া হয়নি। (জগৎ বাবুর প্রতি) ঐ মনোহরাটা খাও না—আমার মা পাঠিয়াছেন।"

জগৎ বাবু দেখিলেন আবার অনুনয়ের পালা আরম্ভ হইল, এ পালাটাকে যদি তিনি একবার জমাইতে দেন তাহা হইলে গৃহিণী তাঁহাকে ঐ দুখানা লুচি ও সন্দেশ না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না। তিনি যদি বা দু এক মিনিট আসনে বসিয়া থাকিতেন,—ইহার পর তাহাতে আর সাহস না করিয়া তাড়াতাড়ি আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন—"অসারং খলু সংসারে শ্বশুর মন্দিরের সবই সার তাকি আর জানিনে গিন্নি—একটা আস্ত সন্দেশ খেয়ে ফেলেছি—"

গৃহিণী তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না,—মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া বলিলেন—একটা খেলে কি আর দুট খেতে নেই। তোমাদের কেমন যে জিনিস নষ্ট করা অভ্যাস! যেন সব ধূলো ধূলো—যত রাখ যত ফ্যালো, কিছুর আর দরদাম নেই।"

জগৎ বাবু মাথা চুলকাইয়া মনে মনে বলিলেন "কিন্তু জীবনের দরটাও একবারত ভাবিতে হয়।" প্রকাশ্যে কিন্তু আর কোন কথা কহিতে সাহস না করিয়া ত্রস্তে বারান্দায় সরিয়া পড়িলেন। সেখানে চাকর গাড়ু গামছা লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। গৃহিণীর যদিও কাজে কাজেই তখন তাঁহার আশা ছাড়িতে হইল কিন্তু সেই নষ্ট খাদ্যের উদ্ধারের আশা তবুও প্রাণ ধরিয়া ছাড়িতে না পারিয়া টগরকে বলিলেন—"অত খাবার নষ্ট কেন হবে, তুই পাতে বস"

দুঃখের মধ্যে টগরেরও আবার তখন 'ক্ষিধে' ছিল না, কিছু পূর্ব্বেই সে তাহার লুচির ভাগ শেষ করিয়া আসিয়াছিল,—সুতরাং সেও গৃহিণীর প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ায় গৃহিণী মহা ক্ষাপা হইয়া উঠিলেন। জগৎ বাবুর দৃষ্টান্তে ও আদরে যে মেয়েগুলোর ইহকাল পরকাল খাওয়া যাইতেছে এই ভাবিয়া তিনি কোন কালেই সুস্থির ছিলেন না; এখন এই দুঃখে তাহার মাথামুড় খুড়িয়া মরিতে পর্য্যন্ত ইচ্ছা হইল। কিন্তু যখন দেখিলেন শুনিয়া ও টগর তাঁহার কথা রাখিল না— তখন কথাবার্ত্তা ছাড়িয়া টগরের হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া জগৎ বাবুর আসনে বসাইয়া দিলেন, এবং কোন ওজর আপত্তি না শুনিয়া লুচি সন্দেশের তাল পাকাইয়া তাহার মুখের মধ্যে ঠাসিয়া ধরিলেন। এই রূপ জোর জবরদস্তিতে বাধ্য হইয়া কিম্বা মিষ্টের স্বাদে বশীভূত হইয়া অথবা এই দুই কারণেরই চাপের মধ্যে পড়িয়া—যে জন্যই হৌক ইহার পর লক্ষ্মীটির মত টগরও তাহার মুখের লুচি শেষ করিয়া ফেলিল--এবং ফিরে বার গৃহিণী যখন তাহাকে খাওয়াইতে গেলেন তখন তাহাতে আর কোন ওজর আপত্তি করিল না, গৃহিণী তখন নির্ব্বি-

বাদে সেই লুচি দুইখানা ও দেড়খানা সন্দেশকে সদ্গতি দিয়া এক রকম নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, কারণ সেই ভূতপূর্ব্ব ভুক্তাবশিষ্টের সম্ভাবিত অকল্যাণ ভয় তথনো তাঁহার কল্পনায় জাগিতে লাগিল, আর যত নষ্টের গোড়া সেই স্নেহলতাটা, বাবু আসিতেই ঠিক সময়ে তাঁহাকে ডাকে নাই বলিয়া তথনো গণগণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে জগৎ বাবু আহারান্তে হাত মুখ ধুইয়া একেবারে শয়নকক্ষে পলাতক হইয়াছিলেন। সেখানে কৌচে শুইয়া তিনি গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন, স্নেহলতা তাঁহার মাথার কাছে একটা টুলে বসিয়া পাকাচুল তুলিতেছিল আর যা খুসী বকিয়া যাইতেছিল, জগৎ বাবু চোখ বুজিয়া হাঁ—হুঁ দিয়া যাইতেছিলেন। গৃহিণী টগরকে খাওয়াইয়া এই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং জগৎ বাবুর পায়ের কাছে কৌচে বসিয়া বলিলেন “বলি ঘুমচ্ছ নাকি”? জগৎ বাবু বলিলেন—‘না’। টগরও গৃহিণীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল, সে বলিল—“বাবা এমন চোখ বুজে থাকে ঠিক যেন ঘুমোয়।” গৃহিণী স্নেহলতার দিকে চাহিয়া বলিলেন—‘ভাঁড়ার দিবিনে বাছা।” সে বলিল—“আমার ভাঁড়ার দেওয়া হ’য়ে গেছে।”

গৃহিণী। “ভাঁড়ার দেওয়া হয়েছে—তা আর কিছু কি কাজ নেই—যা টগরের চুল বেঁধে দিগে”। স্নেহলতা ইহাতে বড় কম আশ্চর্য্য হইল না, টগরের চুলে স্নেহ লতাকে ~~হাত দিতে~~ দেখিলে গৃহিণী ক্ষেপিয়া উঠেন, আজ একি কথা! অন্য সময় হইলে সে বড়ই আহ্লাদিত হইত কিন্তু আপাততঃ জগৎবাবুর কাছ ছাড়িয়া যাইতে তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি বলিয়া কাটাইবে ভাবিয়া পাইতেছিল না এমন সময় টগর তাহাকে অব্যাহতি দিয়া বলিল—“না দিদির কাছে আমি চুল বাঁধব না।”—তখন সে বলিল-“টগর চুল বাঁধবে না।” গৃহিণী বলিলেন—“দেখেছ এক গুঁয়ে! কিছুতেই যাবে না।”

জগৎ বাবু বুঝিলেন—গৃহিণীর কি কথা আছে মেয়েদের তাড়াইতে চান—তিনি স্নেহলতাকে বলিলেন—“লতি তুই ত বেশ চুল বাঁধিস, আজ দে দেখি টগরের বেঁধে। টগর যা ~~বুদ্ধি~~ ওঘরে গিয়ে দিদির কাছে চুল বাঁধগে। যাও স্নেহ ওকে নিয়ে যাও।” টগর তখন আর কোন আপত্তি করিল না, স্নেহ তাহাকে লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে জগৎ বাবু গৃহিণীকে বলিলেন—“উহাদের পষ্ট করিয়া বলিলেই ত হইত ‘তোমরা যাও’ অত ঘোর পঁাচ করিয়া বলিলে কি উহারা বোঝে—না বোঝাটাই ভাল?”

গৃহিণী বলিলেন—“না আমি যা বলি কিছুই ভাল নয়? কি করে আবার স্পষ্ট ক’রে বলতে হয়।” তুমি কেবল আমারি দোষ দেখ।”

জগৎ বাবু দেখিলেন—বেশী কথা কহিলে উল্টা উৎপত্তি হইবে, তিনি ও কথা ছাড়িয়া বলিলেন—“কি কথাটা বলিবে—এখন বল দেখি?”

গৃহিণী বলিলেন—“বলি কত দিন আর আয়বড় রাখবে, আর ত আমার মুখ দেখাবার যো নেই, এই ও বাড়ীর ওরা কত কথা বল্লে, সেসব ত আর তোমার শুনতে হয় না।”

জগৎ বাবু বলিলেন—“এই ত সবে দশ বছর বয়স—ইহার মধ্যেই এত কথা!”

গৃ। দশ বছর কি কম? “আর দেখতে ত ১৬ বছরের মাগী হয়ে উঠেছে।”

জগৎ বাবু বলিলেন—“নিতান্তই যদি এত শীঘ্র বিয়ে দিতে চাও ত উদ্যোগ করতে হয়। তবে আমার ইচ্ছা ছিল—চারু আর একটু বড় হোক।”

গৃহিণীর নথশুদ্ধ নাক ফুলিয়া উঠিল, বলিলেন—“দেখ আমি স্পষ্ট বলছি চারুর সঙ্গে ওর বিয়ে হবে না—তা যদি দাও ত আমি গলায় দড়ি দেব।”

যতদিন জগৎ বাবুর মা বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন গৃহিণী মুখ ফুঠিতে পারেন নাই, জানিতেন মুখ ফুটিলেও কিছু হইবে না। কিন্তু তিনি মরিয়া অবধি গৃহিণী ক্রমাগত বলিতেছেন চারুর সহিত স্নেহের বিবাহ হইবে না—অন্য বর খোঁজা হউক। কিন্তু জগৎবাবু বর খোঁজার দিক দিয়া যান না—তাঁর ইচ্ছা ক্রমে ক্রমে কোন গতিকে গৃহিণীকে তাঁহার মতে আনিবেন। তাই যখন তখন আজ কাল তাঁহাদের মধ্যে এই বিষয় লইয়া তর্কাতর্কি বিবাদ চলে। জগৎবাবু বলিলেন—“ওগো একটু ভেবে দেখ অমন লক্ষ্মী মেয়ে কি আর কোথায় পাবে?”

গৃহিণী বলিলেন—“লক্ষ্মীমেয়ে! কেমন লক্ষ্মী সে আমি বুঝি। ঘর করতে হলে তুমিও বুঝতে। সেও যেন হোল—কিন্তু অমন বাপ মা খেকো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে ছেলের অকল্যাণ হবে—সে আমি প্রাণ থাকতে দেব না।”

জগৎ বাবু বলিলেন—“তোমার কুসংস্কার কি কিছুতেই ভাঙ্গবে না, তোমার বিশ্বাস ভাঙ্গানর জন্যও এই বিয়ে দেওয়া উচিত।”

গৃহিণী দেখিলেন এরূপ করিয়া আর চলে না—তিনি জানিতেন কোন কথা কিরূপ করিয়া বলিলে জগৎ বাবুর আঁতে ঘা লাগে, তিনি চোখে দু ফোঁটা জল আনিয়া নাকি স্বরে বলিলেন—“দেখ স্ত্রী করিয়াছ এই মাত্র, কখনো ত সুখী করিলেনা, ছেলেকে লইয়া যে সুখী হইব তাহাও দিবে না?”

জগৎ বাবু চুপ করিয়া রহিলেন—এরূপ কথা বলিলেই তিনি মুস্কিলে পড়িতেন,—কেবল তাঁহার মাথা চুলকাইতে হইত।

গৃহিণী বুঝিলেন—কথার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে—তিনি আবার বলিলেন—“এ পোড়াকপালে কোন সাধ মিটলনা। স্বামীর ভালবাসা যে পেলে না তার আবার সাধ করাই বা কেন? তবু মন বোঝে না, চারুর একটি ভাল বে দিয়ে সাধ আহ্লাদ করতে ইচ্ছা হয়। তা তোমার যদি এও প্রাণে না সয়—ত দাও কনের সঙ্গেই বে দাও।” গৃহিণীর এইখানে থামিতে হইল—টগর দৌড়িয়া আসিয়াই বলিল—“মা

দিদি কেমন চুল বেঁধে দিয়েছে দেখ—বড় ঢল ঢল করছে—তুই আবার বেঁধে দে" বলিয়া মায়ের কোলে বসিয়া পড়িল—বসিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"দাদার বিয়ে?—কার সঙ্গে? কনেদিদির?" এই সময় কনে দিদিও আসিয়া দাঁড়াইল,

জগৎবাবু নিশ্বাস ছাড়িয়া যেন বাঁচিলেন, আপাততঃ গৃহিণীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। তিনি কৌচ হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া টগরকে বলিলেন—"টগরি—আজ তোদের একজামিন মনে আছে ত, বারান্দায় বই নিয়ে আয়।"

টগর বলিল "বাবা আমার বই হারিয়ে গেছে—যদু বই এনে দেয় নি।"

জগৎ বাবু বলিলেন—"তোর রোজই কি বই হারাবে। মায়ে ঝিয়ের সমান বিদ্যা হবে দেখছি—কেমন গিন্নি? আয় স্নেহ তোর পড়া দেখিগে।" স্নেহ বই হাতে লইয়া আসিয়াছিল তাহার হাত ধরিয়া জগৎ বাবু বারান্দার দিকে অগ্রসর হইলেন। যাইতে যাইতে হঠাৎ দাঁড়াইয়া বলিলেন—"দাঁড়া ঘড়িটা নিয়ে যাই, ৭টার সময় ঠিক আমার এক জায়গায় যেতে হবে।" বলিয়া জগৎ বাবু টেবিলের কাছে আসিয়া ঘড়ি না দেখিয়া বলিলেন—"ঘড়ি কোথায় বল তো?"

গৃহিণী বলিলেন—"ঘড়ি? ঐ যে ঐ—কি বলে মরুক গে—ধেড়ে বেড়ালটা এসে ফেলে দিয়ে গেল"—কথাটা জগৎ বাবুর অসম্ভব মনে হইল, বিশেষ তিনি গৃহিণীকে চিনিতেন, তিনি টগরকে বলিলেন—"টগর ঘড়ি কে ভাঙ্গিল।"

~~টগর~~ একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিল—একবার অঁ্যা অঁ্যা করিয়া বলিল—"আপনি।" তখন তিনি স্নেহ লতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন স্নেহ ঘড়ি কে ভাঙ্গিয়াছে।" স্নেহলতার মুখ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু সে সুস্পষ্ট স্বরে বলিল—"চারু"। জগৎ বাবু ক্রুদ্ধস্বরে গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তুমি আপনি মিথ্যা বলবে—আর ছেলেদেরও মিথ্যা শেখাবে?

এই সময়ে দৈবের গতিকে চারুও এই ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। জগৎ বাবু রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "চারু ঘড়ি কে ভাঙ্গিল?" চারু ভীত হইয়া উঠিল, তাহার দোষ স্বীকার করিতে সাহস হইল না, সে বলিল বাবা—বাবা—আমি ত এই আসছি"—জগৎ বাবু আর পারিলেন না, চারুর কাণ মলিয়া বলিলেন—"চারু মিথ্যা কথা! দোষ করিয়া সত্য কহিতে তোর সাহস নাই।" চারু ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, টগর ও স্নেহ পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল,—গৃহিণী কাঁদিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া কহিলেন—"ওমাগো অত বড় ছেলেকে মার! কোথায় যাবরে আমি? কি অদৃষ্ট করেই জন্মেছিলেম গো" জগৎ বাবু চারুর কাণ ছাড়িয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন "চারু তোকে আমি একটী ঘড়ি কিনে দিতে চেয়ে ছিলাম—আর দেব না তোর এই শাস্তি"। চারু ছাড়া পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল, টগর ও স্নেহলতা তাহার অনুবর্ত্তী হইল। গৃহিণী ও জগৎ বাবু দুই জনে ঘরের মধ্যে রহিলেন। জগৎ বাবুর যেমন

স্বভাব রাগের মাথায় একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াই তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন, গৃহিণী বুঝিলেন তাঁহার কাজ আদায় করিবার এই অবসর। জগৎ বাবু যখন হঠাৎ এইরূপ কোন একটা বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিতেন, তখন তিনি মনে মনে মহা সন্তুষ্ট হইতেন—তাহার পর তাঁহাকে তিনি যেমন সুবিধামত হাত করিয়া লইতে পারিতেন, এমন অন্য কোন সময়ে না—সুতরাং গৃহিণী সেই অবসরই খুজিতেন, সুযোগ বুঝিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"হ্যাঁ গা আমি তোমার কাছে কি দোষ করেছি, চিরকাল তোমার জন্য প্রাণ দিলুম,তোমার সংসারের জন্য শরীর-পাত করলুম,তবুকি"—গৃহিণীর আর কথা বাহির হইল না। দৃশ্যটা এইখানে সহসা বড়ই করুণ হইয়া উঠিল, চক্ষের জল তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, জগৎ বাবুর মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না, কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া তিনি মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন—তাঁহার মূর্ত্তি তাঁহার রুদ্যমানা স্ত্রীর অপেক্ষা দ্বিগুণ শোচনীয় রূপ ধারণ করিল। এই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল—"বাবুমশায় একজন গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে, এখনি আপনার যেতে হবে" ইহা অপেক্ষা সুসংবাদ এখন কি হইতে পারে—ভৃত্যকে তাঁহার পরিত্রাতা বলিয়া মনে হইল, তিনি ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াই চারুর কান্না থামিল; সে গর্ব্বিত, ক্রুদ্ধ, গম্ভীর হইয়া নাট্যশালার নায়কের ভাব ধারণ করিল। লোকে মারিয়া বড় হয়, চারু মার খাইয়া আপনাকে নেপোলিয়নের মত বীর মনে করিতে লাগিল, আর তাহার পারিষদ সঙ্গী দুইটি তাহার সেই বীর ভাবে আদ্র্র, বিস্মিত এবং তাহার তুলনায় আপনাদিগকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রাদপি বলিয়া বোধ করিতে লাগিল।

খানিক দূরে আসিয়া চারু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"টগর তুই বুঝি বাবাকে বলেছিস?"

টগর বলিল—"না আমি না, দিদি বলেছে।"

চারু বিস্মিত দৃষ্টিতে স্নেহের দিকে চাহিল—বুঝিল সত্যই স্নেহলতা অপরাধী—তাহার শুষ্ক মুখ, ম্লান দৃষ্টিই ইহার প্রমাণ। চারু বলিল—"তোকে বই দিতে গিয়ে ঘড়ি পড়ে গেল আর তুই বলে দিলি?"

স্নেহলতা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—"কিন্তু মেশমশায় যে জিজ্ঞাসা করলেন"

টগর বলিল—"তা আমাকেও ত বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তা আমি কি দাদার নাম করেছিলুম? আমি বল্লুম আপনি ভেঙ্গেছে।"

স্নেহ বলিল—"কিন্তু সে যে মিথ্যা কথা।"

টগর। হলই বা মিথ্যা কথা!

স্নেহ। "মেশমশায় যে মিথ্যা বলতে বারণ করেন।"

চারু। "কিন্তু এতে যে আমার মার খেতে হোল ? আমি আর তোকে পড়াব না।" চারু রাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল, টগর সঙ্গে যাইতে যাইতে বলিল—"দাদা, দাদা মা বলেছে তোমার শীগ্‌গির বিয়ে দেবে—ক'ণে দিদির সঙ্গে।"

চারু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"না আমি ওকে বিয়ে করব না, ও বড় দুষ্টু। মাকে বলিস।"

বলিয়া সে চলিয়া গেল, টগরও চলিয়া গেল, স্নেহলতার চোখে জল ভরিয়া আসিল, সে আস্তে আস্তে বাড়ী ভিতরের বাগানে আসিয়া পুকুর ধারের দুই কোণে যেখানে দুইটি পাথর বাঁধান বকুল গাছ ছিল—তাহার একটির তলায় বসিল। অনেক সময় সে একাকী এইখানে বসিয়া পড়া অভ্যাস করিত, আজ সে এই নির্জ্জন গাছ-তলায় একাকী বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সুখ দুঃখ আমরা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনি না, কিন্তু তাহাদের সুখ দুঃখ অধিকাংশ সময় আমাদের মতই গভীররূপে তাহারা অনুভব করে, এবং তাহাদের জীবনেও ইহার স্থায়ী চিহ্ন থাকিয়া যায়।

আমরা ইহা বুঝিনা বলিয়াই আমাদের নির্দ্দয়-অযত্নে অনেক সময় স্ফুটনোন্মুখ হৃদয়গুলি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া বিকশিত হইয়া উঠে না। অযত্নে অনাদরেও তাহারা ফুটে সত্য,—কিন্তু যত্ন করিলে যাহারা সৌন্দর্য্যে সুগন্ধে ভরপূর হইয়া জগতের আনন্দ হইয়া ফুটিতে পারিত, যত্নের অভাবে তাহারাই শুষ্ক, গন্ধহীন হইয়া নিজের এবং অন্যের কষ্টের কারণ হইয়া ফুটে।

স্নেহলতার স্নেহে অবিশ্বাস করিয়া চারু যখন রাগ করিয়া চলিয়া গেল তখন তাহার হৃদয়ে অসীম বেদনা লাগিল। "কেমন করিয়া চারু একথা মনে করে যে স্নেহ ইচ্ছা করিয়া তাহাকে বকুনি খাওয়াইয়াছে ? তাহা কি সে পারে ? চারুকে সে এত ভাল-বাসে, সে কি চারুর মন্দ ইচ্ছা করিতে পারে ! ছিঃ চারু একথা কি করিয়া মনে করিল !" ক্রমাগত স্নেহলতা ইহাই ভাবিতে লাগিল—আর ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাঝে মাঝে তাহার হৃদয় যেন একেবারে শূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল, অশ্রুজল যেন একেবারে শুকাইয়া পড়িতে লাগিল,—সে তখন শূন্য ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু ঝড় দ্বিগুণ বেগে বহিবার জন্য যেমন মাঝে মাঝে থমকিয়া বল সংগ্রহ করে, সেইরূপ দ্বিগুণ বেগে আলোড়িত হইবার জন্যই ক্রন্দনের মাঝে মাঝে হৃদয় এইরূপ প্রশান্ত হইয়া পড়ে। এই ক্ষণস্থায়ী সাম্য ভাবের পর স্নেহলতার মনে কষ্টের ভাব আরো তীব্রবেগে উথলিয়া উঠিতে লাগিল—তাহার মনে হইতে লাগিল—সে যদি এখনি মরিয়া যায় ত বেশ হয়, সে মরিয়া গেলে তখন আর চারুর রাগ থাকিবে না,

তখন আর সে মনে করিবে না যে, ইচ্ছা করিয়া স্নেহ তাহাকে বকুনি খাওয়াইয়াছে, চারুর তখন তাহার জন্য অবশ্যই দুঃখ হইবে—তখন সে কাঁদিবে। স্নেহের বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল সে মরে, চারুকে কাঁদাইবার জন্যই মরে। সে মরিলে যে চারু নাও কাঁদিতে পারে, কিম্বা কাঁদিলেও যে স্নেহ তাহা দেখিতে পাইবে না, এ কথা তাহার একবারো মনে আসিল না. সে কেবল নিজের মৃত্যু কল্পনা করিয়া নিজেই কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে অতীতের কত স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল, সে যাঁহাদের মা বলিত দিদিমা বলিত তাঁহাদের কথা মনে পড়িতে লাগিল। একটি দুঃখ আসিলে সমস্ত দুঃখই ক্রমে মনে জাগিয়া উঠে, কষ্টে দুঃখে অবসন্ন হইয়া একটি ইটের উপর মাথা রাখিয়া বালিকা সেই গাছতলাতেই শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া কাঁদিতে লাগিল। হঠাৎ যেন একবার কাহার পায়ের শব্দ পাইল, চমকিয়া মুখ তুলিয়া চারিদিকে চাহিল—তাহার মনে হইল "যদি চারু আসে—আসিয়া দেখে আমি কাঁদিতেছি—তাহা হইলে আর তাহার আমার উপর রাগ থাকে না" ইহা মনে করিতেও তাহার এতটা সুখ বোধ হইল যে তাহার চোখের জল পর্য্যন্ত শুকাইয়া গেল। কিন্তু যখন দেখিল চারু আসিতেছে না তখন আবার তাহার কান্না উথলিয়া উঠিল। ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে কাঁদিতে এইবার সে ঘুমাইয়া পড়িল। অস্তমান সূর্য্যের লাল আলো পুকুরের উপর পড়িয়া চিক চিক করিতে লাগিল, পাখীগুলি অবিশ্রান্ত কোলাহল করিতে লাগিল, মৃদুমন্দ বায়ুর স্পর্শে বৃন্তচ্যুত হইয়া বকুলফুলগুলি স্নেহের গায়ের উপর পড়িতে লাগিল, স্নেহ তখন স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—যেন বড় বৃষ্টি পড়িতেছে, সে বাগান হইতে উঠিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল সে বাড়ী তাহাদের বাড়ী নহে, আর কাহাদের বাড়ী আসিয়া পড়িয়াছে। সে শঙ্কাকুল হইয়া সেই বাড়ী হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিল, অমনি বাড়ীর চারিদিকের দ্বার সহসা বন্ধ হইয়া গেল, স্নেহ দেখিল সে তাহার মধ্যে বন্দী, তাহার পলাইবার উপায় নাই, তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। এই সময় একজন বালিকাকে সে গৃহের মধ্যে দেখিল, বালিকা এত কৃষ্ণবর্ণ যে তাহার যেন মাজা পাথরের শরীর, স্নেহ অবাক হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল, তাহাকে দেখিয়া তাহার ভয় চলিয়া গেল, সে মানুষ কি পাথর তাহা জানিতে স্নেহের বড় ইচ্ছা হইল, সে বালিকার নিকটে আসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইবামাত্র বালিকা হাসিল। স্নেহ বুঝিল বালিকা মানুষ, এবং ইহাও বুঝিল সে যাদুকরী। সে উৎসুক হইয়া বলিল—"আমার হাত দেখ" যাদুকরী হাত দেখিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল "বুঝিয়াছি তুমি কে, তুমি জগৎ বাবুর বাড়ী থাক" এই কথায় স্নেহ বড়ই আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এ কথা সে কি করিয়া জানিল! তাহার মনে হইল সে আরব্য উপন্যাসের রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। যাদুকরী তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিল, বুঝিয়া হাসিয়া

বলিল—"বলিব চারু তোমার কে হয়?" বালিকা আরো আশ্চর্য্য হইল, সে কি সমস্তই জানে! কিন্তু লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া বলিল—"না বলিও না।" সে বলিল "তবে কি বলিব?"

স্নেহ বলিল—"এ কি সত্যই আরব্য উপন্যাস, ঠিক করিয়া বল?"

যাদুকরী বলিল—"আরব্য উপন্যাস নয়ত কি? আরো মজা দেখিবে?" বলিয়া সে দরজার দিকে অগ্রসর হইল, এবং দরজা যেমন বন্ধ তেমনি রহিল, সে তাহার মধ্য দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। স্নেহ বিস্ময়ে অভিভূত—এমন সময় একজন ইংরাজ গোরা তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল—বলিল "আমি সমস্ত দিন খাই নাই, আমাকে পয়সা দাও"। স্নেহের কাপড়ে দু একটি পয়সা বাঁধা ছিল, সে তাহা জোর করিয়া লইতে পারিত কিন্তু স্নেহ স্বেচ্ছায় তাহা দেয় কি না দেখিবার জন্যই যেন সে এ কথা বলিল, সে তাহাকে পরীক্ষা করিতে চাহে, যাদুকরী তাহাকে ঐজন্য পাঠাইয়াছে। পয়সা কাপড় হইতে খুলিয়া স্নেহ তাহার হাতে দিল, তখন সে বলিল—"পয়সা লইয়া আমি কি করিব, তোমর হাতের ঐ বইখানি দাও"।

জগৎ বাবু তাহাকে সম্প্রতি তাহা কিনিয়া দিয়াছেন—সেখানি তাহাকে দিতে স্নেহলতার কোন মতেই ইচ্ছা হইল না, অথচ ইহাও সে বেশ বুঝিল—যে নিজে না দিলে এখনি সে জোর করিয়া তাহার কাছ হইতে কাড়িয়া লইবে। তবুও সে দিতে পারিতেছে না, এমন সময় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিল চারিদিক ভয়ানক অন্ধকার—তাহার মনে হইল সেই কৃষ্ণবর্ণা যাদুকরী যেন এই অন্ধকারের বেশে তাহার নিকট দাঁড়াইয়া আছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, গাছের মধ্য হইতে তখন দু একটি তারা এবং বাড়ীর জানালায় একটা আলোক তাহার চোখে পড়িল, সে বুঝিল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে ঘুমাইয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে বাড়ীর দিকে চলিল। বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে না ঢুকিতে একজন দাসী বলিল "তেলের জন্য রান্না বন্ধ হইয়া আছে", এক জন চাকর বলিল "বাতি নাই, কর্ত্তার ঘর অন্ধকার"; ইহার উপর গৃহিনীর ঘন ঘন সক্রোধ চীৎকার তাহার কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল, আতঙ্কে স্নেহলতা তাহার কষ্ট, দুঃখ, স্বপ্ন সমস্তই ভুলিয়া গেল।

নব বর্ষ।

১

মোছ নয়নের জল
হৃদয়ে বাঁধ গো বল,
নূতন বরষ ফিরে এসেছে আবার।

নবীন পল্লব পরে
ফুল ফুটে থরে থরে,
পূরবে উঠেছে রবি গিয়াছে আঁধার।

২

হরষে আবার প্রাণ
নিতি গা'ক নব গান
অধরে আবার যেন ফুটে ওঠে হাসি,
আঁধারে জড়ের প্রায়
কে প'ড়ে রহিবে হায়
শোন গো দূরেতে ওই বাজিতেছে বাঁশী।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

বৈশাখী সাজি।

কি রৌদ্র! এধারে স্বধু তাল ও খেজুর,
চল, চল, ওইধারে অশ্বথের তলে।
কি স্বচ্ছ! মুকুর সম মোহন পুকুর!
ওই দেখ, ঝুপ করি পড়িল রে জলে
কুল গাছ হ'তে উড়ি মাছরাঙা পাখী;
ডুব দিল পানকৌড়ি গভীর অতলে,
সারল ও বালহাঁস করে মাথামাখি
কত স্নেহে—বসি মোরা হেরি কুতূহলে।
গ্রামের কামিনী সব নৈবেদ্য আনিয়া,
"বাবাঠাকুরের" পূজা করে মনোসাধে;
বালকেরা নাচি, কুঁদি, হাত তালি দিয়া,
শিমুল ফুলের তুলা কুড়ায় আহ্লাদে।
চিত্রপটে ছবি যেন, কিবা অভিরাম!
সুন্দর এ পুষ্করিণী মোহন এ গ্রাম!

দুই বার।

প্রথম বার।

১

একবার সেই বসন্ত প্রভাতে মুঞ্জরিত আম্রকাননে মৃদুবাহিনী তরঙ্গিত নদীতীরে, আর একবার প্রদোষ কালে শৈলমূলে সন্ধ্যা-গগনতলে—দুইবার দেখিয়াছিলাম। যাহা দেখিয়াছিলাম, যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা চিরদিন মনে রহিয়াছে। আজ আবার সেই কথা বলিতে বসিয়াছি।

এই কোলাহলময় সংসারে এমন কাহার না ঘটে? একটী মুখ, একটী সুখ, একটী দুঃখ, একটী স্মৃতি এমন কাহার না থাকে? সেইটী লইয়া এই তরঙ্গাভিঘাতজীর্ণ জীবন তরণী হইতে মাঝে মাঝে বাহিরে আসিয়া একটু দাঁড়াইতে কাহার না সাধ হয়?

আর যখন সেই চিন্তা পরের জন্য, নিজের সুখ দুঃখের নয়, তখন কেন ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল মনে হয়? কেন সকলে স্বার্থপর স্বার্থপর বলিয়া পরস্পরের গ্লানি করে? পরের জন্য একবার কখন ভাবে নাই এমন কেহ আছে?

পথ চলিতে একটী মুখ দেখিতে পাও, গৃহে আসিয়া সেই মুখ ভাব কেন? কি দুঃখে তাহার মুখ এত মলিন জানিতে ইচ্ছা করে কেন? কি যেন রহস্য তাহার জীবনে মিশ্রিত আছে তাহাই জানিতে ইচ্ছা করে। এমন কত দেখি, কত মনে হয়, আবার ভুলিয়া যাই। কিন্তু এক এক সময় যাহা দেখি তাহা আর ভুলিতে পারি না।

২

যাহা সকলে করে, সকলে যাহার প্রার্থনা করে, আমিও তাহাই করি। অনেক দিন হইতে রাজকর্ম্ম করিয়া আসিতেছি। কর্ম্মের উপলক্ষে প্রতি বৎসরে কয়েক মাস আমার ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। সেই কয় মাসে অনেক জেলায় ভ্রমণ করিতাম। শীতের প্রারম্ভ হইতে গ্রীষ্মাগম পর্য্যন্ত এইরূপ ঘুরিতে হইত।

ভ্রমণকালে প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করা আমার অভ্যাস ছিল। সঙ্গে এক পুরাতন চাকর থাকিত। চাকর পুরাতন হইলেই মুনিবকে আর বড় ভয় করে না। কোন দিন আমি উঠিলে উঠিত, কোন দিন ঘুমাইয়া থাকিত। আমি ততটা চাকরের প্রত্যাশাও রাখিতাম না। দেশ ভ্রমণের এই একটা বিশেষ লাভ—মানুষ নিজের চাকরী নেহাত নীচ কর্ম্ম মনে করে না, আবশ্যক মতে নিজে বিছানা পাতিয়া লইতে পারে, জুতা জোড়াটা নিজে পরিষ্কার করিয়া লইতে পারে। এই রকম অনেক কাজ আমি দিব্য শিখিয়াছি। সুতরাং ভোরের বেলা চাকর না উঠিলে ডাকিয়া বাড়ী

ফাটাইতাম না। মুখ হাত ধুইয়া হাতে একগাছা ছড়ি লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম। তামাকু খাওয়ার ঝঞ্ঝাটটা ছিল না—সেটাও ভ্রমণের ফল।

কয়েক বৎসর অতীত হইল একবার এইরূপ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। শীত ফুরাইয়া গিয়াছে। বসন্তের বাতাস বহিতেছে, গাছে নূতন পাতা উদ্ভিন্ন হইয়াছে, আম্রবৃক্ষে মুকুল ধরিয়াছে, মুকুলের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে মধুপিপাসী মৌমাছি উড়িতেছে, দিবানিশি কোকিলের রবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

একদিন একটী ক্ষুদ্র গ্রামে বাসা করিয়াছিলাম। যেমন প্রত্যূষে উঠা অভ্যাস, সেই-রূপ উঠিলাম, বরং আরও একটু সকালে উঠিলাম। ভৃত্য আমার চারপাইয়ের কাছে শুইয়াছিল। একে বসন্ত কাল তাহাতে ভোরের বাতাস, সকলের এমন সময় নিদ্রাভঙ্গ হয় না। ভৃত্য অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে আর ডাকিলাম না। হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া ভ্রমণ করিতে চলিলাম।

গ্রামের চতুর্দ্দিকে উপবন। কোথাও আম্রকানন, কোথাও পনসশ্রেণী, বৃক্ষতলে রাশিকৃত শুষ্ক পত্র বাতাসে উড়িয়া মর্ম্মর করিতেছে। কোন স্থলে বাঁশঝাড়, বাতাসে বাঁশের পাতা ঝর ঝর করিতেছে। নির্ম্মল বায়ু সেবনে চিত্ত প্রফুল্ল হইতে লাগিল। দ্রুতপদে অনেক দূর চলিয়া গেলাম।

কিছু দূর গিয়া দেখিলাম সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড আম্রকানন। কাননের অভ্যন্তরে বহুবিধ পক্ষী কলরব করিতেছে। আমি কাননে প্রবেশ না করিয়া ঘুরিয়া যাইব মনে করিতেছি, এমন সময়ে কাননের ভিতর হইতে সেতারের শব্দ নিঃসৃত হইতেছে শুনিতে পাইলাম।

তখন আকাশ দিব্য পরিষ্কার হইয়াছে। দিগন্তে আকাশ কোমল, কোথাও ঈষৎ ধূসর বর্ণ, মাথার উপর আকাশ গভীর নীল। বায়ু ঈষৎ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বদিকে উপবীতের ন্যায় এক খণ্ড দীর্ঘ, শুভ্র, ক্ষীণ মেঘ, তাহার তলে ঈষৎ লোহিত আভা। সূর্য্যোদয়ের এখনও বিলম্ব আছে।

সেতারের আওয়াজ শুনিয়া কুতূহলী হইয়া আম্রকাননে প্রবেশ করিলাম। এমন সময়ে, এমন স্থানে কে সেতার বাজায়? দেখিলাম যেখানে বৃক্ষশ্রেণী ঘনবিন্যস্ত ও শাখাপত্র নিবিড়, সেইখানে পরিস্কৃত তৃণমণ্ডিত ধরাসনে বসিয়া কৌপীনধারী বিভূতি ভূষিত তরুণবয়স্ক বৈরাগী সেতার বাজাইতেছে। সেতার বাঁধিয়া আলাপ করিতেছে, এখনও রীতিমত বাজাইতে আরম্ভ করে নাই।

নির্জ্জন কানন মধ্যে প্রভাতকালে বৃক্ষমূলে সেই মূর্ত্তি দেখিয়া আমি একটু থমকিয়া দাঁড়াইলাম। সন্ন্যাসী অবনত মস্তকে বসিয়াছিল, আমার দিকে চাহিয়া দেখিল না। আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া বিস্ময়ের সহিত তাহাকে দেখিতে লাগিলাম।

যেমন দেখিয়াছিলাম আজও যেন তেমনি দেখিতেছি। যদি চিত্রকর হইতাম তাহা

হইলে সেই চিত্র আজ অবিকল চিত্রিত করিয়া দেখাইতে পারিতাম। সেই সজ্জিতশ্রেণী আম্রকানন, উপরে একখণ্ড নির্ম্মল নীল আকাশ, বৃক্ষতলে তৃণাসনে যন্ত্র হস্তে আনত-নয়নে উপবিষ্ট সন্ন্যাসী, তাহার পার্শ্বে সেতারের আবরণ বস্ত্র, একটী একটী করিয়া তুলি মুখে চিত্রিত করিতে পারিতাম। সন্ন্যাসীর প্রশান্ত প্রশস্ত ললাট, জটাশূন্য কুঞ্চিত দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশ, ঘনশ্মশ্রুশোভিত প্রসন্ন মুখশ্রী, নিবিড় দীর্ঘ পক্ষ্মরাজি, গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, চঞ্চল দীর্ঘ সরল অঙ্গুলি সমুদায় চিত্র পটে অঙ্কিত করিতে পারিতাম।

সন্ন্যাসীকে কিছুক্ষণ দেখিয়া তাহার সেতার ও সেতারের খোলের উপর দৃষ্টি পড়িল। সন্ন্যাসীর কটিদেশে কৌপীন, স্কন্ধে একখণ্ড গৈরিক বস্ত্র। আর কোন অঙ্গ বস্ত্র ছিল না। কিন্তু সেতার বহুমূল্য, গজদন্তমণ্ডিত ও অত্যন্ত সুগঠিত। আবরণ বস্ত্র লাল মখমলের, তাহার চারিধারে জরির কাজ। এ সন্ন্যাসী নূতন রকম, নূতন রকম সামগ্রী লইয়া সন্ন্যাস করিতে বসিয়াছে। যদি দরিদ্র হয় ত এমন সেতার, এমন খোল কোথায় পাইল? যদি দরিদ্র না হয় তাহা হইলে বাদ্যযন্ত্রে অনুরাগ থাকিলেও সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিল কেন? এখানেই বা এমন সময় সেতার বাজাইতে আসে কেন?

৩

আর কোন কথা ভাবিবার অবসর রহিল না। সেতারে ললিত রাগিণী বাজিতে লাগিল। আমি তন্মনা হইয়া শুনিতে লাগিলাম।

প্রভাত আকাশতলে সেরূপ করুণাময়ী রাগিণী আর কখন শুনিব না। সেই অপূর্ব্ব কৌশল কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? মথিত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে প্রবাহিত অশ্রুময় নিশ্বাসের তুল্য সেই ঝঙ্কার, রুদ্ধকণ্ঠ অর্দ্ধস্ফুট রোদনের তুল্য, তটশালিনী ধীরবাহিনী সন্ধ্যা তটিনীর তুল্য সেই রুদ্ধ ভগ্ন উচ্ছ্বাস আর কি শুনিব? শুনিতে শুনিতে আমার চক্ষে অশ্রু বহিতে লাগিল।

সার্থক শিক্ষা! ধন্য কৌশল! উদাসীনের সংসার ত্যাগের কারণ বুঝিতে পারিলাম।

সন্ন্যাসী একবার মুখ তুলিয়া চাহে নাই। একমনে চক্ষু নত করিয়া সেতার বাজা-ইতেছিল। বিহঙ্গ কলরব যেন নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। বসন্তের প্রভাত পবনে শুধু সেই কলঝঙ্কার পূর্ণ ললিত রাগিণী প্রবাহিত হইতেছিল।

কতক্ষণ পরে ধীরে ধীরে সেই রাগিণী বিলীন হইল। প্রিয়জনের বক্ষে মুখ লুক্কায়িত করিলে সুন্দরীর রোদন যেমন ধীরে ধীরে শমিত হয়, সেইরূপ সেতারের শব্দ ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। আমি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্যদিকে চাহিলাম। দেখিলাম আমার পার্শ্বে আর এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া স্থির করিলাম গ্রামবাসী কেহ হইবে। সে নীরবে চক্ষু মুছিতেছিল।

আবার সেতার বাজিতে লাগিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির সহিত কথা কহিবার অবকাশ হইল না। সেতারে ভৈরবী, টোড়ী বাজিতে লাগিল। আমরা স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম।

গ্রাম হইতে আর একজন আসিল। ক্রমে ক্রমে লোক জমিতে লাগিল। আমি যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেখানে বিশ পঁচিশ জন লোক আসিয়া দাঁড়াইল। কাহারও মুখে কথা নাই, সকলে নিঃশব্দে শুনিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী ধ্যানস্থ পুরুষের ন্যায় স্থির হইয়া বসিয়াছিল। কেবল বাম হস্তের অঙ্গুলি গুলি কখন ধীরে ধীরে কখন বিদ্যুতের মত চালিত হইতেছিল।

সূর্য্যোদয় হইয়াছে। প্রভাত সূর্য্যের তরল সুবর্ণস্রোত কাননে প্রবাহিত হইয়াছে। এমন সময় দর্শকদিগের মধ্যে একটু গোলযোগ বাধিল। একব্যক্তি অপর এক জনকে কিছু রুক্ষস্বরে কহিল, "কেন হে, ঠেলা দাও কেন ?"

শব্দ সন্ন্যাসীর কানে গেল। সেতার বন্ধ করিয়া মাথা তুলিয়া চাহিল। সন্ন্যাসীর চক্ষু বিশাল, আরক্তবর্ণ। লোক দেখিয়া সন্ন্যাসী সেতারের তার নামাইয়া মখমলের খোলে পূরিল। সেতার হাতে লইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল।

৪

গ্রামবাসীরা হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। আমি সন্ন্যাসীর পশ্চাতে চলিলাম। সন্ন্যাসী দীর্ঘ অথচ লঘু পদবিক্ষেপে অত্যন্ত দ্রুত চলিতে লাগিল। কোথায় যায় দেখিবার জন্য আমি একটু পিছনে রহিলাম। চিরকাল পদব্রজে ভ্রমণ করা আমার অভ্যাস; অক্লেশে অনেকটা পথ দ্রুতগতিতে যাইতে পারি জানিয়া একটু গৌরব করিতাম। কিন্তু এখন সন্ন্যাসীর সঙ্গ রাখা ভার হইল। কিছু দূর গিয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইলাম। মাঝে মাঝে কয়েক চরণ দৌড়িতেছিলাম, নহিলে একেবারেই পিছাইয়া পড়ি, সন্ন্যাসী দৃষ্টির বহির্ভূত হয়।

সেতার বাজাইবার কালে সন্ন্যাসী যেমন কোন দিকে দৃষ্টি ফিরায় নাই, এখনও সেইরূপ সম্মুখে পথ দেখিয়া চলিল, ইতস্ততঃ বা পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল না। কানন হইতে নির্গত হইয়া কখন দক্ষিণে কখন বামে ফিরিয়া, শস্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়া, কাননের পাশ দিয়া সেইরূপ দ্রুত পদে চলিল। যেরূপ অভ্রান্ত দ্রুত গতিতে চলিতেছিল, তাহাতে অনুমান করিলাম পথ তাহার পরিচিত হইবে।

এইরূপে প্রায় দেড় ক্রোশ পথ অতিবাহিত হইল। সহসা সম্মুখে দেখিলাম অন্য কোন গাছ দেখা যায় না, কেবল প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের ঘন সারি। বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে সলিলের উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে। সলিলস্থ সূর্য্যকিরণের প্রতিবিম্ব কখন কখন বসন্তাগমে নবীন অশ্বত্থ পত্রে পতিত হইতেছে। নিকটে আসিয়া দেখিলাম কোন স্রোতস্বিনী-তীরে উপনীত হইয়াছি। নদীর ধারে কিছু দূর অশ্বত্থ গাছের সারি। বসন্তের নদী কিছু ক্ষীণকলেবরা, কিন্তু স্বচ্ছসলিলা। বায়ুবেগে অসংখ্য ক্ষুদ্র তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইতেছে, মধুর তরল শীতল শব্দে কূলে আহত হইতেছে। পর পারে প্রকাণ্ড চর, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝাউগাছ জন্মিয়াছে। নদীগর্ভে

মাঝে মাঝে চড়া পড়িয়াছে, বালুকাসৈকতে জলের নিকটে অসংখ্য জলচর পক্ষী বসিয়া রহিয়াছে।

নদীতটে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসী অশ্বত্থ শ্রেণীর পথে চলিল। আমিও তাহার অনুবর্ত্তী হইলাম। কয়েকটা অশ্বত্থ গাছ ছাড়াইয়া দেখিলাম একটা অশ্বত্থ মূলে জলের দিকে মুখ ফিরাইয়া একটী রমণী বসিয়া রহিয়াছে। সন্ন্যাসীকে আসিতে দেখিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া দেখিল।

চকিতের মত একবার তাহার মুখ দেখিলাম। চকিতের মত অশ্বত্থ মূল হইতে উঠিয়া রমণী সন্ন্যাসীর চরণে নিপতিত হইল।

একবার মনে হইল আমার সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা অনুচিত। কিন্তু সে কথা কি তখন মনে স্থান পায়? যেখানে সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়াছিল, তাহার নিকটেই আর একটা অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। আমি তাঁহার আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম।

সন্ন্যাসী কহিল, "চরণ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আসিয়াছি।"

আদেশমত রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহুযুগলে সন্ন্যাসীকে বেষ্টন করিয়া রুদ্ধ কম্পিত স্বরে কহিল, "আমায় আর ছাড়িয়া যাইও না। তোমার জন্য পাগলিনীর মত দেশে দেশে ফিরিয়াছি।"

সন্ন্যাসী রমণীর বাহুপাশ মোচন করিয়া তাহার হাত ধরিয়া পূর্ব্বে যে অশ্বত্থমূলে বসিয়াছিল, সেই স্থলে উপবেশন করাইল। তাহাকে বসাইয়া কহিল, "তোমাকে যাহা বলিতে আসিয়াছি একটু স্থির হইয়া শুন।"

রমণী কহিল, "যাহা বলিবে, শুনিব। তুমি আমাকে আর ছাড়িয়া যাইও না।"

সন্ন্যাসী বলিল, "তুমি আমার স্বভাব অবগত হইয়াও বালিকার মত নিরর্থ কথা বলিতেছ। আমি অস্থিরচিত্ত, আমার পশ্চাতে অবিশ্রাম ভ্রমণ করিয়া কেন কষ্টভোগ করিতেছ? আমি সংসারে ফিরিব না, মায়ায় বদ্ধ হইব না। কেন তুমি আমার এ আনন্দ ভঙ্গ করিবার যত্ন করিতেছ?"

রমণীর চক্ষে অশ্রুধারা বহিল। কহিল, "পুরুষের আত্মসুখই কি সর্ব্বস্ব? আমার জন্য কি একবার ভাবিবে না, আমার দিকে কি একবার ফিরিয়া চাহিবে না?"

স্নিগ্ধ সমস্বরে সন্ন্যাসী কহিল, "যদি আত্মসুখে কেবল অনুরাগ থাকিত, তাহা হইলে তোমাকে লইয়া সুখী হইতাম। কিন্তু এখন অপরকে সান্ত্বনা করিতে পারি, অপরের চক্ষে অশ্রু প্রবাহিত করাইতে পারি। সর্ব্বস্ব না ত্যাগ করিলে কি এ শিক্ষা লাভ করিতে পারিতাম? যৌবনের সমুদয় শক্তি অর্পণ করিয়া এই আনন্দ লাভ করিয়াছি। তোমার রূপে চিত্ত মুগ্ধ হইলে এই একাগ্রতা কোথায় থাকিত? জাননা কি তুমি সুন্দরী?"

সুন্দরী! সেই প্রস্ফুটিত কুসুমকান্তি অশ্রুসিক্ত আলুলিতকেশ তরুণী যদি সুন্দরী না হয়, তাহাহইলে জগতে সুন্দরী কে? এই মনোমোহিনী লাবণ্যপ্রতিমা কোথা হইতে সেই বিজন নদীকূলে আসিল, আমি তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম। সন্ন্যাসী অতিমাত্র অবিচলিত চিত্তে, যেরূপ কেহ পটচিত্রিত সুন্দরীর অবয়ব নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ তরুণীর বিচিত্র বিবশ রূপ নিরীক্ষণ করিতেছিল।

রমণী কহিল, "আমার চেয়ে কি একটা যন্ত্র বড় হইল?" বলিয়া বেগে উঠিয়া সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে সেতার কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিল।

সন্ন্যাসী এক হস্তে সেতার তুলিয়া ধরিয়া আর এক হস্তে রমণীকে নিবারিত করিল। পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদু ও কোমল স্বরে কহিল, "চঞ্চলে! সেতার ভাঙ্গিলে কি আমায় পাইবে?"

তখন রমণীর সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর হস্তের উপর হস্ত রাখিয়া গম্ভীর মুখে কহিল, "তোমার কি মনে নাই আমাদের উভয়ের যন্ত্রণা জ্বালা শীঘ্র ফুরাইবে? দুই দিনের তরে আমাকে এত দুঃখ দাও কেন?"

সন্ন্যাসী ঈষৎ মুখভঙ্গী করিল। কহিল, "ভবিষ্যৎ জানিয়া কেহ কোন কালে ভবিতব্যতা খণ্ডন করিতে পারিয়াছে? যাহা ঘটিবে তাহার জন্য চিন্তা কেন?"

রমণী কিছু বেগের সহিত কহিল, "আমি আর কিছু চাই না, শুধু তোমার নিকটে থাকিতে চাই। তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তুমি করিও, আমায় কেবল সঙ্গে রাখ। কি অপরাধে আমায় ত্যাগ করিলে?"

"অপরাধ তোমার নয়, অপরাধ সংসারের। তুমি সংসারের মায়াময়ী প্রতিমা সেইজন্য তোমায় ত্যাগ করিয়াছি। তুমি সুন্দরী।"

সন্ন্যাসীর স্বর ধীর, মধুর, চিন্তাব্যঞ্জক। পূর্ব্বের মত অবিচলিত, প্রশান্ত দৃষ্টিতে রমণীর উচ্ছলিত রূপরাশি দেখিতে লাগিল।

রমণীর মুখ আরও মলিন হইয়া গেল। সন্ন্যাসীর চরণে লুণ্ঠিত হইয়া কেশ দ্বারা তাহার চরণ যুগল আবৃত করিল। মর্ম্মভেদী, ভগ্ন স্বরে কহিল, "কিছুতে কি তোমার প্রতিজ্ঞা টলিবে না? নিতান্তই কি স্ত্রী হত্যা করিবে?"

সন্ন্যাসী পূর্ব্ববৎ রমণীকে উঠাইয়া বসাইল। কথোপকথনকালে সন্ন্যাসীর স্বরের একবারও বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। ধীর জল প্রবাহের তুল্য মৃদুগম্ভীর স্নিগ্ধ স্বর একবারও বিচলিত হয় নাই। সেই স্বরে কহিল, "এখন আমি বিদায় গ্রহণ করি। তুমি আশ্রমে ফিরিয়া যাও। পুনর্ব্বার আমার শান্তিভঙ্গের প্রয়াস পাইও না।"

রমণী কহিল, "তুমি যেখানেই যাও আমি তোমার সঙ্গে যাইব।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল।

সহসা সন্ন্যাসী একটু পিছনে সরিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাগ্রভাগ দ্বারা রমণীর ভ্রুযুগ-

লের মধ্যস্থ ললাট ঈষৎ স্পর্শ করিল। রমণী ঈষৎ শিহরিল—উঠিতে যাইতেছিল, উঠিতে পারিল না, বসিয়া রহিল। মর্ম্মাহত বিহঙ্গিনীর ন্যায় কাতর স্বরে কহিল, "নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, আমায় ছাড়িয়া যাইও না।"

সন্ন্যাসী কোন কথা কহিল না, দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রমণী অল্পে অল্পে চক্ষু মুদ্রিত করিল, দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অশ্বথ মূলে ঢুলিয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত কাল পরে সন্ন্যাসী মস্তক ঈষৎ নত করিয়া অপেক্ষাকৃত দৃঢ়স্বরে কহিল, "অর্দ্ধ দণ্ডকাল এইরূপ থাক।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার অগ্রসর হইল, পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া পূর্ব্বের মত দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। দৌড়িয়া গিয়া সন্ন্যাসীর হাত ধরিলাম। তখন সে কয়েকটা অশ্বথ গাছ পার হইয়া গিয়াছে।

৫

হস্ত ধারণ করিবামাত্র সন্ন্যাসী বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল। আমি মনে করিয়াছিলাম সন্ন্যাসী হয় অতিশয় কুপিত অথবা বিরক্ত হইবে, কিন্তু সন্ন্যাসী আমাকে দেখিয়া যেরূপ আচরণ করিল তাহাতে অতিমাত্র বিস্মিত হইলাম।

আমাকে দেখিবামাত্র সন্ন্যাসীর প্রসন্ন মুখমণ্ডল যুগপৎ বিস্ময়ে ও ভয়ে মলিন হইয়া গেল। সে আমাকে পূর্ব্বপরিচিতের মত দেখিতে লাগিল। মিত্রভাবে দেখিতেছিল না তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলাম।

সন্ন্যাসী হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল না, কিয়ৎ কাল পরে কহিল, "এখনি? এখনি আসিয়াছ কেন?"

আমাকে উদ্দেশ করিয়া এ কথা কহিল কি না ভাল বুঝিতে পারিলাম না। বিবেচনা করিলাম আপনা আপনি কিছু বলিতেছে। সন্ন্যাসীর স্বর কিঞ্চিৎ ভগ্ন হইয়াছে লক্ষ্য করিলাম।

আমি কহিলাম, "তুমি এমন স্থানে সঙ্গিনীকে একা রাখিয়া চলিয়া যাইতেছ কেন? আর উহার চৈতন্যই বা কিরূপে অপহৃত করিলে?"

সন্ন্যাসী হস্ত দ্বারা ললাট মার্জ্জনা করিয়া পূর্ব্বের মত কহিল "তুমি এখন আসিয়াছ কেন?"

অকস্মাৎ আমার সন্দেহ হইল সন্ন্যাসী কোনরূপ চিত্ত বিকার গ্রস্ত। তাহার মুখের ভঙ্গী, কথার ভাব, বিশেষ তাহার কথা শুনিয়া এই সংশয় আরও দৃঢ় হইল। অপূর্ব্ব যন্ত্রকুশলী তেজস্বী বৈরাগী কি পাগল! কেন আমাকে দেখিয়া সে ভীত হইল, কেন আমাকে দেখিয়া পূর্ব্বপরিচিতের অথবা পূর্ব্বদৃষ্টের মত মনে করিতে লাগিল? ভাবিয়া মনে একটু ভয় হইল। সেই জনশূন্য স্থান, সম্মুখে কলবাহিনী স্রোতস্বিনী,

পার্শ্বে বলিষ্ঠকায় উন্মত্ত পুরুষ। যদি সন্ন্যাসী আমায় শত্রু বিবেচনা করে! হিংস্র বন্য-পশু ও ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ মনুষ্য তুল্য ভয়ঙ্কর।

যতক্ষণ আমি ভাবিতেছিলাম, ততক্ষণ সন্ন্যাসী আমার মুখ দেখিতেছিল। কথা কহিতে আমার একটু বিলম্ব হইল দেখিয়া সন্ন্যাসী আর একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখাবলোকন করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সন্ন্যাসীর মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। অল্প ঈষৎ স্মিতমুখে অতি কোমল স্বরে আমার চক্ষের মধ্যে সূক্ষ্ম জ্বলন্ত অগ্নি-শলাকার ন্যায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "তুমি আমায় বাতুল বিবেচনা করিতেছ?"

হস্তস্থিত লিপির ন্যায় সন্ন্যাসী আমার মনোভাব অবলীলাক্রমে অবগত হইয়াছে দেখিয়া আমি লজ্জায় চক্ষু নত করিলাম। সন্ন্যাসীর অক্ষুণ্ণ, মধুর মুখমণ্ডল অত্যন্ত কোমল ভাব প্রাপ্ত হইল কিন্তু চক্ষের স্থির দৃষ্টি সূচীর ন্যায় আমাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল।

কিঞ্চিৎ চিত্ত সংযমন করিয়া কহিলাম, "আমার মুহূর্ত্ত মাত্র সংশয় জন্মিয়াছিল, অপরাধ লইবেন না, কিন্তু আপনার সহিত আমার কোনকালে চাক্ষুষ সাক্ষাৎ নাই, আমাকে পরিচিতের মত সম্বোধন করিতেছেন কেন?"

সন্ন্যাসীর চক্ষু হইতে সেই সমুজ্জ্বল তীব্র দৃষ্টি লুপ্ত হইয়াছিল; প্রশান্ত, স্থির কটাক্ষে আমার প্রতি চাহিয়াছিল। আমার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসীর ভ্রূযুগল ও ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। একবার দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া যেন শূন্য আকাশ হইতে কিছু অপসারিত করিল। তৎপরে ললাট পুনর্মুক্ত হইল—কহিল, "চাক্ষুষ সাক্ষাৎ নাই? তাহা আমি জানি। তুমি ইতিপূর্ব্বে আমায় কখন দেখ নাই। দেখিলে হয়ত এখন আবার দেখিতে পাইতে না। আমি তোমাকে এখন যেমন দেখিতেছি, এমন হয়ত দেখি নাই। কিন্তু দেখা কত রকম, পরিচয় কত রকম তুমি কি তাহা জান? তুমি হয়ত আমাকে কখন দেখ নাই কিন্তু আমি হয়ত মুকুরে তোমার প্রতিবিম্ব দেখিয়াছি। সেই জন্য আবার সাক্ষাৎ হইলে তোমায় চিনিতে পারি। অবয়ব না দেখিয়া হয়ত কাহারও ছায়ামাত্র দেখিয়াছি। ছায়া পূর্ব্বগামিনী। যে অবয়বের সেই ছায়া, সেই অবয়বও তদনন্তর দেখিতে পাইলে চিনিতে পারিব।"

সন্ন্যাসীর ললাট আর একবার কুঞ্চিত হইল। আর এক পদ অগ্রসর হইয়া একেবারে আমার নিকটে আসিয়া কিছু বেগের সহিত কহিতে লাগিল, "বাজপক্ষীকে না দেখিয়াও পারাবৎগণ কখন কখন বাজপক্ষীর সান্নিধ্য অবগত হয়, শুনিয়াছ? গৃহে সর্প থাকিলে কুক্কুর তাহাকে না দেখিয়াও ভীত হয় কেন, চীৎকার করে কেন? তাহাদিগের কি পূর্ব্বপরিচয় থাকে?"

অবাক্ হইয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কথার মর্ম্ম ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আবার পূর্ব্ব সংশয় মনে উদিত হইতে লাগিল। কি করিব, কি বলিব স্থির করিবার পূর্ব্বেই দেখিলাম সন্ন্যাসীর আবার ভাবান্তর উপস্থিত। আমার প্রতি কঠোর

কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, হস্ত দ্বারা যে পথে আমি সন্ন্যাসীর অনুগমন করিয়াছিলাম সেই পথ নির্দ্দেশ করিয়া, রূঢ়স্বরে কহিল, "যাও!"

কেন যাইব? এই কথাই প্রথমে আমার মনে আসিল, মুখেও আসিতেছিল কিন্তু সামলাইয়া লইলাম। একজন বৈরাগীর সহিত বচসায় কোন পৌরুষ নাই, তাহাতে সন্ন্যাসীর কথা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছিল। মানুষটা যে সহজ প্রকৃতির নয় তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম, কিন্তু কত দূর অপ্রকৃতিস্থ তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। যখন তাহাকে পাগল মনে হইতেছিল, তখন মনে একটু আশঙ্কা হইতেছিল। কিন্তু একেবারে তাহাকে পাগল স্থির করিতে পারি নাই। যখন কর্কশ স্বরে আমাকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিল, তখন সহজেই আমার একটু রাগ হইল। এতটা পথ আসিয়া সন্ন্যাসীর কথায় ফিরিয়া যাইব কেন?

সন্ন্যাসী আর একবার কহিল, "যে পথে আসিয়াছ সেই পথে ফিরিয়া যাও।"

আমি কহিলাম, "ফিরিয়া যাওয়া না যাওয়া আমার ইচ্ছা। যদি আমি থাকিলে তোমার বিরক্তি বোধ হয় তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে এ স্থান পরিত্যাগ করিতে পার।" যে একটু বড় রাজকর্ম্ম করে তাহার আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, পদাভিমান যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। আমার সে অভিমান অধিক না থাকুক, কিছু নাই এমন কথা আত্মমুখেও বলিতে পারি না। বিভূতি ভস্ম মাখা একটা অর্দ্ধ উলঙ্গ বৈরাগী আমাকে প্রভুর মত আদেশ করিতেছে দেখিয়া কাজেই আমার একটু রাগ হইল।

আমার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী আমার হাত ধরিল। যেরূপ দৃঢ় মুষ্টিতে সে আমার হস্ত ধারণ করিল, তাহাতে অনেক টানাটানি না করিলে হাত ছাড়াইতে পারিতাম না। টানাটানি করিয়াও ছাড়াইতে পারিতাম কি না তাহাতে সন্দেহ। সন্ন্যাসীর মুষ্টির মধ্যে আমার হস্ত ব্যথিত হইতে লাগিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমি বল-প্রকাশের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলাম। দেখিলাম সন্ন্যাসীর মুখ অন্ধকার, ভ্রূযুগল ফুলিয়া কুঞ্চিত হইয়া মিলিত হইয়াছে। প্রজ্জ্বলিত সূচীর ন্যায় তীক্ষ্ণ তীব্র জ্বালাময় কটাক্ষ যেন আমার মুখমণ্ডল বিদ্ধ করিতেছে। উন্মত্তের দৃষ্টি বিবেচনা করিয়া আমি কিঞ্চিৎ ভীত হইলাম। দেখিলাম তাহার অধরোষ্ঠ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

অতি মৃদু ও ঈষৎ কম্পিত স্বরে সন্ন্যাসী কহিল—তাহার নিশ্বাস আমার গণ্ডস্থলে স্পৃষ্ট হইতে লাগিল—"দেখ, এ স্থানে তৃতীয় ব্যক্তি কেহ নাই। তোমার অপেক্ষা আমি বলবান তাহাও দেখিতে পাইতেছ। যদি আমি এই স্থানে তোমায় হত্যা করিয়া তোমার মৃত দেহ এই নদী জলে নিক্ষেপ করিয়া যাই, তাহা হইলে লোকে কি কখন কিছু জানিতে পারিবে?"

সন্ন্যাসী যাহা বলিল সেই কথাই আমার মনে হইতেছিল। যখন সে স্পষ্টাক্ষরে সেই কথা কহিল, তখন আমার শরীর আপাদমস্তক কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু ভীত হইয়া আমি বুদ্ধি-শূন্য হইলাম না। হাত ছাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া কহিলাম, "তৃতীয় ব্যক্তি নাই কেমন করিয়া বলিতেছ? এই যে নিকটেই একজন স্ত্রীলোক রহিয়াছে।"

সন্ন্যাসী হাসিল। সে হাসি হয় অতি মধুর, না হয় বড় ভয়ানক, অথবা উভয়ের মিশ্রণ। তেমন হাসি আর কখন আমি শুনি নাই; সেই জন্য ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিতেছি না। হাসিয়া সন্ন্যাসী কহিল, "তোমাকে ত বুদ্ধিমান দেখিতেছি। তোমার কি বিবেচনা হয় যে এই রমণী কাহারও সাক্ষাতে স্বীকার করিবে যে আমি তোমাকে হত্যা করিয়াছি?"

আমি নিরুত্তর হইলাম।

সন্ন্যাসী কহিল, "এখন যাইবে?"

কি করিব? সেই বিজন প্রদেশ, সঙ্গী নাই, সহায় নাই, উন্মত্ত কুপিত সন্ন্যাসীর হাতে আমি একা। বলে তাহাকে আঁটিতে পারিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সন্ন্যাসী যাহা বলিতেছে তাহা যথার্থ একে নিতান্ত অসঙ্গতও নয়—কারণ আমি যেরূপ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সন্ন্যাসীর অনুবর্ত্তী হইয়াছিলাম, তাহাতে তাহার বিরক্তি হওয়া বিচিত্র নয়। এইরূপ ভাবিয়া এবং চক্ষের সম্মুখে সন্ন্যাসীর উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া আমি রণে ভঙ্গ দেওয়াই শ্রেয় বিবেচনা করিলাম। সন্ন্যাসীকে কহিলাম, "আমার হাত ছাড়িয়া দাও, আমি ফিরিয়া যাই।"

সন্ন্যাসী আমার হাত ছাড়িয়া দিল। কোমল স্বরে কহিল "তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ফিরিয়া যাও, তোমার কোন অনিষ্ট করিবার আমার ইচ্ছা নাই।"

আমি যে পথে আসিয়াছিলাম, সেই পথে ফিরিয়া চলিলাম। সন্ন্যাসী কিয়ৎকাল আমার পশ্চাতে চাহিয়া রহিল, একবার জলের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর পূর্ব্বের মত নিজের গন্তব্য পথে চলিয়া গেল।

৬

সন্ন্যাসী চলিয়া গেল, ফিরিয়া চাহিল না। আমি কলের মত ফিরিয়া চলিলাম। চিত্ত স্থির করিয়া ভাবিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছু ভাবিতে পারিলাম না। সহসা স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় অর্দ্ধ জাগ্রত অর্দ্ধ অচৈতন্যাবস্থায় গমন করিতে লাগিলাম। ফিরিয়া আসিতে যে অশ্বত্থ মূলে রমণী নিদ্রিতা ছিল, সেই খানে আসিলাম। তাহাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। সমুদয় বুদ্ধি ও চিন্তাবৃত্তি একেবারে ফিরিয়া আসিল।

রমণীকে একবার দেখিয়াই যে পথে সন্ন্যাসী যাইতেছিল সেই পথে চাহিয়া দেখিলাম। কোথায় সন্ন্যাসী? দীর্ঘ, ক্ষিপ্র পদক্ষেপে সন্ন্যাসী কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, কে জানে? যত দূর দৃষ্টি যায় কেবল বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের সারি, তাহার

নীচে দিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া নদী বহিয়া যাইতেছে। জলের ক্ষুদ্র তরঙ্গের উপর, শ্যামল তরু পল্লবের উপর সূর্য্যের প্রভাত কিরণ খেলা করিতেছে।

এই সব দেখিয়া দৃষ্টি আবার ফিরিয়া আসিল। বৃক্ষমূলে সেই নিদ্রিত রমণীমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। সেই জাগ্রত জড়জগত পটে নিদ্রিত চৈতন্য জগতের কি মনোমোহিনী প্রতিকৃতি!

যুবতী ঘোর নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে। একটা স্থূল শিকড়ের উপর মাথা-রহিয়াছে, মাথার নীচে কোন অবলম্বন নাই। দুটী হাত পাশে পড়িয়া আছে। চক্ষু, গণ্ড, স্কন্ধ, ঢাকিয়া কেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ওষ্ঠাধর ঈষৎ মুক্ত, নিশ্বাস একটু কষ্টে বহিতেছে, কেশের তলে হৃদয়ের ঈষৎ চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে।

সেইরূপ স্থানে ঐরূপ অসহায় মোহাবিষ্ট রমণীকে একা রাখিয়া যাওয়া উচিত নয় বিবেচনা করিয়া দাঁড়াইলাম। সত্য কথা, তখন ইচ্ছা করিলেও চলিয়া আসিতে পারিতাম না।

কিন্তু কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিব? রমণীর নিদ্রাই বা ভঙ্গ করি কি উপায়ে? অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারি না, কোনরূপ শব্দ করাও অসঙ্গত বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং দাঁড়াইয়া সেই নিদ্রিত রূপরাশি দেখিতে লাগিলাম।

কতক্ষণ এইরূপ দাঁড়াইয়া রহিলাম বলিতে পারি না। মনে করিতে গেলে বোধ হয় যেন দাঁড়াইয়া দেখিবামাত্রই রমণীর নিদ্রা ভঙ্গের সূত্রপাত হইল। দুই এক বার হাত নড়িল, শেষে রমণী হস্ত দ্বারা মুখ হইতে কেশগুচ্ছ অপসারিত করিল! ক্রমে অল্পে অল্পে চক্ষু উন্মীলন করিল।

আমি নিস্পন্দের ন্যায় দাঁড়াইয়াই রহিলাম।

চক্ষু মেলিয়া যুবতী আমায় দেখিতে পাইল। দেখিয়া, শিহরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। আবার হস্ত দ্বারা চক্ষু মার্জ্জিত করিয়া চাহিয়া দেখিল। এবার আর চক্ষু মুদ্রিত করিল না। নিদ্রায় চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়াছিল। স্তিমিত চক্ষু ক্রমে প্রসারিত হইতে লাগিল। বিস্মিত, চকিত, ত্রস্ত দৃষ্টি। সম্মুখে ব্যাঘ্র দেখিলে মৃগী যেমন ভয়চকিত লোচনে অবলোকন করে, রমণী আমায় সেইরূপ দেখিতে লাগিল।

আমি প্রোথিত পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। এক একবার স্মরণ হইতে লাগিল যে সন্ন্যাসীও আমায় দেখিয়া অনেকটা এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিল।

ধীরে ধীরে রমণী উঠিয়া বসিল। বসিয়া পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবৃত করিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। চক্ষের দৃষ্টি একবারও অন্যদিকে যায় নাই। মোহাকৃষ্ট পক্ষী যেমন অজাগরকে নিরীক্ষণ করে, আমায় সেইরূপ দেখিতে লাগিল। অবশেষে উঠিয়া দাঁড়াইল। অতি ধীরে, অতি কষ্টে চক্ষু ফিরাইয়া অতি মৃদু পদক্ষেপে গমন করিতে উদ্যোগ করিল। কোন দিকে যাইবে, কোথায় যাইবে

তাহার নির্দ্দেশ নাই। কেবল আমা হইতে দূরে যাইবার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলাম।

যখন রমণী চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন আমারও মোহ ভঙ্গ হইল। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া কহিলাম, "তুমি একা কোথায় যাইতেছ? এখানে কাহাকেও চেন?"

আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, আমি তাহার অনুগামী হইতেছি দেখিয়া রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইল—ভয়ে বাতুলের মত হইয়া উঠিল। বাতুলের মত কহিল, "তুমি এদিকে আর এক পদ অগ্রসর হইলেই আমি ডুবিয়া মরিব। ফিরিয়া যাও. ফিরিয়া যাও!" বলিয়া রমণী দ্রুতবেগে জলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আমি ভীত হইয়া পিছাইয়া পড়িলাম। না পিছাইলে নারীহত্যা হয়। স্ত্রীলোকটীকে উন্মাদিনী বোধ হইতে লাগিল।

আমাকে পিছাইতে দেখিয়া যুবতী কিছু বেগের সহিত কহিল, "এখন আর অধিক বিলম্ব নাই, তুমি পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ। এখন ফিরিয়া গৃহে যাও, নহিলে দাঁড়াইয়া স্ত্রী হত্যা দেখ।" রমণী আরও জলের নিকটে যাইতে লাগিল।

আমি দেখিলাম সে মিথ্যা ভয় দেখাইতেছে না, আমি দাঁড়াইয়া থাকিলে সত্যই ডুবিয়া মরিবে। আমি ফিরিতে উদ্যত হইলাম। গমনকালে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলাম, "সন্ন্যাসী ঐ পথে গিয়াছে।"

রমণী দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। আমি কিছু দূর গমন করিলে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে অন্যদিকে পলায়ন করিল।

দ্বিতীয় বার।

১

গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসী ও রমণীর অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলাম। মনে জানিতাম তাহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে না, তবু মন বুঝিল না। চারিদিকে লোক ছুটিল। অনেক অনুসন্ধানের পর তাহারা ফিরিয়া আসিল। যাহাদিগের সন্ধানে তাহারা গিয়াছিল, তাহাদিগের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। আমাকেও কর্ম্মের অনুরোধে অন্যত্র যাইতে হইল।

অনেক দিন গেল। কত ঘুরিলাম, কত নূতন দেশ দেখিলাম। কর্ম্মকাজে সর্ব্বদাই ব্যস্ত, বসিয়া দুই দণ্ড ভাবিবার বড় একটা সময় হইত না। তথাপি থাকিয়া থাকিয়া সেই দুই মূর্ত্তি মনে পড়িত। একটু নির্জ্জনে থাকিলে সন্ন্যাসীর সেতারের শব্দ যেন আবার কানে লাগিত, জলস্রোতের তর তর স্বর যেন সেই সঙ্গে মিশিয়া দূর হইতে বহিয়া আসিত, অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে প্রভাত কিরণে আবার যেন সেই নিদ্রাবিহ্বল রমণীমূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম। শুধু খেয়ালের মত দেখিতাম না। খেয়াল দেখি-

বার আমার বড় অবসর ছিল না। কিন্তু সেই প্রভাতের কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিলাম না। সত্য কথা বলিতে গেলে ভুলিবার বড় একটা চেষ্টাও করি নাই। তাহারা কে? কোথা হইতে আসিল, কোথায় গেল? আমাকে দেখিয়া দুইজনে এমন অদ্ভুত আচরণ করিল কেন? এই সব কথা কেবল ভাবিতাম। ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিতাম না, আবার ভাবিতাম। কখন মনে করিতাম দুই জনই অপ্রকৃতিস্থ, পাগলের মত যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতেছে, আবার ভাবিতাম তাহাদিগকে কি পুনরায় দেখিতে পাইব। এমনি করিয়া আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। কতক কতক ঘটনা বিস্মৃত হইতে লাগিলাম।

২

প্রায় দুই বৎসর পরে আমি কর্ম্মযোগে আর এক স্থানে যাই। শীত প্রায় যায় যায়। যে স্থানে যাই সেখানে চারিদিকে পাহাড়। পর্ব্বতের উপর গাছপালা বিস্তর। পাহাড়ের উপর কিছু দূরে ব্যাঘ্রেরও ভয় আছে। নীচে বিশেষ কোন ভয় নাই। পাহাড় হইতে প্রায় আধ ক্রোশ দূরে আমাদের বাসা।

পূর্ব্বে যেমন বেড়াইবার অভ্যাস ছিল, এখনও সেইরূপ বেড়াইতে যাইতাম। সুবিধা হইলে দুই বেলাই বেড়াইতাম; নহিলে এক বেলা খানিক ঘুরিয়া আসিতাম। এ স্থানে দিন দুই তিন থাকিবার কথা। সেখান হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্ব দিবস বৈকাল বেলা ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। তখন বেশ বেলা আছে। অন্ধকার হইবার পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা। একা ভ্রমণ করাই অভ্যাস, এখনও একা চলিলাম।

পাহাড় দেখিতে অত্যন্ত নিকটে হইলেও পথ যেন কেবল বাড়িয়া যায়। এরূপ ভ্রম সর্ব্বদাই হয়। কেবল যাহারা পাহাড়ের উপর কিম্বা পাহাড়ের নিকট সর্ব্বদা বাস করে—তাহাদের হয় না। আমি সম্মুখে পাহাড় লক্ষ্য করিয়া কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ের নীচে পঁহুছিলাম। সেখানে একটু দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম।

বর্ষার পর পর্ব্বতের যেমন শোভা এমন বোধ হয় আর কোন সময় হয় না। এখন সে শোভা ছিল না, কিন্তু শোভার অভাবও ছিল না। চারিদিকে নানা রকম গাছপালা। সম্মুখে নানা জাতীয় গুল্ম, তাহাতে ছোট ছোট ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। পর্ব্বতের উপর বৃক্ষগুলি দেখিতে প্রায় সমুদায়ই ছোট, কিন্তু ডাল পাতার সামঞ্জস্য বড় সুন্দর। পাহাড়ের রং কোথাও কালো, কোথাও ঈষৎ ধূসর বর্ণ। কোন দিকে স্তরের উপর স্তর প্রস্তর সজ্জিত রহিয়াছে; যেন কোন বিশ্বকর্ম্মা সে গুলাকে কাটিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। সে দিকে গাছ পালা বড় নাই, কেবল মাঝে মাঝে স্তরবিচ্ছেদের মধ্য হইতে এক একটা গাছ ফুঁড়িয়া উঠিয়াছে। কোনটা বা সোজা উঠিয়াছে, কোনটা বা পাশের দিকে বাহির হইয়াছে, হয়ত কোনটার মাথা নীচের দিকে। নিকটেই এক দিকে কাছাকাছি দুইটি গাছ, একটা প্রকাণ্ড লতা তাহাদিগকে জড়াইয়াছে, মালার

মত মাঝখানে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দূরে এক একটা শিখর অত্যন্ত উচ্চ, তাহার চারিদিকে মেঘ নামিয়াছে। আর পশ্চাতে একটা পর্ব্বতের উপর হইতে অপরাহ্ণ সূর্য্যের কিরণ চারিদিকে পড়িয়াছে।

পশ্চিম দিকে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, পূর্ব্ব দিকে একটু মেঘ করিয়াছে। মেঘের উপর প্রতিহত সূর্য্য কিরণে একটা ইন্দ্র ধনু উঠিয়াছে। অতি নির্জ্জন নীরব স্থান; নিস্তব্ধের মধ্য হইতে তরুলতা সমাকীর্ণ পর্ব্বত-শ্রেণী উঠিয়াছে। দূরে কোথাও একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী, জলপতন শব্দ নিকটে না যাইলে শুনিতে পাওয়া যায় না।

একবার মনে হইল পাহাড়ে উঠি, কিন্তু পাহাড়ে উঠিতে সকলে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল, সেই বিবেচনায় ক্ষান্ত হইলাম। পাহাড়ের নীচে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

এইরূপ খানিক ঘুরিয়া দেখিলাম একটা অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্ব্বতশ্রেণী আর এক দিকে বাহির হইয়া গিয়াছে। সে দিকে ফিরিতে এক খণ্ড প্রকাণ্ড তীক্ষ্ণাগ্র প্রস্তর বেড়িয়া যাইতে হয়। আমি আর একটু দূরে যাইবার ইচ্ছায় ঘুরিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম। ফিরিয়া—

আর অগ্রসর হইবার ক্ষমতা রহিল না। সেই তীক্ষ্ণাগ্র প্রস্তর খণ্ডের পাশে দাঁড়াইয়া প্রস্তরের মত নিস্পন্দ হইয়া রহিলাম। শরীরে রোমাঞ্চ হইল, নিশ্বাস রুদ্ধ হইল।

সম্মুখে তৃণ মণ্ডিত দিব্য পরিষ্কার সমভূমি। সায়ংকালীন অর্দ্ধাবৃত মৃদু সূর্য্যকিরণে তৃণাস্তরণ অত্যন্ত কোমল দেখাইতেছে। আমি যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহার পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষীণ নির্ঝরিণী বহিয়া যাইতেছিল।

সেই তৃণাবৃত জনশূন্য স্থানে শিলাখণ্ডের সম্মুখে দাঁড়াইয়া—সেই সন্ন্যাসী ও সেই রমণী!

তাহাদিগকে দেখিয়াই আমি নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইলাম। দুই জনের মধ্যে এক জনেরও মুখ দেখিতে পাই নাই, কিন্তু ইহারা যে সেই দুই ব্যক্তি তাহাতে আমার কোন সন্দেহ রহিল না।

কত বার কত দিন এইরূপ মনে হইত যে তাহাদিগের সহিত কোন দিন এইরূপ আবার দেখা হইবে। মনে হইত, হয়ত এক জনকে কি দুই জনকে আবার দেখিতে পাইব। কিন্তু যখন দুই জনকে বাস্তবিক একত্রে দেখিলাম তখন প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস হইল না, মনে হইল স্বপ্ন দেখিতেছি।

এরূপ আবার দেখা হওয়াতে বিস্ময়ের কোন কথা ছিল না। পূর্ব্বেও তাহাদিগকে লোকালয় হইতে দূরে দেখিয়াছিলাম। আমাকে দায়ে পড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, ইহারা স্বেচ্ছামত অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করে। তবে যে আবার এত দিন পরে এমন স্থানে আবার দেখা হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

তখন আমার বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না। কয়েক মুহূর্ত্ত একেবারে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

৩

সন্ন্যাসী আমার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। রমণী একটু দূরে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া ছিল। তাহারও মুখ আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না। আলু-লায়িত ঘনকুঞ্চিত কেশরাশি দেখিতে পাইলাম।

সন্ন্যাসী বোধ হয় বসিয়া ছিল, এই মাত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেতার হাতে রহি-য়াছে, সেতারের খোল ও উত্তরীয় বস্ত্র পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে।

আমি একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম রমণীর মুখে পূর্ব্বের অপেক্ষাও অধিক ব্যাকুলতা—সন্ন্যাসীর দিকে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ওষ্ঠাধর ঈষৎ মুক্ত, নাসিকা একটু বিস্ফারিত, হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল; যেন বেগে আসিতেছিল, হঠাৎ দাঁড়াইয়াছে। আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই, একদৃষ্টে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

আর একবার এইরূপ দেখিয়াছিলাম। তখন দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারি নাই, এখনও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ইহারা কে? কেনই বা রমণীর এরূপ অনুরাগ, এরূপ আকুলতা, সন্ন্যাসীই বা এমন বিরক্ত বৈরাগী কেন?

আর একবার যেমন দেখিয়াছিলাম, আবার তাহাই মনে হইল। সেই প্রভাত প্রবা-হিনী, প্রভাতের নবীন সূর্য্যালোক, আলোক ও ছায়ার আন্দোলন, এবং সেই সুন্দরী ও সেই সন্ন্যাসী, সেই মৃদু মৃদু কল কল ছল ছল শব্দ, অশ্বথ কিশলয়ে প্রভাত সমীরণের অলস ক্রীড়া মনে পড়িল। আবার আজ কোথায় দেখিলাম! সন্ধ্যার আকাশ তলে, জনশূন্য ভয়ময় স্থান; চতুর্দ্দিকে ভ্রূকুটিভীষণ পর্ব্বতশ্রেণী, মস্তকের উপর অন্ধকার। অধিত্যকা হইতে অন্ধকার নামিয়া উপত্যকায় যাইতেছে। সেই ভীষণ স্থানে আবার সেই দুই মূর্ত্তি! প্রভাতে একবার দেখিয়াছিলাম, প্রদোষে আবার দেখিলাম।

৪

সন্ন্যাসী সেতার হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। যুবতী ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আসিতে লাগিল। মুখে ঈষৎ আশঙ্কার ভাব। নিকটে আসিয়া কহিল, "আবার কি আমায় ছাড়িয়া পলাইবে?"

ইতিপূর্ব্বে তাহাদের কোন কথোপকথন হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। ভাবে বোধ হইল এই প্রথম কথা।

সন্ন্যাসী সেই স্নিগ্ধ মধুর স্বরে কহিল,—সে স্বর আমার কানে বরাবর লাগিয়াছিল,—"না এবার তোমায় ছাড়িয়া যাইব না। তুমিই জিতিলে।"

রমণী আসিয়া সন্ন্যাসীর হাতে ধরিল। বাম হস্তে সন্ন্যাসী সেতার ধরিয়াছিল, রমণী

তাহার মুক্ত দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল। অতি কোমল অনুরাগকম্পিত স্বরে কহিল, "এতদিন নিত্য মনে করিতাম আমার মত দুঃখিনী আর নাই। দুঃখের নিশি যেন পোহাইত না, দুঃখের দিন যেন কাটিত না। এখন আর সে দুঃখ কিছুতেই মনে পড়িতেছে না। এইরূপ এক মুহূর্ত্তের জন্য, যদি আর একবার তুমি আমায় এইরূপ কাছে আসিতে দাও, ঘৃণা করিয়া সরিয়া না যাও, তাহা হইলে আবার এই এত দিনের কষ্ট স্বচ্ছন্দে ভোগ করিতে পারি। আর একবার বল, আমাকে আবার বিদায় করিয়া দিবে না। আমার চৈতন্য হরণ করিয়া পলাইবে না।" বলিয়া রমণী শিহরিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে আপনার হাত ছাড়াইয়া লইয়াছিল। সেই হস্ত অত্যন্ত স্নেহভরে রমণীর মস্তকে রাখিয়া, ঘন কুঞ্চিত কেশের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "আর তোমাকে কেমন করিয়া ছাড়িয়া যাইব? আমার অপেক্ষা তোমার একাগ্রতা অধিক, সুতরাং তোমারই জয় হইল। আমি অনন্যচিত্ত হইয়া সাধন করিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু পারিতাম কই? কেবল আশঙ্কা হইত তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কেবল ভাবিতাম কিসে তোমায় বিস্মৃত হইব। তাই এ অস্থিরতা, ক্ষিপ্তের মত দেশে দেশে বনে বনে ফিরিয়াছি, লোকালয় দেখিলে দূরে পলায়ন করিয়াছি, কিন্তু তোমাকে বিস্মৃত হইতে পারি নাই, তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার আশঙ্কা দূর করিতে পারি নাই। আর তুমি অন্য চিন্তাকে মনে স্থান দাও নাই। ছায়ার মত, মায়ার মত আমার সঙ্গে ফিরিয়াছ। এরূপ একাগ্রতা কি কখন বিফল হয়? এইরূপ একাগ্রতায় কোন অভিলাষ না সিদ্ধ হয়? তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। আমার পরাজয় হইল।"

ক্ষণমাত্র সন্ন্যাসী নীরব হইল, রমণী আগ্রহ দৃষ্টে তাহার মুখাবলোকন করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী পূর্ব্ববৎ মধুর স্বরে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বিষন্ন ভাবে পুনরায় কহিতে লাগিল, "এখন আর তোমার চৈতন্য হরণ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তাহা হইলে হয়ত আজও তুমি এত নিকটে আসিতে না। আজ যখন তোমায় দেখিয়াছি, তখনি বুঝিয়াছি যে আমার সে ক্ষমতা গিয়াছে, যখন তুমি আমার নিকটে আসিয়াছ তখন আর কোন সন্দেহ নাই। বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করিয়া দেখ।"

রমণী ভয়ে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "না, না, তুমি পরীক্ষার ছলে আমাকে নিদ্রামগ্ন করাইয়া আবার চলিয়া যাইবে।"

সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে কহিল, "চঞ্চলে! আমি তোমার অনুরাগের কখন প্রতিদান করি নাই সত্য, তোমার দুঃখ মোচনের কোন চেষ্টা করি নাই, কিন্তু আমি কি কখন তোমার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছি; কখন কি তোমায় প্রতারণা করিয়াছি। যদি তোমার চৈতন্য যথার্থই হরণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ছলের প্রয়োজন কি, বলে কি পারিতাম না? পূর্ব্বে কি কখন ছলনা করিয়াছি?"

রমণী মস্তক অবনত করিয়া তিরস্কৃতের মত কহিল, “না।”

সন্ন্যাসী যুবতীর চিবুক ধরিয়া তাহার মুখ তুলিল। অনেকক্ষণ স্থির অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে রমণীকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। রমণীর কোনরূপ বিকার উপস্থিত হইল না। অবশেষে সন্ন্যাসী চক্ষু নত করিল, কহিল, “তোমারই জয়। আমি একেবারে বলশূন্য হইয়া পড়িয়াছি।”

সম্মুখস্থিত শিলাখণ্ডের উপর সন্ন্যাসী উপবেশন করিল। রমণী তাহার পাশে বসিল। বসিয়া সন্ন্যাসীর হাতের সেতার লইয়া আপনার হাতে ধরিল। ঈষৎ মধুর হাসিয়া কহিল, “মনে আছে, একদিন তোমার সেতার ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিলাম?”

সন্ন্যাসী একবার সেতারের দিকে চাহিল, একবার রমণীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, “এখন ভাঙ্গিবে?”

যুবতী কহিল, “না আর ভাঙ্গিবার আবশ্যক কি? এখন আর ইহার সহিত আমার কোন বিবাদ নাই। তোমার যখন ইচ্ছা হয় বাজাইও। বাজনার জন্য আর ত আমার ত্যাগ করিবে না?”

সন্ন্যাসী কহিল, “আর আমি বাজাইব না। আর কখন তেমন বাজাইতে পারিব না। যে বল তুমি হরণ করিয়াছ সেই বলে বাজাইতাম। এখন আর কিসে বাজাইব?”

রমণী কিছুক্ষণ কোন কথা কহিল না, কেবল সন্ন্যাসীর মুখ দেখিতে লাগিল। অবশেষে তাহার চক্ষে জল পূরিয়া আসিল। সন্ন্যাসীর স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিয়া কহিল, “আমি আসাতে কি তুমি দুঃখিত হইয়াছ? তুমি আমায় দেখিলে বিরক্ত হইতে, ক্রোধ প্রকাশ করিতে, সে বরং সহিতে পারিতাম। কিন্তু তোমার দুঃখ সহিতে পারি না। বল যদি তাহা হইলে তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাই, আর কখন তোমার সম্মুখে আসিব না।” যুবতীর কণ্ঠ রোধ হইল, এক হাত দিয়া হৃদয় চাপিয়া ধরিল।

দেখিলাম অকস্মাৎ রমণীর মুখের ভাবান্তর হইয়াছে। এতক্ষণ মানসিক কষ্টের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছিল, এখন শারীরিক যন্ত্রণার লক্ষণ মুখে স্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, নিশ্বাস প্রশ্বাসে যেন অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। সন্ন্যাসীর স্কন্ধ হইতে মস্তক ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতে লাগিল। সন্ন্যাসী ফিরিয়া চাহিল। ফিরিয়া বাহু দ্বারা যুবতীকে ধারণ করিল। স্বীয় জানুদেশে তাহার মাথা রাখিয়া তাহাকে শয়ন করাইল। উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কোথাও আঘাত লাগিয়াছে?”

কিয়ৎকাল রমণী নীরবে রহিল। তাহার পর হস্ত দ্বারা হৃদয়ের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া অতি মৃদু ও ক্লিষ্ট স্বরে কহিল, “আঘাত লাগিয়াছে অনেক দিন, কিন্তু এখন আমি মনে করিতেছিলাম যে এ আঘাত আরোগ্য হইয়া যাইবে। মনে যাহা করা যায় তাহা হয় না।” বলিয়া একটু হাসিল। সে ক্ষীণ হাসি তখনি আবার বিলীন হইয়া গেল।

সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া রমণীকে দেখিল। তাহার পর কহিল, "আমার দোষেই তোমার এ ব্যাধি হইয়াছে। যদি কখন কিছু হয় ত সে পাপ আমার হইবে।"

রমণী আবার বড় মধুর হাসিল। কহিল, "ভবিতব্যতা ভুলিতেছ? জীবন কি? মুহূর্ত্ত মাত্র সুখ লক্ষ জীবনের তুল্য। একবার তুমি আমার দিকে চাও। একবার বল আমায় ভাল বাস।"

রমণীর বাহু সন্ন্যাসীর স্কন্ধে ছিল। দেখিলাম সন্ন্যাসীর মুখ ধীরে ধীরে রমণীর মুখের উপর নমিয়া পড়িল। তখন অস্পষ্ট দুই চারিটি কি কথা হইল শুনিতে পাইলাম না।

৫

তীক্ষ্ণাগ্র শিলাখণ্ডের পার্শ্বে শিলাখণ্ডের মত দণ্ডায়মান হইয়া আমি দেখিতেছিলাম। একটী একটী কথা সেই অপরাহ্ণের নিস্তব্ধের মধ্যে শুনিতেছিলাম, একটী একটী অঙ্গভঙ্গী দেখিতেছিলাম। তাহারা দুইজনে জানিত না যে সেই স্থলে তৃতীয় ব্যক্তি আছে। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির থাকিবার কিছুমাত্র প্রয়োজনও ছিল না।

স্বভাবতঃ আমি সাধারণের অপেক্ষা অধিক কৌতূহলপরবশ নহি। একজন যুবাপুরুষ ও একটী যুবতী—হয়ত দম্পতী—নির্জ্জনে কথোপকথন করিলে অন্তরাল হইতে তাহাদের কথা শ্রবণ করা অভ্যাস নাই। অন্তরাল হইতে কোন কথা শ্রবণ করাই আমার মত গম্ভীর প্রকৃতি লোকের স্বভাববিরুদ্ধ। অথচ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিলাম, সমস্ত শুনিলাম, কার্য্যটা যে গর্হিত হইতেছে তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।

অনেকবার এই কথা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, তথাপি মনে তেমন আত্মতিরস্কারের ভাব হয় নাই। যাহা সাধারণ তাহাই সাধারণ নিয়মের অধীন। এই সন্ন্যাসী ও এই যুবতীকে দুইবার দেখিলাম বটে, দুইবার তাহাদের কথাও শুনিলাম কিন্তু বুঝিতে ত কিছুই পারিলাম না। ইহাদের পরস্পরে কি সম্বন্ধ তাহাও জানিতে পারিলাম না, অনেক কথা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। সেই সন্ধ্যার সময় ইহাদিগকে দেখিয়া আর কিছু না জানিয়া কি সহজে ফিরিতে পারিতাম?

কিন্তু যখন দেখিলাম যে সন্ন্যাসীর কেশ রমণীর কেশের সহিত মিশ্রিত হইল, তখন আমার মনে একটু সঙ্কোচ হইল, বোধ হইল যে আর সে স্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে। এই বিবেচনা করিয়া, শিলাখণ্ডের অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া আমি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম।

সে স্থানে পর্ব্বত সূক্ষ্মাগ্র পূর্ব্বেই বলিয়াছি। চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। আমি পর্ব্বতে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। সরিবামাত্র একখণ্ড শিলা স্থানচ্যুত হইয়া গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িয়া গেল।

সেইরূপ শিলা পতন শব্দ অন্যত্র হইলে হয়ত শোনা যাইত না, কিন্তু সেই একান্ত নির্জ্জনের মধ্যে সেই সন্ধ্যাকালে সে শব্দ সহসা চারিদিকে স্পষ্ট শ্রুত হইল।

তখন সূর্য্য ডুবিয়াছে। পশ্চিমে আকাশের প্রান্তভাগ দেখা যাইতেছে না, কেবল পর্ব্বতের উপর দিয়া ঈষৎ ক্ষীণ লোহিত আভা দৃষ্ট হইতেছে। বায়ু স্থির, পশু পক্ষীর চীৎকার কোথাও শোনা যায় না। দূরে দূরে পর্ব্বতের শিরোদেশে, উপত্যকায় অন্ধকার হইয়া আসিতেছে।

সেই নিস্তব্ধের মধ্যে শিলাখণ্ড গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িয়া গেল। শব্দ শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম।

সন্ন্যাসী তখনও মুখ নিম্নে করিয়া বসিয়াছিল। শব্দ শুনিবামাত্র মাথা তুলিয়া যে দিক্ হইতে শব্দ আসিয়াছিল, সেই দিকে চাহিল। চাহিবামাত্র আমায় দেখিতে পাইল—দেখিয়াই চিনিল।

রমণীও উঠিয়া বসিল। সেও শব্দ লক্ষ্য করিয়া আমাকে চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। হস্তস্থিত সেতার মাটীতে পড়িয়া গেল।

সন্ন্যাসী বসিয়া তীক্ষ্ণ, শান্ত, সরল দৃষ্টিতে আমায় দেখিতে লাগিল। রমণী উঠিয়া ভীতিবিস্ফারিত বিহ্বল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিলাম সন্ধ্যার অন্ধকারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রমণী আপাদমস্তক শিহরিতে লাগিল।

উভয়ের সেই স্থির নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন কষাবৃষ্টি হইতে লাগিল। মনে করিলাম যে এমন অসময়ে এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া ইহারা বিরক্ত হইয়াছে। হইবারই কথা। আমার মনে বড় লজ্জা হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ রমণীর দৃষ্টি স্থির হইল। কিন্তু সহজ দৃষ্টির স্থিরতা নহে। চক্ষু বিস্ফারিতই রহিল। দৃষ্টি যেন আমাকে ভেদ করিয়া পর্ব্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ক্রমে রমণী হস্ত উত্তোলন করিয়া আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া কহিল, "আবার"!

চীৎকার করিয়াই রমণী পূর্ব্বের মত হৃদয়ের উপর হস্ত স্থাপন করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া বেগে শিলাখণ্ডের উপর পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী ফিরিয়া রমণীকে উঠাইতে উদ্যত হইল। দুই চারিবার তুলিবার চেষ্টা করিয়া অকস্মাৎ তাহাকে ত্যাগ করিল। দেখিলাম সেতারের দিকে ফিরিয়া সেতার উঠাইয়া লইল। বোধ হইল সেতারের একটা তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

এতক্ষণ সন্ন্যাসী বরাবর আমার দিকে চাহিয়া ছিল। থাকিয়া থাকিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিতেছিল, "আবার! আবার!" আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে আমাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইল না। চক্ষের দৃষ্টি নিদ্রোত্থিতের মত, দেখিতে দেখিতে চক্ষে অদ্ভুত বিকার উপস্থিত হইল। দৃষ্টি চঞ্চল হইল। সেতার তুলিয়া লইয়া আমার দিকে

আর বড় একটা দৃষ্টিপাত করিল না। খানিক দূরে গিয়া বসিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। অগ্রসর হইয়া কহিলাম, "তোমার কি কিছু-মাত্র বিবেচনা নাই? রমণী অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিল, আর তুমি সেতার বাজা-ইতে বসিলে?"

সন্ন্যাসী আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ করিল না। আমার কথা যে তাহার কানে গিয়াছে তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া আমি স্বয়ং রমণীর নিকটে গেলাম।

এতক্ষণ সেতার বাজিতেছিল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে অশ্রুতপূর্ব্ব মর্ম্মচ্ছেদী বিলাপের রাগিণী শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

রমণীর নিকটে গিয়া দেখিলাম সে নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া আছে। নিশ্বাস প্রশ্বাস অনুভব করা যায় না; চক্ষু মুদ্রিত, হৃদয়ের উপর বাম হস্ত রহিয়াছে। নাড়ী দেখিতে যাই, পাই না। অত্যন্ত ভীত হইয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

এদিকে সেতারে বিলাপ সঙ্গীত ছাড়িয়া এক অদ্ভুত রাগিণী বাজিতে লাগিল। যেন সেতারে কাহাকে আহ্বান করিতেছে—আকুল, উন্মত্ত আহ্বান! ঝঙ্কারের উপর ঝঙ্কার, আহ্বানের পর আহ্বান!

যেমন মনে সন্দেহ জন্মিল, অমনি রমণীর হাত ভাল করিয়া দেখিলাম। পা দেখি-লাম, চক্ষু, নাসিকা সমুদয় দেখিলাম। নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম। ক্রমে প্রতীত হইল যে রমণীর মৃত্যু হইয়াছে—মূর্চ্ছা নয়। বজ্রপাতে যেরূপ অকস্মাৎ মৃত্যু সেইরূপ, তবে মৃত্যুর কারণ কি তাহা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। বিষ ভক্ষণেই হউক অথবা হৃৎ-পিণ্ডের কোন পীড়ার জন্যই হউক, মৃত্যুর কারণ কখন জানিতে পারি নাই।

রমণীর মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া আমি সন্ন্যাসীকে ডাকিতে উদ্যত হইলাম। এমন সময় অকস্মাৎ সেতারের শব্দ বন্ধ হইয়া গেল। সন্ন্যাসী সবলে সেতার দূরে নিক্ষেপ করিল। প্রস্তরে ঠেকিয়া যন্ত্র চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

আমি দ্রুতগতি গিয়া সন্ন্যাসীর হাত ধরিলাম। কহিলাম, "তুমি কি পাগল হইয়াছ?"

উত্তরে সন্ন্যাসী আমার দিকে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল। তাহার চক্ষু দেখিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইলাম। আমাকে দেখিয়া সন্ন্যাসী হাসিল। চীৎকার করিয়া বার বার হাসিল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

সন্ধ্যার সেই আসন্ন অন্ধকারে সেই অট্ট হাসি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে সেই তরঙ্গায়িত বিকট হাস্য, আর মধ্যস্থলে সদ্যমৃত রমণীর মৃতদেহ!

সন্ন্যাসীকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহার উত্তর সেই হাসিতে পাইলাম। আর কোন উত্তর কখন পাই নাই।

উন্মত্তাবস্থাতেই কিছু দিন পরে সন্ন্যাসীর মৃত্যু হয়।

ইহারা দুই জন কে? ইহাদিগের জীবনের সহিত আমার কিরূপ সম্বন্ধ? রমণী কি কারণে মরিল, সন্ন্যাসীই বা পাগল হইল কেন? এসব কথা কখন জানিতে পারি নাই। এ কথা কাহাকে বলিও না, কেন না কেহই শুনিয়া পরিতৃপ্ত হয় না, মনে করে কিছু বাকি রহিল। উপকথা হইলে আমি সমাপ্ত করিয়া শুনাইতে পারিতাম।

আজ আবার অনেক দিন পরে সেই কথা বলিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বৈজ্ঞানিক সংবাদ।

বুরবুল ওয়াটার্স্ (Bourboule waters) নামে এক প্রকার নূতন ধাতব জল নানা রোগের বিশেষতঃ বাত, শ্বাস, মুখের ব্রণ প্রভৃতি চর্ম্ম রোগের ঔষধ বলিয়া কথিত হইতেছে। ডাক্তারগণও পরীক্ষা দ্বারা এই ধাতব জল স্বাস্থ্যজনক বিবেচনা করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া জ্বরের পর শরীরে তাহার যে বিষ অবশিষ্ট থাকে, এই জল পানে তাহাও ধ্বংশ হয়।

চা পত্রে ট্যানিন্ (Tannin) নামে স্বাস্থ্যভঙ্গকারক একরূপ পদার্থ আছে। সম্প্রতি দার্জ্জিলিংয়ের সান্থা (Santha) টি কোম্পানি এক প্রকার চা-সার প্রস্তুত করিয়াছেন—তাহাতে ট্যানিন নাই। চা পত্রের পরিবর্ত্তে ইহা উষ্ণজল ও দুগ্ধাদির সংমিশ্রণে পান করিলে আর চা-পান জনিত স্বাস্থ্য হানির সম্ভাবনা নাই।

ইংলণ্ডে ভিনোলিয়া সোপ (Vinolia soap) নামে এক প্রকার নূতন সাবান বাহির হইয়াছে। ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া বলেন অন্য যত প্রকার সাবান আছে—তাহার মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট; চর্ম্মের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। এবার বুঝি পিয়ারকে হার মানিতে হয়!

প্রোফেসর ফোর্লানিনি প্লুরিসি রোগ (এক প্রকার ফুস ফুস রোগ) আরোগ্য হইবার পর সংহত ঘন বাতাস নিশ্বাসে গ্রহণ করিতে বলেন। এই রোগে ফুস ফুসে যে জল জমা হয়—ইহা আরোগ্য হইলে সেই জল শুকাইবার সঙ্গে ফুস ফুস সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; উক্ত রূপ বায়ু গ্রহণে তাহা আবার বিস্ফারিত হয়। এতদিন এইরূপ চিকিৎসা

প্রচলিত না হইবার কারণ এই উপায় অতি জটিল এবং বহু ব্যয় সাপেক্ষ ছিল, কিন্তু প্রোফেসর ফোর্লানিনির নূতন আবিষ্কৃত উপায়ে এই সকল অভাব অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে।

প্রোফেসর ফ্লাওয়ার সম্প্রতি মনুষ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে লণ্ডন ইন্‌ষ্টিটিউসনে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

হোমর, হিরোডোটস্, অ্যারিষ্টটল্, টিসিয়স্, প্লিনি প্রভৃতির প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন পিগ্‌মি (Pygmi) জাতি অর্থাৎ বালখিল্য (ক্ষুদ্র মনুষ্য)দিগের অস্তিত্বে পূর্ব্বকালীয়-লোকের সাধারণ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এ বিশ্বাসের মধ্যে কতদূর সত্য আছে—তাহা কেবল গত শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল হইতে মাত্র অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। মনুষ্য-বিজ্ঞানের চর্চ্চাধিক্য এবং ক্ষুদ্রতম বানর জাতির আবিষ্ক্রিয়াই এই অনুসন্ধান স্পৃহার মূল।

পারিসের মনুষ্যতত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রধান ও বিখ্যাত প্রোফেসর এম্ ডি ক্যাডরফাজ প্রমুখ দল গত শতাব্দী হইতে এখন পর্য্যন্ত এই বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয়ে যত্নবান হইয়াছেন, এবং পুরাতন লেখকগণ কেবল মাত্র তাঁহাদের কল্পনা শক্তিতে নীত হইয়াই যে মধ্য আফ্রিকা ও দক্ষিণ আসিয়াকে পিগমিদিগের আবাস স্থল করিয়া তোলেন নাই—এত-দ্দ্বারা তাহাও প্রমাণ করিয়াছেন। দক্ষিণ আসিয়ার আণ্ডামান দ্বীপ পুঞ্জে যে ক্ষুদ্র মনুয্যগণ বাস করিত—নবম শতাব্দীর আরব যাত্রীদিগের এতৎসম্বন্ধীয় লেখায় তাহা সপ্রমাণ হয়। উক্ত যাত্রীগণ এই দ্বীপবাসীগণকে অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, বিদেশীয়ের যম স্বরূপ এবং মনুষ্য ভক্ষক জাতি বলিয়া ইহারা কথিত হইয়াছে। তাহার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত যে আর কোন জাতির আণ্ডামান যাত্রার কথা পাওয়া যায় না—এই বর্ণনাই সম্ভবতঃ তাহার মূল। কিন্তু আণ্ডামান দ্বীপ নির্ব্বাসিত ভারতবাসীর উপনিবেশ হইবার পর ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গিয়াছে কিন্তু ইহারা যে মনুষ্য ভক্ষক, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১২০০০ বার হাজার ভারতবাসী সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। আণ্ডামানবাসীগণ প্রথম প্রথম তাহা-দিগকে অত্যন্ত ভয় করিত,—এবং দূরে দূরে থাকিত; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সদয় ব্যব-হারে ক্রমে তাহারা সাহস প্রাপ্ত হওয়াতে তাহাদের আচার ব্যবহার অনেক জানিতে পারা গিয়াছে। ইয়োরোপীয়গণের সম্পর্কে আসিবার আগে তাঁহারা চাষ করিতে জানিত না—জন্তু প্রতিপালনও করিত না। কোন ধাতু দ্রব্য তাহাদের ছিল না। বংশ পাত্রে তাহারা জল পান করিত, হস্ত নির্ম্মিত যেরূপ মৃত্তিকাপাত্র তাহারা ব্যবহার করিত, তাহা ফ্লাওয়ার দেখাইলেন। উত্তম চুপড়ি এবং মৎস্য জাল তাহারা প্রস্তুত করিত। তাহারা উত্তম ডুবারি ও সন্তরণকারী এবং ডোঙ্গা নৌকার নিপুন মাঝি। ধনুর্ব্বাণই যদিও তাহাদের প্রধান অস্ত্র—কিন্তু বর্শা, হার্পুণও তাহারা ব্যবহার করিত। তাহারা কাঁচা

মাংস খাইত না; অগ্নিতে রন্ধন করিত, কিন্তু অগ্নির সাহায্যেই তাহারা অগ্নি করিত, প্রস্তরাদি অন্য পদার্থ হইতে অগ্নি করিতে তাহারা জানিত না। মৎস্য, মাংস, ফল, মূল, মধু এই সকল দ্রব্য তাহাদের আহার্য্য এবং জল তাহাদের এক মাত্র পানীয় ছিল, ক্ষুদ্রাকার ইহাদিগের একটি বিশেষত্ব। অনেক আণ্ডামানবাসীর পরিমাপ লইয়া দেখা গিয়াছে—গড়ে ইহাদের পুরুষেরা ৪ ফুট ৯ ইঞ্চ এবং স্ত্রীলোকেরা ৪ ফুট ৬ ইঞ্চ। ইহাদের বর্ণ ঘনশ্যাম কৃষ্ণবর্ণের কাছাকাছি, চুল সজারুর মত খাড়া এবং কোঁকড়া। দক্ষিণ আসিয়ায় ভারতবর্ষ, সায়াম, কোচিন, চীন এবং অন্যান্য স্থলে যে ক্ষুদ্র জাতিদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়—তাহাদের মধ্যে আণ্ডামানবাসীই একমাত্র অবশিষ্ট। তবে ঐ সকল স্থানের কোথাও কোথাও কখনো কখনো তাহাদের চিহ্নও পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই উপনিবেশবাসীদিগের দৌরাত্ম্যে ধ্বংশ হইয়াছে, কোন স্থলে উপনিবেশীদিগের সহিত বিবাহে ভিন্ন জাতি হইয়া পড়িয়াছে। অল্প যাহা অবশিষ্ট আছে—অগম্য পর্ব্বত প্রদেশেই তাহাদের আশ্রয়, সুতরাং তাহাদের দর্শন সহজ ব্যাপার নহে। আণ্ডামানবাসী ব্যতীত আফ্রিকার দক্ষিণে জংলা নামক (Bosjesmen or Bushmen) এক ক্ষুদ্র জাতি পাওয়া গিয়াছিল—তাহাদেরও গড় পরিমাপ আণ্ডামানবাসীদিগের মত এবং তাহাদের চুলও উহাদিগের ন্যায় খাড়া ও কোঁকড়া। তবে অন্যান্য অনেক বিষয়ে তাহারা অন্য প্রকারের।

আফ্রিকার বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বস্থিত প্রদেশে আর এক ক্ষুদ্র জাতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহারা বৃহদায়তন কাফ্রিদিগের সহিত একত্রেই বাস করিত। অ্যাণ্ড্রু ব্যাটেল (Andrew Battell) ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁহার লোয়াংগো তীর (Loango coast) বর্ণনা বৃত্তান্তে ইহাদের কথা বলিয়াছেন এবং ডু স্যাইলু (Du Chaillu) ষ্ট্যানলি প্রভৃতি অন্য ভ্রমণকারীগণ পরে ইহাঁর অনুমোদন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আক্কা নামক দলগণ অ্যালবার্ট নিয়াঞ্জা হ্রদের পশ্চিমে বাস করিত। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সুইনফার্থ কর্ত্তৃক তাহারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং আরো সম্প্রতি এমিন পাসা তাহাদের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহারা জ্ঞাত ক্ষুদ্র জাতির মধ্যে আবার ক্ষুদ্রতম। ইহাদের পূর্ণ বর্দ্ধিত স্ত্রীপুরুষ চার ফুটের অধিক উচ্চ নহে।

সম্প্রতি হাংগারির বিজ্ঞান অ্যাকাডমিতে মিষ্টার জোজেফ ক্যর‍্যাসি পিতা মাতার বয়সের সহিত সন্তানের দীর্ঘ জীবনের কিরূপ সম্বন্ধ, এই বিষয়ে এক বক্তৃতা দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি ৩০ হাজার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে ২০ বৎসরের মাতা এবং ২৪ বৎসরের পিতার সন্তানগণ অধিক বয়স্ক পিতামাতার সন্তানগণ অপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহাদিগের শ্বাসরোগপ্রবণতা জন্মে। ২৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক পিতা এবং ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক মাতার সন্তানেরা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ সবল। ক্যর‍্যাসি বলেন স্ত্রী অপেক্ষা স্বামী অধিক

বয়স্ক হওয়াই মঙ্গল জনক, কিন্তু ৩০ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স্ক স্ত্রীলোকগণ আপনাদিগের অপেক্ষা কিছু অল্প বয়সের স্বামী গ্রহণ করিলে সন্তান সুস্থতর হয়। ৩০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের ২০ হইতে ৩০ বৎসরের যুবতী নির্ব্বাচন করা উচিত। যদি মাতা পিতাপেক্ষা পাঁচ বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ হন, তাহা হইলে সন্তানের স্বাস্থ্য হানি হয়।

ইয়োরোপে একদল লোক বলিতেছেন—অনাবশ্যক প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতি না শিখাইয়া তৎপরিবর্ত্তে বিজ্ঞানকেই শিক্ষার ভিত্তি ভূমি করা উচিত। তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর ফায়হিংগর এই বলেন যে, বিকাশ পদ্ধতির (Laws of development) একটি প্রধান নিয়ম। ব্যক্তিগত বিকাশ ও জাতিগত বিকাশের পরস্পর স্বাপেক্ষতা অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই অতীত ইতিহাসের পথ দিয়া পরিস্ফুট হইতে হইবে, পূর্ব্ব পুরুষদিগের উন্নতির সমস্ত বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া আপনাকে লইয়া যাইতে হইবে। যেমন প্রত্যেক মনুষ্য ভ্রূণাবস্থায় নিম্নশ্রেণীর প্রাণীমূর্ত্তি পরম্পরাক্রমে উচ্চ মনুষ্যাকারে পরিণত হয়,—ডারউইন আবিষ্কৃত অভিব্যক্তিবাদ মনোরাজ্যে প্রয়োগ করিতে হইলে প্রত্যেক ছাত্রকেই প্রাচীন জাতীর পূর্ব্ববর্ত্তী সভ্যতার সোপান পর্য্যায় দিয়া উন্নতির পথে উত্থান করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলেন—ইয়োরোপীয়ের জীবনের মধ্যে তিন সভ্যতার স্তর আছে, গ্রীক-রোমীয়, খৃষ্টীয়, আধুনিক অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক। ইহার মধ্যে কোন একটিকে বাদ দিলে কোন ইয়োরোপীয়ের চরম মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

জীবন মধ্যাহ্ন।

জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে,
চলেছিনু আপনার বলে ;
সুদীর্ঘ জীবনযাত্রা নবীন প্রভাতে
আরম্ভিনু খেলিবার ছলে।
অশ্রুতে ছিল না তাপ, হাস্যে উপহাস,
বচনে ছিল না বিষানল,
ভাবনা ভ্রুকুটিহীন সরল ললাট
সুপ্রশান্ত, আনন্দ-উজ্জল।

কুটিল হইল পথ, জটিল জীবন,
বেড়ে গেল জীবনের ভার ;—
ধরণীর ধূলিমাঝে গুরু অকর্ষণ
পতন হইল কতবার!
আপনার পরে আর কিসের বিশ্বাস ?
আপনার মাঝে আশা নাই!
দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে ধূলি সাথে মিশে,
লজ্জাবস্ত্র জীর্ণ শত ঠাঁই!

তাই আজ বার বার ধাই তোমা পানে,
ওহে তুমি নিখিল-নির্ভর!
অনন্ত এ দেশ কাল আচ্ছন্ন করিয়া
আছ তুমি আপনার পর।

ক্ষণেক দাঁড়ায়ে পথে দেখিতেছি চেয়ে
তোমার এ ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ,
কোথায় এসেছি আমি, কোথায় যেতেছি,
কোন্ পথে চলেছে জগৎ !

প্রকৃতির শান্তি আজি করিতেছি পান,
চির স্রোত সান্তনার ধারা।
নিশীথ আকাশ মাঝে নয়ন তুলিয়া
দেখিতেছি কোটি গ্রহ তারা,—
সুগভীর তামসীর ছিদ্র পথে যেন
জ্যোতির্ম্ময় তোমার আভাস,
ওহে মহা-অন্ধকার ! ওহে মহা-জ্যোতি !
অপ্রকাশ ! চির-স্বপ্রকাশ !

যখন জীবনভার ছিল লঘু অতি,
যখন ছিল না কোন পাপ,
তখন তোমার পানে দেখি নাই চেয়ে,
জানি নাই তোমার প্রতাপ,
তোমার অগাধশান্তি, রহস্য অপার,
সৌন্দর্য্য অসীম, অতুলন !
স্তব্ধভাবে, মুগ্ধনেত্রে, নিবিড় বিস্ময়ে
দেখি নাই তোমার ভুবন।

কোমল সায়াহ্ন-লেখা বিষণ্ণ, উদার,
প্রান্তরের প্রান্ত আম্রবনে ;
বৈশাখের নীলধারা বিমল-বাহিনী
ক্ষীণ গঙ্গা সৈকত শয়নে ;
শিরোপরি সপ্ত ঋষি, যুগ যুগান্তের
ইতিহাসে নিবিষ্ট নয়ন ;

নিদ্রাহীন পূর্ণচন্দ্র নিস্তব্ধ নিশীথে
নিদ্রার সমুদ্রে নিমগন ;

চির নিঃশ্বসিত বায়ু ; বিকশিত উষা ;
কনকে শ্যামলে সম্মিলন ;
দূর দূরান্তরশায়ী মধ্যাহ্ন উদাস ;
বনচ্ছায়া নিবিড় গহন ;
যতদূর নেত্র যায় শস্য শীর্ষ রাশি
ধরার অঞ্চলতল ভরি ;
জগতের মর্ম্ম হতে মোর মর্ম্মতলে
আনিতেছে জীবন-লহরী।

বচন-অতীত ভাবে ভরিছে হৃদয়,
নয়নে উঠিছে অশ্রুজল,
বিরহ-বিষাদ মোর গলিয়া ঝরিয়া
ভিজায় বিশ্বের বক্ষস্থল।
প্রশান্ত গভীর এই প্রকৃতির মাঝে
আমার জীবন হয় হারা
মিশে যায় মহা-প্রাণ সাগরের বুকে
ধূলিম্লান পাপ তাপধারা।

শুধু জেগে ওঠে প্রেম মঙ্গল মধুর ;
বেড়ে যায় জীবনের গতি ;
ধূলি-ধৌত দুঃখ শোক শুভ্রশান্ত বেশে
ধরে যেন আনন্দ মুরতি !
বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয়
অবারিত জগতের মাঝে ;
বিশ্বের নিশ্বাস লাগি জীবন-কুহরে
মঙ্গল আনন্দধ্বনি বাজে !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হেঁয়ালি-নাট্য।

১৭ নং পাঁচু মিস্ত্রির গলি।

(রাম, শ্যাম, মাধব, দামোদর,ও চিন্তামণি কুণ্ডু পরামর্শে ব্যস্ত, সত্যশরণ বাবুর প্রবেশ)

সত্য। কিহে আজ তোমরা যে বড়ই পরামর্শে ব্যস্ত, কিছু নূতন হুজুগ জুটেছে নাকি?

রাম। না।

সত্য। কঙ্গ্রেসের বিরুদ্ধে যে চিৎকার কচ্ছিলে, সেটা কি সেই রকমই চল্‌ছে?

চিন্তা। না।

সত্য। তবে 'হাঁচি টিক্‌টিকি' পতন প্রভৃতি বড় বড় বিষয়ের সৎ যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় কি তোমাদের কাগজ সুশোভিত কচ্ছ?

দামো। তাও না।

সত্য। সে কি? কোন হুজুগও উঠেনি, কঙ্গ্রেস নিয়ে বকাবকিও চল্‌ছে না, হাঁচি টিকটিকির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও হচ্ছে না, তবে বল তোমাদের কাগজ বন্ধ হয়ে এল?

সকলে (গম্ভীর স্বরে) অসম্ভব, অসম্ভব। যার সাতাশ হাজার তিনশ পঁচানব্বুই জন গ্রাহক, সে কাগজ বন্ধ হবে একথা কি তোমার বিশ্বাস হয়? যে কাগজ বাঙ্গালী দোকানদারদের রসিকতা শেখায়, যার সরস বর্ণনায় আট বৎসরের শিশুহৃদয়েও ইয়ারকির তরঙ্গ উথ্‌লে উঠে, যে কাগজে কত জোচ্চোর ব্যবসাদার কত শত আড়ম্বরপূর্ণ জুয়াচুরির বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে, মফস্বলের নিরীহ ভদ্র লোকদের প্রতারণা দ্বারা বিলক্ষণ দু-পয়সা লাভ কর্চ্ছে, সে কাগজ বন্ধ হবে তুমি সে কথা বিশ্বাস কর কি? যদি তুমি বাহিরের লোক না হতে, তবে তোমায় হিসাবটা দেখাতে পার্ত্তেম।

সত্য। লোকে কিন্তু বলে তোমাদের এত গ্রাহক নয়, তোমরা নাকি বাজার গরম করবার জন্য বল তোমাদের সাতাশ হাজার তিনশ পঁচানব্বুই জন গ্রাহক?

রাম। লোকে বলে, আমরা বলি না, জুতাসেলাই ওয়ালা হতে চণ্ডীপাঠী ব্রাহ্মণ সকলেই আমাদের কাগজ পড়ে। এমনি হিঁদুয়ানির কল ফেঁদে রেখেছি যে কোন বুড়ো এর প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারে না। তা ছাড়া রসের গল্প পড়বার জন্য ছেলেরা দ্বিতীয় ভাগ ছেড়েই আমাদের কাগজ পড়্‌তে হাত দেয়। ধরতে গেলে বাঙ্গালা দেশের ছেলে বুড়ো সকলেই আমাদের কাগজের ভক্ত, বাকি কজন বিকৃত মস্তিষ্ক ইংরাজি শিক্ষিত যুবক; তা তাদের ছেড়ে দিলে কি এ বাঙ্গালায় ২৭৩৯৫ জন গ্রাহক হওয়া অসম্ভব?

সত্য। লোকে তবে এমন কথা বলে কেন?

---

* এবারের হেঁয়ালি-নাট্যের কোন উত্তর নাই।

দামো। আমাদের সত্য কথা বল্‌্বা অভ্যাস নেই বলে।

সত্য। এবার ঠিক কথা বলেছ, কিন্তু তোমরা একটু উঁচু রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখ্‌তে পার না, অনেক ভাল লোক তোমাদের কাগজ পড়ে। সুধু দোকানদার আর ছোট ছোট ছেলেদের ছুটো রসের কথা শুনিয়ে পয়সা রোজগার কল্লে পেটটা বেশ ভরে বটে কিন্তু খবরের কাগজের উদ্দেশ্য বজায় থাকে না।

রাম। তোমার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেছে দেখ্‌ছি, হায়, ইংরাজি লেখাপড়াই আমাদের কাল হ'ল। মুসলমানদের দীর্ঘকাল রাজত্বেও যা বজায় ছিল, আজ ইংরেজ রাজত্বে তা লোপ হলো।

সত্য। আহা!

শ্যাম। আমরা খাঁটি বাঙ্গালী, ইংরেজী শিক্ষায় আমাদের আর্য্য মস্তিষ্ক বিকৃত হতে পারে এই ভয়ে আমরা রাম, শ্যাম, দামু, মাধব ও চিন্তামণি কুণ্ডু এই পাঁচটি আর্য্য সন্তান ইংরেজী না শিখে, বঙ্গ সন্তানদিগকে প্রকৃত আর্য্য রীতি নীতি শিক্ষা দিবার জন্য এই পাঁচু মিস্ত্রীর গলি হ'তে খবরের কাগজ বার কর্চ্ছি, আমাদের উদ্দেশ্য সাধু।

দামো। অতি পবিত্র, সেই জন্য কাশীর পণ্ডিতদের পায়ে ধরে হিন্দুদের কংগ্রেসে না মিশবার অনুরোধপত্র আনিয়েছি।

চিন্তা। অতি উদার, সেই জন্যে বিলেতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ না হলেও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াসূচক ছু পাঁচটা দৃষ্টান্ত মাথা হতে বাহির করে, খবরের কাগজে ছাপি, এতে তিনটি সুবিধা; ১ম অনায়াসে স্থান পুরান হয়, ২য় ভিন্ন সমাজের নিন্দা-জনিত সুখটা উপভোগ করা হয়, ৩য় সরস বাঁধুনিতে গ্রাহককে তৃপ্ত করবার সুযোগ উপস্থিত হয়।

সত্য। হাঁ, তোমাদের ও অভ্যাসটা খুব আছে বটে, দিনকত আগে তোমরাই না এই ১৭নং পাঁচু মিস্ত্রীর গলিতে বসে মাথা হ'তে বার তারিখ ফাঁদা বিলেতের পত্র বার কর্ত্তে?

দামো। এবং আমাদের সাতাশ হাজার তিনশ পঁচানব্বুই জন গ্রাহকের প্রাণে রস-ধারা ঢেলে দিতেম। আমরা আগেই বলেছি আমাদের উদ্দেশ্য সাধু, আর এই সাধু উদ্দেশ্য আছে—তাই রাজা শিবপ্রসাদ ও আমিরহোসেনের মত মহাত্মাদের নিজ দলভুক্ত কর্ত্তে পেরেছি।

মাধব। আর এই জন্যে চেম্বারলেন সাহেবকে কংগ্রেসের বিপক্ষে দাঁড় করাবার চেষ্টা পাচ্ছি।

চিন্তা। আর এই জন্যে বড় লাট ডফরিনের লেকচারে বাবুদের প্রতি গালাগালির বাণবৃষ্টি দেখে আনন্দে নৃত্য করেছি—আর বলেছি এমন লাট আর হয় না।

শ্যাম। আর এই জন্যে ইউল, নর্টন হিউম প্রভৃতি সাহেবের দল স্বার্থ সাধনের জন্য কংগ্রেসের পক্ষ অবলম্বন করেছেন বলে আমাদের সূক্ষ্ম অনুমান শক্তির পরিচয় দিয়েছি।

রাম। আর এই জন্যে বাবুরা উক্ত সাহেবদের স্বার্থপরতা দেখ্‌তে পান না বলে বাহাদুরী প্রকাশ করেছি।

সত্য। হাঁ, তোমরা বাহাদুরের গোষ্টীতে বাহাদুর। তা তোমাদের জিজ্ঞাসা করি তোমরা যেন ভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা শুনবার ভয়ে, আর তোমরা যে 'বড় একটা কেও' তাই প্রকাশ কর্ব্বার জন্য কঙ্গ্রেসের বিপক্ষ হলে, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় এদেশীয় মেম্বর যাতে বেশী হতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত এরূপ সর্ব্ববাদী সম্মত উত্তম প্রস্তাবের বিপক্ষতাচরণ কর কেন ?

রাম। উত্তম প্রস্তাব হলেও তাতে রাম, শ্যাম মাধব, দামোদর আর চিন্তামণি কুণ্ডুর কোন লাভ নাই। ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের কোন কালেই মেম্বর হবার আশা নাই, আর আমাদের শত্রু উকিল বাবু, ব্যারিষ্টার বাবু, ডাক্তার বাবু, বাঙ্গালী বাবু, মান্দ্রাজী বাবু, বোম্বাই বাবু প্রভৃতি বাবুর দল হতে যে মেম্বর মনোনীত হবে, তাও আমাদের প্রাণে সহ্য হবে না।

সত্য। ভাল, তোমরা বাবুদের উপর এত চটা কেন ?

রাম। চটা হব না ? তারা উচ্চশিক্ষা পেয়ে আমাদের কাগজ যা সাতাশ হাজার তিন শ পঁচানব্বুই জন বালক ও দোকানদার গ্রাহকের নিকট অতি উপাদেয় পদার্থ, তাকেই কুরুচিপূর্ণ বলে নাসিকা কুঞ্চিত করে।

শ্যাম। এবং তারা আর্য্য প্রথা মতে টিকি রাখতে সঙ্কুচিত হয়।

মাধব। এবং তারা আমাদের কৃত পরম পবিত্র বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উপহাস করে।

দামোদর। এবং আমরা রাম, শ্যাম, মাধব, দামোদর ও চিন্তামণি কুণ্ডু এই পাঁচটি আর্য্য এই গলিতে বসে যে আর্য্য ধর্ম্ম উদ্ধারের জন্য অকাতরে পরিশ্রম করচি, সেই সনাতন ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি প্রকাশ করে না।

সত্য। কি পরিতাপ! তা তোমরা ত সনাতন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে চিৎকার কর কিন্তু তোমাদের সনাতন ধর্ম্মে পরনিন্দা পরদ্বেষ কর্ত্তে বলে কি ?

রাম। কেন কি অন্যায় কাজ করি—ভগবান ত নিজেই বলিয়াছেন,

'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়ত দুষ্কৃতাং

ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'

শ্যাম। পরনিন্দাই বা কি করি—যা ভাল নয়, অর্থাৎ যা রাম, শ্যাম মাধব, দামোদর ও চিন্তামণি এই পাঁচ জনের স্বার্থের বহির্ভূত, তারই বিপক্ষে দু পাঁচটা কথা বলি মাত্র।

মাধব। আমাদের ইংরাজী বলাটা অভ্যাস নাই, তাই ইংরাজীতে কথা কহা অন্যায় মনে করি।

দামো। তাই কাগজে প্রবন্ধ লিখি যে ইংরাজী কথা কয়ে আমাদের গলদ্‌ঘর্ম্ম হওয়া উচিত নয়।

চিন্তা। আর পয়সা উপার্জ্জ করাই আমাদের জীবনের সারধর্ম্ম বলে জানি, তাই সেই প্রবন্ধে লিখেছি যে, যে কেরাণী হবে তার মাথা ঘামিয়ে জ্যামিতি পড়া উচিত নয়, আর যে পোষ্টাফিসে চাকরি করবে, সে যেন বিজ্ঞান না পড়ে।

সত্য। এবং যেন তোমাদের হাঁচি টিকটিকির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পড়ে বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করে। আচ্ছা, যদি তোমরা উচ্চ শিক্ষারই বিরোধী—তবে কাশীর পণ্ডিতদের কাছ থেকে একটা ব্যবস্থা আনাও না যে যারা এখন হতে ইংরাজী পড়বে তারা ধর্ম্ম ও সমাজ চ্যুত হবে।

রাম। (গম্ভীর ভাবে) উঁহু।

সত্য। কেন, বেশত এক ঢিলে দুই পাখী মরবে, কঙ্গ্রেস করাও ঘুরে যাবে, তোমাদের ইচ্ছাও সফল হবে।

রাম। না, সে কোন কাজের কথা নয়। কেউ সে কথা গ্রাহ্য করবে না, আর তাতে আমাদেরও বিশেষ ক্ষতির সম্ভব, কলেজটা খুলে দুপয়সা পাওয়া যাচ্ছে, কলেজের গায়ে যাতে ছড় লাগে সে রকম কাজ কর্ত্তে পারিনে, তবে কাগজে কলমে যা যোটে লিখি।

সত্য। তা যদি তোমরা উচ্চশিক্ষার বিরোধী—তবে কলেজটা করেছ কেন?

শ্যাম। তুমি এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথা করেও তা বুঝতে পাল্লে না, পয়সাই আমাদের জীবন, লিখিও পয়সার জন্যে—কলেজ করেছিও পয়সার জন্যে, তবে যদি লেখার উদ্দেশ্য আর কলেজ রাখার উদ্দেশ্য এ দুইটা উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দীভাব থাকে তবে তার জন্যে আমরা দায়ী নই।

সত্য। তবে কে দায়ী?

দামো। যারা পয়সা দেয়।

সত্য। ওহো-তাই বটে,-এতক্ষণে বুঝলাম তোমরাই আদর্শ হিন্দু।

(প্রস্থান)

ক্ষুদ্র কবিতা।

বৃন্দাবন।

সন্ধ্যাকালে গাভীগণ ফিরিত আলয়ে;
বনে বনে ভ্রমিত রে সন্ধ্যার বাতাস;
কূলে কূলে ধীরে ধীরে নীল জল লয়ে
বহিত তপন সুতা করিয়া উচ্ছাস;

ঝরিত কদম্ব ফুল ঝুরিয়া ঝুরিয়া,
আনন্দে নাচিত শিশু প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে;
আকাশে নক্ষত্র ফুল রহিত ফুটিয়া
যমুনার পানে চেয়ে চঞ্চল নয়নে;

ধরিয়া চিকন বেশ গোপের কুমারী
সঙ্কেত বাঁশীর লাগি রহিত বসিয়া ;
প্রেমময় কালোরূপ শ্যাম বংশী ধারী
হৃদয়-মন্দিরে সদা রহিত জাগিয়া ;
ধন্য প্রেম, ধন্য রাধা, ধন্য বৃন্দাবন,
ধন্য সে সুন্দর শ্যাম মুরতি মোহন !

দেখা।

কিছুতে কি মিটিবে না নয়নের ক্ষুধা,
কেবলি দহিতে রবে অনন্ত পিপাসা ;
প্রেমের নির্ঝরে ঝরে অবিরাম সুধা,
দিবানিশি কোরে পান মেটে না কি আশা ?
ঘুরে ঘুরে দেখে দেখে শেষে ফিরে আসি,
এদেখা কখন নাহি হবে সমাপন ;
দেখিতে চরণ নাহি দেখি কেশরাশি,
চম্পক অঙ্গুলি হেরি না হেরি নয়ন।
পূর্ণ তুমি—দেখিনু না পূর্ণ রূপ তব,
পূর্ণের অখণ্ড বিম্ব পড়ে না নয়নে ;
অঙ্গে অঙ্গে হেরি শুধু শোভা নব নব,
পূর্ণ লাবণ্যের ছবি নাহি পড়ে মনে।
গলে যাক্ ঢল ঢল রূপরাশি তব,
পড়ুক তরঙ্গ-ছায়া তৃষিত নয়নে !

রূপ।

উছলিছে রূপরাশি লাবণ্য সাগরে,
কূলে কূলে উছলিছে যৌবনের জল ;
তনুতে তরঙ্গমালা সাজে থরে থরে,
অচঞ্চল পূর্ণরূপ হয়েছে চঞ্চল ;
কপোলে তরঙ্গ দোলে চিবুকে খেলায়,
সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে নয়নে ঠেকিয়ে,
উচ্ছ্বসিয়ে ওঠে যেন হৃদয়-দোলায়
শব্দহীন কলস্বরে ঘিরিয়ে ঘিরিয়ে ;

উচ্ছ্বসিয়া দেহ-সীমা ভেঙ্গে ফেলে কূল
ব্যাপ্ত হতে চাহে যেন বিশ্ব চরাচরে ;
ত্রিজগতে আছে যত অস্ফুট মুকুল
ফুটাবারে চাহে সবে চাপিয়া অধরে ;
যাচিয়া জগতে দিবে প্রেম আলিঙ্গন,
রূপের শীতল জলে জুড়াবে যাতন !

বাসনা।

আর কিরে হবে দেখা সন্ধ্যার সময়
ধীর সমীরণে সেই উপবন তটে !
নিভৃত কুসুমবনে কুসুম নিলয়,
অলস সায়াহ্ন মেঘ আকাশের পটে ;
আর কিরে আলিঙ্গনে বাজিবে বলয়,
অস্তমান রবিছবি রঞ্জিবে নয়নে,
পরশিবে অঙ্গ কিরে মধুর মলয়,
আর কি তেমন হাসি ফুটিবে মিলনে !
আর কি ভাঙ্গিয়ে যাবে সোহাগের বাণী,
অধরের কথা শুধু ফুটিবে অধরে;
করতলে সযতনে থুইবে সে পানি,
হৃদয় রাখিবে এই হৃদয়ের পরে ;
আর কি দেখিব সেই চাঁদ মুখখানি,
করিবে কি মধুপান মানস ভ্রমরে !

ছবি।

ধীরে ধীরে পড়ে পা, টলমল করে গা,
খসে খসে পড়ে হাসি রাশি ;
উড়ে উড়ে পড়ে চুল, মুঠিতে ফুটন্ত ফুল,
ঝরে পড়ে চরণে উদাসী ;
চলে যেতে হেসে চায়, যার পানে ধেয়ে যায়,
থমকিয়া দাঁড়ায় আবার ;
নিবিড় নয়নে কিবা, উজল পুলক বিভা,
কিবা শোভা রূপের ছটার !

নীরব মধুর ভাষ, অলস চঞ্চল হাস,
নীরবেতে দাঁড়ায়ে দুজন;
চোকে চোকে টানাটানি, আকুল নীরব বাণী,
নয়নের মধুর মিলন!

কোথা খুলে গেল মুঠি, পশারিল বাহু দুটী,
জননীরে বাঁধিল বন্ধনে;
সন্ধ্যার তারকা প্রায়, দেখিতে মিশায়ে যায়,
ডুবে যায় চাঁদের কিরণে!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

নারী তত্ত্ব। হিন্দু মহিলাদিগের শারীরিক মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উদ্বোধন বিষয়ক প্রবন্ধ। শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার প্রণীত।

লেখকের মনে স্ত্রীলোকদিগের যে আদর্শ ভাব আছে, তাহা অতি উচ্চ। তিনি বঙ্গ কন্যাদিগকে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর মত সাধ্বী সতী উচ্চমনা ও সুশিক্ষিতা দেখিতে চাহেন, এবং তাঁহার মতে যেরূপ শিক্ষায় এইরূপ জাতীয় আদর্শ রক্ষিত হইতে পারে তাহা এই গ্রন্থে উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং পুস্তকের উদ্দেশ্য বিশেষ প্রশংসনীয়—এবং ইহাঁর পরামর্শও অনেক স্থলে সারবান ও সুফলপ্রদ।

তবে মাঝে মাঝে বাজে কথাও ইহার মধ্যে অনেক আছে। যে সকল মত যথোচিত পরীক্ষার সাহায্যে বিজ্ঞানের অনুমোদিত হয় নাই, তাহা গ্রন্থে প্রকাশ করিলে অনেক সময় বিশ্বাস-প্রবণ পাঠক পাঠিকার মনে ভ্রান্তি জন্মাইয়া দেওয়া হয় মাত্র। তাহা ছাড়া রমণীগণের আদর্শ দেখাইতে গিয়া লেখক বিদেশীয় রমণীগণকে যেরূপ অযথা আক্রমণ করিয়াছেন—তাহাও সঙ্গত মনে হয় না। ইংরাজেরা যখন আমাদের সমাজ লইয়া বিদ্যা প্রকাশ করেন, তখন তাঁহাদের অজ্ঞতায় আমরা কত হাসি। বাস্তবিক সমাজের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ না করিলে বাহির হইতে কোন সমাজের অবস্থা বুঝা কত দুরূহ। লেখক ইংরাজ সমাজের কথা যাহা বলিয়াছেন—তাহাতে তাঁহার ঐরূপ অজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিতেছেন—"যুবতী ভার্য্যা পরপুরুষের সহিত স্থানান্তরে, গ্রামান্তরে, দেশান্তরে গমন করিতে পারেন, পরপুরুষের সহিত নির্জ্জনে হাস্য-কৌতুক আলাপ ব্যবহার করিতে পারেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।" কোন বিশেষ স্থলে এইরূপ হইতে পারে না, তাহা নহে; কিন্তু বাস্তবিক ইংরাজী সামাজিক নীতি এরূপ নহে।

ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক প্রথা গঠিত হয়; এবং সঙ্গে

সঙ্গে সেই প্রথা রক্ষারও যথেষ্ট বন্ধন নিয়ম থাকে। ইংরাজ স্ত্রীস্বাধীনতা আছে বলিয়া তাহারা যথেচ্ছাচারী না হইতে পারে এরূপ নিয়ম তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট কড়াক্কড়। আমরা বাহির হইতে একটা দেখিতে পাই, অন্যটা দেখিতে পাই না—এই মাত্র তফাৎ। কোন পুস্তক পড়িয়া যদি লেখক এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন, সে সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে আমাদের দেশের সর্ব্ব লোক প্রচলিত বিখ্যাত বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া কোন বিদেশী যদি এইরূপ স্থির করেন যে, আমাদের দেশের রমণীগণ বিদ্যার মত—কিম্বা তিনিই আমাদের আদর্শ রমণী, তাহা হইলে কিরূপ হয়? বাস্তবিক ইংরাজ রমণীদের মধ্যে কত পুণ্যবতী সতী সাধ্বী না দেখা যায়! তাহাদের উচ্চমনাদিগের মত আত্ম বিসর্জ্জন, ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলে কোন্ বঙ্গ ললনা না গৌরব মনে করিবেন? তাহাদের মধ্যে উচ্চ আদর্শ ভাব যদি না থাকিত, তাহা হইলে এরূপ রমণী জন্ম গ্রহণ করিত না। তবে কথা এই আমাদের জাতীয় ভাবের আদর্শের মধ্য দিয়া আমরা যত শীঘ্র উচ্চ হইতে পারিব--তাহাদের জাতীয় অনুকরণ করিয়া তাহা হইবে না। লেখকের এ কথায় আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কিন্তু ইহা স্বতন্ত্র কথা, ইহার সঙ্গে ইংরাজ সমাজের নিন্দার কথা আনিয়া ফেলিবার বিশেষ আবশ্যক ছিল না।

রমণী। ইহা ক্ষুদ্র একখানি পদ্য পুস্তক। পুস্তক খানিতে লেখকের নাম নাই। কিন্তু যিনিই ইহার লেখক হউন না কেন--তিনি প্রকৃত কবি। ইহার ছত্রে ছত্রে কবি হৃদয়ের ভাবুকতা প্রকাশ পাইতেছে। রমণী ইঁহার তুলিতে গৌরব শ্রীতে ফুটিয়া উঠিয়াছেন। কবিতাটির কোন একস্থল উদ্ধৃত করিয়া তৃপ্ত হয় না—তাই কবিতাটির কিছুই উদ্ধৃত করিলাম না—পাঠক নিজে পড়িয়া দেখুন।

লেখক কে জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহল রহিল।

"সবিরাম ও অপরাপর জ্বর ও আনুসঙ্গিক রোগের ভৈষজ্য গুণ সংগ্রহ। এল, ভি, মিত্র কোঃ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য দুই টাকা আট আনা।

বাঙ্গলা ভাষায় হোমিওপ্যাথিক মতের চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থ অতি বিরল; অধুনা দুই এক খানি প্রকাশিত হইতেছে। "ভৈষজ্যগুণসংগ্রহ" নব বর্ষের নূতন পুস্তক। আমরা পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। যাঁহারা ইংরাজি জানেন তাঁহারাও এ পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বিস্তর শিখিবার কথা পাইবেন। যাঁহারা ইংরাজি জানেন না, তাঁহারা এক্ষণে বাঙ্গলা ভাষাতেই একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুস্তক প্রাপ্ত হইলেন। সরল ভাষায়, সুচারু প্রণালীতে ভৈষজ্যাবলী ও তাহাদের গুণগ্রাম এই পুস্তকে অতি সুন্দররূপে গ্রথিত হইয়াছে। এমন পক্ষপাত-শূন্য পুস্তক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। উপস্থিত পুস্তকে বিরুদ্ধমত হইতেও আরোগ্যপদ্ধতি সংগৃহীত হইয়াছে

দেখা যায়। এমন কি, প্রতিকার উদ্দেশে সাধারণ মুষ্টিযোগেরও উপকারিতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

লেখক একজন বহুদর্শী, বিজ্ঞ চিকিৎসক তাহা পুস্তক পাঠেই জানা যায়। ঔষধ ও রোগ প্রতিকার সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ আছে, তাহা বিশেষ বহুদর্শিতা না জন্মিলে কখনই সন্নিবেশিত হইতে পারিত না। এত ঔষধের উল্লেখ ও বর্ণনা অতি অল্প চিকিৎসা পুস্তকেই আছে—নূতন ও সদ্য পরীক্ষিত ঔষধগুলিও ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ঔষধের তালিকা একরূপ সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইংরাজীতে যে সকল পুস্তক আছে, তাহাতে পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন উপদেশ পাওয়া যায় না—কেননা, ইংরাজী খাদ্য বাঙ্গালী প্রায়ই খান না, আর ইংরাজী পুস্তকাবলীতে প্রায়ই ইংরাজী খাদ্য ভিন্ন অন্য খাদ্যের উল্লেখ থাকে না। লেখক একটী দেশীয় পথ্যের তালিকা করিয়া দিয়াছেন। কোন কোন বস্তুর কি কি উপযোগিতা ও তাহাতে পুষ্টিকারক সামগ্রীই বা কত পরিমাণে আছে তাহার তালিকা যে সাধারণের বিশেষ উপকারী হইবে তাহাতে আর কিছুই সন্দেহ নাই।

কিছু দিন পূর্ব্বে সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার জ্বররোগের যাবতীয় উপসর্গাবলী ও তাহাদের বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী ঔষধ সকলের তালিকা সম্বলিত একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছেন। উপস্থিত ভৈষজ্যগুণসংগ্রহ, সেই গ্রন্থের সহ-পাঠ্য। উভয় পুস্তকেই হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞানের অগণ্য গ্রন্থ ও চিকিৎসাপত্রিকা সকলের সার উপদেশ সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে যেরূপ জ্বর রোগের প্রাদুর্ভাব তাহাতে জ্বর সম্বন্ধে একখানি বিশেষ পুস্তকের বড় প্রয়োজন ছিল। সেই অভাবটী দূর করিয়া, ভক্তিভাজন লেখক জনসাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

এবার নূতন বৎসরের ভারতীতে একাধিক নূতন গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং বিদ্রোহের স্থানাভাব। পাঠক তাহাতে ক্ষুণ্ন হইবেন না, বিদ্রোহের অতি অল্পই অপ্রকাশিত আছে, তাহাও শীঘ্র পুস্তকাকারে সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইবে। বিদ্রোহের মূল্য ১৷৹ সিকা, কিন্তু ভারতীর গ্রাহকগণ ৸৹ আনায় পাইবেন।

"ভারতী ও বালক" কার্য্যাধ্যক্ষ।

ফুলজানি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সুগুনির মা কখন আশা করে নাই যে নায়েব মোশাই তাহার সঙ্গে বেয়ান সম্বন্ধ ধরিবেন। বড় মানুষের মেয়ে পুরনের মা ছোট লোকের মেয়ে ছেলের সঙ্গে কথা কহিতে হইলেও নাসিকা কুঞ্চন করিতেন, কাজেই তাঁহাকে কখন বেয়ান বলিতে সুগুনির মার সাহস হয় নাই। অতএব প্রফুল্ল মনে প্রভু পত্নীর কাছে নিজ সম্মান লাভের গল্পটা করিতে গিয়া বেচারী প্রথমতঃ এক পসলা অশ্রুবারি বর্ষণ করিয়া ফেলিল। নিস্তারিণীও প্রথমে আনন্দানুভব করিতেছিলেন, কিন্তু গল্প জমিয়া আসিলে বিশেষ তাহার উপসংহারে তাঁহার মহা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার এমন আয়োজন কিছু ছিল না যে খবর দিতে দিতে ঘোষ মহাশয়ের সেই ছোট রকমের অশ্বমেধ যজ্ঞের রসদ সরবরাহ হইতে পারে। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের সাধারণতঃ নিন্দা ভয় বেশী, বিশেষ কন্যার বিবাহ সংক্রান্ত নিন্দাভয়। নিস্তারিণী কুল কিনারা দেখিতে ছিলেন না। এমন সময়ে কনু আসিয়া জানাইয়া দিল যে "নায়েব মোশাইদের হুকা-রাম" যত লোক জনকে এ বাড়ীতে সিধা লইতে তাগাদা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা সব এল বলে। অনন্যোপায় হইয়া কর্ত্রীঠাকুরাণী পুরোহিত সার্ব্বভৌম মহাশয়কে ডাকিতে পাঠাইলেন। কালী তখন সইয়ের সঙ্গে কাছের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া "কুট্নো" কুটিতেছিল, বাপের নাম শুনিয়া তিন লাফে সইমার কাছে হাজির হইল। জিজ্ঞাসা করিল, বাবাকে কিজন্যে এখন ডাক্‌চে, কেননা আজ্‌ত বিয়েও নয়, পূজোও নয়। সইমার মুখে নিত্য সুলভ হাসি টুকুর সম্প্রতি অভাব দেখিয়া কালী বিস্মিত হইল। মর্ম্ম পীড়িত হইয়া তাঁর কোলের কাছে ঘেঁসিয়া বসিল। বড় দুঃখেও হাসিয়া নিস্তারিণী মায়াবী মেয়েটার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন।

আদর পাইয়া কালী সইমার হাতে হাত রাখিল। সে বুঝিল উদ্বেগের বিশেষ কিছু কারণ ঘটিয়াছে। অতএব পুনশ্চ সইমাকে আগ্রহে জিজ্ঞাসার উপর জিজ্ঞাসা করিল, —বাবাকে এখন ডাকতে পাঠালে কি জন্যে?

নি। বিয়ের ভারি একটা কথা আছে মা!

কা। তা কনো দাদাকে পাঠালে কেন? বাবা এখন আহ্নিকে বসেচে, মোছনমান ডাক্‌লে কি আর রক্ষে আছে বাছা! আমায় কেন বলনি সইমা?

এই বলিয়া কালী সইয়ের দিকে ফিরিয়া তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিল—ফিরে এসে কাপড় কাচ্‌তে যাবে। তখন ছুটিয়া আপনার বাড়ী গেল। আহ্নিকের ঘরে পিতা শালগ্রাম শীলা, তাম্রকুণ্ড, পদ্মাসন এবং পুষ্প-চন্দন ও গঙ্গোদক সম্মুখীন হইয়া দেবার্চ্চ-

নায় নিমগ্ন ছিলেন। সে সময়ে সে গৃহে আর কাহারও প্রবেশের অনুমতি ছিল না। কিন্তু কন্যা বিধি নিষেধের ধার ধারে না। যা কিছু ভয় মাকে, বাপের বড় আদরের মেয়ে। কাজেই তিনি আহ্নিকের দেরি দেখিয়া ধূপদান লইয়া পড়িলেন এবং পাখা করিয়া ধূমে ঘর আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম বুঝিলেন কিছু একটা মতলব আঁটিয়া মা লক্ষ্মী তাঁহাকে ছলনা করিতেছেন। সহজে একটু শীঘ্র আজ্ আহ্নিক না সারিলে চলিতেছে না। অতএব তিনি সত্বর হইলেন।

পুষ্পাধারে ফুল বিল্বপত্রের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও বাবাকে শিথায় নির্ম্মাল্য বাঁধিতে দেখিয়া কালীর মুখ প্রফুল্ল হইল। বুঝিল কৌশলটা নিষ্ফল হয় নাই। কিন্তু তবু দুষ্ট মেয়ে বাপের মন বুঝিবার জন্য কথা পাড়িল। মাথা নাড়িয়া ডাকিল, "বাবা!"

"কেন গো মা জননী"।

কা। এত শিগ্‌গির যে তোমার আহ্নিক হয়ে গেল, আদ্ধেক ফুল বিল্লিপত্তর থাক্‌তে থাক্‌তে?

সা। আমি ভাব্‌লাম মা লক্ষ্মীর কিছু একটা দরকার আছে—নয় গো?

কা। (হাসিয়া) সত্যি বাবা সইমা তোমায় একবার ডাক্‌চে, কি একটা ভারি কথা আছে। বাগ্‌দী মা পুরো দাদার বাড়ীতে কি শুনে এয়েচে, শুনে সইমার চোক ছল ছল করচে!

এই বলিয়া কন্যা নিজে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দণ্ডায়মান পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। কাষ্ঠপাদুকা পরিহিত, চন্দন চর্চ্চিত নামাবলীধারী সার্ব্বভৌম মহাশয় প্রসন্ন মনে মুগ্ধের ন্যায় চলিলেন। বাটীর বাহির হইতে না হইতে কি একটা কথার জন্য একবার গৃহিণী সম্ভাষণে যাওয়ার ইচ্ছা হইল।—"তোমার গর্ভধারিণীকে একটা কথা বলে আসি" বলিয়া পশ্চাৎপদ হইতে চাহিলে কন্যা মহা আপত্তি করিয়া বসিল। অগত্যা তিনি চলিলেন।

এদিকে দুঃখীরামের নির্দ্দেশানুসারে জমীদারের লোকজন কনের বাড়ীতে আসিয়া হাজির। সুতরাং সার্ব্বভৌম মহাশয় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে ফুলেদের বহির্ব্বাটী লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল, পুরোহিত মহাশয় বিস্মিত হইতেছিলেন—বিবাহের একদিন পূর্ব্বে বরযাত্র আসাটা কি শাস্ত্র সঙ্গত না লৌকিক ব্যবস্থা? শেষে স্মার্ত্ত পণ্ডিতের স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন দ্বিধা বোধ না হউক, আত্ম স্মৃতি শক্তিকে বিশ্বাস ঘাতিনী মনে হইতে লাগিল। ভাবিলেন হয়ত আজই বিবাহের দিন, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই মহাভাবনায় নিমগ্নাবস্থায় সার্ব্বভৌম মহাশয়কে যাহারা প্রণাম করিয়াছিল, তাহারা প্রতিদানে আশীর্ব্বাদ লাভে বঞ্চিত হইয়াছিল। প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি আপনাকে অন্দরের প্রবেশ পথে কন্যার আকর্ষণ বিরহিত অবস্থায় যখন দেখিলেন, তখনও লোকে প্রণাম করিতেছে। অপ্রতিভ হইয়া তাহাদিগকে "জয়োস্তু"

বলিতে না বলিতে আবার সার্ব্বভৌমকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ কন্যার পশ্চাৎবর্ত্তী হইতে হইল। বাপকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া কালী সইমাকে খবর দিয়া আসিয়াছিল। বাপের বসিবার আসনও নিজে বিছাইয়াছিল। সার্ব্বভৌম আসন গ্রহণ করিলে নিস্তারিণী গৃহমধ্যে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। ফুলকে প্রণাম জানাইতে শিখাইয়া দিলেন, কিন্তু তাহার ভারি লজ্জা করিতে লাগিল। কালী বলিল "বাবা সইমা তোমায় নমস্কার করেচে।"

সা। জয়োস্তু। বিবাহের দিন কি অদ্য স্থির হয়েচে? আমার যেন স্মরণ হয়, আগামী কল্য ত্রয়োদশীতে শুভ দিন। মালক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করতো তোমার সইমাকে।

সইমাকে হাসিতে দেখিয়া কালীও হাসিল। আপনা হইতে বলিল,—বাবা তুমি দেখেছ দিন, সই মা তার কি জানে? তুমি ত কালকের কথাই বলেছিলে গো!"

পুরোহিত কাজেই কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। একটু পরে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—"একটা ব্যাপার দেখে আমার স্মৃতি শক্তিটা কথঞ্চিৎ আচ্ছন্ন হয়েছিল, বাহিরে বিস্তর লোক দেখ্‌চি, তারা সব বরপক্ষীয়। গ্রামে বিবাহ হলে কি লোকাচার মতে এক দিন পূর্ব্বে বরযাত্র আসার ব্যবস্থা?

নিস্তারিণী তখন কালীকে দিয়া সকল কথা বলাইলেন। শুনিয়া সার্ব্বভৌম একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। বলিলেন "এরূপ রাক্ষসের ব্যবহার ওই পামরটারই শোভা পায়। বলিতে কি, এ সম্বন্ধের কথায় আমার তেমন মত ছিল না। আহা কেদার ভায়া মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি——ওদের উপর তাঁর যৎপরোনাস্তি বিরাগ ছিল। তা আমি বিবেচনা করলাম কি যে মেয়েটী গ্রামেই থাক্‌বে, জামাতাটীও দিব্য ছেলে, কাজেই আর আপত্তি করে তোমার সইমাকে মনঃক্ষুণ্ণ করি নাই। কিন্তু কি এ ব্যাপার! পাষণ্ডকে দুকথা শুনিয়ে দিয়ে এ ঘোর অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই কর্ত্তব্য। এখুনি আমি চল্‌লাম।"

নিস্তারিণী বলাইলেন যে সেটা ভাল হয় না। এখন এই উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধারের একটা পরামর্শ করা চাই। এখুনি এখুনি জিনিস পত্তর পাওয়া যায় কোথা?

সার্ব্বভৌম মুস্কিলে পড়িলেন। স্মৃতিশাস্ত্র সাগর মন্থন করিয়া দেখিলেন কোন ব্যবস্থা উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রযুজ্য নহে। সাংসারিক ব্যাপারে গৃহিণী তাঁহার কর্ণধার, নিজে সে সব কিছু বুঝেন না। কাজেই পুরোহিত ঠাকুর নীরবে চিন্তা করিতেছিলেন।

কালী সইমার শিক্ষামত একটু পরে বলিল, "বাবা, সইমা বল্‌চে পুরোদাদার বাবার কাছেই যাওয়া ভাল, কিন্তু কোন ঝগড়ার কথা বলা হবে না। লক্ষ কথা না হলে বিয়ে হয় না,—সব তাতে কনেরই হার। তুমি নরম করে যদি সইয়ের শ্বশুরকে দুটো কথা বল, তাতে কিছু ফল হতে পারে।"

সা। মূর্খস্য লাঠ্যৌষধং। নরম কথা বলে মহেশ্বর ঘোষকে ভোলান কি সহজ কথা গো!

কা। সইমা বলচে, এই মাত্তর বল যে এ বিপদে তিনি রক্ষে করুন। জিনিস পত্তর তিনি সব আনিয়ে দিন, দাম যা লাগ্‌বে, সইমা দেবে। নইলে এখুনি এখুনি যোগাড় হয় কেমন করে?

সা। হাঁ এ কথাটা আমারও লাগ্‌চে ভাল। মহেশ্বরকে বশীভূত করবের মন্ত্রৌষধি যদি কিছু থাকে ত সে রৌপ্যখণ্ড। আচ্ছা মালক্ষ্মী সেই কথাই ভাল—আমি চল্‌লাম। উত্তর যা পাই বলে পাঠাব এখন তোমার সইমাকে। রাম রাম এমন চণ্ডালের সঙ্গেও মানুষে কুটুম্বিতা করে!”

সার্ব্বভৌম আসন ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে বহির্ব্বাটী হইতে ফনু সেখ আসিল এবং খবর দিল, নায়েব মোশাইদের চাকর “দুক্খীরাম” কি কথার জন্যে এসেচে! কৌতূহলী হইয়া পুরোহিত মহাশয় পুনশ্চ ভাল করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন, এবং তাহাকে ডাকাইতে পাঠাইলেন।

দুঃখীরাম নায়েব মহাশয়ের যথোপযুক্ত ভৃত্য। প্রভুর সেবাতেই বল আর প্রজার রক্তশোষণ করিয়া টাকা আদায় করিতেই বল, সে একরূপ সিদ্ধ বিদ্যা। সার্ব্বভৌম মহাশয়কে দেখিয়াই সে গলায় গামছা বেড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল এবং পরম ভাল মানুষের মত দাঁড়াইয়া রহিল। স্মার্ত্ত পণ্ডিত দুঃখীরামকে চিনিতেন, অতএব বক ধার্ম্মিকের উপাখ্যান স্মরণ করিতেছিলেন।

দুঃখীরাম করযোড়ে বলিল, “নায়েব মোশাই মা ঠাকুরাণীর কাছে মোরে একবার পেটিয়ে দেলেন। এই যে সব লোকজোন এদের খোরাকী যদি ঘরে না থাকে, তবে বাবু বলেন তিনি পেটিয়ে দেবেন—এর পরে হিসেব করে দাম দেলেই চল্‌বে।”

সার্ব্বভৌমের মুখে রক্তিম রাগ দেখা দিতেছিল। ঘরের ভিতর হইতে দেখিয়া নিস্তারিণী প্রমাদ গণিলেন এবং তাড়াতাড়ি কালীকে দিয়া বলাইলেন—সেই কথাই ভাল। বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন বলিয়া তিনি বৈবাহিক মহাশয়কে ধন্যবাদের ভাগ পাঠাইতেও ভুলিলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বৈশাখের শুক্ল ত্রয়োদশী—রজনী সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনী। বাঙ্গলার পল্লীগ্রামের শোভা পূর্ণ মাত্রায় যদি দেখিতে চাও, এই কৌমুদী প্রফুল্ল নিশি বাসরে আসিয়া দেখ। বৃক্ষ লতা কিসলয় স্তবকে, ফল পুষ্পে চন্দ্র রশ্মি মাখিয়া বিহ্বল, দীর্ঘিকা হৃদয়ে সেই শীত রশ্মি ধরিয়া বিহ্বল, কোকিল, বউ কথা কও, পাপিয়াও যে গাহিয়া গাহিয়া বিহ্বল, সেও সেই সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাসে। অনন্ত সৌন্দর্য্যের গানে সংসার পূরিয়া উঠিতেছে।

পুরন্দর ফুলকুমারীর আজ্ বিবাহ—হরিশপুরে জনকল্লোল আনন্দময়। জন সমাগমে প্রকৃতির কিঞ্চিৎ বিকৃতি ঘটে। বাদ্যভাণ্ডের অত্যাচারে পাখীরা সব নীরব,

আতস বাজীর ধূমে জ্যোৎস্নাময়ী প্রকৃতির সে রমণীয় সঙ্কোচের ভাবটুকু কতকটা পৌরুষভাবে পরিণত। হউক, তথাপি যামিনী সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনী। বিশেষ এমন সুন্দর রাত্রে "রোশনাই" করিতে গিয়া যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোৎস্না-শোভা মাটী করিয়া ফেলা হয়, উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। হিসাবী ঘোষ মহাশয় কিছু সে হিসাবে যান নাই কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, আলোর খরচ তাঁহার বিস্তর বাঁচিয়া গিয়াছিল।

কাজেই গৃহিণী জগদ্ধাত্রীর মনটা তেমন ভাল ছিল না। এদিকে রাত্রি প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল, দুই প্রহরে বিবাহের লগ্ন, ঘোষ মহাশয় মহা তাড়া লাগাইয়া দিলেন। পুরন্দরকে সাজাইয়া গোছাইয়া মার মন উঠে না—পোসাক অলঙ্কার কিছুই তাঁহার পসন্দমত হয় নাই। অতএব "শীগ্‌গির সার" দুইবার বলিতে গিয়া ঘোষজা ভার্য্যার রক্তিম লোচনের তীব্র কটাক্ষ ও সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস যুগপৎ উপার্জ্জন করিলেন। কন্যা মোক্ষদা পিতার কিছু পক্ষপাতিনী, মার এত বাড়া বাড়িটা তাঁর ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু মাতার অভিমানের অশ্রু অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও রুদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয় ভাবিয়া সুবুদ্ধি মেয়ে আপনার বক্তব্য সম্প্রতি সংযম করিলেন। পুরন্দর খুঁটি নাটি স্ত্রী আচারের জ্বালায় তিক্ত বিরক্ত হইয়াছিল, ক্ষুধার জ্বালাও কিছু কম নহে, অতএব বেশ ভূষার অতিরিক্ত পারিপাট্য সমাধা করিবার ধৈর্য্য তাহার রহিল না——কাজেই জগদ্ধাত্রী ছেলেকে ছাড়িয়া দিলেন এবং প্রথা মত তাহাকে কোলে লইয়া বহির্ব্বাটীতে চৌপালায় উঠাইয়া দিতে গেলেন। বিজ্ঞ প্রতিবেশিনী ও কুটুম্বিনীরা অর্দ্ধ চক্রাকারে চৌপালা বেড়িয়া দাঁড়াইলেন এবং জগদ্ধাত্রীকে অনুরোধ করিলেন, ছেলের মুখে স্তন্য দিয়া জিজ্ঞাসা করা হউক—"কোথায় চল্‌লে বাবা?" এ পর্য্যন্ত কোন বিঘ্ন ঘটিল না, কিন্তু উত্তর দাতা পুরন্দর তেমন সহজে তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিল না। সবাই মেলিয়া যত বলে, "বল্ পুরন, মা তোমার দাসী আন্‌তে চল্‌লাম," পুরন তত হাসিয়া আকুল। আদর করিয়া কেউ বলে পুরন, কেহ পুরু, কেহ পুরো, কেহ বর, কিন্তু পুরনের জবাব সেই হাসি। শেষে দিদি মোক্ষদা ভাইয়ের ধৃষ্টতা সহিতে না পারিয়া রুক্ষস্বরে "পুরো" এবং "ভারি দুষ্টু" বলার লোভ সামলাইতে পারিলেন না। অমনি ভাই রাগিয়া গেল এবং তীব্র-স্বরে "ছুঁড়ি, তোর বরকে বল্‌গে বল্‌তে" প্রভৃতি সাধু ভাষায় ভগিনীর সম্মান রক্ষা করিল। ইহার ফল এই হইল যে স্বয়ং ঘোষ মহাশয় আসিয়া "লক্ষণের সময়ে"ও পুরন্দরকে কিঞ্চিৎ অনুযোগ করিলেন। এইরূপে জগদ্ধাত্রীর রুদ্ধ অশ্রু প্রবাহ সহসা উথলিয়া উঠার অবসর পাইল এবং আমরা খবর রাখি, সে রাত্রে তিনি জলগ্রহণ করিলেন না।

এদিকে কনের বাড়ীতে বরযাত্রদের অভ্যর্থনার জন্য যথোচিত আয়োজন হইয়াছে। অধিকাংশ বরযাত্র স্বগ্রামবাসী হইলেও কন্যা পক্ষের প্রতি তাঁহাদের সেই অহি-নকুল সম্বন্ধ। অতএব এপাড়ার লোক ভুলিয়াও একবার দিনের বেলায় কন্যা পক্ষের সহা-

য়তা করিতে আসে নাই। নিস্তারিণী কিন্তু লোকাভাব জানিতে পারিলেন না। সার্ব্বভৌম মহাশয় তাহার যথেষ্ট বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। আর প্রতিবেশীরা ছোট বড় সকলেই আপনার মত ভাবিয়া দিনমান পরিশ্রম করিতেছিল। লুচির ঘরে অনেকগুলি আবশ্যক অনাবশ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল। কেননা গব্য রসের সার যে ঘৃত তাহার সৌরভ মিঠা কড়া তাম্রকূট গন্ধে মিশিয়া সে স্থান "অতিসেব্য" করিয়া রাখিয়াছিল। নিতান্ত নীরবে যে লুচি প্রস্তুত ও তাম্রকূট সেবন চলিতেছিল, ইহা কেহ ভাবিবেন না। মাঝে মাঝে হাস্য লহরী উথলিয়া উঠিতেছিল এবং কন্যার শ্বশুর মহাশয়ের ব্যয় কুণ্ঠতার নানা কাহিনী জনে জনে মহা উল্লাসের সহিত বিবৃত করিতেছিলেন।

অন্দর মহলে আরও জাঁক। রক্ত সম্বন্ধে বলিতে গেলে নিস্তারিণীর ত্রিকুলে কেহ বড় ছিল না, কিন্তু আজ আত্মীয় অনেকগুলি জুটিয়াছিল। তালিকা এইরূপ—পাঁচ কড়ির মা নিস্তারিণীর সইমার ভাগিনের বধূ, কামিনীর পিসি তাঁহার ননদের মাতা, ভব সুন্দরী পিত্রালয়ে প্রতিবেশিনী কন্যা, মাতু এবং জগদম্বা বেগুন ফুলের ভাইঝি। এহেন "সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক কুটুম্বিতার আদর অপেক্ষা করিতে কর্ত্রীঠাকুরাণীর দিনমান কাটিয়াছে। বিবাহের খুঁটিনাটি কাজ কর্ম্মের ভার তিনি অনেকাংশে কালীর মা ও পিসিদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কাজে কর্ম্মে মন নিবিষ্ট থাকিলেও অন্য দিনের চেয়ে আজ্ স্বামীর স্নেহ প্রফুল্ল মুখ খানি বারম্বার নিস্তারিণীর মনে পড়িতেছিল। বারম্বার আহ্নিকের ঘরে গিয়া স্বামী-পাদুকা দর্শন করিতে করিতে তিনি চক্ষের জল মুছিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু কুটুম্বিনীবর্গের দাবি দাওয়াতে শোকের ভাব স্থায়ী হইতে পাইতেছিল না। এই ভাবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটিল।

সন্ধ্যার পর মেয়েদের কনে সাজাইতে অনেকক্ষণ গেল। নিস্তারিণীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু নানা কাজে বারম্বার তাঁহাকে উঠিয়া যাইতে হইতেছিল। কালী একবারও সইয়ের কাছ ছাড়া হয় নাই। এক বৃন্তে তারা দুটি ফুল—আজ্ বুঝি ছাড়াছাড়ি সুরু হইবে। তাই আহ্লাদের ভিতরও দুই সইয়ের মর্ম্মতল হইতে যেন রোদন ধ্বনি উঠিতেছিল।

শেষে বর আসিল, শুভ লগ্নে বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। কন্যা দানের সময় স্বামীকে স্মরণ করিয়া নিস্তারিণী রোদন সম্বরণ করিতে পারেন নাই,—পুরোহিত সার্ব্বভৌমও চোকের জল মুছিতেছিলেন। যাঁহারা কেদার নাথকে জানিতেন, সকলেই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন। ফুলকুমারী এইরূপে বিষাদ পরিবৃত হইয়া স্বামীর সঙ্গে শুভদৃষ্টি বিনিময় করিল। তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—কেননা সেই বৃক্ষতলে সরোবর তীরে মুগ্ধাবস্থায় মৃত পিতার যে কণ্ঠ সে দিন শুনিয়াছিল, এ মুহূর্ত্তে আবার তাহাই শুনিল। কে জানে বিধাতার কেমন ইচ্ছা, এক এক ক্ষেত্রে পরিণাম এই ভাবে পূর্ব্বাহ্নেই সূচিত হইয়া থাকে। কে ইহার রহস্য ভেদ করিবে? ক্ষুদ্র আমরা পতঙ্গ, বালকের ন্যায় অজ্ঞেয় দৈব শক্তির যথেচ্ছ ক্রীড়ার সামগ্রী মাত্র।

মেঘদূত।

কত দিন নীরবে হৃদয়ের জ্বালা বহন করিয়া আষাঢ়ের প্রথম দিবসে তৃষিত নেত্রে বিরহী যখন নবীন মেঘপ্লাবিত আকাশের পানে চাহিয়া দেখে, তখন তাহার বিরহকাতর হৃদয়ে না জানি কোন্ স্মৃতিময়ী মায়াপুরীর সুখ দুঃখের কথা উদয় হয়! সারা বৎসরের মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম মেঘে বিরহের এমন কি স্মৃতি আছে যে, এতদিন প্রবাসের তীব্র যন্ত্রণায় যাহার বিরহ সহিয়া আসিতেছি, আজ সহসা তাহার জন্য প্রাণ একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠে—আজই তাহার বিরহ অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। কি আছে কে জানে, কিন্তু আষাঢ়ে বিরহকে কেহ উপেক্ষা করিতে পারে না; প্রাবৃটের নবীন মেঘের সঙ্গে সঙ্গে বিরহীর হৃদয়েও প্রিয় বিরহ জাগিয়া উঠে। বিরহিণীরা প্রিয়তমের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথপানে চাহিয়া থাকেন। প্রবাসক্লিষ্ট প্রিয়তমেরা প্রবাসের বিজন অরণ্যে বসিয়া মেঘকে বিরহিণীর নিকট সংবাদ লইয়া যাইতে বলেন। মেঘই বর্ষার বিরহে প্রাণ।

অন্য ঋতুর বিরহে দিন কাটিয়া যায়, কিন্তু বর্ষায় দিন আর কাটে না। মুহূর্ত্তকে তখন যুগান্তর বলিয়া মনে হয়—বিরহের বন্ধনে সময় যেন গতি শক্তি হীন হইয়া পড়ে। কুবেরশাপে অভিশপ্ত যক্ষ তাই বুঝি আষাঢ়ের প্রথম দিনে রামগিরিশিখরে শ্যাম মেঘ দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছে না—তাহার মনে সম্মুখের দীর্ঘ বিরহ দুঃখ উথলিয়া উঠিতেছে। এক বৎসর প্রবাসের কয়মাস মাত্র অতিবাহিত হইয়াছে, যক্ষের শরীর এমনি শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রকোষ্ঠ হইতে বলয় খসিয়া পড়ে। এই দীর্ঘবর্ষা প্রিয়ার সংবাদ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া সে জীবন ধারণ করিবে কিরূপে? নবপল্লবসজ্জিত বসন্তের জ্যোৎস্নাময়ী নিশির দারুণ বিরহও প্রণয়িনীর সংবাদ বিনা কাটান যায়, কারণ মিলনেচ্ছার প্রভাবেই বিরহ তখন গুরুতর, তাহাতে বিভীষিকার ছায়া নাই; কিন্তু এই দীর্ঘ অন্ধকার বর্ষায় বিরহিণীর কথা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকা অতীব দুরূহ। যক্ষের বুক ফাটিয়া যাইতেছে যে, বিরহিণী কান্তার এই দীর্ঘকাল আশাপথ চাহিয়াই দিন কাটিবে, কিন্তু যক্ষ প্রবাস হইতে ফিরিতে পারিবে না।

চিরদিন প্রবাসের তাপ ভোগ করিতেও যক্ষ কাতর নহে, যদি এই বর্ষার সময় প্রিয়তমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পায়। কিন্তু কি করিবে, কান্তাদর্শনস্পৃহা যতই বলবতী হোক্ না, তাহাকে গুমরিয়া থাকিতে হইবে; কুবেরের অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নহে। যক্ষ ভাবিল, দর্শনলাভ কপালে না ঘটে একবার মেঘের দ্বারা প্রিয়তমার নিকট সংবাদ প্রেরণ করি, তবুও তাহার ব্যথার কিছু উপশম হইবে। এই স্থির করিয়া যক্ষ একদিন মেঘকে দৌত্যকার্য্য করিবার জন্য ধরিয়া বসিল। মেঘ দূত হইল।

কালিদাসের মেঘদূতে ঘটনা এইটুকু। কুবেরের শাপে অভিশপ্ত এক জন যক্ষ মেঘের দ্বারা কান্তার নিকটে সংবাদ পাঠাইতে চাহে। কিন্তু ঘটনা এইটুকু বলিয়া মেঘদূত উপেক্ষণীয় নহে। মেঘদূতে ঘটনার আর আবশ্যক নাই। কারণ, ইহা নাটক অথবা উপন্যাস নহে যে, বিরহ নিশ্বাসের মর্ম্মস্পর্শিত্ব প্রকাশ করিবার জন্য অসংখ্য সখীর অশ্রুসিক্ত সান্ত্বনাবাক্যের সাহায্য লইতে হইবে। মেঘদূত গীতি কাব্য—কালিদাস ইহাতে বর্ষাকালে বিরহের প্রভাব দেখাইতেছেন। বাহ্য জগৎ অন্তরের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে, ইহা দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য তাঁহার সফলও হইয়াছে। যক্ষের মুখ দিয়া তিনি মেঘকে যে কথা বলাইয়াছেন, তাহার ছত্রে ছত্রে বিরহ জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। ভাবের সহিত সম্পর্কশূন্য একটী কথাও তাঁহার লেখনীমুখে বাহির হয় নাই। ভাবের ঠিক রাগিণী ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার কাব্যের এত গৌরব।

কালিদাস অপেক্ষা মানব-চরিত্রাভিজ্ঞ গভীর চিন্তাশীল অনেক কবি আছেন স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার মত বিরহের কবি আর কেহ আছেন কি না সন্দেহ। তিনি যেন বিরহীর হৃদয়ে বসিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। বিরহ ঔৎসুক্যের কোন স্থানই তাঁহার অপরিজ্ঞাত নহে। কালিদাস বুঝিতেন, মেঘকে সংবাদ লইয়া যাইতে বলা সচেতন প্রাণীর পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে, কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও যে তিনি মেঘকেই যক্ষের সংবাদবাহী ঠাহরাইয়াছেন, তাহার কারণ আছে। যক্ষ বিরহে এমনি কাতর হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার চৈতন্য ভ্রংশ হইয়াছে বলা যায়। যক্ষের কতকটা উন্মাদাবস্থা। তাই সে মেঘকে ধরিয়াছে—হে মেঘ, তুমি আমার সংবাদ লইয়া যাও। কাজটা বেহিসাবী সন্দেহ নাই, কিন্তু কালিদাস যক্ষকে পাকা হিসাবী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন না। সেই জন্য এই বেহিসাবী কাজেই মেঘদূতের কবিত্ব।

মেঘদূত বিরহের কাব্য; এবং বোধ হয়, বিরহের শ্রেষ্ঠ কাব্য। জয়দেব বল, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বল, বিরহজ্বালা অনেকেই প্রকাশ করিয়াছেন, প্রকাশ করিতে সক্ষমও হইয়াছেন; কিন্তু কালিদাসের মত সংক্ষেপে অথচ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে বিরহীকে কেহ বাহির করিতে পারিয়াছেন বোধ হয় না। মেঘদূতের প্রথম গুটী কয়েক শ্লোকেই কালিদাস যক্ষের অবস্থা যথেষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অনেক কথা বলেন নাই বটে, কিন্তু এক একটী কথায় তাঁহার বলা হইয়াছে অনেক। যক্ষের শরীরের অবস্থা তিনি এক কথায় বলিয়াছেন—কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ। কনকবলয় কথাটীতে যক্ষ যে কুবেরের অনুচর তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। পরের শ্লোকে তিনি মেঘ সন্দর্শনে বিরহীর মনের ভাব লিখিয়াছেন; আর, একটী বিশেষণে যক্ষের সমস্ত যন্ত্রণা প্রকাশ করিয়াছেন—অন্তর্বাষ্পঃ। তাহার পর যক্ষ যখন মেঘের স্তব করিতেছে, তখন বেশ

বুঝা যায় যে যক্ষ আপনার কাজ ভুলে নাই, এদিকে জ্ঞানহারা হইলেও কিরূপে আপনার কার্য্য উদ্ধার করিতে হয় জানে। মেঘকে সে কেমন গায়ে হাত বুলাইয়া বলিতেছে, "যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।"

যক্ষের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা কালিদাস এইটুকুর মধ্যেই একরকম সব ব্যক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে যক্ষ মেঘকে অলকার পথের কথা বলিয়া দিতেছে, তাহা না হইলে প্রিয়ার নিকট সন্দেশ পঁহুছিবে কিরূপে ? পথের বর্ণনার মধ্যে মধ্যে যক্ষের ভাব বেশ ধরা দেয়। সে বর্ণনা বিরহীর মতই হইয়াছে। বর্ষাও তাহার মধ্যে এমনি পরিস্ফুট যে, পড়িতে পড়িতে চোখের সম্মুখে কদম্ব ফুটিয়া উঠে, ধরণী হইতে বৃষ্টিবারিসিক্ত একপ্রকার স্নিগ্ধ গন্ধ বাহির হইতে থাকে, চারিদিকে আনন্দোৎফুল্ল ময়ূর ময়ূরী বর্ষার তালে তালে নাচিয়া উঠে। পথের বর্ণনা করিতে করিতে ফাঁক পাইলেই যক্ষ বিরহ কাতরতা প্রকাশ করিয়াছে। অথবা, অজ্ঞাতসারে তাহার হৃদয়ের কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে বোধ হয়। কিন্তু যাহাই হৌক, কালিদাস যক্ষকে বর্ণনার স্রোতের মধ্যেও বিরহী রাখিতে পারিয়াছেন, মেঘদূতের সকল বর্ণনার মধ্যেই বিরহের ভাবের বরাবর কেমন একটা স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

মেঘকে যক্ষ বলিতেছে, "কঃ সন্নদ্ধে ত্বয্যুপেক্ষেত বিরহবিধুরাং জায়াং।" এখন কি আর তাহাকে উপেক্ষা করা যায় ? তাহার পর বুঝাইতেছে—তুমি সংবাদ লইয়া যাও' অনুকূল বায়ু তোমার সহায় হইবে, চাতকেরা গান গাহিবে, কোন সুখেরই ক্রটী হইবে না। যাও ভাই, তুমি গিয়া সেই দিবসগণনতৎপরা, কেবল আমার প্রত্যাগমনাশায় জীবিতা বিরহিণীকে সান্ত্বনা দাও; নহিলে সে কি আর বাঁচিবে ? পথে, ঐ রঘুপতি পদাঙ্কিত শৈলকে আলিঙ্গন করিয়া তোমারও বিরহ-যাতনার উপশম হইবে। তাহার পর কত গিরি উল্লঙ্ঘন করিয়া, কতসভ্রূভঙ্গ নদীর অধর পানে পরিতৃপ্ত হইয়া, উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইবে। উজ্জয়িনী না দর্শন করিলে জীবনই বৃথা। বিরহ-কৃশদেহ সিন্ধুর কার্শ্য ঘুচাইতেও চেষ্টার ক্রটী করিবে না। যাও মেঘ আরও যাও। রজনীতে সূচিভেদ্য অন্ধকারে রুদ্ধালোক রাজপথে বিদ্যুৎ প্রকাশ করিয়া প্রিয়ভবনাভিমুখগামিনী যোষিৎদিগকে তুমি পথ দেখাইয়া দিও, কিন্তু তোমার গম্ভীর গর্জ্জনে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিও না। যাও মেঘ, আরও যাও। যাও, হিমাচল ছাড়াইয়া, মানস-সরোবর পার হইয়া যাও। কৈলাস গিরিবক্ষে জ্যোৎস্নাময়ী অলকার রমণীয় শোভা দেখিয়া নয়ন সার্থক কর।

এইবারে যক্ষ অলকার বর্ণনা করিতেছে; অলকা বিলাসের লীলাক্ষেত্র। না হইবেই বা কেন, ধনপতির অনুচরেরা বিলাসী হইবে না ত হইবে কে ? কালিদাস যক্ষকে বরাবর এই বিলাসের লীলাক্ষেত্রজাত রাখিয়াছেন। যক্ষের কথায় বিলাস লালসা সুব্যক্ত। অলকার বর্ণনা পড়িলেই আমরা বুঝিতে পারি, কালিদাস যক্ষের মুখে যে

সকল কথা বসাইয়াছেন, তাহা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে—তাঁহার যক্ষের চিত্র কতদূর নিখুঁৎ। যক্ষকে বিলাস প্রিয় দেখিতে যাঁহারা কাতর, তাঁহারা কালিদাসকে দোষ দিতে পারেন। কিন্তু বুঝা উচিত, কালিদাস আদর্শ মনুষ্য খাড়া করিবার চেষ্টা করেন নাই, যক্ষের প্রকৃত চিত্র আঁকিয়াছেন মাত্র। আরও মনে রাখিতে হইবে, মেঘদূত কালিদাসের সৃষ্টি বটে, কিন্তু যক্ষ তাঁহার সৃষ্টি নহে।

বায়রণের চাইল্ড্ হ্যারল্ড্ একটী বিলাসীর চিত্র—বায়রণের নিজের সৃষ্টি। চাইল্ড হ্যারল্ডকে ইচ্ছা করিলে বায়রণ আর এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছাঁচে গড়িতে পারিতেন। কিন্তু তাহার তাহাতে আবশ্যক কি? তিনি ত বিলাসীই আঁকিতে চাহেন। শিব গড়িতে বানর গড়িলে কবি নিন্দার্হ সন্দেহ নাই, কিন্তু যেখানে বানর গড়াই উদ্দেশ্য, সেখানে নিন্দা কিসের? তবে উদ্দেশ্যের কেহ নিন্দা করেন, করুন—আমাদের কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। কালিদাসের যক্ষ বিলাসপ্রিয় বটে, কিন্তু চাইল্ড হ্যারল্ডের মত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি নহে। আর এরূপ হইলেও কালিদাস যক্ষকে আপনার ইচ্ছানুরূপ ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতে পারেন না। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যক্ষ তাঁহার সৃষ্টি নহে। তাঁহার নিকট আমরা যক্ষের প্রকৃত চিত্র দেখিবার আশা করি, যক্ষকে বাল্মীকি মুনির মত দেখিতে চাহি না।

মেঘদূতে ছন্দের কেমন একটী গম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখা যায়। বর্ণনার সঙ্গে ছন্দের বেশ মিল খাইয়াছে। ছন্দের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কথার সঙ্গে এইরূপ প্রাণে প্রাণে মিলন হইয়াছে বলিয়াই মেঘদূত এত উচ্চ অঙ্গের কাব্য। তাহাতে অনুপ্রাস আছে, কিন্তু অনুপ্রাসবাহুল্যে কাব্যের প্রধান সৌন্দর্য্য ভাবের কোথাও হানি হয় নাই। এক কথার পাশাপাশি দুইবার ব্যবহার আছে, কিন্তু ভাব সুব্যক্ত হইয়াছে বৈ বিরক্তিকর পুনরুক্তি কখনও হয় নাই। বর্ণনা যথেষ্ট আছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটী নাই; যাহা আছে, তাহা স্বভাবের সুন্দর ছিত্র। বাস্তবিক, মেঘদূত পড়িতে পড়িতে আষাঢ়মাস হইয়া আসে, আকাশে নবীন মেঘ দেখা দেয়।

আমাদের ইচ্ছা ছিল, মেঘদূত হইতে গুটীকতক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দি, কিন্তু কোনটিকে রাখিয়া যে কোনটী উঠাইয়া দিব, তাহা ঠাহরাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। অগত্যা এ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিতে না পারিলেও কালিদাসের ভাব প্রকাশক কথানির্ব্বাচন শক্তির পরিচয় স্বরূপ দুই একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। উত্তর মেঘের প্রথমেই সঙ্গীত-পূর্ণা অলকার বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন, "সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।" মৃদঙ্গ বাজিতেছে—তাহার শব্দ কিরূপ? না, স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর। কথাগুলি এমনি বসিয়াছে যে, শুনিলেই মৃদঙ্গধ্বনি মনে পড়ে। যেন মেঘগর্জ্জন হইতেছে। রঘুবংশের প্রথম সর্গে দিলীপের রথের গম্ভীর নিনাদ প্রকাশক এইরূপ একটী শ্লোক আছে,

"স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষমেকং স্যন্দনমাশ্রিতৌ।
প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিব॥"

এখানেও স্যন্দন কথাটীতে কালিদাসের ভাব প্রকাশক শব্দ নির্ব্বাচন শক্তির যথেষ্ট প্রকাশ হইয়াছে। অন্য কোনও প্রতিশব্দ বোধ হয় এমন কসিত না। আর স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষের ভাব প্রকাশত্বের ত কথাই নাই। সমস্ত শ্লোকটী গম্ গম্ করিতেছে। পূর্ব্ব মেঘে একস্থানে আছে, "ত্বন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিতবসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ।" ইহার মধ্যে বৃষ্টির ভাব কেমন জাগ্রত—কি যেন ঝম্ ঝম্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নিষ্যন্দ ও উচ্ছ্বসিত এই দুইটী কথা উঠাইয়া লইলে সমস্ত ভাবই যেন মারা যায়। নিষ্যন্দ শব্দে যেমন বৃষ্টির ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে, উচ্ছ্বসিত শব্দে সেইরূপ বসুধাগন্ধের ব্যাপ্তির ভাব অনুভব হয়। এইরূপ কালিদাসের ভাব প্রকাশক শব্দ নির্ব্বাচন-শক্তির পদে পদে পরিচয় পাওয়া যায়; এবং বোধ হয়, এই ভাবময় শব্দনির্ব্বাচনের জন্য তাঁহার কাব্যে এত সৌন্দর্য্য।

যক্ষের অলকা-বর্ণনা এমন পরিষ্কার যে, তাহার আলয় খুঁজিয়া লইতে মেঘের কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। তাহার পর যক্ষ বিরহিণীর বর্ণনা করিতেছে। সে বর্ণনায় কান্তার প্রতি যক্ষের প্রেম সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত। বাস্তবিক, সে বর্ণনা পড়িলে যক্ষের দুঃখে চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়। যক্ষ স্ত্রীর সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছে, "যা তত্র-স্যাদ্‌যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যের ধাতুঃ।" কান্তার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া যক্ষ বলিতেছে,

"তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাং।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশির মথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্॥"

মেঘদূতের এইখানকার শ্লোকগুলি বড়ই মধুর—ভাব প্রকাশক। বিরহীর বেদনা এইখানে বড় চমৎকার ব্যক্ত হইয়াছে। যক্ষ মেঘের নিকট হৃদয় খুলিয়া সকল কথা বলিতেছে, কিছুমাত্র সে গোপন রাখিতে চাহে না। যক্ষ বলিতেছে, তুমি যখন অলকায় গিয়া উপস্থিত হইবে, তখন হয়ত দেখিবে, প্রিয়া আমার বিরহকৃশ চিত্র আঁকিতেছে, কিম্বা আমার মঙ্গলের জন্য দেবতার নিকট যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছে। হয়ত দেখিবে, মলিন বসন উৎসঙ্গে বীণা রাখিয়া আমার নাম সংযুক্ত কোনও পদ গাহিবার চেষ্টা করিতেছে, নেত্রনীরে বীণার তন্ত্রী আর্দ্র। হয়ত দেখিবে, উদয়গিরি প্রান্তে কলামাত্রাবশিষ্ট চন্দ্রের মত তাহার দেহ বিরহে কৃশ হইয়া পড়িয়াছে, চোখের জলেই তাহার নিশিদিন কাটিয়া যায়। ভাই মেঘ! তুমি আমাকে বাচাল মনে করিতে পার, কিন্তু শীঘ্রই এ সকল তোমার প্রত্যক্ষ হইবে, দেখিবে, আমার বিরহে তাহার কি কষ্টে দিন কাটে।

প্রিয়াকে কি রূপে কি বলিতে হইবে, তাহাও যক্ষ বলিয়া দিল। মেঘ বলিবে, আমার দ্বারা তিনি বলিয়া দিয়াছেন,

"শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতম্
বক্তৃচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাম্ বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি নতে চণ্ডি! সাদৃশ্য মস্তি॥
ত্বামালিখ্য প্রণয় কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াম্
আত্মানম্ তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ॥"

তোমার তুলনা কোথাও পাই না; চিত্র আঁকিয়া যে তোমার মিলন সুখ অনুভব করিব, তাহাতেও বাধা, চোখের জলে দৃষ্টি আবৃত হইয়া আসে। প্রিয়াকে সান্ত্বনাও আছে। হে কল্যাণি, তুমি নিতান্ত কাতর হইও না, চিরসুখী বা চিরদুঃখী সংসারে কেহই নয়। নয়ন মুদিয়া এই কয় মাস কাটাইয়া দাও,

"পশ্চাদাবাং বিরহগণিতং তং তমাত্মাভিলাষম্
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণত শরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু॥"

জ্যোৎস্নাময়ী শারদীয়া নিশিতে আমাদের আবার মিলন হইবে।

কাব্যের শেষে যক্ষ মেঘকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে,

"ইষ্টান্ দেশান্ জলদ বিচর প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রী
মাভূদেবং ক্ষণমপি চতে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ॥"

যাও মেঘ, বর্ষায় সম্ভৃতশ্রী হইয়া অভিলষিত প্রদেশে বিচরণ কর, বিদ্যুতের সহিত তোমার যেন ক্ষণমাত্রও বিরহ না হয়। বিরহ-কাতরের হৃদয়ের আশীর্ব্বাদে মেঘদূত সমাপ্ত হইল। আমরা বিদায় গ্রহণ করি। প্রার্থনা এই যে, কালিদাসের সৌন্দর্য্যে আমাদের হৃদয় যেন প্রতিদিন নূতন নূতন আনন্দ লাভ করিয়া তৃপ্ত হয়—তাঁহার সৌন্দর্য্য আমরা যেন দিনে দিনে উত্তম রূপে উপলব্ধি করিতে পারি।

প্লেটো—টিমীয়স্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অন্যান্য দেবগণের বিষয় বলা ও তাঁহাদিগের উৎপত্তি অবগত হওয়া আমাদিগের সাধ্যাতীত, এবং এবিষয়ে পুরাকালের যে সকল লোক আপনাদিগকে দেববংশজাত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন তাঁহাদিগের বচন গ্রহণ করাই আমাদিগের কর্তব্য—কারণ

এই সকল লোক অবশ্য তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ দেবগণের সম্বন্ধে সত্য বৃত্তান্ত জ্ঞাত- ছিলেন ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহারা যেখানে তাঁহাদিগের পরিবারের আ- দিম বৃত্তান্ত বলিতেছেন মাত্র, সেখানে প্রমাণ অভাবেও প্রচলিত বিধি অনুসারে তাঁহা- দিগের বাক্য আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

প্লেটো ইতিপূর্ব্বে দৃশ্যমান দেবগণের (চন্দ্র সূর্য্যাদির) বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু যখন তিনি গ্রীকদিগের উপাস্য দেবগণের বর্ণনায় পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার উভয় সঙ্কট উপস্থিত হইল। এদিকে ঐ সকল দেবগণ কাল্পনিক বলিলে তাঁহার স্বজাতীয়েরা তাঁ- হার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবে, হয়ত বা সক্রেটিসের ন্যায় তাঁহাকে প্রাণ দণ্ড দিবে। অপর দিকে উহাদিগের অস্তিত্বে তাঁহার নিজের কোন বিশ্বাস ছিল না, সুতরাং বলিতে পারেন না যে তাহাদিগের অস্তিত্ব আছে। এই নিমিত্ত এই সকল দেবতাদিগের বিষয়ে তিনি উক্ত প্রকার অর্দ্ধব্যঙ্গোক্তি লিখিয়া গিয়াছেন। আইনে যাহা বিশ্বাস করিতে আমরা বাধ্য, প্রমাণ না থাকিলেও তাহা আমাদিগের সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে। সমুদয় গ্রীক জাতি যে সকল দেবতায় বিশ্বাস করে, যাহাদিগের প্রতি অবিশ্বাস দেখাইলে আইন মতে দণ্ড হইবে, প্লেটো কিরূপে সে সকল দেবতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করি- বেন ? বিশেষতঃ যখন তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে তাঁহার গুরু সক্রেটিস ঐ অপরাধে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। আমাদিগের সমাজেও অনেকে ঐরূপ সামাজিক তাড়নার ভয়ে মুখে মাত্র প্রচলিত ধর্ম্মে সাঁই দিয়া থাকেন।

যাহা হউক প্লেটো এক্ষণে আবার স্বাধীন ভাবে কথা কহিতেছেন। যখন সমুদয় দেবগণের উৎপত্তি হইল, অর্থাৎ কি চন্দ্র সূর্য্যাদি দৃশ্যমান দেবগণ আর কি উপাস্য দেবগণ (যাঁহারা কচিৎ কখনও দর্শন দেন) সমুদয় দেবতারই সৃষ্টি হইল—তখন বিশ্বকার তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া এই বক্তৃতা দিলেন—হে দেবগণ ও দেবসন্ততিগণ যাঁহাদিগকে আমি রচনা করিয়াছি, এবং যাঁহাদিগের নির্ম্মাতা ও পিতা আমি—আমার রচনা সমূহ অবিনশ্বর, যদি আমি তাহা ইচ্ছা করি। যাহা সংযোগে গঠিত তাহার বিয়োগ আছে; কিন্তু সামঞ্জস্যময় ও সুখী বস্তুকে নষ্ট করা অসৎ পুরুষেরই শোভা পায়, এবং যদিচ তোমরা সৃষ্টজীব আর সেই নিমিত্ত সম্যক প্রকারে অমর ও অক্ষয় নহ, তথাপি ইহা নিশ্চয় যে তোমাদিগের ক্ষয় হইবে না এবং তোমরা মৃত্যুর ভাগী হইবে না; সৃষ্টি কালে যে সকল বন্ধনের সাহায্যে তোমাদিগের রচনাকার্য্য সাধিত হয় সে সকলের অপেক্ষা আমার ইচ্ছা মহত্তর ও বলবত্তর (অর্থাৎ ঐ সকল বন্ধন লোপ পাইবার সম্ভা- বনা হইলেও আমার শক্তিতে তোমাদিগের অস্তিত্ব রক্ষা পাইবে।) অতঃপর এক্ষণে আমার আদেশ শ্রবণ কর—তিন জাতি নশ্বর জীব সৃষ্টি করিতে এখনও বাকী আছে, তাহাদিগের ব্যতীত জগৎ অসম্পূর্ণ রহিবে, কারণ সম্পূর্ণ জগতে যে সকল প্রকার জন্তু থাকা উচিত ইহাতে তাহা হইলে সে সকল থাকিবে না।

অপর পক্ষে যদি আমি তাহাদিগের সৃষ্টি করি, তবে তাহারা তোমাদিগের সমান হইবে। অতএব যাহাতে এই সংসারে নশ্বর জীব আবির্ভূত হয়, সেই উদ্দেশে তোমরা আমার শক্তির অনুকরণে জন্তু সৃষ্টি কর। এই সকল জন্তুর অমর ও ঐশিক অংশ, যাহা দ্বারা সমুদয় ন্যায় প্রিয় ও দেবভক্ত ব্যক্তিগণ পরিচালিত হয়, উক্ত অংশ আমি প্রদান করিব। পরে তোমরা ঐ অমর অংশের সহিত মরণশীল অংশ যোগ করিয়া জীব সৃষ্টি কর, তাহাদিগকে খাদ্য দ্বারা পালন কর, এবং তাহাদিগের বর্দ্ধন সংসাধন কর ও পরে মৃত্যু কালে তাহাদিগকে পুনর্গ্রহণ কর। এইরূপ বলিবার পর বিশ্বকার পূর্ব্বে একটী পাত্রে যে যে উপকরণ মিশ্রিত করিয়া ও যে প্রকারে জগতের আত্মা গঠন করিয়াছিলেন, এক্ষণেও আবার সেই সেই উপকরণ (অবিভাজ্য অংশ, বিভাজ্য অংশ ও মধ্যবর্ত্তী অংশ) সেই প্রকারে মিশাইলেন—তবে এই মিশ্রণ পূর্ব্ববৎ বিশুদ্ধ রাখিলেন না, তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ কি তিনগুণ পাতলা করিলেন, এবং যখন তিনি জগতের গঠন সমাপন করিলেন, তখন তিনি এক একটী নক্ষত্রে এক একটী আত্মা রাখিলেন; এবং তাহাদিগের প্রত্যেককে এইরূপে যেন এক একখানি শকটে সংস্থাপন করিয়া তিনি তাহাদিগকে বিশ্বের প্রকৃতি ও তাহাদিগের ভাগ্যের বিধানগুলি বুঝাইয়া দিলেন. আর তাহাদিগকে বলিলেন যে তাহাদিগের প্রথম জন্ম সকলের পক্ষেই সমান হইবে এবং তাঁহার হস্ত হইতে কেহই কষ্টের ভাগী হইবে না। তাহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব উপযোগী সময়ের পাত্রে * বপিত হইবে এবং তখন সর্ব্বাপেক্ষা ধার্ম্মিক জন্তু (মানুষ) জন্মগ্রহণ করিবে এবং মানুষের প্রকৃতি যেখানে দ্বিবিধ (নর ও নারী) ঐ দুয়ের মধ্যে উচ্চতরটী নর নামে আখ্যাত হইবে। এই সকল আত্মা যেখানে অখণ্ডনীয় ভাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া দেহের সহিত যুক্ত হইবে, এবং পদার্থ সমূহ সর্ব্বদাই দেহের নিকটে আসিবে ও দেহ হইতে দূরে যাইবে তাহারা সকলেই একরূপ

* "সময়ের পাত্র"—ইহার অর্থ কি? এস্থলে নানা লোকে নানা অর্থ করিয়াছেন। জাউয়েট্ বলেন—"in the vessels of their appointed times," অন্য কথায় বলেন, "in the vessels of the times severally adopted to them" ইহার অনুবাদে আমরা বলিয়াছি "স্বস্ব উপযোগী সময়ের পাত্রে"—ইহার অর্থ হইতে পারে "স্বস্ব উপযোগী সময় রূপ পাত্রে" অর্থাৎ "স্বস্ব উপযোগী সময়ে।" হিউয়েল্ বলেন—"among the organs of time (the planets)" অর্থাৎ "সময়ের যন্ত্র সমূহে (অর্থাৎ গ্রহ সমূহে।)" গ্রোট বলেন "an appointed hour of birth and of conjunction with a body"—"জন্মের ও দেহ সংযোগের একটী নির্দ্ধারিত ঘটিকা।" গ্রোটের কথা গ্রাহ্য হইলে জাউয়েটের উল্লিখিত উক্তির দ্বিতীয় এক অর্থ হইতে পারে—"স্বস্ব উপযোগী সময়ের পাত্র" অর্থাৎ "স্বস্ব উপযোগী জন্ম সময়ে দেহরূপ পাত্রে।" সিসিরো এই স্থলের সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন—তিনি বলেন—"in the course of certain intervals of time" অর্থাৎ "সময়ের কতকগুলি ক্রমের মধ্যে।" এই নোটটী পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে প্লেটোর এই গ্রন্থের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা কিরূপ কঠিন।

প্রকারে বহির্জগতের শক্তি অনুভব করিবে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ একরূপ বলিয়া ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান ও একরূপ হইবে।) দ্বিতীয়তঃ তাহারা ভালবাসা অনুভব করিবে, ইহা সুখ দুঃখের মিশ্রণ; ভয় ও রাগ আর তাহাদিগের বিপরীত অনুভূতি এসকলও তাহারা অনুভব করিবে। যদি তাহারা এই সমুদয় অনুভূতি শাসন করিয়া চলে তবেই তাহারা ধর্ম্মপথে চলিবে, নচেৎ অধর্ম্মের ভাগী হইবে। যে ব্যক্তি সৎপথে থাকিয়া মানবজীবন যাপন করিবে, সে পুনরায় তাহার (পূর্ব্বের আবাসস্থান) নক্ষত্রে ফিরিয়া আসিবে এবং তথায় সুখে কালযাপন করিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি অসৎপথে চলিবে, সে দ্বিতীয় জন্মে নারী হইবে এবং তখনও যদি তাহার প্রকৃতি না শোধ্‌রায় তাহা হইলে মানবাকারে সে যে পশুর সদৃশ অকর্ম্ম করিয়াছে জন্মান্তরে সেই পশুর আকার প্রাপ্ত হইবে; এবং এইরূপে সে ক্রমাগত কষ্ট পাইবে, যতদিন পর্য্যন্ত সে তাহার উচ্চতর প্রকৃতি (আত্মার অবিভাজ্য, একরূপী অংশ) দ্বারা জীবনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে না শিখে এবং জ্ঞানের সাহায্যে তাহার প্রকৃতির উগ্র ও ন্যায়ের অবাধ্য অংশ গুলি (রাগ দ্বেষাদি) দমন করিতে না পারে। এই সকল অংশ ক্ষিতি অপ্ তেজঃ ও মরুৎ এই কয় উপাদানে গঠিত এবং আত্মা যখন দেহে সংযুক্ত হয় তখনই (অর্থাৎ আদিতে নহে) উহারা মানব প্রকৃতিতে সংলগ্ন হয়। যখন বিশ্বকর্ত্তা তাঁহার সৃষ্ট জীবদিগকে এই সকল বিধি প্রদান করিলেন (যাহাতে তিনি ভবিষ্য অমঙ্গলের জন্য দায়ী না হয়েন) তখন তিনি উহাদিগের কতক পৃথিবীতে, কতক চন্দ্রে ও কতক অন্যান্য নক্ষত্রে বপন করিলেন; এবং তাহাদিগের দেহ সংযোগ ও মানবাত্মা গঠন ও তাহাদিগের জীবনের পরিচালনার ভার তরুণ বয়স্ক দেবগণের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে এই আদেশ দিলেন যে এই সকল মরণশীল জীব যেন স্ব স্ব কর্ম্মফল জনিত দুঃখ ভিন্ন অন্য কোন দুঃখের ভাগী না হয়।

বিশ্বকার এই সকল আদেশ দেওয়ার পর তাঁহার স্বকীয় প্রকৃতির মধ্যে রহিলেন, এবং তাঁহার সন্ততিগণ তাঁহার নিকট হইতে মরণশীল জীবের অমর অংশ (আত্মা) প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে এই জীব গঠন উদ্দেশে তাহার দেহ প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহারা বিশ্বকর্ত্তার অনুকরণে জগৎ হইতে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, ও মরুৎ এই কয় বস্তু হইতে কিছু কিছু অংশ লইলেন (এই সকল অংশ আবার জগৎকে পশ্চাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে) এবং অংশগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য পেরেক দ্বারা সংযুক্ত করিলেন, আর তখন দেহ প্রস্তুত হইল। এই দেহ পেরেক দ্বারা সংযুক্ত, সুতরাং দেবগণের দেহ যেরূপ অচ্ছেদ্য বন্ধনী দ্বারা সংযুক্ত সেরূপ নহে। দেবগণ যে দেহ প্রস্তুত করিলেন তাহার মধ্যে পদার্থ আসিবার ও তাহা হইতে পদার্থ বাহিরে যাইবার পথ রহিল (অর্থাৎ মরণশীল জীবের দেহ ক্ষয় বৃদ্ধি নিয়মের অধীন।) দেহ প্রস্তুত হইলে পর দেবগণ তাহার মধ্যে অমর আত্মার স্রোত সংস্থাপিত করিলেন; আত্মার স্রোত বহিঃস্থিত

কোন শক্তির অধীন হইল না কিম্বা কোন্ শক্তিকে অধীন করিতেও পারিল না। অপিচ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অনিয়মিত রূপে এদিকে সেদিকে বহিতে লাগিল—সর্ব্বসহিত উহার দিগ্‌ভেদে ছয়প্রকার গতি হইল, পশ্চাতে ও সম্মুখে, ডাহিনে ও বামে, উর্দ্ধে ও নিম্নে; এইরূপে সমুদয় জন্তুটীও ঐ ছয়দিকে নড়িতে সমর্থ হইল। আত্মার প্রবাহ দুই কারণে বিচলিত হইল—এক যে শারীরিক স্রোতে খাদ্যের প্রবেশ ঘটে আর এক উহা হইতে বলবত্তর স্রোত, ইন্দ্রিয়জাত শারীরিক ঘটনা। দেহ যখন বহিঃস্থিত অগ্নি, মৃত্তিকা, জল ও বায়ুর সংস্পর্শে আইসে, তখন দেহ আলোড়িত হইয়া যে গতি উৎপন্ন হয় তাহার ধাক্কা আত্মায় যাইয়া পৌঁছে; এই গতিকে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কহে (দৃষ্টি, স্পর্শ, ইত্যাদি।) আত্মার স্রোত বৃত্তাকার ও জগতের গতির ন্যায় দ্বিবিধ (১) একরূপী, অপরিবর্ত্তনীয় (জগতের বহির্বৃত্তের গতির ন্যায়—যাহা এক দিবারাত্রে সংঘটিত হয়) আর (২) বহুরূপী, পরিবর্ত্তনশীল (জগতের অন্তর্বৃত্তের গতির ন্যায়—গ্রহাদির গতি।) বাহিরের বস্তুজাত স্রোত আসিয়া যখন আত্মার স্রোতে পড়ে তখন আত্মার স্রোত বৃত্ত নানা প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয় এবং উহা নিয়ম মত চলিতে পারে না। সুতরাং আত্মার তখন প্রমাদ জন্মে, যে বস্তু যাহা সে বস্তু তাহা বলিয়া বুঝিতে পারে না; যেরূপ কোন ব্যক্তি মস্তক মৃত্তিকায় ও পদ উর্দ্ধে রাখিলে ডাহিনকে বাম ও বামকে ডাহিন মনে করে। আবার যদি কোন ইন্দ্রিয় প্রচণ্ডরূপে আলোড়িত হয়, তাহা হইলে আত্মার স্রোত বাহিরের জাত স্রোতের অধীন হইয়া পড়ে কিন্তু আত্মা তাহা বুঝিতে পারে না (অর্থাৎ আত্মা যখন ইন্দ্রিয়ের দাস হয়, তখন সে ভ্রমবশতঃ মনে করে যে সে যেন ইন্দ্রিয়ের প্রভু রহিয়াছে; আত্মার স্বাধীনতা লোপ পাইলে উহার কি প্রকৃত কি অপ্রকৃত, কি ন্যায্য কি অন্যায্য এই জ্ঞানও লোপ পায়।)

এই সকল বাহ্য তাড়নায় আত্মা মরণশীল দেহে অবস্থিতিকালে প্রথমতঃ জ্ঞান-বিহীন থাকে; কিন্তু যখন বৃদ্ধি ও পুষ্টির স্রোতের তেজঃ কমিয়া আইসে তখন আত্মার স্রোত স্থির ভাবে বহিতে থাকে আর তখন উহা কোন্ বস্তু অপরিবর্ত্তনীয় প্রকৃতির আর কোন্ বস্তু বহুরূপী প্রকৃতির তাহা বুঝিতে সক্ষম হয়। এই অবস্থায় জীবকে জ্ঞানী বলা যাইতে পারে। [পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বস্তু সমূহ দুই প্রকৃতির, এক অপরি-বর্ত্তনীয় একরূপী আর এক পরিবর্ত্তনশীল, বহুরূপী। বস্তু দুই প্রকার, আত্মার স্রোতও দুই প্রকার—একরূপী ও বহুরূপী; আত্মার একরূপী গতি দ্বারা একরূপী বস্তু আর অপর গতি দ্বারা অপর বস্তু উপলব্ধ হয়।] আত্মার গতি যখন স্থিরভাবে ও নিয়মিত রূপে চলিতে আরম্ভ করে, তখন জীব যদি শিক্ষা দ্বারা আপনার উন্নতি সাধন করে তাহা হইলে সে সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যদি তাহা না করে তবে এ জীবনে খঞ্জবৎ ভ্রমণ করে এবং মৃত্যুর পরে অকর্ম্মণ্য অবস্থায় নিম্ন জগতে (পাতালে, হেডিসে) উপস্থিত হয়। যাহা হউক, এ বিষয় আপাততঃ আমাদিগের বিবেচ্য নহে। অগ্রে

আমাদিগের অপর কতকগুলি বিষয় জানা আবশ্যক - কিরূপে দেহ উৎপন্ন হইল, কি রূপেই বা আত্মা সৃষ্ট হইল, এবং এ দুয়ের কি কি কারণ, আর দেবগণই বা কি ভবিষ্যদ্ জ্ঞান দ্বারা চালিত হইয়া দুয়ের সৃষ্টি করেন। এই সকল বিষয়ের আলোচনায় আমরা যাহা কিছু সত্য হওয়ার সম্ভব বলিয়া বুঝিব তাহাই বলিব—অর্থাৎ নিশ্চয় সত্যের অবর্ত্তমানে সম্ভবপর সত্য পথ অনুসরণ করিব।

প্রথমতঃ দেবগণ বিশ্বগোলকের অনুকরণে একটী গোলাকার বস্তু (যাহাকে আমরা মস্তক বলি) প্রস্তুত করিলেন এবং তাহার মধ্যে আত্মার উল্লিখিত দুই গতি (একরূপী ও বহুরূপী) সংস্থাপন করিলেন। মস্তক আমাদিগের দেহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ এবং দেহের অবশিষ্ট অংশ ইহার ভৃত্য স্বরূপ। মস্তক যাহাতে শরীর দ্বারা সর্ব্বদিকে চলিতে পারে এবং উচ্চ নিম্ন ভূমিতে চলিতে কোন কষ্ট না পায় এই উদ্দেশে দেবগণ মস্তকের নিম্নে একটী দীর্ঘ দেহ যুড়িয়া দিয়াছেন এবং উহাতে চারিটী অঙ্গ সংলগ্ন আছে। দেবগণ শরীরের সম্মুখের ভাগকে পশ্চাতের ভাগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মনে করেন বলিয়া মানুষকে অগ্রবর্ত্তী গতি দিয়াছেন; আর পশ্চাৎ ও সম্মুখে বিভেদ রাখিবার নিমিত্ত সম্মুখ দেশে মুখ গঠিয়া উহাতে চক্ষু কর্ণাদি আত্মার জ্ঞানোৎপাদক যন্ত্র সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই সকল যন্ত্রের মধ্যে প্রথমে চক্ষু নির্ম্মিত হয় আর তাহা এই প্রণালীতে। দেবগণ অগ্নির এরূপ এক অংশ লইলেন যাহা দহন করিবে না অথচ এক প্রকার স্নিগ্ধ আলোক প্রদান করিবে, আর এই অংশ হইতে একটী বস্তু গড়িলেন—ইহাকেই আমরা চক্ষু কহি। চক্ষু যে বিশুদ্ধ অগ্নিতে গঠিত, সেরূপ অগ্নি আবার আমাদিগের শরীরের অভ্যন্তরেও আছে; এই অগ্নি এক্ষণে দেবগণ চক্ষু পথে প্রবাহিত করিয়া দিলেন, আর চক্ষুর মধ্যভাগ এরূপভাবে টিপিয়া (স্থূল করিয়া) দিলেন যে শারীরিক অগ্নি চক্ষু দ্বারা বাহিরে আসিবার পূর্ব্বে উহার স্থূলতর অংশগুলি চক্ষুর মধ্যে রহিয়া যাইবে—সুতরাং চক্ষু হইতে যে জ্যোতি বাহির হইবে, তাহা বিমল হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক চক্ষু দ্বারা দৃষ্টি কিরূপে সম্ভবে—চক্ষু হইতে এক জ্যোতি বাহির হইল, ইহা দিবাভাগে বাহিরের আলোকের জ্যোতির সহিত মিলিত হইল - দুইটী জ্যোতিই যেখানে এক প্রকৃতির সেখানে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে দুই জ্যোতি মিলিয়া এক হইয়া গেল—এইরূপে একটী কিরণ রেখা গঠিত হইল; ইহা চক্ষু হইতে চক্ষু যে বিন্দু দেখিতেছে, তাহা পর্য্যন্ত প্রসারিত, অতএব এই বিন্দুর সংঘর্ষণে যে গতি উৎপন্ন হয়, তাহা চক্ষু পথ দিয়া আত্মায় পৌঁছিবে। এইরূপে দৃষ্টি জন্মে। [এই বিষয়টী আমরা আর একটু বিশদ করিয়া বুঝাইতেছি; মনে কর তোমার হস্তে একটী রজ্জু আছে, এবং আর এক ব্যক্তির হস্তেও ঐরূপ একটী রজ্জু আছে। আরও মনে কর রজ্জু দুইটীর মুখ এরূপ ভাবে যুড়িয়া দেওয়া হইল যে দুয়ে এক হইয়া গেল। এক্ষণে অপর ব্যক্তি যদি রজ্জুর তাহার হস্তে সংলগ্ন অংশটী

নড়ায়, তাহা হইলে এই আন্দোলন অবশেষে তোমার হস্তে আসিয়া পৌঁছিবে এবং তুমি তখন জানিতে পারিবে যে অপর ব্যক্তি রজ্জু নড়াইতেছে। প্লেটোর মতে দৃষ্টিও এইরূপে ঘটিয়া থাকে—চক্ষু হইতে যে জ্যোতি যাইতেছে তাহা বাহিরের বস্তু হইতে আগত জ্যোতির সহিত মিলিত হইয়া একটী রেখা উৎপন্ন হয়—সুতরাং বাহিরের বস্তু দ্বারা এই রেখার অপর প্রান্তে যে গতি উৎপন্ন হয়, তাহা অবশেষে চক্ষু পথ দিয়া আত্মায় আসিয়া পৌঁছে, আর তখন আমাদিগের উক্ত বস্তুর দৃষ্টি জ্ঞান জন্মে *।]

দিবাভাগে দৃষ্টি কি রূপে ঘটিয়া থাকে তাহা বলা হইল; এক্ষণে দেখা যাউক রাত্রিতে দৃষ্টি অসম্ভব কেন। রাত্রিতে চক্ষু হইতে জ্যোতি পূর্ব্ববৎ বাহির হয় কিন্তু বাহির হইতে আলোক আসিয়া ঐ জ্যোতির সহিত মিলিত হয় না; অতএব দৃষ্টিও ঘটে না। চক্ষুর তেজ এক্ষণে আর বাহিরে বিনির্গত না হইয়া ভিতরে বদ্ধ হইয়া থাকে; (চক্ষুর পাতা রাত্রিতে বন্ধ হইয়া ঐ ঘটনার সহায়তা করে।) উক্ত তেজ তখন শরীরের মধ্যে গতি সমূহ দমন করে অর্থাৎ এই সকল গতি আর পূর্ব্ববৎ প্রবল থাকে না, আর তাহাতে নিদ্রার আবির্ভাব হয়। কিন্তু শরীরের কোন স্থলে যদি কোন প্রবলতর গতি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে নিদ্রাকালে তদনুরূপ স্বপ্ন জন্মিয়া থাকে। অতঃপর কিরূপে দর্পণাদিতে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়, তাহা বুঝা যাইবে। যখন দর্পণে মুখ দেখা যায়, তখন মুখ হইতে যে আলোক যায় আর চক্ষু হইতে যে আলোক নির্গত হয়, এই দুই আলোক দর্পণের মসৃণ ভূমিতে মিলিত হয় কিন্তু যেহেতু মুখ হইতে নিঃসৃত আলোক এক বিশেষরূপে দর্পণে যাইয়া পড়ে, সেই নিমিত্ত প্রতিবিম্বে যাহা বাম হওয়া উচিত তাহা দক্ষিণ হয়, আর যাহা দক্ষিণ হওয়া উচিত তাহা বাম হয় [অর্থাৎ মনে কর তুমি তোমার প্রতিবিম্ব দেখিতেছ, তোমার যে দিকে বাম তোমার প্রতিবিম্বেরও সেই দিকে বাম হইবে; কিন্তু প্রতিবিম্ব যদি একটী মানুষ

---

* দৃষ্টি সম্বন্ধে গ্রীকদিগের মধ্যে তিন প্রকার মত প্রচলিত ছিল—প্রথম মত এই যে আমরা যখন দেখি, তখন আমরা যে বস্তু দেখি তাহার উপর আমাদিগের চক্ষু হইতে একটী অতি সূক্ষ্ম পদার্থ যাইয়া পড়ে ও তথা হইতে ফিরিয়া চক্ষুতে আইসে আর তাহাতেই আমরা দেখিতে পাই; দ্বিতীয় মত এই যে আমরা যাহা দেখি তাহা হইতে আমাদিগের চক্ষু পথ দ্বারা এক সূক্ষ্ম পদার্থ আমাদিগের আত্মায় পৌঁছে; আর তৃতীয় মত এই যে দৃষ্টির সময় চক্ষু হইতে সূক্ষ্ম পদার্থ নির্গত হয়, আর বস্তু হইতেও ঐরূপ পদার্থ আইসে এবং দুয়ে মিলিয়া এক হয়। প্লেটোর মত তৃতীয় প্রকারের। এ-স্থলে সূক্ষ্ম পদার্থ শব্দে অগ্নি অর্থাৎ আলোক বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান কালে বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি বিষয়ে কি মত, আর আলোকেরই বা প্রকৃতি কি তাহা এই প্রবন্ধের লেখক কর্ত্তৃক ১১শ ভাগ ভারতীর (১২৯৪ সালের) ৫৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। প্লেটো দৃষ্টি বিষয়ে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বে এম্‌পেডক্লিস্ নামক দার্শনিক কর্ত্তৃক গ্রীসদেশে প্রচারিত হয়।

হয় আর ঠিক প্রতিবিম্বের ন্যায় তোমার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে প্রতিবিম্বে যেখানে বাম হস্ত আছে, মানুষের সেখানে দক্ষিণ হস্ত হইবে। ইহার কারণ এই যে তোমার বাম হস্তের আলোক যেখানে পড়িবে, তোমার প্রতিবিম্বেরও বাম হস্ত সেখানেই হইবে।]

কিন্তু দর্পণ যদি সমতল না হইয়া ন্যুব্জ হয়, তাহা হইলে দর্পণের ন্যুব্জ ভাগ এড়োএড়ি করিয়া ধরিলে বাম দিকের আলোক দক্ষিণে যাইবে, আর দক্ষিণের আলোক বামে আসিবে, আর তখন প্রতিবিম্বের (অর্থাৎ প্রতিবিম্ব মানুষ হইলে তাহার) যেখানে বাম হওয়া উচিত সেখানে বাম হইবে, আর যেখানে দক্ষিণ সেখানে দক্ষিণ। ন্যুব্জ দর্পণ এড়োএড়ি না ধরিয়া উচ্চ নীচ করিয়া ধর, তাহা হইলে মস্তকের আলোক নিম্নে যাইবে, অতএব প্রতিবিম্বের যেখানে পদ হওয়া উচিত সেখানে মস্তক হইবে।

এই যে সকল কারণের (অগ্নি বায়ু ক্ষিতি জল) কথা আমরা এতক্ষণ বলিলাম, এসকল আদিম কারণ নহে; এ গুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণ মাত্র; ঈশ্বর যখন "উৎকৃষ্টতম" এই ভাবের আদর্শে বিশ্ব সৃজন করেন, তখন ইহাদিগকে উপকরণ স্বরূপ ব্যবহার করেন *। সাধারণ লোকে ইহাদিগকেই একমাত্র কারণ কহে। কিন্তু উল্লিখিত কারণগুলি জ্ঞানময় বস্তু নহে, উহারা দৃষ্টিগ্রাহ্য জড়বস্তু মাত্র। [প্রত্যেক বস্তুরই দুই প্রকার কারণ আছে মনে করা যাইতে পারে, এক তাহা কিউদ্দেশ্যে হইয়াছে --আর উদ্দেশ্য বলিলেই মানসিক ঘটনা অতএব আত্মা বুঝায়; আত্মাগত কারণই আদিম বা প্রাথমিক কারণ। ইহা ব্যতীত আবার কোন বস্তুকে দৃষ্টিগ্রাহ্য আকারে পরিণত করিতে হইলে অগ্নি বায়ু প্রভৃতি জড় কারণও প্রয়োজন হয়—এগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণ বলা যাইতে পারে।] যে ব্যক্তি বুদ্ধি ও জ্ঞান ভাল বাসে, তাহার অবশ্য প্রথমতঃ আত্মাগত বা জ্ঞানময় কারণের অনুশীলন করা উচিত, আর দ্বিতীয়তঃ জড় কারণের। আর আমরাও ঐরূপ করিব। দুইরূপ কারণই আমাদিগের আলোচ্য, তবে কিনা ঐ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ রাখা উচিত। আদিম কারণ আত্মা হইতে জাত; আত্মার জ্ঞান আছে আর সেই নিমিত্ত তাহার কার্য্য সৎ ও সুঠাম; দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণ জড় হইতে জাত, জড়ের বুদ্ধি নাই, সুতরাং তাহার কার্য্য কোন শৃঙ্খলানুসারে ঘটে না, পরন্তু অনিয়মের বশবর্ত্তী। দৃষ্টির জড়জাত কারণগুলি কি তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এক্ষণে দেখা যাউক উহার আদিম বা প্রাথমিক কারণ কি। আমার মতে দৃষ্টি আমাদিগের পরম মঙ্গলের

* "উৎকৃষ্টতম"—প্লেটোর মতে দৃশ্যমান জগৎ অস্থায়ী, স্থায়ী কেবল কতকগুলি ভাবমাত্র ইহা পূর্ব্বেই অন্য সংখ্যায় বলা হইয়াছে। যেমন সুন্দর বস্তুগুলি অস্থায়ী, কিন্তু সুন্দরতা এই ভাবটী চিরস্থায়ী, অপিচ সমুদয় সুন্দর পদার্থ সুন্দরতা এই ভাবের অনুকরণে গঠিত। সেইরূপ, এই বিশ্বের প্রকৃতি উৎকৃষ্ট—অতএব ইহা "উৎকৃষ্টতম" এই ভাবের আদর্শে গঠিত।

মূল, চক্ষু দ্বারা যদি আমরা নক্ষত্র, সূর্য্য ও আকাশ না দেখিতাম, তাহা হইলে আমরা বিশ্ব সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছি সে সব বলিতে পারিতাম না। কিন্তু দিবারাত্রের পরিবর্ত্তন এবং মাস ও বৎসরের গতি দেখিয়া আমরা সংখ্যা ও সময়ের জ্ঞান লাভ করিয়াছি, আর সমুদয় বিশ্বের প্রকৃতি কি তাহাও আলোচনা করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছি, আর এই হইতে আমরা দর্শন শাস্ত্র পাইয়াছি—যাঁহার অপেক্ষা অধিকতর মঙ্গলকর বস্তু দেবগণ মরণশীল মানবকে কখনও দেন নাই, দিবেনও না। এইটীই আমি বলি দৃষ্টি হইতে আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ; ইহা ব্যতীত যে সকল সামান্যতর লাভ দৃষ্টি হইতে ঘটিয়া থাকে, তাহার আর আমি কেন উল্লেখ করিতে যাইব—কারণ তাহার ক্ষতি হইলে সাধারণ লোকেও অভাব বুঝিয়া দুঃখ করে। আমরা এইমাত্র বলিব; পরমেশ্বর এই উদ্দেশে দৃষ্টির উদ্‌ভাবন করেন ও আমাদিগকে দৃষ্টি দান করেন যে আমরা আকাশে জ্ঞানগর্ভ যে সকল (নক্ষত্রাদির) গতি দেখিতে পাইব তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া উহা দ্বারা আমাদিগের আত্মার গতি সংযমন করিতে শিখিব। [পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আকাশে যেরূপ একরূপী ও বহুরূপী গতি আছে, আত্মাতেও উহার অনুরূপ দুই প্রকার গতি আছে; তবে আত্মার গতি নানা কারণে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, গগনমার্গে নক্ষত্রাদির গতি নিয়মিতরূপে সুশৃঙ্খলামতে ঘটিয়া থাকে। এই সকলের গতি দেখিয়া আত্মার গতি সুশৃঙ্খল করাই জ্ঞানীর কার্য্য।] দৃষ্টির সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, বাক্য ও শ্রবণের সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। শ্রবণ দ্বারা আমরা সঙ্গীতের তান লয় জ্ঞাত হই, আর এতদ্দ্বারা যে সামঞ্জস্যের জ্ঞান জন্মে তাহা আত্মার গতিতে প্রযোগ করাই শ্রবণের উদ্দেশ্য, বৃথা আমোদ প্রমোদ উহার উদ্দেশ্য নহে। [ইহার অর্থ এই যে সঙ্গীত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইলে সামঞ্জস্য কাহাকে বলে, বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহার পরে আত্মার গতি-সমূহকে সামঞ্জস্য ভাবের অধীনে আনিতে পারিলেই আমাদিগের উন্নতি হয়। যখন আমরা রাগ দ্বেষাদি দ্বারা বিব্রত হইয়া পড়ি, তখন আত্মার গতির সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। আত্মার গতির সামঞ্জস্য সাধিত হইলেই আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হই।] সামঞ্জস্য ব্যতিরেকে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা আবার আমাদিগের তাল জ্ঞানও জন্মে, তাল জ্ঞান জন্মিলে মানুষ তাহার অনিয়মিত ও কুৎসিত কার্য্য সমূহ দমন করিতে সমর্থ হয়।

এ পর্য্যন্ত আমরা বুদ্ধির কার্য্য (জ্ঞানময় বা প্রাথমিক কারণ) বর্ণনা করিলাম, এক্ষণে জড়ের কার্য্য আলোচ্য। [আত্মার যেরূপ স্বাধীনতা আছে, জড়ের তাহা নাই—জড় অন্ধভাবে কার্য্য করে; অর্থাৎ আত্মা সম্যক্ বিবেচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। জড় তাহা পারে না, উহা যে কারণের অধীনে কার্য্য করে, সে কারণোপযোগী ঘটনা অবশ্যম্ভাবী, উহা ইচ্ছামত তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারে না। যেমন, তুমি ছাদের উপর দাঁড়াইয়া আছ, নিম্নে লম্ফ দিবে কি না সেটা তোমার ইচ্ছার অধীন; কিন্তু

নারিকেল গাছ হইতে যখন ফল পড়িবে, তখন তাহা পড়িবেই—ইহার ব্যতিক্রম নাই। এই জন্য আত্মা স্বাধীন, জড় তাহা নহে] এই বিশ্ব দুই কারণ হইতে উদ্ভূত, স্বাধীন মন আর অন্ধ জড়। মন এই দুয়ের মধ্যে উচ্চতর, এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে জড়কে বশীভূত করিয়া এই সুশৃঙ্খল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছে। সৃষ্টি কিরূপে ঘটিল, ইহা বুঝিতে হইলে দুই প্রকার কারণেরই ইতিবৃত্ত জ্ঞাত হওয়া উচিত। অতএব এক্ষণে আমরা ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ এই কয়েকের প্রকৃতি ও ইহাদিগের উৎপত্তি অনুশীলন করিতেছি। উক্ত চারিটী বস্তুকে লোকে রূঢ় বা মৌলিক পদার্থ বলে, কিন্তু উহারা বাস্তবিক তাহা নহে। আমরা এক্ষণে যেরূপ পদ্ধতিতে আলোচনা করিতেছি, তাহাতে বস্তু সমুদয়ের মূলতত্ত্ব কি কি ইহা স্থির করা কঠিন হইবে। সুতরাং এবিষয়ে আমি আপাততঃ কিছু বলিব না [অর্থাৎ আমি নিশ্চয় বলিয়া কিছু বলিব না।] কিন্তু আমি যাহা সত্য হওয়ার সম্ভব মনে করিব, কেবল তাহাই বলিব, নিশ্চয় সত্য কি তাহা তোমরা আমার নিকট হইতে জানিবার আশা করিতে পার না। আর আমার বর্ণনা এখানেও আবার (সৃষ্টির) আদি হইতে আরম্ভ করিব; বর্ণনা আরম্ভের পূর্ব্বে এখানেও আবার আমি পরমেশ্বরের বন্দনা করিতেছি, যাহাতে তিনি আমাদিগকে ভ্রম হইতে রক্ষা করিয়া সত্য পথ দেখাইয়া দেন।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মানবীকরণ বটে।

(তৃতীয় প্রস্তাব।)

মূল-কারণই প্রকৃত কর্ম্ম-কর্ত্তা, সাক্ষাৎ কারণ তাঁহার কার্য্য-সাধক যন্ত্র। ইহা হইলে মূল কারণকে চেতন এবং সাক্ষাৎ কারণকে অচেতন বলা অসঙ্গত নহে। কিন্তু এই অর্থ স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, পরমাত্মা সর্ব্বদাই সৃষ্টি-সাধক যন্ত্র লইয়া কর্ম্মশীল আছেন।

[প্রভাত বাবু এই যাহা বলিলেন, ইহার ভাব এই যে, জগতের উপরে পরমাত্মার সার্ব্বকালিক কর্ত্তৃত্ব মানিতে গেলে তাহাতে এইরূপ দাঁড়ায় যে, পরমাত্মা এক প্রকার যন্ত্র—সচেতন জগচ্চালক যন্ত্র। কেননা, অষ্টপ্রহরই যে ব্যক্তি কেবল যন্ত্র লইয়া কর্ম্মশীল থাকে—সে নিজেই এক প্রকার যন্ত্র; তাহার সাক্ষী—ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া—

ঘানিটানা গরু—ইত্যাদি। এ সব জন্তুরা এক প্রকার যন্ত্র—সজীব যন্ত্র—ধোঁয়াকলের ছোটো ভাই! যন্ত্রের পক্ষে সজীব এবং সচেতন হওয়া বড়ই কর্ম্মভোগ! কেননা তাহা হইলে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রণা—কর্ম্মের সঙ্গে ঘর্ম্ম—অনবরতই লাগিয়া থাকে;—নির্জীব যন্ত্রের এরূপ কোনও আপদ বালাই নাই। কাজেই—সজীব যন্ত্র অপেক্ষা নির্জীব যন্ত্র—ঘাণিটানা গরু অপেক্ষা ধোঁয়া-কল—লাখো-গুণে ভাল। এই জন্য আমরা বলি যে, ঈশ্বরকে সচেতন যন্ত্র বলা অপেক্ষা, জগৎকে ঈশ্বরভ্রষ্ট নির্জীব যন্ত্র বলা সহস্র-গুণে শ্রেয়। প্রভাত বাবু এখানে যে একটি কূট-তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার ভিতরে পরম একটি রহস্য মাটি-চাপা রহিয়াছে—তাহা তিনি দেখেন নাই—সেটি এই;—খুব উচ্চ এবং খুব নিম্ন, এ দুয়ের মধ্যে এক দিকে যেমন খুবই বৈপরীত্য—আর-এক দিকে তেমনি খুবই সৌসাদৃশ্য; কিন্তু ল্যাজা-মুড়া'র সহিত মধ্যম অংশের—না আছে বৈপরীত্য—না আছে সৌসাদৃশ্য। যথা;—

নিম্ন	মধ্য	উচ্চ
বীজ	শাখা-পত্র	শস্য
সা	রে, গ, ম, পা, ধা, নি,	সা
শিশু	পণ্ডিত	পরম জ্ঞানী
জড়	অপক্ক চিন্তা	পরিপক্ক জ্ঞান

ধানের গাছ দেখ—তাহার বীজ এবং শস্যের মধ্যে কেমন মিল! কিন্তু ধানের ডাঁটার সহিত দু'য়ের কাহারো কোন মিল নাই। স্বর সপ্তক দেখ—নীচে'র সা'র সহিত উপরের সা'র কেমন মিল! কিন্তু মাঝের সুরের সহিত দুয়ের কাহারো কোনও মিল নাই। শিশু এবং পরমজ্ঞানী—উভয়েই কেমন সরল-চিত্ত এবং নিরভিমান; কিন্তু মাঝের ধাপের পণ্ডিত বিদ্যাভিমানে পরিপূর্ণ—প্রান্ত-যুগলের কাহারো সহিত মাঝের মিল নাই। জড়পিণ্ড যখন যে দিকে চলে—তখন সেই দিকেই চলে, যখন চলে না—তখন চলে না; জড়-পিণ্ড এক-রোখা; পরিপক্ক জ্ঞানও একনিষ্ঠ—দুয়ের মধ্যে এইরূপ সৌসাদৃশ্য; কিন্তু অপক্ক চিন্তা নানা দিকে বিক্ষিপ্ত—এবং সংশয়াক্রান্ত। সর্ব্বত্র এই রূপ ল্যাজা মুড়া'র পরস্পর সৌসাদৃশ্য, এবং মাঝখানের সহিত দুয়েরই বৈসাদৃশ্য, স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সঙ্গে এটা যেন স্মরণ থাকে যে, শস্য বীজের দ্বিতীয় সংস্করণ বটে—কিন্তু তাহা বলিয়া মৃত্তিকাগর্ভস্থিত বীজ সত্যসত্যই কিছু আর আলোক-বিহারী শস্য নহে; উচ্চশ্রেণীর জ্ঞানী ব্যক্তি শিশুর ন্যায় নিরভিমান বটে—কিন্তু তাহা বলিয়া ব্রহ্মসংস্থ জ্ঞানী ব্যক্তি সত্য সত্যই কিছু আর ক্রোড়-সংস্থ শিশু নহে; স্বয়ম্ভূ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পুরুষের কার্য্য যন্ত্রের ন্যায় অবিশ্রান্ত অব্যর্থ এবং অস্খলিত বটে, কিন্তু

তাহা বলিয়া স্বয়ম্ভু মুক্ত পুরুষ সত্য সত্যই কিছু আর যন্ত্র নহেন—ঘড়ি'র কলের ন্যায় অচেতন যন্ত্রও নহেন—অশ্বগবাদির ন্যায় সচেতন যন্ত্রও নহেন। মনুষ্যের আত্মশক্তির কার্য্য শিশুর পদ-চারণা'র ন্যায় পতন-শীল—যন্ত্রের ন্যায় অব্যর্থ এবং অস্খলিত নহে; কিন্তু এরূপ হয় কেন? না যেহেতু মনুষ্যের মনোমধ্যে শরীরাদি যন্ত্রের বদ্ধ ভাব এবং আত্মার বিশুদ্ধ মুক্ত ভাব এই দুই ভাবের কোস্তাকুস্তি নিরন্তর চলিতেছে—কখনও বা তলে তলে গূঢ়ভাবে চলিতেছে—কখনও বা পষ্টাপষ্টি ব্যক্ত-ভাবে চলিতেছে। মনুষ্য—দেবতা এবং পশু দুয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। মনুষ্য যে অংশে পশু-ঘেঁসা সেই অংশে তাহার কার্য্য বদ্ধভাবের কার্য্য, আর, যে-অংশে দেবতা-ঘেঁসা সেই অংশে তাহার কার্য্য মুক্ত ভাবের কার্য্য। মুক্ত-ভাবের কার্য্য কি? না যে কার্য্য কায়-মনোবাক্যের ঐক্য-স্থান হইতে—অন্তর-বাহিরের ঐক্য-স্থান হইতে—আত্ম-পরের ঐক্য-স্থান হইতে—বাহির হয়, তাহাই মুক্ত ভাবের কার্য্য; আর যাহা কায়-মনোবাক্যের—অন্তর বাহিরের—আত্মপরের বিরোধ-স্থান হইতে বাহির হয়, তাহাই বদ্ধ ভাবের কার্য্য। ঐক্যের মূল আত্মা এবং বিরোধের মূল শরীর ইহা বলা বাহুল্য। এখানে পাঠক যেন এরূপ মনে না করেন যে, শরীর আমাদের মতে হেয় পদার্থ;—আমাদের অভিপ্রায় শুদ্ধ কেবল এই যে, শরীর স্বতঃ হেয়ও নহে—উপাদেয়ও নহে; তবে কি? না যে-শরীর আত্মার অবশীভূত তাহাই কেবল হেয় পদার্থ; কিন্তু যে শরীর আত্মার বশীভূত, তাহা পরম-কল্যাণের আস্পদ। মুক্তভাবের কার্য্য কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত—উপরে তাহার ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম; যিনি বোঝেন—বুঝিবেন, না বোঝেন—না বুঝিবেন; সংক্ষেপোক্তি ভিন্ন এখানে আমাদের গত্যন্তর নাই। আরো সহজ কথায় বলিতে গেলে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, খোলা-প্রাণের এবং ভরা-প্রাণের কার্য্যই মুক্ত ভাবের কার্য্য; তা' ছাড়া, মুখে এক ভাব—পেটে আর-এক ভাব, আপনার বেলায় এক ভাব—অন্যের বেলায় আর এক ভাব, এইরূপ সংকীর্ণ ভাবের যত কিছু কার্য্য আছে—সমস্তই বদ্ধ-ভাবের কার্য্য। এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, মনুষ্যের হস্ত হইতে যখন মুক্ত ভাবের কার্য্য প্রথম প্রথম বাহির হয়, তখন তাহা অনেক ইতস্তত করিয়া বাহির হয়; ক্রমে যখন তাহা সাধন দ্বারা পরিপক্কতা লাভ করে, তখনই তাহা যন্ত্র-চলনের ন্যায় অস্খলিত-ভাবে বাহির হইতে থাকে। একজন অভিনব ব্রতী গায়কের গীতিকার্য্যে—হ'ল বা কোথাও স্বর-চ্যুতি হইয়া গেল—হ'ল বা কোথাও তাল-ভঙ্গ হইয়া গেল—হ'ল বা কোথাও রাগ-ভঙ্গ হইয়া গেল—এরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে; কিন্তু খুব একজন পাকা ওস্তাদের গীত যন্ত্র-চালিত আর্গিনের গীতের ন্যায় অভ্রান্ত এবং অবিস্খলিত। আর্গিনের গীত এবং ওস্তাদের গীত দুইই অভ্রান্ত এবং অবিস্খলিত—কার্য্য দু'টি একই প্রকার—কিন্তু তাহার কারণ-দুইটির মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হয়, যথা;—আর্গিনের গীত জড়-যন্ত্রে যন্ত্রিত বলিয়া অস্খলিত, ওস্তাদের গীত জড়-যন্ত্রে অযন্ত্রিত

বলিয়া—মনের অবাধিত উচ্ছ্বাস বলিয়া—অস্খলিত; দুয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্যও যেমন—বৈপরীত্যও তেমনি। উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বদ্ধভাব মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ—মুক্তভাব মনুষ্যের সাধন-সিদ্ধ; বদ্ধভাবের কার্য্য মনুষ্যের অভ্যস্ত কার্য্য, মুক্ত ভাবের কার্য্য মনুষ্যের অভীষ্ট কার্য্য। মনুষ্যের কার্য্য এইরূপ দুই পক্ষের বিবাদে আক্রান্ত হওয়াতেই—আপাততঃ তাহা যন্ত্রবৎ অব্যর্থ এবং অস্খলিত হইতে পারিতেছে না; কিন্তু আপাততঃ যাহাই হউক্ না কেন, কাল ক্রমে মনুষ্যের সাধন যতই পরিপক্কতা লাভ করিবে—মুক্তভাবের কার্য্য ততই তাহার স্বভাব-সিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে। পক্ষান্তরে, ঈশ্বরের কার্য্য গোড়াগুড়িই—স্বভাবতই—নিত্য নিত্যই মুক্তভাবের কার্য্য; তাই তাহা যন্ত্র-চলনের ন্যায় অভ্রান্ত এবং অস্খলিত। এইটি কেবল এখানে সবিশেষ দ্রষ্টব্য যে, ওস্তাদের গীত যন্ত্র-বৎ অস্খলিত বলিয়া ওস্তাদকে যেমন আর্গিন যন্ত্র বলা বিধেয় নহে—ঈশ্বরের কার্য্য যন্ত্রের ন্যায় অস্খলিত বলিয়া ঈশ্বরকে তেমনি জগচ্চালক যন্ত্র বলা বিধেয় নহে; কেননা তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ভাবে—সম্পূর্ণ জ্ঞান এবং আনন্দের সহিত—জগৎ কার্য্য চালাইতেছেন; তিনি জড় পিণ্ডের ন্যায় অন্ধ-ভাবেও কার্য্য করেন না, আর, দেহ-বদ্ধ জীবদিগের ন্যায় শ্রমও অনুভব করেন না—সমস্ত জগৎ সংসার তাঁহার আনন্দেরই উচ্ছ্বাস।

স্বয়ম্ভু শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পরমাত্মা তো যন্ত্র নহেনই—তাঁহার সৃষ্ট জগৎ কতদূর যন্ত্র নামের যোগ্য তাহাও বিবেচনা-স্থল। "যন্ত্র"—শব্দ একটি মাত্র, কিন্তু তাহার অর্থ প্রধানতঃ দুইরূপ ও কড়াকড় করিয়া ধরিতে গেলে—অনেকরূপ। যন্ত্র শব্দের মুখ্য অর্থ নির্জীব যন্ত্র; যেমন ঘড়ির কল, তাঁত, ধোঁয়া-কল, ইত্যাদি। যন্ত্র শব্দের দ্বিতীয় অর্থ সজীব যন্ত্র; যেমন—বৃক্ষ একটি রস কর্ষক যন্ত্র—অথবা ফলোৎপাদক যন্ত্র। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত যন্ত্র প্রথমোক্তের ন্যায় কেবল-মাত্র যন্ত্র নহে—তাহা প্রাণ × যন্ত্র অর্থাৎ প্রাণময় যন্ত্র। যন্ত্র শব্দের তৃতীয় অর্থ সচেতন যন্ত্র; যেমন জীব-দেহ। ঘড়ির কল অপ্রাণ যন্ত্র—বৃক্ষ সপ্রাণ যন্ত্র। এ যেমন, তেমনি—বৃক্ষ অচেতন যন্ত্র, জীব-দেহ সচেতন যন্ত্র। ঘড়ির কল যন্ত্র মাত্র; বৃক্ষ—প্রাণ × যন্ত্র অর্থাৎ প্রাণময় যন্ত্র; জীব শরীর মন × প্রাণ × যন্ত্র অর্থাৎ মনোময় প্রাণময় যন্ত্র। মনুষ্য-শরীর = বুদ্ধি × মন × প্রাণ × যন্ত্র। মনুষ্যের মধ্যে আবার ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞের শরীর = আনন্দ × বুদ্ধি × মন × প্রাণ × যন্ত্র। সংক্ষেপে বলিলাম "আনন্দ" কিন্তু তাহার অর্থ বিষয়সুখ নহে—ঐন্দ্রিয়ক আনন্দ নহে; আনন্দ কিনা আধ্যাত্মিক আনন্দ—ব্রহ্মানন্দ। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, শিশুর অন্তঃকরণে যেমন বিষয়-লালসা নাই অথচ সর্ব্বদাই আনন্দ বিরাজ করে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির অন্তঃকরণে সেইরূপ বিনা-কারণে সর্ব্বদাই আনন্দ বিরাজ করে; ঐন্দ্রিয়ক আনন্দ বিশেষ বিশেষ বিষয়কে অপেক্ষা করে—তাই তাহা সহেতুক ((conditioned) আনন্দ বলিয়া উক্ত হয়। কিন্তু এখানে যে আনন্দের কথা হইতেছে তাহা অহেতুক (unconditioned) আনন্দ;

তাহা ঐন্দ্রিয়ক বিষয়ে শৃঙ্খল-বদ্ধ নহে;—তাহা উদার অমায়িক মুক্ত ভাবের আনন্দ। বিষয়-সুখ যেমন বিষয়-জ্ঞানের সহচর—স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিমল আনন্দ সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের সহচর; এই প্রকার আনন্দেরই রশ্মি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির মুখ-চক্ষু হইতে সময়ে সময়ে ফুটিয়া বাহির হইতে দেখা যায়।' এখন বক্তব্য এই যে, সামান্য যন্ত্র (ঘড়ির কল) এক শ্রেণীর যন্ত্র; প্রাণময় যন্ত্র (বৃক্ষ) আর এক শ্রেণীর যন্ত্র। সামান্য প্রাণ এক শ্রেণীর (যেমন বৃক্ষের প্রাণ) প্রাণ—তাহা সুখ-দুঃখ বিহীন; মনোময় প্রাণ (যেমন জীবের প্রাণ) আর এক শ্রেণীর প্রাণ। সামান্য মন (যেমন পশুর মন) এক শ্রেণীর মন; বুদ্ধিময় মন (যেমন মনুষ্যের মন) আর এক শ্রেণীর মন—বিবেক নিষ্ঠ (reflective) মন। সামান্য বুদ্ধি এক শ্রেণীর বুদ্ধি; আনন্দ-ময় (inspirational) বুদ্ধি আর এক শ্রেণীর বুদ্ধি। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে শুধু যদি কেবল যন্ত্র (যেমন ঘড়ির কল) বলা যায়, তবে প্রকৃত বৃত্তান্তটি'র কিছুই বলা হয় না। "নিউটন কে?" "একজন গোরা লোক"—এ যেমন প্রশ্নোত্তর, "জগৎ কি? "এ-কটা যন্ত্র"—এ-ও অবিকল তেমনি। লৌকিক ব্যবহার-কালে অনেক সময়ে ষোলো আনা কথার এক আনা মাত্র আমাদের মুখে বাহির হয়—পোনেরো আনা কথা আমাদের পেটে থাকিয়া যায়; চলিত ভাষায় কথা কহিবার সময় অনেক কথা আমরা সাঁটে-সোঁটে ইঙ্গিত-ইসারায় ব্যক্ত করি; আর, তাহাতেই আমাদের কাজ চলিয়া যায়; এমন কি একজন মহামহোপাধ্যায় জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিতও আসল বৃত্তান্তটি সাত হাত জলের নীচে ফেলিয়া রাখিয়া মুখে বলিবার সময় নিশ্চয়ই বলেন "পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উঠি-য়াছে;" তা ভিন্ন, এরূপ কথনই বলেন না যে, পশ্চিমদিকে পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়াছে। জগৎকে যন্ত্র বলা সেইরূপ একটা মৌখিক ধরণের কথা—তাহা লৌকিক ব্যবহার স্থলেই শোভা পায়। কিন্তু জ্ঞানালোচনার সময় জগৎকে শুদ্ধ যদি কেবল যন্ত্র বলিয়াই নিরস্ত থাকা যায় (যেন জগতের মূলে আনন্দ নাই, প্রাণ নাই, ঈশ্বর নাই; ও জগতের মর্ম্মে মর্ম্মে অস্থিতে অস্থিতে—ঈশ্বরের প্রভাব ওতপ্রোত-ভাবে পরিব্যাপ্ত নাই; জগৎ একটা ঘড়ির কল মাত্র!) তবে তাহাতে কাহারো আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে না। প্রকৃত কথা এই যে ঈশ্বর এবং ভৌতিক বিশ্ব-যন্ত্রের মধ্যে একটি ধারাবাহিক সোপান-পরম্পরা বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং সে সোপান-পরম্পরা ঈশ্বরেরই প্রভাবের উচ্ছ্বাস। মূল-কারণের প্রভাবস্ফূর্ত্তি হইতেই সাক্ষাৎ কারণ সকল উদ্গীরিত হইতেছে—এবং উদ্গীরিত হইয়া তাঁহার অভিপ্রায়-সাধনে উদ্যোগী হইতেছে। আমরা যদি সাক্ষাৎ কারণ অস্বীকার করিতাম—যদি বলিতাম যে, মূল কারণ ভিন্ন দ্বিতীয় কোন প্রকার কারণ জগতে নাই, তবেই প্রভাত বাবুর মুখে এরূপ কথা মানাইত যে, আমাদের মতে মূল কারণই একমাত্র কর্ম্ম-কর্ত্তা, ও আর যত কিছু পদার্থ সমস্তই তাঁহার কার্য্যসাধক যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু আমরা সাক্ষাৎ কারণের অস্তিত্ব স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছি। "গোড়া নাই আগা" অসম্ভব, কাজেই মূল-কারণের অস্তিত্ব না মানিলেই

নয়; তেমনি আবার, "মধ্য নাই আগা" অসম্ভব, কাজেই সাক্ষাৎ কারণের অস্তিত্ব না মানিলেও চলে না। আমরা যখন সাক্ষাৎ কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছি তখন তাহাতেই প্রভাত বাবুর বোঝা উচিত ছিল যে, সাক্ষাৎ কারণও কারণ—তবে কিনা তাহা আপেক্ষিক কারণ; যাহাই হৌক্—তাহা কারণ তো বটে? সাক্ষাৎ কারণে যদি কারণত্ব না থাকিত তবে তাহাকে আমরা মূলেই "সাক্ষাৎ কারণ" বলিতাম না—আর কিছু বলিতাম; কেননা—যাহা কোন অংশেই কারণ নহে তাহা কখনও সাক্ষাৎ-কারণ নামে সংজ্ঞিত হইতে পারে না। যাহা কোন অংশেই জল নহে, তাহা কখনও ঘোলা জল নামে সংজ্ঞিত হইতে পারে না। অতএব প্রভাত বাবুর জানা উচিত ছিল যে, সাক্ষাৎ কারণও কতক অংশে কারণ সাক্ষাৎ কারণও মূল কারণের কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্বের আংশিক অধিকারী। মূল কারণের সহিত সাক্ষাৎ কারণের সম্বন্ধ সবিস্তরে খুলিয়া বলিতে গেলে এইরূপ বলা বিধেয় যে, সাক্ষাৎ কারণ যে-অংশে কারণ চালক—প্রবর্ত্তক—সেই অংশে তাহা মূল কারণের অনুযোগী (অর্থাৎ মূল কারণের কারণত্বের অংশাধিকারী); আর সাক্ষাৎ কারণ যে অংশে কার্য্য—চালিত—প্রবর্ত্তিত—সেই অংশে তাহা মূল কারণের প্রতিযোগী। প্রভাত বাবু শুদ্ধ কেবল প্রতিযোগী সম্বন্ধটিই বুঝিযাছেন—অনুযোগী সম্বন্ধটি একেবারেই তিনি বিস্মৃত। যেখানে অনুযোগী এবং প্রতিযোগী দুইই সম্বন্ধ এক সঙ্গে বিবেচ্য, সেখানে কেবল-মাত্র প্রতিযোগী সম্বন্ধটিকেই সর্ব্বস্ব করিয়া মানিলে কিরূপ ভ্রমে জড়াইয়া পড়িতে হয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত আমরা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি;—মনে কর একজন সেনা-পতি দশ সহস্র সামান্য সৈন্যের এবং তাহাদের উচ্চনীচ অধিনায়কদিগের অধিপতি, আর, মনে কর সেনাপতির অধীনে দশজন সহস্রপতি রহিয়াছে; প্রত্যেক সহস্র-পতির অধীনে দশজন শত-পতি রহিয়াছে; প্রত্যেক শতপতির অধীনে দশজন দশপতি রহিয়াছে; প্রত্যেক দশপতির অধীনে দশজন সামান্য সৈন্য রহিয়াছে। এরূপ স্থলে মোটামুটি যদিচ বলা যাইতে পারে যে, সেনাপতিই প্রকৃত কর্ম্মকর্ত্তা—সৈন্যেরা কেবল তাঁহার কার্য্য-সাধক যন্ত্র, কিন্তু তাহা হইলে তাহার প্রকৃত বৃত্তান্তটির কিছুই বলা হয় না। ঠিক্ সত্যটি ব্যক্ত করিয়া বলিতে গেলে এইরূপ বলা আবশ্যক যে, সেনাগণের মধ্যে যে ব্যক্তি যে অংশে নিম্ন পদবীস্থ সে-ব্যক্তি সেই অংশে যন্ত্রবৎ পরিচালিত; আর, যে ব্যক্তি যে অংশে উচ্চপদবীস্থ সে ব্যক্তি সেই অংশে সেনাপতির প্রতিনিধিস্বরূপ—সুতরাং সেই অংশে সেনাপতির কর্ত্তৃত্ব-ভার তাহাতে বর্ত্তিতেছে। সৈন্যেরা সেনাপতির যন্ত্রস্বরূপ এইটিই এখানে প্রতিযোগী সম্বন্ধ; আর, সৈন্যেরা উচ্চ নীচ পদবী অনুসারে সেনাপতির কর্ত্তৃত্বের অংশাধিকারী—এইটিই এখানে অনুযোগী সম্বন্ধ; উভয় সম্বন্ধই এক সঙ্গে বিবেচ্য। যদি অনুযোগী সম্বন্ধটি ছাড়িয়া দিয়া প্রতিযোগী সম্বন্ধটিকেই সর্ব্বস্ব করিয়া মানা যায় তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, সেনা-মণ্ডলীর যুদ্ধ কার্য্য এক প্রকার

পুৎলো-বাজি, আর, সেনা-পতি সেই পুৎলো-বাজির বাজিকর; তেমনি আবার, যদি প্রতিযোগী সম্বন্ধটি ছাড়িয়া দিয়া কেবল-মাত্র অনুযোগী সম্বন্ধটিকেই সর্ব্বস্ব করিয়া মানা যায়, তবে দাঁড়ায় এই যে, প্রত্যেক সেনারই যুদ্ধ-কার্য্যে ষোলো আনা কর্তৃত্ব, অথবা যাহা একই কথা—প্রত্যেক সেনাই সেনাপতি। দুইই এক দিক্ ঘেঁসা ভ্রম-সিদ্ধান্ত—সত্য উভয়ের মধ্য স্থলে। সত্য যাহা—তাহা এই যে, সেনাপতির ষোলো আনা কর্তৃত্ব; সহস্র পতির দশমাংশ কর্তৃত্ব; শতপতির শতাংশ কর্তৃত্ব; দশপতির সহস্রাংশ কর্তৃত্ব; অধম সেনার সহস্রাংশের দশমাংশ কর্তৃত্ব। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, এরূপ কর্তৃত্ব বিভাগ একটা মনুষ্যকৃত কৃত্রিম ব্যাপার বই নয়; মনুষ্য সমাজেই কেবল—এইরূপ কর্তৃত্ব-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়; তা ভিন্ন আর কোথাও নহে। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, কি অন্তর্জগতে—কি বহির্জগতে—প্রকৃতির কার্য্য-প্রণালী সর্ব্বত্রই ঐরূপ; যথা;—

(১) অপ্রাণ ভৌতিক জগতে এইরূপ দেখা যায় যে, সূর্য্যের আকর্ষণ-কর্তৃত্ব আংশিকরূপে গ্রহ-গণে বর্ত্তিতেছে—গ্রহের আকর্ষণ-কর্তৃত্ব আংশিক-রূপে উপগ্রহে বর্ত্তিতেছে;—এই গেল অনুযোগী সম্বন্ধ। আর একদিকে দেখা যায় যে, পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি সূর্য্যের নিকটে নতশির—উপগ্রহের আকর্ষণ-শক্তি গ্রহের নিকটে নতশির? এই গেল প্রতিযোগী সম্বন্ধ। সেনাপতির উপমাটি এখানে দিব্য সংলগ্ন হয়; যেমন—সেনাপতি, সহস্র পতি, শত পতি; তেমনি সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ। সহস্র পতি একদিকে যেমন সেনাপতির আজ্ঞায় চালিত হইয়া চলিতেছে—আর-এক দিকে তেমনি সেনা পতির প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া শত-পতিগণকে চালাইতেছে। পৃথিবীও তেমনি; এক দিকে সে যেমন সূর্য্যের আকর্ষণে চালিত হইতেছে, আর এক দিকে তেমনি সূর্য্যের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া চন্দ্রকে চালনা করিতেছে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত অনুযোগী এবং প্রতিযোগী দুইই সম্বন্ধ দুই পক্ষেই সমান।

(২) সপ্রাণ ভৌতিক জগতে এইরূপ দেখা যায় যে, শাখা মূলের আশ্রিতও বটে—প্রতিনিধিও বটে দুইই; কেননা, মূল যেমন শাখা'র আশ্রয়-দাতা, শাখাও তেমনি উপশাখার আশ্রয় দাতা।

(৩) অন্তর্জগতেও তাই। বহির্জগতে মূল শাখা এবং উপশাখার মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, অন্তর্জগতে বুদ্ধি মন এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ;—সকল জগৎ একই আদর্শে পরিগঠিত! কেনই বা তাহা না হইবে,—জগৎ সহস্র ধা বিচিত্র হইলেও তাহা একেরই সৃষ্টি। জগৎ একেরই সৃষ্টি—এ বৃত্তান্তটিকে জগৎ অতলস্পর্শ গহ্বরের অভ্যন্তরে চাপাচুপি দিয়া কোন মতেই গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না,—উহাকে একদিকে চাপা দিয়া রাখিতে গেলে উহা আর-এক দিক্ দিয়া তাড়িয়া ফুঁড়িয়া বাহির হয়। একত্বের আদর্শটিকে ভৌতিক আবরণে চাপা দিয়া রাখিতে গেলে উহা উদ্ভিদ্

জগতে বাহির হইয়া পড়ে; উদ্ভিদ্ জগতে উহাকে চাপা দিয়া রাখিতে গেলে চেতন-জগতে বাহির হইয়া পড়ে। একত্বের আদর্শটি মনুষ্যের আত্মাতেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকট-ভাব ধারণ করে—কিন্তু আছে তাহা সর্ব্বস্থানেই; কঠিন ভৌতিক পিণ্ডেও তাহা ভার-কেন্দ্র-রূপে (Centre of gravity) বর্ত্তমান! ভার-কেন্দ্র যদিচ একটি জ্যামিতিক বিন্দু-মাত্র—তা ছাড়া আর কিছুই নহে, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র বিন্দুটির উদরাভ্যন্তরে অনেক কথা সংগোপিত রহিয়াছে—একটি কথা তাহার মধ্যে এই যে, জড়-পরমাণু-সকল যদিচ গণনায় পৃথক্ পৃথক্—তথাপি সকলের মধ্য দিয়া একই ঐক্য-সূত্র আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সটানে চলিয়াছে। ভার-কেন্দ্রের অর্থই এই যে, পরিমাণুগণ বাহিরে দেখি-তেই কেবল পরস্পর-হইতে বিচ্ছিন্ন—ভিতরে ভিতরে তাহারা একেরই শাখা-প্রশাখা। অনেক দিনের পর দুই ভ্রাতায় পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইলেই যেমন দোঁহে দোঁহার সহিত কোলাকুলি করে—দুই পরমাণু সেইরূপ কাছাকাছি হইলেই দোঁহে দোঁহার প্রতি ধাবিত হয়; ইহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে—যে, ভ্রাতৃ-দ্বয়ও যেমন—পরমাণু-দ্বয়ও তেমনি—পূর্ব্ব হইতেই উভয়ে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত। আলিঙ্গন-টিই কেবল নূতন ঘটনা কিন্তু সৌহার্দ্দ-সম্বন্ধটি পুরাতন বন্ধন-সূত্র। ভৌতিক-বস্তু-মাত্রেরই ভার-কেন্দ্র সেই আন্তরিক বন্ধন-সূত্রটির পরিচয় প্রদান করিতেছে। বহির্জগতের বন্ধন-সূত্র আমরা ভাব গতিকে বুঝিয়া লই, কিন্তু অন্তর্জগতের বন্ধন-সূত্র আমরা অন্তশ্চক্ষুতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিতে পাই;—বাহিরে যেমন আকর্ষণ-বন্ধন, অন্তরে তেমনি প্রেম বন্ধন; বাহিরে যেমন বিকর্ষণ, অন্তরে তেমনি স্বৈর-ভাব। অনুযোগী প্রতিযোগী দুইই সম্বন্ধ বহির্জগতের আকার-প্রকারে ভাবে গতিকে আভাসিত হয়; অন্তর্জগতে তাহা অন্তশ্চক্ষুতে পষ্টাপষ্টি ধরা দেয়। তাহার সাক্ষী—বুদ্ধি মন এবং ইন্দ্রি-য়ের যোগাযোগ—ভেদাভেদ—অনুযোগিতা-প্রতিযোগিতা।

প্রথম ইন্দ্রিয়;—ইন্দ্রিয় বলিতে কি বুঝায়? শুধু কি কেবল শরীরের অঙ্গ বিশেষ বুঝায়? না—তাহা নহে। চর্ম্ম-চক্ষুও চক্ষু নহে—চর্ম্ম-কর্ণও কর্ণ নহে। এমন কি, প্রসুপ্ত ব্যক্তির উন্মীলিত চক্ষুও চক্ষু নামের যোগ্য নহে; কেননা—তাহাতে দৃষ্টি-শক্তি অবর্ত্তমান। দৃষ্টি-শক্তি এক প্রকার মানসিক শক্তি—সে শক্তি চক্ষুর অভ্যন্তরস্থিত প্রাণ-ক্রিয়ার মধ্য দিয়া কার্য্য করে—তাহাই প্রকৃত চক্ষু; চর্ম্ম চক্ষু তাহার বহিরাবরণ মাত্র। তলোয়ারের খাপও তলোয়ার নহে—ইন্দ্রিয়ের বহিরাবরণও ইন্দ্রিয় নহে। বহির্দৃষ্টিতে এইরূপ মনে হয় বটে যে, চক্ষু বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়—শুদ্ধ কেবল শরী-রেরই অঙ্গ-বিশেষ; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উহা মনেরই বৃত্তি-বিশেষ। যে-অংশে উহা শরীরের অঙ্গ-বিশেষ, সেই অংশে উহা ইন্দ্রিয়ের বাহ্য আবরণ; আর, যে অংশে উহা মনের বৃত্তি-বিশেষ সেই অংশে উহা প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রিয়।

দ্বিতীয়, মন;—সেনাপতি এক হিসাবে সেনারই সামিল; কিন্তু আর এক হিসাবে সেনাপতি সেনা নহে—কিন্তু সেনার অধিনায়ক। যাহারা দলবদ্ধ হইয়া সশস্ত্রে যুদ্ধ করিতে যায়, তাহারাই সেনা—কাজেই সেনাপতিও সেনা; কিন্তু সেনাপতি একদিকে যেমন সেনা, আর-একদিকে তেমনি সেনাগণের সর্ব্বাধ্যক্ষ। দলবদ্ধ যোদ্ধাগণ সকলেই সেনা—সেনাপতিও সেনা; কিন্তু তাহাদের মধ্যে আর কোন ব্যক্তি সর্ব্বাধ্যক্ষ নহে—এক কেবল সেনাপতিই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাধ্যক্ষ। যদ্দ্বারা দেখা শোনা প্রভৃতি বিষয়-গ্রহণ সংসাধিত হয়, তাহাই ইন্দ্রিয়—কাজেই মনও ইন্দ্রিয়; কেননা, কি শব্দ-শ্রবণ, কি রূপ দর্শন, কি রসাস্বাদন, মনের কর্ত্তৃত্ব ব্যতিরেকে কোনও উপলব্ধি-কার্য্যই চলিতে পারে না। কিন্তু সেনাপতি একদিকে যেমন সেনা—আর এক দিকে তেমনি সেনাগণের অধিনায়ক; মন একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়, আর একদিকে তেমনি ইন্দ্রিয়গণের অধিনায়ক। চক্ষু শুধু কেবল দর্শন-কার্য্যেরই কর্ত্তা—শ্রবণ কার্য্যের নহে; কর্ণ শুধু কেবল শ্রবণ কার্য্যেরই কর্ত্তা—দর্শন-কার্য্যের নহে; কিন্তু মন দর্শন-কার্য্যেরও কর্ত্তা—শ্রবণ কার্য্যেরও কর্ত্তা—সকল ইন্দ্রিয়-কার্য্যেরই কর্ত্তা। চক্ষু না থাকিলেও কর্ণ শুনিতে পায়, কর্ণ না থাকিলেও চক্ষু দেখিতে পায়; কিন্তু মন না থাকিলে চক্ষুও দেখিতে পায় না—কর্ণও শুনিতে পায় না—কোনো ইন্দ্রিয়ই কোনো কার্য্য করিতে পারে না। অতএব মনও ইন্দ্রিয়, অপরাপর ইন্দ্রিয়ও ইন্দ্রিয়; কিন্তু তাহার মধ্যে বিশেষ এই যে, মন অধিনায়ক ইন্দ্রিয়—আর আর ইন্দ্রিয় অধীনস্থ ইন্দ্রিয়; এ প্রভেদটি অনিবার্য্য। সেনাপতি যেমন অধীনস্থ অধিনায়কদিগের একের অবর্ত্তমানে তাহার কার্য্য অন্যকে দিয়া চালায়—মন তেমনি চক্ষুর অবর্ত্তমানে চক্ষুর কার্য্য কতক-বা কর্ণকে দিয়া—কতক-বা স্পর্শেন্দ্রিয়কে দিয়া—চালায়; অন্ধ ব্যক্তির শ্রবণ এবং স্পর্শ যে, এত সজাগ, তাহার কারণই ঐ। ইন্দ্রিয় না থাকিলেও মন আপনার ভিতর হইতে ইন্দ্রিয় যোগায়, যেহেতু সকল ইন্দ্রিয়ই মনের অভ্যন্তরে বীজ-ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। মনের অভ্যন্তরে যদি ইন্দ্রিয়-সকল বীজ ভাবেও বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে স্বপ্নের দর্শন শ্রবণাদি ব্যাপারগুলি অসম্ভব হইত; কেননা, মনের অভৌতিক চক্ষু দ্বারাই আমরা স্বপ্নের আলোক দর্শন করি; মনের অভৌতিক কর্ণ দ্বারাই আমরা স্বপ্নের গীত শ্রবণ করি। জাগ্রৎ কালেও আমরা যখন মনে মনে গীত গাই—তখন তাহা আমরা মনঃকর্ণে শ্রবণ করি—এ কর্ণে নহে; যখন আমরা আগ্নেয় গিরির অগ্নি-উদ্গীরণ ভাবনা করি, তখন সেই মানসিক অগ্নি-উদ্গীরণ আমরা মনশ্চক্ষে দর্শন করি—এ চক্ষে নহে; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, দর্শন শ্রবণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়—মনের অভ্যন্তরে বীজ-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে—সমস্ত ইন্দ্রিয়ই মনেরই শক্তি-ভূত। প্রভাত বাবু নিশ্চয়ই এখানে বলিবেন যে, রূপবান্ বস্তুর প্রতিবিম্ব যাহা নেত্র-গোলকে নিপতিত হয়, সেই প্রতিবিম্ব তলে তলে উদ্বোধিত হইয়াই স্বপ্নের দৃশ্য-রাজি গঠন করিয়া তুলে। প্রভাত বাবুর এই

রাক্ষসী দেখিয়াছে; সেই দৃষ্ট-পূর্ব্ব রাক্ষসীদের সঙ্গে সীতার চতুর্দ্দিকস্থ রাক্ষসীদের খুবই সে ঐক্য দেখিতে পাইতেছে—সীতার কিন্তু তাহাদের সঙ্গে বিন্দু-বিসর্গও ঐক্য দেখিতে পাইতেছে না। এই গেল ভূত কালের সহিত বর্ত্তমানের ঐক্যানৈক্য; ইহাতে অন্তঃকরণের অতীত-মুখী এবং বর্ত্তমান-মুখী—উভয়-মুখী বৃত্তিরই সহকারিতা রহিয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ-বৃত্তিও কার্য্য করিতে থাকে, যথা;—ইনি রাক্ষসী ন'ন—এটা স্থির; হয় ইনি দেবী—নয় বরগুণান্বিতা মানবী—কি তাহা স্থির করা যা'ক,—এই সংকল্পটি ভবিষ্যৎ-মুখী। "ইনি রাক্ষসী ন'ন" এই সিদ্ধান্তটি—"ইনি সীতা" এই ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তটির পত্তন-ভূমি। মন এটা হইতে ও-টাতে—ওটা-হইতে সেটাতে ধাবিত হয়; বুদ্ধি সমস্তের মধ্যে ঐক্যানৈক্য অবধারণ করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করে। মন একবার সীতাকে প্রত্যক্ষ করিতেছে—একবার দৃষ্টপূর্ব্ব বিষয় স্মরণ করিতেছে—একবার কি করিবে তাহা ভাবিতেছে; একবার বর্ত্তমান, একবার অতীত, একবার ভবিষ্যৎ, এইরূপ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; বুদ্ধি—মনের অসম্বদ্ধ ব্যাপারগুলিকে ঐক্য সূত্রে গ্রথিত করিয়া যথাবৎ সিদ্ধান্ত স্থির করিতেছে। এইরূপ, মনুষ্যের অন্তঃকরণে দুই-অঙ্গের দুইটি বৃত্তির অন্বেষণ পাওয়া যায়—একটি ক্ষণিক অসম্বদ্ধ ব্যাপারে ব্যাপৃত—ইহারই নাম মন; আর একটি ত্রৈকালিক বন্ধন-সূত্রে ব্যাপৃত—ইহারই নাম বুদ্ধি। অতএব মোটামুটি গণনায় বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধি-বৃত্তির অধিকার-ভূমি ষোলো আনা; আর (১) অতীত বৃত্তি—স্মরণ, (২) বর্ত্তমান বৃত্তি—প্রত্যক্ষ, এবং (৩) ভবিষ্যৎ বৃত্তি—সঙ্কল্প, তিনটি মনোবৃত্তির এক-একটির অধিকার-ভূমি তাহার তৃতীয়াংশ মাত্র। সর্ব্ব-সমেত এইরূপ;—

ত্রৈকালিক বৃত্তি (বুদ্ধি)

অতীত-মুখী মন বর্ত্তমান-মুখী মন ভবিষ্যৎ-মুখী মন

(স্মরণ) (প্রত্যক্ষ) (সংকল্প)

দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ আস্বাদন স্পর্শ

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে সূর্য্য গ্রহ এবং উপগ্রহের মধ্যেও যেমন—বৃক্ষ শাখা এবং উপশাখার মধ্যেও তেমনি—বুদ্ধি মন এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যেও তথৈব—প্রকৃতির সর্ব্বত্রই গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি ধারাবাহিক সোপান-পদ্ধতি বর্ত্তমান রহিয়াছে; সেই সোপান-পদ্ধতির মাঝের ধাপ উল্লঙ্ঘন করিয়া নীচের ধাপ হইতে উপরে ওঠাও সম্ভবে না—উপরের ধাপ হইতে নীচে নাবাও সম্ভবে না। এমন কি—লঙ্কায় যাইবার সময় পৌরাণিক হনুমানকেও মাঝের সমুদ্র পথ না হউক—মাঝের বায়ুপথ—অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। গন্তব্য পথে পৌঁছিতে হইলে মাঝের পথ অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে—

এটি একটি ধ্রুব সিদ্ধান্ত। এখন, ঈশ্বর সর্ব্বোপরিস্থিত এবং ভৌতিক জগৎ সর্ব্ব-নিম্নস্থিত—এটা যখন স্থির, তখন কাজেই একতম হইতে অন্যতমে সংক্রমণ করিতে হইলে মাঝের পথ অলঙ্ঘনীয়। ঈশ্বরের প্রভাব যাহা ধাবা-বাহিক সোপান-পরম্পরায় সর্ব্বজগতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে, তাহাই সেই মাঝের পথ। ঘড়ি-ওয়ালার প্রভাব কিছু আর ঘড়ির মর্ম্মের অভ্যন্তরে অর্থাৎ ঘড়ির প্রত্যেক পরমাণুর গূঢ়-তম প্রদেশে—কার্য্য করে না, তাহা ঘড়ির উপরে উপরেই কার্য্য করে; এই জন্য, ঘড়িওয়ালাকে যদি অষ্টপ্রহরই ঘড়ি লইয়া কর্ম্ম-শীল থাকিতে হইত, তাহা হইলে তাহার কষ্টের সীমা-পরিসীমা থাকিত না; কেননা ঘড়ি ঘড়ি-ওয়ালার বাহিরের বস্তু—বাহিরের বস্তুর সঙ্গে কোস্তাকুস্তি করা শ্রমের কার্য্য সুতরাং তাহার মাত্রাতিশয্য হইলেই তাহা কষ্টকর হইয়া উঠে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রভাব জগতের নিগূঢ় মর্ম্মাভ্যন্তরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্য্য করিতেছে; ঘড়িওয়ালার কার্য্য যেমন বাহিরের বস্তুর সহিত কোস্তাকুস্তি—ঈশ্বরের কার্য্য সেরূপ নহে; কেননা জগৎ ঈশ্বরের প্রভাবেরই উচ্ছ্বাস—আনন্দেরই উচ্ছ্বাস—তা' ভিন্ন তাহা তাঁহার বাহিরের কোনো-কিছু নহে; কাজেই জগৎ লইয়া সর্ব্বদা-কর্ম্মশীল থাকা ঈশ্বরের পক্ষে শ্রমজনকও নহে—কষ্ট-জনকও নহে। কিন্তু এখানে এইটি বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক যে, ঈশ্বরের প্রভাব সর্ব্বজগতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্য্য করিতেছে, এ কথার অর্থ এরূপ নহে যে, ঈশ্বরের প্রভাব সকল স্থানে একই ভাবে কার্য্য করিতেছে। যদি বলা যায় যে, নেপোলিয়নের প্রভাব সৈন্য মণ্ডলীতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কার্য্য করিতেছে—তাহাতে কিছু-আর এরূপ বুঝায় না যে, একজন সামান্য পদাতিককে তিনি যতটা কর্তৃত্ব ভার দিয়াছেন—সহস্র পতিকে তিনি তাহার অধিক কর্ত্তৃত্ব-ভার দেন নাই; নেপোলিয়নের নিজের তুলনায় সহস্র-পতির কর্ত্তৃত্ব কিছুই নহে—কিন্তু একজন সামান্য পদাতিকের তুলনায় সহস্র-পতির কর্তৃত্ব কম কর্ত্তৃত্ব নহে। সেনাপতির অধীনস্থ সামান্য সৈন্য যদি চারি সহস্র মাত্র হয়, তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, সেনাপতির কর্ত্তৃত্ব ষোলো আনা—সহস্র-পতির কর্ত্তৃত্ব তাহার সিকি অংশ মাত্র; কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে;—সেনাপতির ষোলো আনা কর্ত্তৃত্বের সিকি অংশ সহস্র-পতিতে বর্ত্তিতেছে—সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া তুমি এরূপ বলিতে পারো না যে, সহস্রপতি যখন সেনাপতির চারি আনা কর্তৃত্ব আত্মসাৎ করিয়াছে, তখন সেনাপতির ষোলো আনা কর্ত্তৃত্ব হইতে চারি আনা বাদ পড়িয়া গিয়াছে। সেনাপতির ষোলোআনা কর্ত্তৃত্বের ষোলোআনা-কে-ষোলোআনাই বর্ত্তমান অথচ তাহার চারি আনা অংশ সহস্রপতিতে উপসংক্রান্ত—এইটিই এখানকার বিশেষ রহস্য; অতএব এই যে একটি কথা যে, ঈশ্বরের সমস্ত কর্ত্তৃত্বই ঈশ্বরেতে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান আছে—অথচ সেই অক্ষয় ভাণ্ডারের অংশোপাংশ যথা-পাত্রে যথা-পরিমাণে নিয়তই বর্ত্তিতেছে, এ কথার যাথার্থ্য উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই জলের ন্যায়

স্পষ্টরূপে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। যখন আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে, জগতে প্রাণ রহিয়াছে—মন রহিয়াছে—বুদ্ধি রহিয়াছে—আনন্দ রহিয়াছে, তখন আমরা কোন্ লজ্জায়—কোন্ সাহসে—কোন্ যুক্তিতে—বলিব যে, জগৎকে ঈশ্বর শুধু কেবল একটা যন্ত্র মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত আছেন; অর্থাৎ জগতে শুদ্ধ কেবল ঈশ্বরের প্রতিযোগী ভাবই আছে—তাঁহার অনুযোগী ভাব মূলেই নাই। কেহ যদি বলে যে, পৃথিবীতে সূর্য্যের রশ্মি নিপতিত হয় না—কেবল বৃক্ষাদির ছায়া নিপতিত হয়; তবে সে কথাও যেমন, আর, উপরিউক্ত ও-কথাটিও তেমনি, দুইই সমান যুক্তি-বিরুদ্ধ। এমন প্রাণ-মন-বুদ্ধি-বর্ণসমন্বিত বিচিত্র জগৎকে প্রভাত বাবু যদি শুধু কেবল একটা ঘড়ির কলের মত যন্ত্রভাবে দেখেন--তবে তিনি কিরূপে প্রত্যাশা করেন যে, অন্যেরা তাঁহাকে যন্ত্রভাবে দেখিবে না—জ্যান্ত মনুষ্য-ভাবে দেখিবে? অবশ্য, ঈশ্বরের পূর্ণ প্রভাব জগতের কুত্রাপি নাই; তাহা স্বয়ং ঈশ্বরেতেই আছে (যেমন সৈন্যমণ্ডলীর উপরে ষোলো আনা কর্তৃত্ব কেবল সেনা-পতিরই আছে—অন্য কাহারো নাই); কিন্তু তাহা বলিয়া কি সৈন্য-গণ সেনা-পতির প্রভাবের যথা-পরিমাণ অংশাধিকার প্রাপ্ত হয় না? ঈশ্বরের প্রভাব কি সমস্ত জগৎময় যথা পরিমাণ অংশোপাংশ ক্রমে পরিব্যাপ্ত হয় না? সেশ্বর জগৎও কি নিরীশ্বর জগতের ন্যায় শ্রী-ভ্রষ্ট—প্রাণ-ভ্রষ্ট—জ্ঞান-ভ্রষ্ট এক কথায়—ঈশ্বর-ভ্রষ্ট? এ তো হইতেই পারে না। সজীব শরীরও মৃত শরীরের ন্যায় নির্জীব হইতে পারে না—সেশ্বর জগৎও নিরীশ্বর জগতের ন্যায় যন্ত্রমাত্রে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। প্রভাত বাবুর কথার প্রতিবাদ করাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে এত কথা বিস্তার করিয়া বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না—শুধু কেবল এই বলিলেই হইত যে, যদি মূল-কারণ ভিন্ন দ্বিতীয় কোন কারণ না থাকিত তবেই তাঁহার এ কথা শোভা পাইত যে, মূল কারণই একমাত্র কর্ম্মকর্ত্তা, আর সমুদায়ই শুদ্ধ কেবল যন্ত্র-মাত্র; কিন্তু আমরা যখন বলিয়াছি যে, মূলকারণ ছাড়া সাক্ষাৎ কারণও আছে, তখন তাঁহার বোঝা উচিত ছিল যে, সাক্ষাৎ কারণও কতক অংশে কারণ—সুতরাং মূলকারণের কারণত্বের আংশিক অধিকারী। ঈশ্বর শুধু কেবল নির্জীব যন্ত্রের ঈশ্বর নহেন—মৃত জগতের ঈশ্বর নহেন—তিনি দেব মনুষ্য পশু পক্ষী উদ্ভিদ্ চরাচর সমস্ত সম্বলিত সমগ্র জগতের ঈশ্বর। শ্রীদ্বি]

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন।

ক্রমশঃ।

গাজিপুর-পত্র।

তুমি ত কথায় কথায় রেলের গাড়ীর গতির সহিত মানব জীবনের সাদৃশ্য দেখাইয়া থাক;—কথাটা অস্বীকার করিবার যো নাই,—রেলের গাড়ী হুহুঃ শব্দে চলে—নিঃশব্দে মানুষের জীবনও সেইরূপ করিয়া চলে,—কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এই উভয়বিধ রথযাত্রীর অবস্থাগত প্রভেদ যে বিস্তর, তাহা আমি তোমাকে হাতে হাতে বুঝাইয়া দিতে পারি।

প্রথমতঃ দেখ জীবনের যাত্রা শেষ হইলেই আমরা মরি—আর রেলের যাত্রা শেষ হইলেই আমরা বাঁচি। একের লক্ষ্যস্থান হইতে দূরে থাকিবার জন্য, আর অন্যের লক্ষ্যস্থান পাইবার জন্যই আমাদের প্রাণগত চেষ্টা।

দ্বিতীয়তঃ—আমরণ একঘেয়ে একটানা জীবন বহন করা মানুষের পক্ষে কিরূপ কষ্টকর, ইহার হাত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে এদিক ওদিক বদল জন্য মানুষ কত উপায়ই না অবলম্বন করে, কিন্তু রেলপথের গম্যস্থানে পৌঁছিবার আগে কোন খানে যদি ইহার একটানা গতি ভাঙ্গা পড়ে অর্থাৎ ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাহা হইলেই আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

তুমি আমার সব কথা প্রহেলিকা বিবেচনা কর,—কিন্তু ইহা প্রহেলিকাও নহে, হাসিবার কথাও নহে,—গাজিপুর আসিবার সময় বিশেষ কষ্ট পাইয়া আমার অদৃষ্টে এই জ্ঞান লাভ ঘটিয়াছে, প্রত্যয় না যাও তুমি বরঞ্চ নিজে একবার গাজিপুর আসিয়া কথাটা যাচাইয়া লও।

তিনজনে ত আমরা রাত্রে হাবড়ার মেলট্রেণে উঠিলাম; একজন কাশীধামে শ্বশুরালয়ে যাইবেন, আর আমরা দুই ভাইবোনে গাজীপুরের যাত্রী। রাত্রিটা ত ঘুমাইয়া কাটিল, পরদিন সকালটাও বাহিরের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বেশ এক রকম আরামে কাটাইয়া দিলাম; বাকী রহিল কেবল ঘণ্টাকতকের মামলা। ভাবিলাম তাহা কাটাইতে আর কতক্ষণ! কিন্তু তাহার পরেই দেখিলাম দিন যায় তবু ক্ষণ যায় না! যতই বেলা বাড়িতে লাগিল—শ্রাবণের কাঠফাটা রৌদ্রে আমাদের প্রাণ পর্য্যন্ত যতই ফাটিয়া উঠিতে লাগিল—আর ততই ঐ কথার মর্ম্ম বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে লাগিলাম।

এই রৌদ্রে বেলা প্রায় দেড়টার সময় আমাদের দিলদারনগরে নামিতে হইল, এখানে ট্রেণ বদলাইয়া তাড়িঘাটের ট্রেণে উঠিতে হয়। খর রোদে ভাজা ভাজা হইয়া, তপ্ত বালি পায়ে ভাঙ্গিয়া আমরা দিলদারনগরের অন্য পাশের গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। উঠিয়া শুনিলাম এ ট্রেণ আপাততঃ ছাড়িতেছে না—আধ ঘণ্টা বাদে ছাড়িবে। মনটা বড়ই দমিয়া গেল, বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া আধ ঘণ্টা এইরূপে বন্দী হইয়া

থাকিবার মানে মোদ্দা বুঝিয়া পাইলাম না, বড়ই রাগ ধরিতে লাগিল, কিন্তু কাহার উপর—সেটা ঠিক বলিতে পারি না। সে সময় গার্ড দুএকবার আমাদের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিয়াছিল, দুএকজন অপরিচিত লোক দূর হইতে আমাদের গাড়ীর দিকে চাহিয়া সেলাম করিয়াছিল, আর কুলিগুলা আমাদের জিনিস পত্র ট্রেণে তুলিয়া দিয়া দ্বিগুণ ভাড়া পাইয়াও বক্সিসের জন্য আবার ঘ্যান ঘ্যান করিতেছিল। ইহার মধ্যে কে যে আমার রাগের পাত্র তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম, কিন্তু যখন দেখিলাম চারিদিকের এই সকল মহামারী ব্যাপারের মধ্যেও আমার ভায়াটী কাপুরুষের মত অবিচলিতভাবে বসিয়া আছেন, তখন সমস্ত রাগ তাঁহার উপর গিয়া পড়িল। তাঁহা হইতে কখনো যে ভারত উদ্ধার হইতে পারিবে না ইহা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে লাগিলাম। রাগে দুঃখে আমার চোখ দিয়া জল পড়িল না, কিন্তু মুখখানা শুকাইয়া যে আধখানা হইয়া গিয়াছে, সম্মুখে আয়না না থাকাতেও তাহা বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু ভ্রাতার এমনি মনুষ্য চরিত্র জ্ঞান—তিনি বুঝিলেন আর এক রকম! তিনি ভাবিলেন পথশ্রমে আমি বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, কথাবার্ত্তায় আমাকে তিনি উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইল না, তিনি কথা আরম্ভ করিতেই আমাদের তর্ক উঠিল, আমরা দুজনে একত্র হইলে এরূপ না হইয়া বড় যায় না। তিনি আরম্ভ করিলেন "যদি চাও সুখ, আগে লও দুখ।" সবুরে মেওয়া ফলে, তাহা ভুলিলে দিদিমণি?

আমি বলিলাম "যে সুখ চায় সে দুঃখ ভোগ করুক, আমি নির্ব্বাণ মুক্তির ভিখারী।" ক্রমে ঠাট্টা হইতে গম্ভীর তর্ক উঠিল। সুখ দুঃখ মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি না, মঙ্গল অমঙ্গল অনন্য-সাপেক্ষ (absolute) কি না, হিন্দুর মোক্ষ বৌদ্ধের নির্ব্বাণ এক কি না, এই সকল বিচারে আধ ঘণ্টা ছাড়া দেড় ঘণ্টা যে কোথা দিয়া চলিয়া গেল আমরা জানিতেও পারিলাম না। ট্রেণ যখন একেবারে তাড়িঘাটে আসিয়া থামিল, তখন আমাদের জ্ঞানোদয় হইল, কিন্তু আমাদের বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে তখনো আমরা সমান অজ্ঞান রহিলাম। তাড়িঘাটে আমার জন্য পাল্কি প্রস্তুত ছিল, গাড়ী হইতে নামিয়া আমি পাল্কিতে উঠিলাম, ভ্রাতা পদব্রজে চলিলেন। ষ্টেসন হইতে ষ্টীমার নিতান্ত মন্দ পথ নহে। পাল্কি দেখিয়া প্রথমটা আমি একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম—ষ্টেসন হইতে হাঁটিয়া আমি কি আর ষ্টীমারে উঠিতে পারিতাম না? কিন্তু পথটা দেখিয়া সে ভাবটা সহজেই চলিয়া গেল। ষ্টীমারে নূতন প্রকার অভ্যর্থনা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা ষ্টীমারে উঠিবামাত্র ষ্টীমারের অগ্নি-গৃহের অগ্নি-বাতাস ঝলকে ঝলকে আমাদের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল, আর দলে দলে বোল্‌তা উড়িয়া আমাদের মাথায়, গায়, মুখে ভন্ ভন্ আরম্ভ করিল। ষ্টীমার ছাড়িতেই কিন্তু এ সকল উপদ্রব শান্তি হইল, নদীর শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ হইল। সেই শীতল বাতাস আর

তীরের সুদৃশ্য শোভা উপভোগ করিতে করিতে আমরা গাজিপুরের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই ঘাট গাজিপুর সহরের ধারে। (সহর বলিতে দেশীয় লোকের নিবাস-স্থল বুঝিতে হইবে)। ঘাটে নামিয়া ধূলিময় একটা ক্ষুদ্র গলি হাঁটিয়া আমরা ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলাম, গাড়ী আমাদের লইয়া সহরের গলি ঘুঁজি ছাড়াইয়া ঘণ্টা খানিকের মধ্যে ইংরাজ-পাড়ায় পড়িল। ভাইটি তখন আশ্বাস দিলেন অল্পক্ষণের মধ্যেই এবার আমরা বাড়ী পৌঁছিব। কিন্তু ক্রমাগত নামা উঠা করিয়া ট্রেণ ষ্টীমার গাড়ীর দোলায় অনবরত পাক খাইয়া খাইয়া আমার শরীর মন এতই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল যে, এই অস্থির জগতের কোথায় স্থির মাটি আছে কি না—যদিই বা থাকে তাহা আমাদের পায়ের নীচে কখনো আসিবে কি না—যদিও বা আসে ত এত শীঘ্র আসিবে কি না তাহাতে তখনো আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হইতে লাগিল। অবশেষে গাড়ী যখন একটি বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া এক বড় বাঙ্গলার কাছে লাগিল, বেলু-রাণীর টুকটুকে মুখখানি ফুলের মত আমাদের চোখে ফুটিয়া উঠিল, তাহার হাত ধরিয়া আমার ভ্রাতৃজায়া যখন বারান্দায় অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন সে সন্দেহ মুহূর্ত্তে অপহৃত হইল, পথশ্রান্তিও ভুলিয়া গেলাম, নির্ব্বাণ-মুক্ত হইবার জন্যও আর আকুলতা রহিল না।

গাজীপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এখন আর তাহাতে ভুল নাই, কিন্তু তবুও অনেক সময় ইহাতে ভুল হয়। আমি আগে শীত কালে ছাড়া অন্য সময় কখনো পশ্চিমে আসি নাই, সেই জন্য পশ্চিম মনে করিতে, সুদূর-প্রসারিত বালুকা তট-মধ্যবর্ত্তী ক্ষীণা তটিনী, হরিদ্রাবর্ণ শুষ্ক ক্ষেত্র, ধূলিময় জন পথ, মেঘহীন নির্ম্মল আকাশে জলীয় অণুবিহীন শুষ্ক বাতাস—এই সকলই মনে পড়ে। কিন্তু বর্ষার প্রসাদে এখন এখানকার স্বতন্ত্র শ্রী। ঘন পল্লবিত তরুশাখে লুকাইয়া কোকিল পাপিয়া প্রায় সারা-দিনই এখন ঝঙ্কার দিতেছে, প্রসারিত প্রান্তর সুদীর্ঘ শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন হইয়া আছে, ভাগীরথী পূর্ণ যৌবনে উথলিত হইয়া বহিতেছে—আর মাঝে মাঝে মেঘ বৃষ্টি আসিয়া এই নবীন দৃশ্য অধিকতর নবীনতায় সিক্ত করিয়া যাইতেছে। এখন পূর্ণবর্ষার সময় নহে, তাই সারাদিন যদিও মেঘের ঘনঘটা, আর বৃষ্টির অবিশ্রান্ত বর্ষণের ধূম নাই, তথাপি মধ্যে মধ্যে প্রায়ই প্রকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। কখনো বিনা বৃষ্টিতে কখনো ক্ষণস্থায়ী বর্ষণে এ মেঘ পরিষ্কার হইয়া যায়, কখনো কখনো বা দৈবাৎ সমস্ত দিনটাই মেঘ বৃষ্টিতে কাটে। এরূপ দিনে কোকিল পাপিয়ার স্বর আর শুনা যায় না; কিন্তু শরদিনের নির্ম্মল বৃষ্টিধৌত দিক বিদিকে প্রভাত সূর্য্যের কিরণ যখন নবশোভা অর্পণ করে, কোকিল পাপিয়া তখন আবার অতি মধুরভাবে গাহিয়া উঠে, তখন বর্ষা বসন্তে পরিণত হয়। এই বসন্ত-দৃশ্যের দিকে চাহিয়া আমি পশ্চিম ভুলিয়া যাই, বাঙ্গলার গ্রাম্য দৃশ্য আমার সম্মুখে জাগে, গঙ্গাতীরের বিজন ভ্রমণ আমার মনে পড়িয়া যায়, গাজিপুরকে আমার

রাজসাই বলিয়া ভ্রম হয়। রাজসাই থাকিতে আমরা প্রায়ই বিকালে পদ্মার তীরে বেড়াইতে যাইতাম, তীরে একস্থলে একটা প্রকাণ্ড ভগ্ন বটের উন্মূলিত শত সহস্র শিকড়ের উপর দিয়া পদ্মার কাল জল রাশি সকল্লোলে বহিয়া যাইত, আমরা সূর্য্যাস্ত সময়ে তাহার নিকট দাঁড়াইয়া মেঘের চিত্র বিচিত্র খেলা দেখিতাম। এক একদিন সূর্য্যের আলো ডুবিতে না ডুবিতে চাঁদ উঠিত, সেই জ্যোৎস্নালোকে, কোকিল পাপিয়া গীতকুহরিত, বাবলার স্নিগ্ধ গন্ধপূর্ণ বিজন ভ্রমণে হৃদয় যে সুখের ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিত, তখন অনুভব করিতাম সে সুখ স্মৃতির মর্ম্মে মর্ম্মে অঙ্কিত হইয়া যাইতেছে। তখন মনে হইত না এ সময় যখন চলিয়া যাইবে, এ দৃশ্য যখন ফুরাইয়া যাইবে, এ সুখও তখন ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এমনি সুখের মোহ! এ মোহ যখন থাকে তখন প্রেমের ছলনাও সমস্ত বিশ্ব সংসার অপেক্ষা নিত্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু যখন ছুটে তখন ইহার মত মিথ্যা আর নাই। তবে মানুষের জীবনই মোহময়, তাহার এক মোহ ভাঙ্গে কেবল অন্য মোহে পড়িবার জন্য। রাজসাইয়ের সে স্বপ্ন দৃশ্য আমি প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম—কিন্তু এখন আবার পদ্মার মত দুকূল ভরা গঙ্গার বুকে ছায়া আলোকের আন্দোলন যখন দেখিতে পাই, তৃণমণ্ডিত, তরুলতা-ঘন, বিহঙ্গ-কূজিত বনানীর পুলকশিহরণ যখন অনুভব করি, তখন সেই সুপ্তস্মৃতি নূতন মোহ স্বপ্নে আবার জাগ্রত হইয়া উঠে। পদ্মার সেই কাল জল—বটমূলের সেই তরঙ্গাভিঘাত, স্নিগ্ধ বাবলার গন্ধে চাঁদের আলোর সেই হৃদয় কম্পন, এখানকার দৃশ্যের এইরূপ যে শত অভাব, তাহা স্মৃতির উথলিত ভাবে পূর্ণ হইয়া যায়,—গাজিপুর আর রাজসাই আমার মনে এক হইয়া পড়ে।

কিন্তু সকলেরি সীমা আছে, কৌলি (একজন দাসী) গম ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়া যাঁতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে পাশের বারান্দা হইতে যখন বেসুর' চীৎকার আরম্ভ করেন—তখন শত মোহ দৃশ্যের মধ্যে থাকিলেও গাজিপুরে আছি বলিয়া বেশ মনে থাকে, কিম্বা এখানকার কঙ্কর-রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইলে তাহা রাজসাইয়ের ধূলিময় পথ বলিয়াও ভ্রম জন্মায় না। বাস্তবিক এখানকার কঙ্করপথ বড়ই সুন্দর। যতই বৃষ্টি হউক না কেন এ রাস্তায় কাদা হয় না, বৃষ্টি থামিতে না থামিতে রাস্তা শুকাইয়া খট খট করিতে থাকে। এ রাস্তায় চলিয়া সুখ আছে। কিন্তু ঢেঁকির স্বর্গে গেলেও সুখ নাই—এখানকার সহর যেখানে দেশীয় লোকেরা বাস করেন, সেখানে যে ধূলা সেই ধূলা, সেখানে কাঁকরের চিহ্ন দেখা যায় না। আমরা রোজই প্রায় বিকালে কখনো হাঁটিয়া কখনো গাড়িতে বেড়াইতে যাই। বিজন পথ, পথে দৈবাৎ এক একটি এ-দেশীয় লোক দেখা যায়। তাহাদের দুইচক্ষু, আমাদের দেশের লোকের মত ত্রিনেত্র দিয়া তাহারা আমাদের দিকে চাহে না—তাই পথ ভ্রমণে আমাদের সঙ্কোচ হয় না।

কিন্তু গাজিপুর আসিলাম, যাহাদের লইয়া গাজিপুরের গাজিপুরত্ব, তাহা কিছুই

দেখিলাম না। বসন্তের কাল গেছে, এখন আর গাজিপুরের দিগন্ত প্রসারিত ক্ষেত্র গোলাপময় হইয়া থাকে না। যোগীবর পবহারী বাবা এখন গুহামগ্ন, তাঁহার এখন দেখা পাওয়া যায় না, আর আফিনের কুঠি যাহা ইচ্ছা করিলেই দেখা যাইতে পারিত, তাহাও আমার দেখিতে ইচ্ছা করে না। এখন এখানে একমাত্র দেখিবার যোগ্যস্থল আমাদের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনেরল কর্ণওয়ালিস সাহেবের কবর উদ্যান। আমরা বেড়াইতে বাহির হইলেই প্রায় সেই উদ্যান প্রদক্ষিণ করিয়া আসি, ইহা আমাদের বাড়ীর খুবই কাছে। এই স্থানটি বড়ই মনোহর, প্রস্ফুটিত মালতীলতা বেষ্টিত উদ্যান প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী হইলেই তাহার শোভায় ও সুগন্ধে প্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠে। উদ্যানে নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্পের কেয়ারি, মধ্যস্থলে কর্ণওয়ালিস সাহেবের গম্বুজাকৃতি গোরমন্দির। সিঁড়ি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত মন্দিরটি প্রস্তর নির্ম্মিত। মন্দির মধ্যে এক চতুষ্কোণ শ্বেত প্রস্তর স্তম্ভের উপর লাট সাহেবের মূর্ত্তি বিরাজিত—স্তম্ভের চারিদিকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতীয় লোকের প্রতিমূর্ত্তি এবং ফুল লতা পাতার কারু কার্য্য খোদিত। আমি এখানে আসিয়া যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে এই স্থানটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু আমাদের বন্ধু প্রবর গাজিপুরের গাজি মহাশয়ের নিকট একদিন এই কথা বলিয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছিলাম। অনধিকার চর্চ্চার যে কত মহৎ দোষ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইবার প্রয়াসে এ সম্বন্ধে সংলগ্ন অসংলগ্ন যত গল্প তাঁহার জানা আছে—একে একে সমস্তগুলি তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এবং এতদ্দ্বারা আমাকে নিতান্ত বিষণ্ণ অবসন্ন সন্তপ্ত অনুতপ্ত করিয়া তুলিয়া তাঁহার হৃষ্ট মুখে ও পুষ্ট শরীরে তুষ্ট ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক গাজিপুরের যেখানে যত উৎকৃষ্টতর স্থান আছে, তাহার তালিকা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে দোবে ও চোবের বাগানকেও তিনি ছাড়েন নাই। সেই প্রলোভনে পড়িয়া আমরা একদিন ঐ দুই বাগান দেখিতে গিয়াছিলাম। চোবের বাগানটা দেখিয়া নিতান্ত নিরাশ হই নাই—কেন না সেখানে আমাদের গোটা দুই মোচা ও দু চারিটা নেবু মিলিয়াছিল, কিন্তু দোবের বাগানে গিয়া আমাদের একটা সাধারণ নৈরাশ্য উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা নিরাশ হইলাম—কেন না আমরা যেরূপটা মনে করিয়া গিয়াছিলাম—সেখানে তাহার কিছুই দেখিলাম না। আমাদের বাড়ী ভিতরের বাগানকেও তাহা হইতে উৎকৃষ্ট মনে হইবে। আর গাজি মহাশয় নিরাশ হইলেন আমাদের এই সৌন্দর্য্য রুচির অভাব দেখিয়া। এ সম্বন্ধে আমরা উভয়তঃ উভয়কেই কৃপাপাত্র বিবেচনা করিয়াছিলাম।

এইখানে গাজিপুরের গাজি মহাশয়ের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা যাউক। গাজি শুনিয়া তুমি যদি মনে করিয়া থাক ইনি মুসলমান, তাহা হইলে ভুল বুঝিয়াছ। ইনি জাতিতে হিন্দু—বর্ণে ব্রাহ্মণ। সে হিসাবে গাজিপুর-স্থাপয়িতার সহিত আমাদের বন্ধুবরের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে কোন সম্পর্কই দেখা যায় না। তবে আমরা তাঁহাকে

গাজি বলি—তাহার কারণ গাজিপুরের নবাগতদিগের ইনি অন্ধের নড়ি। ইনি তাহাদিগের আতিথ্যদাতা—পরামর্শদাতা—আর একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরস আলাপের যোগান দাতা। ইনি আমাদের দাতাকর্ণ। কর্ণ আতিথ্যের অনুরোধে নিজ সন্তানকে বলি দিয়াছিলেন—ইনি অতিথিদের জন্য সর্ব্বদাই আত্ম বলিদানে প্রস্তুত। এখানে আসিয়া ইহাঁর সহিত যদি আলাপ কর—তাহা হইলে গোলাপের ক্ষেত আর আফিনের কুঠি না দেখিবার দুঃখ আর তোমার থাকে না। তবে আফিনের কুঠি না দেখিয়া আমার আগেও কখনো দুঃখ হয় নাই, পরেও কখনো হইবার সম্ভাবনা নাই—কেননা ইহা না দেখিয়াও ইহার সম্বন্ধে আমার কতক অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। যে দিন দোবের বাগানে যাইতেছিলাম—সে দিন রাস্তায় গরুর গাড়িতে একরূপ পাতার বোঝাই দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম উহা কি? কোথায় যাইতেছে?

শুনিলাম উহা নীল পাতা, নীল কুঠিতে যাইতেছে। রাস্তার ধারেই দেখিলাম সেই নীলকুঠি, ভাবিলাম একবার ভিতরে গিয়া দেখিলে হয়, কিন্তু কুঠির দরজার কাছে না যাইতে এমন দুর্গন্ধ পাওয়া গেল, যে আর ভিতরে যাইতে হইল না। আফিনের কুঠির দুর্গন্ধ শুনিলাম ইহাকেও হারাইয়া দেয়। পশ্চিমে নীল জন্মাইতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য প্রকাশ করিলাম। গাজি মহাশয় বলিলেন "পশ্চিমে তিল পাওয়া যায় আর নীল পাওয়া যাইবে না"। এহিসাবে ইঁহার কালিদাসেরও স্বভাব আছে। রচনার সুবিধা পাইলে এমনতর মিলও কখনো কখনো তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয়। ইহা ছাড়া ঠাট্টার বুলি—আর গল্পের টীকা তাঁহার ত মুখে লাগিয়াই আছে। যেদিন কোন কথা কহিবার পর তাঁহার মুখ হইতে একটি গল্প শুনিতে না পাই—সেদিন কথাটাই বৃথা মনে হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের মধ্যে কেহ যদি বলিলেন—"মশায় বড় সর্দ্দি হয়েছে" তিনি বাঁ হাতে হয় ঘড়ির চেনটা নয় কোটের বোদামটা নাড়িতে নাড়িতে (বুকের কাছাকাছি তাঁহার হাত সর্ব্বদাই থাকে) চোখ ভ্রূ একটু তুলিয়া একটু হাসিয়া হাসিয়া বলিবেন—"চায়ে স্নান করেছিলেন বুঝি?" বলিয়াই তিনি উচ্চ হাস্য করিবেন এবং যদি দেখেন অন্য সকলেই হাসিল তখন তিনি বলিবেন "একটু কষ্ট চাই, মাথা ডিঙ্গিয়ে চায়ের জল পিছনে পড়বে তবে শর্দ্দিটা ঠিক জমকে আসবে"। এইরূপে ক্রমে ক্রমে যে গল্পটি তিনি আগাগোড়া শেষ করিবেন—সে গল্পটি এই—

"গাজিপুরে একটি চাভক্ত বাবু ছিলেন, তিনি স্নানাহার উভয়ই চায়ে চালাইতেন। সম্বৎসর তিনি স্নান করিতেন না—বৎসর পরে শ্রীপঞ্চমীর দিনে বেলা দুই প্রহরের সময় তাঁহার স্নানের আয়োজন হইত; সে আয়োজন কি—না এক ঘটি উষ্ণ চা। তিনি স্নানে বসিয়া সেই গরম চা মাথা ডিঙ্গাইয়া পিঠের দিকে ফেলিয়া দিতেন, এই সময় অসাবধানতা বশতঃ যদি তাহার ছিটে ফোটা তাঁহার মাথায় কিম্বা গায়ের কোথায় লাগিত—

তাহা হইলেই তাঁহার ঝামরিয়া শর্দ্দি আসিত, আর এক সপ্তাহকাল হাঁচিয়া কাশিয়া তিনি পাড়াশুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া তুলিতেন। গাজিপুরে ইনি চাবাবু নামে খ্যাত।"

গাজি মহাশয় বলেন—এটি সত্য গল্প। তাঁহার গল্পের মজাই এই—তিনি সত্য বলিয়া যাহা বলেন—তাহা গল্পের মত অদ্ভুত, আর গল্প বলিয়া যাহা বলেন—তাহা নিতান্ত দৈনিক কাঠখোট্টা খবরের মত। সুতরাং গল্প যাহা করিয়াছেন তাহা একটিও মনে নাই, সত্য ঘটনা বলিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাই মনে আছে। আরো দু-একটী বলি শুন।

এখানে তাড়িঘাট পর্য্যন্ত যখন রেল হয় নাই, তখন মৈত্রী মহাশয়ের ডাক গাড়িতে লোকে জামালিয়ার ষ্টেসন হইতে তাড়িঘাট পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। মৈত্রী মহাশয় পাকা-চালের লোক, যেখানে সিকি পয়সার চলে, সেখানে তিনি আধ পয়সা বাহির করিতেন না। পশ্চিমে রেল হইবার আগে যে গাড়ী ডাকে চলিত, সত্যযুগের সেই সকল পুরাণ পচা পচকা গাড়ী—ও বেতো শস্তা ঘোড়া কিনিয়া তিনি ব্যবসা চালাইতেন অথচ ঘোড়াদের নাম ডাকে গগণ ফাটিয়া উঠিত, কোনটার নাম ভ্যান্‌ডিম্যানস্ ল্যাণ্ড, কোনটার নাম ইংল্যাণ্ডস্ গ্র্যাণ্ড ইত্যাদি। যেমন গাড়ী ঘোড়া, সাজও তেমনি; দড়াদড়ির প্রসাদে কোন প্রকারে গাড়ি ঘোড়া ও সাজের সঙ্গে সম্বন্ধ কষিয়া রাখিলেও ৭ ক্রোশ রাস্তার মধ্যে অন্ততঃ তিন চার বার সে সম্বন্ধ একেবারে ঘুচিয়া যাইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইত। এই ত ডাকগাড়ীর অবস্থা, সুবিধার মধ্যে কেবল ভাড়া তেমন অধিক নহে; দেশের লোক হইলে চার, ইংরাজ হইলে পাঁচ টাকা ভাড়া দিলেই চলিত।

মৈত্রী মহাশয়ের আড্ডা ছিল জামালিয়া। গাজিপুর ঘাট হইতে তাঁহার গাড়িতে যাহারা জামালিয়া আসিত—তিনি স্বয়ং আগুয়ান হইয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিতেন। কিন্তু যাহারা অন্য গাড়িতে আসিত, মহা পরিচিত হইলেও তাহাদের সহিত তিনি বাক্যালাপ করিতেন না।

একবার গাজিপুরের আফিং কুঠির কর্ত্তা সাহেব রিবেট কার্নাক তাঁহার মেমসাহেবের সহিত এই ডাক গাড়িতে জামালিয়া যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে গাড়ীর একখানি চাকা বিদ্রোহী হইয়া একেবারে ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইল, সাহেব রাস্তার মধ্যে সস্ত্রীক নামিতে বাধ্য হইয়া ক্রোধে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একাকার করিবার মনস্থ করিলেন। কিন্তু তথাপি ক্ষুদ্র গাড়ী ঘোড়া তাঁহাকে বড় সাহেব বলিয়া মানিল না। কোচমানের নিকট দড়াদড়ি প্রভৃতি কোন সরঞ্জাম না থাকায় সে বেচারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কোন উপায় করিতে পারিল না। সাহেব রাস্তায় দাঁড়াইয়া কেবল তর্জ্জন গর্জ্জনেই রাগ নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে এক একারোহী এই পথে যাইবার সময় এই ব্যাপার দেখিয়া গিয়া জামালিয়ায় মৈত্রী মহাশয়কে সংবাদ প্রদান করিল। শুনিয়াই

ত মৈত্রী মহাশয়ের চক্ষুস্থির! বড় সাহেব রাগিয়াছেন, আর রক্ষা নাই! তাঁহার এক-মাত্র ভরসা-স্থল তখন পটকামায়ী। সাহেবের সাহায্যের জন্য লোকজন কিম্বা গাড়ী ঘোড়া পাঠাইতে তিনি কিছুমাত্র ব্যস্ত না হইয়া এক অশ্বত্থ বৃক্ষ মূলবর্ত্তী সিন্দুর চর্চ্চিত ইষ্টকরূপা পটকামায়ীর সদনে 'রক্ষা কর মা' বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। আসিবার আগেই মনে মনে তিনি পাঁচ সিকির সিন্নি মানিয়া আসিয়াছিলেন, এখন পৈতা হাতে লইয়া তাঁহার স্তব করিতে করিতে আবার সেই লোভ দেখাইতে লাগিলেন—আর মাঝে মাঝে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন—সাহেব আসিতেছেন কিনা। সাহেব ইত্যবসরে সৌভাগ্যক্রমে এক পরিচিত বন্ধুর টমটম দেখিয়া তাহাতেই সস্ত্রীক আরূঢ় হইয়াছিলেন, এবং মৈত্রী মহাশয়ের স্তব শেষ হইবার আগেই জামালিয়া আসিয়া পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়াই ডাকগাড়ীর কর্ত্তাবাবুকে তলব হইল, মৈত্রী মহাশয় পটকামায়ীকে স্মরণ করিতে করিতে ভয়ে ভয়ে তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, সাহেব রাগের মাথায় জিহ্বার প্রলয়কাণ্ড সমাধা করিয়া যখন থামিলেন—তখন মৈত্রী মহাশয় মৃদু স্বরে বলিলেন—

"স্যর, বেগ পার্ডন। আয়রণ রোড, আয়রণ ক্যারেজ—এলাহাবাদ, ক্যালকাটা স্যর, ফিফ্‌টি রুপি, দেয়ার এক্‌সিডেণ্ট, আর আই পুয়োর ম্যান, ডাকগাড়ি জামালিয়া—ফাইফরুপী ফ্রেট, নো একসিডেণ্ট? আয়রণ ষ্টীমার, লণ্ডন-ক্যালকেটা, থাউজেণ্ট রুপী ফ্রেট—হোয়াই কর্ককোট ব্রিং? ইবন দেয়ার একসিডেণ্ট, নট—হিয়ার?"

অর্থ এই—মহাশয় ক্ষমা করিবেন, কলিকাতা হইতে এলাহাবাদে যাতায়াত করিতে হইলে লোকে ৫০ টাকা ভাড়া দিয়া লোহার পথে লোহার গাড়ীতে যায়—ইহাতেও মাঝে মাঝে বিপদ ঘটে, আর লণ্ডন হইতে কলিকাতায় আসিতে ১০০০ টাকা খরচ আর লোহার ষ্টীমারের বন্দবস্ত, তবু বিপদ ভয়ে লোকে কর্ককোট সঙ্গে রাখে। আর আমি গরীব মানুষ, আমার গাড়ীর ভাড়া পাঁচ টাকা মাত্র, এখানে কোন বিপদ হইবে না?

তাঁহার ন্যায়শাস্ত্র আর যুক্তি আর ইংরাজি ভাষা শুনিয়া সাহেব হাসিয়া জল হইয়া গেলেন। খুসী দেখিয়া মৈত্রী মহাশয়েরও প্রাণ শীতল হইল—তিনি ভরষা করিয়া বলিলেন—"সাহেব—তোমরা ফাদার মাদার, আমার এই ডাক "গাড়ীতে লোকসান অনেক, তুমি যদি ইচ্ছা কর—তবেই আমি উদ্ধার পাই"—

সাহেব বলিলেন—"আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি?"

"আপনি যদি আমাকে একখানি সার্টিফিকেট দেন যে আমার গাড়ী ঘোড়া ভাল, বন্দবস্ত ভাল—তাহলে সকলেই এই গাড়ীতে আসেন—লোকসান না হলে আমি ভাল গাড়ীও করতে পারি।" সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া সেইরূপ সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন। মৈত্রী মহাশয় জয়জয়কার করিয়া তাঁহাকে ঝুঁকিয়া সেলাম করিলেন এবং বাড়ী গিয়া তৎক্ষণাৎ পটকামায়ীর জন্য পাঁচসিকির সিন্নি প্রেরণ করিলেন।

মৈত্রী মহাশয় পটকামায়ীকে সিন্নি দিয়ে আফিং কুঠির কর্ত্তা সাহেবকে বশ করিয়াছিলেন—গাজিপুরের আর একটি বাবু আর একটি অকাট্য উপায়ে সমস্ত সাহেবকে বশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিস্তারিত শরীর ও রাস্তারধারের বাড়ীর প্রসাদে তাঁহাকে অনেক ইংরাজেই চিনিত। বিকালে তিনি ভুঁড়ি বাহির করিয়া রাস্তায় বসিতেন—কোন সাহেবকে পথ দিয়া যাইতে দেখিলেই সেই অনাবৃত দেহে দৌড়িয়া তাহাকে সেলাম করিতে আসিতেন। সাহেব প্রবর তাহাকে দেখিয়া—well অমুক—বলিয়া কথা আরম্ভ করিতে যাইত,—কিন্তু তিনি সেলাম করিয়া দুহাত তুলিয়া বলিতেন—"Wait shar (sir) I have the honour to be shar (sir) your most obedient sharvant (servant.)—আমার নাম—অমুক—আর আমি অমুক আফিসের অমুক কর্ম্মচারী"।

বলিয়াই তিনি আর একবার সেলাম করিবার পর হাত নাড়িয়া বলিতেন—now go on shar (sir) অর্থাৎ আপনি কি বলিতেছিলেন বলুন। সাহেবেরা তাঁহার এই ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার যথেষ্ট পদোন্নতি হইয়াছিল।

ইনি জাতিতে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন—এবং ব্রাহ্মণদিগকে অত্যন্ত মান্য ভক্তি করিতেন। একবার একজন ব্রাহ্মণ অনেক দিন হইতে ইহাঁর নিকট কর্ম্মের উমেদারী করিয়াও কোন কর্ম্ম আদায় করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ এক দিন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক নির্ঘাত উপায় অবলম্বন করিলেন—সেলাম বাবু যখন পাল্কী করিয়া কাছারীতে যাইতেছিলেন, তখন সেই পাল্কী ধরিয়া জোর জবরদস্তিতে একজন বেহারাকে সরাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে নিজের স্কন্ধ পাল্কীতে প্রদান করিলেন। গোলমাল শুনিয়া বাবু পাল্কীর ভিতর হইতে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিলেন ব্যাপারখানা কি, তখন আমূল জিহ্বা বাহির করিয়া পাল্কী হইতে নামিয়া পড়িলেন, এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াও ইহার প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞান করিলেন না। ইহার পর ব্রাহ্মণ শীঘ্র কর্ম্ম প্রাপ্ত হইল বটে, কিন্তু সেলাম বাবু তাঁহার মনের শান্তি আর কিছুতেই শীঘ্র ফিরিয়া পাইলেন না।

কেবল ইহাঁরা নহেন; এমন অনেকে মিলিয়া আমাদের বন্ধুবরের গাজিপুরের ইতিহাস পুষ্ট করিয়াছেন। এখানে হাণ্টিং ঘোষাল নামে এক বিখ্যাত অবতার ছিলেন। তিনি ভূতলে কখনো রাত্রি যাপন করিতেন না, একখানি খাটিয়া ও চারিজন বেহারা অবলম্বন করিয়া সমস্ত রাত্রি তিনি ভ্রমণ করিতেন। মানব স্কন্ধের ঝাঁকানি না খাইলে তাঁহার নিদ্রা হইত না। রাত্রি ত এইরূপে কাটিত, দিনের বেলাও তাঁহার যে কোন একটা স্থায়ী নিবাস ছিল তাহাও নহে, তিনি চাল চুলাশূন্য ছিলেন, থাকিবার মধ্যে তাঁহার নিকট তাঁহার বন্ধুদের নম্বর সন্নিবিষ্ট একখানি বড় ফর্দ্দ ছিল—সেখানি তিনি কাছ ছাড়া করিতেন না। সেই নম্বর দেখিয়া প্রতিদিন প্রভাতে পালা ক্রমে তিনি এক এক দিন এক একজন

বন্ধুর গৃহে আবির্ভূত হইতেন। কিন্তু যে বন্ধুর ঘাড়ে তিনি যে দিন চাপিতেন সে দিন তাঁহার আর রক্ষা ছিল না। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে দিনটা ঘোষাল মহাশয়ের আহার যোগাইয়াই তিনি নিস্তার পাইতেন না, সন্ধ্যাবেলা বিদায় কালে তাঁহার খাটিয়া বেহারার এক রাত্রের বেতন পর্য্যন্ত সে বন্ধুকে যোগাইতে হইত। এইরূপে তিনি দিনের বেলা বন্ধুবর্গ—ও রাত্রে খাটিয়া বেহারাকে পাইয়া বসিতেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন—কেহই তাঁহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই।

কত আর বলিব, আমাদের বন্ধুবর এমন অনেককে গাজিপুরে অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন—আর তাহাদিগকে অমর করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজেও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তবে এ অমরত্বে শ্রেষ্ঠ কে—কালিদাসগণ কি মল্লিনাথ তাহা এখনো ঠিক হয় নাই। আমার মতে অবশ্য মল্লিনাথ। আর তিনি নিজেও একথা বলেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ইহা কিছুতেই স্বীকার করেন না—তবে এ সম্বন্ধে তাঁহার কথা প্রামাণ্য কি না তাহা তুমি বুঝিয়া দেখ—একটা ত প্রবচনই আছে—নিজের ঘরে নিজে কেহ নায়ক নহে।

গাজি মহাশয়ের গৃহিণীর কৃপায় আমাদের এখানে অনেকগুলি বঙ্গ পরিবারের সহিত আলাপ হইয়াছে। এখন কেবল ইচ্ছা এদেশের ভদ্র মহিলাদিগের দু এক জনের সহিত আলাপ করি, কিন্তু এখানকার জানানা-নিয়ম এত কড়াক্কড় যে তাহা হইবার সুবিধা নাই। এ হেন গাজি মহাশয়—যাঁহার পক্ষে কিছুই অসাধ্য সাধন নাই, তিনি পর্য্যন্ত ইহাতে হার মানিয়াছেন। তবে তিনি ইহার অন্যরূপ কারণ দিয়া থাকেন—তিনি বলেন যত অসাধ্য সাধন তাহাই তাঁহার পক্ষে অধিক আয়ত্তাধীন, আকাশের চাঁদ মাটীতে আনা তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, সেরূপ ফরমাস না করিলে তিনি তাহা রক্ষা না করিতেই বাধ্য। কারণ যাহাই হোক, আমাদের ইচ্ছাসত্ত্বেও এ দেশের ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের সহিত আমাদের আলাপ হয় নাই। সুতরাং তাহাদের কোন সংবাদ দিয়া তোমার কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে পারিলাম না। তবে এদেশের নিম্ন-শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহা বরঞ্চ তোমাকে বলিতে পারি। প্রথমতঃ তাহাদের চেহারা মানুষেরি মতন—ঠিক মেয়েমানুষেরি মতন, দাঁড়াও, তাহা নাও হইতে পারে—কেননা আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়ে গড়ে ইহারা অনেকটা লম্বা চৌড়া, সেই জন্য কেহ কেহ তাহাদিগকে পুরুষালি মেয়েও বলিতে পারেন। এখানকার মেয়েরা দাসীর কাজ হইতে বাগানের মালীর কাজও করিয়া থাকে, এ হিসাবেও তাহাদের ঐ নাম খাটে। তবে গহনা পরার সাধে ইহারা আমাদের স্ত্রীলোকদিগকেও হারাইয়া দেয়। এমন কোন কষ্ট নাই গহনা পরিবার জন্য বোধ হয় ইহারা সহ্য করিতে অপ্রস্তুত। সমস্ত গায়ে ত ইহাদের উলকির চিত্র বিচিত্র, তাহার উপর ইহারা হাতের কুনুই পর্য্যন্ত একরূপ মোটা মোটা কাঁসার চুড়ি আর পায়েও অনেক দূর পর্য্যন্ত এমন একরূপ আঁট গহনা পরে যে তাহার নীচের

মাংস কখনো দেখা যায় না—এইরূপ আবদ্ধ শরীরাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে শ্বেত হইয়া যায় এবং প্রথম প্রথম ইহাতে তাহারা নাকি অসীম যন্ত্রণা ভোগ করে, তথাপি তাহারা তাহা খোলে না, ইচ্ছা করিলেও খুলিবার যো থাকে না, কামারে সে গহনা তাহাদের পরায়, কামার নহিলে সে গহনা খুলিতেও পারে না। যাহারা এ ভয়ঙ্কর গহনা না পরে তাহাদের হাতের জল নাকি শুদ্ধ হয় না। কিন্তু এইরূপ গহনা পরা স্ত্রীলোক দেখিলেই আমাদের গা কেমন করিয়া ওঠে।

এদেশের মেয়েদের মধ্যে মেলভেট বলিয়া কাঁদিবার নিয়ম বড় অদ্ভুত। এক দিন গাড়ী করিয়া যাইতে পথে দেখি—দুই জন স্ত্রীলোক জড়াজড়ি করিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে—ভাবিলাম কি না জানি তাহাদের বিপদ হইয়াছে। কিন্তু শুনিলাম ঠিক বিপরীত। অনেক দিনের পর হঠাৎ রাস্তায় আত্মীয়াতে আত্মীয়াতে দেখা হইলে পরস্পর এইরূপ করিয়া তাহারা কাঁদে। ইহা ছাড়া শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় কন্যার, কিম্বা অন্য কারণে যাহার স্থানান্তরে যাইতে হয় তাহার বাড়ীর সমস্ত আত্মীয়ার এক একবার গলা ধরিয়া ও আত্মীয়ের পা ধরিয়া রীতিমত কান্নাকাটি করিতে হয়, নহিলে বড় নিন্দা রটে। এদেশের ছোটলোকদের বিবাহ রীতি আরো অদ্ভুত। ইচ্ছা করিলেই স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামীকে ময়লা কাপড়ের মত পরিত্যাগ করিয়া আবার নূতন বিবাহ করিতে পারে। ভজিয়া বলিয়া আমাদের একজন দাসী আছে, তাহার বয়স ২৫।৩০ হইবে, প্রথম স্বামীকে সে ছাড়িয়াছে, দ্বিতীয় স্বামী তাহাকে ছাড়িয়াছে, তাহার পর সে এখন চাকরী করিতে আসিয়াছে। তাহার মায়ের ইচ্ছা চাকরী না করিয়া সে আবার বিবাহ করে। সে তাহাতে অসম্মত বলিয়া মায়ের আর দুঃখের সীমা নাই—সে রোজ রোজ গঙ্গামায়ীর নিকট তাহার বিবাহে মতি হৌক এই প্রার্থনা করে।

বিবাহের এই স্বাধীনতায় তাহারা বড়ই সন্তুষ্ট। বড়লোকদের মধ্যে এ রীতি নাই বলিয়া তাহাদিগকে ইহারা বড়ই কৃপাপাত্র মনে করে। কিন্তু এ রীতি সত্ত্বেও মাঝে মাঝে স্বামী মাঙ্গা হয় বলিয়া ইহাদের সন্তাপ করিতে হয়। ভজিয়ার মা তাহার বয়স ৬০ হইবে, শুনিলাম ৫।৬ বৎসর আগে ইনিও বিবাহ হইতেছে না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাদের গানের মধ্যেও স্বামী মাঙ্গার কথা শুনা যায়। আমাদের একটি আত্মীয়া গাজিপুরে আছেন—তিনি ছোটলোকী হিন্দুস্থানী গান অনেক জানেন, এই খানে দুই একটি তুলিয়া দিতেছি—তোমার ইহাতে মস্ত জ্ঞান লাভ হইবে।

বায়ু বহে পুরবৈঁয়া মোরি স্বজনি—গঁউলো আঙ্গোয়ামে শোয়ি।
যো মোরি গোদিমে রোয়েল বালকওয়া ননদীয়ে দিইলি জাগায়ি।
একতু মহগ ভয়ি সিঁদুরে সে কাজরা দুসরা মহগ ভয়ি ফুলেলরে—
তিসরে মহগ ভয়ি ননদীকা বিরানা—কৈসে কটে দিন রাত।

অর্থ এই। স্বজনি গো পূর্ব্বদিকের বাতাস বহিতেছিল, আমি আঙ্গিনায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, আমার কোলের বালক যেই কাঁদিয়া উঠিল, অমনি ননদী আসিয়া আমাকে জাগাইয়া দিল। একেত সিঁদুর, কাজল মহার্ঘ্য হইয়াছে, তাহাতে আবার ফুলেল তেলও মহার্ঘ্য হইয়াছে, ইহার উপর ননদীর ভাইও মহার্ঘ হইয়াছে—কি করিয়া দিন রাত কাটে বল? (এই অবস্থায় যদিইবা দৈবাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল পোড়া ননদী আবার জাগাইয়া দিল!) আর একটা গান—

সৈঁয়া চলে পরদেশ পরসিনো বরজ কস নাহি।
হম শাবনোকে বিজুলিরে তুম পিয়া ভাদরকে মেহ ঝম ঝম বরষ কৈস নাহি।
হম মাঙ্গেকে সিঁদুরারে তুমপিয়া কাজরকে নীর ঘুঁমরকে চিতয়ো কেস নাহি।
হম বেলেকি কলিয়ারে তুমপিয়া আতর গোলাপ মহামগ্ন, মহকো কৈস নাহি।

প্রিয় পরদেশ যাচ্চেন, হে প্রতিবাসিনীগণ তোমরা কেন বারণ করিতেছ না। হে প্রিয় আমি শ্রাবণের বিজুলি তুমি ভাদ্রের মেঘ ঝমঝম বৃষ্টি করিতেছ না কেন? আমি সিঁথির সিঁদুর তুমি নয়নের কাজল চিত্তকে শান্তি দিতেছ না কেন? আমি বেলের কলি তুমি মহা মহা আতর গোলাপ, গন্ধে আকুল করিতেছ না কেন?"

ইহার মধ্যে কোনটা তোমার ভাল মনে হয়?

ক্রমশঃ।

বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি।

চতুর্দ্দশ বর্ষ তার—তরুণ বালিকা।
দেখিলাম তার কোলে, "দাম্বাল" বালক দোলে;
সামালিতে নারে তারে কুসুম কলিকা।
সবে নয় মাস গেছে, ধরায় সে আসিয়াছে;
তবু যেন বোধ হয় দুটি বছরের!
গোলগাল হস্ত পদ দুষ্ট বালকের।
উছলি উছলি উঠে!—বালা কহে করপুটে
"আমি গো আঁটিতে নারি দুরন্ত রাক্ষসে;
পায়ে পড়ি, এরে কেহ লও হেথা এসে।"
আমি কহিলামতায়, "কে দেখিবি, ছুটে আয়,
লাউঝাড়ে লাউদোলে, ফুটিঝাড়ে ফুটি"!
খুড়ি জেটি মাসি সবে হেসে কুটি কুটি!

২

পাঁচ বরষের শিশু, নিতান্ত বালিকা।
মোরে বড় ভাল বাসে; মোর কাছে যবে আসে,
গলায় জড়ায়ে যায় মোহন মালিকা।
আমার মুখের দিকে চাহি শিশু অনিমিখে
করতালি দিয়ে উঠে হাসিয়ে সহসা!

আমার চক্ষের মাঝে, তার প্রতিবিম্ব রাজে ;
মোর কোলে বসে বসে হেরে সে তামাসা !
একদিন মোরে বলে,"তুমি ওঠ মোর কোলে"
এত বলি, ধীরে ধীরে টানিয়ে আমায়,
আপনার ক্ষুদ্র কোলে বসাইতে চায় !
আমি কহিলাম তায়, "কে দেখিবি ছুটে আয়,
লাউঝাড়ে লাউদোলে, ফুটি ঝাড়ে ফুটি"
খুড়ি জেটি মাসি সবে হেসে কুটি কুটি !

অপূর্ব্ব দুঃখ।

দেখ্ ভাই—আমার এ সুখের সংসার,
তবু অশ্রু থাকে লেগে অপাঙ্গে আমার !
খোকা আসি ত্বরা করি, আমার আঁচল ধরি,
করিতে লাগিল কালি ঘোর আব্দার।
কাট বিড়ালির দিকে, চাহি শিশু অনিমিখে,
পুচ্ছ ও লাফানি তার হেরি বার বার,
উপজিল মহালোভ মনেতে তাহার !
চাহি শেষে মোর দিকে, কহিল "ও পাখী-টিকে
ধরে দে আমায় মাগো।"—শিশুর ব্যাভার
হেরে সবে, হেসে সারা হ'ল চারি ধার !
বহু বুঝাইনু তারে, কিছুতে বুঝিতে নারে,
চাপড় মারিনু শেষে পিঠেতে তাহার।
অভিমানে' অবসাদে, ফোঁপায়ে ফোঁপায়ে কাঁদে,
দীননেত্রে, মার পানে চাহে বার বার !
ঝি আসিয়ে কোলে করে, গেল লয়ে স্থানা-ন্তরে ;
তবু যাদু ফিরে ফিরে চায় কত বার !
শিশু গেল;—কিন্তু তার আঁখির কিরণ ধার
জড়ায়ে রহিল যেন পরাণে আমার।
সজল-নয়ন দুটি, উছলি উছলি উঠি,
করিল আমারে ভাই কত তিরস্কার !
"মা এত ভালবাসার এই পুরস্কার" ?
দেখ্ সই তোর কাছে, বলিতে কি লাজ আছে ?
তুই'ত পাগল মোরে বলিবিনে আর !
আকুল চীৎকার তার স্মরি সখি বার বার,
আঁখি-নীরে ভিজে গেল অঞ্চল আমার !

২

দেখ ভাই—আমার এ সুখের সংসার,
তবু অশ্রু থাকে লেগে অপাঙ্গে আমার !
দেখ্ সই তোর কাছে, বলিতে কি লাজ আছে?
তুই' ত পাগল মোরে ভাবিবিনে আর !
স্বামী সোহাগিনী আমি ; জানেন অন্তরযামী
কত পূজা করি আমি পতি দেবতার।
চোখের সম্মুখে রাখি, হরগৌরী ভাবে থাকি,
তিলেক বিরহ তাঁর সহা কি গো যায় ?
দুই দিবসের তরে যান যদি স্থানান্তরে,
মাথা ঘোরে, কাঁপে বুক, শোণিত শুকায়—
এঘরে ও ঘরে ধাই, কিছুতে সোয়াস্তি নাই,
সুখের সংসার মোর হয় গো শ্মশান !
স্বামী না থাকিলে ঘরে, কিসে লোকে ঘর করে?
কিসে বা মঙ্গল হয় কিসে বা কল্যাণ ?

*　　*　　*

দুই তিন দিন পরে, ফিরিয়া আসিলে ঘরে
তখন তাঁহার প্রতি করি অভিমান !

সুখের সহিত এই, লুকাচুরি খেলা সই
নারী বিনা কেবা আর বুঝে সে সন্ধান ?
সারাদিন বালা প'রে, হাত মোর ব্যথা করে;
দুদণ্ড খুলিয়া রাখি বালিশের তলে।
সুখের শীতল বায় পরশি শিহরে কায়;
সাধ করে জ্বালি তাই মানের অনলে !
বিদেশে পথিক পারা, বাক্যহারা, দিশেহারা,
গরীব ব্রাহ্মণ যবে হয় গো আকুল,
[illegible] সই হয়ে যায় ভুল !
সহসা জোয়ার ছোটে, মান বাঁধ যায় টুটে,
ভেসে যায়, ভেঙ্গে যায়, নয়নের কূল।
মিছামিছি—তাঁর মনে, দিনু দুঃখ অকারণে,
ভাবিয়া শিহরি উঠে মরমের মূল !
কপোতী কপোত বক্ষে মাথা গোঁজে যথা,
আমিও তাঁহার বুকে মাথা গুঁজে অধোমুখে,
থাকি ভাই, বহুক্ষণ, বিনা কোন কথা,
তবে গিয়া ঘোচে মম অশান্তির ব্যথা।
জানিনা কেমন বিধি, ভালে লিখিয়াছে বিধি,
স্বজনি লো এ আমার সুখের সংসার—
তবু অশ্রু থাকে লেগে অপাঙ্গে আমার।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

স্নেহলতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বয়সে—৪২।৪৩, কিন্তু ইহার মধ্যেই তাঁহার মাথার ও গোঁপদাড়ির চুল এত পাকিয়াছে যে দেখিতে তাঁহাকে ৫০ মনে হয়।

জগৎ বাবুর চেহারায় বেশ একটি কমনীয় ভাব আছে; নিতান্ত রোগা নহেন, নিতান্ত মোটা নহেন, হৃষ্ট পুষ্ট গৌরবর্ণ চেহারা, প্রফুল্ল হাসি হাসি ভাব, প্রথম পরিচয়েই লাগে ভাল, দেখিলেই মনে হয় লোকটা বেশ ভালমানুষ। তবে আজ কাল ভালমানুষ কথাটা সব সময় বড় ভাল অর্থে ব্যবহৃত হয় না, নির্ব্বোধকেও লোকে ভাল মানুষ বলে; সুতরাং এইখানে টীকা করা আবশ্যক যে, জগৎ বাবু ভাল মানুষ হইলেও নির্ব্বোধ নহেন, তিনি তাঁহার সময়ের একজন বুদ্ধিমান ছাত্র—আর এ সময়ের এক জন প্রতিষ্ঠালব্ধ ডাক্তার। তবে বুদ্ধিমান হইলেও তিনি সরল বুদ্ধির লোক; বিজ্ঞানের কূট তথ্যের মধ্যে তিনি অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারেন, কিন্তু বক্র মনুষ্যের হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে তত সহজ নহে। ইহাতে যদি কেহ তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিতে চাহেন বলুন কিন্তু আমাদের মনে হয়, এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতাতেই যথার্থ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রটপ্লাজম অবস্থা হইতে উদ্ভিদ, পশু, মনুষ্য কিরূপ প্রণালীর সোপান দিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতিগত স্বাতন্ত্র্যে আসিয়া পৌঁছায়—শরীরের কোন সূক্ষ্মশিরা কোন সূক্ষ্মতর স্নায়ু কিরূপ বক্রভাবে কোন স্থানের কোন যন্ত্রের মধ্যে পাক

খায়, এ সকল তাঁহার কাছে জলের মত সহজ—কিন্তু মানুষ মানুষের সহিত কি প্রকারে 'মনে এক মুখে আর' ব্যবহার করে, তাহা তিনি সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অনেক সময় সংসারে ইহার আবশ্যক বুঝেন ; কিন্তু এ বিজ্ঞানে তিনি এমনি অনিপুণ যে এই আবশ্যক যখনি তিনি কার্য্যতঃ সাধন করিতে যান, তখনি প্রায় হিতে বিপরীত হইয়া উঠে।

গৃহিণী বাপের বাড়ী যাইবার নামে জগৎবাবুকে লুকাইয়া—কালীঘাট, থিয়েটার প্রভৃতি এমন কত জায়গায় গমন করেন, জগৎ বাবু তাহার কিছুই প্রায় জানিতে পারেন না ; দৈবাৎ জানিতে পারিলেও গৃহিণীর কান্নাকাটির জোরে তাঁহার ভৎর্সনা অবশেষে সাধ্য সাধনায় পরিণত হয়। কিন্তু গৃহিণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জগৎ বাবু গোপনে একটা কাজ করিয়াছেন কি—অমনি প্রায় ধরা পড়েন আর তাহার পরিণাম জগৎ বাবুর পক্ষে বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠে।

দুই একটা দৃষ্টান্ত দিই—

একদিন জগৎ বাবুর এক স্থানে রাত্রে নিমন্ত্রণ—গৃহিণী ধরিয়া পড়িলেন—থিয়েটারে লইয়া যাইতে হইবে। অনেক কষ্টে ত তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া জগৎ বাবু নিমন্ত্রণে গেলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আহারাদির পর তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে থিয়েটারে ধরিয়া লইয়া গেল। এ কথা গৃহিণী শুনিলে আর রক্ষা থাকিবে না, জগৎ বাবু কথাটা একবারে গোপন করিবেন ভাবিলেন। রাত্রটা তাহা গোপনেও রহিল, কেননা জগৎ বাবু যখন শুইতে আসিলেন তখন অনেক রাত, রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত করিয়া কথাবার্ত্তা কহা গৃহিণীর অভ্যাস নাই, ঘুম ভাঙ্গিবে ভয়ে কর্ত্তা আসিতেই তিনি আরো পাশ ফিরিয়া শুইলেন। প্রত্যূষে উঠিয়াই গৃহিণী গৃহ কর্ম্মে গমন করেন—সুতরাং তখনো ঠিক কথা কহিবার সময় নয়, কিন্তু কাজ কর্ম্মের শেষে আবার শয়ন গৃহে ফিরিয়া আসিয়াও যখন জগৎ বাবুকে তিনি শয্যাগত দেখিলেন, তখন তাঁহার আর কথা কহিবার কোন বাধা না থাকায় মুখ খুলিলেন, বলিলেন—"তোমার যে দুপুরে দিন হয় দেখছি—এর বেলা বুঝি কোন অসুখ হয় না, আর আমাকে থিয়েটারে নিয়ে যেতেই যত অসুখ।"

জগৎ বাবু গেল রাত্রে অবশ্য অসুখের ওজর করেন নাই, তবে আগে কোন একদিন করিয়া থাকিবেন।

জগৎ বাবু বলিলেন "জানত নিমন্ত্রণে গেলিই দেরী হয়"। ইতিমধ্যে টগর আসিয়া মশারি খুলিয়া তাঁহার কাছে বসিয়াছিল, সে বলিল—"বাবা সেই গানটা গাও না, আমি ভুলে গেছি"। জগৎ বাবু তাহার ফরমাসী গানটা একটু গাহিবার পর বলিলেন—এটা থাক, একটা নতুন গান গাই শোন—

গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে, মৃদুল মধুর বংশী বাজে
বিসরি ত্রাসে লোক লাজে সজনি আওয়ো আওয়ো লো"।

গৃহিণী বলিলেন—"এ যে অশ্রুমতীর গান ?"

জগৎ বাবুর অপেক্ষা না করিয়া ইহার আগেই এক দিন গৃহিণী অশ্রুমতীর অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছিলেন। গৃহিণীর এই কথায় জগৎ বাবু তাহা ধরিতে পারিতেন—কিন্তু সে দিক দিয়া তিনি গেলেন না, তিনি কেবল নিজের উত্তরে নিজেই ধরা পড়িলেন। গান গাহিতে গাহিতে তিনি তাঁহার সঙ্কল্প ভুলিয়া গিয়াছিলেন— গৃহিণীর উত্তরে বলিলেন "হাঁ কাল বড় সুন্দর গাহিয়াছিল !"

গৃহিণী বলিলেন "বটে! তবে তুমি কাল গিয়েছিলে ?" জগৎ বাবু দেখিলেন সমস্ত ফাঁক হইয়া গেল, তিনি মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে মহাকাণ্ড বাধিল, গৃহিণী রাগ করিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেলেন, আর তাহার পর সমস্ত হপ্তা মুখ ভার করিয়া, খোঁটা দিয়া কাঁদিয়া জগৎ বাবুর এমন অবস্থা করিয়া তুলিলেন যে পরের শনিবারে একটা বিশেষ কাজ ফেলিয়াও তাঁহার গৃহিণীকে থিয়েটারে লইয়া যাইতে হইল।

আর একবার সুখীবালা নামে জগৎ বাবুর দূর সম্পর্কীয় এক দরিদ্র জ্ঞাতিকন্যা কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া জগৎ বাবুর স্ত্রীর কাছে সাহায্য প্রার্থনায় আসে। এখন বহুদিন পূর্ব্বে সুখীবালার পিতামহের সহিত জগৎ বাবুর পিতার এক মকর্দ্দামা বাধে। সুখীবালার পিতামহ অন্যায় মকর্দ্দামা আনিয়াছিলেন এই বিশ্বাসে মকর্দ্দামায় জগৎ বাবুর পিতা জয়লাভ করিলেও তিনি পরে আর উহাদের সহিত আত্মীয়তাচরণ রাখেন নাই। যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন সুখীবালার জন্মও হয় নাই, গৃহিণীর বিবাহও হয় নাই, পরে গৃহিণী তাঁহার শাশুড়ির কাছে ইহা শুনিয়াছিলেন। আপাততঃ সুখীবালা গৃহিণীর কাছে দুঃখ জানাইতেই তাহার পিতামহের সেই শত্রুতার কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, সুতরাং দানের মধ্যে কতকগুলা কড়া কড়া কথামাত্র দান করিয়া সুখীবালাকে তিনি বিদায় প্রদান করিলেন।

সুখীবালা ত কাঁদিয়া চলিয়া গেল, তিনি মনে করিলেন তিনি একটা মস্ত প্রশংসার কাজ করিয়াছেন, জগৎ বাবু আসিতেই মহা গর্ব্বভরে তাঁহার নিকট এই গল্প করিলেন।

জগৎ বাবু অবশ্য তাঁহার ব্যবহারে মনে মনে মহা ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং সুখীবালাকে গোপনে ৫০০ শত টাকা প্রেরণ করিয়া এই ব্যবহারের প্রতিকার করিলেন।

এখন তাঁহার পকেটের যে নোট বুকে তিনি এইরূপ লুকান খরচ পত্র টুকিয়া রাখিতেন, সেইখানি কিরূপে একদিন তাঁহার পকেট হইতে বিছানায় পড়িয়া গিয়াছিল। চারু গৃহে আসিয়া সেই বইখানি লইয়া পড়িতেছিল। পড়িতে পড়িতে একবার পড়িল—"সুখী ফাইভ্ হনড্রেড" সুখীবালার নামটা কানে যাইতেই গৃহিণীর মন খারাপ হইয়া গেল—বলিলেন—"কি" ? চারু আবার বলিল "সুখী—ফাইভ হানড্রেড ?" গৃহিণী বলিলেন—"ওটার মানে কি ?"

চারু। "পাঁচশ।"

গৃহিণীর আর কিছু বুঝিতে বাকী রহিল না। যে দিন তিনি জগৎ বাবুর নিকট সুধীর গল্প করেন, সে দিন জগৎ বাবু সিন্দুক খুলিয়া পাঁচ শ টাকা লইয়াছিলেন তাহাও মনে পড়িল। কর্ত্তা আসিতেই বলিলেন—"সুধীকে পাঁচ শ টাকা দেওয়া হয়েছে?"

কর্ত্তা বলিলেন—"কে বলিল?"

গৃহিণী। "কে বলিল? কেন ওসব কথা জানতে বাকী থাকে। কেবল আমার বেলাতেই হাত দিয়ে এক পয়সা বার হয় না, তা হবে কেন? আমি যে পর, কিন্তু আমি ত আর শত্রু নই?"

কিছু দিন পূর্ব্বে গৃহিণী তাঁহার বোনঝির বিবাহের যৌতুকের গহনা গড়াইবার জন্য কর্ত্তার নিকট দুই শত টাকা চাহেন, তাহাতে জগৎ বাবু একশ টাকা দিয়া বলিয়াছিলেন "সম্প্রতি চারুর পৈতাতে ও একটা মকর্দ্দামায় অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে—এখন আর অত বেশী টাকার যৌতুক দিয়ে কাজ নেই" গৃহিণী আপাততঃ সেই খোঁটা দিতে আরম্ভ করিলেন।

জগৎ বাবু বিব্রত হইয়া সেই যৌতুক এবং এই দানের মধ্যে যে কি তফাৎ তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গৃহিণী তাহা যত বুঝিবার পাত্র তাহা পাঠক বুঝিয়াছেন। জগৎ বাবুর পক্ষপাতিতায় তিনি ভগ্ন হৃদয় হইয়া পড়িলেন, এবং ২০০ শতের স্থলে ৫০০ শত টাকা বোনঝির যৌতুক স্বরূপ আদায় করিয়াও জগৎ বাবুকে তাঁহার অপবাদ হইতে মুক্তি প্রদান করিলেন না।

এই সকল ঘটনা হইতে পাঠক বুঝিয়াছেন—জগৎ বাবু যেরূপ সরল-প্রকৃতি, সেরূপ সবল-প্রকৃতি নহেন; এবং আসলে তাহা নহেন বলিয়া তাঁহার যত সহ্য করিতে হয়—সরল বলিয়া তত নহে।

জগৎ বাবু হেঙ্গামকে বড় ভয় করেন, কিন্তু এরূপ দুর্ব্বল স্বভাবদিগের যেরূপ হইয়া থাকে—হেঙ্গাম এড়াইতে গিয়াই তিনি আরো অধিক হেঙ্গামে পড়েন, গৃহিণীর কান্না কাটায় তিনি যত নরম হন—গৃহিণীর জুলুমও তত বাড়িয়া উঠে। তিনি একটু জবরদস্ত লোক হইলে আর এরূপ ঘটিত না। যাহা হউক এই কারণে স্ত্রী সমাজে জগৎ বাবু আদর্শ স্বামী, পুরুষ মহলে স্ত্রৈণ বলিয়া রাষ্ট্র। ইহাতেও সুবিধার ভাগ জগৎ বাবুর স্ত্রীর—আর অসুবিধার ভাগ জগৎ বাবুর। জগৎ বাবুর স্ত্রীর এ জন্য মেয়ে মহলে মহা আদর, বিবাহ নিমন্ত্রণে তিনি সকল স্থলেই প্রধান সম্মান লাভ করেন—হাইআমলা বাঁটা, বরণডালা সাজান—প্রভৃতি স্বামী বশীকরণ-তুক তাঁহার হাত দিয়া সম্পন্ন না হইলে কন্যার মাতাগণ কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না। আর জগৎ বাবু বেচারা এই জন্য বন্ধু মহলে Chicken-hearted baby, কাপুরুষ, স্ত্রৈণ, এই সকল নামে সম্ভাষিত হন। তবে এ সকল ঠাট্টা বিদ্রুপও জগৎ বাবুর সহ্য হয় কিন্তু তাঁহার অমঙ্গল ভয়ে আকুল

হইয়া মাঝে মাঝে গম্ভীর ভাবে যখন তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার ব্যবহার সংযত করিতে পরামর্শ প্রদান করে, তখনই তিনি বিব্রত হইয়া পড়েন।

জগৎ বাবু যে তাঁহার বন্ধুদিগের পরামর্শে এত অসন্তুষ্ট হন—তাহার একটা কারণ, তিনি তাঁহার নিজের দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণ বোঝেন। তিনি বেশ জানেন—তিনি যদি গৃহিণীর কান্নাকাটা না মানিয়া নিজের সংকল্পে দৃঢ় থাকিতে পারেন, তাহা হইলে ক্রমে তাঁহার কান্নাকাটাও কমিয়া আসে। এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি যে চেষ্টা করেন না—এমনো নহে।

গৃহিণীর সহিত কোন বিবাদ বাধিলে সাধারণতঃ বিবাদের প্রথম ভাগে তিনি প্রায়ই বেশ অটল থাকেন,—কিন্তু এমনি তাঁহার দুর্ভাগ্য—পরে এই অস্বাভাবিক অটলতাই সময় সময় আবার বিশেষরূপে তাঁহার পরাজয়ের কারণ হয়।

জগৎ বাবুর প্রথম সন্তান অতি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। গৃহিণীর ইচ্ছা তাহাকে ঔষধের সাহায্যে হৃষ্টপুষ্ট করিয়া তোলেন, জগৎ বাবু বুঝিতেন তাহাতে মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গলই হইবে। তিনি কোন ঔষধ দিতে চাহিতেন না। গৃহিণী নিরাশ হইয়া অবশেষে লুকাইয়া টোটকা আরম্ভ করিলেন। তাহাতে ক্রমে তাহার শরীর একেবারে এমন ভগ্ন হইয়া পড়িল, যে তখন বাধ্য হইয়া জগৎ বাবুও তাহাকে ঔষধ ব্যবহার করিতে দিলেন, কিন্তু অজস্র ঔষধেও আর তখন কোন ফল হইল না, অকাল মৃত্যুর কোলে সে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গৃহিণীর মনে হইল—জগৎ বাবুর দোষেই তিনি পুত্রহীনা হইলেন—যথেষ্ট ঔষধাভাবে সে মারা গেল, জগৎ বাবুও বুঝিলেন—তিনিই দোষী, মর্ম্মাহত হইয়া নিজের দুর্ব্বলতাকে তিনি অভিসম্পাৎ করিতে লাগিলেন।

ইহা ছাড়া তাঁহার অন্য উপায় কি? তাঁহার কষ্টের কারণকে তিনি গালিই দিতে পারেন, দূর করিতে ত তাঁহার ক্ষমতা নাই। এইরূপ স্বভাব লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই স্বভাবেই তাঁহার নিজত্ব, এ নিজত্ব ভঙ্গ করা বিধাতার হাতে, তাঁহার হাতে নহে।

লোকে কিন্তু এ কথা ঠিক বুঝিতে পারে না, তাহারা ভাবে 'যাহা হওয়া উচিত—স্বভাব অতিক্রম করিয়াই বা তাহা না হইবে কেন?' তাহাই প্রার্থনীয়। কিন্তু সংসারে তাহা হয় না। জগৎ বাবুও তাহা প্রার্থনা করিতেন কিন্তু দেখিতেন তাহা হইতেছে না। কেবল গৃহিণীর সহিত ব্যবহারে নহে, বাল্যকাল হইতে যেখানেই তাঁহার সংকল্পের সহিত দুর্ব্বলতার যুদ্ধ বাধিয়াছে—সেইখানেই প্রায় তাঁহার দুর্ব্বলতার জয় হইয়াছে।

আমরা পর পরিচ্ছেদে তাঁহার বাল্য জীবন সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জগৎ বাবুর মাতার দেবধর্ম্মে অতিশয় নিষ্ঠা ছিল, পূজা অর্চ্চনা লইয়াই তিনি

প্রায় থাকিতেন ; তাঁহার এই ধর্ম্মের ভাব জগৎবাবুর মনেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। তবে ঘটনা ও অবস্থার প্রভেদে সকল সময়ে ঠিক সমান ভাবে ইহার প্রভাব তাঁহার মনে রক্ষিত হয় নাই। বাল্যকালে জগৎ বাবু শালগ্রাম শিলার প্রতি বিশেষ ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। প্রত্যহ সকালেও সন্ধ্যারতি সময়ে মাতার সহিত পূজা গৃহে গমন করিতেন, এবং পূজা শেষে মা যে প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইতেন. জগৎ বাবুও ঠিক সেই প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিতেন। জগৎ বাবু সাত বৎসর বয়সে স্কুলে ভর্ত্তি হন, ইহার পর এক বৎসর না যাইতে যাইতে তাঁহার প্রার্থনা পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইল। মাতার প্রার্থনার আর তিনি এখন অনুসরণ করেন না—প্রণাম করিবার সময় তিনি এখন মনে মনে বলেন "হরি—আজ যেন আমি ফার্ষ্ট হই—আজ যেন মাষ্টার আমাকে না দাঁড় করাইয়া দেয়,—মন্মথ যেন আজ আমার সঙ্গে ভাব করে'—ইত্যাদি।

১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার এইরূপ প্রার্থনা চলিল, তাহার পর অন্যরূপ হইল।

একদিন বালক জগৎকে খেলার সময় কাঁদিতে দেখিয়া উপর ক্লাশের একজন বালক তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"জগ কি হইয়াছে" ?

বালক বলিল—"দেবী আমাব পেন্সিল কাড়িয়া নিয়াছে, আর মারিয়াছে—"

বামাচরণ দেবীকে ধমকাইতেই সে তাহা একেবারে অস্বীকার করিল, এবং সরিয়া গিয়া পশ্চাৎ হইতে দুই জনকেই ভ্যাংচাইয়া চলিয়া গেল। জগ রাগিয়া বলিল—"আচ্ছা থাক, আমি বলিয়া দিব"

বামাচরণ বলিল—"কাহাকে—মাষ্টারকে ? কিন্তু তুমি ত প্রমাণ দিতে পারিবে না ?"

সে বলিল "না ঠাকুরকে ?'

বামাচরণ। "কোন ঠাকুরকে ?"

জগ। আমাদের শালগ্রাম ঠাকুরকে ? তিনি উহাকে জব্দ করিবেন—"

বামাচরণ হাসিয়া বলিল, "শালগ্রাম ত পাথর, তোমার কথা কি তাঁহার কানে যায়— ? তাহা হইলে ঐ থামটাকেও ত বলিতে পার ?"

বালকের প্রাণটা হঠাৎ চমকিয়া উঠিল, কথাটায় তাহার মনে বড়ই আঘাত লাগিল। সে বাড়ী গিয়া আরতির সময় শালগ্রামের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল—তাহার মনে হইল—তাইত সত্যইত পাথর। সে দিন আর তেমন ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সে প্রণাম করিতে পারিল না। পরদিন মাকে বলিল—"মা শালগ্রাম ত পাথর—তবে আমাদের কথা কি করিয়া শোনেন ?"

মা বলিলেন—"ছি বাছা ও কথা কি বলে ? উনিই হরি। ঐ পাথরের মধ্যেই হরির অধিষ্ঠান—"

বালক বলিল—"সকল পাথরেই হরি আছেন ?"

মা। তিনি সকল জায়গাতেই আছেন—কিন্তু আমরা ত তা বুঝতে পারিনে, তাই আমাদের পূজা নেবার জন্য এই শালগ্রাম শিলায় তিনি আবির্ভাব হয়েছেন”—

এই কথার মধ্যে যে তত্ত্ব আছে তাহা বালক অবশ্য বুঝিল না, কিন্তু তাহার মা ভাবিলেন সে এবার বেশ বুঝিয়াছে, বালক নিজেও তাহাই ভাবিয়া সন্তুষ্ট হৃদয়ে চলিয়া গেল। কিন্তু পরদিন আবার তাহার সন্দেহ হইল, সে স্কুলে বামাচরণকে জিজ্ঞাসা করিল—“যদি পাথর হরি নহেন ত হরি কে ?” ব্রাহ্ম বামাচরণ বলিল “ঈশ্বরই হরি”। ইহাতে যে বালক বিশেষ জ্ঞানলাভ করিল তাহা নহে, সে আবার বলিল—“ঈশ্বর কিরূপ ?”

বামাচরণ বলিল—“ঈশ্বর নিরাকার, জ্ঞানস্বরূপ, মঙ্গলময়, তিনি এই জগৎ সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা এ চক্ষু দিয়া দেখিতে পাই না, কিন্তু জ্ঞান চক্ষু দিয়া দেখিতে পাই, তাঁহার নামে তাঁহার সৃষ্ট বস্তুর পূজা করিলে তাঁহার অপমাননা করা হয়, একমাত্র তাঁহার আরাধনাই ঐহিক পারমার্থিক মঙ্গলের কারণ”। বামাচরণ সমাজে যেরূপ বক্তৃতা শুনিত যতদুর পারে তাহা মনে করিয়া বলিল, কিন্তু এ সকল কথা জগতের হৃদয়ঙ্গম হইল না, বরঞ্চ শালগ্রামকে হরি বলিয়া বুঝা ইহাপেক্ষা তাহার পক্ষে সহজ ছিল। কিন্তু ইহার পর তাহাও সে পারিল না, সে কেবল এইমাত্র জানিয়া রাখিল ঈশ্বর নিরাকার তাঁহাকে দেখা যায় না। ক্রমে বালক যত বড় হইতে লাগিল বামাচরণের সহিত তাহার তত ভাব বাড়িতে লাগিল, এবং এই সূত্রে আরো অনেক ব্রাহ্ম বালকদিগের সহিত তাহার আলাপ হইল। তাহাদের সহিত নিয়মিত জগৎ বাবু ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে লাগিলেন, আগে যাহা তাঁহার দুর্ব্বোধ্য হইয়াছিল, ক্রমে তিনি তাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন। ষোল বৎসর বয়সে জগৎ বাবু এণ্ট্রেন্স পাস করেন। তখন নূতন উৎসাহে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ, তিনি তখন প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প গোপন রহিল না, পিতা মাতার কর্ণে তাহা উঠিল। মা তাহা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—বলিলেন—“বাবা তোকে মানুষ করিয়াছি কি পর করিবার জন্য ? আমাদের ছাড়িয়া তুই কোথায় যাইবি বাবা” ? পিতা রাগ করিয়া বলিলেন—“তুই যদি ব্রাহ্ম হইবি ত তোকে ত্যাজ্য পুত্র করিব”। তিনি তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া যত দিন না বিবাহ হইল ততদিন একেবারে বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, তাহার পর বিবাহ দিয়া যখন তাঁহার মনে হইল তাহাকে নিগড় পরাইয়াছেন, তখন মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

জগৎ বাবু আর প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইল না। সেই প্রথম যৌবনে তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মের ভাব প্রবল, উৎসাহের ভাব প্রবল, ভাল বাসার ভাব প্রবল, সেই সঙ্গে সামাজিক অবনতির প্রতিও

তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে, বিবাহের পর জীবনের এই সমস্ত আবেগ সমস্ত আশা একটি মাত্র প্রণালীতে প্রবাহিত হইল, তাঁহার নব বিবাহিত স্ত্রীকে নিজের মনের মত করিয়া গঠন করিতে তিনি তাঁহার সমস্ত উৎসাহ অর্পণ করিলেন। যখন তাঁহার বিবাহ হয় তখন স্ত্রীর বয়স ১০ কিন্তু ৩।৪ বৎসরের মধ্যেই সে একরূপ লেখা পড়া শিখিল, ধর্ম্মের ভাবেও তাহার হৃদয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, জগৎ বাবু তাহাতে পরম সুখী হইলেন, সংসারে থাকিয়া তিনি আপনাকে ত্রৈলোক্যস্বামী জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

পিতা যখন তাঁহাকে ব্রাহ্ম হইতে দেন নাই, তখন তাঁহার কষ্টের সীমা ছিল না, আপনার দুর্ব্বলতায় তিনি যথেষ্ট অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বাসের বিপরীত কাজ করিতে বাধ্য হইয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল তিনি আত্মহত্যা করিলেন। কিন্তু বিবাহের পর ক্রমে সান্ত্বনা লাভ করিলেন। তাঁহার মনে হইল—"আমার মত দুর্ব্বল লোকের ধর্ম্ম প্রকাশে কি লাভ ? আমি কি কখনো সুদৃঢ় বিশ্বাস-বলে মনুষ্যের উচ্চতম কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইতাম ? রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন যাঁহারা মহাত্মা লোক—শত বাধা অতিক্রম করিয়া জীবন দিয়া সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহারাই সক্ষম, তাঁহাদের বিশ্বাসেই জগৎ জাগরিত হইবে, তাঁহাদের দৃষ্টান্তই জগৎ অনুকরণ করিবে। আমি কে ? একটা অঙ্গুলির তর্জ্জনে দাঁড়াইতে যে অক্ষম তাহার ধর্ম্ম বিশ্বাস প্রকাশে কিম্বা অপ্রকাশে জগতের কি ক্ষতি বৃদ্ধি ! কিন্তু ?

এইখানে আবার তাঁহার মন কিন্তুতে পূর্ণ হইয়া উঠে।

জগতের ক্ষতি বৃদ্ধি—? জগৎ কি ? ক্ষুদ্র মনুষ্যের সমষ্টিতেই জগৎ, যদি এক জন মনুষ্যও তাহার কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হয় তাহাতেই জগতের ক্ষতি, আমার নিজের ক্ষতিতে জগতেরো ক্ষতি, আমার নিজের বৃদ্ধিতে জগতেরো বৃদ্ধি। মনে মনে আমি পুতুল পূজা করিতেছি না সত্য, মনে মনে আমি সত্যধর্ম্মের বিশ্বাসী সত্য, কিন্তু বাহ্যানুষ্ঠানে বাহ্য ব্যবহারে ইহার বিপরীত কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া কি আমি নিজের ও জগতের ধর্ম্ম হানি করিতেছি না ?

জগৎ বাবু এ প্রশ্নে আপনার নিকট আপনি নিরুত্তর হইয়া পড়েন, তখন নিজের প্রতি তাঁহার নিজের অনুকম্পা উপস্থিত হয়, সেই করুণা বলে ঈশ্বরের করুণা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি সে অপরাধের মার্জ্জনা অনুভব করেন। তিনি মনে করেন—"কর্ত্তব্য কি সকলের পক্ষে সমান ? অবস্থানুসারে লোকের ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম বিশ্বাস সর্ব্বতোভাবে অখণ্ড রাখিয়া জগতের জন্য কার্য্য করা সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ কর্ত্তব্য, কেননা তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য সাধিত হয়, কিন্তু সকলের মহৎ কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। সংসারে গৃহ কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্যক্তি অনেক আছে কিন্তু বুদ্ধ যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি কয় জন মহৎলোক জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ? ক্ষুদ্র লোকের মহৎ কার্য্য সাধিত করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমি যদি পিতা মাতা ত্যাগ করিয়া সমাজ ত্যাগ

করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে না আমি ঈশ্বরধর্ম্ম রাখিতে পারিতাম, না মানব ধর্ম্ম রাখিতে পারিতাম। ঈশ্বর আমাকে ক্ষুদ্র লোক করিয়া জন্ম দিয়াছেন, আমি সংসারের ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য পালন করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য সাধন করিব, আমি পিতা মাতার আজ্ঞা পালন করিয়া স্ত্রীকে সহধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া সন্তুষ্ট থাকিব—কেন না ইহা পালনই আমার পক্ষে সহজ, অন্য কর্ত্তব্য আমার পক্ষে অসাধনীয়। এই কর্ত্তব্য পালন করিতে অন্য কর্ত্তব্যের যদি হানি হয়, তাহা তিনি মার্জ্জনা করিবেন—কেন না তিনি আমাকে ক্ষুদ্র করিয়া জন্ম দিয়াছেন।

জগৎ বাবু এইরূপ ভাবিয়া প্রশান্ত হৃদয়ে গৃহধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহার এ সুখ শান্তি স্থায়ী হইল না। জগৎ বাবু যে বৎসরে চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া ডাক্তার উপাধি প্রাপ্ত হইলেন, যৌবনের আনন্দ উচ্ছাস লইয়া, যে বৎসরে বিংশতি অতিক্রম করিয়া এক বিংশতিতে পদার্পণ করিলেন, সেই বৎসরে তাহার প্রাণ হইতে প্রিয়তমা পঞ্চদশ বর্ষীয়া পত্নী এক মৃত সন্তান প্রসব করিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিল। এই নিদারুণ আঘাতে জগৎ বাবুর সমস্ত আশা, আনন্দ, অভিলাষ, উদ্যম এমন কি ধর্ম্ম বিশ্বাস পর্য্যন্ত শিথিলমূল হইয়া পড়িল। দিন কতক তিনি বিশ্বাসহীন অস্থির জীবন লইয়া উন্মত্তের মত উদ্দেশ্য শূন্য জীবন বহন করিয়া বেড়াইলেন। এতদিন প্রাণী বিজ্ঞানের অনাত্মবাদ তিনি মিথ্যা বলিয়া অনুভব করিতেন, স্নায়বীয় শক্তির যন্ত্রবৎ ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়াও ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদিগের প্রমাণ যুক্তি অগ্রাহ্য করিতেন—কিন্তু এখন সেই জড় বিজ্ঞানের পর পারে তিনি আর কিছু দেখিতে পাইলেন না, সহসা যেন তাঁহার নয়ন অন্ধ হইয়া গেল। যাহার বর্ত্তমানে সংসার মঙ্গলময় আত্মাময় বলিয়া বোধ হইত—তাহার অবর্ত্তমানে সংসার অর্থহীন যন্ত্র বিশেষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল, ইহার মধ্যে জ্ঞানময় আত্মার প্রভাব আর তিনি দেখিতে পাইলেন না, অমঙ্গল, অজ্ঞান, জড়তা, মৃত্যুমাত্র এই জগতের সর্ব্বস্ব বলিয়া তিনি অনুভব করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার জীবনে আর একটি ঘটনা ঘটিল। তাঁহার স্ত্রীর স্বসম্পর্কীয় এক বিধবার চিকিৎসা ভার তাঁহার হস্তে আসিয়া পড়িল। বিধবার মাতা ভিন্ন আর কেহ ছিল না, সে স্বামীর অল্প যাহা টাকা কড়ি পাইয়াছিল, তাহা লইয়া মাতৃগৃহে বাস করিত, সেইখানে চিকিৎসা-উপলক্ষে জগৎ বাবুর সহিত তাহার আলাপ হইল। ক্রমে তাঁহাদের ঘনিষ্টতা বাড়িতে লাগিল, রোগীকে দেখিতে আসিয়া জগৎ বাবু সেইখানে দিন কাটাইতে আরম্ভ করিলেন, রোগী যখন আরোগ্য হইল, তখনও তিনি তাহাকে দেখিতে আসা বন্ধ করিলেন না। বাহিরে গোল যোগ আরম্ভ হইল, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার ব্যবহার অনুচিত বলিয়া বিবেচনা করিল, তিনি তর্ক করিতে উদ্যত হইলেন, বলিলেন "কিছুমাত্র অনুচিত নহে, কেন না তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন"।

তিনি মনে করিলেন ইহার উপর আর কাহারো কিছু বলিবার নাই। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। সকলেই ইহাতে ক্রুদ্ধ, বিরক্ত, আশ্চর্য্য হইয়া এক বাক্যে তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি ও মূর্খতার নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বিধবার সম্বন্ধে এত কথা বলিল, যে তাহার কোনটিই বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া বিশ্বাস সত্বেও তিনি মনে মনে দমিয়া গেলেন। তখন তাহাদের সহিত ঘোর তর্ক করিলেন, কিন্তু পরে তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল—তিনি ভাল কাজ করিতেছেন কি না।

আসল কথা জগৎ বাবু যে সেই বিধবাকে প্রগাঢ় প্রেম হইতেই বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন তাহা নহে; করুণা জাতীয় প্রেম এবং সামাজিক বিধির বিপক্ষে কার্য্য করিবার ইচ্ছা হইতেই তাঁহার এই বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়। সুতরাং বিধবার নিকট বিবাহে প্রতিশ্রুত হইলেও বন্ধুদের কথায় তাহা তাঁহার এখন বিবেচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু অধিক দিন এ সম্বন্ধে তাঁহাকে অস্থিরচিত্ত থাকিতে হইল না, দুই এক দিনের মধ্যেই এ কথা পিতার কর্ণে উঠিল, তিনি অবিলম্বে এক কন্যা স্থির করিয়া তিন চারি দিনের মধ্যেই তাঁহাকে বিবাহ দিয়া দিলেন। বিবাহের পর জগৎ বাবুর এত লজ্জা বোধ হইল, যে কিছু দিন তিনি বিধবার বাড়ী একেবারে যাইতে পারিলেন না; তাহাদের খবর বার্ত্তাও আর কিছু পাইলেন না। ৫।৬ মাস পরে একদিন সেই বাড়ীর নিকট দিয়া গাড়ি করিয়া যাইবার সময় দেখিলেন গৃহের দ্বার রুদ্ধ, বুঝিলেন সেখানে কেহ নাই। পরে সন্ধান করায় কেহ বলিল—বিধবা আত্মহত্যা করিয়াছে, আর তাহার মা কাশী গিয়াছে—কেহ বলিল দুজনেই কাশী গিয়াছে। জগৎ বাবুর প্রাণে আবার এক ভয়ঙ্কর আঘাত লাগিল। তিনি কি ভয়ানক কাজ করিয়াছেন তাহা বুঝিলেন, অনুতাপে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি জীবনে অন্য যত অন্যায় করিয়াছেন, ইহার পক্ষে তাহা লঘু। সে সকল তাঁহার সাহসের অভাব হইতে প্রসূত—ইহা তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাসের অভাব হইতে ঘটিয়াছে! তিনি সেই বিধবার পথে না আসিলে তাহার এই শোচনীয় পরিণাম হইত না! যদিই বা আসিলেন কেন বিবাহ করিলেন না, তাহাকে আশা দিয়া তিনি প্রতারণা করিয়া শেষে তাহার এই মৃত্যুর কারণ হইলেন; তাহার পরিণীতা পত্নী হইলে আজীবন ধর্ম্মপথে থাকিয়া সে কি সুখে জীবন কাটাইতে পারিত না? তাঁহারি সাহসের অভাবে, বিশ্বাসের অভাবে এইরূপ হইয়াছে! ধর্ম্মের অভাব কি যে ভয়ানক, তাহা হইতে মানুষ কিরূপ জঘন্য কাজও করিতে পারে তাহা তিনি বুঝিলেন। এই ঘটনা হইতে আবার তাঁহার ধর্ম্মের বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল, এক আঘাতে তাহা দূর হইয়াছিল—অন্য আঘাতে তাহা তিনি ফিরিয়া পাইলেন।

তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পীড়িত অনুতপ্ত হৃদয় কিছু দিন আর সংসারের দিকে চাহিতে অক্ষম হইল, বৎসরাবধি তিনি স্ত্রী কেমন চোখে দেখিলেন না, কিন্তু ক্রমে আবার তিনি আত্মস্থ হইলেন, বুঝিলেন বিবাহ করিয়া তাহাকে অবহেলা করা

তাঁহার অন্যায়, তাঁহার কর্ত্তব্যের প্রতি আবার তাঁহার দৃষ্টি পড়িল—যাহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে সুখী করিতে যত্নবান হইলেন। গৃহিণীর দ্বাদশ বর্ষে বিবাহ হইয়াছিল—ত্রয়োদশ বর্ষে তিনি স্বামী কর্তৃক গৃহীতা হইলেন। এক বৎসর প্রায় তিনি পিত্রালয়েই ছিলেন। জগৎবাবু তাঁহার পূর্ব্ব স্ত্রীর ন্যায় ইহাঁকেও জ্ঞান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি এখনো জগৎ বাবুর মনে আদর্শস্বরূপ জাগ্রত ছিলেন। কিন্তু কিছুতেই আর এ স্ত্রীকে তিনি সে আদর্শে গড়িয়া তুলিতে পারিলেন না। জগৎ বাবুর নিজেরও আগেকার মত আর উদ্যম নাই, কর্ত্তব্য ভাবিয়া তিনি তাহাকে শিক্ষা দিতে আসেন, কিন্তু তাঁহার অবসর অল্প, কাজ কর্ম্ম সারিয়া রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে তিনি তাহাকে শিখাইতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু গৃহিণীরও এত পড়ায় মন নাই—যে পড়ার আগ্রহে নিদ্রার হস্ত হইতে তিনি অব্যাহতি পান। সুতরাং দাঁড়ায় এই, জগৎ বাবু বকিয়া যান, গৃহিণী ঢোলেন। ইহা দেখিয়া জগৎ বাবু দিনের বেলা একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিলেন, স্থির রহিল গৃহিণী ও জগৎ বাবুর ভগিনী সুমতি উভয়ে সেই সময় তাঁহার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিবেন। দিন কতক নিয়ম মত শিখান চলিল, তাহাতে সুমতিরই লাভ হইল, কিন্তু গৃহিণীর বেশী কিছুই হইল না, দিনকে দিন তিনি অমনোযোগী অবাধ্য হইতে লাগিলেন, জগৎ বাবু বিশেষ কিছু বলিলেই কান্নাকাটি আরম্ভ করিতেন। এই অবস্থায় তিনি অন্তঃস্বত্ত্বা হইলেন, পড়া শুনা বন্ধ হইল, তিনি পিতৃগৃহে গমন করিলেন। যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহাকে আর কে পায়—তখন ছেলে পিলে দেখিবেন, না স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য তাঁহার কাছে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিবেন বা পড়া আওড়াইবেন। জগৎ বাবু দেখিয়া শুনিয়া নিরাশ হইয়া তাঁহার হাল ছাড়িয়া দিলেন। স্ত্রীকে মনের মত করিতে পারিলেন না—সন্তানদিগকে মনের মত করিয়া তুলিবার বাসনা তাহার হৃদয়-মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিল।

কিন্তু পরে দেখিলেন তাহাতেও পূর্ণ বাধা, স্বামী স্ত্রী একই মত না হইলে সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। তিনি যেখানে সত্য বলিতে শেখান, স্ত্রী সেখানে মিথ্যা বলিতে শেখান। তিনি যদি মেয়েকে লেখাপড়া করিবার কথা বলেন ত গৃহিণী নানা উপহাস বিদ্রূপে তাহাকে নিরুৎসাহ করেন। তিনি যদি তাহাতে কোন কথা কহেন তবে ক্রমে ঝগড়া বাধে, সমস্ত দিন গৃহিণী মুখ ভার করিয়া থাকেন, না হয় ছেলেদের লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যান, মাস খানেক আর আসেন না—তাহার মধ্যে তাঁহার শিক্ষার চতুর্গুণ বিপরীত তাহারা শিখিয়া আসে। এইরূপ কারণে ক্রমে তাঁহার ইহাতেও যত্ন শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল, ছেলেদের জন্য মাষ্টার পণ্ডিত রাখিয়া দিলেন এই মাত্র। যাহা হউক তখন সংসার নির্ব্বিবাদে চলিতে লাগিল। এই অবস্থায় সুমতি পীড়িত হইয়া শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে আগমন করিল। সুমতির তখন বয়স ১৮ কিন্তু তখনো তাহার সন্তান হয় নাই। তাহার একমাত্র ননদকে

শ্বশুর কুলীন করিয়া রাখেন—তাহার একটি কন্যা হইয়া সে বিধবা হয়। বিধবা হইবার কিছুদিন পরে ননদেরও মৃত্যু হয়। সুমতি এই পিতৃমাতৃহীন শিশুকে আপনার সন্তানের মত পালন করিয়াছিল, পিত্রালয় আসিবার সময় সে ইহাকে সঙ্গে লইয়া আসে—এই কন্যাই স্নেহলতা। পিত্রালয়ে আসিয়া সুমতির মৃত্যু হইল, মরিবার সময় মা ও দাদাকে কন্যাটি সে সমর্পণ করিয়া গেল। স্নেহলতা তখন আট বৎসরের। জগৎ বাবু দেখিলেন তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে যে সকল গুণযুক্ত দেখিতে চান, এই বালিকার সেই সকল গুণ আছে। বালিকা, নম্র অথচ সরল, বালিকা অলস নহে, বালিকা বিদ্যানুরাগী, সে সত্য কথা বলে, স্বাভাবিক কোমলভাবে তাহার হৃদয় কোমল। জগৎ বাবু দিন দিন তাহাকে নিজের ছেলেদের মত ভালবাসিতে লাগিলেন, জগৎ বাবুর মাও তাহার গুণে বশীভূত হইলেন। জগৎ বাবুর স্ত্রীও প্রথম প্রথম তাহাকে যত্ন করিতেন, তাহাকে ভাল বাসিতেন, কিন্তু যখন দেখিলেন জগৎ বাবু তাহাকে বড় বেশীরকম ভাল বাসিতেছেন,সারাদিন তাহার গুণের কথা তাঁহার মুখে লাগিয়া আছে—টগর তাহার মত নহে বলিয়া যখন তখন জগৎ বাবু দুঃখ প্রকাশ করেন—তখন তাঁহার মনে ক্রমে স্নেহলতার প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল, ক্রমে স্নেহলতা তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে একটা অসুখের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সে দিন রাত্রে যখন জগৎ বাবু বাড়ীতে ফিরিলেন, তখন রাত ৮ টা। তাঁহার বাহিরের বসিবার ঘরে আসিয়া দেখিলেন তখনো ঘর অন্ধকার। আশ্চর্য্য হইলেন, চাকরদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা বলিল, তেল পায় নাই তাই বাতি তৈয়ার করিতে পারে নাই। তিনি বুঝিলেন আবার একটা নূতন গোলযোগ হইযাছে; বাড়ী ভিতর গিয়া দেখিলেন, তাঁহার শয়ন ঘরেও আলো নাই। গৃহিণী বারান্দায় দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছেন। গৃহিণী ইচ্ছা করিলে যে গৃহে আলো জ্বলিত না তাহা নহে, ভাঁড়ার ঘরের কাজ শেষ হইলে স্নেহলতা চাবি তাঁহার কাছেই রাখিয়া যাইত। আসলে ইচ্ছা করিয়াই তিনি অন্ধকার রাখিয়াছিলেন। কর্ত্তা গৃহে আসিয়া বলিলেন—"ব্যাপার খানা কি? ঘর সব অন্ধকার কেন?"

গৃহিণী বলিলেন—"তোমার কর্ম্মিষ্ঠি—সুবোধ, শিষ্ট শান্ত মেয়ের কর্ম্ম—সে যে কোথায় থাকে তার ঠিক নাই,—কেহ খুঁজে পাচ্ছে না। টগর যদি এরূপ করিত ত আমি মজা দেখাইতাম—কিন্তু ওকে ত কিছু বলবার যো নেই"—

জগৎ বাবু বলিলেন—"নিশ্চয় তার কোন অসুখ করেছে, বুঝি বিছানায় শুয়েটুয়ে আছে দেখ দেখি" জগৎ বাবু তাহাকে খুঁজিবার জন্য ঘরের বারান্দা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন—দেখিলেন স্নেহলতা আসিতেছে। জগৎ বাবু বলিলেন—এতক্ষণ কোথা ছিলে?—" সে আস্তে আস্তে বলিল—"ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম"

জগৎ বাবুর স্ত্রী বলিলেন—"হ্যাঁ ডাক্তার ডাকাও,-মেয়ে অসুখে সারা হয়ে পড়েছে। ভ্যাল্লা যাহক আদুরে করে তুলেছ—শেখাও আরো লেখাপড়া শেখাও—মেয়েকে যে বৌ করবে—সে বর্ত্তে যাবে"

বালিকা তাঁহার বকুনি শুনিবার জন্য না দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি ভাঁড়ার ঘরে গেল।

জগৎ বাবু বলিলেন "বড় বৌ,কি একটা দোষ হইয়াছে কি না হইয়াছে কেন উহাকে অমন করিয়া বকিতেছ! ছেলে মানুষ মা বাপ নাই, তোমার কি একটু মায়া হয় না?"

গৃহিণী বলিলেন—মা বাপ নাই? মাবাপের বেশী আছে—কোন মা বাপ তোমার মত আদর দেয়, ওর ইহকাল পরকাল তুমি খেলে?"

জগৎ। সে ভাবনা তোমার ভাবিতে হইবে না, তুমি কেবল উহার সঙ্গে একটু ভাল মুখে কথা কহিও দেখি।

গৃ। আমি আদর করা সইতে নারি—অন্যায় দেখিলে আমার বলিতেই হইবে, তাতে যদি না তোমার সহ্য হয়—তাতে যদি মেয়ের এতই ব্যথা লাগে, যদি ফুলের ঘায়ে ওঁর মূর্চ্ছা আসে ত দাও না কেন শীঘ্র বিয়ে দিয়ে, ওরও কষ্ট যাবে—আমারো কষ্ট যাবে, সেই ত ভাল—

টগর ঠিক একটু আগে এখানে আসিয়াছিল; সে বলিল "মা দাদা বলছিল কনেকে বিয়ে করবে না—সে বড় দুষ্ট"

জগৎ বাবু বলিলেন "আচ্ছা এতই তোমার অসহ্য হইয়াছে ত তাহাই হইবে" বলিয়া জগৎ বাবু চলিয়া গেলেন।

গৃহিণী বলিলেন—"কোথা যাও খাইয়া যাও"

জগৎ বাবু বলিলেন "আমার কাজ আছে—খাইবার সময় নাই"

গৃহিণী বলিলেন—"মাথা খাও খাইয়া যাও"

এই সময় স্নেহলতা এইখানে আসিয়া জগৎ বাবুকে অনাহারে যাইতে দেখিয়া বলিল—"মেশমশায় খাবে না?" মেশমশায় ক্রুদ্ধস্বরে উত্তর করিলেন "না"

জগৎ বাবু চলিয়া গেলেন, স্নেহলতা ভাবিল তাহার দোষেই এরূপ হইল। তাহার উপরই রাগ করিয়া তিনি খাইলেন না, তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। এই কষ্টের উপর গৃহিণী আবার বকুনি আরম্ভ করিলেন। তাহার দোষেই যে জগৎ বাবুর খাওয়া হইল না, অশেষ প্রকারে তিনি তাহাকে ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, এবং বুঝাইবার ভাষা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

———

সঙ্গীত-শিক্ষা। *

ইমন্ কল্যাণ—তাল কাওয়ালি

চতুরঙ্গ।

চতুরঙ্গ রসসন গাওয়ে হি গায়ান গোনি আয়ে মুমিদা সা কে ঘরকা জু হস্তী তুরঙ্গ সরস সুখ পাঁওয়ে তান মান সুন্দর জরিসর পাহিয়া ॥ ১ ॥

না দ্রে দ্রে দানি তাদানি দিয়ানারে তোম তানা নেতা নেতা না না না না দ্রে দ্রে দানি তাদানি তেদারে তা না না না না না দিম তা না দিম তা না না না না না না না না না না না ধ্রাং ধ্রাং ধ্রাং ধ্রাং ॥ ২ ॥

দেরেকেটে দোম দেরেকেটে দোম ক্রমকট ক্রমকট থারেকুটু থারেকুটু থাক জাগো থাক জাগো নাগ্ দিগ্ দিগ্ থাং নুং নুং নুং নুং নুং নুং নুং নুং দিগ্ দিগ্ তোম আমোয়া মোয়া মোইয়া আমোইয়া তিয়াইয়া তিয়াইয়া তিয়াইয়া তিয়াইয়া তিয়া-ইয়া ॥ ৩ ॥

সা সা সা রে গা গা রে গা গা রে সা পা পা গা গা রে সা সা রে গা মা পা পা ধা ধা পা ধা ধা পা নী নী ধা নী নী ধা ধা পা পা মা মা গা গা রে গা গা রে সা ॥ ৪ ॥

* ইতিপূর্ব্বে ভারতীতে সঙ্গীত-শিক্ষার সঙ্কেত প্রণালী বিস্তারিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা তাহা পড়েন নাই, তাঁহাদিগের জন্য পুনরায় উক্ত প্রণালী সংক্ষেপে নিম্নে বুঝান যাইতেছে।

রে সুর কোমল হইলে রে না লিখিয়া রি লিখিতে হইবে। গা সুর কোমল হইলে গা না লিখিয়া সেই স্থলে গ লেখা যাইবে। ধা সুর কোমল হইলে ধা না লিখিয়া ধ লিখিতে হইবে। নী কোমল হইলে দীর্ঘ নী'র পরিবর্ত্তে নি লিখিতে হইবে। ম সুর কড়ি হইলে ম না লিখিয়া মা লিখিতে হইবে।

মধ্য সপ্তকের সুরে কোন চিহ্ন থাকিবে না, উপরের সপ্তকের সুরের মাথায় কসি থাকিবে এবং নিম্ন সপ্তকের সুরের নীচে কসি থাকিবে।

গানের পদের একেকটী ভাগের পর একেকটি দাঁড়ির চিহ্ন থাকিবে এবং একেকটি পদের পর দুইটী করিয়া দাঁড়ি থাকিবে। একেকটি সুর যতগুলি মাত্রা অধিকার করিয়া থাকিবে, ততগুলি কসি চিহ্ন তাহার পার্শ্বে স্থাপিত হইবে। অর্দ্ধ মাত্রার স্থলে কসির পরিবর্ত্তে বিন্দু চিহ্ন বসিবে। সহজে একটি অক্ষর উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে, তাহাকে এক মাত্রা কাল কহে। তালের—১, ২, ৩, ০, যথাস্থানে সুরের মাথার উপরে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

গানের যে অংশটুকু দুই বিন্দুযুক্ত দাঁড়ির মধ্যে (॥ঃ ঃ॥) লিখিত হইবে, তাহা দুইবার করিয়া গাহিতে হইবে।

যে সুরের নীচে হসন্ত চিহ্ন থাকিবে, সেই সুর স্পর্শ করিয়া যাইতে হইবে মাত্র।

১ ২ ৩
সা—সা—ধা—ধা—। পা—পা—গা—পা—। গা— — রে— —। নী॰রে॰গা ॰ গা॰
চ—ত—র —ঙ্গ র— স স— ন গা— আ— — আ— —আ—ওয়ে

০
গা—গা— । পা॰মা॰ পা—গা—রে— ।
হিঁ গা — য়া — —আ—ন —

১ ২ ৩ ০
—গা—পা—পা—। ধা—ধা—পা—পা—। গা—পা—পা—পা—। পা—নী— — —।
গো—ও—নি আ আ আ আ আ আ য়ে মু— — ম—দা

১ ২
নী—ধা — — —। পা—ধা—পা—পা—।
সা —আ কে—এ—এ—এ

৩ ০ ১ ২
গা— —ধা— — । পা—পা—মা—পা—। গা—রে —পা —পা —। গা —রে— —
ঘ— র কা—আ—আ—আ— আ —আ—আ—আ — আ—আ

৩ ০
সা—। সা— —সা— —। সা—সা—ধা সা—।
জু হ — স্তী তু—র —ঙ্গ স—

সা—সা —রে —রে—। সা— —সা— — । সা—রে —রে -রে—। গা—রে—
র —স মু —খ পাঁ— —ওয়ে তা— ন মা— — — ন

গা—পা—। পা—পা—মা—মা— । গা —রে—পা—পা— ।
সু— — — — ন্দ—র জ—রি স— র পা—আ

৩ ০ ১ ২
গা—রে—পা—পা—। গা—রে—সা—সা—। রে—গা— — —। রে— — — —।
আ—আ—আ—আ— আ—আ—আ—আ— আ —আ— — ই— —য়া—

৩ ০ ১
সা— — — —। সা—সা—ধা—ধা—। পা —পা —গা —পা— ।
য়া— — — — চ —ত—র —ঙ্গ র— স স— ন

২ ৩ ০
পা—গা—গা—পা—। পা—ধা—পা—ধা— । সা—সা —সা—সা— । সা— —সা
না দ্রে দ্রে দা নি তা দা নি দি য়া না রে তোম্ তা

২ ৩
—সা— । সা—গা— —রে— । সা—সা—ধা—ধা— ।
না নে তা নে তা না না না

০ ১ ২ ৩
পা—ধা মা—ধা— । পা—পা—পা॰মা॰পা— । পা—গা— —রে— । রে—
দো দ্রে দ্রে দা নি তা দা নি তে দা রে তা

০ ১
রে—গা—পা— । পা—ধা—ধা— — । পা॰ধা॰পা॰গা॰ ।
না না না না না দি— — — — — — —ম

২ ৩ ০ ১
পা—পা— । গা— —রে— —। রে—রে—গা—পা—। পা—ধা—সা—রে— । গা—
তা না দি— —ম্ তা না না না না না না না না

২
গা—রে—রে। সা— —ধা— — ।
না না না দ্রাং দ্রাং

৩ ১ ২
পা ° মা ° পা — গা — রে — । র্সা — র্সা — ধা — ধা — । পা — পা — গা — পা — । পা °
ধ্রা — — ং ধ্রা — ং চ — ত — র — ঙ্গ র — স স — ন দে

৩
পা ° পা ° পা ° গা — — । পা ° পা ° পা ° পা ° পা — — ।
রে কে টে দোম্ দে রে কে টে দোম্

১ ২ ৩
পা — পা — পা — পা — । পা — পা — পা — পা — । র্সা — র্সা — ধা — ধা — । পা — পা —
দ্রু — ম ক — ট দ্রু — ম — ক — ট থা — রে কু — টু থা — রে —

পা — পা — । র্সা — র্সা — ধা — ধা — ।
টু থা কো জা — গো

২ ৩ ০
পা — পা — পা — পা — । পা — পা — পা — ধা — । ধা — ধা — র্সা — র্সা — । র্সা — র্সা —
থা — কো জা — গো নাগ্ দিগ্ দিগ্ থাং নুং নুং নুং নুং নুং নুং

১ ২
র্সা — র্সা । ধা — ধা — পা — — । পা — — গা — পা — ।
নুং নুং দিগ্ দিগ্ তোম্ আ — মো — য়া

৩ ০ ১ ২
— গা — রে — সা — । সা — রে — গা — — । গা — রে — সা — — । ধা — ধা - পা — পা — ।
মো — — য়া মো — ও — ও — ই — ই — য়া আ আ আ আ

৩ ০
গা — রে — সা — সা — । সা — রে — গা — — ।
আ আ আ আ মো — ও — ও

১ ২ ৩ ০
গা — রে — সা — — । সা — সা — সা — সা — । রে — রে — রে — রে — । গা — গা — —
ই — ই — য়া তি — য়া ই — য়া তি — য়া — ই — য়া তি — য়া — —

১ ২
গা — । গা — — গা — — । পা — পা — গা — — ।
ই — য়া — — তি — আ — আ — ই

৩ ০ ১ ২
গা — রে — রে — — । গা — পা — ধা — নী — । র্সা — র্সা — র্সা — — । ধা — ধা — পা —
যা — আ — তি য়া — আ — আ — আ আ আ উ ই ই ই

৩ ০
পা — । গা — রে — সা — — । সা — সা — সা — রে — ।
ই ই ই য়া সা রে সা রে

১ ২ ৩
গা — গা — রে — গা — । গা — রে — সা — — । পা — পা — গা —
গা গা রে গা গা রে সা পা পা গা

[সম্ভাবনা নাই, সক-
...সের আধার। আ...
—তখন ব...]

১ ২
সা — রে । গা — মা — পা — পা — । ধা — ধা — পা — ধা — ।
সা রে গা মা পা পা ধা ধা পা ধা

৩ ০ ১ ২
ধা — পা — নী — নী — । ধা — নী — নী — ধা ° ধা ° । পা — পা — মা — মা — । গা —
ধা পা নী নী ধা নী নী ধা ধা পা পা মা মা গা

৩
গা — রে — গা — । গা — রে — সা — — ।
গা রে গা গা রে সা।

শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

কুড়ান।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হরিশ বাবুর নিকট এক ছাগল চুরির মোকর্দ্দমা উপস্থিত। আসামীকে অত্যন্ত নিরীহ দেখিতে। হরিশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন তুই সত্যি বল্‌ছিস যে গোয়ালপাড়ার হরি নাপিতের ছাগল তুই চুরি করিস্‌ নি ?

আ। "আজ্ঞে হ্যাঁ আমি সত্যি বল্‌ছি—আমি এর কিছু জানিনে মশায়—আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী—আজ্ঞে হুজুর আমি পেরমাণ দেখাতে পারি যে হরে নাপ্তের ছাগল আমি চুরি করিনি।"

ডে। "কি প্রমাণ"

আ। "আজ্ঞে যে রাত্রে ওর ছাগল চুরি যায়, সেই রাতে আমি জেলেপাড়ায় ক- দের বাড়ী দুটো হাঁস চুরি করি। আর জেলেপাড়া গোয়ালপাড়া থেকে তিন ক্রোশ দূরে—এখন হুজুরই বিচার করেন।"

ডে। "হ্যাঁ প্রমাণ চূড়ান্ত বটে—আসামী খালাস।

কলেজের অধ্যাপক শ্রী য—বাবু সর্ব্বদাই কেমন অন্যমনস্ক। কিছু দিন হইল একটী নূতন আলাপী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মহাশয় আপনার কি বিবাহ হয়েছে ?" অধ্যাপক মহাশয় কিছুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিয়া বলিলেন "হ্যাঁ হয়েছে ত বোধ হয় —কিম্বা না আমার ভুল হতেও পারে।

এক বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা করিলেন "আমরা কিরূপে শুনিতে পাই" ? একটী ছাত্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বলিল 'মহাশয় এ প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত সহজ। একজন তাহার বন্ধুর নিকট গল্প করিয়া আর কাহাকেও বলিতে বারণ করিয়া দেয়। সেই গল্পকারীর বন্ধু আমাদের কোন বন্ধুর নিকট বলে; সে আবার আমাদের বলে—এইরূপে আমরা শুনিতে পাই।"

মা—"আজ কি ভাল বোধ হচ্ছে বাবা ?"

হারু—"তা বল্‌তে পারিনে মা। (কিছুক্ষণ পরে) বেদানা কি সব ফুরিয়ে গেছে ?"

মা—হ্যাঁ বাবা যেটুকুন বাকী ছিল সে ত আজ সকালে তোমাকে দিয়েছি।"

[illegible]—ধা [illegible] উঠিয়া) "তাহলে আমার অসুখ সেরে গেছে।"

[illegible] দ্রে. দ্রে দ.

গা—পা—। [illegible]পাল তোমার ছোট বোনটীর ভাগের সন্দেশটুকুন কি খেতে হয় ?"

[illegible] না মা—তুমিইত বলেছ আমাকে সব বিষয়ে ছোট বোনকে সাহায্য কর্ত্তে।"

গঙ্গার ধার,—ভুলুবাবু—"দাদা এটা কি Ganges—ব্রহ্মপুত্র না ইরাবতী ?

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য।

কাল সহকারে ভাষার পরিবর্ত্তন বুঝিতে গেলে প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা বিশেষ আবশ্যক। প্রাচীন সাহিত্য পুরাতন কালের ভাবের ইতিহাস, সেই জন্য পুরাতনকে জানিতে হইলে পুরাতন সাহিত্যকে বিশেষ করিয়া জানিতে হয়। সে সময়ের সাহিত্য না জানিলে সে সময়ের লোকের অবস্থা সম্যক বুঝিয়া উঠা অসম্ভব, সেই পুরাতন ভাবের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে কিরূপে আমাদের এই পরিবর্ত্তিত অবস্থা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। সাহিত্য আমাদের অতীতের সহিত বর্ত্তমানের বন্ধনসূত্র—প্রাচীন সাহিত্য অতীতের ভাবের একমাত্র স্মৃতি। এই জন্য পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে আমাদের গভীর আনন্দ আছে—পুরাতন সাহিত্যে কোথাও ভাবের মহত্ত্ব দেখিলে হৃদয় পূরিয়া উঠে, পুরাতন সাহিত্যে বর্ণনার সৌন্দর্য্য দেখিলে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়, পুরাতনের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর আমরা যেন ভাল করিয়া দাঁড়াইবার ভরসা পাই।

বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য ইংরাজী প্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই ধর্ত্তব্য। সে কালে বাঙ্গলায় গদ্য লেখা প্রচলিত ছিল না, পদ্যই সকলের বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশের একমাত্র উপায় ছিল। গদ্য কেবল কথাবার্ত্তায় এবং চিঠি পত্রে ব্যবহৃত হইত। সেই জন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আর কিছুই নহে, কেবল কবিতা। কিন্তু যাহাই হোক্, এই সকল প্রাচীন কবিতা হইতেই আমাদিগকে বঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এইগুলি ভাল করিয়া না দেখিলে আমরা বঙ্গ সাহিত্যের উপরে কোন্ কোন্ ভাষার কিরূপ প্রভাব পড়িয়াছে—সম্পূর্ণরূপে বলিতে পারি না। এইগুলি বিশেষরূপে আলোচনা না করিলে বঙ্গ সাহিত্যের প্রাণ কোথায় তাহাও বুঝা যায় না। বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেই হইবে—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যকে অনেকে অশ্লীল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহেন। প্রাচীন সাহিত্য অশ্লীল কি না সে কথা পরে বিবেচনা করা যাইবে, আপাততঃ দেখা যাউক্, বাঙ্গলার পুরাতন সাহিত্যে কোন্ রসের বিশেষ প্রাধান্য। এ বিষয়ে মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, আমাদের প্রাচীন সাহিত্য আদি রসের আধার। আদি রসের আমাদের দেশে অনেক দিন হইতেই সমধিক আদর দেখা যায়—তখন বাঙ্গলা সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই, এ বাঙ্গালী জাতির তখন জন্ম হইয়াছে কিনা সন্দেহ। জয়দেবের নাম উল্লেখ করিতে চাহি না, আমাদের কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস আদি রসের দ্বারাই বিখ্যাত হইয়াছেন। তবে বঙ্গ সাহিত্যই অশ্লীল হইয়া পড়িয়া থাকে কেন? কারণ অবশ্যই আছে, সে কারণ বিশেষ দূরও নহে—সে সময়ের বঙ্গসমাজের অবস্থাব প্রতি

দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝা যায়। সমাজের অবস্থা এত হীন হইয়া পড়িয়াছিল যে, অশ্লীলতা বৈ আর কিছুতেই মন উঠিত না—ভাল জিনিষকে মন্দ করিয়া না লইলে তাহাতে আমোদ উপভোগ হয় না, দেবতাকে বানর করিয়া না গড়িলে মন প্রবোধ মানে না। শিবের প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ইদানীং লক্ষ্মী ছাড়া গঞ্জিকা সেবকের অস্থি পঞ্জর হইয়া উঠিয়াছে—কৈলাসধাম হইয়াছে গঞ্জিকার প্রধান আড্ডা, রাজনীতি বিশারদ অদ্বিতীয় রণপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ ছলনাপটু বংশীধর রমণীমোহনে পরিণত হইয়াছেন; মহত্ত্ব গাম্ভীর্য্য স্থবিধামত ছিব্‌লামিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম কবিরা এই পরিণতির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নহেন। তাঁহারা পূর্ব্বতন কবিদিগের নিকট হইতে এই আদর্শ পাইয়াছেন। তবে তাঁহারা ইহার উপর যেরূপ কবিত্ব ফলাইয়াছেন, সে জন্য তাঁহারা অবশ্য সম্পূর্ণ দায়ী। আরও একটী কথা। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বিলাসের সাহিত্য বটে, কিন্তু তাহা যে সব সময়ে অশ্লীল, তাহা বলা যায় না। সে কালের লোকের রুচি অনুসারেই সে কালের সাহিত্য হইয়াছে। তাহাতে বর্ত্তমান কালের রুচি বিরুদ্ধ যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহা মার্জ্জনীয়। অশ্লীলতা সাময়িক সমাজের ভদ্র নিয়মের ব্যভিচার মাত্র। বর্ত্তমান কালে কেহ যদি সে কালের রুচি অনুযায়ী বর্ণনা করিতে বসে, তবে তাহাকেই রীতিমত অশ্লীল বলা যায়। বঙ্গ সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে হইলে বর্ত্তমানের রুচি বিরুদ্ধ অনেক কথা পড়িতে হইবে। সে জন্য প্রাচীন কবিদিগকে বরতরফ করা চলে না, কারণ তাঁহারা ভিন্ন প্রাচীন বঙ্গসমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমানের কত আদরের গ্রন্থও হয়ত ভবিষ্যতে রুচি বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কিন্তু সমাজ যেখানে রুচির জন্য দায়ী, সেখানে গ্রন্থকারকে দোষী করা যায় না।

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে যে কেবলই আদি রস, অন্য রসের ঐকান্তিক অভাব, তাহা নহে। অন্যান্য রসের একেবারে অভাব হইলে এ সাহিত্য এতদিন টিঁকিত না। কিন্তু একটী জিনিষের বাঙ্গলায় অভাব আছে—বীর রস। বীর রস বাঙ্গলা সাহিত্যে যেখানে যেখানে বসিয়াছে, ভালরূপ ফুটিতে পায় নাই। তাহার কারণ, বীররস বাঙ্গালীর প্রাণের রস নহে। প্রাচীন সাহিত্যে বীররস মধ্যে মধ্যে মাথা উঁচু করিয়াছে বটে, কিন্তু জমাইতে পারে নাই—কতকগুলা ঢাল তলোয়ার, লাঠি শড়কি, সংগ্রহ হইয়াছে মাত্র, তাহার অধিক কিছু নয়। তাহা মোদ্দা বাঙ্গালীর মত হইয়াছে। নব্য সাহিত্যে বিদেশ হইতে বিস্তর অস্ত্র শস্ত্র, সেনা সেনাপতি আসিয়াছে, কিন্তু ফাঁকা আওয়াজ বৈ আর অধিক কিছু করিতে হয় নাই। বন্ধুর গৃহ হইতে দুই চারিটা কামান বন্দুক ধার করিয়া আনিয়া শত্রুকে দেখাইবার জন্য গোটাকতক ফাঁকা আওয়াজ আর কি। আসল কথা বাঙ্গালা সাহিত্যে বীর রস অনেক সময় কোমল রসে ভিজান অথবা একেবারেই রস সম্পর্ক শূন্য। বীররস আমাদের পক্ষে বিদেশীয়, অথচ তাহাকে

আমরা স্বদেশীয় বলিয়া ধরিয়া লইতে চাই, সুতরাং ভয়ে ভয়ে একটা গোল বাধাইয়া বসি, এবং ইহাতেই সহজে ধরা দি; এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার আবশ্যক নাই। এইখানেই শেষ করা ভাল।

বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকের মত এই যে, মৈথিলী হিন্দী হইতে তাহার জন্ম। কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, কাশীরাম দাস প্রভৃতির লেখার সহিত বিদ্যাপতি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন লেখকগণের রচনা তুলনা করিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বিদ্যাপতির কবিতায় হিন্দীর বিশেষ প্রাদুর্ভাব বটে, তাঁহার সমসাময়িক চণ্ডীদাসের কবিতা তাঁহার অপেক্ষা বাঙ্গলা, কিন্তু তথাপি বাঙ্গলা ভাষা মৈথিলী হিন্দী জাত—এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক বোধ হয় না। চণ্ডীদাসের কবিতায়ও এমন কিছু আছে, যাহাতে বুঝা যায়, বাঙ্গলা হিন্দীজাত—একেবারে সংস্কৃতজাত নহে। সংস্কৃত বাঙ্গলা ভাষার পিতামহ অথবা প্রপিতামহ। বাঙ্গলা ভাষা অনেক পরিবর্ত্তনের ফল, সন্দেহ নাই। সে কালের ভালরূপ ইতিহাসাভাবে এ বিষয়ে আমরা অধিক কথা বলিতে সমর্থ নয়, তবে বহুদর্শী চিন্তাশীল পণ্ডিতদিগের অনুসরণ করিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি বলিলাম।

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যকে মোটামুটী দুই ভাগে ভাগ করা যায়--ভাবের সাহিত্য এবং পাণ্ডিত্যের সাহিত্য। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের আমলে ভাবেরই প্রাধান্য ছিল, অক্ষরের বড় একটা ক্ষমতা ছিল না; ইদানীং ক্রমে ক্রমে ভাবের নদীতে চড়া পড়িয়াছে, পাণ্ডিত্যের অক্ষর-শাসনে ভাবের সে স্বাধীনতা নাই, ভাবকেও আইন কানুনে বদ্ধ হইতে হইয়াছে। ইদানীন্তন কবিতায় মাজাঘষা কথার বিলক্ষণ পারিপাট্য দেখা যায়, দোষ হয়ত প্রায়ই মিলে না, কিন্তু দুই ছত্রে কবির ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। রসিকতা অনেক সময় কবিত্বের ছদ্মবেশে চুপিচাপি বসিয়া যায়, এবং গোঁফে চাড়া দিয়া আপনাকে অসাধারণ কবিত্ব বলিয়া প্রতিপন্ন করে। কিন্তু তাহা হইলেও শেষ প্রাচীন কবিদিগের নিকট বঙ্গ সাহিত্য যে বিশেষ ঋণী, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের কল্যাণে বাঙ্গলা ভাষার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে—বাঙ্গলা মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাদের সহস্র দোষ থাকিলেও নির্গুণ তাঁহারা নহেন। কারণ, যেমন করিয়াই হোক্, তাঁহাদেরই পরিশ্রমের ফল আজিকার এই নবীন বঙ্গ সাহিত্য।

বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা এত কথা বলিয়া আসিলাম, অথচ প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের পরিপূর্ণ ধর্ম্মভাবের কথার উল্লেখ করা হইল না, ইহাতে অনেক পাঠক বিশেষ বিরক্ত হইবেন। আমাদের বিবেচনায় বঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই, কেবল গোটাকতক পুরাতন জানা কথা সংক্ষেপে পুনরুল্লিখিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু যাহাই হৌক, বাঙ্গলা সাহিত্যে ধর্ম্মের ভাব সম্বন্ধে আমাদিগকে

দুই চারি কথা বলিতে হইবে। নহিলে ধর্ম্মতর্কমগ্ন বঙ্গদেশের ধর্ম্ম সর্ব্বস্ব অযুত নর-নারীর চক্ষে এ মর্ত্ত্য লেথকের অক্ষরবৃন্দ নাও পড়িতে পারে। বাঙ্গলা দেশের অনেক দুগ্ধ পোষ্যও আজি কালি থুঁথু ফেলায় এবং মাথা চুলকানয় ধর্ম্মের মহিমা দেখিতে পায়। সেকালের সাহিত্যে ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল প্রভার উল্লেখ না করিলে লেথকের যে দুর্নাম রটিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? অনেকের মত এই যে, সে কালে যে কিছু সাহিত্য বাহির হইয়াছে, সকলই ধর্ম্মের জন্য—সকলেরই হৃদয়ে ধর্ম্ম নদী অন্তঃ সলিলা বহিতেছে। এ মত যে কতদূর অভ্রান্ত বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, দুই চারিটা গণেশ বন্দনা ও সরস্বতী বন্দনার উপরেই ইহার প্রতিষ্ঠা। এখন দেখিতে হইবে, যে ভিত্তির উপরে এই মত প্রতিষ্ঠিত, সে ভিত্তি কিরূপ দৃঢ়।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে ধর্ম্মের সহিত বিশেষরূপে সংযুক্ত কতকগুলি পুঁথি আছে স্বীকার্য্য, কিন্তু তাই বলিয়া কাব্য গ্রন্থ মাত্রই যে ধর্ম্মের সহিত বিশেষ কোনও সম্বন্ধে সম্বদ্ধ তাহা বোধ হয় না। গণেশ বন্দনা বা সরস্বতী বন্দনা সে কালের ফেসান ছিল বলা যাইতে পারে। এ কালেও এ ফেসান সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই। কিন্তু এই বন্দনাটুকুর জোরে কবি বিশেষকে ধর্ম্মপ্রাণ অথবা সবন্দনা কাব্য গ্রন্থগুলিকে ধর্ম্ম গ্রন্থ বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। আজ কালের সাহিত্য অপেক্ষা সেকালের সাহিত্যে ধর্ম্ম বিশেষরূপ থাকিত এরূপ কোনও প্রমাণ যতক্ষণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ প্রাচীন সাহিত্যকে কিছুতেই ধর্ম্ম সাহিত্য বলা চলে না। ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার গ্রন্থে শিব কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস বর্ণনা করিয়াছেন, বিদ্যাপতি ঠাকুর রাধা কৃষ্ণের প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের গ্রন্থের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম, একথার কোনও অর্থ নাই। যাঁহারা এ সকলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন গভীর আধ্যাত্মিক রূপক দেখিতে পান, তাঁহারা তাহাতে তৃপ্ত হউন, কিন্তু কবি যে বরাবর এক মহা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের পশ্চাতে ছুটিয়াছেন, এ কথা সহজে বিশ্বাস হয় না। রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ পড়িয়া কেহ যদি বলেন, এ গ্রন্থের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে, তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায়; কিন্তু প্রাচীনতা-মোহ মুগ্ধের বর্ত্তমান-বিদ্রূপী হাস্যের উপরে বিশ্বাস করিয়া বলা যায় না যে, সেকালের সাহিত্য ধর্ম্ম বৈ আর কিছু নয়।

তবে সেকালের সাহিত্য কি? একালের সাহিত্য যাহা সেকালেরও তাই--তবে সেকালে গদ্য ছিল না, সেকালের সাহিত্য আগাগোড়া পদ্যে। সকল দেশের সাহিত্যই প্রায় প্রথমাবস্থায় পদ্য। সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ মহাভারতের পূর্ব্বে গদ্য ছিল না। গ্রীক সাহিত্যে ইলিয়াদের পূর্ব্বে কোনও বিখ্যাত গদ্য গ্রন্থের ত কৈ নাম শুনা যায় না; আর আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বেত গদ্য আমদানি হয় নাই। ইংরাজ আসিবার কত পরে গদ্যে আমাদের হাতে খড়ি।

বাঙ্গলা সাহিত্যের আরম্ভ গীতি কাব্যে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের রচনা তানলয়ে

গাহিবার মত ছোট ছোট কবিতা। শুধু বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কেন, বসন্তরায়, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি গীতি কাব্য রচয়িতা বাঙ্গলায় অনেক; প্রাচীন সাহিত্য ছাড়িয়া দিলে নব্য বঙ্গসাহিত্যেও গীতি কাব্যের অভাব নাই। বলিতে কি, বাঙ্গলা সাহিত্য এক রকম গীতিকাব্য। নব্য সহিত্যে নাটক, উপন্যাস, অন্যান্য জিনিষ মিলে, কিন্তু বাঙ্গলায় পড়িবার মত গীতিকাব্য যত আছে এত নাটকও নাই, উপন্যাসও নাই, এত কিছুই নাই। গীতিকাব্যে বাঙ্গলা সাহিত্যের আরম্ভ, গীতি কাব্যেই তাহার শ্রীবৃদ্ধি; জানি না, কালে হয়ঁত আরও কত সুমধুর সরস কবিতায় এই তরুণ সাহিত্য সুশোভিত হইবে।

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের উপরে জয়দেবের কিছু বিশেষ প্রভাব অনুভব হয়। জয়দেব বাঙ্গলা সাহিত্যের কবি নহেন বটে, কিন্তু তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, এবং তাঁহাকে সংস্কৃতের শেষ কবি বলা যাইতে পারে। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিরা এক হিসাবে তাঁহারই শিষ্য—অন্ততঃ তাহারা তাঁহার গীতগোবিন্দ মুগ্ধ। তাঁহাদের রচনায় জয়দেবের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দ দাসের পদাবলীতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের ন্যায় জয়দেবেরও নামে একটী গান আছে। বিদ্যাপতির কথায় তিনি বলিয়াছেন, "যাক গীতে জগত চিত চোরায়ল।" আর চণ্ডীদাস "প্রেমধনেহি ধনী।" আর জয়দেব "রাধারমণ চরিতরস বর্ণনে কবিকুল গুরু দ্বিজ দেব।" বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমালোচনা আমাদের এখানে আবশ্যক নাই, কিন্তু গোবিন্দ দাসের লেখা হইতে বৈষ্ণব কবিদিগের উপর জয়দেবের প্রভাব সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। জয়দেব বাঙ্গলা ভাষার আদি কবি না হৌন্, বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাবের প্রথম কবি বটে। কিন্তু যাহাই হোক্, সে কথার আলোচনা এখন থাক্। প্রাচীন সাহিত্য আমাদের বিষয়।

প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিবার—বলা হইয়াছে। দেখা গেল, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবল কবিতা, তাহার প্রধান রস আদি, গীতিকাব্যেই তাহার আরম্ভ, এবং সাময়িক সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সে কালের কবিদিগকে অশ্লীল বলা যায় না। পৌরাণিক অনেক মহচ্চরিত্রের বঙ্গসাহিত্যে অবনতি লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু বঙ্গসাহিত্য সেজন্য সম্পূর্ণ দায়ী নহে। তাহার কারণ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আর পুনরুল্লেখ আবশ্যক বোধ না। বাঙ্গালা সাহিত্যে ধর্ম্মের সহিত বিশেষরূপে জড়িত কতকগুলি গ্রন্থ আছে, সেরূপ সকল সাহিত্যেই আছে, সে জন্য বঙ্গসাহিত্যকে বিশেষরূপে ধর্ম্মসাহিত্য বলাও যাইতে পারে না। এ সম্বন্ধে মোটামুটী আর অধিক কথা না বলিয়া বিশেষ বিশেষ কবির লেখা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। এখন আমাদের কপালে অমৃতই উঠুক্ চাই গরলই উঠুক্, যাহা হয় ঘটিবে।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঘরের অলক্ষ্মী।

১

"ঐ মেয়েটা হয়ে অবধি মুখুয্যেদের লক্ষ্মী গিয়েছে," পাড়ার লোকে এই কথা কাণাকাণি করিতেছিল।

দত্তদের বাড়ীতে একঘর স্ত্রীলোক জড় হইয়া এই কথার আন্দোলন করিতেছিল।

বামার মা বিধবা মানুষ, বয়স বছর পঞ্চাশ হবে। তিনি বলিতেছিলেন, "আমি সে দিন মেয়েটাকে দেখে পর্য্যন্ত আর তাদের বাড়ী যাই না। ও মেয়ে যদি বেঁচে থাকে ত মুখুয্যেদের সর্ব্বনাশ হবে।"

কাদম্বিনী একটুখানি গলা বাড়াইয়া, একটু চাপা গলায় তাঁহার একজন বয়স্যাকে বলিলেন, "ভাই, মেয়েটা এখন হট্ হট্ কোরে ঘর বার কোরে বেড়ায়। এদিকে হাবা কালা, কিছু বল্‌তেও পারে না, কিছু শুন্‌তেও পায় না, কিন্তু ভাই তার চোক দুটো দেখ্‌লে ভয় করে। ডাগর ডাগর চোক, এম্‌নি ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চেয়ে থাকে! রাত্রে দেখ্‌লে আঁৎকে উঠতে হয়।"

গোপাল দত্তের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তাঁহার ননদের পাশে বসিয়া ছিলেন। তিনি ননদের আঁচল ধরিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই ঠাকুর্‌ঝি, আর একটা কথা শুনেছ কি? মেয়েটা ভাই লোকের সাক্ষাতে কথা কয় না, কিন্তু এক্‌লা থাক্‌লে নাকি হাত মুখ নেড়ে কি বলে, লোক দেখ্‌লেই আবার হাবা কালা হয়।"

"নে ভাই, তুই আর অনাছিষ্টি কথা বলিস্‌নে।" এই বলিয়া ননদ বউয়ের গালে আদর করিয়া একটী ঠোনা মারিলেন।

ভাইয়ের দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী হইলে একটু বেশি খোসামোদ করিতে হয়।

২

কলিকাতা সহরে মুখুয্যেরা বুনিয়াদি বড়মানুষ। মস্ত নামডাক—দোল, দুর্গোৎসব, পূজা আচ্ছা, ক্রিয়াকর্ম্ম খুব ঘটা করিয়া সম্পন্ন হয়। দানে মুক্ত হস্ত। এদিকে মুখুয্যেরা বড় সজ্জন, একেবারে নিরহঙ্কারী। পাড়ার লোকেদের সঙ্গে বেশ সদ্ভাব। সকলকে সমান আদর অপেক্ষা করে।

হরিহর মুখোপাধ্যায় বিপুল পিতৃসম্পত্তি পাইয়া নিয়মিত সদ্ব্যয় করিয়া আসিতেছিলেন। বাড়ীর শিক্ষা ভাল, এজন্য তাঁহার চরিত্রে কোন দোষ ছিল না। কয়েক বৎসর হইতে দুর্গোৎসব বন্ধ হইয়াছে। লোকে বুঝিল অর্থের অনাটন পড়িয়াছে। হরিহর মুখোপাধ্যায় আর বড় একটা প্রতিবেশীদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন না, অথচ বাড়ীতেও থাকেন না। ইদানী কেহ কেহ বলিত তাঁহার পানদোষ ঘটিয়াছে।

মুখুয্যেদের বৃহৎ চকমিলান দোতালা বাড়ী। তবে কিছু সেকেলে ধরণের, আর একটু স্যাঁৎ সেঁতে। বাড়ীর সুমুখে বাগান, তারপরে আস্তাবল, আর একদিকে গোয়াল ঘর। বাড়ীর উঠানের চারি ধারে, দোতালার বারান্দার নীচে পায়রার খোপ। পূজার দালানে একটা লক্ষ্মীপেঁচা বাসা করিয়াছিল। সেটা ছেলেদের দৌরাত্ম্যে উড়িয়া গিয়াছে। দোতালার কার্ণিশে চড়ুইয়ের বাসা, চিলের ছাদে চিলের বাসা। সদর দরজায় একটা কাকাতুয়া পিতলের দাঁড়ে বসিয়া পাখা ঝাপ্‌টা দিয়া কেবল এদিক ওদিক দুলিত আর অনবরত চীৎকার করিত। বাড়ীর ভিতরে রোয়াকে একটা ময়না খাঁচায় বসিয়া কেবল "ঝি! ঝি!" করিয়া ডাকিত।

৩

ঘরের অলক্ষ্মী কে?—হরিহর বাবুর এক কন্যা। কন্যার বয়স কত?—বছর পাঁচ ছয়। তবে সে কিসে অলক্ষ্মী হইল? অনেক কারণে। সেই মেয়েটার জন্ম হইতে ঘরের বাঁধা লক্ষ্মী চঞ্চল হইয়াছেন—হরিহর বাবুর আয় কমিয়াছে, কিছু কিছু ধারও হইয়াছে, আরও অন্য রকম বিপদ ঘটিতেছে। হরিহর বাবুর আরও তিন চারিটী সন্তান বর্ত্তমান। তাহাদের সময় কোন অমঙ্গল ঘটে নাই। মেয়েটীর হাবা কালা হওয়া অমঙ্গলের আর এক প্রধান কারণ।

বাড়ীর ছেলেরা ভয়ে তাহার সহিত খেলা করিত না। আত্মীয় পরিজন, ঝি চাকর সকলে বলিত, মেয়েটার ভিতর কিছু আছে। হরিহর বাবু কত রকম চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, কিছুতেই কিছু হয় নাই। তাঁহার স্ত্রী রোজা পর্য্যন্ত ডাকাইয়াছিলেন।

কেহ তাহাকে যত্ন করিত না। কেহ তাহার সহিত দুটা কথা কহিত না। কথা কহিলেই বা কে শুনিত? মায়ের মন বুঝেনা, তাই তিনি মেয়েটীকে আপনি খাওয়াইয়া পরাইয়া দিতেন। সে সময় সে একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। মাকে মা বলিয়া এক এক সময় চিনিত, আবার এক এক সময় যেন চিনিতে পারিত না। মাথারও কিছু দোষ ছিল। মাতা দুঃখে চক্ষু মুছিতেন, আবার তখনি মনে মনে বলিতেন, "আমি কাহার জন্য কাঁদি? এত মানুষ নয়। এ কোন শত্রু আমার পেটে এসেছে!" আঁতুড় ঘরে মেয়েটি বড় সুন্দরী হইয়াছিল দেখিয়া মা নাম রাখিয়াছিলেন—ভুবনমোহিনী। এখন আর কাহারও সাক্ষাতে সে নাম করিতেন না।

অপর ছেলে মেয়েরা তাহার নিকটে আসে না দেখিয়া মেয়েটী আর কাহারও নিকটে বড় যাইত না। দূর হইতে দাঁড়াইয়া তাহাদের পুতুল খেলা, লুকাচুরি খেলা, আরও নানা রকম খেলা দেখিত। কাকাতুয়ার চীৎকার শুনিতে পাইত না। তাহার পাখানাড়া দেখিয়া আনন্দে হাততালি দিত। ক্ষুধা বোধ হইলে আস্তে আস্তে গিয়া মার কাছে দাঁড়াইত। মা খাইতে দিতেন।

মেয়েটী দেখিতে বড় সুন্দরী। কাল কাল কোঁকড়ান চুল, টুকটুকে রং, ধীর চলন,

আর সে শান্ত ভাব, বড় সুন্দর। সবচেয়ে চক্ষু দুটী বড় চমৎকার। চোক দুটী খুব বড়, কালো, আর খুব উজ্জ্বল। সে চক্ষের চাহনি অতিশয় শান্ত এবং স্থির, কিন্তু একটা কি অভাবময়। যে একবার দেখিত, সে আর ভুলিতে পারিত না। রাত্রিকালে ঘুমাইয়া সেই চক্ষু দেখিত।

একদিন ভুবনমোহিনী তাহার মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি ঘরে বসিয়া একটা গৃহকর্ম্ম করিতেছেন। এমন সময় ভুবন তাঁহার কাপড় ধরিয়া অঙ্গুলি দ্বারা কতকগুলি পুতুল দেখাইয়া দিল· পুতুলগুলি একটা কাচের দেরাজে বন্ধ করা ছিল। মাতা বুঝিতে পারিয়া কতকগুলি বেনেপুতুল আর খানিকটা ছেড়া কাপড় বাহির করিয়া দিলেন। ভুবন সেইগুলি হাতে করিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ীর ভিতরে নীচে তলা হইতে উপর তলায় উঠিবার পথে একটী ছোট চোরকুঠুরী ছিল। সেই ঘরে ভুবন আপনার মনে খেলা করিত। আর কেহ তাহার কাছে যাইত না। সেইখানে গিয়া পুতুলগুলিকে কাপড় পরাইয়া খেলিতে বসিল। একদিকে সব পুতুলগুলি সাজাইল, কেবল একটীকে ঘরের আলাদা এক কোণে রাখিয়া আসিল। পুতুলেরা কেহ নিমন্ত্রণে যাইতেছেন, কেহ খেলা করিতেছেন, কেহ চুল বাঁধিতেছেন, কেহ ভাত রাঁধিতেছেন। শুধু সেইটী এক কোণে বসিয়া কাঁদিতেছে। ভুবন আর সব পুতুল ফেলিয়া সেইটীর নিকটে বসিয়া তাহার চক্ষু আপনার অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিল। তাহার পর তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিল।

একবার বাড়ীতে একটা বিড়ালের তিনটা ছানা হয়। ভুবন সারা দিন সেইখানে বসিয়া থাকিত। যখন সেগুলি কিছু বড় হইল, তখন সে একটিকে বাছিয়া লইয়া আপনার কাছে রাখিল। আপনি খাইবার সময় সেটীকে খাওয়ায়, রাত্রে সেটীকে বুকে করিয়া নিদ্রা যায়। কেহ কিছু বলিলে গিন্নী বলিতেন "ও যাতে ভাল থাকে তাই করুক। কারুর ত কোন ক্ষতি হয় না।" তাঁহার অসাক্ষাতে একটা দুষ্ট ঝি একদিন বিড়ালটাকে ধরিয়া কোথায় ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছিল। দুই দিন পরে সেটা আবার ফিরিয়া আসে। সে দুদিন ভুবন জলস্পর্শ করে নাই। মেনিকে আবার পাইয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া একবেলা আহ্লাদে কাঁদিয়াছিল।

জলখাবারের দুইখানি লুচির মধ্যে একখানি আপনি খাইত, আর একখানি হাতে করিয়া দরজা গোড়ায় দাঁড়াইয়া থাকিত। বিড়ালে ত লুচি খায় না, তাই একখানি লুচি একটা কুকুরকে খাওয়াইত। কুকুর লুচি খাইয়া এক দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত; আর ভুবন তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিত। তাহাদের চোকোচোকি দেখিলে বোধ হইত যেন তাহারা পরস্পরের মনের ভাব বুঝিতে পারিতেছে।

৪

হরিহর বাবুর বাড়ীর নিকটে চন্দ্রকান্ত মিত্র নামে একজন নূতন ভাড়াটিয়া বাস করি-

তেন। চন্দ্রকান্ত বাবু যেম রাখিয়া স্ত্রীকে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। নিজেও সর্ব্বদা অনেক রকম সুশিক্ষা দিতেন। সুতরাং চন্দ্রকান্ত বাবুর স্ত্রী ভূত প্রেত বড় মানিতেন না।

চন্দ্রকান্ত বাবু নিঃসন্তান। স্ত্রী যুবতী, সন্তানাদি হইবার আর বড় আশা ছিল না। সে জন্য তাঁহারা কিছু বিমর্ষ থাকিতেন। চন্দ্রকান্ত বাবুর স্ত্রী, দাসীর মুখে হরিহর বাবুর মেয়ের সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়কর কথা শুনিয়া এক দিন দুপুর বেলা স্বয়ং পাল্কী করিয়া হরিহর বাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত। গৃহকর্ত্রী তাঁহার নাম শুনিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে বিলক্ষণ সমাদর করিয়া বসাইলেন। চন্দ্রকান্ত বাবুর স্ত্রী ভুবনকে ডাকাইয়া তাহাকে কোলে করিয়া মুখচুম্বন করিলেন। ভুবন প্রথমে বিস্মিত হইল, তাহার পর বিড়ালটিকে কোলে করিয়া তাঁহার নিকটে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। গমন কালে চন্দ্রকান্ত বাবুর স্ত্রী ভুবনের মাতাকে বলিয়া গেলেন, "আপনি বিনা অপরাধে সন্তানের অযত্ন করিবেন না। এক এক দিন আমাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিবেন। এক এক দিন আমি আসিয়া আপনার মেয়েটীকে দেখিয়া যাইব। আমার সন্তান নাই।" এই কথা বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

সেই রাত্রে চন্দ্রকান্ত বাবুর স্ত্রীর মূর্চ্ছারোগ হইল। ডাক্তারেরা বলিল হিষ্টিরিয়া হইয়াছে। লোকে বলিল আর কিছু। চন্দ্রকান্ত বাবুর স্ত্রী হরিহর বাবুর বাড়ী আর যাওয়া আসা করিতেন না। ভুবনকে আনিবার জন্যও লোক পাঠাইলেন না, ভুবনের মাও ভুবনকে পাঠাইলেন না।

৫

হরিহর বাবুর সম্বন্ধে লোকে অনেক রকম কথা রটাইতে আরম্ভ করিল। আগে কাণাকাণি, তাহার পর পাড়াশুদ্ধ রাষ্ট্র হইয়া গেল। হরিহর বাবুর পানাসক্তি ও তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য দোষও ঘটিয়াছে। বাবু অনেক রাত্রে বাড়ী আসেন, কোন দিন রাত্রে হয়ত একেবারেই বাড়ী আসেন না।

প্রতিদিবস বৈকালে হরিহর বাবু গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাইতেন। গাড়ী সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিত কিন্তু বাবু আসিতেন না। কোন দিন বা কোন বন্ধু আপনার গাড়ীতে হরিহর বাবুকে লইয়া যাইতেন।

এক দিন রাত্রি দুইটার সময় হরিহর বাবু বাড়ী আসিলেন। নিজে আসিতে অক্ষম এজন্য তাঁহার একটি বন্ধু গাড়ী করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। হরিহর বাবুর হাত, পা, মাথার কিছুরই ঠিক ছিল না, কাজেই সিঁড়ীতে উঠিতে গিয়া বার কতক পড়িয়া গেলেন। তখন একজন চাকর আর দরওয়ান দুইজনে মিলিয়া বাবুকে উপরে তুলিল। বাবু চাকরকে লাথি মারিলেন, আর দরওয়ানের গোঁপ ধরিয়া জড়িতকণ্ঠে কহিলেন, "আমি কি মাতাল হয়েছি যে তোরা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্চিস্?"

এই অবস্থায় বাবু অন্দর মহলে উপস্থিত হইলেন। গৃহিণী রাত্রি প্রায় বসিয়াই

কাটাইতেন। স্বামীকে দেখিয়া কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হরিহর বাবুর নেশা ছুটিতে আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে কহিলেন, "আমার অপরাধ কি? তোমার ঐ মেয়েটাই ত যত নষ্টের গোড়া!"

পাশের ঘরে ভুবন নিদ্রিত ছিল। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছিল, কে যেন তাহার বিড়াল কাড়িয়া লইতেছে। ঘুমের ঘোরে বিড়ালটাকে আরও জোরে বুকে চাপিয়া ধরিল।

৬

কিছু দিন পরে ভুবনের বড় কঠিন পীড়া হইল। মাতা ডাক্তার বৈদ্য ডাকাইলেন। ইহাতে অনেকে রুষ্ট হইল। বালাই দূর হইলেই ভাল। কোলের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলে কি আর লক্ষ্মী থাকেন?

সে শয্যা হইতে ভুবন আর উঠিল না। পীড়ার সময় চুপ করিয়া থাকিত, কেবল তৃষ্ণা পাইলে ইঙ্গিত দ্বারা জল চাহিত। মা কাছে থাকিলে তৎক্ষণাৎ জল দিতেন, আর কেহ এক ফোঁটা জলও দিত না। বিড়ালটা দিবারাত্রি ভুবনের কাছে শুইয়া থাকিত। রোগের সময় বিড়াল কাছে থাকিলে পাছে আর কাহারও কিছু হয়, এই আশঙ্কা করিয়া সকলে বিড়ালটাকে তাড়াইয়া দিত। তবু সে কখন ভুবনের কাছ-ছাড়া হইত না। ভুবনের মা অধিকক্ষণ কাছে বসিয়া থাকিলে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে নানাবিধ ভয় দেখাইত। তিনিও বড় একটা কাছে থাকিতেন না।

দিন কয়েক বড় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ভুবনের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর কয়েক দিবস একটা বিড়াল ম্যাও ম্যাও করিয়া বাড়ীময় কাঁদিয়া বেড়াইত। প্রত্যহ বৈকাল বেলা একটা কুকুর বাড়ীর বাহিরে চীৎকার করিয়া কাঁদিত। গৃহস্থেরা তাহাতে বড় ভয় পাইত।

ঘরের অলক্ষ্মী বিদায় হইল। ঘরের লক্ষ্মী ফিরিলেন কি? তা ত জানি না।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

আবুল ফজল এলেমি।

রত্নাকর না থাকিলে ইক্ষাকুকুল-গৌরব রামচন্দ্র যেরূপ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিতেন না, সত্যবতী-তনয় লেখনী ধারণ না করিলে যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন যেরূপ অপরিস্ফুট থাকিতেন, চাঁদ বর্দ্দে না থাকিলে পৃথ্বীরাজ যেরূপ বিস্মৃতি গর্ভে পড়িয়া থাকিতেন, অর‍্ম্ না থাকিলে ক্লাইব যেরূপ ক্ষীণজ্যোতি হইয়া পড়িতেন, আবুল ফজল না থাকিলে আঁকবর সাহেরও সেই দশা হইত।

আকবর সাহ মোগল বাদসাহদিগের শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন। তাঁহার সময়ে মোগল রাজবংশ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার শাসন কালকে আদর্শ শাসনকাল বলিয়া অনেকে উল্লেখ করিয়া থাকেন। আবুল ফজল আকবরের শাসনকালের সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া সেই অন্ধতমসময় কালের প্রকৃত ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন, ইহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন এবং ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকেরা তল্লিখিত ঘটনাবলী পাঠ করিয়া উপযুক্ত উপাদান লাভে তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিবেন। ইতিহাসে কোন সম্রাজ্যের বাহ্যিক ঘটনাই অধিক পরিমাণে লিপিবদ্ধ থাকে, কিন্তু আবুল ফজল বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়বিধ ঘটনা চিত্রণে সমান মনোযোগ দেখাইয়াছেন। তাঁহার প্রতিভাময়ী লেখনীর জন্য আমরা মানসিংহ, ভগবান দাস, জয়সিংহ, তোডরমল্ল, বীরবল প্রভৃতি খ্যাতনামা পদস্থ হিন্দু রাজকর্ম্মচারীদিগের রাজনীতিজ্ঞতা, বীরত্ব, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি হিন্দু-হৃদয়ের স্বাভাবিক গুণের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। তাঁহারই পরিশ্রমের ফলে আমরা আকবরের শাসন নীতি, হিন্দুপ্রিয়তা, রাজধর্ম্ম, ধর্ম্ম বিশ্বাস, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ও রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরীণ কার্য্য-প্রণালী নখদর্পণের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আকবরের উজীরবর্গের মধ্যে আবুলফজল মনস্বী, লিপিকুশল, ধীর বুদ্ধি, উদারচেতা, দূরদর্শী রাজকর্ম্মচারী ছিলেন; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া পরিশেষে আকবরের শাসন-নীতির পরিচয় প্রদান করিলে বোধ হয় পাঠকবর্গের পক্ষে বিরক্তিপ্রদ হইবে না।

১৫৫১ খৃষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি তারিখে, নাগর নগরে সেখ মোবারকের ঔরসে আবুল ফজলের জন্ম হয়। সেখ মোবারক সুন্নি শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। আরব্য ও পারস্য ভাষাতে তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। ক্রমাগত স্বাধীনভাবে শাস্ত্রালোচনা করাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার এক বিশেষ মত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তৎকালীন মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ মৌলবীগণের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঘোরতর অনৈক্যতা ঘটাতে তাহারা স্বাভাবিক বিদ্বেষ বুদ্ধি বশে তাঁহার প্রধান শত্রু হইয়া উঠিল। চারিদিক হইতে তাঁহার উপর কঠোর বিদ্রূপ বর্ষণ, উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। এই প্রকারে ক্রমাগত পরিব্যাপ্ত, নিগ্রহের উত্তেজনায় তিনি অচিরাৎ স্বীয় ধর্ম্ম মত পরিত্যাগ করিয়া আগরায় আসিয়া একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন।

পিতার গুণরাশি স্বাভাবিক নিয়মবশে পুত্রগণের উপরও বর্ত্তিয়া থাকে। মোবারকের পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ফৈজি ও তৎকনিষ্ঠ আবুল ফজল পিতার প্রতিভার ছায়ায় বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আবুল ফজল ও ফৈজি বাল্যকালে যে অস্বাভাবিক প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়াছিলেন, ভবিষ্যতে ইহাই তাঁহাদিগকে যশের রত্নময় সিংহাসনে প্রতিস্থাপিত করিয়াছিল। উভয় ভ্রাতাই স্ব স্ব প্রতিভাগুণে মোগল সম্রাটের করুণা নয়নে পড়িয়া অতি সামান্য অবস্থা হইতে রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে উন্নীত হইয়া-

ছিলেন। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন ফৈজি আক্‌বরের প্রধান রাজকবি (Poet-Laureat) ও আবুল ফজল প্রধান অমাত্য ও সুহৃদ বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত।

আবুল ফজল বাল্যকাল হইতেই বিশেষ প্রতিভাশালী, নিবিষ্ট চিত্ত ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। পিতার নিকট প্রথম হইতে শিক্ষা লাভ করাতে তাঁহার এই প্রতিভা ক্রমশঃ পূর্ণ বিকশিত হইয়াছিল। বিংশতি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই তিনি আরবী ও পারস্য ভাষাতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও প্রতিভার তেজ কতদূর প্রখরতর ছিল, নিম্ন লিখিত ঘটনাটি হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বৎসর, সেই সময়ে তিনি মহম্মদীয় ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তক ("হিকামি" ও "নাক্‌লি" প্রভৃতি) পাঠ পরিসমাপ্ত করিয়াছিলেন। বিংশতি বৎসর বয়োপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই তাঁহার শিক্ষা এতদূর সম্পূর্ণভাব প্রাপ্ত হয় যে, তিনি পিতার ন্যায় ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তাঁহার হস্তে একখানি প্রাচীন ইস্পাহানী গ্রন্থ আসিয়া পড়ে। এই গ্রন্থ অতিশয় প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য; কিন্তু বহুবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। ইহার প্রাচীন পত্র সমূহ বিধ্বস্ত, বিশৃঙ্খল ও ছিন্ন ভিন্ন। আবুল ফজল পুস্তকের কয়েক পৃষ্ঠার অর্দ্ধাবশিষ্ট অংশ পড়িয়াই উপলব্ধি করিলেন—ইহা রত্ন সমুদ্র বিশেষ। এতজ্জন্য তাঁহার জ্ঞান পিপাসা ও কৌতূহল বৃত্তি আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে দৃঢ় ইচ্ছা, সে অদম্য পিপাসা পরিতৃপ্তি করিবার অনেক অসুবিধা। তাহার কোন কোন অংশের অক্ষর সকল সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কোন কোন স্থলে পত্রের অর্দ্ধাংশ বা ত্রিচতুর্থাংশ ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে, আবার কোন কোন স্থল বিভাবসুর সুতীক্ষ্ণ দন্তে চর্ব্বিত। এ সকল দুঃসাধ্য বাধাবিপত্তি দেখিয়াও তিনি পুস্তক পাঠেচ্ছা বিসর্জ্জন দিতে পারিলেন না। সমগ্র পুস্তক খানির পত্র রাশিকে কর্ত্তিত করিয়া তাহার পৃষ্ঠে কাগজ যুড়িয়া লুপ্ত অংশগুলি নিজের মস্তিষ্ক হইতে পরিপূরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত চিন্তা, পরিশ্রম, আলোচনা, ও গবেষণার সহায়তায় তিনি অপরের লিখিত সেই প্রাচীন পুস্তক সম্পূর্ণ করিয়া তুলিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই—এই পুস্তকের শ্লোক সমূহের অধিকাংশ "প্রক্ষিপ্ত" হইলেও আবুল ফজলের নিজ পরিপূরিত অংশগুলির ভাব ও মর্ম্মের সহিত প্রাচীন লেখকের ভাব ও মর্ম্মের অসম্ভব সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল; এবং মূল গ্রন্থের সহিত তাহার অত্যল্প মাত্র বিভিন্নতা উপলব্ধি হইয়াছিল! একজন বহুদর্শী অভিজ্ঞ, প্রাচীন কবির কঠোর চিন্তা-প্রসূত ভাবোচ্ছাসের সহিত অপ্রাপ্ত বয়স্ক সাংসারিক জ্ঞান পরিবর্জ্জিত, অজাত-শ্মশ্রু লেখকের চিন্তা তরঙ্গের এই প্রকার অস্বাভাবিক সামঞ্জস্য দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

মহম্মদীয় ভাষায় নানাবিধ কূট তর্কপূর্ণ দর্শন ও বিজ্ঞান পুস্তক পাঠ করিয়া আবুল ফজল প্রথমে নির্জ্জন বাসের অতীব পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। রাজসভার ভীষণ কোলা-

হল অপেক্ষা নির্জ্জনে বিজ্ঞানের আলোচনা তাঁহার পক্ষে অনেকাংশে প্রীতিপ্রদ বলিয়া উপলব্ধি হইল। উচ্চপদস্থ আমীর ওমরাহগণ বেষ্টিত কোলাহলময় রাজ সভায় নিয়মিত হাজিরি দেওয়া অপেক্ষা শাস্ত্রপাঠ দ্বারা আত্মোন্নতি সাধন তিনি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লইলেন। আর্থিক উন্নতি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতি তাঁহার চক্ষে অতীব গরীয়সী বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সুতরাং রাজসভায় গিয়া নিজভাগ্য পরীক্ষা না করিয়া তিনি যৌবনের প্রারম্ভেই উচ্চাভিলাষ বর্জ্জিত হইয়া গৃহভিত্তি নিবদ্ধ ভাবে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভবিতব্য শীঘ্রই তাঁহার এই অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য ভাবের পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। ভবিষ্যতে এমন এক ঘটনা ঘটিয়া উঠিল যদ্দ্বারা তিনি অচিরাৎ আকবরের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া সৌভাগ্য লক্ষ্মীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইলেন। রাজসভায় মোবারকের (আবুল ফজলের পিতার) অনেক শত্রু ছিল। বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বী হওয়াই তাঁহার এই শত্রু বৃদ্ধির প্রধান কারণ। বাদসাহের সভায় পিতার শত্রু প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও আবুল ফজলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফৈজি স্বীয় প্রতিভাবলে সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া উঠিলেন। ফৈজি সামান্য সভাসদ হইতে রাজ কবির পদে উন্নীত হইলেন। ফৈজির সুরভিপূর্ণ কবিতা-কুসুম-বাসে আকবরসাহ পূর্ব্ব হইতেই এই নবীন কবির প্রতিভার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন; সুতরাং এখন হইতে তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং সামান্য সভাসদ হইতে তাঁহাকে স্বীয় নির্জ্জন বাসের সহচর ও সুহৃদ স্থানীয় করিয়া তুলিলেন। ফৈজির কবিতা—নবীন কবির প্রাণোন্মাদিনী কবিতা আকবরের আদরের জিনিয। সন্ধ্যা গগনের ছায়ায়, অস্তমিত রবির স্নিগ্ধ রশ্মি তলে, কৌমুদী-বিধৌত নিশীথে, স্তব্ধ ভাবময় মধ্যাহ্নে, চন্দ্রকর-বিধৌত মর্ম্মরময় বেদীর উপরে, সুগন্ধ বিস্তারি ক্ষীণ বীচিমালাময় চৌবাচ্চার পার্শ্বে, ফৈজি ছায়ার ন্যায় আকবরের পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিতেন, তিনি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কবিতা শুনিতেন, তৃপ্ত হইয়া যুথিকা মালিকা—আবার কখনও বা মণিময় হার কবিশিরে পরাইয়া দিতেন। আকবরের প্রসাদিত মালিকার মনঃ প্রাণ হারী সুরভির ন্যায় ফৈজির যশঃ সৌরভ ক্রমশঃ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। রাজ কবি এই সময়ে বাদসাহ দরবারে প্রভূত ক্ষমতা সঞ্চয় করিলেন। একদিন অবসর মতে কথায় কথায় বাদসাহকে ভ্রাতার অমানুষিক প্রতিভা ও উদ্যমশীলতার কথা জ্ঞাপন করিলেন। আকবর আবুল ফজলকে দেখিতে চাহিলেন। আবুল ফজলের সৌভাগ্য লক্ষ্মী সেই দিন হইতেই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

যাহাদের দ্বারা জগতের বিশেষ উপকার হইবে, যাহাদের প্রতিভার সদ্ব্যবহারে কোন সম্প্রদায় বিশেষের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, পরমেশ্বর শীঘ্রই তাহাদিগের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। তাহারা যতই দুরবস্থাগ্রস্ত হউক না কেন—যতই সাধারণের অপরিচিত থাকুক না কেন—একটী সামান্য ঘটনা স্রোতে অদৃষ্টের

গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগকে যশের উজ্জ্বল কঙ্করময় পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। আবুল ফজল প্রথমেত কাহারও সহিত মিশিবেন না—দরবারের অহঙ্কারময় ছায়ায়, তোষামোদের দুর্গন্ধের নিকটস্থ হইবেন না—অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য ও নির্জ্জন বাস সহায়ে জীবন ক্ষেপণ করিবেন এই উদ্দেশে জীবনের গতি ফিরাইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে জ্যেষ্ঠের উত্তেজনায়, ভবিতব্যের সঙ্কেত দৃষ্টিতে তাঁহার অবরোধ বাসের ইচ্ছা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ফৈজি তাঁহাকে আত্মোন্নতির আলোকময় পথ দেখাইয়া দিলেন। আবুল ফজল ভ্রাতার প্ররোচনায় নির্জ্জন বাস সংকল্প, দার্শনিকের কঠোর রস হীন সুখময় জীবন সাংসারিকের ভাবে পরিবর্ত্তিত করিলেন। মৌলবীর কার্পাসময় উষ্ণীষের পরিবর্ত্তে ওমরাহের রত্নমণ্ডিত, দীপ্তিময়, মণিঝলকিত শিরস্ত্রাণের দিকে স্বীয় লক্ষ্য ফিরাইলেন।

একটা দিন স্থির হইয়া গেল—সেই দিন ফৈজি ভ্রাতাকে সম্রাটের নিকট লইয়া গেলেন। আবুল ফজল দরিদ্র, বাদসাহের উপঢৌকনের মণি রত্ন তাঁহার নাই, ভ্রাতার ন্যায় তিনি সুবাসিত কবিতা-কাননের সুরসিক ভৃঙ্গও নহেন— তিনি দার্শনিক, দর্শনের, বিজ্ঞানের কণ্টকময় উদ্যানবিচারী—সুতরাং তাড়াতাড়ি সেই বিজ্ঞান কাননের কয়েকটী তীব্রগন্ধী পুষ্পে এক মালিকা গাঁথিয়া বাদসাহের সহিত দেখা করিতে চলিলেন।*

আকবরের মধুর ও অমায়িক প্রকৃতি আবুল ফজলকে অতিশয় মোহিত করিল। সমগ্র হিন্দুস্থান যাঁহার কুঞ্চিত কটাক্ষে কাঁপিয়া উঠে, বীরকেশরী প্রতাপ যাঁহার প্রতাপে অবনত, যাঁহার করুণাভিক্ষায় কুলগৌরবোন্মত্ত রাজপুতও জাত্যাভিমান ভুলিয়া কুটুম্বিতা করিতে সমুৎসুক, হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত ভূভাগের অধিকাংশই যাঁহার কর কবলিত, যাঁহার অধীনস্থ সামান্য আমীর ওমরাহ প্রকৃত দেশাধিপতির ন্যায় পদগৌরব-গর্ব্বিত, সেই আকবর যে এতদূর অমায়িক, বিনীত, মধুরপ্রকৃতি হইতে পারেন, ইহা সেই সংসারানভিজ্ঞ নবীন যুবকের প্রথমতঃ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছিল। বাদসাহ সেই দিন প্রীতি প্রফুল্ল মুখে রাজ কবির কনিষ্ঠের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। আবুল ফজল স্বরচিত পুস্তকখানি বাদসাহের চরণ প্রান্তে অর্পিত করিয়া স্বীয় রাজভক্তি দেখাইলেন।

প্রথম আলাপের এইরূপেই শেষ হইল; আরও বাঁধাবাঁধি হইতে পারিত কিন্তু বাদসাহ সে সময়ে বড় ব্যতিব্যস্ত—বাঙ্গলা বিহারের বিগ্রহ ব্যাপারে তাঁহার মন তখন নিতান্ত চিন্তাকুলিত। ইহার কতিপয় দিবস পরে আকবর সাহ বাঙ্গালা জয়ে যাত্রা করিলেন, ফৈজী তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন। বাঙ্গলা মুলুক হইতে ফৈজী ভ্রাতাকে

---

* এই পুস্তক কোরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৫৬ সংখ্যক শ্লোকে—"আয়ত্ উল্ কুরসী"র উপর মন্তব্য।

আগরায় লিখিয়া পাঠাইলেন—"বাঙ্গলায় আসিয়াও যুদ্ধ বিগ্রহের কোলাহল মধ্যে বাদসাহ তোমার কথা বিস্মৃত হন নাই, মধ্যে মধ্যে তোমার কথা উঠিয়া থাকে। তুমি আগরায় বাদসাহের প্রত্যাগমনাপেক্ষায় থাকিও।" আকবর সাহ বাঙ্গলা জয় করিয়া আগরায় ফিরিলেন এবং তথা হইতে ফতেপুর শিক্রী যাত্রা করিলেন। এই-স্থানে আবুল ফজলের সহিত তাঁহার দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার ঘটিল। শিক্রির "জামী মস্‌জিদে" বাদসাহ আবুল ফজলের নূতন পুস্তক "পুরত্‌ উলফতে" বা "বিজয়-অধ্যায়" নামধেয় উপহার গ্রহণ করিলেন। দ্যুতিমান্‌ মণিরত্ন অপেক্ষা ইহা তাঁহাকে সন্তোষ প্রদান করিল।

ফৈজির সহায়তায় * আবুল ফজলের আকবরের দরবারে ক্রমশঃ প্রভুত্ব বাড়িতে

---

* আবুল ফজলের কথা বলিতে গিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ফৈজির সম্বন্ধে আরও দুই চারিটী কথা না বলিলে নিতান্ত অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। ফৈজি মোবারকের জ্যেষ্ঠ পুত্র—আবুল ফজলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহার সহায়তাতেই আকবরের সভায় আবুল ফজলের প্রতিপত্তি বাড়ে একথা আমরা উপরে বলিয়াছি। ফৈজি যে কেবল পারস্য ও আরব্য ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন এমত নহে। ভারতীয় দেবভাষা সংস্কৃতেও তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎ-পত্তি ছিল। ব্রাহ্মণকুমার বেশে বারাণসীতে গিয়া ছদ্মভাবে কোন ব্রাহ্মণ উপাধ্যায়ের নিকট তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া আইসেন। পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্যের বীজগণিত, লীলাবতী, মহাভারতোক্ত নলোপাখ্যান স্বয়ং সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করেন। ফৈজির অনুবাদিত নলোপাখ্যান, পারসীতে 'নলদমান" বলিয়া পরিচিত। ইহা প্রায় সার্দ্ধ চারি সহস্র শ্লোকে পরিপূর্ণ এবং হিজুরা ১০০৩ অব্দে পাঁচ মাসের মধ্যে ইহার অনুবাদ কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়। রাজকবি ইহার অনুবাদ সমাপ্ত করিয়া কয়েকটী আশ্‌রফির সহিত বাদসাহকে ইহা উপহার স্বরূপে অর্পণ করেন। আকবর সাহের সম্মুখে যে সমস্ত নির্ব্বাচিত পুস্তক পাঠ হইত, তাহার মধ্যে ফৈজির অনুবাদিত নলদময়ন্তীও অন্য-তম। মহাভারতের অনুবাদক নকিব খাঁ বাদসাহের নিকট ফৈজির "নলদময়ন্তী" পাঠ করিতেন। ইহার অনুবাদেও মূল পুস্তকের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছিল। অনুবাদের শব্দ লালিত্যে মূল কবিতার ভাবোচ্ছাসে অতিশয় মুগ্ধ হইয়া আকবর ফৈজির বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মহাভারতের ও অথর্ব্ববেদের অনুবাদ কার্য্যেও রাজ কবি ফৈজি অনেক সহায়তা করেন। আকবরের সভায় ফৈজির প্রতি-দ্বন্দী কবি আমীর খসরু—কিন্তু বাদসাহ খসরুর কবিতা অপেক্ষা ফৈজির লেখনী-প্রসূত কবিতার বহুল সমাদর করিতেন। আকবরী আমলে যে সমস্ত মুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহার উপর ফৈজির রচিত কবিতা সমুদায় মুদ্রিত হইত। আমরা আকবরের একটী স্বর্ণ মুদ্রা হইতে ফৈজির লিখিত একটী কবিতার প্রতিলিপি পাঠকবর্গের গোচরার্থে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"খরসেদ্‌ কি হফ্‌ত বহর্‌ আজ্‌ গৌহর ইয়াফ্‌ৎ-
সঙ্গই সিয়া অজ্‌ পরতুই আঙ্গ জৌহর ইয়াফৎ
কান্‌ অজ্‌ নজর্‌ এ তরবিয়াত্‌ এউ জর্‌ ইয়াফৎ
ওয়ান্‌ জর্‌ সরফ্‌ অজ্‌ সিক্কাই সাহ অক্‌বর ইয়াফৎ"

লাগিল। দরবারের প্রকাশ্য স্থল ব্যতীত ভ্রাতার ন্যায় তিনিও এক্ষণে সম্রাটের নির্জ্জন বাসের সহচর হইয়া পড়িলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উদার মতের জন্য আকবর সাহ বিশেষ বিখ্যাত। তিনি যদি আরঙ্গজেবের ন্যায় গোঁড়ামী আরম্ভ করিতেন, তাহা হইলে ভারতে মোগল সাম্রাজের ভিত্তিমূল ও স্থায়িত্ব অত সুদৃঢ় হইত না। এই সময়ে প্রতি বৃহস্পতিবারে বাদসাহের একটী গোপনীয় সভা আহূত হইত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে

অর্থাৎ—"সূর্য্য প্রভাব হইতে সপ্ত সমুদ্র রত্ন রাজিতে বিভূষিত হইয়া থাকে; তাঁহার কিরণচ্ছটা হইতে কৃষ্ণাভ পর্ব্বত সকল, মণিপ্রস্তরাদিতে বিভূষিত হইয়া থাকে, তাঁহার তেজঃপুঞ্জ হইতে মণি গর্ভ বহু মূল্য স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতব দ্রব্যে পরিপূরিত হয়—এবং সেই সমস্ত স্বর্ণরাজি আকবরের নামে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আরও গৌরবান্বিত শ্রী ধারণ করে।" ফৈজির অন্যান্য কবিতা হইতে অংশোদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে আমরা তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলাম।

১৫৬৮ খৃঃ অব্দে যে সময়ে আকবর সাহ চিতোর আক্রমণ করেন, তখন ফৈজির কবিতা-কুসুম-সৌরভে উল্লাসিত হইয়া তিনি তাঁহাকে রাজ কবির পদে উন্নীত করেন। পরে স্বীয় তেজস্বী প্রতিভাবলে ও কার্য্যগুণে ফৈজি একেবারে "রাজ কবি," "আকবরের প্রধান পারিষদ" ও "বন্ধু" স্থানীয় হইয়া উঠেন; এবং জীবনের শেষভাগে বাদসাহের অনুকম্পায় "চারি হাজারী মন্সবদার" পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন।

১৫৯৩ খৃঃ অব্দে ফৈজি পিতৃহীন হন। এই সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় অষ্ট চত্বারিংশৎবর্ষ। পিতার মৃত্যুর পর রাজকবি দুই বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। পঞ্চাশত বর্ষ বয়সে, ছয় মাস হাঁপানি রোগে শয্যাগত থাকিয়া ১৫৯৫ খৃঃ অব্দের ৫ই অক্টোবর তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইহলোক হইতে অপসৃত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে গভীর নিশিথে আকবর সাহ সঙ্গোপনে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। ফৈজি মুমূর্ষু শয্যায় শায়িত—তাঁহার শরীরে সমস্ত মৃত্যু লক্ষণ প্রকাশিত—এমন সময়ে বাদসাহ একজন হাকিম লইয়া নিঃশব্দ পদ বিক্ষেপে রাজ কবির শয্যাপার্শ্বে বসিলেন। তাঁহার মস্তক ধীরে ধীরে উত্তোলিত করিয়া স্বীয় জানুর উপরিভাগে স্থাপিত করিয়া সস্নেহে বলিলেন—"সেখজী! আমি একজন সুদক্ষ হাকিম সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, তুমি একবার আমার সহিত কথা কও।" কে তাঁহার কথার উত্তর করিবে? ফৈজির নশ্বর দেহ তখন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে, চক্ষে জাল পড়িতেছে—কিন্তু তখনও একটু সংজ্ঞা আছে। বাদসাহের কাতরোক্তি মুমূর্ষু রাজ কবির কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহার নয়ন প্রান্ত দিয়া দুইটী অশ্রুধারা বহিল। এই উষ্ণ অশ্রুধারাই বাদসাহের নিকট শেষ উপহার। আকবর বন্ধুর এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কোন উত্তর না পাইয়া বিষাদে, ক্ষোভে, ঘোরতর মর্ম্ম পীড়ায়, স্বীয় উষ্ণীষ সবেগে হর্ম্মতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিলেন; এবং মধ্যে মধ্যে আবুল ফজলকে সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগে প্রকৃতিস্থ করিতে লাগিলেন। সেই গভীর নিশীথে, ভারতেশ্বরের স্নেহময় ক্রোড়ে ফৈজির প্রাণ বায়ু ইহলোক ত্যাগ করিল। যাহার জন্য তিনি একাগ্রতার সহিত জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ক্রোড়েই প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া অনন্ত সাগরে গিয়া মিশিল।

সকল বিষয় স্বাধীনভাবে আলোচনার জন্য আকবর এই সভার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। বড় বড় সৈয়দ, সেখজী, উলমা ও উজীরগণ, এই সভায় সম্রাট কর্ত্তৃক ধর্ম্মালোচনার্থে আমন্ত্রিত হইতেন। বাদসাহের চারি পার্শ্বে এই সমস্ত পণ্ডিতগণ পদ মর্য্যাদা অনুসারে উপবেশন করিতেন, তৎপরে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইত। আবুল ফজলের প্রভুত্ব বৃদ্ধির সময়, মকৃদম উল্‌মুলুক ও সেখ মকদম্ নাবি গোঁড়া সম্প্রদায়ের অধিনায়ক ছিলেন। আকবর বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিলে এক বৃহস্পতিবারে এই ধর্ম্ম সভার অনুষ্ঠান হইল। আকবরের মনে এই সময়ে উদার মতের ক্রমশঃ বিকাশ হইতেছিল। যে উদার মতের জন্য তিনি হিন্দু মুসলমানের সমান ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া কথিত হইয়াছেন—কুলগৌরব দীপ্ত উচ্চবংশীয় হিন্দু রাজকন্যাদিগের পাণিপীড়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন—তাহারই উত্তেজনায় তিনি এই সকল আত্মাভিমানী নৃশংস, ভ্রান্ত সৈয়দগণের অন্যায় যথেচ্ছাচার-প্রণোদিত কার্য্যে ফেরোয়ার ন্যায়—স্বকপোল কল্পিত আত্মগৌরবে মধ্যে মধ্যে বড়ই জ্বালাতন হইতেন। আবুল ফজলের মতের সহিত কেবল তাঁহার মতৈক্যতা ঘটিত। ইহাতে উক্ত আত্মাভিমানী পণ্ডিতগণ আবুল ফজলের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। আবুল ফজল কোন যুক্তিগর্ভ কথার অবতারণা করিলেই তাহারা গোলমাল করিয়া তাহা কোলাহল-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া দিতে চেষ্টা করিত। * আকবর সাহ দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন—এই আত্মাভিমানী উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার রাজ্য মধ্যে ক্রমশঃ বিলক্ষণ বল সঞ্চার করিয়া অশান্তি প্রচার করিতেছে এবং তাহাদের এই প্রকার বল সঞ্চয়ে কেবল তাঁহার হিন্দু প্রজাদেরই প্রভূত অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে। আকবর সাহ ইহাদের এই ক্ষমতা উচ্ছেদ জন্য প্রাণ পণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ফতেপুর শিক্রির নির্জ্জন স্থানে শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট হইয়া ভাবিতেন কি প্রকারে তাঁহার হিন্দু প্রজাবর্গকে ইহাদের শোচনীয় সংঘর্ষণ হইতে মুক্তি প্রদান করিবেন। তাঁহার এই অন্ধকারময় চিন্তা স্রোতের মধ্যে সহসা দীপ্ততেজ আলোক ছটা প্রবেশ করিল। তিনি দিশাঁহারা হইয়া উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন, আবুল ফজল তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিলেন। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়চিত্ত, ও গম্ভীরপ্রকৃতি হইয়া উঠিলেন। অতঃপর বৃহস্পতিবারে নৈশ ধর্ম্ম সভায় যে সমস্ত তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল, তাহাতে আবুল ফজলের তীক্ষ্ণ যুক্তিরই জয় হইতে লাগিল। তাঁহার প্রতিভাতেজে পরাভূত হইয়া তদীয় প্রধান প্রতিযোগী আবদমনবী মক্কায় পলায়ন করিলেন।

* একবার আকবর সাহ ইহাদের এই প্রকার বিশৃঙ্খলতায় বিরক্ত হইয়া এই সমস্ত পণ্ডিতদিগকে দরবার হইতে বাহির করিয়া দিতে হুকুম দেন।

যে উদার মত আক্‌বরের হিন্দু প্রজাদিগের মধ্যে অশেষ সুফল প্রসব করিয়াছিল, আবুল ফজল এই সময়ে সম্রাটের মনঃক্ষেত্রে তাহার বীজ বপন করিয়া অঙ্কুরিত করিয়া দিলেন। ফলতঃ আকবরের চরিত্রে এই অভিনব পরিবর্ত্তন সংঘটন জন্য আবুল ফজলের নিকট তৎকালীন হিন্দু সাধারণ মাত্রেই সম্পূর্ণ ঋণী।

এই সময়ে আবুল ফজলের সহিত সম্রাটের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ়ভাব ধারণ করিল। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর তাঁহার এতদূর বিশ্বাস জন্মিল যে, তিনি কবিবর ফৈজিকে যুবরাজ মুরাদের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং উভয় ভ্রাতাকেই মন্সবদারের পদে উন্নীত করিলেন। এই সময় হইতে আবুল ফজলের রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হইল। তিনি রাজকার্য্যে বা গোপনীয় মন্ত্রণায় সকল বিষয়ে বাদসাহের সহকারী হইয়া উঠিলেন। বাদসাহ যখন ফতেপুর শিক্রিতে থাকিতেন, তিনি নিকটে থাকিয়া মনোরঞ্জন করিতেন। বাদসাহ যখন বিদেশে যুদ্ধযাত্রা করিতেন, প্রিয় সুহৃদকে সহচারী করিয়া লইয়া যাইতেন।

আবুল ফজল ১৫৮৫ সালে হাজারী মন্সবদারের পদ লাভ করেন এবং পর বৎসর দিল্লী প্রদেশের দেওয়ানরূপে নিযুক্ত হন। * ইতি পূর্ব্বে যে নূতন ধর্ম্মমত আকবর সাহের হৃদয়-ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করিতেছিল—এক্ষণে তাহা পূর্ণ তেজে প্রদীপ্ত হইয়া স্বীয় স্নিগ্ধ জ্যোতি প্রকাশ করিল। বাদসাহের নূতন ধর্ম্ম মতের অর্থাৎ "দীন্ ই ইলাহির" মূল মন্ত্রই—"এই জগৎ সংসার এক মাত্র জগদীশ্বরের সৃষ্টি এবং আকবর সাহ এই পৃথিবীতে স্বয়ং তাঁহার প্রতিনিধি বা "খলিফা"। এই বিশ্বাস প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানী ধরণের নেমাজ উপাসনা প্রভৃতি রাজ সভা হইতে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। উৎসব, আনন্দ, উপাসনা, অর্চ্চনা, ভোজ ব্যাপার প্রভৃতি যাহা কিছু চলিতে লাগিল, তাহার অধিকাংশেরই মূলে পারসী বা হিন্দু রীতি নীতি অন্তর্নিবিষ্ট হইতে লাগিল। অপরন্তু এই নূতন ধর্ম্ম মতের স্মরণার্থে "তারিখ-ই-ইলাহি" নামক এক নূতন সালের সৃষ্টি করা হইল। হিন্দুরা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক সংখ্যায় উচ্চতর রাজকর্ম্মে নিয়োজিত হইতে লাগিল। আবুল ফজলের প্রতিযোগীরা তাঁহাকেই এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের মূলাধার ভাবিয়া তাঁহার প্রতি যথেষ্ট বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বাদসাহকে এমন পরামর্শও দিলেন যে আবুল ফজলকে দিল্লী হইতে স্থানান্তরিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে পাঠান হউক। আবুল ফজলের এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মধ্যে যুবরাজ সেলিমও একজন; পরে পাঠক এই বিষয়ের আরও পরিচয় পাইবেন।

১৫৯২ খৃঃ অব্দের আরম্ভে আকবর সাহ, প্রিয় সচিব আবুল ফজলকে দুই হাজারী

* আকবর নামা—তৃতীয় অধ্যায় ৪৬৩ পৃঃ।

মন্সবদারের পদে উন্নীত করেন। এখন আর সচিববর সামান্য শ্রেণী ভুক্ত নহেন, এক্ষণে তিনি বাদসাহের অনুকম্পায় একজন "আমীর" সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহার পর বৎসরেই তিনি পিতৃহীন হয়েন। পিতার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে তিনি স্বীয় সৌভাগ্য সোপান স্বরূপ, অসীম স্নেহাবিষ্ট ভ্রাতৃবিয়োগ-শোক অনুভব করেন। * ভ্রাতার মৃত্যুর পর আবুল ফজল সংসারে একাকী হইয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু এক মাত্র অমানুষিক প্রতিভা ও সম্রাটের স্নেহ তাঁহার প্রধান সুহৃৎরূপে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। ফৈজির মৃত্যুর পর আকবরের সমস্ত মনোযোগ তাহার কনিষ্ঠের উপর সম্পূর্ণরূপে সংন্যস্ত হইল। তিনি আবুল ফজলকে এই সময়ে আড়াই হাজারী মন্সবদার করিয়া দিলেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাম রাজ সভার আমীর শ্রেণীর তালিকা মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

আকবরের রাজত্বের ত্রিচত্বারিংশৎ বৎসর কালে, আবুল ফজল লেখনীর পরিবর্ত্তে অসি ধারণ করিতে বাদসাহ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে মহাসমর চলিতেছিল। যুবরাজ মুরাদ আকবর প্রেরিত বাহিনীদলের অধিনায়ক হইয়া দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন। নানা কারণে যুবরাজ মুরাদের বিষম পান দোষ ঘটিয়াছিল— আকবর সুতরাং আবুল ফজলকে দাক্ষিণাত্য জয়ের সহায়তা জন্য কুমারের নিকট প্রেরণ করিলেন। আবুল ফজল গিয়া দেখিলেন চারিদিকে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা— মোগল শিবিরের প্রধান প্রধান সেনানীগণ সকলেই অবাধ্য ও অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিক হইতে এই প্রকার নানাবিধ অতর্কিত বিপদ পাতে উদ্বেলিত চিত্ত না হইয়া তিনি বিশেষ ধীরতার সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন।

যুবরাজ মুরাদ ইতি মধ্যে আহম্মদনগর হইতে ইলিচ্‌পুরে আসিয়া পৌঁছিলেন— এইস্থানে তাঁহার শিশু পুত্রের কাল হওয়াতে কুমার অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়া অতিরিক্ত মদিরাপানে চিত্তস্থির করিতে লাগিলেন। মদিরাসক্তির বিষময় ফল শীঘ্রই প্রসূত হইল। কুমার সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাগত হইলেন। পীড়ার প্রকোপ উপশম হইলে তিনি দৌলতাবাদ হইতে পূর্ণানদী তীরে ছাউনি স্থাপন করিলেন। ইহার পর আর তাঁহাকে বেশী কষ্ট স্বীকার করিতে হইল না। সর্ব্বতাপ-সংহারক কাল আসিয়া তাঁহার সকল কষ্টের অবসান করিয়া দিল।

---

* আবুল ফজলের ভ্রাতৃস্নেহ অতিশয় প্রবল ছিল। ভ্রাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইতে তিনি সাধ্যমতে ত্রুটি করেন নাই। ফৈজির মৃত্যু-শয্যায় তিনি শপথ করিয়াছিলেন—তাঁহার মৃত্যুর পর তদ্রচিত কবিতাগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবেন। পরে তিনি এই প্রতিজ্ঞা বাক্য পালন করিয়াছিলেন। আকবর নামার যে খানেই তিনি ফৈজির নামোল্লেখ করিয়াছেন, সেইখানেই স্নেহ প্রণোদিত হইয়া সৌভ্রাত্রতার উচ্ছ্বাস দেখাইয়াছেন।

যুবরাজ মুরাদ যে দিন কালগ্রাসে পতিত হন, ঠিক সেই দিনই আবুল ফজল পুর্ণা-তীরে তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন শিবিরের মধ্যে সমস্তই গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। সৈনিকদিগের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধ না করিয়া দেশে ফিরিতে উদ্যত। ভূয়োদর্শনের সহায়তায় তিনি আরও দেখিলেন এই ঘোরতর শত্রু সঙ্কুল দেশের মধ্য দিয়া পলায়ন করিতে গেলে বাদসাহের অসংখ্য সৈন্যক্ষয় ব্যতীত আর কোন উপকারই হইবে না। সুতরাং দৃঢ়তা, সাহস ও অধ্যবসায় অব-লম্বনে অবশিষ্ট বিশ্বাসী সৈন্য সহায়ে তিনি যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। নাসিক ব্যতীত নিকটস্থ সমস্ত স্থানগুলিই তাঁহার করতলস্থ হইল। এতদ্ব্যতিরিক্ত বৈতালা, তালতম্, সাতন্ডা প্রভৃতি স্থলের কতিপয় দুর্গও তাঁহার হস্তগত হইল। লেখনী ও অসি উভয়ে সমান পরিশ্রমে তাঁহার জন্য যশঃ সঞ্চয় করিতে লাগিল। *

আকবর এই সময়ে উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইলেন। দাক্ষিণাত্যের ব্যাপার ক্রমশঃ ভয়ানক ভাব ধারণ করিতেছিল। বাদসাহ ইতি পুর্ব্বে যুবরাজ দানিয়েলকে দাক্ষি-ণাত্যে মুরাদের স্থলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে বাহাদুর খাঁ যুবরাজের নিকট অবনত হইতে অস্বীকার করায় খান্দেশ আক্রমণ নিতান্ত অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। আকবর স্বয়ং বাহাদুরের আসীরের দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, যুবরাজকে আহম্মদ নগরে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে আবুল ফজল আহম্মদনগরে ছিলেন। যুবরাজ তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"আহম্মদ নগরে আপনার আর কিছুই করিবার প্রয়ো-জন নাই, আমি স্বয়ং এই নগর দখল করিব।" ইতি মধ্যে বাদসাহ আবুল ফজলকে ফিরিয়া আসিতে আজ্ঞা দিলেন। বিজাগড়ে বহুকালের পর দুই সুহৃদের পুনরায় সম্মিলন হইল।

আসীরের সম্মিলনের পর এক নূতন ঘটনা উপস্থিত হইল। যুবরাজ সেলিম উদয়পুরের রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া তিনি সহসা এলাহাবাদে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় গিয়া "বাদসাহ" উপাধি ধারণ করিয়া বিদ্রোহী হইলেন। তাঁহার নিজ নামে মুদ্রা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইল। তিনি নব মুদ্রিত কয়েক খণ্ড মুদ্রা আকবরের শিবিরে প্রেরণ করি-লেন। আকবরের ঘোরতর হিন্দুপ্রিয়তার জন্য তাঁহার অধীনস্থ অনেক উচ্চপদস্থ সেনানী যুবরাজ সেলিমের পক্ষপাতী হইয়াছিল। আকবর সেলিমের এই ধৃষ্টতা দেখিয়া অতিশয় মর্ম্মপীড়িত ও ক্রোধোদ্দীপ্ত হইলেন। আবুল ফজলকে সুতরাং দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করিয়া আগরাভিমুখে ধাবিত হইতে আদেশ করিলেন। তাঁহার উপর হুকুম হইল—"ন্যায় অন্যায় যে উপায়েই হউক যুবরাজকে বন্দী করিও।" আবুল

* ইহার পর আবুল ফজল জলামপুর প্রভৃতি কয়েকটী স্থান নিজে দখল করেন।

ফজল তাঁহার পুত্র আবদর রহমানের উপর দক্ষিণাপথের সেনা পরিচালনের ভার ন্যস্ত করিয়া ত্বরায় অতি অল্প সংখ্যক লোক লইয়া আগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। সেলিম পূর্ব্ব হইতেই আবুল ফজলকে তাঁহার উন্নতির পথে ঘোরতর কণ্টক ও অন্তরায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, পথিমধ্যে আবুল ফজলকে ধৃত করিয়া নিহত করিবার নৃশংস বাসনা তাঁহাকে সম্পূর্ণ প্রলুব্ধ করিয়া তুলিল। এ কার্য্য সিদ্ধ করিবার ও কোন বিশেষ ব্যাঘাত দেখা গেল না। তিনি বুন্দেলা রাজপুত সর্দ্দার বীর সিংহকে আবুল ফজলের হনন কার্য্যে অনুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য ভবিষ্যৎ পুরস্কারের প্রলোভনে বীর সিংহ আকবরের ভয় সত্ত্বেও এই বিষয়ে সম্মত হইলেন। বাদসাহের সভায় তাঁহার কিছুমাত্র প্রতিপত্তি ছিল না। নানা কারণে তিনি আকবরের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন সেলিম ত কিছু কাল পরে ভারতের মসনদে বসিবেন, তাঁহাকে করকবলিত করিতে পারিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ও ভবিষ্যতের পথ সরল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। তিনি জানিতেন আবুল ফজল তাঁহার রাজ্য সীমা মধ্যস্থ নারওয়ারের নিকট দিয়া আগরায় যাইবেন। এই পথে আবুল ফজলকে ধরিবার জন্য তিনি কয়েক দল সজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য সংস্থাপিত করিলেন। আবুল ফজল যখন উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সহচরেরা তাঁহার জীবনের বিরুদ্ধে এই ঘোরতর চক্রান্তের বিষয় জানিতে পারিল। তাহারা তাঁহাকে নারওয়ারের পথ ত্যাগ করিয়া ঘাটী চণ্ডার পথে যাইতে অনুরোধ করিল। কিন্তু আবুল ফজল উত্তর করিলেন—"দস্যু তস্কর হইতে আমি কোন ভয়ের আশঙ্কা করি না। সামান্য দরবেশ হইতে আমি আমীর হইয়াছি, নিয়তির সহিত সংগ্রাম করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।" বস্তুত ভবিতব্যের ক্ষমতার প্রতিরোধ করা কাহারও ক্ষমতায়ত্ত নহে। আবুল ফজল কাহারও কথা না শুনিয়া নারওয়ারের পথে যাইতে লাগিলেন। যখন তিনি নারওয়ার হইতে ছয় ক্রোশ দূরে সরাইবারে উপস্থিত হইলেন, তখন, বীরসিংহের সেনাদল তাঁহার সম্মুখীন হইল। আবুল ফজলের সঙ্গে যে সমস্ত স্বল্প সংখ্যক লোক ছিল, তাহারা তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিল। তাহারা বিনয়ের সহিত তাঁহাকে অনুরোধ করিল—"আপনি ও পথে না গিয়া আন্ত্রিতে প্রত্যাগমন করুন—রায়বারণ ও সূর্য্যসিংহ সেইখানে তিন সহস্র বাদসাহী অশ্বারোহী লইয়া অবস্থান করিতেছেন। আপনি সেই সমস্ত সৈন্যের সহায়তায় বীরসিংহের মনোরথ ব্যর্থ করিয়া পাপিষ্ঠকে যথেষ্ট শাস্তি দিতে পারেন।" কিন্তু "পলায়ন" বা "আশ্রয় গ্রহণ" আবুল ফজলের অভিধানে লেখে নাই। সাহসীর ন্যায় মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া তিনি বীরসিংহের সৈন্য দলের নিকটবর্ত্তী হইলেন। একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ সংঘটিত হইল। একজন সৈনিকের বর্ষাঘাতে সাহসী কর্ত্তব্যকুশল পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ আবুল ফজলের বহু মূল্য মস্তিষ্ক বিদ্ধ হইল, সেই আঘাতেই তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন

বীরসিংহ * তাঁহার দ্বিখণ্ডিত মস্তক সেলিমের নিকট আলাহাবাদে উপঢৌকন পাঠাইলেন। সেলিম, জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সেই ছিন্ন মস্তক পূতিগন্ধময় এক অপরিষ্কার স্থলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। যিনি সেলিমকে দমন করিয়া আগরায় বাদসাহের জন্য চির শান্তি স্থাপন করিতে যাইতেছিলেন, তিনিই স্বয়ং গুপ্ত চর হস্তে নিহত হইয়া চিরশান্তি লাভ করিলেন।

আকবর ইতিমধ্যে আগরায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু আবুল ফজলকে দেখিতে পাইলেন না। কাহারও এমন সাহস হইল না যে বাদসাহের নিকট তাঁহার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করে। ভয়ে, উদ্বেগে সকলেরই হৃদয় স্তম্ভিত। কেহই সাহস করিয়া এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে চাহে না। মোগল দরবারের চলিত প্রথা এই—"কোন রাজকুমারের প্রাণবিয়োগ হইলে তাহার উকীল সেই সংবাদ বাদশাহের নিকট জ্ঞাপন করিত। মুখে অবশ্য এই সংবাদ জ্ঞাপন করিতে তাহার সাহস হইত না, হস্তের মণিবন্ধে এক খণ্ড নীলবর্ণ রেশমী রুমাল বাঁধিয়া বাদসাহের নিকট দাঁড়াইলেই তিনি প্রকৃত তথ্য বুঝিতে পারিতেন। আবুল ফজলের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন জন্য সেই উপায় অবলম্বিত হইল। তাঁহার উকীল একখণ্ড রেশমী বস্ত্র মণিবন্ধে বাঁধিয়া বাদসাহের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। বাদসাহ শোকাকুল চিত্তে, সেই অশুভ সংবাদ অবগত হইলেন। আবুল ফজলের শোকে তিনি এতদূর কাতর হইয়া উঠিলেন যে পুত্র বিয়োগেও লোকে তাঁহাকে অতদূর হইতে দেখে নাই। তিন দিবস আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তিনি সামান্য বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। চতুর্থ দিবসে সমস্ত তথ্য অবগত হইয়া শোক ভুলিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"সেলিম! সেলিম! রাজ্য লাভই যদি তোর উদ্দেশ্য ছিল, তুই কেন আমায় নিহত না করিয়া আমার প্রিয়তম আবুল ফজলকে নিহত করিলি?" †

ইহার পর বন্ধুর শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিহিংসা লইবার দৃঢ় বাসনা তাঁহার মনোমধ্যে জাগরূক হইয়া উঠিল। তিনি বুন্দেলাধিপতি বীর সিংহকে শাস্তি দিবার জন্য

* সেলিম নিজ মন্তব্য পুস্তকে বীরসিংহের অনেক সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। তিনি বাদসাহ হইয়া এই বুন্দেলা সর্দ্দারকে তিনহাজারী মন্সবদার করিয়াছিলেন।

† আকবর এই সময়ে শোকার্ত্ত হইয়া একটী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ এই——

অনুরাগে ত্বরাগতি, আসে সেখ ধীরমতি—
দূরতর দেশ হ'তে মিলন কারণ,
বাসনা তাহার হৃদে চুম্বিতে রাজেন্দ্র পদে—
প্রতিহিংসা বহ্নি হায়! নাশিল জীবন॥

পাত্রদাস ও রাজসিংহ নামক দুইজন হিন্দু সেনানীকে বুন্দেলা দুর্গের ধ্বংস সাধনার্থে প্রেরণ করিলেন। বুন্দেলা সর্দ্দার সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও আহত হইয়া বন মধ্যে পলায়ন করিয়া আকবরের জলন্ত ক্রোধবহ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

আবুল ফজলের সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করা যাইতে পারে, পাঠকবর্গের গোচরার্থে আমরা এই স্থানে তাহার পরিসমাপ্তি করিলাম। এক্ষণে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে দুচারিটী কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আবুল ফজলই আকবরের মনঃক্ষেত্রে সর্ব্বজন-প্রিয় উদার মতের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নিজে সাতিশয় উদার মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া কেহ তাঁহাকে হিন্দু, কেহ বা অগ্নি উপাসক, কেহ বা নিরীশ্বর মতাবলম্বী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। * আবার কেহ কেহ বলেন—সুফীদিগের ন্যায় তিনি মহম্মদের বিধানাবলীর উচ্চতম স্থলে আপনাকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া মহম্মদ অপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতেন। যিনি যাহাই বলুন না কেন—আক্‌বরের সময়ে ইতিহাস ঘটিত ঘটনাগুলির আলোচনা দ্বারা আমারা এই সত্যে উপস্থিত হই—আবুলফজলই আকবরের মনে শাসন সম্বন্ধে উদার নীতির নিয়ন্তা, তাঁহারই বিধানানুসারে, তাঁহারই অপক্ষপাতি মন্ত্রণা-কুশলতায়, তাঁহারই যুক্তিপূর্ণ তর্কে ও লেখনী মুখে পরাস্ত হইয়াই আকবর হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিকেই ন্যায় ও সাম্যের চক্ষে শাসন করিতে আরম্ভ করেন। আকবরের সাম্রাজ্য-ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার প্রধান স্থপতিই আবুল ফজল। †

বাদসাহের সুহৃৎ বলিয়াই হউক বা বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালী হওয়াতেই হউক ‡ আবুল ফজলের আহার প্রণালীটা বাদসাহী ধরণের ছিল। "মসীর উল্ উম্‌রা" নামক গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি——তিনি জল ও সুপ বাদে বাইশ সের বস্তু

---

* মসীর উল্ উমারা'র গ্রন্থকার।

† সুপ্রসিদ্ধ পারস্য ভাষাবিদ্ ঐতিহাসিক মৃত বুকম্যান 'এই সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন—* * Abul Fazl also led his sovereign to a true appreciation of his duties, and from the moment he entered the Court the problem of successfully ruling over mixed races which Islam in but few other countries had to solve, was carefully considered and the policy of toleration was the result. If Akber felt the necessity of this new law, Abul Fazl enunciated it, and fought for it with his pen; and if the Khan Khanans gained their victories the new policy reconciled the people to foreign rule and whilst Akber's apostacy from Islam is all but forgotten, no Emperor of the Mogul dynasty has come nearer to the ideal of a father of the people than he.

* * * * * * * *

‡ চার হাজারি মন্সবদারের মাসিক বেতন বাইশ হাজার মুদ্রা।

ভক্ষণ করিতেন; আহারের ঘটার বড় পরিপাটী হইত। বহুদুর বিস্তৃত প্রকাণ্ড মেজের উপর সহস্রাধিক প্রকারের চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, নানা বর্ণে—নানা ভাবে—নানা গন্ধে—শোভিত থাকিত। আহারের সময় তৎপুত্র আবদুল রহমান নিজে উপস্থিত থাকিয়া পিতার আহারের তদারক করিতেন। প্রধান বাবুর্চ্চিও সেই স্থানে উপস্থিত থাকিত, কারণ আবুল ফজল যে পাত্রস্থ খাদ্যের দুইবার আস্বাদ গ্রহণ করিতেন, তাহা পরদিন পুনরায় পাক হইত। তিনি নিজেও যেমন আহার করিতে পারিতেন, লোককে খাওয়াইতেও সেইরূপ দক্ষ ছিলেন। আগরায় থাকিবার সময়ও অতিথি সেবার, আমন্ত্রণ ভোজের বিরাম ছিল না—এমন কি যখন যুদ্ধ যাত্রায় যাইতেন, তখন তাঁহার বিস্তৃত স্কন্ধাবারে অসংখ্য আমীর ওমরাহ আসিয়া আহারাদি করিতেন। পার্শ্বে আর একটী শিবিরে দরিদ্রদিগের জন্য উদ্যোগ হইত। সমস্ত দিনই চারিদিক খেচরান্নের সদ্গন্ধে পরিপূরিত থাকিত এবং সকলেই যথেচ্ছা খাইতে পাইত।

আবুল ফজল নিজে যেমন সবিদ্বান ও শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ ও উচ্চপদস্থ ছিলেন—তেমনি আপনাপেক্ষা হীনাবস্থার লোকদিগের প্রতি যথেষ্ট যত্ন করিতেন। অভিমান বা অহঙ্কার তাঁহার অতি অল্পই ছিল—বৃথা আড়ম্বর তাঁহার দুই চক্ষের শূল, তিনি অত উচ্চপদস্থ হইয়াছিলেন কিন্তু কখনও উপাধি লয়েন নাই। তাঁহার পরিবার ও ভৃত্যবর্গ তাঁহার শাসনাধীনে চিরসুখে কাল কাটাইত। তিনি একবার যে ভৃত্যকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন, পরে তাহার সহস্রাপরাধ ঘটিলেও তাহাকে পদচ্যুত করিতেন না। তিনি বলিতেন, অকর্ম্মণ্য বা দোষী ভৃত্যকে পদচ্যুত করিলে লোকে প্রভুকেই মূর্খ বিবেচনা করে। কারণ ভৃত্য নিয়োগ সময়ে তাহার কর্ম্মক্ষমতা প্রভুর দেখিয়া লওয়া উচিত। বৎসরের প্রথম দিনে তিনি পূর্ব্ব বৎসরের হিসাব পত্রাদি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেন এবং নিজের পায়জামা ব্যতীত সমস্ত পুরাতন বস্ত্রগুলি দান করিয়া ফেলিতেন। পায়জামাটী দগ্ধ করা হইত।

"মসিরওল ওমরা" নামধেয় গ্রন্থপ্রণেতা আবুল ফজলের রচনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"লেখক শ্রেণীতে আবুল ফজল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা সমকালীন অন্যান্য গ্রন্থকারগণের অপেক্ষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। শব্দ সংযোজনার ওজস্বিতা, কল্পনা ও রচনার চাতুর্য্য—ভাবোচ্ছাসের প্রাচুর্য্য এবং বাক্য সমাপ্তির সৌষ্ঠবতা—তাঁহার লেখাতে এত প্রচুররূপে আছে যে অপরের তাহা অনুকরণের ক্ষমতা নাই।" বোখারার রাজা আবদুল্লা বলিতেন—"আমি আবুল ফজলের লেখনীকে যত ভয় করি—আকবরের শাণিত অসিকে তত ভয় করি না।" বস্তুতঃ তাঁহার ক্ষমতাই এইরূপ অসীম ছিল, তাহা না হইলে স্বয়ং কুমার সেলিম তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসৃত করিতেন না।

এলফিন্‌ষ্টোন প্রভৃতি দুই এক ইংরাজ ঐতিহাসিক আবুল ফজলকে "চাটুকার"

"সত্যাপলোপকারী" "অতিরঞ্জিত ঘটনা প্রকাশক" বলিয়া বিদ্রূপ কটাক্ষ করিয়া গিয়াছেন। আকবরের যথেষ্ট সুখ্যাতি করাতেই আবুল ফজল এই প্রকারে আসামী শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি আকবরের সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন— তাহা ভারতবর্ষীয়দেরই কমনীয় প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুরূপ। যাঁহার অন্নে শরীর পুষ্ট— যাঁহার সেবায় দেহ সমর্পিত—যাঁহার সমদর্শিতায় সমগ্র হিন্দুস্থান মুগ্ধ—যাঁহার শাসনে হিন্দু মুসলমান জাতিগত পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া—ভাই ভাইএর মত ছিল, সেই শাপ-ভ্রষ্ট প্রজাপ্রাণ আকবরের সম্বন্ধে অলঙ্কার পরিপূর্ণ ওজোগুণ বিশিষ্ট কথায় মনোভাব প্রকাশ করিলে কি চাটুকারিতা হয়? এলফিন্‌ষ্টোন উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার দর্পণে ষোড়শ শতাব্দীর আবুল ফজলের ও আকবরের চিত্র দেখিয়াছেন। তাহা না করিয়া যদি তিনি সেই সমসাময়িক দর্পণে তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি প্রতি ফলিত দেখিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে এ প্রকার বিরুদ্ধ মন্তব্যে উপনীত হইতেন না। যে আকবর আবুল ফজলের মৃত্যুতে তিন দিন বালকের ন্যায় নির্জ্জনে রোদন করিয়াছিলেন—যে আকবর তাঁহাকে পুত্রাপেক্ষাও স্নেহ করিতেন, ভ্রাতা অপেক্ষা সুহৃদ বিবেচনা করিতেন—যাঁহার কৃপায় তিনি সামান্য দরবেশ হইতে সর্ব্বোচ্চ আমীরি লাভ করিয়াছিলেন—যে প্রভুর চরিত্র চিত্রিত করিয়া তিনি আজও তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে বিচরণ করিতেছেন, সেই আবুল ফজল যদি সত্য সত্যই একটু "অতি রঞ্জিত গুণ বর্ণনা দোষে" দোষী হইয়া থাকেন, সহৃদয় সদবৃত্তি পরিপূর্ণ মানব হৃদয়ের নিকট তাহা কি স্বাভাবিক বলিয়া ক্ষমার্হ নহে? *

সাহান্‌সা বাদসাহ আকবরের দেহ সেকন্দ্রার অন্ধতমসাবৃত গহ্বরে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। আবুল ফজলের নির্দ্দোষিত শোণিতস্রাবে নাওয়ারার প্রশস্ত ক্ষেত্র ও পুণ্যতীর্থ প্রয়াগের পবিত্র ভূমি কলঙ্কিত হইয়াছে; বসুন্ধরা স্বীয় কোমল ক্রোড়ে সেই প্রভুভক্ত ভৃত্যকেও প্রভুর ন্যায় আশ্রয় দিয়াছেন। আকবরও মরিয়াছেন—— আবুল ফজলও মরিয়াছেন। জীবদ্দশায় বাদসাহ সর্ব্বদাই তাঁহাকে স্বীয় পার্শ্বচর করিয়া রাখিতে ভাল বাসিতেন। এই সংস্কারের ছায়ায় আজও আমরা যেন কল্পনার চক্ষে উভয়কে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পাই। "আইন আকবরী" বিস্মৃতি গর্ভে

---

* সুবিখ্যাত পারস্য ও আরব্য ভাষাবিৎ শ্রীযুক্ত ব্লকম্যান সাহেব এই অভিযোগের সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

Abul Fazl has far too often been accused by European writers of flattery and even of wilful concealment of facts damaging to the reputation of his master. A study, though perhaps not a hasty perusal of the *Akbernamah* will show that the charge is absolutely unfounded * * * we may pardon Abul Fazl when he praises because he finds a true hero.

না ডুবিলে আকবরের নাম কেহ স্মৃতিপথ-বিলুপ্ত করিতে পারিবেন না—এবং আকবর না ডুবিলে আবুল ফজল সাধারণের বিশেষতঃ ইতিহাস পাঠকের স্মৃতি ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইতে পারিবেন না। কীর্ত্তি উভয়কেই অপরিচ্ছেদ্যরূপে সংবদ্ধ করিয়াছে, সুতরাং একের স্মৃতি লোপ না হইলে অপরের স্মৃতি লোপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব!!!

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

চপলা।

কোথা হতে এস
কোথা যাও চলে!
বাহুতে বাঁধিলে
হেসে যাও গলে;
কাছে এসে তুমি
চাও মুখ পানে,
কেড়ে লও প্রাণ
গুনু গুনু গানে;
টুকু টুকু হাসি
চোকে চোকে ভাসে,
আলসে নয়ন
মুদে মুদে আসে।
কিশোর কোমল
সুললিত তনু;
বিজুলিতে বাঁধা
ভুরু যুগ ধনু;
কোকিল কলিত,
বেণু বীণা বাজে—
সুমধুর স্বর
বাধ' বাধ' লাজে।
চরণের পানে
ধায় মোর হিয়া,
চঞ্চল চরণ
বাঁধিব কি দিয়া!
চপল চঞ্চল,
কেন যাওয়া আসা—
হৃদয়ে রহিবে
বাঁধিয়াছি বাসা!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ধর্ম্ম সমন্বয়।

(কোন পরম হংস স্বামির উপদেশ হইতে উদ্ধৃত।)

অসংখ্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে মনুষ্য মণ্ডলী বিভক্ত রহিয়াছে এবং ঐরূপ বিভাগ বশতঃ মানুষের প্রতি মানুষের বিদ্বেষ, নৃশংসতা ও উৎপীড়নের অনন্ত প্রবাহ চলিতেছে, ইহা দেখিয়া বিচারশীল লোকমাত্রেরই হৃদয় দুঃখগর্ভ বিস্ময়ে অভিভূত হয়। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ, এই ভাব অতি প্রবলভাবে মনকে আক্রমণ করে। পৃথিবীতে আর একটি দেশ নাই যেখানে এত প্রকারের পরস্পর বিষম্বাদী ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; এবং বর্ত্তমান কালে এমন কোন স্থান নাই যেখানে ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন বিদ্বেষ দ্বারা এত কুফলের উদ্ভব হয়। যে সকল সম্প্রদায়ের বাহিরে সঞ্চারণের অধ্যবসায় নাই, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম অনবরত পরস্পরের পরাভবের জন্য কটিবদ্ধ রহিয়াছে। এ নিমিত্ত সকলেরই, বিশেষতঃ যাহাদের ভারতবর্ষের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে, তাহাদের পক্ষে গম্ভীরভাবে সত্যলিপ্সায় বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে ধর্ম্ম কি, তাহার কি স্বরূপ, যে ধর্ম্মে জন্ম গ্রহণ হইয়াছে তাহাকে ত্যাগ করিয়া অপর ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে কি ফল হয়, কোন ধর্ম্ম সত্য, সত্যধর্ম্মের জয় কেন প্রার্থনীয়, এবং সত্যধর্ম্মের জয় হইলে কি ফল হয়?

সত্যধর্ম্মের জয় হইলে লোকে বাছিয়া মিথ্যা হইতে সত্যকে গ্রহণ করিতে পারে, এবং ব্যবহার ও পরমার্থ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য ইহা বিশেষ জানিতে পারে, এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করিলে সর্ব্ব সাধারণের সমান ভাবে মঙ্গল হয়। জল যেমন পিপাসা নিবারণ করে, সেইরূপ সত্যধর্ম্ম, আমাদের স্থায়ী প্রকৃতি কি তাহা না বুঝিবার হেতু একের প্রতিদ্বন্দ্বী অপরের বাসনা হইতে যে ক্রূর কর্ম্মা বিরোধ উপস্থিত হয় এবং সেই বিরোধ হইতে সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর যে অমঙ্গল জন্মে, তাহা একেবারে চিরকালের জন্য সমূলে বিনষ্ট করে। ক্ষুদ্র হইতে মহৎ পর্য্যন্ত সমস্ত জীবেরই পিপাসা নিবারণের কোনও না কোন আকারে জলের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু ঐ নানা আকারের মধ্যে যে জল আছে, তাহা এক, ভিন্ন দুই নহে। সেই প্রকার স্বরূপ যে সত্য, অর্থাৎ যাহাতে সত্য এই বিশেষণ পদের প্রয়োগ হয় না, যাহা নিজেই সত্য এবং যাহা মনুষ্য মণ্ডলীর পরিজ্ঞাত নানা ধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবের অভাব মোচন করিতেছে, সেই সত্য এক ও অদ্বিতীয়। যেমন জল এক ও নিরংশ হইয়া, ভৌতিক জীবন রক্ষা করিতেছে, সেইরূপ সত্য এক এবং নিরংশ হইয়া আধ্যাত্মিক জীবন রক্ষা করিতেছে। বাক্যান্তরে ইহাকে এইরূপ বলিতে হয় যে, পূর্ণ পরব্রহ্ম যাঁহার গড্, আল্লা, য়াহোবা, ঈশ্বর নামান্তর মাত্র, যিনি সমস্ত জীবের পিতা মাতা গুরু আত্মা ও যিনি চরাচর সকলেরই

আধার, তিনিই সত্য ধর্ম্ম। তাঁহাকেই সর্ব্বলোকে অঙ্গীকার করিবে এবং তদ্ভিন্ন অন্য কাহাকেও অঙ্গীকার করিবে না। যদ্যপি তাঁহারই অধীন হইয়া আমরা শান্ত, ধীর ভাবে রহি, এবং পরস্পরের উপচিকীর্ষু হইয়া বিচার পূর্ব্বক চলি, তাহা হইলে সর্ব্ব-বিষয়ে সর্ব্বাবস্থায় আমরা আনন্দরূপ রহিব। ইহাই সত্য ধর্ম্ম। দেশ কাল ও জাতি ভেদে এই সত্য ধর্ম্মের যে নানা আকার কল্পিত হইয়াছে, তাহা সত্য ধর্ম্ম নহে। যদিও চরমে পরব্রহ্মই ঐ সকল আকারের আধার—তথাপি বুঝিবার সুবিধার জন্য উহাদিগকে মিথ্যা ধর্ম্মই বলিতে হয়—কেননা ঐ সমুদায় আকারের কোন একটীতে আসক্তি জন্মাইলে উহাদের আধার যে পরব্রহ্ম তাঁহাতে মুখ্য দৃষ্টি থাকে না এবং অনেক সময় তাহা হইতে একেবারে দৃষ্টি বিচ্যুত হয়। দৃষ্টি পরব্রহ্ম হইতে বিচ্যুত হইলে এক আকারের ধর্ম্মাবলম্বি লোক নিজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বরূপ মিথ্যা অভিমানের দ্বারা চালিত হইয়া অপর লোকের অপর আকারের ধর্ম্মকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে এবং ঐরূপ চেষ্টা হইতে নানা প্রকার অশান্তি, বিষম্বাদ, ও ক্রূর কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। যথার্থ কথা এই যে, যে বস্তু যে ব্যক্তির প্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল হয়, সে ব্যক্তির সে বস্তুতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতি হয় এবং তাহাকেই সে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মানিয়া অপর ব্যক্তিকেও তাহাতেই অনুরক্ত করিতে যত্ন করে। মদ্যপায়ী অহিফেনসেবক ও গাঞ্জা অনুরাগী ব্যক্তিকে নিন্দা করে ও অপর দুই জনের কর্ত্তৃক নিজে নিন্দিত হয়। মাংসাহারী অমাংসাহারির মূর্খতা প্রচার করে এবং অমাংসাহারী মাংসাহারিকে ঘৃণা করে। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। যদ্যপি পরব্রহ্ম ধর্ম্মের আদি মধ্য ও অন্ত হয়েন, তাহা হইলে এক ধর্ম্মের অন্য ধর্ম্ম হইতে কি প্রকারে শ্রেষ্ঠত্ব হইতে পারে? যে ব্যক্তির মধ্যে যে সকল গুণ জাগ্রত থাকে, তাহাই তাহার প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতি যাহার দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়, তাহাই তাহার ভাল বোধ বোধ হয়, এবং তাহার বিপরীতেই সে ব্যক্তির অপ্রীতি জন্মে ও তাহাকেই মন্দ বলিয়া অনুভব করে। তিনি জ্ঞানী হয়েন তিনি জানেন যে, যে পুরুষ তাঁহার নিজের অন্তর্যামী ও যিনি সর্ব্বদা তাঁহাকে সৎ পথে প্রেরণ করিতেছেন, তিনি সকলেরই অন্তর্যামী এবং এইরূপ জানিয়া কাহাকেও নিন্দা বা বিদ্বেষ করেন না।

সকলেরই ধর্ম্ম অন্তর্দ্দিকে এক। স্বপ্রকাশ, সকলের পিতামাতা, গুরু আত্মা, সত্য স্বরূপ পরব্রহ্মে অচল নিষ্ঠা ভক্তি, সর্ব্বভূতে দয়া ও সমদৃষ্টি এবং ক্ষুধার্ত্তকে আহার দান ও পিপাসুকে জল দান—ইহাই হিন্দুদিগের মধ্যে সত্যধর্ম্ম। পরব্রহ্মের নামান্তর যে আল্লা তাঁহাকে ঐরূপ নিষ্ঠা ভক্তি ও ক্ষুধার্ত্ত পিপাসুর ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করাই মুসলমানের পক্ষে সত্যধর্ম্ম। পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন যে গড্ তাঁহাতে প্রেমপূর্ণ নিষ্ঠা ও সর্ব্বজীবের উপচিকীর্ষা ও অসহায়, অন্ধ খঞ্জের অভাব মোচন করাই খৃষ্টিয়ানের পক্ষে সত্যধর্ম্ম। সর্ব্ব ধর্ম্মই যখন এইরূপে এক মত তখন আপন আপন মানস-গঠিত অস্ত্রের দ্বারা পরস্পরকে তাড়না করায় ফল কি? নিজ নিজ ধর্ম্মের পক্ষপাত কর্ত্তৃক চালিত

হইয়া ও বিশুদ্ধ সত্যের দিকে দৃষ্টি রোধ করিয়া কেন আমরা অনন্ত দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি? হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, আইস আমরা গম্ভীরভাবে বিচার করি যে, আমি কে, আমার কি স্বরূপ, স্বপ্রকাশ শুরু আত্মা গড্, আল্লা, ঈশ্বর পূর্ণ ব্রহ্মের কি স্বরূপ? অনন্ত ভূতকালে আমি কোথায় ছিলাম, ও মৃত্যুর পরে আমি কোথায় যাইব, আমার কি কর্ত্তব্য এবং ব্যবহার ও পরমার্থ বিষয়ে আমি কিরূপে সিদ্ধি লাভ করিয়া সদা আনন্দরূপ থাকিব! ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

প্রবাদ প্রশ্ন।

বড় বেশি দিনের কথা নয়—আজ তিন বৎসর হইবে আমি একবার কৃষ্ণনগর হইতে গোয়ালন্দ যাইতেছিলাম। আহারাদি সারিয়া বেলা ৮টার সময় বগুলা ষ্টেসন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কৃষ্ণনগর হইতে বগুলা ১১ মাইল, ভাড়াটিয়া গাড়ীতে এই পথ অতিক্রম করিলাম, যখন ষ্টেসনে পৌঁছিলাম তখন বেলা দশটা।

ট্রেণ ১০½ টার সময় ষ্টেসনে পৌঁছিবার কথা। পূজার সময়, কাজেই ষ্টেসনটি লোকে পূর্ণ হইয়াছে, ছোট বড় মোট লইয়া বিস্তর স্ত্রী পুরুষ গাছের তলে, ষ্টেসনের আঙ্গিনায় ও ঘরে সমবেত হইয়াছে; শত শত যাত্রীর জীবনের সুখ দুঃখময় কাহিনীতে ষ্টেসনটি শব্দময়।

ক্রমে টিকিটের ঘণ্টা বাজিল, যাত্রীর দল টিকিট ঘরের 'গবাক্ষ দ্বারে' আসিয়া দাঁড়াইল; কি বিষম জনতা! সকলেই অগ্রে টিকিট পাইতে উৎসুক, শান্তি রক্ষকের কঠোর ভ্রূকুটী ও তীব্র কটূক্তি তাহাদের ব্যগ্রতায় অগ্রাহ্য হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধঘণ্টা চলিয়া গেল, ট্রেণ 'হুস্ হুস্' শব্দে প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া দাঁড়াইল; 'বোগ্‌লো' 'বোগ্‌লো' 'চাই পান,' 'চাই জলখাবার' ইত্যাদি শব্দে ও আরোহীদিগের ব্যগ্রতাসূচক চিৎকার ধ্বনিতে ঘোর রোল উঠিল; কতকগুলি যাত্রী তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, কতকগুলি বা জন বিরল গাড়ীর অনুসন্ধানে এদিক ওদিক করিয়া দৌড়িতে লাগিল; তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলির দিকে চাহিতে আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, গাড়ীতে লেখা আছে 'to carry 60' কিন্তু তাহাতে তাহার তিনগুণ পরিমিত লোক উঠিয়াছে, আরোহীদিগের আর্ত্তনাদ ও স্থানাভাবের আপত্তি কোন কর্ম্মচারীর কর্ণেই প্রবেশ করিতেছে না, গাড়ীগুলি যে স্থিতিস্থাপক নহে সে কথা ভুলিয়া কর্ম্মচারীগণ যাত্রীদলকে ঠেলিয়া সেই বোঝাই গাড়ীগুলির ভিতরই পুরিতেছেন, তাহাদের আপত্তি ও অনিচ্ছার চিৎকার এঞ্জিনোত্থিত বাষ্পের ন্যায় বাতাসে মিশাইয়া যাইতে লাগিল।

মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীগুলির অবস্থাও প্রায় সেই প্রকার, তবে এগুলি ভদ্রলোক দ্বারা অধিকৃত বলিয়াই তাহা হইতে বিকট চিৎকার উঠিতেছিল না।

দেখিয়া শুনিয়া আমি একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী দুখানির বেশি ছিল না, তাহার মধ্যে একখানিতে ৪।৫ জন বাঙ্গালী আরোহী ছিলেন, আর একখানি খালি পড়িয়াছিল, আমি এই শেষের খানিতে উঠিয়া পড়িলাম, জানালাগুলি বন্ধ ছিল, সেগুলি তাড়াতাড়ি খুলিয়া একটি জানালার ধারে বসিয়া পড়িলাম।

প্রায় দশ মিনিট অতিবাহিত হইল, ষ্টেসনের ভিড় কমিয়া গেল, একটি নাতিদীর্ঘ 'ফুঁ' ছাড়িয়া ট্রেণ আবার চলিল, তিন চারি মিনিটের মধ্যে ষ্টেসনটিকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া প্রবল বেগে ছুটিল, গাড়ীর ভিতর বড় গরম হইয়াছিল, এতক্ষণে বেশ বাতাস পাইলাম, আমি জানালার ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

আশ্বিন মাস—বর্ষা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার অধিকারের চিহ্ন এখনও চারি দিকে দেখা যাইতেছে; রেলের রাস্তার নীচে যে নিম্ন ভূমি আছে, বর্ষাকালে সেখানে প্রচুর জল জমিয়াছিল, সূর্য্যের প্রখর কিরণে সে জল অনেক শুকাইয়াছে বটে, কিন্তু যাহা আছে তাহাও নিতান্ত অল্প নহে। স্থানে স্থানে বহুদূর বিস্তৃত জলখণ্ড দেখা যাইতেছে—বোধ হইতেছে যেন এক একটি হ্রদ। তাহার ভিতর ছোট ছোট শুষ্ক গাছের অগ্রভাগ জাগিয়া আছে, দুই একটি মাছ রাঙ্গা পাখী তাহার উপর বসিয়া শিকারের চেষ্টা দেখিতেছে, কোথাও বা বকের দল স্থিরভাবে বসিয়া আছে। একস্থানে দেখি কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে দুই তিন খানি তালের ডিঙ্গিতে চড়িয়া মহানন্দে জলের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা গাড়ী দেখিয়াই দুই হাত তুলিয়া আরোহীদিগকে ডাকিতে লাগিল; আর একস্থানে দেখি কতকগুলি ধোপা রাশিকৃত বস্ত্র পরিষ্কার করিতেছে; অতি দূরে দূরে গাছের ছায়া কুয়াসার মত দেখা যাইতেছে, আর দুই একটি তাল বৃক্ষ উন্নত শীর্ষে দাঁড়াইয়া যেন চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূখণ্ডের উপর পাহারা দিতেছে। কিছুকাল পরে এ জলময় নিম্নভূমির চিহ্ন অদৃশ্য হইল; দেখিলাম রেল পথের ধারে উচ্চ জমি আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর দুই এক জন কৃষকের অযত্ন-বদ্ধ কুটীর, কুটীরের সম্মুখে সামান্য জমীতে কিছু তরকারী লাগান হইয়াছে, কুটীরের চালে কুমড়া গাছ লতাইয়া উঠিয়াছে, একপাশে একটি চালের উপর অনেকগুলি শশা ধরিয়া আছে, আঙ্গিনায় একটি বালিকা একটি ছোটছেলেকে খেলা দিতেছিল, গাড়ীর শব্দ শুনিয়া সে ছেলেটিকে কোলে করিয়া লাইনের পাশে তারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। এইরূপ বৈচিত্র্যময় নানা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অনেক পথ অতিবাহিত হইল, বিবিধ মনোহর দৃশ্যের ভিতর আমার অস্তিত্ব কিছুকালের জন্য ডুবিয়া গেল, গাড়ীর সেই

'এক ঘেয়ে' শব্দে, মাঠের প্রচুর বাতাসে, এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে মনের একাগ্রতাতে আমার বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

বেশি সময় ঘুমাই নাই, জাগিয়া দেখি গাড়ী থামিয়াছে, নিকটে অনেক লোকের কোলাহল শব্দ শুনিতে পাইলাম, দুই একটি অন্ধ সুর তুলিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে। আমি উঠিয়া বসিতেই দেখি, একজন সাহেব ও একটি বাঙ্গালি ভদ্রলোক আমার গাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইয়া কি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

বুঝিলাম পোড়াদহ ষ্টেসনে পৌঁছিয়াছি। আমাকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়াই সেই বাবুটি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন—"মহাশয়ের কতদূর যাওয়া হইবে ?"

আমি। "গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত, কিছু প্রয়োজন আছে কি ?"

বাবু। "আপনাকে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি—বলিতে পারি কি ?"

লোকটার কথার অর্থ বুঝিলাম না, কখন যে তাঁহাকে দেখিয়াছি তাহা বোধ হয় না, তবে কি কথা বলিবেন কৌতূহল বাড়িল, বলিলাম—"অসঙ্কোচে বলুন, অনুমতির আবশ্যক কি ?"

বাবু। "দেখুন, এই সাহেবটি পীড়িত, ইনি নিকটেই একটি ষ্টেসনে নামিবেন; কিন্তু এ ট্রেণে দুখানি বই সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী নাই, একখানিতে কয়েক জন বাবু আছেন, আর একখানি এই, এখানে আপনি একা আছেন, যদি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই গাড়ীটাতে যান তবে এই সাহেবটি একটু নিরিবিলিতে গন্তব্য স্থানে যাইতে পারেন।"

আমি। "সাহেব ইচ্ছা করিলে এই গাড়ীতেই যাইতে পারেন, যদি তিনি বিরক্ত হইবার ভয়ে আমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত না হন, তবে আমি বলিতেছি তিনি নির্ভয় হউন, সাহেবকে কোন রকমে বিরক্ত করা আমার একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, তবে যদি তিনি "কালা আদ্‌মি"র সহিত এক গাড়ীতে যাওয়া অপমানজনক মনে করেন, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। যদি আমার দ্বারা তাঁহার প্রকৃতই কোন ক্ষতি হইত, তাহা হইলে আমি এই দণ্ডেই গাড়ী ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু শুদ্ধ তাঁহার জেদ বজায়ের জন্য আমি এ গাড়ী ছাড়িতে প্রস্তুত নহি। আপনার যদি এতই ইচ্ছা তবে এ ট্রেণে আর একটা 'সেকেণ্ড ক্লাস ক্যারেজ' জুড়িয়া দেন।"

বাবুটি নাছোড়বান্দ।—আমাকে আবার বলিলেন—"এ ষ্টেসনে আর গাড়ী নাই, আরও দেখুন অন্য গাড়ীতে আপনি অন্যান্য বাবুদের সঙ্গে বেশ আমোদ আহ্লাদে যাইতে পারিবেন, একজন ভদ্রলোকের উপকার করা কি আপনার উচিত নহে ?"

আমার বড় রাগ হইল, দেখিলাম লোকটি যদিও বাবু গোছের, কিন্তু তাঁহার প্রাণ মন শ্বেতাঙ্গের শ্রীচরণে চির বিক্রীত, লোকটা সেই সাহেবের অনুরোধে তাহার মনস্তুষ্টির জন্য আমার নিকট বারম্বার এরূপ অন্যায় আবেদন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত

হইল না। আমার বোধ হয় যে সমস্ত অশিক্ষিত লোক রেলওয়ে বিভাগে চাকরত্ব স্বীকার করে, তাহাদের অধিকাংশই এই বাবুটির মত শ্বেতাঙ্গ প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য ন্যায় ও কর্ত্তব্যের মস্তকে পদাঘাত করিতে অক্ষুণ্ণচিত্ত। যাহা হউক কাজের কথা বলি—আমি সেই বাবুটিকে বলিলাম "কেন মশায় বারবার বিরক্ত করেন, আমার কর্ত্তব্য আমি ভাল বুঝি—কিসে আমার সুবিধা অসুবিধা হইবে, উপযাচক. হইয়া তা আমাকে না বলিয়া দিলে বড় উপকৃত হইব।"

সেই আরোহী সাহেবটি একটু দূরে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর পদ চারণা করিতেছিলেন, আর মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইয়া আমাদের দিকে কটাক্ষপাত করিতেছিলেন; তিনি অঙ্গুলী সঙ্কেতে সেই তর্ক পরায়ণ বাবুটিকে ডাকিলেন, বাবু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে উভয়ে কি কথা হইল, তাহার পর উভয়েই একটু হাসিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

দুই তিন মিনিট অতীত হইল, দেখিলাম সেই বাবু অগ্রে আসিতেছেন, তাঁহার পশ্চাতে স্থূলোদর, মসিবিনিন্দিত মূর্ত্তি, হ্যাটধারী একটি ফিরিঙ্গীকুলচূড়ামণি, তাঁহার পশ্চাতে একটি কুলি, হস্তে একখানি কাঁষ্ঠফলক; তাহার পশ্চাতে সেই সাহেব। এই বিভিন্ন ভাবাপন্ন মূর্ত্তি চতুষ্টয় আমার দিকে আসিতে লাগিলেন, আমি বলি এ কি ব্যাপার!

সেই ফিরিঙ্গী কুলশেখর আমার নিকট আসিয়াই একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে ইংরেজীতে বলিলেন "আপনি অন্য সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ীতে যান, এখানি স্ত্রীলোকদিগের জন্য মনোনীত হইল।' এই বলিয়া তিনি সেই কুলিরদিকে একবার তাকাইলেন; কুলি সেই কাষ্ঠফলকখানি আমার গাড়ীতে লাগাইয়া দিল, সেখানিতে লেখা ছিল 'For ladies only'। আমি ধীরে ধীরে বাঙ্গালী ভদ্রলোক কয়টি যে গাড়ীতে ছিলেন, সেই গাড়ীতে আশ্রয় লইলাম, যাইতে যাইতে একবার ফিরিয়া দেখিলাম—সেই যাত্রী সাহেবটি আমার পরিত্যক্ত গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখে একমুখ হাসি; শীঘ্রই গাড়ী ছাড়িয়া দিল, সেই বাঙ্গালীকুল-তিলক (যিনি সাহেবের জন্য আমার নিকট অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলেন) আমার দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন, সে হাসি নীচ অহঙ্কারভাবে. পূর্ণ। আমি মনে মনে ভাবিলাম ভগবান এ হাসি হাসিতে মানুষ কবে ভুলিবে? যাহা হউক সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গোয়ালন্দ পৌঁছিলাম, আমার একটি বন্ধু আমার প্রতীক্ষায় ষ্টেসনে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি পৌঁছিতেই তিনি আমাকে মহাসমাদরে লইয়া গেলেন; আমাদের নানাবিধ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল, আমি কথায় কথায় এই সাহেব সংক্রান্ত কথাটাও পাড়িলাম, তিনি আদ্যোপান্ত শুনিয়া একটি প্রাচীন প্রবাদ বাক্যে আমার কথার উপসংহার করিলেন।

পাঠক, বলুন দেখি সে প্রবাদটা কি?

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বধিরের বাসনা।

কেহ কখন সুখ পাইয়াছ? সুখ কি, তা জান? সুখী কে, তা জান? আমি সুখী। কেন—জান? আমি বধির। জন্মাবধি কখন শব্দ শুনি নাই।

তোমরা হাসিবে, আমি জানি। আমি তোমাদের হাসি দেখিব, শুনিব না। তোমরা আমায় বিদ্রূপ কর, তাহাও জানি। বালকেরা করতালি বাজাইয়া বলে, "কালা, নিজের বিয়ের বাজনা শুন্‌চে!" আমি তাহা বুঝিতে পারি। কোন উদার ব্যক্তি আমাকে দেখিয়া দুঃখিত হন, তাহাও বুঝিতে পারি।

আমি সুখী, তোমরা বিশ্বাস করিবে কেন? তোমাদের যে পঞ্চেন্দ্রিয় আছে, তাহারি একটীতে আমি বঞ্চিত। তোমাদের সুখ নাই, আমার সুখ থাকিবে কিসে? তোমরা ধনী, আমি দরিদ্র, তোমরা পূর্ণাঙ্গ, আমি বিকলাঙ্গ। তোমাদের সুখ নাই, আমি কেমন করিয়া সুখ পাইব?

পূর্ণতাই কি সুখ? কিসের পূর্ণতায় সুখ? ধন পূর্ণমাত্রায় পাইলে সুখ হয়? যৌবন, ইন্দ্রিয়বৃত্তি, রূপ, কিসের পূর্ণতায় সুখ আছে, বলিতে পার? দরিদ্র ধনীর অপেক্ষা সুখে থাকে, সকলে ত দেখিয়াছ। যে তোমার অপেক্ষা শারীর ঐশ্বর্য্যে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, সে তোমার অপেক্ষা কেন না সুখী হইবে?

যোগের আনন্দ কাহাকে বলে, কখন শুন নাই কি? ইন্দ্রিয় নিরোধই সুখের মূল। ইন্দ্রিয় রোধ কর, সুখ পাইবে। আরও ইন্দ্রিয় রোধ কর, আরও সুখ পাইবে। বাহ্যেন্দ্রিয় সমুদায় রুদ্ধ কর, যোগানন্দ অনুভব করিবে। মনেন্দ্রিয় রুদ্ধ কর, সুখের আর সীমা থাকিবে না। ইন্দ্রিয় সংযম না করিলে কেহ কখন জ্ঞান লাভ করিয়াছে? মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস। চক্ষে, কর্ণে আবার সুখ? সুখ ইন্দ্রিয়গত? তোমরা চক্ষু কর্ণ জুড়াইলেই মনে কর সুখ হইল। তোমরা সুখের কি জানিবে? তোমরা বুঝনা, ইন্দ্রিয়ের অগোচর সুখ কেমন করিয়া থাকিবে। চীনসম্রাটের সাক্ষাতে একজন ইয়োরোপীয় বলিয়াছিলেন যে জল জমিয়া প্রস্তরবৎ কঠিন হয়। তাহার উপর দিয়া শকটাদি গমনাগমন করে। সম্রাট সে ব্যক্তিকে বাতুল বিবেচনা করিয়াছিলেন। তোমরা আপনাদিগকে সর্ব্বদর্শী বিবেচনা কর; মনে কর, তোমার বোধাতীত কোথাও কিছু নাই। প্রত্যক্ষ অথবা করতলগত নহিলে কিছু বিশ্বাস কর না। কার্য্যকারণ সম্বন্ধে মনুষ্যের বুদ্ধি বহু দূরগামিনী বিবেচনা কর। তৃণাঙ্কুরের বর্ণবৈচিত্র কিসে সম্পাদিত হয়, কেহ বলিতে পার?

তোমাদের অপেক্ষা আমি দুঃখী কিসে? তোমরা শব্দ শুনিতে পাও, আমি শুনিতে পাই না, এই জন্য? তোমরা প্রিয় সম্বোধন শ্রবণ করিয়া, স্নেহময় বাক্য শুনিয়া,

রমণীর মধুর কণ্ঠোচ্চারিত সঙ্গীত, পাখীর গান শুনিয়া শ্রবণ পরিতৃপ্ত কর? আমি বধির, এ মোহমন্ত্র শুনিতে পাই না। বল, দেখি, শুনিয়া তোমাদের কি সুখ, কতটুকু সুখ? তোমরা কি শুনিতে পাও? আলোকের তরঙ্গভঙ্গ রব শুনিতে পাও, কৌমুদী সঙ্গীত শুনিতে পাও, নক্ষত্র কিরণময়ী বীণার ঝঙ্কার শুনিতে পাও? শূন্যময় নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া এই বিশাল ধরণীর বেগবতী গতি শ্রবণ করিতে পাও? তোমাদের শ্রবণ বিবরে পুণ্যের কয়টী কথা প্রবেশ করে? প্রণয়ের কথা, স্নেহের সম্ভাষণ, সঙ্গীত ধ্বনি, বিহঙ্গকলরব কয়বার শুনিতে পাও? নিত্য কতবার কর্ণ কলুষিত কর? পরনিন্দা, অভিশাপ, কটূক্তি ইহাতেই কি কর্ণ পরিপূরিত কর না? আমি কখন কাহারও নিন্দা শুনিয়াছি?

আমার কি দুঃখ? রমণী কলকণ্ঠগীতি, বিহঙ্গকাকলী শুনিতে পাই না? কে বলিল? আমি ইচ্ছা করিলেই শব্দ অনুভূত করিতে পারি। আমি কিরূপে শব্দ অনুভূত করি, তাহা পরে বলিব। তোমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের গৌরব হরণ করিতে চাহি না।

তোমরা সুখের কি জান? তোমরা কখন সুখ পাইবে না, অথচ সুখই তোমাদের একমাত্র কামনা। সদ্যপ্রসূত শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই রোদন করে। সদ্য শিশুকে কখন হাসিতে দেখিয়াছ? তোমরা রোদন করিতেই আসিয়াছ। দুঃখই তোমাদের সর্ব্বস্ব। তোমরা মরুভূমি মধ্যে সুখ মরীচিকা দেখিয়াছ। চিরকাল সেই দিকে ধাবমান হইবে, কখন সুখ করপ্রাপ্ত হইবে না।

আমি দেখিতেছি প্রকৃতি আনন্দময়ী। কুসুমিত শাখা, মুকুলিত লতা, শ্যামল পত্র, বিহঙ্গের পক্ষ সঞ্চালন, জলতরঙ্গ, সকলই দেখিতেছি। দেখিতেছি কুসুম নীরব, চন্দ্র নীরব, সূর্য্য নীরব, নক্ষত্র নীরব। সবই সুন্দর। নীল নীরব শূন্য কত সুন্দর! জড় প্রকৃতির এই হাস্যময় মুখ, আর সময়ে সময়ে ভয়ঙ্কর সংহারমূর্ত্তি, সবই সুন্দর। নৈসর্গিক উৎপাতে যে সৌন্দর্য্য আছে, তোমরা কি তাহা দেখিতে পাও? দিগন্ত হইতে দিগন্ত বিস্তারী মেঘে যখন আকাশ আচ্ছন্ন হয়, সীমান্তে এক একবার অতি ক্ষীণ বিদ্যুৎ চমকিতে থাকে, সে সময়কার সৌন্দর্য্য দেখিয়াছ? স্তরে স্তরে কৃষ্ণ মেঘ সজ্জিত হইতে থাকে, যেন সেই ঘোর যুদ্ধে ভীমদর্শন সৈন্যশ্রেণী সজ্জিত হইতেছে। আর সেই বজ্রবিদ্যুৎরূপা ঘোরাস্ত্র আস্ফালন করিতে করিতে যেন কোন অদৃশ্য মহারথী আকাশপ্রান্ত হইতে আকাশ মধ্যস্থলে অগ্রসর হইতে থাকে। বায়ু স্তম্ভিত, বৃক্ষপত্র স্থির, পশুপক্ষী নীরব। সে যুদ্ধে কেহ অগ্রসর হইতে চাহে না, আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া সকলে ভীতচিত্তে অবস্থান করে। সহসা আকাশমণ্ডল প্রদীপ্ত করিয়া, পশুপ্রাণীর চক্ষু ঝলসিত করিয়া বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠে। মেঘ সকল একত্রে গর্জ্জন করিয়া উঠে, আমি তাহা শুনিতে পাই না। তৎপরে বায়ুকে কে কষাঘাত করে, বায়ু গর্জ্জন করিয়া ধাবিত হয়। আমি বায়ুর হুঙ্কার, তীব্র চীৎকার শুনিতে পাই না।

আমি দেখিতে পাই, ঝলকে ঝলকে নয়নান্ধকারী বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটিতেছে, মেঘ ছিন্নভিন্ন হইয়া, আবার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ধাবিত হইতেছে, উচ্চ বৃক্ষের মস্তক ধূলি-স্পর্শ করিতেছে, কদাচিৎ শাখাস্থ পক্ষী নীড় সমেত ভূতলশায়ী হইতেছে, ফেন ধবলিত উত্তাল তরঙ্গমালা কূলে প্রহত হইতেছে। আমি দেখিতে পাই, ঘোরতর নীরব যুদ্ধ। অধঃপ্রকৃতি নিশ্চেষ্ট, ভীত। ঊর্দ্ধ-প্রকৃতি রোষাবিষ্ট, সংহার কার্য্যে নিরত, নিঃশব্দে সংহার কার্য্য সমাধা করিতেছে, নিঃশব্দে ফুল ছিঁড়িতেছে, নিঃশব্দে গাছ ভাঙ্গিতেছে, নিঃশব্দে প্রকাণ্ড তরঙ্গ তুলিতেছে। প্রকৃতির সে মূর্ত্তি অতি ভীম সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট। শব্দশূন্য বাত্যাবৃষ্টি, ঝটিকা ঝঞ্ঝা যে কত ভয়ঙ্কর, তাহা তোমরা কল্পনা করিতে পার না। তোমরা দেখিবে কি? প্রভাত সূর্য্যের উদয় দেখিয়াছ? সংসারের কোলাহলে ব্যস্ত, তোমাদের জীবন শব্দময়, তোমরা সূর্য্যোদয়ের অতুলিত সৌন্দর্য্য কি বুঝিবে? দীপমালা দেখিলে তোমরা পতঙ্গের মত ধাবিত হও, নিত্য প্রভাতে যে নিরূপম দৃশ্য পূর্ব্ব গগনে শোভিত হয়, তাহার প্রতি চক্ষু ফিরাইবে কেন? তোমরা কেবল শব্দ শুনিলেই চরিতার্থ হও। শব্দই তোমাদের জীবনের সারভূত। আমি প্রভাতের কোলাহল শুনিতে পাই না। আমি প্রভাত সূর্য্যোদয় দেখি। আমি দেখি, অন্ধকা-রের বর্ণপ্রগাঢ়তা কিরূপে ধীরে ধীরে বিরল হয়। অন্ধকার আকাশ কিরূপে ধূসর বর্ণ ধারণ করে। সেই সময় প্রভাত পবন কেমন ধীরে ধীরে ধীরে বহে। আকাশের অন্ধকার গর্ভে নক্ষত্রকুল একে একে বিলীন হয়, আকাশের কোমল নীলিমা ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হয়। পূর্ব্ব দিকের নীলাকাশে শ্বেত ছটা,—তাহার চারিপার্শ্বে অস্পষ্ট কিরণ রেখা, শ্বেতবর্ণ ক্রমে রক্তবর্ণে পরিণত, তৎপরে গভীর রক্তবর্ণ। আকা-শের একাংশে সেই লোহিতবর্ণ ক্রমে তরল হইয়া নীলিমায় মিশাইয়া যায়। অক-স্মাৎ একেবারে সূর্য্যের অর্দ্ধচক্র নয়ন গোচর হয়। সে সময় তাহার প্রতি চাহিতে পারা যায়, মধ্যাহ্নের খরতর তেজ নাই। ক্রমে বৃহৎ সূর্য্য উদিত হয়। সেই সময় পূর্ব্ব গগনাবলম্বী তরল মেঘখণ্ড সমূহ, তরল সুবর্ণ নির্ম্মিত প্রতীত হয়। কাঞ্চন কিরণ ছটায় পূর্ব্বাকাশ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, ঊর্দ্ধে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রগাঢ় নীলিমা ভেদ করিয়া কিরণপুঞ্জ সূক্ষ্ম সুবর্ণ সূত্রের ন্যায় লক্ষিত হয়।

পশু পক্ষী সব সুন্দর, কেবল তোমাদের সৌন্দর্য্য নাই। আমি আকাশে, পৃথিবীতে রূপরাশি দেখিয়া মানুষের মুখে রূপ খুঁজিতে যাই। যাহা কিছু দেখি সব সুন্দর, মনুষ্যমুখে কোন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না কেন? মানুষের মুখ দেখিলে ঘৃণা হয়, ভয় হয়। যে মুখে সৌন্দর্য্য ছিল, সে মুখে ক্রোধের কুৎসিৎ প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই। ক্রোধ, দ্বেষ, ভয়, ইন্দ্রিয়লালসা মুখে মুখে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। শঠতা, ধূর্ত্ততা, কত মুখে লেখা রহিয়াছে। কেহ পরশ্রীকাতর, তাহার চক্ষের সমক্ষে বৃথাই চন্দ্র সূর্য্য উদিত হয়। কেহ মুখ আবৃত করিয়া মনোভাব গোপন করিবার চেষ্টা করে। আমি

সব দেখিতে পাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে যে সরলতা আছে, তাহার সহিত শঠতা কখন মেশে না। মানুষ মানুষকে সহজে প্রতারিত করিতে পারে। প্রকৃতি অভ্রান্ত, কখন ভ্রমে পতিত হয় না। আমি প্রকৃতির মুখ চিনি, ক্রূরমনা ব্যক্তি আমাকে প্রতারণা করিতে পারে না। মানুষের মুখ দেখিলে আমার মনে মালিন্য প্রবেশ করে, হৃদয় ব্যথিত হয়। আমি মানুষের মুখ দেখিব না। আমি আপনার সুখেই সুখী।

রূপ! কেহ কখন দেখিয়াছ? কর্ণ রুদ্ধ করিয়া, নয়ন ভরিয়া কেহ কখন রূপ দেখিয়াছ? আমার চক্ষের সমক্ষে এ রূপরাশি কে ফুটাইল? রূপে চক্ষু ভরিয়া রাখ, আমি অনন্যেন্দ্রিয় হইয়া দেখি। প্রকৃতি দেবি! তুমি আমাকে নিত্য নূতন রূপ দেখাও, দেখিয়া আমি নিত্য মুগ্ধ হই। যেন রূপের মোহ কখন না ভাঙ্গে, যেন জীবনে মরণে অন্য প্রভেদ না ঘটে, যেন রূপ হইতে রূপান্তরে, মোহ হইতে মোহান্তরে নীত হই। ধ্যানে, জ্ঞানে, যোগে কি সুখ তাহা আমি জানি না। ইন্দ্রিয়াতীত সুখই প্রকৃত সুখ। সে সুখ কেমন করিয়া পাইব? আমার দেখিয়াই সুখ। চক্ষের দেখা ইন্দ্রিয়ের সুখ বটে। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম সুখ আমি কিরূপে কল্পনা করিব? আমি দেখি রূপের সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতেছে। সেই তরঙ্গে আরোহণ করিয়া ভাসিতে ইচ্ছা করে। আমি দেখি ঊর্দ্ধাকাশে নক্ষত্র কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলে। আকাশের নীলিমা যদি নক্ষত্রে নক্ষত্রে পূরিয়া যায়, কোথাও একটি ছিদ্র না থাকে, কোন রন্ধ্রপথে নীলাভা না দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে সৌন্দর্য্যের উপমা কোথায় খুঁজিতাম? পূর্ণিমার চন্দ্রের জন্য দিন গণি। কি রূপ! এ রূপের স্রোত ঢালিয়া ফুরায় না। এত রূপ কোথা হইতে আসিল?

স্তব্ধতা কি সুন্দর! আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখি, কোথাও কোন শব্দ নাই। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হৃদয়ের ভিতর দেখি, কোন শব্দ শুনিতে পাই না। কেবলই নীরব। অনন্ত, প্রশান্ত, অবিচলিত, গভীর নীরব। সে সৌন্দর্য্য কেমন করিয়া বুঝাইব! মুখ হইতে শব্দমাত্র নির্গত হইলে যে সমুদ্রে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়, সেই মহাসমুদ্রের শান্ত মূর্ত্তি কিরূপে বর্ণিত করিব? আলোক, অন্ধকার, শীত গ্রীষ্ম, কত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, এ নিস্তব্ধে কোন পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারি না। কি শান্তি, কি বিশাল প্রশস্ততা, কি গভীরতা! শান্তিময়ী, সুষুপ্তিময়ী, চিন্তাময়ী, রূপময়ী নীরবতা! তোমার বক্ষে শব্দরূপী তীক্ষ্ণধার তরবার কে বিদ্ধ করে?

শব্দে কি কোন সৌন্দর্য্য নাই, কোন মাধুর্য্য নাই? না থাকিলে, বিহঙ্গের সঙ্গীত, রমণীর কণ্ঠ, এত মধুর কেন? শ্রবণে সুখ নাই, এমত নহে। ইন্দ্রিয় মাত্রেরই কিছু কিছু মোহিনী আছে, নহিলে মানুষে ইন্দ্রিয়ের সেবায় অন্য সুখ বিস্মৃত হয় কেন? আমার এই বিশ্বাস যে প্রকৃত মধুর শব্দে অনন্তব্যাপী নিস্তব্ধের ধ্যান ভঙ্গ হয় না। মধুর শব্দ নীরবের অঙ্গ মাত্র। তোমরা মধুর শব্দ শ্রবণ করিয়া কিরূপ সুখানুভব কর? আমি দেখি, রমণীকণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীত শব্দবহ সমীরণে তরঙ্গায়িত হইয়া

আলস্যময় হিল্লোলে ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করে। সে গীতধ্বনি কুসুমসুগন্ধবাহী, প্রস্ফু-টিত কুসুম সুবাসিত সন্ধ্যা-সমীরণের ন্যায় নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে। সে গীতখণ্ড চন্দ্রকিরণ তুল্য, পবিত্রস্পর্শ, লাবণ্যময়, স্নিগ্ধকারী। সে গীত প্রভাত সূর্য্য কিরণের ন্যায় হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। গীতরশ্মি, সূর্য্যের কনক রশ্মির ন্যায় হৃদয় আলো-কিত করে।

তোমাদের দুঃখ দেখিয়া দুঃখ হয়। তোমরা আমাকে অসুখী বিবেচনা করিয়া আমার জন্য দুঃখ প্রকাশ কর। আমার সুখের শতাংশও পাইলে তোমরা কৃতার্থ হইতে। তোমরা আমার সুখ বুঝিতে পারিবে না, নহিলে তোমাদের বুঝাইতাম। যেমন চিরান্ধ আলোকের মর্ম্ম কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, সেইরূপ তোমরাও আপনার দুঃখে মগ্ন রহিয়া অপরের সুখ বুঝিতে পারিবে না। শব্দই তোমাদের দুঃখের মূল অথচ তোমাদের জীবন শব্দময়। তোমাদের ধর্ম্ম শব্দময়, কর্ম্ম শব্দময়, সৎকর্ম্ম, অসৎকর্ম্ম, দয়া দাক্ষিণ্য, পাপ পুণ্য সকলই শব্দময়। যশের আকাঙ্ক্ষা, শব্দের নামা-ন্তর মাত্র। শব্দের তুল্য অসার আর কিছু আছে? তথাপি তোমরা শব্দের উপা-সনা কর কেন? শব্দ শুনিয়া তোমাদের কি সুখ? দেশে বিদেশে তোমাদের নিন্দা রটনা হইতেছে, কেবল তাহাই শুনিতেছ। জগৎশুদ্ধ লোকে বলিতেছে, তোমরা কাপুরুষ, তোমরা পরাধীন, তোমরা হীনবল, তোমাদের মনুষত্ব নাই। তোমরা সেই কথা শুনিতেছ। তাহাতে কি সুখ? তোমরা আমার মত বধির হইলে না কেন?

আমারও সুখ পূর্ণ নয়। সমুদায় ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ না হইলে পূর্ণ সুখ হয় না। একটী ইন্দ্রিয় বৃত্তি না থাকাতেই আমি এই অতুল সুখের অধিকারী, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত অন্য সুখের কামনা আছে। যে পর্য্যন্ত সুখের আকাঙ্ক্ষা বা কামনা থাকে, সে পর্য্যন্ত সুখ পূর্ণ হয় না। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিই সুখের পূর্ণতা।

আমার একবার শুনিবার ইচ্ছা আছে। যেমন তোমরা শোন, সেইরূপ শুনিবার ইচ্ছা আছে। তোমরা একবার কোটিকণ্ঠ মিলাইয়া, সমুদ্রগর্ভ বিলোড়িত করিয়া জয়ধ্বনি কর, আমি শুনি। সকলে উচ্চকণ্ঠে বল, জয়! জয়! জয়! কণ্ঠনাদে সংক্ষুব্ধ সমুদ্র পারে তরঙ্গাঘাত হইবে। তোমরা সকলে কণ্ঠ তুলিয়া একবার জয়ধ্বনি কর। আমি বধির, তথাপি সে জয়ধ্বনি শুনিতে পাইব।

না পার, আমি সর্ব্বান্তকারী মহাপ্রলয়ের কামনা করিব। সেই সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর ভীম ভৈরব নিনাদ কে না শুনিবে? দেবতার বজ্র আকাশ পরিত্যাগ করিয়া বসু-ন্ধরার অভ্যন্তরে গর্জ্জন করিবে, বিদ্যুতাগ্নি নগর নগরী দগ্ধ করিবে। পৃথিবী ঘোর-রবে শতধা বিদীর্ণ হইবে। সংহারকালীন সেই মহাশব্দে বধিরের শ্রবণ বিদারিত হইবে। আমি সে শব্দ শুনিয়া সুখী হইব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

রমা বাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে

পত্র।

কাল বিকেলে বিখ্যাত বিদুষী রমাবাইয়ের বক্তৃতার কথা ছিল তাই শুন্‌তে গিয়েছিলেম। অনেকগুলি মহারাষ্ট্রী ললনার মধ্যে গৌরী, নিরাভরণা, শ্বেতাম্বরী, ক্ষীণতনুযষ্টি, উজ্জ্বলমূর্ত্তি রমাবাইয়ের প্রতি দৃষ্টি আপনি আকৃষ্ট হল। তিনি বল্লেন মেয়েরা সকল বিষয়ে পুরুষদের সমকক্ষ কেবল মদ্যপানে নয়। তোমার কি মনে হয়? মেয়েরা সকল বিষয়েই যদি পুরুষের সমকক্ষ, তা হলে পুরুষের প্রতি বিধাতার নিতান্ত অন্যায় বিচার বল্‌তে হয়। কেন না কতক বিষয়ে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—যেমন, রূপে এবং অনেকগুলি হৃদয়ের ভাবে—তার উপরে যদি পুরুষের সমস্ত গুণ তাদের সমান থাকে তা হলে মানবসমাজে আমরা আর প্রতিষ্ঠা পাই কোথায়? সকল বিষয়েই প্রকৃতিতে একটা Law of Compensation অর্থাৎ ক্ষতিপূরণের নিয়ম আছে। শারীরিক বিষয়ে আমরা যেমন বলে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনি রূপে শ্রেষ্ঠ; অন্তঃকরণের বিষয়ে আমরা যেমন বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনি হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই স্ত্রী পুরুষ দুই জাতি পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন কর্ত্তে পারচে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প বলে অবশ্য এ কথা কেউ বল্‌বে না যে তবে তাদের লেখাপড়া শেখান বন্ধ করে দেওয়া উচিত। যেমন, স্নেহ দয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে পুরুষের সহৃদয়তা মেয়েদের চেয়ে অল্প বলে এ কথা কেউ বল্‌তে পারে না যে, তবে পুরুষদের হৃদয়বৃত্তি চর্চ্চা করা অকর্ত্তব্য। অতএব, স্ত্রীশিক্ষা অত্যাবশ্যক এটা প্রমাণ করবার সময় স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের ঠিক সমান এ কথা গায়ের জোরে তোলবার কোন দরকার নেই।

আমার ত বোধ হয় না, কবি হতে ভূরি পরিমাণ শিক্ষার আবশ্যক। মেয়েরা এতদিন যে রকম শিক্ষা পেয়েছে তাই যথেষ্ট ছিল। Burns খুব যে সুশিক্ষিত ছিল তা নয়। অনেক বড় কবি অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর থেকে উদ্ভূত। স্ত্রী জাতির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কবির আবির্ভাব এখনো হয় নি। মনে করে দেখ, বহু দিন থেকে যত বেশি মেয়ে সঙ্গীত বিদ্যা শিখ্‌চে এত পুরুষ শেখেনি। য়ুরোপে অনেক মেয়েই সকাল থেকে রাত্তির পর্য্যন্ত পিয়ানো ঠং ঠং এবং ডোরেমিফা চেঁচিয়ে মরচে কিন্তু তাদের মধ্যে কটা Mozart কিম্বা Bethoven জন্মাল? অথচ Mozart শিশুকাল থেকেই Musician। এমন ত ঢের দেখা যায় বাপের গুণ মেয়েরা এবং মায়ের গুণ ছেলেরা পায়, তবে কেন এ রকম প্রতিভা কোন মেয়ে সচরাচর পায় না? আসল কথা প্রতিভা একটা শক্তি (Energy)। তাতে অনেক বল আবশ্যক।

তাতে শরীর ক্ষয় করে। তাই মেয়েদের একরকম গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি আছে—কিন্তু সৃজন শক্তির বল নেই। মস্তিষ্কের মধ্যে কেবল একটা বুদ্ধি থাক্‌লে হবে না, আবার সেই সঙ্গে মস্তিষ্কের একটা বল চাই। মেয়েদের একরকম চট্‌পটে বুদ্ধি আছে, কিন্তু সাধারণতঃ পুরুষদের মত বলিষ্ঠ বুদ্ধি নেই। আমার ত এই রকম বিশ্বাস। তুমি বলবে এখন পর্য্যন্ত এই রকম চলে আস্‌চে—কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে কে বল্‌তে পারে। সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা আছে।

আসলে, শিক্ষা, যাতে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়, তা কেবল বই পড়ে হতে পারে না—তা কেবল কাজ করে হয়। বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে পড়ে যখন সংগ্রাম কর্ত্তে হয়—সহস্র বাধা বিঘ্ন যখন অতিক্রম কর্ত্তে হয়—যখন বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধিতে ও জড় বাধাতে সংঘাত উপস্থিত হয় তখন আমাদের সমস্ত বুদ্ধি জেগে ওঠে। তখন আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তির আবশ্যক হয় সুতরাং চর্চ্চা হয়, এবং সেই অবিশ্রাম আঘাতে স্নেহ দয়া প্রভৃতি কতকগুলি কোমলবৃত্তি স্বভাবতই কঠিন হয়ে আসে। মেয়েরা হাজার পড়াশুনো করুক্—এই কার্য্যক্ষেত্রে কখনই পুরুষদের সঙ্গে সমান ভাবে নাব্‌তে পারবে না। তার একটা কারণ শারীরিক দুর্ব্বলতা। আর একটা কারণ অবস্থার প্রভেদ। যতদিন মানব জাতি থাক্‌বে কিম্বা তার থাক্‌বার সম্ভাবনা থাক্‌বে—ততদিন স্ত্রীলোকদের সন্তান গর্ভে ধারণ এবং সন্তান পালন কর্ত্তেই হবে। এ কাজটা এমন কাজ, যে এতে অনেক দিন ও অনেক ক্ষণ গৃহে রুদ্ধ থাক্‌তে হয়—নিতান্ত বলসাধ্য কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্চে যে বাহিরের কাজ মেয়েরা কর্ত্তে পারবে না। যদি প্রকৃতির সে রকম অভিপ্রায় না হত তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাত। যদি বল পুরুষদের অত্যাচারে মেয়েদের এই রকম দুর্ব্বল অবস্থা হয়েছে—সে কোন কাজেরই কথা নয়। কেননা গোড়ায় যদি স্ত্রী পুরুষ সমান বল নিয়ে জন্মগ্রহণ কর্ত্ত তা হলে পুরুষদের বল স্ত্রীদের উপর খাট্‌ত কি করে?

যদি এ কথা ঠিক হয় যে বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে প্রবেশ করে তার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে তবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণবিকাশ হয়, তবে এ কথা নিশ্চয় যে মেয়েরা কখনই পুরুষদের সঙ্গে (কেবল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে) বুদ্ধিতে সমকক্ষ হবে না। ইয়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় সভ্যতার প্রভেদ কোথা থেকে হয়েছে—তার কারণ অন্বেষণ কর্ত্তে গেলে দেখা যায়—আমাদের দেশের লোকেরা বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে প্রবেশ করে নি, এই জন্যে তাদের বুদ্ধির দৃঢ়তা হয় নি। তাদের সমস্ত মনের পূর্ণ বিকাশ হয় নি। এক রকম আধাআধি রকমের সভ্যতা হয়েছিল। য়ুরোপের আজ যে এত প্রভাব তার প্রধান কারণ, কাজ করে তার বুদ্ধি হয়েছে—প্রকৃতির রণক্ষেত্রে অবিশ্রাম সংগ্রাম করে তার সমস্ত বুদ্ধি বলিষ্ঠ হয়েছে। আমরা চিরকাল কেবল বসে বসে

চিন্তা করেছি। জীবতত্ত্ববিৎ বলেন যখন থেকে প্রাণীরাজ্যে বুড়ো আঙ্গুলের আবির্ভাব হল, তখন থেকে মানব সভ্যতার একরকম গোড়াপত্তন হল। বুড়ো আঙ্গুলের পর থেকে সমস্ত জিনিষ ধরে ছুঁয়ে ভেঙ্গে নেড়েচেড়ে আঁক্‌ড়ে ভার অনুভব করে উৎকৃষ্টরূপে পরীক্ষা করে দেখ্‌বার উপায় হল। কৌতূহল থেকে পরীক্ষার আরম্ভ হয়, তার পরে পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তি বুদ্ধিবৃত্তি উত্তেজিত হতে থাকে। এই পরীক্ষার বুড়ো আঙ্গুল পুরুষদের অত্যন্ত বেশি ব্যবহার কর্ত্তে হয়। মেয়েদের তেমন কর্ত্তে হয় না। সুতরাং—।

যদি বা এমন বিবেচনা করা যায়, এক সময় আস্‌বে যখন স্ত্রী পুরুষ উভয়েই আত্মরক্ষা, উপার্জ্জন প্রভৃতি কার্য্যে সমানরূপে ভিড়বে—সুতরাং তখন পরিবার-সেবার অনুরোধে মেয়েদের অধিকাংশ সময় গৃহে বদ্ধ থাক্‌বার আবশ্যক হবে না—বাহিরে গিয়ে এই বিপুল বিচিত্র সংসারের সঙ্গে তাদের চোখোচোখি মুখোমুখি হাতাহাতি পরিচয় হবে। তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলেছি আর সমস্ত সম্ভব হতে পারে, স্বামীকে ছাড়তে পার, বাপ ভাইয়ের আশ্রয় লঙ্ঘন কর্ত্তে পার—কিন্তু সন্তানকে ত ছাড়বার যো নেই। সে যখন গর্ভে আশ্রয় নেবে—এবং নিদেন পাঁচ ছয় বৎসর নিতান্ত অসহায়ভাবে জননীর কোল অধিকার করে বস্‌বে তখন সমকক্ষভাবে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা মেয়ের পক্ষে কি রকমে সম্ভব হবে? এই রকম সন্তানকে উপলক্ষ করে ঘরের মধ্যে থেকে পরিবার সেবা করা মেয়েদের স্বাভাবিক হয়ে পড়ে—এ পুরুষদের অত্যাচার নয় প্রকৃতির বিধান। যখন শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং অলঙ্ঘনীয় অবস্থা-ভেদে মেয়েদের সেই গৃহের মধ্যে থাক্‌তেই হবে তখন কাজে কাজেই প্রাণধারণের জন্যে পুরুষের প্রতি তাদের নির্ভর কর্ত্তেই হবে। এক সন্তান ধারণ থেকেই স্ত্রী পুরুষের প্রধান প্রভেদ হয়েছে—তার থেকেই উত্তরোত্তর বলের অভাব, বলিষ্ঠ বুদ্ধির অভাব এবং হৃদয়ের প্রাবল্য জন্মেছে। আবার এ কারণটা এমন স্বাভাবিক কারণ যে, এর হাত এড়াবার যো নেই।

*

অতএব আজকাল পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠেছে সেটা আমার অসঙ্গত এবং অমঙ্গলজনক মনে হয়। পূর্ব্বকালে মেয়েরা পুরুষের অধীনতা গ্রহণকে একটা ধর্ম্ম মনে করত—তাতে এই হত যে, চরিত্রের উপরে অধীনতার কুফল ফল্‌তে পারত না—অর্থাৎ হীনতা জন্মাত না, এমন কি অধীনতাতেই চরিত্রের মহত্ত্ব সম্পাদন কর্ত্ত। প্রভুভক্তিকে যদি ধর্ম্ম মনে করে তাহলে ভৃত্যের মনে মনুষ্যত্বের হানি হয় না। রাজভক্তি সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী অধীনতা মানুষকে সহ্য করতেই হয়—সেগুলিকে যদি অধীনতা, হীনতা বলে আমরা ক্রমাগত অনুভব করি তা হলেই আমরা বাস্তবিক হীন হয়ে যাই এবং সংসারে সহস্র অসুখের সৃষ্টি হয়। তাকে যদি ধর্ম্ম মনে করি তা হলে অধীনতার মধ্যেই আমরা

স্বাধীনতা লাভ করি। আমি দাসত্ব মনে করে যদি কারো অনুগামী হই, তা হলেই আমি বাস্তবিক অধীন, আর আমি ধর্ম্ম মনে করে যদি কারো অনুগামী হই, তা হলে আমি স্বাধীন। সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি যদি কোন স্বামী পাশব ব্যবহার করে, তবে সে ব্যবহারের দ্বারা সে স্ত্রীর অধোগতি হয় না—বরং তার মহত্ত্বই বাড়ে। কিন্তু যখন একজন ইংরেজ পাথাটানা কুলিকে লাথি মারে, তখন তাতে করে সেই কুলির উজ্জ্বলতা বাড়ে না।

আজকাল একদল মেয়ে ক্রমাগতই নাকী সুরে বল্‌চে আমরা পুরুষের অধীন, আমরা পুরুষের আশ্রয়ে আছি, আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়! তাতে করে কেবল এই হচ্চে যে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ-বন্ধন হীনতা প্রাপ্ত হচ্চে। অথচ সে বন্ধন ছেদন করবার কোন উপায় নেই। যারা অগত্যা অধীনতা স্বীকার করে আছে, তারা নিজেকে দাসী মনে কর্‌চে—সুতরাং তারা আপনার কর্ত্তব্য কাজ প্রসন্ন মনে এবং সম্পূর্ণ ভাবে কর্ত্তে পারচে না। দিনরাত খিটিমিটি বাধ্‌চে—নানাসূত্রে পরস্পর পরস্পরকে লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করচে। এ রকম অস্বাভাবিক অবস্থা যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তা হলে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অনেকটা বিচ্ছেদ হবে কিন্তু তাতে স্ত্রীলোকের অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরে থাক—তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হবে।

কেউ কেউ হয়ত বল্‌বে পুরুষের আশ্রয় অবলম্বনই যে স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম এটা বিশ্বাস করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়—কেন না এটা একটা কুসংস্কার। সে সম্বন্ধে এই বক্তব্য প্রকৃতির যা অবশ্যম্ভাবী মঙ্গল নিয়ম, তা' স্বাধীন ভাবে গ্রহণ এবং পালন করা ধর্ম্ম। ছোট বালকের পক্ষে পিতা মাতাকে লঙ্ঘন করে চলা অসম্ভব এবং প্রকৃতিবিরুদ্ধ—তার পক্ষে পিতা মাতার বশ্যতা স্বীকার করাই ধর্ম্ম—সুতরাং এই বশ্যতাকে ধর্ম্ম বলে জানাই তার পক্ষে মঙ্গল। নানা দিক থেকে দেখা যাচ্চে, সংসারের কল্যাণ অব্যাহত রেখে স্ত্রীলোক কখনো পুরুষের আশ্রয় ত্যাগ কর্ত্তে পারে না। প্রকৃতি এই স্ত্রীলোকের অধীনতা কেবল তাদের ধর্ম্ম-বুদ্ধির উপরে রেখে দিয়েছেন তা নয়, নানা উপায়ে এমনি আটঘাট বেঁধে দিয়েছেন যে, সহজে তার থেকে নিষ্কৃতি নেই। অবশ্য, পৃথিবীতে এমন অনেক মেয়ে আছে পুরুষের আশ্রয় যাদের আবশ্যক করে না, কিন্তু তাদের জন্যে সমস্ত মেয়ে-সাধারণের ক্ষতি করা যায় না। অনেক পুরুষ আছে যারা মেয়েদের মত আশ্রিত হতে পারলেই ভাল থাক্‌ত কিন্তু তাদের অনুরোধে পুরুষ-সাধারণের কর্ত্তব্য নিয়ম উল্টে দেওয়া যায় না। যাইহোক্, পতিভক্তি বাস্তবিকই স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্ম্ম। আজকাল এক রকম নিষ্ফল ঔদ্ধত্য ও অগভীর ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে সেটা চলে গিয়ে সংসারের সামঞ্জস্য নষ্ট করে দিচ্চে এবং স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই আন্তরিক অসুখ জন্মিয়ে দিচ্চে। কর্ত্তব্যের অনুরোধে যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি একান্ত নির্ভর করে সেত স্বামীর অধীন নয়, সে কর্ত্তব্যের অধীন।

স্ত্রীপুরুষের অবস্থা-পার্থক্য সম্বন্ধে আমার এই মত—কিন্তু এর সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার কোন বিরোধ নেই। মনুষ্যত্ব লাভ করবার জন্যে স্ত্রীলোকের বুদ্ধির উন্নতি ও পুরুষের হৃদয়ের উন্নতি, পুরুষের যথেচ্ছাচার ও স্ত্রীলোকের জড় সঙ্কোচ ভাব পরিহার। একান্ত আবশ্যক। অবশ্য, শিক্ষা সত্ত্বেও পুরুষ সম্পূর্ণ স্ত্রী, এবং স্ত্রী সম্পূর্ণ পুরুষ হতে পারবে না এবং না হলেই বাঁচা যায়। রমাবাই যখন বল্লেন—মেয়েরা সুবিধে পেলে পুরুষের কাজ কর্ত্তে পারে তখন পুরুষ উঠে বল্‌তে পারত, পুরুষরা অভ্যেস করলে মেয়েদের কাজ কর্ত্তে পারত—কিন্তু তা হলে এখন পুরুষদের যে সব কাজ কর্‌তে হচ্চে সেগুলো ছেড়ে দিতে হত। তেমনি মেয়েকে যদি ছেলে মানুষ না কর্ত্তে হত, তা হলে সে পুরুষের অনেক কাজ কর্ত্তে পারত। কিন্তু এ "যদি"কে ভূমিসাৎ করা রমাবাই কিম্বা আর কোন বিদ্রোহী রমণীর কর্ম্ম নয়। অতএব এ কথার উল্লেখ করা প্রগল্‌ভতা।

রমাবাইয়ের বক্তৃতার চেয়ে আমার বক্তৃতা দীর্ঘ হয়ে পড়ল। রমাবাইয়ের বক্তৃতাও খুব দীর্ঘ হতে পারত কিন্তু এখানকার বর্গির উৎপাতে তা আর হয়ে উঠ্‌ল না। রমাবাই বল্‌তে আরম্ভ কর্ত্তেই তারা ভারি গোল কর্ত্তে লাগ্‌ল। শেষকালে বক্তৃতা অসম্পূর্ণ রেখে রমাবাইকে বসে পড়তে হল।

স্ত্রীলোকের পরাক্রম সম্বন্ধে রমণীকে বক্তৃতা কর্ত্তে শুনে বীর পুরুষেরা আর থাকৃতে পারলেন না—তাঁরা পুরুষের পরাক্রম প্রকাশ কর্ত্তে আরম্ভ করলেন ;—তর্জ্জন গর্জ্জনে অবলার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকে অভিভূত ক'রে জয়গর্ব্বে বাড়ি ফিরে গেলেন। আমি মনে মনে আশা কর্ত্তে লাগ্‌লুম আমাদের বঙ্গ ভূমিতে যদিও সম্প্রতি অনেক বীর-পুরুষের অভ্যুদয় হয়েছে, কিন্তু ভদ্র রমণীর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করে এতটা প্রতাপ এখনো কারো জন্মায় নি। তবে বলা যায় না, নীচ লোক সর্ব্বত্রই আছে ; এবং নীচ-শ্রেণীয়-হীনশিক্ষা ভীরুদের এই একটা মহৎ অধিকার আছে যে,—পঙ্কের মধ্যে বাস করে তারা অসঙ্কোচে স্নাত দেহে পঙ্ক নিক্ষেপ কর্ত্তে পারে ; মনে জানে, এরূপ স্থলে সহিষ্ণুতাই ভদ্রতার একমাত্র কৌলিক ধর্ম্ম। মহারাষ্ট্রীয় শ্রোতৃবালকবর্গের প্রতি এতটা কথা বলা অসঙ্গত হয়ে পড়ে—আমি কেবল প্রসঙ্গক্রমে এই কথাটা বলে রাখ্‌লুম। আক্ষেপের বিষয় এই যাদের প্রতি এ কথা খাটে, তারা এ ভাষা বোঝে না, এবং তাদের যে ভাষা তা ভদ্র সম্প্রদায়ের শ্রবণের ও ব্যবহারের অযোগ্য।

পুণা।

জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৬। শ্রীঃ—

দেবী প্রতিমা।

জীবনের যত আশা ফুরায়ে গিয়েছে,
হৃদয় হয়েচে তার সন্ন্যাসিনী প্রায়,
স্বরগের আলো মুখে ফুটিয়া উঠেচে,
সংসারের আশা তৃষা তাও যায় যায়।
মূর্ত্তিমতী শান্তি যেন আঁখি নিমীলিয়া,
হৃদয়ে বহিছে শুধু অনুরাগ ভার,
জ্বলন্ত একটী আশা রয়েছে জাগিয়া
সতত ভাবিছে যেন মূরতি কাহার!

দেবীর প্রতিমা সম মুখানি তাহার,।
স্নেহমাখা হৃদিখানি গিয়াছে খুলিয়া,
যা কিছু যাতনা জ্বালা হয়েছিল তার
চাহিয়া ধরার মুখে গিয়াছে ভুলিয়া।
শিখিয়াছে সমভাবে ভাল বাসিবারে,
শিখিয়াছে মিশিবারে পরাণে সবার,
শিখিয়াছে দৃঢ়তার ব্রত পালিবারে
শিখিয়াছে বিলাইতে স্নেহ সুধাধার।

ভালবাস তুমি দেবী স্নেহ কর সবে,
তোমার সে নিধি জেন, অবশ্য মিলিবে
সারিয়া ব্রতটী তব সংসার ক্ষেত্রেতে
স্বরগের রাজ্য মাঝে চ'লে যাবে যবে।

স্নেহলতা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গৃহিণীর উপর রাগ করিয়া কাজের ছুতায় ত জগৎ বাবু বাড়ীভিতর হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বাস্তবিক তখন তাঁহার কাজ কিছুই ছিল না। তিনি বাহিরে আসিয়া একটুখানি এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইলেন, তাহার পর বাড়ীর বাহির হইয়া পদ-ব্রজে আহিরীটোলার গঙ্গার ঘাটের রাস্তার উপর আসিয়া পড়িলেন।

কৃষ্ণ পক্ষ রাত্র, দিক জ্যোৎস্না-মধুর নহে, আকাশে তারকামালা, জল স্থলে দীপমালা দীপ্তি বিকাশ করিতেছে, এই দীপ্তির প্রভাবে কোন স্থান সমুজ্জল, কোন স্থল মৃদুতর ভাবে আলোকিত, ইহার অভাবে কোন স্থল বহুদূর ব্যাপী অন্ধকারে বিলীন। রাত্র নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, গাড়ী ঘোড়া আর-এ রাস্তায় চলিতেছে না, লোক জনের যাতায়াতও বিরল হইয়া পড়িয়াছে। দুই এক জন মেছুনি কেবল তখনো ঝাঁকা মাথায় হন হন করিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিতেছে, দুই একজন চাকর চাকরাণী ইলিস মাছ হাতে বাবুদের বাড়ীর গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে। ঐ নাগরা জুতাধারী ভুঁড়িদারী মাড়োয়ারী একজন গানের উপলক্ষে গর্দ্দভের চীৎকার করিয়া গেল, স্কুলের ছাত্র দুই জন গলাগলি করিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিতে ছুটিতে তাহাকে সাবাস দিতে আরম্ভ করিল। জগৎ বাবু তাহাদের পাশ কাটাইয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়া বসিলেন। ঘাটও তখনো জনশূন্য নহে, ঘাটে কৌপিন রুদ্রাক্ষধারী বিভূতি চর্চ্চিত সন্ন্যাসী—কেহ বা বসিয়া আছে, কেহ বা জয় জয় হরে মুরারী বলিয়া জলপূর্ণ লোটা হস্তে সোপান উত্তরণ করিতেছে। স্ত্রী পুরুষ দুই একজন তখনো জলে অবগাহন করিতেছে। দু-একজন যুবক সোপানে বসিয়া গুণগুণ করিয়া গান গাহিতেছে, গঙ্গার কুলু কুলু তটাঘাত শব্দে মিশিয়া সেই গুণগুণ শব্দ ভ্রমর ঝঙ্কারের মত বোধ হইতেছে। দূরে ওদিকে নদীগর্ভে একজন হিন্দু মাঝি গোপীযন্ত্র বাজাইয়া গাহিতেছে—

মন মাঝি সামাল সামাল --ডুবলো তরী ভবনদীর তুফান ভারী।

জগৎ বাবু গানটি ভাল করিয়া শুনিবার জন্য কাণ পাতিলেন, কিন্তু এদিকে ঘাটের পাশে তাঁহার কাণের কাছে একখানি চট্টগ্রামী মহাজনী নৌকা হইতে গান উঠিল—

আর কুয়েলা ন ডাহিও
বধু গেছন বিদেশৎ থৎ না লেহন ছমাসৎ
বঁধুর লাগি মোর কলিজা জ্বলি জ্বলি যায়
কোয়েলা ন ডাহিও
বঁধু গেছন যনডা, ডাহো কুহিল হনটা*
হ্যানে যদি ডাহো কুহিল মোর মাথাটি খাইও।

এই গানের মধ্যে দূরের বৈষ্ণব মাঝির গান ডুবিয়া গেল, জগৎ বাবু তাহার আর এক অক্ষরও বুঝিতে পারিলেন না। কেবল পূর্ব্ব বঙ্গীয় অপরূপ সুর তান, উচ্চারণ বিশিষ্ট উক্ত অপূর্ব্ব কথাগুলি ক্রমাগত তাঁহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া জগৎ বাবু যখন উঠিবেন ভাবিতেছেন তখন সহসা চট্টগ্রাম বাসীর গানও বন্ধ হইল, জগৎ বাবু আবার শুনিতে পাইলেন—

মন মাঝি সামাল সামাল, ডুবলো তরী, ভবনদীর তুফান ভারী ই ই ই ই ;
মাঝি তরঙ্গ হেরি, সইতে নারি তাই তোরে জিজ্ঞাসা করি—

বল দেখি কোন মাস্তিরি শিখায় তোরে আজগুবি এ মাঝিগিরি ই ই ই ই,
তোর হেলে ছয়খান দড়ি যাচ্ছে ছিঁড়ি ঐ দেখ পটাশ পটাশ করি—
ডুবলো তোর ভগ্নতরী, হায় কি করি কেমনে জমাবি পাড়ি ই ই ই ই।”

জগৎ বাবু গান শুনিতে লাগিলেন, শুনিতে শুনিতে গান ভুলিয়া গেলেন, যে চিন্তায় এতক্ষণ তাঁহার মন তরঙ্গিত হইতেছিল, ধীরে ধীরে অজ্ঞাতভাবে আবার সেই চিন্তার মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—আমি কেন ভাল বাসি! সংক্রামক রোগের মত যাহার স্পর্শ সে কেন অন্যকে আলিঙ্গন করিতে চায়? যে বিষাক্ত কীট, যাহার স্নেহ চুম্বনে অন্যে জর্জ্জরিত হইয়া ওঠে—সে কেন অন্যকে ভাল বাসে?

বিগত জীবনের সমস্ত ঘটনা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন—যেমন সকলে গিয়াছে,তেমনি স্নেহলতাও একদিন যাইবে—বাড়ী ফিরিয়া গিয়া একদিন আর তাহাকে দেখিতে পাইব না। জগৎ বাবুর চক্ষু জলপূর্ণ হইল—কিন্তু তিনি বলিলেন—“হউক, তাহাই হউক, স্নেহলতার পক্ষে তাহাই ভাল। আমি যে স্নেহকে আমার আপনার করিয়া আমার কাছে কাছে তাহাকে রাখিতে চাই, সে কেবল আমি স্বার্থপর বলিয়া বইত নয়। তাহাতে কি স্নেহ সুখী হইবে? এখন যে এখানে সে বিশেষ সুখে আছে তাহা নহে, বিবাহ হইলে এইরূপ গঞ্জনায় তাহার চির জীবন কাটিবে। ইহার উপর চারু যদি না ভালবাসে ত তাহার কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা”!

এতদিন জগৎ বাবুর মনে হইত চারু স্নেহকে ভালবাসে, বিবাহ হইলে স্বামীর সুখে সুখী হইয়া স্নেহ অন্য অসুখকে তাচ্ছল্য করিতে পারিবে। কিন্তু আজ তাঁহার অন্য রকম মনে হইতে লাগিল। টগরের মুখে আজ যখন শুনিলেন চারু স্নেহকে বিবাহ করিতে চাহে না—তখন সে কথা তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছিল। সেই কথা এখন বারবার মনে হইতে লাগিল। তিনি যদিও বুঝিলেন—চারু ছেলেমানুষ, পরে তাহার স্নেহের প্রতি কিরূপ ভাব হইতে পারে, ও কথা হইতে অবশ্য তাহার মীমাংসা হয় না। উহাদের বিবাহ হইলে উহারা যথার্থ সুখীও হইতে পারে– কিন্তু তথাপি তাঁহার মনে হইতে লাগিল—তাহার নিশ্চয়তা কোথা? বিপরীতও ত হইতে পারে। বরঞ্চ তাহার সম্ভাবনাই অধিক। মাতার ভাব সন্তানে প্রবর্ত্তিত হওয়াই স্বাভাবিক। গৃহিণী স্নেহকে ভাল বাসেন না, ক্রমাগত তাহার নিন্দা করেন—এ অবস্থায় চারু স্নেহকে কিরূপে ভাল বাসিতে শিখিবে! আর বাল্যকালে যে ভাব হৃদয়ে আবদ্ধ হইয়া যায়, পরে যুক্তি দ্বারা তাহা অতিক্রম করা যায় না, বিশেষতঃ স্নেহ, প্রেম হৃদয়ের সামগ্রী, যুক্তি দ্বারা কে কবে ভালবাসা কমাইতে বাড়াইতে পারিয়াছে? এ অবস্থায় চারুর সহিত স্নেহের বিবাহ দেওয়া কি তাঁহার উচিত? তিনি স্থির করিলেন—“না তাহা দিবেন না।” এতদিনকার বদ্ধমূল আকাঙ্ক্ষা তিনি সবলে উৎপাটন করিতে চেষ্টা

করিলেন, হৃদয় শোণিতাক্ত হইল, কিন্তু তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। অবশেষে স্পষ্ট দেখিলেন—তাহা হইয়া গিয়াছে—উৎপাটিত, শোণিতসিক্ত শত মূল আকাঙ্ক্ষা ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছে, স্নেহলতা তাঁহার পর হইয়া গিয়াছে, তাঁহার বাড়ীর মধ্যে আর সে নাই, তিনি গৃহে গেলে আর সে হাসিয়া কাছে আসে না, একটি পুষ্পের অভাবে সমস্ত সংসার এখন তাঁহার মরুময়।" তিনি আকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন— "মায়া, মায়া, সবই বৃথা মায়া।" কিন্তু তবুও মায়া ভাঙ্গিতে পারিলেন না, দরদর করিয়া তাঁহার নেত্র বাহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল, আর মনে হইতে লাগিল স্নেহলতা কেন তাঁহার নিজের সন্তান হইল না।

অনেকবার ইহা তাঁহার মনে আসিয়াছে, কিন্তু ঠিক এরূপ মর্ম্মান্তিকরূপে ইহার সত্যতা তিনি এতদিন অনুভব করেন নাই। আজ দেখিলেন—সে কোথা আর তিনি কোথা, তাহাদের মধ্যে পর্ব্বতের ব্যবধান। তিনি মর্ম্মপীড়িত হইয়া ঈশ্বরকে ডাকিলেন, কিন্তু সাড়া পাইলেন না, তাঁহার যন্ত্রণা কমিল না, বহুদিন পরে আবার মনে হইল— সত্য সত্য কি সমস্তই যন্ত্রমাত্র, আত্মা নাই, প্রাণ নাই, দয়া নাই, করুণা নাই, যাহা দেখিতেছি ইহার বাহিরে কেহ নাই? সব যন্ত্র যন্ত্র।

জগৎ বাবু শিহরিয়া চক্ষু মুদিলেন হঠাৎ তাঁহার কর্ণে আবার প্রবেশ করিল—

'মন মাঝি সামাল সামাল ডুবলো তরী—
ভবনদীর তুফান ভারী।"

তিনি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার মনে হইল সত্যই তরী ডুবিল, কোথায় হাল কোথায় কাণ্ডারী! তিনি পরিপূর্ণ কাতর প্রাণে গাহিলেন—

অকূল ভব-সাগরে তার হে, তার হে,
চরণতরী দেহি মে অনাথ নাথ হে।
সন্তাপ নিবারণ, দুর্গতি বিনাশন, দুর্দ্দিন তিমির হর,
পাপ তাপ নাশ হে।

বিজন গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া এক মনে এক প্রাণে অনবরত এই কয়ছত্র তিনি গাহিতে লাগিলেন। দুই একজন বিজন বিহারী সন্ন্যাসী তাঁহার দিকে আশ্চর্য্য-নেত্রে চাহিয়া চলিয়া গেল, দুয়েকটি বিমান বিহারী তারকা তাঁহার দিকে করুণ-নেত্রে চাহিয়া নির্ব্বাপিত হইল। তিনি কাহারো দিকে না চাহিয়া আপন মনে কেবল ইহাই গাহিতে লাগিলেন। গাহিতে গাহিতে তাঁহার হৃদয় বলযুক্ত হইল, তাঁহার হৃদয়ব্যথা প্রশমিত হইল, এক দয়াময় কাণ্ডারীর স্পর্শ তিনি যেন অনুভব করিলেন, অকূল ভবসাগরেও তিনি কূল দেখিতে পাইলেন।

সেইরাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া জগৎ বাবু গৃহিণীকে বলিলেন—

"বর খুঁজিতে বলিও, স্নেহলতার শীঘ্র বিবাহ দিব।"

নবম পরিচ্ছেদ।

স্কুলের চারিজন ছাত্র বিকালে বিডন-গার্ডনের এক নির্জ্জন প্রান্তে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া গল্প করিতেছিল। কিন্তু এরূপ স্থলে যেরূপ হইয়া থাকে—শীঘ্রই তাহাদের গল্প তর্ক বিতর্কে পরিণত হইল। জীবন বাল্য বিবাহের বিরোধী, অন্য তিনজনে মিলিয়া তাহার মতকে ধরাশায়ী করিতে প্রবৃত্ত হইল।

হেম বলিল—"আচ্ছা বাল্য বিবাহ সমাজের পক্ষে অশুভ, বেশ খুব বক্তৃতা কর, খবরের কাগজে লেখ, কিন্তু তাই বলে নিজে যে কেন বিয়ে করবে না—এত আমি ভেবে পাইনে। তুই কি বলিস কিশোরি?"

কিশোরীর উপর হেমের অগাধ ভক্তি, কিশোরীর কথা তাহার বেদবাক্য। কিশোরী যে গতবার এণ্ট্রেন্স ফেল করিয়াছে, হেমের মতে তাহাও কিশোরীর অতিবুদ্ধির ফলে। তাহার বিশ্বাস (কেননা কিশোরী এইরূপ বলে) অধিক বুদ্ধিমানেরা পরীক্ষা সহ্য করিতে পারে না। হেম নিজেও তাহার আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষায় এই কথার মাহাত্ম্য রক্ষা করিবে এইরূপ সম্ভাবনা বিবেচনা করিতেছে।

কিশোরীর কথায় জীবন বলিল—"আমিত আগেই বলেছি ও সমস্তই Absurd, non-sense, hypocrisy। আসল কথা জীবনদা যেমনটি চায়—ঠিক তেমনটি পেয়ে ওঠে না। Early marriage, Female emancipation, Social reformation এ সব বড় বড় কথা মুখে বেশ বলতে ভাল, সুবিধা পেলে আমিই কি বলতে ছাড়ি? সে দিন জন সাহেব আমার radical views শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল? কিন্তু তাই বলে যদি তেমন তেমন একটা জুটে যায়, রূপ আর রূপী এক সঙ্গে মেলে, তাহলে কি আমি ছেড়ে কথা কই?"

নবীন। "কিহে ভায়া জীবন, তাই কেন ফুটে বল না। যদি তোমার লজ্জা করে আমাকে বল্লেই আমি তোমার হয়ে একটা advertisement দিয়ে দিই।"

কিশোরী। "adver´tisement কিরে? ad´vertisement—first syllableএ accent"।

কিশোরী এণ্ট্রেন্স-ফেল, নবীন এল, এ ক্লাশের ছাত্র—সে ও কথা শুনিবে কেন? সে বলিল—"কক্ষনো না আমাদের প্রফেসার এইরূপ উচ্চারণ করেন।"

কিশোরী। "প্রফেসারের বিদ্যা তাহলে বোঝা গেছে। আচ্ছা বল দেখি ad´versary না adver´sary?"

জীবন। "তা অবশ্য ad´versary—কিন্তু তাই বলেই যে advertisement এরও first syllabl[illegible]cent হবে তার ত কোন মানে নেই। যেমন ধর in´dolence আর condo´lenc[illegible]র্ণের কথা—কিন্তু accent দুটর দুরকমের।"

জীবন ইহাদের চারি জনের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ক্লাশের ছাত্র, অন্য কেহ সহজে ইহার কথা অমান্য করিতে সাহস করে না, কিন্তু কিশোরীর সে সাহস আছে।

সে বলিল—"হ্যাঁ ওটা যা বলেছ ঠিক indo´lence আর con´dolenceই (জীবন কিন্তু ঠিক বিপরীত উচ্চারণ করিয়াছিল) বটে, কিন্তু advertisement আর adversaryর যে accent একই, তা আমি কখনোই স্বীকার করব না।"

জীবন। "তুমি স্বীকার কর বা না কর তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের প্রফেসার বিলাত থেকে লেখাপড়া শিখে এসেছেন ?"

কিশোরী। "রেখে দাও তোমার বিলাত। বিলাত গেলেই ত আর লোকে বিদ্যা-দিগ্‌গজ হয়ে আসে না। কৃষ্ণদাস পাল কি বিলাত গিয়েছিল ? সে কি আর ইংরাজি জানে না ?"

হেম। "ঠিক বলেছিস ভাই। সেদিন হুজিফ ও হাউস-ওয়াইফ নিয়ে কি তর্কই হোল ?"

কিশোরী। "হ্যাঁ, চিরকাল গ্রেজ এলিজিতে হাউসওয়াইফকে হুজিফ পড়ে এলুম, আজ একজন বিলাত ফেরত বলেন কিনা—হাউস-ওয়াইফ আর হুজিফ আলাদা কথা, আলাদা মানে, আলাদা উচ্চারণ, মাথা আর মুণ্ডু।"

জীবন। "সত্যিই ত আলাদা, হাউসওয়াইফ মানে গৃহিণী, হুজিফ হচ্ছে মেয়েদের সেলাই ইত্যাদি করার মত জিনিসের ক্ষুদ্র কেস কিম্বা বেগ। তবে যে গ্রেজ এলিজিতে ওরূপ উচ্চারণ হয়, সে কেবল ছন্দের অনুরোধে। Exceptionকে তোরা Universal করে তুলতে চাস—সেত আর বিলাত ফেরতের দোষ নয়।"

কিশোরী। "অমনি বল্লেই হোল ? সে দিন থিয়েটারে দেখি একজন বিলাত ফেরত 'অঁাকোর' বলছে; আর আমি ইংরাজদের 'এন্‌কোর' বলতে শুনেছি। বল তারা ভুল বলে ?"

হেম। "তুই ভাই থিয়েটারে গিয়েছিলি ? কবে ? আমাকে বলতে নাই ? গোলাপী গিয়েছিল নাকি ? She has a splendidest throat I have ever heard !"

জীবন। "(হাসিয়া) you are the greatest ass I have ever seen."

নবীন। "হেম থ্রোট কিরে ?"

হেম। "থ্রোট নাত নেক বলব নাকি ?"

নবীন। "থ্রোটও বলবিনে, নেকও বলবিনে—বলবি voice."

হেম। "একই কথা। He saw me, he eyed me দুইই বলা যায় কি না ? আমি না হয় voice না বলে throat বলেছি তাতে আর কি এল গেল ?"

জীবন। "এল গেল এই যে ভুল হোল।"

হেম। "কেন কিশোরীও ত ঐ কথা বলে ?"

কিশোরী সেয়ানা ছেলে, দেখিল বেগতিক, হাসিয়া বলিল—"হেম তুই যদি একটুও ঠাট্টা বুঝিস। বলি জীবনদা এবারকার তোমাদের English courseটা কি ?"

জীবন। "তুলাইনে বলব ?"

আদি সেন তানসেন মাকালি গোবরস্তথা
মুলতান হুমারশ্চৈব বলাকী বরদাভর্ত্তা।

হেম। "একি এ যে সব সংস্কৃত !"

নবীন। "হাহা ঐ,ত মজা ! বিদেশের ভাষা বুঝিস আর দেশের ভাষা বুঝিসনে ?"

হেম। "দেশের ভাষা ! এটা তোমার দেশের ভাষা হোল ? তুই বল দেখি—নাকে মুখে কথা কয়—কেবা সেই মহাশয় ? এত বাপু খাঁটি ভাষা ?"

নবীন। "নাকে মুখেত আর কেউ কথা কয় না তুই ছাড়া।"

হেম। "আমাকে ভূত বল্লি ? তোকে কিন্তু ভূত ছাড়া করব।"

কিশোরী। "আঃ হেম একটু থাম না। দাদা কি বল্লে আর একবার বল দেখি ?"

জীবন আর একবার পূর্ব্ববৎ উপরোক্ত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া গেল, কিশোরী ভাবিয়া বলিল—"হ্যাঁ বুঝেছি, এইটুকু কি আর বুঝতে পারিনে ? আদি সেন অ্যাডিসন, তানসেন টেনিসন, মাকালিটাও বুঝলুম,

হেম। "কি বুঝলি ?"

কিশোরী। "কেন—মেকলে ?"

হেম। "সাবাস বুদ্ধি ! আমি বলে দিলুম কিশোরী একদিন যদি হাইকোর্টের জজ না হয় আমার নাম মিথ্যা। তাপর ভাই গোবর ?"

কিশোরী। "গোবর আর বরদা ভর্ত্তা—ঐটে গলাধঃকরণ করতে একটু গোল বাধছে। মূলতান মিলটন—হুমর ত হোমর—"

জীবন। "শোন তবে, কুপার থেকে গোবর—ওয়ার্ডসওয়ার্থ থেকে বরদা ভর্ত্তা। যেমন সিন্ধু থেকে হিন্দু—হাণ্ড্রেড থেকে হান্দর—হলাঁদে থেকে ওলন্দাজ ইত্যাদি।"

কিশোরী। "তাহলে কালীঘাটা থেকে কলিকাতা—dandy থেকে জাঁদরেল—এও ত হতে পারে।"

হেম। "Bravo ; happy, happy thought ! বলি জীবন বাবু বাল্য বিবাহ সত্ত্বেও এ সব thought বাঙ্গালী সন্তানের মাথা থেকে বার হয় !"

কিশোরী। "এ ত ভারী ! এমন কত Original idea বাঙ্গালীর মনে এসেছে। আচ্ছা জীবনদা আমি জিজ্ঞাসা করি, চিরকাল আমাদের বাল্য বিবাহ চলে আসছে তা আমাদের দেশ উচ্ছন্ন গেছে না সংসার চলছে না—কি বল দেখি ?"

জীবন। "সংসার চলেছে বটে—তা এরূপ না চলাই ভাল। আমরা কি আবার একটা জাত ? আমাদের চরিত্রের বল আছে, না মহৎ কার্য্যে আত্মদান আছে—কি

আছে কি ? দু একজন মহৎ চরিত্রকে কালে ভদ্রে যদি বা আবির্ভাব হতে দেখা যায়, অকাল মৃত্যু থেকে তাঁদেরও নিস্তার নেই। এ সকলের কারণ কি" ?

কিশোরী। "কারণ ম্যালেরিয়া—আর বিদেশীয় অধীনতা। আমাদের আগেও ত বাল্যবিবাহ ছিল কিন্তু বড় লোকের ত অভাব ছিল না,—আর তাঁরা বাঁচতওত অনেক দিন ?"

জীবন। "ম্যালেরিয়া আর কদিন হয়েছে—আর সব জায়গায় ত আর ম্যালেরিয়া নেই। আর বেদেশীয়ের অধীনতার কথা যদি বলিস তারই বা কারণ কোথা ?"

কিশোরী। "তার কারণ বাঙ্গলার জল বাতাস"—

হেম। "তার কারণ বাঙ্গালীর স্বভাব—"

জীবন। "তার কারণ বাঙ্গালীর শিক্ষা—rather শিক্ষার অভাব। স্ত্রীলোকদের নিকট হতেই মানুষের চরিত্র গঠিত হয়, আমাদের স্ত্রীলোকেরা যদি সুশিক্ষিত হতেন, আমরা যদি তাঁদের সহিত উপযুক্ত ব্যবহার করিতে জানতুম—তা হলে আর আমাদের এরূপ দশা হোত না।"

কিশোরী। "রেখে দাও তোমার স্ত্রী শিক্ষা—আর স্ত্রী মর্য্যাদা! শাস্ত্রকারগণ কি তোমার চেয়ে নির্ব্বুদ্ধি ছিলেন—তাঁরা বলেন—"

"বিশ্বাস নৈবং কর্ত্তব্যং স্ত্রীংষু রাজ কুলেং যুচ।"

জীবন। "শাস্ত্রে অন্য কথাও ত অনেক আছে তা তোমরা মান কই ? বিধবা বিবাহ ত শাস্ত্র সম্মত বিদ্যাসাগর প্রমাণ করেছেন—তবে কেন বিধবা বিবাহে এত কুণ্ঠিত ?"

কিশোরী। "বিধবা বিবাহ! কি একটা কথা আছে—আচার আচাব—"

জীবন। "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং—"

কিশোরী। "আমি জানি, কেবল মনে পড়ছিল না। তা আচার ত ছাড়া যায় না। শাস্ত্রে আগে ছিল বিধবা বিবাহ, এখন আচার দাঁড়িয়েছে অন্য রকম।"

জীবন। "তাই আচারের নামে আমরা সহস্র দুরাচার পালন করছি। এর চেয়ে silliness, foolishness আর কোন nationএ দেখতে পাবে না।"

নবীন। "তুমি অন্যায় বলছ। এ রকম foolishness সব নেসনের মধ্যেই দেখা যায়। ইংরাজেরা দেখ শাস্ত্রের মান্য রক্ষার জন্য কত লোক পুড়িয়েছে। আসল কথা পুরাতনের প্রতি লোকের এমনি শ্রদ্ধা যে sentiment এখানে বুদ্ধির লাগাম মানে না;"

জীবন। "False sentiment !"

নবীন। "মানুষ যখন imperfect তখন তার আর বিচিত্র কি!"

জীবন। "কিন্তু এই imperfection নিয়ে যে সন্তুষ্ট থাকে, একেই যে perfect বলে জানে, সেত আর কখনো মানুষ নামেরো যোগ্য হতে পারে না।"

নবীন। "তাহলে ইংরাজরাও মানুষ না।"

জীবন। "false sentiment যে ইংরাজদের নাই তা নয়—কিন্তু তাদের মধ্যে সত্যের অনুরাগও এত প্রবল যে এরূপ মিথ্যাকে তারা অতিক্রম করে উঠে, অন্ততঃ তাদের সেইদিকে লক্ষ্য দেখা যায়। কিন্তু আমাদের আদি যুগ হতে এখন পর্য্যন্ত কেবল অন্ধবিশ্বাস—পরের ল্যাজ ধরে চলা অভ্যাস। এ কিরূপ injustice বল দেখি—স্ত্রীলোক আর শূদ্র—"

নবীন। "তুমি এখনকার চোখে তখনকার কালকে বিচার করছ; এখানে absolute ন্যায়ান্যায় দেখলে ত চলবে না, তখনকার কালের পক্ষে সমাজে ঐরূপ বিধান হয়ত absolutely আবশ্যক হয়েছিল।"

জীবন। "বেশ—কিন্তু এখন ত আর সে কাল নেই—সে অবস্থা নেই—এখনো কেন তোমরা তবে অন্ধ হয়ে থাকতে চাও—সেই সংস্কার—সেই শাস্ত্রের দোহাই ধরে চল।"

কিশোরী। "রেখে দাও তোমার বক্তৃতা! ভারী নাকি মস্তলোক তাই শাস্ত্র ছেড়ে তোমাকে মানব। ঐ কি শ্লোকটা—কালোহ্যনন্তং বিপুলাচ পৃথ্বিং উৎপসতি নাস্তি সমানা—কালও অনন্ত পৃথ্বিও বিপুল—কিন্তু এরূপ শাস্ত্র আর হবে না।"

জীবন। "ভবভূতির? উৎপস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা, কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলাচ পৃথ্বী—কিন্তু ভবভূতির কাব্য ত আর শাস্ত্র নয়।"

কিশোরী। "দাদা রুষ্ঞ হয়োনা, সংস্কৃত যে লিখেছে সেই শাস্ত্রকার, তুমি দুলাইন বাঙ্গলা লিখে শাস্ত্র ওলটাতে পারবে না।"

জীবন। "সে ভাবনা করিসনে কিশোরী আমি শাস্ত্র ওলটাচ্ছিনে—বিশুদ্ধ বাঙ্গলা শুনলেই থমকে যেতে হয় তা শাস্ত্র? রুষ্ঞর মানে কি কিশোরি?"

হেম। "সত্যি নাকি; রুষ্ঞ কথাটার মানে জান না আবার বাঙ্গলা লেখ; রুষ্ঞ জান না—উষ্ট কাকে বলে জান? উষ্টও যা রুষ্ঞও তাই। হায় হায় আমাদের দেশের এমনই দুরাবস্থাই বটে!"

নবীন। "তোদের কথার আকারেই তা প্রকাশ পাচ্ছে। অহে কিশোরী এত দেশ দেশ করিস্ আর দেশের ভাষাটা একটু শিখিসনে!"

কিশোরী। "আমি দেশের ভাষা জানিনে!"

নবীন। "এই না বল্লি রুষ্ঞ?"

কিশোরী। "তা না ত কি?"

নবীন। "রুষ্ট।"

কিশোরী। "আমি ত তাই বলেছিলুম্—দাদা বল্লে রুষ্ঞ। আমাকে আবার উনি ভাষা শেখাতে আসেন?"

হেম। "আর বাঙ্গলা শিখেই বা কি হবে, বৃথা পরিশ্রম। বাঙ্গলা ভাষা ত আর বেশী দিন টিকছে না। যা শেখবার তাত শিখেছে। বলি কিশোরি এবার কি এণ্ট্রেন্স দিবি?"

কিশোরী। "ঠিক বলতে পারছিনে। একটু juxta positionএ পড়েছি।"

জীবন। "কি রকম ?"

কিশোরী। "দাদা ত পড়া নিয়ে ব্যস্ত, বাবাও আর পেরে ওঠেন না। জমীদারীতে একটা হেঙ্গাম বেধেছে, বোধ হচ্ছে আমার না গেলে চলবে না। একটা Equitorial mortgage"।

জীবন আর নবীন উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, কিশোরী থামিয়া বলিল "এতে হাসির কথা কি ?"

জীবন। "কিছু না—এই যে মোহনদা আসছে ?"

কিশোরী। "তাইত দাদা আসছে আমি যাই এখনি লেকচার ঝাড়বে এখন, আয় হেম।"

মোহন এদিকে আসিতে আসিতে হেম ও কিশোরী বাগান পার হইয়া গেল। জীবন ও নবীন মোহনের কাছে আসিয়া বলিল "এইযে মোহনদা খবর কি ? কবে শিবপুর থেকে এলে ?"

মোহন। "এই ভাই এক রকম! কাল এসেছি আবার কাল যাব। এত হাসি চলেছিল কেন জীবন ?"

নবীন। "ওহে ভাই তোমার ভায়ার Equitorial mortgage এর মধ্যে পড়ে বড়ই juxta positionএ পড়েছিলুম।"

মোহন বুঝিল ব্যাপার খানা কি ; বলিল ;—

"ওটার বিদ্যা ঐ পর্য্যন্ত হয়েছে কিছুতেই আর ওর কিছু হোল না।"

জীবন। "বুদ্ধি শুদ্ধি কিন্তু মন্দ ছিল না—পড়লে শুনলে বেশ হোত।"

মোহন। "বাবা ও জ্যেঠাই মা আদর দিয়ে দিয়েত ওর মাথা খেলেন। যাক কি আর হবে।"

জীবন। "মোহনদা তুমি যে বলেছিলে join করবে ?"

মোহন। "কিসে ? Early marriage pledge এ ?"

জীবন। "হ্যাঁ।"

মোহন। "ভেবে দেখলুম সেটা না করাই ভাল। কেন না জানছি যে তা পেরে উঠব না।"

জীবন। "তোমার ত প্রায় ১৯বছর বয়স পার হোতে চল্লো—আর দুবছর বই ত নয় ?"

মোহন। "যে রকম বিরক্ত করে তুলেছে—দুবছর ছাড়া দুমাস আর পোহাতে দেবে এমন মনে হয় না।"

নবীন। "জীবন তুই যে বাল্য বিবাহ বিবাহ করে ক্ষেপলি ? সকলেরি use abuse আছে। আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা আতে হঠাৎ বাল্য বিবাহ উঠিয়ে দিলে

যে ভাল ফল হবেই এমন ত বলা যায় না। আর যদি বাল্য বিবাহ বন্ধ হওয়া আবশ্যকই হয় ত ক্রমে আপনিই হবে; তার জন্য তোর আমার অত মাথা ভাবাবার আবশ্যক নেই।”

জীবন বলিল— ‘তাহলে কিসেই বা আবশ্যক আছে? আমরা সকলে চুপ চাপ বসে থাকি, অদৃষ্টে যা হবার আপনিই হবে। পড়া শুনাই বা কেন, উপার্জ্জনের চেষ্টাই বা কেন—কিছুরি আবশ্যক নেই।”

বাল্য বিবাহের পরিবর্ত্তে অদৃষ্টবাদ লইয়া আবার তাহাদের তর্ক আরম্ভ হইল এবং পূর্ব্বের ন্যায় কোন মীমাংসার পূর্ব্বেই ইহাও অসময়ে সমাপ্ত হইয়া গেল। ইহার পর আরো একটা তর্ক উঠিবার সূত্রপাত হইয়াছিল কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া পড়িল, মৃদু চন্দ্রালোকে চারিদিক শোভিত দেখিয়া পুস্তকের বিরহে তাহারা চঞ্চল হইয়া উঠিল, এই মুক্ত জ্যোৎস্নাময় দৃশ্য অপেক্ষা তাহাদের মলিন তৈল দীপালোকিত ক্ষুদ্র কোটর অধিকতর রমণীয় বলিয়া মনে হইতে লাগিল, তাহারা দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

জীবন বিবাহ করিতে চাহে না জীবনের মার ইহাতে বড়ই দুঃখ। জীবন কিছু নিতান্ত ছেলেমানুষ নহে, বয়স প্রায় ১৯ বৎসর হইতে চলিল, দু দুইটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, অন্য ছেলে হইলে এতদিন কোন কালে তাহার বিবাহ হইয়া যায়। জীবনের মারও ইচ্ছা অন্য সকলের ন্যায় তিনিও জীবনের এখনই বিবাহ দেন, তাঁহার কন্যা নাই, পুত্রবধূকে লইয়া তিনি কন্যার সাধ পূর্ণ করেন। কিন্তু জীবন কিছুতেই বিবাহে রাজি হয় না, কত বড় বড় ঘর হইতে সম্বন্ধ আসিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া যায়। জীবন যত বড় হইতেছে, পাশ্চাত্য ইতিহাস, পাশ্চাত্য মহৎ-চরিতের সহিত যতই সে অধিক পরিচিত হইতেছে, ততই তাহার প্রাণের মধ্যে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে, আর দেশের সামাজিক রীতি নীতি সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণের পক্ষে ততই যেন তাহার প্রতিকূল বলিয়া মনে হইতেছে। দিন কতক সে বিলাত যাইবার জন্য ভারী ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পরে বুঝিল সে বাসনা তাহার পক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত। এখনই সে পরের বৃত্তিভোগী, তাহার পিতৃব্য অনুগ্রহ স্বরূপ তাহাদিগকে মাসে মাসে যৎকিঞ্চিৎ যাহা দান করেন, তাহাতে তাহাদের যথেষ্ট হয় না। জগৎ বাবু যদি বিনা ভাড়ায় তাহাদিগকে থাকিবার স্থান না দিতেন—তিনি যদি নানারূপে তাহাদের সাহায্য না করিতেন, তবে তাহাদের দুর্দ্দশার শেষ থাকিত না। এ অবস্থায় বিলাত যাইবার ইচ্ছা তাহার দুরাশা মাত্র। জীবন সে বাসনা ত্যাগ করিল—কিন্তু তাহাতে তাহার মনের অতৃপ্তি বাড়িল

বই কমিল না, তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা একটা অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট আকারে তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। বিদ্যানুশীলনে এ অতৃপ্তি সে ডুবাইতে চেষ্টা করিত। ভবিষ্যতের স্বাধীন জীবিকা লাভের জন্য বিদ্যানুশীলন যদিও এখন তাহার একটি প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে পাঠাভ্যাস করিয়াই যে সে ক্ষান্ত থাকিত এমন নহে, পুস্তকের সহবাসে জীবন যথার্থ আনন্দ উপভোগ করিত। একখানা নূতন মনের মত বই পাইলে জীবন না পড়িয়া থাকিতে পারিত না, ইহাতে তাহার আবশ্যক পাঠের অনেক সময় বরঞ্চ ক্ষতিও হইত।

সাহিত্য এবং বিজ্ঞান এই দুই বিষয়ের পুস্তক জীবন অধিক পাঠ করিত। দুইই তাহার এত ভাল লাগিত যে যখন যে বিষয় পড়িত, তখনকার মত তাহার মধ্যে সে একেবারে ব্যাপৃত হইয়া থাকিত, এবং উভয়ের সম্পূর্ণরূপ স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে সে যেন একই সাদৃশ্য দেখিতে পাইত।

কাব্য উপন্যাসাদির উদার অসীম কল্পনার মধ্যে বিজ্ঞানের জ্বলন্ত সত্য সে দেখিতে পাইত, মনুষ্য চরিত্রের অগাধ মন্থিত রাজ্যে প্রবেশ করিয়া দর্শনের উচ্চ গূঢ় জ্ঞান লাভ করিত, সংসারের মঙ্গল অমঙ্গল পাপ পুণ্যের ঘাত প্রতিঘাতে সৃষ্টির অনন্ত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইত। আদর্শ উচ্চ চরিত্রের সহবাসে একটা জীবন্ত সম্মিলন সুখ অনুভব করিয়া সেই আদর্শ অবলম্বন করিতে তাহার প্রাণগত একটা ইচ্ছা হইত। আবার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র সত্যের মধ্যেও সে কল্পনার বিপুল দ্বার উন্মুক্ত দেখিত, বিজ্ঞানের সীমায় প্রকৃতির অসীমতা অধিকতর সুস্পষ্ট দেখিয়া তাহার মধ্যে এক বিস্ময়জনক কবিত্ব সৌন্দর্য্য অনুভব করিত, সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জীবনের প্রতি তাহার অসীম শ্রদ্ধা ভক্তির উদয় হইত। তাহার ইচ্ছা হইত সে ঐরূপ জীবন অবলম্বন করে। কেন সে যদি ইয়োরোপে গিয়া সেখানকার কোন পণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, এবং সেখানে অনবরত অধ্যবসায় সহকারে বিজ্ঞান চর্চ্চা করে, তাহা হইলে কি সে সিদ্ধকাম হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিবে না, এবং তাহার জ্ঞানে ভারতবর্ষের উপকার সাধিত হইবে না? কেন হাকসলি আগে কি ছিলেন? তিনি ত কেবল অধ্যবসায়েই পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন?

যৌবনের অনভিজ্ঞতা এবং উৎসাহে সে এইরূপে তাহার আশা সফলের পক্ষে আর কোন প্রতিবন্ধক দেখিতে পায় না। একবার যদি কেবল মাত্র সে ইয়োরোপে যাইতে পায়! যেখানে কোপর্নিকস, গেলেলিও, নিউটন জন্মিয়াছেন, যেদেশ শত সহস্র মহালোকের জন্মভূমি, তাহার চক্ষে তাহা কামরূপ, তাহার স্পর্শে যেন অন্ধও দিব্য চক্ষু লাভ করে। ইংলণ্ড যাইবার পক্ষে এখন সে যতই প্রতিবন্ধক দেখে, ততই সে ভবিষ্যতের মুখ চাহে, উপার্জ্জন সক্ষম হইলে সে যে একদিন ইয়োরোপে যাইবে, ইহাতে সে দৃঢ় সঙ্কল্প। মাঝে মাঝে বিবাহের অনুরোধ করিয়া মা তাহার এ সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গাইতে চাহেন। জীবন

বেশ জানে একবার বিবাহের নিগড় পরিলে তাহার সমস্ত আশা বিফল হইবে। সুতরাং এই অনুরোধে বিবাহের প্রতি অধিকতর তাহার বিতৃষ্ণা জন্মে এবং তর্ক করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া প্রচলিত বিবাহ রীতির বিপক্ষতা অবলম্বন করে। কেবল তাহাই নহে, তাহার মাতার অনুরোধ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহার যত্নে বাল্য বিবাহ নিবারণী এক সভা সংগঠিত হইয়াছে। তাহার মাষ্টার পণ্ডিত প্রভৃতি অনেকেই এসভার হিতাকাঙ্ক্ষী সভ্য কিন্তু তাহাতে সভার উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইয়াছে বলিতে পারি না, কেন না তাঁহারা সকলেই বিবাহিত, ইহার মধ্যে অবিবাহিত একমাত্র জীবন। তবে ভবিষ্যতে ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে এমন আশা করা যায়। সভার নিয়ম এই যে, যে অবিবাহিত ব্যক্তি ইহার সভ্য হইবেন—তাঁহাকে অন্ততঃ ২১ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিতে শপথবদ্ধ হইতে হইবে। জীবনের ইচ্ছা ছিল ২১শের পরিবর্ত্তে ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রম এই শপথের সীমা হয়, কিন্তু এ প্রস্তাব কিছুতেই গ্রাহ্য হয় নাই। যাহা হউক জীবন শপথ গ্রহণ করিয়াই যে মাতার অনুরোধের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছে তাহা নহে, তিনি সমানই কান্না কাটা করিয়া জীবনকে বিরক্ত করিয়া তোলেন।

জীবন যে নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক তাহা নহে—ঠিক বিপরীত। অনেক বিষয়ে কর্ত্তব্য পক্ষেও অন্যকে সে কষ্ট দিতে পারে না। অপরাধীকে শাসন করিতেও তাহার অনেক সময় চক্ষুলজ্জা উপস্থিত হয়। চাকরদের দোষ দেখিলে তাহাদের লজ্জা ভাবিয়া সে নিজে লজ্জায় পড়ে। একদিন জীবন গৃহে আসিয়া দেখিল তাহার চাকর তাহার আয়নার সমুখে দাঁড়াইয়া তাহার ব্রস লইয়া চুল আঁচড়াইতেছে, জীবনের ভয় হইল পাছে চাকর তাহাকে দেখিতে পায়? অপরাধীর মত সে আস্তে আস্তে মহা সঙ্কোচে সেখান হইতে চলিয়া গেল—এবং পরে সে কথার উল্লেখও করিল না, কেবল সেই দিন হইতে তাহার ডেস্কের মধ্যে সে ব্রসখানি স্থান পাইল।

একদিন জীবন অন্য কয়েক জন সমবয়স্কের সহিত কিশোরীদের গঙ্গাতীরের বাগানে বেড়াইতে গিয়া গঙ্গাস্নান করিতেছিল। কিশোরী ও জীবন দুজনেই সবল শরীর, যুদ্ধংদেহি বলিয়া উভয়ে হাসিতে হাসিতে কুস্তির ভান আরম্ভ করিল। হঠাৎ কিশোরী আত্মবিস্মৃত হইয়া জীবনকে জলে চুবাইয়া ধরিল। জীবন তাহার হাত ছাড়াইয়া কষ্টে যখন উপরে মাথা তুলিল, তখন তাহার সোপানাহত ওষ্ঠ হইতে দর দর করিয়া রক্তধারা বহিতেছে। জীবন ক্রুদ্ধ বিস্মিত হইয়া কিশোরীকে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তার আগেই কিশোরী বলিল "দাদা লেগেছে? দৈবাৎ দৈবাৎ" জীবন অমনি থামিয়া গেল, বুঝিল কিশোরী কি ভয়ানক অপ্রস্তুত হইয়াছে, ক্রোধের পরিবর্ত্তে সে নিজে লজ্জিত হইয়া পড়িল। অন্য ছেলেরা সকলে কিশোরীর দিকে ক্রুদ্ধ কটাক্ষে চাহিল, কিন্তু জীবন স্পষ্ট মিথ্যা করিয়া বলিল, "কিশোরি কিছু না কিছু না অতি

সামান্য, হঠাৎ পড়ে গেলুম, কেমন পা পিছলে গেল, কিন্তু বিশেষ কিছু হয়নি—অতি সামান্য"—

কিশোরী যে কিছু করে নাই, জীবন আপনার দোষে পড়িয়া সামান্য আহত হইয়াছে, নানারূপে জীবন এই কথাটা সকলকে বিশ্বাস করাইতে প্রয়াস পাইল।

অন্যকে সামান্য কষ্ট হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য জীবন অনেক সময় এইরূপ অন্যায় করিয়া থাকে, এ সম্বন্ধে জীবনের একটা বিশেষ দুর্ব্বলতা আছে। কিন্তু সে বিবাহ করে না বলিয়া মা যে এত কষ্ট পান, সে জন্য তাহার কিছুই দুঃখ হয় না। কথাটা এই, জীবন নিজে যেরূপ স্থলে পড়িলে কষ্টে লজ্জায় পড়িত সেইরূপ স্থলেই তাহার মমতা হয়, অন্য স্থলে সে অন্ধ। সে বিবাহ না করিলে মা যে কেন কষ্ট পাইবেন—ইহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং সে দিন বাড়ী আসিবামাত্র আবার মা যখন বলিলেন—"বাবা বিয়ে কর না; খাসা মেয়ে" তখন জীবন আর একবার বিরক্ত হইল, এবং আর একবার তাঁহাকে বাল্য বিবাহের বিপক্ষীয় যুক্তি সকল আনুপূর্ব্বিক বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইল। মা খানিকটা শুনিয়া বলিলেন "তা বাবা আমাদের সকলেবিত ছেলেবেলায় বিয়ে হয়েছে—আমরা কি আর মানুষ হইনি?"

জীবন বলিল—"বাল্য বিবাহ প্রচলিত না থাকিলে আমরা আরো বড় মানুষ হইতে পারিতাম।"

মা। "তা বড় মানুষ এখনো অনেক আছে। শোন বাছা টাকা কড়ি অনেক পাবি—মেয়েটিও বেশ।"

জীবনের মার বিশ্বাস জগৎ বাবু স্নেহলতাকে যেরূপ ভালবাসেন—তাহাতে গৃহিণী যাহাই বলুন—তিনি বেশ ভালরকম করিয়াই তাহাকে দান করিবেন। জীবন এই কথায় রাগিয়া গেল—বিবাহ করিয়া টাকা লইতে তাহার ঘৃণা বোধ হইত, সে ভাবিত যদি সে বিবাহই করে ত ভালবাসিয়া বিবাহ করিবে। আমাদের দেশের পক্ষে তাহা সম্ভব কি না ইহা তাহার মনে আসিত না।

এতক্ষণ সে প্রকৃতিস্থ হইয়া কথা কহিতেছিল—এবার রাগিয়া বলিল—"ভরসা করি আমি নিজেই টাকা কড়ি আনিয়া তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিব—বৌয়ের টাকায় তোমায় বড় মানুষ হইতে হইবে না।"

জীবনের মা বলিলেন—"তা টাকা নাই নিস অমনি বিয়ে কর।"

জীবন। একশবার ঐ কথা। জানত আমার লেখাপড়া শেষ না হইলে আমি বিবাহ করিব না, নিদেন আর দুবছর পর্য্যন্ত ত আমার হাত পা বাঁধা।"

বলিয়া জীবন পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল, বলিল "এখনি নবীন আসবার কথা আছে আমি বাইরে যাই"—

জীবনের মা তবু বলিলেন "মেয়েটি বড় সুন্দর, আচ্ছা একটিবার তুই দেখ—"

মায়ের শেষ কথায় তাহার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল—"কেমন সুন্দর ?" অবশ্য বিবাহের জন্য নহে, সৌন্দর্য্যের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক যে আকর্ষণ—সেই আকর্ষণ-উৎপন্ন কৌতূহল চরিতার্থের জন্য। জীবনের অনেক রকম দুর্ব্বলতা আছে সৌন্দর্য্যানুরাগ তাহার মধ্যে আর একটি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না—তাহা হইলে মা আবার বাড়াবাড়ি করিয়া বসিবেন। সে কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেল।

জীবনের মা আবার দুঃখ করিতে লাগিলেন—তাঁহার নিতান্তই পোড়া অদৃষ্ট! নহিলে বিধবাই বা কেন হইবেন! স্বামী থাকিলে কি ছেলে এমন কথার অবাধ্য হইতে পারিত ?

কান্নাকাটি করিয়া একটু ঠাণ্ডা হইবার পর একটি কথা তাঁহার মনে আসিল। জীবন রাত্রে গৃহে আসিতে তিনি বলিলেন "আচ্ছা জীবন তুই যদি না বিয়ে করিস ত মোহন কেন করুক না, অমন মেয়ে হাত ছাড়া হবে ?"

মোহন ও কিশোরী জীবনের পিতৃব্য সন্তান। জীবনের পিতা বর্ত্তমানে তাঁহারা যখন এক পরিবারভুক্ত ছিলেন, তখন ৪ মাস আগে পরে মোহন ও জীবনের জন্ম হয়। সন্তান প্রসবের কয়েক মাস পরে মোহনের মাতা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ায় জীবনের মা তাহাকে নিজ দুগ্ধে পালন করেন। সুতরাং মোহনকেও তিনি মাতৃ চক্ষেই দেখিতেন।

মায়ের কথায় জীবন বলিল "আঃ কি যে তোমার বাতিক! তা আমি কিছু জানিনে তোমার যা ইচ্ছা তুমি কর।" জীবনের মা দেখিলেন জীবনকে এ কথা কিছু না বলাই ভাল। তিনি নিজের সঙ্কল্প মতে কাজ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাহার পর দিন জগৎ বাবুর স্ত্রীর কাছে গিয়া স্নেহের সহিত মোহনের সম্বন্ধ পাড়িলেন। বলিলেন "ছেলেটি বড় ভাল, ছেলেবেলা হইতে মানুষ করিয়াছি সব জানি, সে যেমন কথার বশ, আমার জীবন তেমন নয়; তবে আমার যা মোহনের জ্যেঠাই কিছু রুক্ষ স্বভাব। তা মেয়ে মানষের স্বামী ভাল হইলে তাহাতে কি আসে যায়।" গৃহিণীর ইচ্ছা কোনরূপে স্নেহলতার বিবাহটা হইয়া গেলে হয় অথচ ভাল বর না হইলে কিছু জগৎ বাবু বিবাহ দিবেন না—সুতরাংতিনি এই সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইয়া জীবনের মার কথায় সম্পূর্ণ সায় দিলেন এবং সেই দিনই কর্ত্তার কাছে মোহনের কথা বলিলেন—কেবল তাহার জ্যেঠাই-মার স্বভাব সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন সে কথা বলিলেন না। কর্ত্তা মোহনলালের বাড়ীর ডাক্তার ছিলেন, মোহনকে চিনিতেন, তাহাকে বেশ ভাল ছেলে বলিয়াই জানিতেন, তিনি ইহার পর আরো ভাল করিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা আলাপ আরম্ভ করিলেন, তাঁহার পরীক্ষায় মোহন পাশ হইল। ইহার সহিত বিবাহ হইলে স্নেহ সুখী হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল, তিনি গৃহিণীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। জীবনের মা গৃহিণীর নিকট তাহা শুনিয়া কিশোরীকে একদিন ডাকিয়া পাঠাইলেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর যে অবধি দেবর তাঁহাদের সম্পত্তি বেদখল করিয়া তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছেন, সে অবধি আর জীবনের মা দেবরের বাড়ী যান নাই। দেবর ও কথনো তাঁহাদের নিমন্ত্রণ কি তত্ত্বতলাস করেন নাই। কিন্তু এজন্য মোহন কিশোরীর সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক ঘোচে নাই। তাহাদের তিনি প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিতেন, ডাকিয়া পাঠাইতেন, খোঁজ খবর লইতেন। মোহনের বাবা কিন্তু তাহা জানিতেন না—জানিলে আসিতে দিতেন কি না সন্দেহ। তাঁহার ভয়ে জীবনকে কথনো মোহন কিশোরী বাড়ী লইয়া যাইতে পারিত না।

কিশোরীকে ডাকিয়া তিনি মোহনের বিবাহ প্রস্তাব করিলেন। বলিলেন "মেয়ে দেখতে ভাল, দেবে থোবে ভাল, ঘর হবে ভাল—সব ভাল। দিদিকে বলো যেন হাত ছাড়া না করেন।" জীবন এখন বিয়ে করবে না, নইলে আমার ইচ্ছা ছিল ঐ মেয়ে করব।"

কিশোরী বলিল—"মেয়ে ভাল, দেবে থোবে ভাল বুঝলুম, কিন্তু ঘর ভাল কি করে বলি, মেয়ের ত বাপ মা নেই"—

জীবনের মা বিরক্তির স্বরে বলিলেন—"এই দেথ! বাপ মা নেই তা জগৎবাবু যে বাপ মার অধিক। আর মামা ত রয়েছে—বড় মানষের ছেলে, ছেলে পিলে নেই, বৌটা বাঁজা—স্বভাবটা তার তাই কেমন এক রকম হয়ে পড়েছে, তাই সিন খোঁজ নেয় না, চির দিন ত আর এমন থাকবে না, ঐ মেয়েকে দেখিস কত আদর করে নেবে"—

এ কথার পর এ বিবাহে আর কোন আপত্তি প্রকাশ না করিয়া কিশোরী সেই দিনই এই সম্বন্ধের কথা জ্যেঠাইমাকে গিয়া বলিল। এদিকে জগৎ বাবুর বাড়ী হইতে ঘটকীও আসিয়া উপস্থিত হইল। দিনকতক পরস্পর কথাবার্ত্তা চলিল, বরের বাপ মস্ত হাঁক হাঁকিয়া বসিলেন, গহনা দানপত্র নগদ টাকার লম্বা ফর্দ্দ ধরিয়া দিলেন। কন্যা পক্ষ হইতে তাহার কষাকষি চলিতে লাগিল, অবশেষে মাঝামাঝি একটা রফা হইয়া গেলে বর পক্ষ কন্যাপক্ষ উভয় পক্ষ হইতে পাকা দেখা হইয়া গেল। এই ফাল্গুন মাসেই বিবাহের দিন স্থির হইল।

ক্রমশঃ

প্রবাদ প্রশ্নের উত্তর——জোর যার মুলুক তার।

ফুলজানি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ ব্যাপারটা সুখে দুঃখে এত জড়িত যে, মনে হয় ইহা সুখদুঃখের মিলন। অনিশ্চিত এবং অদৃষ্টের উপর ইহার সম্পূর্ণ নির্ভর, সংসারের আশায় নৈরাশ্যে ইহার জীবন। ঋষি কণ্ব হইতে সাধারণ গৃহী পর্য্যন্ত সকলকেই যে কন্যা বিদায়ের সময় বাষ্প মোচন করিতে হয়, তাহার অন্য কোন অর্থ নাই।

অনেক আশা করিয়া নিস্তারিণী পুরন্দরের সহিত ফুলকুমারীর বিবাহ দিলেন। যাহা কিছু দেখিয়া লোকে কন্যা পাত্রস্থ করিতে পারিলে সৌভাগ্য জ্ঞান করে, উপস্থিত ক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে তাহার সকলেরই যোজনা হইয়াছিল। কুল মর্য্যাদায় বল, ধন সম্পদ মান সম্ভ্রমে বল, মহেশ্বর ঘোষ গ্রামে কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন। তার উপর একমাত্র পুত্রের বধু—শ্বশুর শাশুড়ীর সাধ আহ্লাদের এমন সামগ্রী আর কি হইতে পারে? চিরজীবন শোক দুঃখে কাটিলেও এমন স্থলে মানুষের মনে স্বতঃই আশা ভরসার সঞ্চার হয়—নিস্তারিণীরও হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহের অষ্টাহ গত হইতে না হইতেই বুঝাগেল সেটা তাঁহার ভ্রম মাত্র। অর্থ-পিশাচ ঘোষ মহাশয় দিনের পর দিন স্বমূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিতে লাগিলেন, নূতন জমীদারী খরিদ করিলে তাহার হাট হদ্দ একবার দেখিয়া লওয়ার যেমন রীতি, সেই ভাবে তিনি পুত্রের শ্বশুরালয় সংক্রান্ত ব্যাপার সকল দেখিবার মনস্থ করিলেন। মালিক কিছু নিজে জমীদারী দেখেন না,—বরাং মুৎসুদ্দি নায়েব প্রভৃতির উপর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মালিক স্বয়ং নায়েব মহাশয়, অতএব মণি-কাঞ্চন যোগ হইয়াছিল।

বেচারী ফনু সেখকে যে তিনি একদিন শাসাইয়াছিলেন—"রোস্ আগে বিয়ে হোক্"—বিবাহ শেষ হইয়া গেলে সেই কথাটা কার্য্যে পরিণত করিতে নায়েব মহাশয় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অতএব পুরন্দর "যোড়ে" আসিয়া শ্বশুরালয়ে থাকিতে থাকিতে তিনি একদিন প্রাতঃকালে তাঁহার চিরসহচর—তিনটী পদার্থ—গোলপাতার ছাতা, বাঁশের লাঠি এবং উদর—এই তিন পদার্থ সহায় করিয়া বৈবাহিক গৃহে পদার্পণ করিলেন।

পুরন্দর তখন তাহার পাঠশালার সহচরদের সঙ্গে খেলায় মত্ত ছিল। ভিন্ন গ্রামে শ্বশুরালয় হইলে জামাতাকে যে ছদ্ম বেশের নিগড় পরিতে হয়, স্বগ্রামে তাহা বড় করিতে হয় না। প্রথম দিন পুরনের বড় লজ্জা লজ্জা করিয়াছিল, মুখ তুলিয়া এমন কি কালীর সঙ্গেও কথা কহিতে পারে নাই, কিন্তু ভোলা এবং মধো আসিয়া তাহার সকল সঙ্কোচ দূর করিয়া দিল। পুরন্দরের সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহিয়াই তাহারা প্রথম একদফা ছুটাছুটি করিল, তাহার পর বাটীর সম্মুখস্থ বকুল গাছে তিন লাফে

উঠিয়া বসিল। মধো বকুলের ফুল এবং ভোলা ফল সংগ্রহে মন দিল। পুরন্দর এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল, নিকটে কেহ আসিতেছে কিনা! গাছে উঠিবার দুর্জ্জয় লোভ মহাকষ্টে তাহাকে সম্বরণ করিতে হইল। তখন দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া গাছের নীচে বসিয়া ফুল কুড়াইতে লাগিল, এবং হাতে পায়ে ব্যস্ত, কখন বা ভোলার কোঁচড় হইতে অপহৃত বকুল ফল চর্ব্বণে রত মধো যে মহানন্দে গুরু মহাশয়ের গত কয় দিনের প্রহার এবং তাম্রকূট সেবন ও নিদ্রার গল্প করিতেছিল, একমনে তাহাই শুনিতেছিল।

এমন সময়ে গজ কচ্ছপ-গতি পিতৃদেবের চিরপরিচিত চলিষ্ণু বংশছত্র পুত্রের দৃষ্টি পথে পড়িল। অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় এবং তিন লাফে অন্দরে প্রবেশ পূর্ব্বক শয়ন গৃহে অর্গল বদ্ধ করিয়া শয়ন। শ্বশ্রূঠাকুরাণী তখন সেই গৃহের দাওয়ায় বসিয়া কুটনো কুটিতেছিলেন, কনে সইয়ের সঙ্গে গৃহান্তরে পুতুল খেলায় বরের স্মৃতি নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। অতএব হঠাৎ পুরন্দরের সেইভাবে আবির্ভাবে শাশুড়ীর মাথায় চকিতে কাপড় উঠিল, কনের খেলাধূলো ভাঙ্গিয়া গেল, আর কালীর সর্ব্বাঙ্গে হাসি ফুটিয়া উঠিল এবং সে বাহিরে ছুটিয়া দেখিতে গেল ব্যাপার খানা কি? পরে বৈবাহিক মহাশয়ের শুভাগমন বার্ত্তা শুনিয়া কনের মা তাড়াতাড়ি আসনাদির বন্দোবস্ত করিতে উঠিলেন।

একটু পরে "পুরো রে ও পুরো" ডাকিতে ডাকিতে ঘোষ মহাশয় বৈবাহিক-গৃহে প্রবেশ করিলেন। আসন বিছাইয়া বেহাইন ঠাকুরাণী গৃহ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। শ্বশুরেব নাম শুনিবামাত্র তাহার অনেক আগে ফুল লুকাইয়াছিল, সুতরাং নায়েব মহাশয়কে আদর অভ্যর্থনা করিবার একা কালী আসনের নিকট রহিল।

ঘোষ মহাশয়ের এটা ভাল লাগিল না। তিনি আসিয়াছেন নানা কাজের কথা কহিতে, অপর লোকে শুনিবে—হইলই বা বালিকা—ইহা হইতেই পারে না। কাজেই কালীকে কোন রকমে বিদায় করিতে তিনি ব্যস্ত হইলেন।

"আরে কেও সার্ব্বভৌম ভায়ার মেয়ে নয়? তুই এখানে কেন গো! ডাগর মেয়ে, বাপের একটু ভাবনাও নেই। রাত দিন আহ্নিক পূজো আর পুঁথির রাশ নিয়েই আছেন। কারো পরামর্শ ত নেবেন না! আমি এক দিন এক সম্বন্ধের কথা বলে মহা মুস্কিলে পড়েছিলাম আর কি! ভায়া একেবারে অগ্নিশর্ম্মা—বলেন, "হাঁ আমি কি কন্যার বিবাহ দিয়ে পণ গ্রহণ করব নাকি?" দোষটা কি? চাল কলার চেয়ে সে ভাল—এমন সুযোগ কি ছাড়তে আছে?" লজ্জায় কালী সইয়ের কাছে গিয়া লুকাইল, মহেশ্বর তাহা লক্ষ্য করিলেন না। তাঁহার মনে হইল আপদ বালাই মেয়েটা তবে পলাইয়াছে।

তখন ঝোঁকটা গিয়া পড়িল ছেলে পুরন্দরের উপর। তাহাকে ছুটিয়া পলাইতে দেখিয়াছিলেন, কাজেই বুঝিয়াছিলেন বাড়ীর ভিতর কোথাও লুকাইয়া আছে। পিতার

তীব্র স্বরে পুরন বিহ্বল হইয়া উঠিল এবং দ্বার খুলিয়া নিতান্ত ভাল মানুষের মত তাঁহার কাছে মাথা গুঁজিয়া বসিল।

পিতা। "এখানে বস্‌লি কেন বোকা ছেলেটা কোথাকার? দেখ্ তোর শাশুড়ী ঘরে আছেন কিনা।"

পুরন্দর উঠিয়া দেখিল এবং বিষণ্ণ নীরবে সম্মতি-সূচক মাথা নাড়িল।

পিতা। "তবে তুই ওই চৌকাঠে বোস্—আমি বেহাইনকে যে কথা বল্‌ব, তুই তার জবাব শুনে আমায় বল্‌বি— বুঝ্‌লি?"

ভিতর হইতে একখানা আসন চৌকাঠে আসিয়া পড়িল, কিন্তু জামাতার তাহাতে উপবেশন করিবার সাহস বা প্রবৃত্তি হইল না। পুরনের মনে হইতেছিল কোন রকমে বাপের সম্মুখ হইতে পলাইবার উপায় হইতে পারে কিনা? পিতার প্রসাদে শ্বশুরালয় সে মুহূর্ত্তে তাহার পক্ষে নিতান্ত আধুনিক অর্থ-ব্যঞ্জক হইয়া উঠিয়াছিল!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ঘোষ মহাশয় একটী ছোট রকমের ভূমিকা করিয়া কথা পাড়িলেন। তিনি যে এখন নিতান্ত আপনার হইয়াছেন এবং সকল বিষয়ে বেহাইন ঠাকুরাণীর যে কর্ত্তব্য তাঁহার পরামর্শ লওয়া—বৈষয়িক কোন কথা গোপন করা আর যে বিহিত হয় না।—ইহাই তাঁহার ইঙ্গিত। কতক উদ্বেগ কতক বা কৌতূহল আসিয়া নিস্তারিণীর হৃদয় চঞ্চল করিয়া তুলিল। বৈবাহিক বলিয়া চলিলেন—

"কতকগুলো ভাল জমী শুন্‌চি নাকি একটা মোছনমানকে ভাগে দেওয়া হয়েচে? কি তার নামটা—মরুক্—ফনো বুঝি—হাঁ ফনোই বটে। তা এত লোক থাক্‌তে মোছনমানকে জমী দেওয়া কেন? সে ত সবই ফাঁকি দেয়, নইলে ২।১ বছরের ভেতর অমন গুছিয়ে উঠ্‌লো কেমন করে? ব্যাটার বাড়ীতে আঁব কাঁটালের বাগান, ৩।৪ টে মড়াই। তা আমি বলি কি, ওকে ছাড়িয়ে দিয়ে যদিস্যাত কোন বাধা না থাকে, আমার চাকর দুঃখীরামের ভাই নসীরামকে জমীগুলো দেওয়া হোক্। লোকটা আমার আশ্রিত, আর ডাক্‌তে হাঁক্‌তেও পাওয়া যাবে।"

নিস্তারিণী বিপদে পড়িলেন। তিনি ভাবিয়া পাইতেছিলেন না ফনুর অপরাধটা কি? আঁব কাঁঠালের বাগানের নাম শুনিয়া একবার সেই ইঁচড়ের কথাটা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু বৈবাহিক মহাশয় সেই তুচ্ছ ব্যাপার ধরিয়া গরিবের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, তিনি এরূপ নীচতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। প্রথমে তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, পরে উত্তরের জন্য নিতান্ত পীড়াপীড়ি হইলে জামাতাকে দিয়া বলাইলেন যে ফনু অনেক দিনের আশ্রিত লোক, খুব বিশ্বাসী।

শাশুড়ী এত আস্তে কথা কহিতেছিলেন যে বালক জামাতাও তাহা বুঝিতে পারে

নাই, বিশেষ ভোলা আর মধোর সঙ্গে বকুল তলায় খেলার কথা ভাবিয়া সে তখন অন্যমনস্ক হইতেছিল। অতএব পিতার কাছে ধমকের উপর ধমক খাইল। নিস্তারিণী জামাতার দুর্দ্দশা দেখিয়া একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন এবং উত্তর পুনরুক্ত করিলেন।

মহেশ্বর ভাবেন নাই যে বেহাইন তাঁহার প্রথম অনুরোধ এই ভাবে উপেক্ষা করিতে সাহস করিবেন। এবার একটু জোরের সহিত বলিলেন,

"তা যাই হোক্, জমীগুলো তার কাছ থেকে ছাড়াতে হবে!"

নি। "সেটা ভাল হয় না। আশ্রিত লোক, কত আশা করে আছে। কাল বিয়ে হোল, আজ তার রুজি মার্‌লে গরিব মর্ম্মে মর্‌বে। আর সে অনেক দিনের আশ্রিত, যখন তখন ডাকিয়ে এনে ফাই ফরমাইস্ করতে পারি। নূতন লোক দিয়ে তা হবেনা, আমি তার সাম্‌নে বেরুব কেমন করে?"

ইহার উপর আর কথা চলে না। বেহাইনের কাছে এতটা দৃঢ়তার প্রত্যাশা মহেশ্বর করেন নাই, গৃহিণীকেই তিনি স্ত্রীজাতির আদর্শ মনে করিতেন, সুতরাং হটিয়া কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন। কিন্তু আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে যেমন পিত্ত পড়িয়া যায়, বৈষয়িকতার একটা সীমা আছে যাহার বাহিরে মনুষ্যত্বের পিত্তও তেমনি লোপ হইয়া আসে। মহেশ্বর হটিলেন, কিন্তু তবু ছাড়িলেন না।

"আচ্ছা, তা বেয়ান না শোনেন, থাকুক মোছনমান ব্যাটারই ভাগে জমীগুলো! কিন্তু দেখে শোনেই বা কে? আমিত দু দিন পাঁচ দিন পরে পরগণায় চলে যাব। হাঁ, আর একটা কথা বল্‌তে চাই। আমার মনাব সরকারে একটা জমাদারী বিক্রী হবে, আমার ইচ্ছা বেনামী করে সেটা পুরনের জন্যে খরিদ করি। কিন্তু অনেক টাকার দরকার,—কোথায় পাব? বেহাই মশায় শুন্‌তে পাই অনেক টাকা উপার্জ্জন করেছিলেন। কিছু টাকা কর্জ্জ পেতে পারি কি না—বিষয় আপনকার কন্যা জামাতারই থাকবে বেয়ান!"

নিস্তারিণী সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। স্বামীর অন্তিম অনুরোধ মনে পড়িয়া গেল। গুপ্ত ধনের কথা কাহারও কাছে কখন তিনি ব্যক্ত করেন নাই, বিশেষ বিষয় খরিদের পরামর্শ স্বামী চিরকাল ঘৃণা করিয়া গিয়াছেন। বেহাই কথাটা আর না তোলেন এই ভরসায় নিস্তারিণী প্রথমে উহা একেবারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। ব্যাধের জালে পড়িয়া হরিণীও বুঝি এইরূপে পলায়নের চেষ্টা করে।

বৈবাহিক মহাশয় হাসিলেন—সে হাস্য পূর্ণবিষয়ীর শুষ্ক হাস্য, অবিশ্বাস এবং নৈরাশ্য তাহার প্রাণ। মুহূর্ত্তে তিনি একটা মতলব আঁটিয়া লইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন,

"আমি নিজের জন্যে কিছু বল্‌চি নে বেয়ান, আপনকার কন্যা জামাতার ভবিষ্যতে

যাতে ভাল হয় তাই আমার উদ্দিশ্যো! আপনকাদের কৃপায় এক কলমে আমি যা করেছি, আমার তাই খায় কে? শুনচি নাকি নবাবের সঙ্গে কোথাকার পাদশার শিগ্‌গির একটা মস্ত লড়াই হবে। সহরের এত কাছে থেকে টাকা পুঁতে রাখ্‌লে সে টাকা থাকা ভার—সিপাহীরা সব লুটে নেবে। তার অপিক্ষা যদিস্যাৎ বিষয় আশয় করা হয় ত মাটী কেউ নিতে পার্‌বে না।”

নিস্তারিণী দেখিলেন উত্তর দেওয়া অনর্থক। দিলে কথাবার্ত্তা ক্রমে কষ্টকর হইয়া উঠিবে। তথাপি চক্ষুলজ্জা এড়াইতে না পারিয়া বলিলেন, “যা কিছু সামান্য তাঁর আছে সবই কন্যা জামাতার।” নায়েব মহাশয় বেয়ানকে চিনিয়াও ভাবিলেন সবুরে মেওয়া ফলে। তিনি উঠিলেন। পথে যাইতে নানা ফন্দী তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল।

ক্রমশঃ

মানবীকরণই বটে।

দ্বিজেন্দ্র বাবু যে প্রকৃতিকে বৃক্ষোৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণ বলিতেছেন তাহা দ্রব্যগুণ না তদতিরিক্ত কোন পদার্থ?

[প্রকৃতিকে দ্রব্য-গুণ বলিলে প্রকৃতির পক্ষচ্ছেদ করিয়া তাহাকে পিঞ্জরবদ্ধ করা হয়। বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণকেই দ্রব্য-গুণ কহে। সেই সকল বিশেষ-বিশেষ গুণ—বিশেষ-বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি, তাহাতে আর ভুল নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া প্রকৃতি-শব্দে বিশেষ কোন-একটি বস্তুর বিশেষ কোন-একটি প্রকৃতি বুঝিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে তাহাতে প্রকৃতির কিছুই বোঝা হয় না। একজন বঙ্গভাষানভিজ্ঞ বিদেশী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, উদ্ভিদ্‌ শব্দের অর্থ কি? তাহার উত্তরে আমি যদি তাহাকে এক গাছি তৃণ আনিয়া দেখাই, ও বলি যে, ইহাই উদ্ভিদ্‌; তবে সে ব্যক্তি উদ্ভিদ্‌ শব্দের অর্থ তৃণ বুঝিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে। কিন্তু তাহা হইলে তো চলিবে না! তৃণ শুধু কেবল উদ্ভিদের দৃষ্টান্ত পদবীতেই স্থান পাইতে পারে—তা ভিন্ন, তাহা সমগ্র উদ্ভিদের পদারূঢ় হইতে পারে না। যেখানে সাধারণতঃ সকল জগতের মূল-স্থিত প্রকৃতির কথা হইতেছে—সেখানে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি (যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি) শুদ্ধ কেবল মূল-বিষয়টির দৃষ্টান্ত-স্থলেই কাজে লাগিতে পারে—তা ভিন্ন—তাহা মূল-বিষয়টির স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। শ্রী দ্বি]

যদি তাহা দ্রব্যগুণই হয়, তবে তাহা জড়াধার হইতে পৃথক্ হইতে পারে কি না ?

[দ্রব্য-গুণ—অর্থাৎ বিশেষ কোন-একটি দ্রব্যের বিশেষ কোন-একটি গুণ—যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি, বীজের বৃক্ষোৎ-পাদিকা শক্তি, ইত্যাদি ; এরূপ দ্রব্যগুণ অবশ্য আধার-বস্তু হইতে পৃথক্কৃত হইতে পারে না। এখন কথা এই যে, অগ্নির দাহিকা-শক্তি অগ্নিরই প্রকৃতি—কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা কিছু আর সর্ব্ব-সাধারণতঃ সকল বস্তুর প্রকৃতি নহে—জলের প্রকৃতি নহে। প্রকৃতি শুধু কেবল অগ্নির অভ্যন্তরে দাহিকা-শক্তিরূপে নহে—কিন্তু সর্ব্ব জগতের অভ্যন্তরেই নানা-রূপে বিচেষ্টিত হই-তেছে। অগ্নির দাহিকা-শক্তি—বীজের বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি—এইরূপ যত প্রকার বিশেষ বিশেষ দ্রব্যগুণ আছে, সমস্তই একই প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ পরিণাম। উদ্ভিদ্-প্রকৃতি বলিতে যেমন, তৃণ লতা বৃক্ষ প্রভৃতি সাধারণতঃ সকল উদ্ভিদেরই প্রকৃতি বুঝায় ; সেইরূপ চরাচর-প্রকৃতি বলিতে সাধারণত সকল বস্তুরই প্রকৃতি বুঝায়। যে এক সর্ব্ব-সাধারণ প্রকৃতি সকল বস্তুর অভ্যন্তরেই বিচেষ্টিত হইতেছে, আর, বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ দ্রব্য-গুণ যাহার বিশেষ বিশেষ পরিণাম মাত্র—তাহাই মুখ্যরূপে প্রকৃতি-শব্দের বাচ্য। এক মূল-প্রকৃতি হইতে কেমন করিয়া বহুধা বিচিত্র প্রকৃতি (অথবা যাহা একই কথা—নানা বিধ দ্রব্য-গুণ) কাল ক্রমে পরিস্ফুট হয়, বর্ত্তমান অব্দের নবাবিষ্কৃত ক্রমাভিব্যক্তি-বাদ Evolution Theory তাহার প্রণালী প্রদর্শনে সাধ্যমতে ত্রুটি করিতেছে না।

"প্রকৃতি" এই শব্দটিতেই প্রকৃতির অর্থ দেদীপ্যমান। প্রকৃতি = প্র + কৃতি। কৃতি কি না ক্রিয়া। প্রকৃতি কিনা pro কৃতি—বহিঃপ্রসারিত ক্রিয়া, কার্য্যোৎপাদিকা ক্রিয়া। ক্রিয়ামাত্রই শক্তির অভিব্যক্তি। যে শক্তির কার্য্য-কারিতায় জগতের ঘটনা-সকল সংঘটিত হয়, দ্রব্য গুণ-সকল স্ব স্ব ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়, তাহাই প্রকৃতি-শব্দের বাচ্য। কিন্তু জগতের ঘটনা-মাত্রেতেই দুইরূপ শক্তির সমবেত কার্য্য-কারিতা দৃষ্টি-গোচর হয় ; (১) করণ শক্তি এবং (২) হওন-শক্তি। দহন-কার্য্যে করণ-শক্তি কি ? না দগ্ধ করণের শক্তি—যাহা অগ্নিতে আছে ; হওন-শক্তি কি ? না দগ্ধ হওনের শক্তি—যাহা কাষ্ঠাদিতে আছে ; এ দুয়ের সমবেত কার্য্যকারিতা ব্যতিরেকে দহন-কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। দগ্ধ করিবার শক্তি অগ্নিতে আছে—কিন্তু দগ্ধ হইবার শক্তি ভস্মেতে নাই—এরূপ স্থলে দহন-কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। আবার, দগ্ধ হইবার শক্তি কাষ্ঠেতে আছে কিন্তু দহন করিবার শক্তি জলেতে নাই ; এরূপ স্থলেও দহন-কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। আর একটি উদাহরণ ;— উপযুক্ত জল বায়ু মৃত্তিকাকে বৃক্ষে পরিণত করিবার শক্তি বীজেতে আছে—এবং বৃক্ষরূপে পরিণত হইবার শক্তি জল-বায়ু মৃত্তিকা প্রভৃতি সামগ্রী সকলেতে আছে ; দুয়ের সমবেত কার্য্যকারিতা ব্যতিরেকে বৃক্ষোৎপত্তি সম্ভবে না। মরু-ভূমিতে খুব

সারবান্ বীজ নিক্ষিপ্ত হইলেও তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না; আর খুব উর্ব্বরা ভূমিতে দগ্ধবীজ নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা হইতেও বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, দহন-কার্য্যের সংসাধক শক্তি দুই ভাগে বিভক্ত—(১) দগ্ধ করিবার শক্তি এবং (২) দগ্ধ হইবার শক্তি; আর সে দুই শক্তি দুই বিভিন্ন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তিতেছে—দাহিকা-শক্তির আধার-বস্তু—অগ্নি, দাহ্যতা-গুণের আধার-বস্তু—কাষ্ঠ। অতএব, যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, দহন-কার্য্যের এক মাত্র কারণ কি? তবে তুমি বলিতে পার না যে, অগ্নিই দহন কার্য্যের একমাত্র কারণ; কেননা, দহন-কার্য্যের জন্য অগ্নি যেমন আবশ্যক—দাহ্য বস্তুও তেমনি আবশ্যক; সুতরাং অগ্নি তাহার একমাত্র কারণ নহে। এখন বক্তব্য এই যে, কোনও দ্রব্য-গুণই কোন কার্য্যের একমাত্র কারণ হইতে পারে না;—বিষের একটি দ্রব্য-গুণ এই যে, তাহা প্রাণ সংহার করে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিষ প্রাণ-সংহারের একমাত্র কারণ হইতে পারে না—শরীর-বিশেষে বিষও অমৃতের কার্য্য করে; "বিষস্য বিষমৌষধং।" তবেই হই-তেছে যে, শারীরিক প্রকৃতির সহায়তা-ব্যতিরেকে কেবল-মাত্র বিষ প্রাণ-সংহার-কার্য্যে সমর্থ নহে। অতএব প্রকৃতিকে যদি জগতের সমস্ত কার্য্যের এক মাত্র কারণ বলিয়া ধরা যায়, তবে দাঁড়ায় যে, কোনও দ্রব্য-গুণই প্রকৃতি শব্দের বাচ্য নহে; কেননা, কোনও দ্রব্য-গুণই কোনও কার্য্যের একমাত্র কারণ নহে। এরূপ সত্ত্বেও, সকলেই এ কথা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, একমাত্র প্রকৃতি জগতের সকল ঘটনার অভ্যন্তরেই কার্য্য করিতেছে—সুতরাং দহন-কার্য্যের অভ্যন্তরেও তাহা কার্য্য করিতেছে। দহন-কার্য্যের একমাত্র সংসাধক শক্তি যদি কিছু থাকে, তবে তাহা প্রকৃতি। দহন-কার্য্যের একমাত্র সংসাধক শক্তি আছে কি না—সে কথা পরে হইবে; এখন শুধু "যদি থাকে" তবে তাহা অগ্নির দাহিকা-শক্তিও নহে—কাষ্ঠের দাহ্যতা-গুণও নহে—কিন্তু তৃতীয় আর-একটা কিছু, এই বিষয়টি ইঙ্গিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। দহন-কার্য্যের মধ্যে দ্রব্য-গুণ যত কিছু আছে, তাহাদের প্রত্যেকেই বিশেষ কোন-না-কোন একটি দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান আছে; দহন করিবার শক্তি অগ্নিকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান আছে—দগ্ধ হইবার শক্তি কাষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান আছে; আর, ঐ যে-সমস্ত শক্তি বিশেষ-বিশেষ দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তিতেছে—তাহাদের কোনটিই দহন-কার্য্যের একমাত্র নিঃসঙ্গ কারণ নহে—তাহা অন্যান্য দ্রব্য-গুণের সঙ্গ-সাপেক্ষ; অগ্নির দাহিকা-শক্তি কাষ্ঠের দাহ্যতা-গুণের সঙ্গ-সাপেক্ষ। কাজেই বলিতে হয় যে, যে কোন গুণ বিশেষ-কোন-একটি দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান আছে—তাহা কোনও কার্য্যেরই একমাত্র নিঃসঙ্গ কারণ নহে,—তাই উপরি-উক্ত সংজ্ঞা-অনুসারে তাহা প্রকৃতি-শব্দের বাচ্য নহে; কেননা, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কার্য্য-সকলের একমাত্র গোড়ার কারণই

প্রকৃতি শব্দের বাচ্য। অতএব স্থির হইল যে, জগৎকার্য্যের একমাত্র মূল-ক্রিয়া যদি কিছু থাকে, আর, তাহার যদি নাম দেওয়া যায়—প্রকৃতি, তবে আপনা হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে, তাহা বিশেষ কোন-একটি দ্রব্যের দ্রব্য-গুণ নহে—সুতরাং তাহা বিশেষ কোন-একটি দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান নাই; তবে কি? না যেখানে যত দ্রব্য-গুণ আছে—সমস্তেরই তাহা মূলীভূত শক্তি। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে—দ্রব্য-গুণ বলিতে সচরাচর যে অর্থ বুঝায়, প্রভাত বাবু সেই অর্থেই "দ্রব্য-গুণ" এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, আমরাও এখানে তাহাই করিলাম; সেই অর্থেই আমরা বলি যে, প্রকৃতি বিশেষ কোন একটি দ্রব্যকে (অর্থাৎ কোন জড় পদার্থকে) আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান নাই—কিন্তু পাঠক যেন এরূপ মনে না করেন যে, আমাদের মতে জগতের মূল-শক্তি (প্রকৃতি) একেবারেই নিরাশ্রয়—কেননা আমরা বলি যে, ঐশীশক্তিই প্রকৃতি; কাজেই ঈশ্বরের আশ্রয় ব্যতিরেকে তাহা থাকিতে পারে না; তা শুধু নয়—ঈশ্বরকেই আমরা মূল-কারণ বলি, আর, প্রকৃতিকে আমরা সাক্ষাৎ কারণ বলি। আমরা বলি যে, জগতের মূল আত্মা যিনি পরমাত্মা, তিনিই জগতের মূল কারণ; আর, জগতের মূল শক্তি যে প্রকৃতি (যাহা ঈশ্বরেরই ঐশী-শক্তি) তাহাই জগতের সাক্ষাৎ কারণ। কেন আমরা এরূপ বলি—তাহা পরে দেখা যাইবে। জগৎ-কার্য্যের একমাত্র মূল-শক্তি যদি থাকে, তবে তাহা দ্রব্য-গুণ নহে—উপরে এইটিই কেবল প্রমাণ করা হইল; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহা যদি দ্রব্য-গুণ না হয় তবে তাহা কি? আর তাহা যে আছে, তাহারই বা প্রমাণ কি? শ্রী দ্বি]

প্রকৃতি যদি জড়াধার হইতে পৃথক্ হইতে পারে, তবে দ্বিজেন্দ্র বাবু এই তত্ত্ব জগতের কোনো ঘটনা হইতেই উপলব্ধি করিয়াছেন? না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই প্রকাশ করিতেছেন? আর যদি প্রকৃতি দ্রব্য-গুণের অতিরিক্ত কিছু হয়, তবে তাহার পরিচায়ক লক্ষণ কি?

[আমরা ইতি পূর্ব্বে প্রমাণ করিলাম যে, প্রকৃতি (অর্থাৎ জগতের একমাত্র মূল-শক্তি) যদি থাকে, তবে তাহা দ্রব্য-গুণ নহে—সুতরাং তাহা জড়াধারকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করে না; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, (১) সেরূপ শক্তি যে আছে তাহার প্রমাণ কি? (২) আর, তাহার পরিচায়ক লক্ষণই বা কি?

প্রথম প্রশ্ন এই যে, প্রকৃতি যে আছে তাহার প্রমাণ কি? প্রভাত বাবু তাই বলিতেছেন যে, "দ্বিজেন্দ্র বাবু এই তত্ত্ব জগতের কোনো ঘটনা হইতেই উপলব্ধি করিয়াছেন? না তাহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই প্রকাশ করিতেছেন?" এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, জ্ঞানের মূল-তত্ত্ব মাত্রই স্বতঃসিদ্ধ; যেমন, ঘটনা-মাত্রেরই কারণ আছে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু যখন মূল-তত্ত্ব হইতে নীচে নাবিয়া জিজ্ঞাসা করা

যায় যে, এই বিশেষ ঘটনাটির বিশেষ কারণ কিরূপ? আর তাহার উত্তরে যখন আমরা বলি যে, "এই বিশেষ ঘটনাটির বিশেষ কারণ এইএই," তখন পরীক্ষাই তাহার প্রমাণ। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বিশেষ বিশেষ ঘটনার পরীক্ষা দ্বারা এই-রূপ স্থির করিয়াছেন যে, ভৌতিক অভিব্যক্তি সকলের (phenomena) মূলান্বেষণ করিতে গেলে, "অনেকের" মধ্য হইতে মূল-স্থিত "এক" উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; তাহার সাক্ষী—লা প্লাসের আভ্রিক সিদ্ধান্ত (Nebular theory) অনুসারে, সৌর জগৎ এক মাত্র অভ্রাকার পদার্থ ছিল; বর্ত্তমান আনবিক সিদ্ধান্ত (molecular theory) অনু-সারে, উত্তাপ আলোক প্রভৃতি অভিব্যক্তি সকল ভিন্ন ভিন্ন বস্তু নহে কিন্তু একই আনবিক গতির ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম। কিন্তু আর-এক দিকে দেখা যায় যে, সমস্ত জগৎ যে একই জগৎ—ও জগতের বিভিন্ন অভিব্যক্তি যে, একই মূল শক্তির ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম, এ কথাটির গোড়া'র বনিয়াদ—স্বতঃসিদ্ধ সত্য; তাহা এইরূপ;—জগতের বস্তু সকল যতই বহুধা বিচিত্র হউক্ না কেন, কিন্তু প্রকাশ পাইবার সময় তাহা একই জ্ঞানের নিকটে প্রকাশ পায়; জ্ঞানের নিকটে প্রকাশ-যোগ্যতা সমস্ত বস্তু-রই সাধারণ ধর্ম্ম, আর, সেই একের নিকটে প্রকাশ-যোগ্যতাই জগতের মৌলিক একত্বের পরিচায়ক। প্রভাত বাবু হয় তো আমাদের কথার অর্থ না বুঝিয়া বলিবেন যে, দূরবীক্ষণের অগম্য এমন অনেক অনেক নক্ষত্র থাকিতে পারে—যাহা আমা-দের জ্ঞানে অপ্রকাশ, আর, কখনও যে তাহা আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হইবে তাহার সম্ভাবনাও নাই—তবে আর এ কথা কোথায় রহিল যে, জ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্যতা সমস্ত জগতের সাধারণ ধর্ম্ম? ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, "জ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্যতা" স্বতন্ত্র, আর, জ্ঞানে প্রকাশ পাওয়া স্বতন্ত্র; এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা জ্ঞানে প্রকাশ যোগ্য—অথচ জ্ঞানে প্রকাশ পায় নাই। অনেকা-নেক নক্ষত্র পূর্ব্বে অপ্রকাশ ছিল—বিশিষ্টরূপ তেজালো দূরবীণের সাহায্যে তাহা অধুনাতন কালে প্রকাশিত হইয়াছে,—এমত স্থলে আমরা বলিতে পারি না যে পূর্ব্বে তাহা প্রকাশ-যোগ্য ছিল না; এই পর্য্যন্তই কেবল বলিতে পারি যে, পূর্ব্বে তাহা প্রকাশিত হয় নাই। কাহাকে আমরা বলি প্রকাশ-যোগ্য, আর কাহাকেই বা আমরা বলি প্রকাশের অযোগ্য, নিম্নে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিই;—গোল-চতুষ্কোণ শুধু যে কেবল জ্ঞানে প্রকাশিত হয় না তাহা নহে—মূলেই তাহা জ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্য নহে; তেমনি, কারণ-শূন্য ঘটনা, সীমাবদ্ধ মহাকাশ, দুই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, একই প্রত্যক্ষ-ক্রিয়ার অনুভব-কর্ত্তা এবং স্মরণকর্ত্তা দুই বিভিন্ন ব্যক্তি; এই সকল বিষয় জ্ঞানে তো প্রকাশ পায়ই না—তা ছাড়া ও-সকল বিষয় মূলেই জ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্য নহে। কেননা, ও-সকল বিষয় জ্ঞানের মূল-নিয়মের বিরোধী। পক্ষান্তরে, অগাধ সমুদ্র গর্ভে হয় তো এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা আজ-পর্য্যন্ত কোনও

মনুষ্যেরই জ্ঞানে প্রকাশ পায় নাই; কিন্তু তাহা জ্ঞানের মূল-নিয়মের বিরোধী নহে—এই জন্য আমরা বলি যে, তাহা জ্ঞানে প্রকাশ পা'ক্ বা না পা'ক্—তাহা জ্ঞানে প্রকাশ-যোগ্য তাহাতে আর ভুল নাই; তাহা গোল-চতুষ্কোণের ন্যায় প্রকাশের অযোগ্য নহে। জ্ঞানের একই মূল নিয়ম সমস্ত জগতেই খাটে—ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, সমস্ত জগৎ একই জগৎ। 'ঘটনা-মাত্রেরই কারণ আছে" এই তত্ত্বটি যদি কেবল পৃথিবীতেই খাটিত—সূর্য্য-লোকে না খাটিত—তবেই বলিতে পারিতাম যে, পৃথিবী যে জগতের অন্তর্গত—সূর্য্য-লোক সে জগতের অন্তর্গত নহে; কিন্তু জ্ঞানের ঐ মূল নিয়মটি যখন সর্ব্ব জগতেই সমান বলবৎ—তখন সমস্ত জগৎ যে একই জগৎ, একই মূল-শক্তির বিস্তীর্ণ ক্রীড়া ক্ষেত্র, ও একই মূল-নিয়মের অধীন, তাহাতে আর কাহারো সংশয় হইতে পারে না। অতএব দুইটি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব জগতের একত্বের প্রতিপাদক; সে দুইটি তত্ত্ব এই যে, (১) জ্ঞানের মূলস্থিত একত্ব; এবং (২) সেই একত্ব-সূত্রে সমস্ত জগতের বন্ধন-যোগ্যতা। যখনই নানাবিধ বিচিত্র গুণ আমাদের জ্ঞানের একত্ব-সূত্রে গ্রথিত হয়, তখনই আমরা সেই সকল গুণের মূলস্থিত বস্তুর একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করি; যখনই প্রভাত বাবুর প্রস্তাবটির আদ্যোপান্ত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমার জ্ঞানের একত্ব-সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে, তখনই আমার মনে এই বিশ্বাসটি উৎপন্ন হইয়াছে যে, সে ঐক্য-সূত্রটি প্রভাত বাবুর মনের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান ছিল। অতএব জ্ঞানের মূল-গত একত্বই জগতের একত্বের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। জগতের একত্ব স্বীকার করিলেই প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয় যে, সমস্ত জগৎ একই মূল-শক্তির অভিব্যক্তি। কেননা এরূপ যদি হয় যে, পৃথিবীর পরিবর্ত্তন-ঘটনা এক মূল-শক্তির অভিব্যক্তি ও চন্দ্র-লোকের পরিবর্ত্তন-ঘটনা আর-এক মূল-শক্তির অভিব্যক্তি, তাহা হইলে দাঁড়ায় যে, পৃথিবী এক জগতের বস্তু—চন্দ্র লোক আর-এক জগতের বস্তু। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানের মূল-গত একত্ব একটি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব—আর, এই স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বটিই জগতের একত্বের মুখ্য প্রমাণ। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জ্ঞানই অস্তিত্বের প্রমাণ; এক্ষণে দেখাইলাম যে, জ্ঞানের একত্বই জগতের একত্বের প্রমাণ; আর জগতের একত্ব হইতেই এইটি প্রতিপন্ন হয় যে, সমস্ত জগতের ঘটনা একই মূল-শক্তির অভিব্যক্তি। এই গেল, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান-মূলক প্রমাণ; তা ছাড়া—প্রকৃতির অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কিরূপ—অতঃপর তাহাই দেখা যাইতেছে।

"প্রকৃতি বৃক্ষোৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণ" এই যে একটি কথা, ইহার বৈজ্ঞানিক অর্থ কি—দেখা যা'ক্। ইহার বৈজ্ঞানিক অর্থ এই যে, যে এক মূল-শক্তি সাধারণতঃ সকল জগতের অভ্যন্তরে কার্য্য করে—তাহা প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরেই কার্য্য করে; যথা;—ইহা যদি সত্য হয় যে, ভারাকর্ষণ সমস্ত ভৌতিক জগতের অভ্যন্তরে কার্য্য

করে, তবে ইহা অকাট্য যে, তাল-ফল যখন বৃক্ষ-চ্যুত হইয়া ভূপতিত হয়, তখন সে ঘটনাটির সাক্ষাৎ কারণ ভারাকর্ষণ; যদি জিজ্ঞাসা কর যে, সকল ভৌতিক বস্তুই যে, ঐরূপ আকর্ষণের অধীন তাহার প্রমাণ কি? তবে তাহার উত্তর অতীব সংক্ষেপে এই যে, পরীক্ষা। ভূতল-স্থিত যে সে বস্তু—এবং আকাশ-স্থিত গ্রহ চন্দ্র—তাবতেরই ভৌতিক স্থিতি-গতি শুদ্ধ কেবল এক আকর্ষণ দ্বারাই প্রতিপাদিত হইতে পারে। যে প্রকার স্থিতি গতি আকর্ষণ-দ্বারা প্রতিপাদন-সাধ্য, সেই প্রকার স্থিতি গতি সর্ব্ব-ত্রই পরীক্ষাতে পাওয়া যায়—ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারাকর্ষণ সকল ভৌতিক জগতেরই সাধারণ কার্য্য-প্রবর্ত্তক; তাহা যখন হইল, তখন কাজেই মানিতে হয় যে, তাল-ফল যখন বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভূপতিত হয়, তখন তাহার সাক্ষাৎ কারণ ভারাকর্ষণ। অতএব তাল-ফলের ভূপতন সম্বন্ধে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, যে শক্তি দ্বারা সাধারণতঃ সমস্ত ভৌতিক জগতের স্থিতি-গতি নির্ব্বাহিত হয়, সেই শক্তি দ্বারাই তাল-ফল ভূপতিত হয়। এইরূপ, এক অদ্বিতীয় মূল শক্তি যাহা সাধা-রণতঃ সকল জগতের অভ্যন্তরে কার্য্য করে—এবং কাজে কাজেই প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে কার্য্য করে, বিজ্ঞানের পদবী অনুসরণ করিয়া তাহাকেই আমরা বলি—ভৌতিক জগতের প্রকৃতি। আমরা তাই বলি যে, আকর্ষণ বিকর্ষণ অথবা তাহারই প্রকারান্তর কেন্দ্রানুগ (centripetal) এবং কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) বিচেষ্টা—ইহাই প্রাণ-শূন্য ভৌতিক জগতের প্রকৃতি; এবং প্রাণ-শূন্য ভৌতিক রাজ্যে যেখানে যে-কোন প্রকার স্থিতি গতি সংঘটিত হয়—তাবতেরই তাহা সাক্ষাৎ কারণ। এই গেল ভৌতিক প্রকৃতি, তাহার পরে আসিতেছে জৈবিক প্রকৃতি। ভৌতিক প্রকৃতি, জৈবিক প্রকৃতি, মানসিক প্রকৃতি ইত্যাদি প্রকার নানাবিধ প্রকৃতির মূলে যে এক অদ্বিতীয় প্রকৃতি কার্য্যে বিচেষ্টিত হইতেছে—তাহাই সর্ব্ব-জগতের প্রকৃতি—তাহা সকলের শেষে আসিবে; ইহার পরেই আপাততঃ জৈবিক প্রকৃতি কিরূপ তাহাই দেখা যাইবে। শ্রীদ্বি]

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন।

অশ্রুজল।

জীবনের সুখ দুঃখের স্মৃতিতে মুখ লুকাইয়া একবারও কাঁদে নাই, সংসারে এরূপ লোক দেখা যায় না। সকল মনুষ্যেরই হৃদয়-তন্ত্রীতে এক একটী সুর কেমন লাগিয়া থাকে, সেই সুরে যে দিন আঘাত পড়ে সেই দিন সহসা যেন তাহার জীবনে কি পরি-

বর্ত্তন সাধিত হয়, তাহার হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে কি যেন তড়িৎ স্রোত ছুটিয়া বেড়ায়; আপনাকে কোথায় যেন ধরিতে পাইয়া সে একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে, তাহার নয়ন বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিতে থাকে। কিন্তু কোন্‌খানে কবে কি আঘাত লাগিয়া তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে, সে কি তাহা বুঝিতে পারে? সে আপনার মনে কাঁদিয়া যায়—না কাঁদিয়া সে থাকিতে পারে না—কিন্তু তাহার সেই হৃদয়মথিত অশ্রুবিন্দুতে কত দিনের হয়ত গভীর সুখ দুঃখের স্মৃতি আছে, সে তাহা জানেও না। প্রথম উচ্ছ্বাস যখন সংযত হইয়া আসে, তখন যদি সে ভাবিয়া দেখে, তবে হয়ত দেখিতে পায়, বিন্দুর মধ্যে হারাইয়া যাওয়া যায় এমন কিছু আছে—সেখানে সকলই শূন্য নহে।

অশ্রুজল ত আর কিছু নহে, হৃদয়ের নীরব ভাষা। হৃদয় উথলিয়া উঠিয়া আপনাতে আর থাকিতে পারে না, বাহির হইয়া পড়ে। সুতরাং অশ্রুবিন্দুর মধ্যে হৃদয় কতখানি লুকাইয়া আছে বলিতে হইবে না। কিন্তু হৃদয়ের এই অশ্রু-ভাষায় কি ভাব ব্যক্ত হয়? হৃদয়ের ভাষা ত আরও আছে। নৈরাশ্যের বিজন কাননে যখন আত্মহারা দীর্ঘ নিশ্বাস শিহরিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যায়, তখন সেও ত সেই হৃদয়ের ভাষা; আসন্ন নির্ব্বাণের বিবর্ণ অধরে যখন ক্ষীণ দীপ-শিখার মত একটী ম্লান অস্ফুট রজত-সৌন্দর্য্য বিকশিয়া উঠে, তখন সেওত সেই অবসন্ন হৃদয়ের নীরব ভাষা। তাই বলিয়া এ সব ভাষাই ত আর সম্পূর্ণ এক নহে—ভাবের সাদৃশ্য থাকিতে পারে মাত্র, কিন্তু এক ভাব হওয়ার সম্ভাবনা বিরল। অশ্রুজলের মর্ম্মের ভাব দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত অবশ্য এক নয়—বেশ একটু তফাৎ আছে।

নয়নে অশ্রু বহে কখন? অভিমান, অনুতাপ, হৃদয়ের সুগভীর বেদনাতেই ত অশ্রুজলের উচ্ছ্বাস। আনন্দেও অশ্রু ঝরে। সুখের শুধু অশ্রু নাই। দীর্ঘনিশ্বাসও হৃদয়ের বেদনা-উচ্ছ্বাস। কিন্তু দুয়ের মধ্যে ভাবের তারতম্য কি? দীর্ঘ নিশ্বাসে অতৃপ্তির ভাব কিছু বিশেষরূপে অভিব্যক্ত, অশ্রুজলে শান্তির ভাব। হৃদয় যখন ব্যথিত হইয়া আপনার মধ্যেই মিলাইয়া থাকিতে চায়, একা একা আপনার মধ্যে যখন সে অজ্ঞাতবাস করে, তখন তাহার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে দীর্ঘনিশ্বাস হাহাকার করিয়া মরে। দীর্ঘনিশ্বাসে হৃদয়ের ভয়ানক অন্তর্দাহ হয়, হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যায়। অশ্রুজলে এ দাবানল ভাব নাই, হৃদয় যেন গলিয়া গিয়া অশ্রুরূপে ঝরিয়া যায়; বেদনার অনেকটা উপশম হয়। দীর্ঘনিশ্বাসে অশ্রুজলের এ তৃপ্তি কোথায়? হৃদয় গুমরিয়া গুমরিয়া প্রতিদিন অবসন্ন হইয়া আসে, প্রাণে যে শেল বিঁধিয়া থাকে, তাহার জ্বালা আরও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সে শেল ঘুচে না। এই দীর্ঘনিশ্বাস যখন বুকে আসিয়া আট্‌কাইয়া যায়, সহসা আসিতে আসিতে আর আসিতে পারে না, তখন লোকে উন্মাদ-হাসি হাসিয়া উঠে। তখন সে এক দারুণ যন্ত্রণার অবস্থা—ভাবিতে কল্পনা শিহরিয়া উঠে। সহসা উথলিত উচ্ছ্বাস রুদ্ধ হইয়া গিয়া হৃদয় পাষাণের মত যেন

হিম হইয়া যায়। অশ্রু যখন ঝরিতে পায় না, হৃদয়েই শুকাইয়া আসে, তখন উন্মাদ হাসি দেখা দেয় না, অধরে হাসি মিলাইয়া যায়—ম্লান, ক্ষীণ, নিভ নিভ। সে যাতনায় শান্তি আছে—দীর্ঘ নিশ্বাসের রৌদ্র তপ্ত মরুভূমি-ভাব নাই।

অভিমান যখন চোখের জল মুছিতে থাকে, তখন নৈরাশ্যের মধ্যেও কিছু আশা আছে তখন অভিমানকে শান্ত করা যাইতে পারে, পুরাতন স্মৃতির উপর একটা আবরণ টানিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু অভিমানের চোখে যখন জল নাই, হৃদয়ে শুধু দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিয়া মিলাইয়া যায়, তখন তাহাকে শান্ত করা দায়, তখন অবস্থা বড় ভাল নয়। অনুতাপও চোখের জল ফেলিলে ভরসা হয়, পুরাতন স্মৃতি ভুলিয়া এইবারে সে বুঝি নব-উদ্যমে কাজে লাগে। আর অনুতাপের হৃদয়ে যখন কেবলই দীর্ঘ নিশ্বাস উথলিয়া উঠে, তখন স্মৃতির দংশনে দংশনে সে কাতর, তাহার অবস্থা মৃত্যুর সন্নিকট।

কিন্তু দুঃখের গভীরতা কোথায়—অশ্রু জলে কি দীর্ঘ নিশ্বাসে? এ কথা বলা কিছু কঠিন। দীর্ঘ নিশ্বাসের মধ্যেও যেমন অশ্রু জলের হৃদয়েও সেইরূপ দুঃখ লুকাইয়া থাকিতে পারে। স্বতন্ত্র ভাবের হৃদয়ে স্বতন্ত্র ভাবের উচ্ছ্বাস। তবে রুদ্ধ প্রবাহ রুদ্ধ উচ্ছ্বাস যন্ত্রণাই যে অধিক কষ্টদায়ক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যেখানে হৃদয় বড়ই গভীর সেখানে উচ্ছ্বাস ততই কম বলিয়া উপলব্ধি হয়, যন্ত্রণাও সেখানে অধিক বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু বাস্তবিক সেখানে যন্ত্রণার অবসান নাই। লঘু হৃদয় সহজেই ঝরিয়া যায়, যন্ত্রণা সেখানে আঁকড়িয়া থাকিতে পারে না। গভীর দুঃখের দীর্ঘ নিশ্বাসে বড়ই কষ্ট—চোখে জল আসিলে কষ্টের কতকটা উপশম হয়।

দীর্ঘনিশ্বাসে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে—হৃদয়ের মধ্যে এমন একটা উলট্ পালট্ হয় যে, কিছুই যেন ধরিয়া ছুঁইয়া পাওয়া যায় না। দীর্ঘ নিশ্বাস সান্ত্বনা পায় না। অশ্রু জলে কতকটা তবু সান্ত্বনা আছে—আপনাকে ব্যক্ত করিয়া তৃপ্তি হয়। সমদুঃখীর নিকট কাঁদিয়া অনেক সময় সুখ আছে, কিন্তু দীর্ঘ নিশ্বাস আপনার বাহিরে প্রায় বাহির হয় না। দীর্ঘ নিশ্বাসে জীবন যেন বাহির হইতে চায়, কিন্তু পারে না, প্রতি উদ্যমে আঘাত খাইয়া ফিরিয়া আসে।

অশ্রুজলে প্রেমের মধুর ভাবটী বড় পরিস্ফুট—নৈরাশ্য নয়, হাহাকার নয়, প্রেমের মধ্যে যে একটী পবিত্র সৌন্দর্য্য চিরবিকশিত সেই ভাবটী। সে ভাবে উগ্রভাবের একেবারে অভাব; তাহা বড়ই কোমল, মধুর, পবিত্র। তাহার তুলনায় দীর্ঘনিশ্বাসের কতকটা রৌদ্র ভাব বলা যাইতে পারে। অশ্রুজলের এই মধুর ভাবেই প্রধান সৌন্দর্য্য। এ ভাবে যতই ডুবা যায় ততই তাহার গভীরতা উপলব্ধি হয়। সমস্ত জগৎকে আপনার মধ্যে আনিয়া আমরা এই ভাবে ডুবিয়া যাই, যত ডুবি আপনাকে ততই ভুলিতে থাকি। এমন আত্মবিস্মৃতি আর কোথাও বুঝি নাই।

দীর্ঘনিশ্বাসে আপনাতে আর আপনি থাকি না, কিন্তু আপনাকে পাঁচ জনের মধ্যে হারাইয়া ফেলি না। দীর্ঘনিশ্বাসে আত্মহত্যা; অশ্রুজলে আত্মবিসর্জ্জন। দীর্ঘনিশ্বাসে হৃদয় ছারখার হইয়া গিয়াছে, প্রতীকারাশা বিরল; অশ্রুজলে হৃদয়ের মোহ ধুইয়া গিয়াছে, কিন্তু হৃদয় যায় নাই। অশ্রুজলে জগৎ ডুবিতে পারে; দীর্ঘনিশ্বাসের কাছে জগৎ ঘেঁসিতে পারে না—তাপ বড় প্রবল।

কিন্তু এ ছলনার সংসারে স্বর্গের অশ্রুজল ত প্রায় মিলে না। এখানে সকল বিষয়েই প্রতারণা আছে, হৃদয়ের ভাষায় ভাণ না থাকিবে কেন? হৃদয়হীন লোকে হৃদয় লইয়া উপহাস করে, হৃদয়ের বিরুদ্ধে সারি সারি শাণিত দন্ত ও নিষ্ঠুর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ খাড়া করিয়া দিয়া তামাসা দেখে। এই জন্য হৃদয়ের অশ্রুজল বিজন অরণ্যের শান্তিনিকেতনেই ঝরিয়া যায়। আর লোকালয়ে তার কণ্ঠ স্ফীত বদন চোখ মিটিমিটি করিয়া দু' এক ফোঁটা নীরস জল বাহির করে; তাহার চারিদিকে পর হৃদয়-ছিদ্রানুসন্ধিৎসুর আইন বদ্ধ বাহবাগুলি চাটুকারের মত ঘিরিয়া বসে, ইহাই তাহার অভিলাষ। কিন্তু যেমন লোকই হৌক, তাহার হৃদয়ে স্বর্গের অশ্রুজল একদিন না এক দিন দেখা দিবেই।

অশ্রুজলের মত আমাদের বন্ধু কেহ নাই। এই অসীম সংসার সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত যাহা উঠে অশ্রুজল। দীর্ঘনিশ্বাসের তীব্র দংশন সেখানে নাই—সেখানে কি সুগভীর স্নেহ, শান্তিময় প্রেম! রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে আমরা যখন আপনাকে ছাড়িয়া দি, তখন অশ্রুজল যদি দেখা না দেয়, তাহা হইলে প্রাণ কি বাঁচে? আমরা পদে পদে হৃদয়ে অনন্ত নরককুণ্ড রচনা করিতে বসি, কিন্তু এ সংসারে নাকি অশ্রুজল আজিও শুকায় নাই, তাই নরক যন্ত্রণার মধ্যে স্বর্গের সোপান দেখিয়া বিস্মিত হই। অশ্রুজলে যে কি পবিত্রতা আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বুকে যাহার দীর্ঘনিশ্বাস বিঁধিয়া আছে, তাহার জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার আশা ভরসা কিছুই নাই। অশ্রু জলে দলিত হৃদয় নবজীবন লাভ করে। অশ্রুজল সম্পদে সুখ, বিপদে বন্ধু, রোগে আরাম, শোকে শান্তি। অশ্রু-ধৌত হৃদয় ধ্রুবলোকের ছায়া।

হে অশ্রুজল! নিশ্বাস-শপ্ত হৃদয়ে তুমি চিরদিন শান্তি বর্ষণ কর, সেখান হইতে নির্ম্মম হাহাকার ঘুচিয়া যাক্। সংসারের শোক তাপ ভয়ে জর জর প্রাণে তুমি সেই অভয়পদের প্রতিষ্ঠা কর, ধরণীর পাপভার লঘু হৌক। তুমি এস, এই ক্ষুদ্র মানব-শিশুর মলিন হৃদয়ে একবার এস, এ মরুভূমি ঘুচিয়া যাইবে। একবার শুধু এস তুমি এস।

গাজিপুর পত্র।

আমি যে দিন জানিয়াছি তুমি গাজিপুরের ইতিহাস জানিতে চাও, সেই দিনই ওল্ড-হ্যামের মস্ত মস্ত গেজেটিয়ার দুইখানা সংগ্রহ করিয়াছি। তোমার বিধু মুখে মধুর হাসি দেখিবার জন্য আমি সব করিতে পারি—এই বই দুখানা শেষ করা কোন ছার কথা! তবে যে গেজেটিয়ারখানা সমুখে খুলিলেই তাহার এক অক্ষর পড়িবার আগেই আমার ঢুলুনি আরম্ভ হয়, আর সমস্ত দিনেও এক পাতার বেশী শেষ করিয়া উঠিতে পারি না—তাহার অন্য কারণ আছে। কারণটা তোমাকে ঠিক বুঝাইয়া উঠিতে পারিব না, বুঝা-ইতে গেলেই খুব সম্ভব ভুল বুঝাইয়া বসিব, তাই বলি সে কথা থাক, একেবারে ইতিহাস আরম্ভ করি। তুমি ভাবিও না গেজেটিয়ার না পড়িয়া লোকে ইতিহাসজ্ঞ হইতে পারে না,—তাহা হইলে আদৌ গেজেটিয়ারই সৃষ্টি হইত না। কিন্তু এরূপ পুরাতন যুক্তির প্রধান দোষ ইহাতে কোন ওরিজিনালিটি নাই সুতরাং আমার ভ্রাতৃবর প্রণীত গাজিপুরের ইতিহাস সার সংগ্রহ উদ্ধৃত করিয়া তোমাকে এ সম্বন্ধে আর এক নূতন অকাট্য প্রমাণ দেখাইব। ইহাতে কেবল ইতিহাস নহে, গাজিপুরের ভূগোল বৃত্তান্তও আছে। ভূগোল শুনিয়া চমকিয়া উঠিও না—সাধারণ ধারানুসারে এ ভূগোল লিখিত নহে, ল্যাটিটিউড, লংজিটিউড, জলস্থল বিভাগের সহিত ইহার কোন সম্পর্কই নাই। লেখ-কের মতে এ সকল নিতান্তই অসার, অনুপকারী, অনাবশ্যক জ্ঞান, সুতরাং এরূপ অসার গর্ব্বেচ্ছুকগণ ওল্ডহ্যামের গেজেটিয়ার বা সরভে-ডিপার্টমেণ্টের ম্যাপ খুঁজিয়া মরুন, তাঁহার আপত্তি নাই, তিনি কিন্তু কোন ম্যাপে না দেখিয়াই ইহা প্রত্যক্ষ জানেন যে—"মধ্যাহ্ণ সূর্য্যের ঠিক নীচেই গাজিপুর অবস্থিত—যদি প্রমাণ চাও—দ্বিপ্রহরে গাজিপুরের মাঠে আসিয়া দাঁড়াইও, ছায়া পায়ে পড়িবে। কিন্তু অধিকক্ষণ দাঁড়াইও না, তাহার কারণ আছে।" কারণটা তিনি বলেন নাই। আমার বোধ হয় তাহারও কারণ আছে। ইহার পরেই তিনি একেবারে এমন হুড়মুড় করিয়া ইতিহাসে আসিয়া পড়িয়াছেন যে সেই ঘটনার মধ্যে পড়িয়া উহার কারণটা নিজে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে ইতিহাসের কিছু মাত্র ভুল হয় নাই। শালি বাহনের সময় হইতে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গাজিপুরের সমস্ত ঘটনাই অবলীলাক্রমে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের এমন 'Instructive' এবং 'interesting' ইতিহাস কোন ইংরাজেও যে এপর্য্যন্ত লিখিতে পারে নাই ইহা আমি খুব সাহস করিয়া বলিতে পারি। (ইংরাজি কথা দুইটা তাঁহার ইতিহাস হইতেই আমি উদ্ধৃত করিলাম; এই দুটার ভাল বাঙ্গলা করিতে পারিলে তিনি পুরস্কার প্রতিশ্রুত হইয়াছেন—চেষ্টা করিতে ছাড়িও না।) এখন ইতিহাস শুন। লেখক বলেন——

"হয় সাদত আলি, নয় মুরাদ খাঁ, নয় বলবন্ত রাও, নয় বিশ্বামিত্র মুনির বাবা গাধিরাজ প্রথম গাজিপুর স্থাপন করেন। তার পরে তিন চারি শত বৎসর কি হোল তা কেউ বলতে পারে না। সফদৎজঙ্গ হজুরীমলের পেটে তিনটে চারটে ছুরীর খোঁচা মেরে যখন গাজিপুরের তক্ত দখল করে বসেন, তখন শালিবাহনের বা বিক্রমাদিত্যের বা খৃষ্ট মৃত্যুর বা মহম্মদ জন্মের কোন শক বা শাল বা অব্দ তা এখনো স্থির হয় নি। কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হচ্চে না। কিন্তু এটা স্থির হয়ে গেছে যে ফজল আলি অত্যন্ত মোটা লোক ছিল। সে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত আপনার পা দেখতে পেত না—দৃষ্টি পেটের উপর বেধে যেত, শ্রীচরণ পর্য্যন্ত পৌঁছত না। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার চরণ দৃষ্টি গোচর হবার প্রধান কারণ এই যে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র খান খানান একটা বড় গোছের ভূজালি নিয়ে বাপের জঠরভার লাঘব করেছিল। এর থেকে কোন তত্ত্ব বা নীতি বেরোতে পারে কি না জানিনে কিন্তু বহুৎ পরিমাণে অন্ত্র তন্ত্র যকৃৎ ও প্লীহা বেরিয়েছিল। তার পরে মামুদ খাঁর সঙ্গে আমুদ খাঁর ভয়ানক যুদ্ধ হয়—কিন্তু মাঝে থেকে মন্ত্রী হামুদ খাঁ বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্ব্বক দুই দলকে ফাঁকি দিয়ে প্রভু এবং প্রভুর তিন পুত্র, তের জামাই ও আঠারটা ভাগ্নেকে সাফ করে ফেলে পৌনে দুশ বেগম ও গাজিপুর দখল করে বসে, তারপর থেকে অনেক গুলো খাঁ, আলি, বক্স, উল্লা, নেড়ে, দেড়ে, বিষ, ছুরী, মড়ক উত্তরোত্তর গাজিপুর ভোগ দখল করে। তার পরে অনেক দিন আর বড় একটা শিক্ষা বা আমোদজনক ঘটনা কিছু ঘটে নি। কেবল ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে গাজিপুরে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যে গাজিপুরের ইতিহাসে চিরদিন জাজ্বল্যমান থাকবে।"

এ ঘটনাটা যে কি তাহা বোধ হয় তুমি অনুমান করিতে পারিয়াছ? অন্ততঃ আমি ত পারিয়াছিলাম। পারিয়া এতদূর উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলাম যে সেদিন গেজেটিয়ারের একটা আস্ত পরিচ্ছেদ সমস্তটা পড়িতেও আমার কষ্ট বোধ হয় নাই। কিন্তু পরিচ্ছেদটা শেষ করিয়া তাহার ত্রিসীমার মধ্যে কোথায় গাধির নামোল্লেখ না দেখিয়া মনটা বড়ই চটিয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজ ইতিহাস লেখকের একচোখো দৃষ্টির ইহা অন্যতম প্রমাণ। কিন্তু তিনি যাহাই বলুন, গাজিপুর যে গাধিপুরের অপভ্রংশ—অন্য কথায় গাধিরাজ যে গাজিপুরের স্থাপয়িতা, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ আমার বিজ্ঞ ভ্রাতৃপ্রবর এই প্রসঙ্গে তাঁহার নামও উল্লেখ করিয়াছেন;

দ্বিতীয়তঃ, শ্যামবাবুর মুখে ইহা আমরা শুনিয়াছি।

তৃতীয়তঃ শ্যামবাবুর বিশ্বাস—দেশের লোকের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত।

চতুর্থতঃ, আমরা এসম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করিলেই তাঁহার কথার অকাট্য প্রমাণস্বরূপ তিনি আমাদিগকে সহরের মধ্যে লইয়া গিয়া গাধি দুর্গের ভগ্নাবশিষ্ট দেখাইতে উদ্যত। আমরা কিন্তু তাহা দেখিতে যাই নাই, কিম্বা উক্ত প্রবাদ বা উক্ত দুর্গের সত্যতা নিরূ-

পণের৩ অন্য কোন চেষ্টা করি নাই। এত প্রমাণের উপর অন্য প্রমাণ সংগ্রহ করা নিতান্তই অনাবশ্যক, তাহাতে মূর্খতা প্রকাশ পায় মাত্র। এই পত্র খানি কোন ইংরাজের দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি মনে করিতে পারেন—এইরূপে Oldhamকে মুর্খ বলাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু ঠিক উল্টা। আমার বিশ্বাস ইহার একটী প্রমাণও তাঁহার চক্ষু কর্ণ গোচর হয় নাই। বেশী নহে, ইহার মধ্যে কোন একটি জানিতে পারিলেই তিনি যে মান্ধাতার তক্তায় গাধিরাজকে বসাইয়া নির্ব্বিবাদে সমস্ত গোল মিটাইতেন, তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই।

মান্ধাতার আমল হইতে গাজিপুর বর্ত্তমান—মনে করিলেও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। তবে যদি তুমি এ মান্ধাতাকে রামের আদি পুরুষ মনে করিয়া থাক, তবে সে দোষ আমারো নহে—ওল্ডহামেরো নহে।

দিল্লীশ্বর পৃথিরাজ পরাজিত হইবার পর মান্ধাতা নামে তাঁহার বংশজ এক ক্ষত্রিয় পুরুষ কোন রোগ হইতে আরোগ্য লাভের বাসনা করিয়া শ্রীক্ষেত্রে গমন করিতে ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলার সীমানায় পদার্পণ করিবার অগ্রেই তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। গাজিপুরের ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে স্থিত কুতোট নামে এক গ্রামে পৌঁছিয়া সেখানকার পুষ্করিণীতে স্নান করিতেই তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন, এবং কৃতজ্ঞতার প্রাবল্যে এই দেশকে তাহার অসভ্য শাসনকর্ত্তার হস্ত হইতে মুক্তি প্রদান পূর্ব্বক নিজে তাহার সিংহাসনে চাপিয়া বসিলেন।

ক্রমে দুর্গাদিতে কুতোটের এক স্বতন্ত্র শ্রী হইয়া উঠিল। মান্ধাতার পুত্রাদি ছিল না, তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজরূপে বরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাবে ক্ষত্রিয়োচিত লক্ষণের কোন ব্যতিক্রম ছিল না। একদিন একজন মুসলমানী তাহার বালিকা কন্যা লইয়া রাজপ্রাসাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল,—যুবরাজ তাহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ হইলেন এবং বিবাহ অভিপ্রায়ে মুসলমানীকে ডাকিয়া সেই কন্যা প্রার্থনা করিলেন। মুসলমানী তাহাতে অসম্মত হওয়ায় তাহার নিকট হইতে বালিকাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বালিকা তখন নিতান্ত অল্পবয়স্কা—সুতরাং তাহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিতে মানস করিয়া তাহাকে রাজান্তঃপুরে রাখিলেন। (রাজার জাতিকুল ইহাতে কিরূপে রক্ষিত হইয়াছিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।) এদিকে কন্যাপহৃতা ক্রুদ্ধা মুসলমানী নিকটস্থ এক মুসলমান প্রধানের নিকট এই সংবাদ জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। মুসলমান সমস্ত শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইল কিন্তু রাজবিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহস না করিয়া মুসলমানীকে দিল্লিসম্রাটের নিকট ইহা আবেদন করিতে পরামর্শ দান করিল। মহম্মদ টোগলক তখন দিল্লির সম্রাট, কিন্তু তিনি তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজ ফিরোজ টোগলককে দিল্লিতে রাখিয়া স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন। ফিরোজ টোগলক

৪০ জন দরবিস-যোদ্ধ্‌বর্গকে মুসলমানীর সাহায্যের জন্য প্রদান করিলেন। তাহারা মুসলমানীকে বলিল "আমরা আহ্লাদের সহিত তোমার পক্ষ অবলম্বন করিব,—কিন্তু তোমার একটি কাজ করিতে হইবে,—বিখ্যাত সায়েদ মসায়ুদকে আমাদের সেনাপতিত্ব গ্রহণে সম্মত করাইতে হইবে।"

মুসলমানী বলিল "তাহাকে কোথায় পাইব?"

তাহারা বলিল "আজ রাত্রে খুব একটা ঝড় উঠিবে এবং কেবল তাঁহার শিবির ব্যতীত এই ঝড়ে অন্য সমস্ত দলপতিদিগের শিবির ভূমিসাৎ হইবে। সেই শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তুমি যাহাকে কোরাণ পাঠে নিযুক্ত দেখিবে, তিনিই মসায়ুদ।"

ইহার পর অবশ্যই সে রাত্রে ঝড়ও উঠিয়াছিল, মুসলমানী মসায়ুদকে শিবিরে কোরাণ পড়িতেও দেখিয়াছিল—এবং মুসলমানীর অনুনয়ে তিনি দরবিসদিগের সেনাপতি হইতেও সম্মত হইয়াছিলেন।

মসায়ুদের সপ্ত পুত্র ছিল, সেই সপ্ত পুত্র ও ৪০ দরবিস এবং অন্য সেনাবর্গের সহিত তিনি যখন মান্ধাতার দুর্গ সন্নিকট হইলেন তখন একজন ফকীরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, এই ফকীর হিন্দুদিগের ভয়ে তাহার ধর্ম্ম গোপন রাখিত। সে দরবিস-দিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পরামর্শ দিল—"প্রকাশ্য যুদ্ধে তোমরা হিন্দুর সহিত পারিবে না, গুপ্ত যুদ্ধ কর।" তাহার কথায় মসায়ুদ লুক্কায়িতভাবে রাত্রিকালে দুর্গ বেষ্টন করিয়া প্রাতঃকালে আক্রমণ আরম্ভ করিল। রাজা মান্ধাতা সকালবেলা স্নানে যাইবার আগে নদীতীরে বসিয়া আয়েশে কুস্তি দেখিতেছিলেন, সহসা কোস্তাদিগের কুস্তি এবং তাঁহার দেখা সমস্তই শেষ হইল। এইরূপে যুদ্ধের আগেই যুদ্ধ জয় পরে দুর্গ গৃহীত এবং অবশেষে মুসলমানী তাহার কন্যাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ,— কন্যাকে পাইয়া মুসলমানী গৃহে লইয়া গিয়াছিল, দ্বিতীয় প্রবাদ— পৌত্তলিকের সহবাস করিয়াছে বলিয়া অপমানিত জ্ঞানে তাহাকে পাইয়াই সে বধ করিয়াছিল। মান্ধাতার ভ্রাতুষ্পুত্র এ সময় স্থানান্তরে ছিলেন—দুর্গাভিমুখে প্রত্যাগমন কালে সমস্ত ব্যাপার তিনি শুনিতে পাইলেন, তাঁহার সহিত আর একবার মুসলমান-দিগের যুদ্ধ বাধিল, কিন্তু সেবারও হিন্দুগণ পরাজিত হইল, যুবরাজ ও তাঁহার পুত্র সিদ্ধরাজ এই যুদ্ধে নিহত হইলেন।

সিদ্ধরাজের নাম হইতে গাজিপুরের পুরাতন মহলের নাম সিধবার। সিদ্ধরাজ ও তাঁহার পিতার গোরস্থান নাকি এখনো এইস্থানে দেখা যায়। হিন্দুদিগের গোরস্থান বড় নূতন কথা। বোধ হয় মসায়ুদ আপনাদিগের প্রথানুসারে সম্মান দান করিয়া তাঁহাদিগকে সমাধিস্থ করিয়া থাকিবেন।

মসায়ুদ কর্ত্তৃক হিন্দুরাজ পরাস্ত ও নিহত শুনিয়া দিল্লীশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া মসায়ুদকে

গাজি উপাধি প্রদান পূর্ব্বক মান্ধাতার সিংহাসনে অধিকার দান করিলেন। গাজি নাম হইতেই এই রাজ্য গাজিপুর নাম প্রাপ্ত হইল।

এখানে প্রতিবৎসরে সায়েদ মসায়ুদের নামে গাজিমিন নামক একটি উৎসব হয়—ইহাতে হিন্দু মুসলমান সকলেই যোগদান করে। উৎসবমেলায় সহরের উত্তর ময়দানে একটি গোরস্থান নির্ম্মিত হয়।

গাজিমিন উৎসবে যেমন হিন্দু মুসলমানে ভাব, বখরীদ উৎসবে তেমনি বিপরীত। প্রতি বৎসর এই উৎসবে পরস্পরের মধ্যে একটা দাঙ্গা হেঙ্গাম না হইয়া প্রায় যায় না। মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে মর্ম্মাহত করিবার জন্য তাহাদিগের দ্বার দেশ দিয়া উৎসর্গীকৃত গোকে বধ করিতে লইয়া যায়—এবং তাহাদিগের বাসস্থানের নিকটস্থ ময়দানে তাহাকে হত্যা করে, হিন্দুগণ ইহাতে বাধা দিবার জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করে। গভর্ণমেণ্ট ইহার একটা সুব্যবস্থা করিয়া দিলে গোল মিটিয়া যায়, গোবধের জন্য হিন্দুদিগের দৃষ্টিবহির্ভূত স্বতন্ত্র স্থল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে এরূপ দাঙ্গা আর হইতে পায় না, কিন্তু মুসলমানদিগের প্রতিই তাঁহাদিগের সহানুভূতি। এবার বখরীদে দাঙ্গা নিবারণ অভিপ্রায়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া হিন্দুদিগের চোখের উপর গোবধ করাইয়াছিলেন। ইহাতে মুসলমানের উল্লাস ও হিন্দুর হতাশের সীমা ছিল না। এইরূপে অপমানিত ও আহত হইয়া ক্রুদ্ধ হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে জব্দ করিবার অন্য উপায় অবলম্বন করিল। গমওয়ালা, তরকারীওয়ালা, কাপড়ওয়ালা প্রভৃতি হিন্দু ব্যবসাদারগণ মুসলমানদিগকে কিছু বিক্রয় করিবে না বলিয়া এককাট্টা হইল। বাস্তবিক জব্দ করিবার উপায় বটে! মুসলমানগণ দিনকতক মহা ত্রাস্ত হইয়া উঠিল, অবশেষে নিতান্ত বেগতিক দেখিয়া ভদ্র মুসলমানগণ ভদ্র হিন্দুদিগকে ধরিয়া আপোষে এই গোল মিটাইয়া ফেলিলেন। এই সময় হিন্দুদিগের যথার্থ একটা সাহস দেখা গিয়াছিল। এক ভদ্র ব্রাহ্মণ বালক কোন মকর্দ্দামার সাক্ষীতে এই সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে আনীত হয়। আসিবার আগেই সে ঠিক করিয়া আসিয়াছিল, ম্যাজিষ্ট্রেটকে জুতা মারিবে এবং ইহার জন্য যে শাস্তি পাইতে হয় গ্রহণ করিবে। ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে ধীরভাবে পায়ের একপাটি জুতা খুলিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মারিল, এবং আবার মারিবার জন্য আর এক পাটি খুলিতেছে—এই সময় ধৃত হইল। তিন মাস তাহার কয়েদ হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে সে কাতর নহে। মার খাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন—এবং অন্য ইংরাজেরা বলিতেছেন—কি Coward! কোর্টের ভিতরে দাঁড়াইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে জুতা মারিল—Cowardই বটে! যাক্, কি বলিতে কি কথায় আসিয়াছি?

কি করিয়া গাজিপুরের নামকরণ হইল তাহা ত শুনিলে? গাজি বংশের পর আফগানেরা এখানে রাজত্ব করে। আফগান বংশ যখন বিদ্রোহী হয় তখন আকবর তাহাদের

রাজ্যচ্যুত করিয়া পাহাড়খানকে এখানকার ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। পাহাড়খাঁর গোরস্থান এবং পুষ্করিণী এখনো তাঁহার নাম গাজিপুরে জাগ্রত রাখিয়াছে। ফজল আলি গাজিপুরের শেষ নবাব। তিনি সত্যই এত স্থূলকায় ছিলেন—যে নিজের উদর তাঁহার নজরে পড়িত না। তিনি নাকি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন; তবে ইহা প্রবাদ কিনা জানি না, গেজেটিয়ার লেখক এইরূপ বলিয়াছেন। ইঁহার নিকট হইতে ইংরাজেরা গাজিপুর গ্রহণ করেন।

এই ত গাজিপুরের ইতিহাস! ইতিহাসের যাহা প্রধান বিষয় অর্থাৎ দেশের সাধারণ লোক এবং তাহাদের অবস্থা,—তাহার সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই, ভারত-বর্ষের কোন ইতিহাসেরি নাই। রাজা রাজড়ায় যুদ্ধ বাধিয়াছে, তাহারা উলুখড়ের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা হইবারি কথা, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা ইতি-হাস-লেখকগণ বাহুল্য বিবেচনা করিয়াছেন। তুমি যদি বেশী কিছু জিজ্ঞাসা কর আমিও বাহুল্য বিবেচনা করিব। তবে যদি দেশের লোকের কথা ছাড়িয়া বলিয়া যাইতে বল, তাহা হইলে বরঞ্চ আরো দুচার কথা বলিয়া যাইতে পারিব। গাজিপুর অতি পুরাতন সময়ে বৌদ্ধদিগের অধিকারভুক্ত ছিল; তাহার পর গুপ্তবংশগণ এ অঞ্চলে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। এই বংশের লোপের পর সপ্তশতাব্দী যে এ অঞ্চলের কি দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা অজ্ঞাত। ইহার পর একেবারে চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে গাজিপুরের আসল ইতিহাস আরম্ভ, এই সময়েই মান্ধাতার আমলে গাজিপুর স্থাপিত হয়। মুসলমান আসিবার বহুপূর্ব্বেই যে এ অঞ্চল হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যায় এবং এ প্রদেশ আদিম অসভ্যদিগের বাসভূমি হইয়া উঠে তাহা নিশ্চয়। এই অসভ্যগণই ভড় ও শিওড়ি নামে খ্যাত। অসভ্যদিগের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে পালি ভাষাও এদেশে এতদূর লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল—যে মুসল-মান সময়ের হিন্দুগণ গুপ্তবংশের সমসাময়িক স্তম্ভাদি খোদিত পালি ভাষা কিছুমাত্র পড়িতে পারিতেন না। তাঁহারা সেই সকল চিহ্ন অতি পুরাতন কালের জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। বর্ত্তমান কালেও সাধারণ্যে এই সকল ভগ্নাবশিষ্ট ভড় রাজা ও শিওড়িদিগের কীর্ত্তি বলিয়া কথিত, কোনটি বা মহা-ভারতের কোন ঘটনার সহিত অদ্ভুত গল্পে সম্বদ্ধ। কনিংহাম প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ দিগের যত্নে এই সকল মিথ্যার মধ্য হইতেও সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। এ প্রদেশের সৈয়দপুর এবং ভিৎরি নামক স্থানে গুপ্ত বংশের কীর্ত্তি চিহ্নাদি যথেষ্ট পাওয়া যায়। সৈয়দপুর গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থান। ইহা নিজ গাজিপুর হইতে মোট ১২ ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত। ভিৎরিও গাজিপুর হইতে অধিক দূরে নহে।

ভিৎরি পূর্ব্বে একটি বর্দ্ধিষ্ণু নগর ছিল। গুপ্তবংশের বিবরণ খোদিত একটি প্রকাণ্ড স্তম্ভ, ভগ্ন ইষ্টক রাশি, ভগ্নাবশিষ্ট খোদিত প্রতিমূর্ত্তিরাশি এখানে পাওয়া

গিয়াছে। এই মুর্ত্তিদিগের মধ্যে দেবদেবীর মূর্ত্তিও আছে। ইষ্টকে কুমার গুপ্তের নাম পাওয়া গিয়াছে। সায়েদপুর এখনো একটি বর্দ্ধিষ্ণু স্থান। অনেক লোক এখানে বাস করে, অধিকাংশই বাণিজ্যব্যবসায়ী। এখানে নূতন মন্দিরাদির ত অভাবই নাই, দুইটি পুরাতন চৈত্যও এখানে অদ্যাপি বর্ত্তমান। বৌদ্ধ ধর্ম্মের এত দুর্দ্দশার পর এই পুরাতন চৈত্য দুইটি যে এখনো এখানে অবস্থান করিতে পাইয়াছে, তাহার একটি কারণ—একজন মুসলমান ফকীর সিক সামন ইহার একটিতে বাস করিত, এবং মরিবার পর ইহার মধ্যে গোরস্থ হইয়াছে,—দ্বিতীয় চৈত্য নবাব মুকদুম সার গোর স্থান। সায়েদপুর হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে হিংচুর নামক গ্রামে এই চৈত্যাদির অপেক্ষাও পুরাতন কালের মন্দিরাদি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু মুসলমান হস্তে তাহা এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, তাহার পুরাতনত্ব সহজে নির্ণয় করা যায় না।

শ্রাবণের বারিধারা।

ধরণীর সুগভীর অন্ধকারে আষাঢ়ান্তে মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় ঢালিয়া দিয়া অন্ধকার আকাশ যখন বিরহ-নিশ্বসিত সুরে অবসাদ গাহিতে থাকে, তখন ঝরঝর ধারায় শ্রাবণের গভীর হৃদয় কোথায় ঝরিয়া যায়। প্রবহমান জীবনস্রোতে কি গম্ভীর ছায়া পড়ে, আপনার প্রবল আবর্ত্তের মধ্যে নিশিদিন ঘূর্ণমান হইয়া জীবন যেন ফেনাইয়া উঠে। শ্রাবণের হৃদয় অবিরল ঝরিতে থাকে; গভীর হৃদয় একবার ঝরিতে আরম্ভ করিলে আর সহজে থামে না ত। আকাশে যতই মেঘ ঘনাইয়া আসে, বর্ষা ততই জমিয়া যায়, ধরণী মুখের উপর ঘন-অন্ধকার অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া স্তম্ভিত হৃদয়ে একাকিনী বিজনে বসিয়া থাকে। চারিদিকেই ক্রমাগত অন্ধকার ঘনীভূত হয়, সূর্য্যালোকে মেঘের ছায়া পড়ে, তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে অন্ধকারের উপর অন্ধকার যেন নৃত্য করিতে থাকে। এই অন্ধকারময় ভাব প্রবাহের মধ্যে মানবের হৃদয়ও অন্ধকার না হইয়া কি থাকিতে পারে?

বর্ষায় আমাদের হৃদয় অন্ধকার হইয়া আসেইত। অন্ধকার না হইলে শ্রাবণের বারিধারা কখনও কি উপভোগ করা যায়? অন্ধকারের সহিত তাহা যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। শ্রাবণের বর্ষণ আরম্ভ হইলে, ভেকের মকমকধ্বনি চাই, পৃথিবী তমসাচ্ছন্না চাই, চাই অনেক জিনিস,—কিন্তু আলোক চাহিনা, কোকিল পাপিয়ার দিগন্তব্যাপী আকুল স্বরলহরী চাহিনা, আপনার মধ্যে থিতাইতে না দিয়া জগতে টানিয়া লইয়া যায় এমন কিছু চাহি না। কোকিল কি শ্রাবণে ডাকে না? পাপিয়া কি চোখ গেল বলিয়া ভুলিয়াও বিলাপ করে না? শ্রাবণের বাদলেও দৈবাৎ বসন্তের পাখীর হৃদয়-বেদনা শুনা যায়। কিন্তু সে কিরূপ? প্রশান্ত হৃদয়েও এক এক সময়ে যেমন দীর্ঘনিশ্বাস উথলিয়া উঠে।

ঝমঝম বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, বসন্তের পাখী আর থাকিতে পারিল না, স্মৃতি-কাতর-হৃদয়ে একবার বসন্তকে আহ্বান করিয়া গাহিয়া উঠিল। পরক্ষণেই তাহার ভুল ভাঙ্গিল—দেখিল, সে বসন্ত নাই, বসন্তের সুরও তেমন জমে না।

শ্রাবণের বারিধারার ছন্দ স্বতন্ত্র কিনা, তাই শ্রাবণের ভাব পরিত্যাগ করা চলে না। অন্ধকারটুকু—এটুকু সেটুকু বাদ দিলে ছন্দ ভাঙ্গিয়া যায়। আবশ্যক মত একটী বিজলী না হানিলে, একবার মেঘ-গর্জ্জন না হইলে হয়ত কতখানি ভাব হানি হয়। শ্রাবণত্ব বিহীন শ্রাবণ ধারা কি হইতে পারে? আর ছন্দ বল, ভাষা বল, ভাব প্রকাশই ত সকলের উদ্দেশ্য। তাহা হইলে ব্যক্তব্য ভাব যাহাতে ভালরূপ প্রকাশ করা যায় না, তাহা লইয়া কি হইবে? এই জন্য শ্রাবণের কোন-একটী-কিছু বাদ দিয়া তাহার বারিধারাটুকু উপভোগ করা যায় না। সমগ্র ভাবই তাহা হইলে বদলাইয়া যায়।

বারি ধারা ত অন্যান্য মাসেরও আছে। আষাঢ়ে কি মেঘ বর্ষায় না? বৈশাখে জ্যৈষ্ঠেও ত বারি বর্ষণ হয়। তবে শ্রাবণের বারিধারাই বিখ্যাত কেন? ভাবের জন্যই না? শ্রাবণের বারিধারার ভাব আর কোথাও নাই—এমন সুন্দর, এমন গম্ভীর, এমন মধুর। আষাঢ়ের নবীন মেঘ বিখ্যাত, সে মেঘের শোভা আর কোন কালে দেখা যায় না। ভাদ্রের ভরাভাব তেমনি। কিন্তু বারিধারা শ্রাবণের। বর্ষায় অনেক সময় পাঁচ সাত দিন ধরিয়া টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ে, এক একবার যেন বিরক্তি বোধ হয়। আর শ্রাবণের দিন নাই রাত নাই, অবিশ্রান্ত ঝরঝর ঝরঝর—তাহাও কেমন ভাবে মধুর।

কিন্তু শ্রাবণের বারিধারায় বিশেষ ভাব কি? সংক্ষেপে বলিতে গেলে—গাম্ভীর্য্য। ভাদ্রের ভরা ভাবও ত সেই গাম্ভীর্য্য। কিন্তু ভাদ্রের সহিত শ্রাবণের গাম্ভীর্য্যে মূলগত প্রভেদ। শ্রাবণ-বর্ষণই কেমন গম্ভীর। ভাদ্রের তাহা নহে। শ্রাবণের বারিধারায় নদ নদী খাল বিল সব ভরিয়া উঠিয়াছে, সকলই কূলে কূলে পূর্ণ, তাই ভাদ্র ভরা। ভরা ভাদ্রের সূচনা শ্রাবণের জলধারায়।

শ্রাবণবর্ষণে মনের উপর কেমন একটা স্থির প্রভাব পড়ে, কিন্তু তথাপি মনের আকুলতা ঘুচে না। সদাই ভয় হয়, কোথায় যেন চিরবিরহ রচিত হইতেছে, কোথায় কে যেন একেবারে হারাইয়া যাইতেছে। একটা কোন অনির্দ্দেশ্য বিভীষিকার পশ্চাতে মন যেন সারাক্ষণ ঘুরিয়া বেড়ায়। জানালা খুলিয়া একেলা আকাশের পানে তাকাইয়া থাক, বসিয়া বসিয়া সেই ঝম্‌ঝম ধারাপতন শব্দ শ্রবণ কর, মন যেন আপনার মধ্যে উদাস হইয়া বসিয়া আছে। বসন্তে মন যেমন আপনা হারাইয়া উদাস, এ তেমন নহে। এ আর এক ভাব।

কিন্তু শ্রাবণের বারিধারায় হৃদয় মুহুর্ম্মুহু চমকিয়া উঠে না। মন চমকিয়া উঠে বিজলীতে। তড়িল্লতায় সহসা যেন জীবনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে একটা আঘাত দিয়া যায়—কোথাকার কোন রহস্য বুঝি ব্যক্ত হইতেছিল, আর ব্যক্ত হইল না। শ্রাবণধারা নাকি

বিজলীহীনা প্রায় হয় না, তাই ধারাসম্পাতে হৃদয় একএকবার শিহরিয়া উঠে। গুরু গুরু মেঘ গর্জ্জনে, চপলাচমকে শ্রাবণধার।র সঙ্গত হইতে থাকে।

শ্রাবণের একটা কেমন ঝাপসা ভাব আছে। অবিশ্রান্ত ধারাসম্পাতে চারিদিক কেমন ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা ঠেকে। আষাঢ়ের মেঘ যখন বর্ষিত হইতে থাকে, তখনও চারিদিক ঝাপ্‌সা, কিন্তু সে ঝাপ্‌সায় একটা নবীন জ্যোতির স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। শ্রাবণে আষাঢ়ের সে নবীন মেঘ আর নাই, মেঘের উপর মেঘ ঘনাইয়া অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়াছে, সুতরাং তাহার ঝাপ্‌সা ভাবে খানিকটা কালো ছায়া।

শ্রাবণের বারিধারায় কিন্তু আষাঢ়ের মত গল্প জমে না। তাহার কারণ বোধ হয়, শ্রাবণে আষাঢ়ের নব-উৎসাহের ভাব অনেকটা ম্লান হইয়া পড়ে। আষাঢ়ে গল্প করিয়া করিয়া শ্রাবণে বিশ্রাম আবশ্যক হয়। আর প্রথম নবীন মেঘে যত গল্প আম্‌দানি হয়, আষাঢ়ান্তে তাহা প্রায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। হৃদয়ের মধ্যে আষাঢ় জমিয়া জমিয়া একটা নূতন ভাব রাখিয়া যায়, শ্রাবণে সেই ভাবের বিশেষ বিকাশ। গল্পগুজব তখন কিছু কমিয়া আসে, তবে তাহার ঐকান্তিক অভাব অবশ্য হয় না। বর্ষার দিনে গল্পের অল্পবিস্তর স্ফূর্ত্তি হয়ই।

ঝর শ্রাবণ ঝর। তোমার বারিধারায় যে গম্ভীর কাব্য রচিত হইতেছে, তাহা উপভোগ করিবার জন্য যক্ষ কিন্নর, দেব মানব তৃষিত নেত্রে চাহিয়া আছে। এক ফোঁটা বারি পতনশব্দ হইতে বঞ্চিত হইলে তোমার এ মহাকাব্যের ভাব বুঝি হারাইয়া যাইবে। তাই সকলে নীরব। তুমি শুধু ঝরিয়া যাও—তোমার ঝরঝরে বর্ষে বর্ষে এমনি নূতন নূতন কাব্য রচিত হোক্! আমরা সেই কাব্যের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া একটু আনন্দ উপভোগ করি।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নাগা সন্ন্যাসী।

(পরিহিত বস্ত্র একটি দুই তিন বৎসরের শিশুকে সম্মুখে রাখিয়া, তাহাকে সম্বোধন করিয়া, এই কবিতাটি পাঠ করিতে হইবে।)

১

ফ্রকে অঙ্গ মুড়ি দিয়া, আস্ত সঙ বানাইয়া,
কে তোরে পরালে বাস নাগা সন্ন্যাসী?
নগ্নদেহে কুতূহলে, পরম হংসের দলে,
বেড়াস্‌ ও মুখপদ্ম সদা বিকাশি,
তৃপ্ত হয় মোর দুটি আঁখি উপাসী!
কি কব দুঃখের কথা! খাইয়ে আঁখির মাথা,
তোর অঙ্গে দিল বস্ত্র রুচি বিলাসী!
কে তোরে পরালে বাস নাগা সন্ন্যাসী?

২

বসন্তে ধরার প্রেম হয়ে উল্লাসী,
ফুটে উঠে, ফুল হয়ে, সুখে উচ্ছ্বাসি!

সেই সে গোলাপ ফুলে, ঊষারাণী পরে চুলে;
গোলাপের মুখে আর ধরে না হাসি !
(তেমতি তুইও মোর নাগা সন্ন্যাসী)
সোহাগে হয়ে আকুল, প্রভাতে গোলাপ ফুল,
শিশিরেতে ঢল ঢল কহে সম্ভাষি,—
"পাখীপুষ্পলতা রাজী যে যেথানে আছ অজি
আমার হাসির ভাগী হওসে আসি"
এত বলি ঢুলে পড়ে, নিজেরি রূপের ভরে,
পলে পলে রাগভরা দল বিকাশি।
অলি এসে পড়ে ছুটে, পাপিয়া গাহিয়া উঠে,
অমনি পড়ে গো মোর নয়নে ফাঁশি !
(তুইও গোলাপ ফুল নাগা সন্ন্যাসী)।
ঊষার অরুণভালে, সন্ধ্যার নীরদ-জালে,
ইন্দ্র ধনু মেঘমালে, কত তপাসি,
আঁখি মোর দিশেহারা,খুঁজে খুঁজে হ'ল সারা,
গোলাপের যোড়া পেতে বৃথা প্রয়াসী ;
গৃহে ফিরে এল শেষে আঁখি প্রবাসী !
হেরিয়াছি আঁখি চিরে, উষার উষারি ধীরে,
ময়ূরের বর্হরাশি – এত তপাসি,
তবু আঁখি রয়ে গেল ঘোর পিপাসী !
কোনো ঠাঁঞি, কারো ঠাঁঞি, সে গোলাপি রাগ নাই ;
রূপ-পূজা-পুরোহিত আমি উদাসী,
হার মেনে গেছি আমি করে নীকাশি !
কি কব হাসির কথা? সৃষ্টিছাড়া বাতুলতা !
হেন ফুলে গৃহে আনি রুচি বিলাসী,
সে গোলাপি কলেবরে রঞ্জিলরে থরে থরে !
অপরূপ চিত্রকর যশ প্রত্যাশী !
কে তোরে পরালে বাস নাগা সন্ন্যাসী ?

৩

সীমা কোথা মাধুরীর ?
মুক্ত কেশী যামিনীর
উথলিয়া পড়ে, দেখ, জ্যোৎস্না হাসি !
এ হেন উজ্জ্বল রাতি !
জ্বালি তবু মোমবাতি
আনিয়ে রাখিল ছাদে ভোগ বিলাসী !
কে তোরে পরালে বাস নাগা সন্ন্যাসী ?

৪

রামপ্রসাদের গান
ভক্তি যেন মূর্ত্তিমান্ !
তার শেষে আরো দুটি কলি বিন্যাসি,
দিল রে রস রুচি আচ্ছা প্রকাশি !
কমলা লেবুর রসে,
হা অদৃষ্ট ! অবশেষে
চোটা গূড় দিল থোট্টা ডিল্লি-নিবাসী !
কে তোরে পরালে বাস নাগা সন্ন্যাসী ?

৫

গীতগোবিন্দের সঙ্গে
দিল রে গাঁথিয়ে রঙ্গে
উড়িয়া ভাষার ছন্দ কোন্ দোভাষী ?
শিখীপুচ্ছ ছিঁড়ি হায়,
সে গ্লানি সারিতে চায়
মোরগ ফুলের গুচ্ছে—মরি সাবাসি !
কে তোরে পরালে বাস নাগা সন্ন্যাসী ?

৬

তুইরে ন্যাংটা ছেলে,
ধূলি মেখে, হেসে খেলে,
বেড়াস্ ও মুখ-পদ্ম সদা বিকাশি ;
তৃপ্ত হয় মোর দুটি আঁখি উপাসী !
কি কব দুঃখের কথা
খাইয়ে আঁখির মাথা,
তোর অঙ্গে দিল বস্ত্র রুচিবিলাসী !
কে তোরে পরালে বাস নাগা সন্ন্যাসি ?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

স্নেহলতা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শুভলগ্নে শুভক্ষণে স্নেহলতার বিবাহ হইয়া গেল। জগৎ বাবুর ভগিনীপতি—স্নেহলতার মামা তাহাকে সম্প্রদান করিলেন; জগৎ বাবু তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শুধু অশ্রু বিসর্জন করিলেন; ইহাতেই মাত্র তাঁহার অক্ষত অধিকার। পরদিন প্রাতঃকালে কুশণ্ডিকা হোম যজ্ঞাদিও এইখানে সম্পন্ন হইল, পরে মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে বর কন্যার বিদায়ের আয়োজন।

কন্যা বিদায়ের দিন বাঙ্গালী গৃহে কিরূপ নিরানন্দ তাহা সকলেই জানেন। যদিও স্নেহলতা বাড়ীর ঠিক কন্যা নহে—তবু সে কন্যার মতই হইয়া গিয়াছিল; গৃহিণীর এতদিন তাহার উপর যে আক্রোশ ছিল—আজ তিনিও তাহা ভুলিয়া গেলেন, দোষের পরিবর্ত্তে স্নেহলতার গুণই সব আজ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। যখন কন্যা জামাতা সিঁড়ির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—তিনিও চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন "স্নেহ আজ ঘর শূন্য করিয়া চলিলি বাছা?"

স্নেহলতা ত সমস্ত দিন ধরিয়া কাঁদিতেছিল—গৃহিণীর সস্নেহ বাক্যে তাহার ক্রন্দন আরো উথলিয়া উঠিল। দাস দাসীগণ এতক্ষণ নীরবে চোখ মুছিতেছিল—এইবার তাহাদের হৃদয়ের শুভ কামনা অর্দ্ধোচ্চারিত অস্ফুট ভাষায় ব্যক্ত হইতে লাগিল, 'সুখে থাক,' 'রাঙ্গামাথায় সিঁদুর পর', 'সুখে স্বামীর ঘর কর'—'হাতের নোয়া ক্ষয় যাক্' ইত্যাদি আশীর্বাক্য চারিদিক হইতে বর্ষিত হইতে লাগিল।

টগর স্নেহকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, চারু কাঁদিল না, কিন্তু তাহার মুখেও কষ্টের ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। জগৎ বাবুর মূর্ত্তি এ সকলের অপেক্ষা বিষণ্ণ। জগৎ বাবু স্নেহলতার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"বৎসে স্বামীগৃহে গিয়া সুখী হও, শ্রী তোমার অনুবর্ত্তী হউন, দুঃখ ক্রন্দন তুমি এইখানে ত্যাগ করিয়া যাও, তোমার চরণস্পর্শে তোমার শ্বশুরালয় প্রফুল্ল হইয়া উঠুক।"

ক্রন্দন আশীর্ব্বাদের মধ্যে স্নেহলতা পাল্কীতে গিয়া উঠিল—ক্রন্দনের অন্ধকার লইয়া সে শ্বশুরগৃহে প্রথম পদার্পণ করিল।

বর কন্যার সহিত বাদ্যের আড়ম্বর ছিল না, জন কয়েক আসাসোটাধারী, দুই চারি জন দাসী এবং দুইখানি জুড়িগাড়ী—এইমাত্র বর কন্যার সহযাত্রী। ইহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য দুই দল বাদক বহুক্ষণ হইতে দরজি পাড়ার গলির মোড়ে অপেক্ষা করিতেছিল, গাড়ীর মাথায় লাল কাপড়ের নিশান দেখিয়াই তাহারা বাজনা বাজাইয়া উঠিল। গলির ঠিক সম্মুখে একেবারে অন্য প্রান্তে বরের বাড়ী। বাড়ীর বারান্দায়, উঠানে, ছাতে লোক পূর্ণ, গলির মোড়ে যেমন জোরে বাজনা বাজিয়া

উঠিল, অমনি চারিদিকে 'বর আসছে বর আসছে' এই অভিনন্দন বাক্য ধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং চতুর্দ্দোলা গলির মোড়ে পৌছিবার অগ্রেই বাড়ীর মধ্যে একটা ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। উপরের লোক নীচে নামিতে আরম্ভ করিল,—নীচের লোক কেহ মোড়ের দিকে ছুটিল—কেহ অন্তঃপুরে চলিল। রমণীগণ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, আর চীৎকারধ্বনি একই সঙ্গে উত্থিত হইতে লাগিল।

বাড়ীর কর্ত্রী ঠাকরুণ—ব্রত উপবাস-পীড়িতা, জীর্ণ-দেহা, শীর্ণ-মুখী, দীর্ঘনাসা, মুণ্ডিত কেশা, (সম্প্রতি তীর্থ করিয়া আসিয়াছেন) লম্বগ্রীবা,—রুক্ষ গৌরবর্ণা, উগ্রা—অর্দ্ধবয়সী প্রৌঢ়া-বিরক্ত বিকৃত মুখে চীৎকার করিতে লাগিলেন—"আরে ফুঁ দে—ফুঁ দে—বৌ এসে পড়লো, দুধ যেন ঠিক সময়ে উথলায়।"

কোমল সুশ্যামাঙ্গী প্রফুল্লমুখী হাস্যময়ী জীবনের মা আনন্দ উৎসুক স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন—"দিদি বৌকে কোলে করবে কে? তুমি না আমি?

ঠাকুরাঝি চীৎকার করিতে লাগিলেন—"ও বড় বৌ ও মেজ বৌ—খই কই? কড়ি কই? জলঝারি কই? বৌ যে এল!"

যে সকল সধবাগণ ঐ সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন—তাঁহারা চীৎকার করিতে লাগিলেন—"সব ঠিক আছে, আমরা দাঁড়িয়ে আছি।"

নিতান্ত সুব্যবস্থাশীল বাড়ীতেও এই সময় এইরূপ অব্যবস্থা দেখা যায়। যাহা হউক এই সকল গোলযোগ, অব্যবস্থা, আনন্দ ঔৎসুক্যের মধ্যে বর কন্যার চতুর্দ্দোলা ও পাল্কী বাড়ীর উঠানে আসিয়া থামিল। আজ আনন্দের দিন, বাহিরের দর্শক উপেক্ষা করিয়া কুলরমণীগণ আজ উঠানে পাল্কীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জীবনের মা আর তাঁহার যায়ের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই পুত্র-বধূকে পাল্কী হইতে উঠাইয়া ক্রোড়ে লইলেন, এবং বরকে নামিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে বলিলেন। আল্পনা অঙ্কিত পথ মাড়াইয়া খই কড়ি জল ছড়াইতে ছড়াইতে অবগুণ্ঠনবতী যুবতীগণ, অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী রমণীগণ, লোহিত বস্ত্র পরিহিত দাসদাসীগণ তাঁহাদের সঙ্গ গ্রহণ করিল। বাহিরের উঠান পার হইয়াই জীবনের মা অন্তঃপুরের দালানে আসিয়া পড়িলেন। দালানের এক কোণে দুইখানি ইষ্টকের এক চূলায় একটি ক্ষুদ্র ভাণ্ড চড়াইয়া এক রমণী প্রাণপণে চূলাগ্নিতে ফুঁক দিতেছিলেন। জীবনের মা সেইখানে দাঁড়াইয়া স্নেহকে বলিলেন "চাওত মা ঐ দিকে চাও"; সে তাহার অবগুণ্ঠন ঐদিকে ফিরাইল—কিন্তু তাহার মধ্য হইতে কিছু দেখিতে পাইল কি না জানি না—কিন্তু অন্য সকলে দেখিলেন হাঁড়ির দুধ উথলিয়া উঠিল না। জীবনের মার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল, তিনি কথা কহিতে পারিলেন না, আর সকলে অর্থ পূর্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চাওয়াচাওয়ি করিয়া অর্দ্ধোচ্চারিত ভাবে কাণাকাণি করিল—'মেয়েটা অপয়া'!

কর্ত্রী ঠাকরুণ এই সময় অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—সর্ব্বনাশ! দুধ উথলায় নাই! তিনি চুপি চুপে কথা কহিবার লোক নহেন, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "ও মেজ বৌ—এ কেমন মেয়ে তুই মোহনকে দিলি? দুধ যে উথলায় না?"

এ দিকে রমণীর অবিশ্রান্ত প্রাণপণ ফুঁকে সহসা দুধ উথলিয়া উঠিল—সকলে আনন্দ প্রকাশ করিল, জীবনের মা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, বলিলেন—"দিদি হয়েছে, হয়েছে, খুব উথলেছে ঐ দেখ" বলিয়া সেখান হইতে দালানের মধ্যস্থলে আসিয়া কলাগাছের কাছে পিঁড়ির উপর কন্যাকে দাঁড় করাইয়া দিলেন। বর পাশের পিঁড়িতে আসিয়া দাঁড়াইল; কলাগাছের নিকট একটি দধিপাত্রে খানিকক্ষণ হইতে একটি মাগুর মাছ ধড়ফড় করিতেছিল—বর কন্যা পিঁড়িতে দাঁড়াইতেই তাঁহাদের বস্ত্র দধিসিক্ত হইয়া উঠিল, সুলক্ষণ দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে একজন রমণী সমৎস্য দধিপাত্র স্থানান্তরিত করিলেন। এইবার কন্যার সিন্দুর পরিধান। কন্যার মাথার উপর একজন একটি ধানচুপড়ি ধরিয়া তাহার অবগুণ্ঠন কিয়ৎ পরিমাণে খুলিয়া দিলেন, বর তাঁহার অঙ্গুরি সিন্দুর রঞ্জিত করিয়া তদ্দ্বারা কন্যার সীমন্ত রঞ্জিত করিলেন। তাহার পর বরণ আরম্ভ হইল। এ সমস্তক্ষণই হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, বাদ্যধ্বনি এবং চীৎকারধ্বনি সমান চলিতেছিল। বরণ হইয়া গেলে বরকন্যা দ্বিতলে আনীত হইয়া যৌতুক গৃহে উপবিষ্ট হইলেন। যুবতীগণ তাঁহাদিগকে মঙ্গল ভাঁড় খেলাইতে আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঠাট্টা করিতেও ত্রুটি করিলেন না। এইরূপে সমস্ত স্ত্রীআচার-পর্ব্ব শেষ হইলে পর শ্বশুর মহাশয়কে পুত্র বধূর মুখ দর্শনের জন্য অন্তঃপুরে তলব পড়িল। তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইয়া কর্ত্রীঠাকরুণ যৌতুক হস্তে বর কন্যার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, দেবর যৌতুক করিয়া গেলে তিনি যৌতুক করিবেন। কুঞ্জ বাবু গৃহে আসিবামাত্র জীবনের মা কন্যার ঘোমটা তাহার মাথার উপর উঠাইয়া ধরিয়া ঠাকুর পোকে বলিলেন—"দেখ ঠাকুর পো বউ পসন্দ হয়?"

মুখ দেখাইবার সময় কন্যার চোখ বুজিতে হয় ইহা কে না জানেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে স্নেহলতা তাহা জানিত না। ইহার প্রধান কারণ, স্নেহ জ্ঞান হইয়া অবধি কখনো কোন বিবাহ দেখে নাই—গৃহিণী তাহাকে কোন নিমন্ত্রণে লইয়া যাইতে ভাল বাসিতেন না। শ্বশুর গৃহে আসিবার সময়ও এ কথা তাহাকে কেহ শিখাইয়া দেয় নাই, ইহা এতই জানা কথা, স্নেহলতা ইহা যে জানে না ইহা সম্ভবতঃ কাহারো মনেই আসে নাই। সুতরাং জীবনের মা যখন তাহার মুখের কাপড় খুলিয়া দিলেন, সে চোখ না বুজিয়া ধীরে ধীরে শ্বশুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। এই অপরিচিত রাজ্যে কোন করুণ মুখ, কোন নূতন স্নেহের মুখ দেখিবার জন্য সে আকুল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু শ্বশুরের মুখ তাহার নেত্র পথে বিম্বিত না হইতে হইতে শাশুড়ি তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"ওমা এমন নির্লজ্জ মেয়ে ত দেখিনি, শ্বশুরের দিকে চায় দেখ"। স্নেহের হৃদয় কাঁপিয়া

উঠিল—তাহার অশ্রুপূর্ণ নেত্র তখনি নিম্নে পতিত হইল। জীবনের মা আস্তে আস্তে তাহাকে বলিলেন "বৌমা চোখ বোজ"। সে চোখ বুজিল, কিন্তু তাহার মুদিত চক্ষু দিয়া জলধারা বাহিয়া পড়িল।

শ্বশুর যৌতুক দিয়া চলিয়া গেলে, প্রথমে মান্যের সম্পর্ক—পরে ঠাট্টার সম্পর্ক—শেষে অসম্পর্কীয়গণ বর কন্যাকে যৌতুক প্রদান করিলেন। যৌতুক শেষ হইলে বর বাহিরে চলিয়া গেলেন—এইবার রমণীগণ নববধূর রূপ ও অলঙ্কারের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই প্রসঙ্গে নানা কথা চলিতে লাগিল, গোড়াতেই বৌয়ের চুল বাঁধাটা সকলে "ধ্যাচ" করিলেন। গৃহিণী এই প্রথমবার স্নেহের চুল বাঁধিয়া দিয়াছেন—অাঁট করিতে কসুর করেন নাই, কিন্তু অপসন্দ সেজন্য নহে, জুলপিটা তেমন সুচারু হয় নাই। আর সোনার ফুলের বদলে খোঁপায় রুপার কাঁটা দেওয়া হইয়াছে।

ইহার পর, এক জনের বৌয়ের রংটা বড় ফ্যাকাশে বলিয়া মনে হইল, অন্য জন বৌয়ের হাতটা হাতে লইয়া বলিলেন—"নরম আছে—তবে আঙ্গুল বড় সরু, দেখি পা কেমন?" তিনি স্নেহের পা টানিয়া লইয়া তাহার পায়ের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন—অপর রমণী বলিলেন—"বৌ চাওত একবার উপর দিকে," বধূ লজ্জিত ভাবে নীচের দিকেই চাহিয়া রহিল—রমণী রুক্ষ স্বরে বলিলেন—"ওমা বল্লে কথা শোনেনা কেন গা—চাওনা উপর দিকে?" নববধূ উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, আর একজন বলিল—"আমার দিকে চাও দেখি?"

চাওনি দেখিয়া সে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—"হাঁ চাওনি ভাল—ঠাণ্ডা মেয়ে।"

বৌয়ের রূপের পরীক্ষা এইখানেই সাঙ্গ হইতেছিল—কিন্তু আর একজন এই সময় বৌয়ের হাত ধরিয়া দাঁড় করাইয়া বলিলেন—"শরীরের গড়ন পিটন কেমন একবার দেখি? বড় রোগা, মেয়ে মানুষ এত রোগা ভাল দেখায় না"—একথায় একবাক্যে সকলেই সায় দিলেন—তখন আবার স্নেহ বসিতে অনুরুদ্ধ হইল। এইরূপে রূপের পরীক্ষা শেষ করিয়া তখন সকলে তাহার গহনার দিকে মনোনিবেশ করিলেন। কেহ তাহার হাতটা ধরিয়া বলেলেন—"চার গাছা চুড়ি আর বালা, একি না দিলেই নয়?"

কোন যুবতী স্নেহের ঘোমটা খুলিয়া কণ্ঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইলেন—এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিয়া নিন্দা করাও তিনি প্রয়োজন দেখিলেন না। এক গাছি মাত্র চিক স্নেহের গলায়, একি আবার গহনা গা!

ঘরে এইরূপ চলিতেছে এমন সময় শাশুড়ি ঠাকরুণ আগমন করিলেন, তিনি এতক্ষণ অন্যদিকে কাজে কর্ম্মে গিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন—"কই কি গহনা দিয়েছে দেখি?" দেখিয়া বলিলেন—"কি পোড়ার গহনাই দিয়েছে? ও কখানা দেওয়া যে কেন তাত জানিনে"—জীবনের মা এই সম্বন্ধের গোড়া - সকলের তিরস্কার-দৃষ্টি তাঁহার দিকে পড়িল।

জীবনের মা বলিলেন "ঠাকুর পো যে গহনার টাকা সব ধরে নিয়েছেন। তবু এই কথানা যে তারা দিয়েছে তাদের ভাল বলতে হয়।"

কর্ত্রী ঠাকরুণ রাগিয়া বলিলেন "বটে—ঠাকুর পোকে জগৎ ডাক্তার ধন ঢেলে দিয়েছে নাকি? নাহয় এ কখানা নাই দিত,—তার জন্য এত কথা!"

এ বিবাহে জীবনের মার একরূপ যাচিয়া আসা। দেবর নিমন্ত্রণ করেন নাই—কর্ত্রী ঠাকরুণ দাসীর মুখে এ কটা কথার কথা রকমে আসিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু মোহনের বিবাহ—বিশেষ তিনিই এ বিবাহের ঘটক, তাই এই অনিমন্ত্রণ সত্ত্বেও বাসীবিবাহের দিন তিনি যৌতুক দিতে আসিয়াছিলেন। এসময় যদি তিনি কথা কন ত ঝগড়া হয়, সেরূপ তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; তাই তিনি চুপ করিয়া গেলেন। আর একজন বলিল "তা পরের মেয়ে এই দিয়েছে এই ঢের"! মোহনের পিসি বলিলেন—"তা পরের মেয়ে মনে করে ত আমরা দিইনি—মোহনের কি আর কনে জুটত না।"

নবাগত বালিকা বধূর মনের ভাবের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া সকলে তাহার সম্বন্ধে তাহার সাক্ষাতে—এই রূপ নানা কথা কহিতে লাগিলেন। তাহার হৃদয় তখন কি করিয়া উঠিতেছিল ভগবানই জানেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে স্নেহকে জীবনের মা জল খাওয়াইতে লইয়া গেলেন; খাওয়া তাহার যত হইল বলিবার আবশ্যক নাই। আহারের নামরক্ষার পর আবার সেই ঘরে সে আসিয়া বসিল। নিমন্ত্রিতাগণও এই সময় জলযোগ করিয়া কেহ বাড়ী গেলেন, কেহ কাপড় কাচিতে গেলেন, ইহাদের এই বিবাহ উপলক্ষে আপাততঃ এইখানেই স্থিতি। জীবনের মাও বধূর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন; বলিলেন,—"মা তবে আমি যাই"।

এই অপরিচিত কঠোর রাজ্যের মধ্যে তিনিই তাহার একমাত্র পরিচিতা আত্মীয়া স্নেহভাষিণী, সে তাঁহার হাত ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে করুণ-কণ্ঠে বলিল—"মাসী আমি কবে বাড়ী যাব—আমাকে নিয়ে চল"—তিনি তাহার অশ্রু মুছাইয়া বলিলেন—"মাসী না মা—এখন আমি তোমার জ্যেঠাই। আর যাবার কথা কি এখন বলতে আছে? এখন ফুল শয্যা হবে, বৌভাত হবে—তাপর জোড়ে যাবে—এখন কি যাবার কথা বলে? আমি তোমার দাসীকে এইখানে ডেকে দিয়ে যাই, সে কাপড় কেচে এল বলে?"

এতক্ষণ এখানে কেহ ছিল না, এই সময় কর্ত্রী ঠাকুরুণ কাপড় কাচিয়া ভিজা গামছায় এই ঘরের বারান্দার নিকট দিয়া নিজের ঘরে হরি নামের মালা আনিতে যাইতেছিলেন, একবার অমনি এই ঘরে উঁকি মারিয়া বলিলেন—"বৌ কি বলে কি মেজ বৌ?" জীবনের মা বলিলেন "কিছু না—ছেলে মানুষ বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে তাই কাঁদছে" শাশুড়ি বলিলেন—"অত বড় মেয়ে আবার মন কেমন! আর ঘরে কি না ১০ টা বাবা কাঁদছে" সংক্ষেপে এইরূপ মমতা প্রকাশ করিয়া কর্ত্রী নিজ গৃহে গমন করিলেন, স্নেহ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, জীবনের মারও চক্ষু দিয়া জল পড়িল, তাঁহার মনে হইল—'স্নেহ

যদি তাঁহার বৌ হইত ত বুকে করিয়া রাখিতেন, জীবন কেন বিবাহ করিল না।” জীবনের মা তাহার অশ্রু জল মুছাইয়া বলিলেন, “কেঁদ না মা—ও মাগীর ঐ রকম স্বভাব, ওতে কিছু মনে করো না।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রথম দিন শ্বশুরালয়ে আসিয়া স্নেহলতা ত এইরূপ আনন্দ উপভোগ করিল। অধিকাংশ বঙ্গবালাদিগেরই নব বধূ জীবনের প্রথম স্মৃতি অল্প বিস্তর পরিমাণে এইরূপ। প্রিয়-বিচ্ছিন্ন কোমল কাতর হৃদয়গুলি যখন অপরিচিতের মধ্যে আসিয়া একটি স্নেহ দৃষ্টি, একটি সাদর সান্ত্বনা বাক্যের জন্য লালায়িত—তখন সাধারণতঃ তীব্র সমালোচনার দংশনই তাহাদের সাদরোপহার—তাহাদের সম্মান অভ্যর্থনা।

একখানি নীরব কচিপ্রাণের মধ্যে অন্য মনুষ্যের ন্যায় সাড়া শক্তি আছে ইহা বোধ হয় সমালোচনাকারিণীগণের তখন মনেই আসে না, প্রাণহীন পাষাণ খণ্ডের সম্মুখে যেন তাঁহারা আপনাদের অকুণ্ঠিত, কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেন।

আজ যাহারা এইরূপ নির্দ্দয় সমালোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহাদের সময়ে তাঁহারাও ইহার জ্বালা ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার স্মরণে অন্যের বেলা ত তাঁহাদের দয়ার্দ্র হইতে দেখি না। যাহা আপনারা ভোগ করিয়াছেন—যাহা সর্ব্বদাই দশ জনকে ভোগ করিতে দেখিতেছেন—তাহা তাঁহাদের নিকট ক্রমে দস্তর কর্ম্ম হইয়া থাকে, ইহা নিষ্ঠুরতা বলিয়া হয়ত তাঁহাদের আর মনেই হয় না।

যাহা হউক বাসীবিবাহের দিন রাত ত একরকম করিয়া কাটিয়া গেল, পরদিন ফুল শয্যা। দুই প্রহরের পর হইতে নিমন্ত্রিতাগণ আসিতে আরম্ভ করিলেন। কাল কুঞ্জ বাবুর নিতান্ত আত্ম সম্পর্কীয়া যাঁহারা তাঁহারাই আসিয়াছিলেন—কিন্তু আজ তাঁহার এবং তাঁহার ভাজ ঠাকুরাণীর আত্মীয়া সম্পর্কে তিন কুলে যিনি যেখানে আছেন—(জীবনের মা ছাড়া) সকলেই নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন, অনেকেই উপস্থিত হইলেন। জীবনের মা আজ আর আসিলেন না।

আর একবার নূতন করিয়া গত দিনের মত বৌয়ের রূপের চর্চ্চা এবং দান সামগ্রীর আলোচনা শেষ করিয়া প্রৌঢ়াগণ একত্র হইয়া এক ঘরে গল্প ফাঁদিলেন। এক যুবতীর কাকা কন্যাকে আগা গোড়া জড়োয়া গহনায় ঢাকিয়া এবং ‘সাসোঁজ’ রৌপ্য-দান দিয়া কিরূপ ঘোরঘটা করিয়া বিবাহ দিয়াছেন, একজনের কাকা বড় মানষের মেয়ে বৌ করিয়া কিরূপ ঠকিয়াছেন, এক জনের ননদের খুড় তত ভাই টাকার লোভে কিরূপ কাল মেয়ে বৌ করিয়াছে—অধিকাংশ গল্পই এইরূপ।

এদিকে বিবাহিতা অবিবাহিতা বালিকাগণ, অল্প বয়স্কা যুবতীগণ অন্য ঘরে বৌকে ঘেরিয়া বসিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ পরিচয় গল্প আরম্ভ করিলেন।

এরূপ স্থলে বাক্যালাপ নিতান্তই এক পক্ষীয়। বধূ চুপ করিয়া থাকেন; অন্যেরা তাঁহাকে প্রশ্ন করে,—কিন্তু উত্তরের প্রত্যাশা না রাখিয়াই আপনারা গল্প করিয়া যায়। অধিকাংশই স্বামী সম্বন্ধীয় গল্প। বিবাহের রাত্রে, ফুলশয্যার রাত্রে কার স্বামী কিরূপে কাহাকে কথা কহাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোন রমণীর লজ্জা ভাঙ্গিতে কতদিন লাগিয়াছিল, কাহার স্বামী কাহাকে কত ভালবাসে, কোন দিন কি ভাবে সে ভালবাসা প্রকাশ পাইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আজও যুবতীগণ এই সকল গল্প করিতে করিতে স্নেহলতাকে সাজাইতে লাগিলেন।

তাহার চুল বাঁধিয়া দিলেন, তাহার পায়ে আলতা, সিঁথিতে সিন্দুর, কপালে চন্দন, চোখে কাজল পরাইয়া চিত্রিত করিলেন। এইরূপ সাজসজ্জায় গল্প স্বল্পে তাঁহাদের সময় সুখে কাটিয়া যাইতে লাগিল, কেবল মাঝে মাঝে 'কখন ফুলশয্যা আসিবে' বলিয়া ইহার মধ্যেও ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ফুলের গহনা ও শয্যা বস্ত্র সেখান হইতে আসিলে তবে তাঁহারা নববধূর সাজ সম্পূর্ণ করিতে পারেন।

সন্ধ্যার বাতি জ্বলিবার কিছু পরেই কর্ত্রী ঠাকরুণ ডাকিলেন—"আয় সব, তত্ত্ব আসছে—তোরা উঠিয়ে দেখে শুনে রাখ—" স্নেহলতাকে একাকী রাখিয়া সকলে উৎসুক হইয়া বড়দালানের দিকে ছুটিল; রঙ্গিন বস্ত্র মণ্ডিত থাল হস্তে, রঙ্গিন বস্ত্র পরিহিত দাসদাসীগণ পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় একে একে দালানে আসিয়া থালা নামাইতে লাগিল। সকলে আগ্রহ সহকারে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন! অনেকে 'তত্ত্বের' প্রশংসা আরম্ভ করিলেন; একজন বরকন্যার শয্যা বস্ত্র হাতে লইয়া সকলকে দেখাইতে লাগিলেন, সকলেই বলিলেন—"বেশ দিয়েছে, ডাক্তারের হাত দরাজ বটে"।

কিন্তু সংসারে এক একজন লোক আছেন, যাঁহাদের চোখে ভাল কিছুই পড়ে না, যে কোন জিনিস হউক, তাহার মধ্যে ভালটুকুর পরিবর্ত্তে যে তিল পরিমাণ খুঁৎ আছে, তাহাই তাঁহারা দেখিতে পান; মোহনের জ্যেঠাইমা এই প্রকৃতির লোক; জগৎ বাবু কিংখাপ দিলেও জ্যেঠাইমা সর্ব্বান্তঃকরণে খুসী হইতেন না—কোন না কোন খুঁৎ বাহির করিতেন। সুতরাং তিনি বস্ত্রের দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া দীর্ঘ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—মেয়ের বেনারসী—ছেলের ঢাকাই, তা এমন কাপড় ঢের দেখেছি—ওলো বৌরা—কনের ফুল চন্নন কাপড় নিয়ে যা"।

কনের বাড়ীর দাসী চাকরগণ তাঁহার এই নাসিকা কুঞ্চিত বাক্যে রাগে গসগস করিয়া উঠিল—কিন্তু কথা কহিতে সাহস করিল না। ক্রমে দালান পরিষ্কার হইল, জিনিসপত্র ঘরে উঠিল, বেহাই বাড়ীর চাকর দাসী বিদায় হইল, ফুলসজ্জিত বরকন্যা ঝাড়লণ্ঠন প্রজ্জ্বলিত ফুলশয্যাগৃহে আনীত হইয়া মসলন্দের উপর বসিলেন, তখনো

নৃত্যকারিণীগণ আসিয়া পৌঁছে নাই; যুবতীগণ বরকন্যাকে ঘেরিয়া মঙ্গল ভাঁড় খেলাইতে লাগিলেন, চারিদিক হইতে হুলুধ্বনি আতর গোলাপ ফুল বৃষ্টি হইতে লাগিল, ক্রমে ঠাট্টা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বিবাহ উৎসবের সেই চির-প্রচলিত চির পুরাতন ঠাট্টা—প্রত্যেক রমণীরই নিজের অতীত জীবনের সুখস্মৃতি সুখস্বপ্ন যাহাতে বিজড়িত বলিয়া চির নবীন সরস উপহাসের ন্যায় চিরদিন যাহা তাঁহাদের উপ-ভোগ্য,—তাহার বর্ষণে চারিদিক আনন্দময় হইয়া উঠিল। বরের দিদিমা-সম্পর্কীয় রমণী ঠাট্টার সূত্রপাত করিলেন, তিনি কন্যার মুখের ঘোমটা খুলিয়া বলিলেন—"দেখরে ভেঁড়ো হতে পারবি ত?" তখন জগদ্ধাত্রী ঠাকরুণ—পাড়ার সর্ব্বসাধারণের পিশিমা, আর ঠাট্টার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না—মোহনের হাতে সন্দেশ দিয়া বলিলেন—"বাছা কনেকে খাইয়ে দেও, দিতে হয়"। মোহন ইহাতে কোন আপ-ত্তির কারণ না দেখিয়া তাঁহার অভিমত কার্য্য করিবামাত্র অমনি চারিদিকে হাসির ধূম পড়িয়া গেল। অতঃপর মোহনের ভ্রাতৃজায়া সম্পর্কীয় একজন পশ্চাৎ হইতে তাহার কাণ মলিয়া সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—"কেমন বর, কথা কয়না কেন, একটা গান কর—" মোহন বলিলেন—"আমি গান জানি না"—তিনি বলিলেন "বৌকে কোলে করতে জান ত? কোলে কর" চারিদিক হইতে অনুরোধ উঠিল "বৌকে কোলে কর—কোলে করতে হয়—" মোহন তাহাতে নীরবে আপত্তি প্রকাশ করায় তাহার কর্ণ নাসিকা রক্ষা দায় হইয়া উঠিল, সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল, এদিকে একজন রমণী স্নেহকে জোর করিয়া উঠাইয়া তাহার কোলে বসাইয়া দিলেন। অত্যন্ত হাসির গড়রা উঠিল; বেচারা বর বিষম অপ্রস্তুত হইয়া স্নেহকে নামাইয়া দিবে কিম্বা কোলে করিয়া রাখিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। এমন "জাক্সটা পোজিসনে" কিশোরীও কখনো পড়ে নাই। এমন সময় ঘুঙ্গুরের শব্দ হইল—সকলে আহ্লাদে বলিয়া উঠি-লেন—ঐ নাচওয়ালী আসছে।" এই আনন্দ উৎসবে নৃত্যকারিণীগণ নহিলে তাঁহাদের আনন্দ পূর্ণ হইবার নহে।

সকলের ব্যস্ততার মধ্যে মোহন স্নেহকে নামাইয়া দিলেন। নৃত্যকারিণীগণ গৃহে প্রবেশ করিল, মুন্দিরারধ্বনি, বাঁয়া তবলার চাঁটি, ঘুঙ্গুরের রুনুঝুনু আরম্ভ হইল, বর কন্যার সম্মুখে নাচিতে নাচিতে তাহারা গান ধরিল—

"নাগর মনের মত মিলিলো ভালো
রূপে জুড়ায় আঁখি ভুবন আলো।"

দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ফুলশয্যাগৃহে নৃত্যগীত চলিল, তাহার পর বর কন্যাকে নিদ্রাতুর দেখিয়া নৃত্যকারিণীগণ অন্য গৃহে নীত হইল। এখন যাঁহার ইচ্ছা তিনি জলযোগ করিয়া গৃহে যাইবেন, যাঁহার ইচ্ছা তিনি আরো নৃত্যগীত ভোগ করিবেন। নৃত্যকারিণীগণ অপর গৃহে গমন করিলে বর কন্যার শয়ন উদ্যোগ আরম্ভ হইল। ঝাড় লণ্ঠন সমস্তই

প্রায় নির্ব্বাপিত করিয়া রমণীগণ আপনারা আতর গোলাপে ফুলমাল্যে ভূষিত হইলেন, এবং বর কন্যাকেও ভূষিত করিলেন। তাহার পর হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি মঙ্গলাচরণের মধ্যে তিনজন যুবতী ফুলসজ্জিত পালঙ্কের মশারি খুলিয়া ধরিলেন। বর কন্যা পালঙ্কে প্রবেশ করিলে একজন যুবতী নিজের ইচ্ছামতরূপে স্নেহ লতাকে শয্যা-শায়িত করিলেন—অন্য যুবতীগণ তাহাদের গাত্রে ফুল বৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ফুলশয্যা শেষ করিয়া তাঁহারা উপহাস বর্ষণ করিতে করিতে গৃহের বাহির হইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

সকলে চলিয়া গেল, গৃহ নিস্তব্ধ হইল, স্নেহের এতক্ষণকার রুদ্ধঅশ্রু আর বাঁধ মানিল না, সে বিছানায় শুইয়া কাঁদিতে লাগিল। হঠাৎ চমকিয়া উঠিল, মোহন তাহার গায়ে হাত দিয়া সস্নেহে বলিলেন—"কাঁদিতেছ কেন?" শ্বশুর গৃহে আসিয়া স্নেহলতা যেরূপ অভ্যর্থনা পাইয়াছে—সে জানিত সেইরূপ সমাদর, সেইরূপ অভ্যর্থনাই চিরদিন তাহার এ গৃহে প্রাপ্য, সহসা এই করুণ স্বর তাহার অন্তস্তলে প্রবেশ করিল, সে সচকিতে ঘোমটার মধ্য হইতে মোহনের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। যুবতীগণ তাহাকে মোহনের দিকেই ফিরাইয়া শোয়াইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ঘোমটার মধ্য হইতে মোহনকে সে ভাল করিয়া দেখিতে পাইল না, স্নেহকে মুখ উঠাইতে দেখিয়া সযত্নে মোহন তাহার ঘোমটা ঈষৎ খুলিয়া দিলেন, সে ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিল, দেখিল সে মুখ সত্যই করুণ স্নেহের ভাবে পূর্ণ, তাহার হৃদয়ে আশ্বাস জন্মিল, তাই তাহার অশ্রু আর একবার উথলিয়া উঠিল, সে বলিল "আমি বাড়ী যাব"? স্বামী বলিলেন—"আমি তোমাকে যত্ন করিব—আমার কাছে থাকিতে পারিবে না?" স্নেহ বলিল "না"।

মোহন বলিলেন—"আচ্ছা তোমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব—কাঁদিও না"—সে বলিল "কবে?" স্বামী বলিল—বৌভাত যাক"? বলিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিলেন এবং তাহাকে ঘর্ম্মাক্ত দেখিয়া শয্যাস্থিত ফুলের পাখা লইয়া আস্তে আস্তে বাতাস করিতে লাগিলেন। হঠাৎ খাটের ওপাশ হইতে তাঁহার ভ্রাতৃ জায়া সম্পর্কীয় একজন রমণী খিলখিল করিয়া হাসিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"সব শুনেছি ঠাকুর পো—এর মধ্যে এত ভালবাসা"! ঠাকুর পো নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। স্নেহলতার মনে ভয় ও লজ্জা যুগপৎ উদয় হইল। এই ভয়—যদি তাহার আর বাড়ী যাওয়া না হয়। লজ্জা এই, সকলে শুনিল সে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিয়াছে। স্বামীর সহিত প্রকাশ্যে কথা কওয়া যে লজ্জার বিষয়, অন্য যুবতীগণের কথা বার্ত্তায় এই দুদিনের মধ্যেই তাহার সে জ্ঞানলাভ হইয়াছিল, কিন্তু কথা কহিবার সময় তাহার ও কথা মনে ছিল না। ভ্রাতৃ জায়া ত চলিয়া গেলেন। সে রাত্রে বরকন্যার কথা বার্ত্তা এখানে শেষ হইল। আবার কে আড়ি পাতিয়া শুনিবে—বর সাবধান হইয়াও দুই একটা কথা

কহিলেন,—কিন্তু স্নেহলতা আর কোনই উত্তর করিল না,—স্ত্রীলোকের লোকলজ্জাভয় বড় অধিক। তাপর দুজনে ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন সকাল না হইতে হইতে বর বাহিরে গেলেন। যে সকল অল্পবয়স্কা বিবাহিতা বালিকাগণ বিবাহ উপলক্ষে এই বাড়ীতে আসিয়া আছে—তাহাদের দ্বারা কন্যার পালঙ্ক অধিকৃত হইল। রাত্রে কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহা বিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে স্নেহকে সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সে চুপ করিয়া রহিল। সকলে বিরক্ত হইয়া তাহাকে ট্যাটা বলিতে লাগিল এবং অন্য কে কোন লক্ষ্মী মেয়ে ফুলশয্যার দিনের আমূলগল্প তাহাদের নিকট করিয়াছিল, তাহার প্রশংসা করিতে করিতে আজিকার নৈরাশ্য দুঃখ নিবৃত্ত করিল। যাহা হউক স্নেহলতা মৌনী সত্বেও তাহাদের রাত্রের কথোপকথন প্রকাশ হইল, ক্রমে জ্যেঠাইমার কর্ণেও তাহা উঠিল—তিনি দুই হাত গালে দিয়া বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন—"বাবারে এ কি মেয়ে? এর মধ্যে এত কথা! ছেলেকে যে দুদিনে যাদু করবে?"

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

বঙ্গ সাহিত্যের প্রথম কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। দুই জনে সম সাময়িক লোক ছিলেন, সমান বিষয় লইয়াই দুই জনের কবিতা—রাধা কৃষ্ণের মিলন বিরহ, মানাভিমান, পূর্ব্বরাগ অনুরাগ। কিন্তু বিষয় এক হইলেও দুই জন কবির ভাব অবশ্য সম্পূর্ণ এক নহে, দুই জনের বর্ণনার মধ্যে একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। বিদ্যাপতি আপন হৃদয়ের মধ্য দিয়া রাধা কৃষ্ণকে দেখিয়াছেন, আপন রুচি অনুযায়ী আঁকিয়াছেন, সাজাইয়াছেন; চণ্ডীদাসও নিজের মত করিয়া তাঁহাদিগকে গড়িয়াছেন, নিজের হৃদয়ের ভাব দিয়া তাঁহাদের প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং হৃদয়ের একই ভাব বর্ণনা করিতে বসিলেও উভয় কবির বর্ণনা যে বিভিন্ন হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। বিদ্যাপতিও রাধার রূপ খুলিয়া বসিয়া গিয়াছেন, চণ্ডীদাসও রাধার রূপের বর্ণনা করিয়াছেন; তাই বলিয়া দুই জনের রূপ বর্ণনা কি একই রকম? দুই জনেই রাধার রূপের সুখ্যাতি করিযাছেন, দুই জনেই রাধাকে সুন্দরী বলিয়াছেন, সে সুন্দরী বাঙ্গলাদেশের সুন্দরী—সেই কৃষ্ণ কেশ গুচ্ছ, সেই মৃগলোচন, সেই চন্দ্র বদন, কিন্তু তথাপি দুই জনের বর্ণনা কি তফাৎ! এক বর্ণনার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্যাপতি, আর এক বর্ণনার মর্ম্মে মর্ম্মে চণ্ডীদাস। লেথার সহিত গ্রন্থকার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে জড়িত।

শুধু ভাবের কথা কেন, বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের ভাষারও বিস্তর প্রভেদ। বিদ্যাপতি হিন্দীর ধারে ধারে ফিরিয়াছেন, তাঁহার অনেক কথা স্পষ্ট হিন্দী; চণ্ডীদাস বাঙ্গালী, তাঁহার লেখায় হিন্দী বড় একটা জোর করিয়া উঠিতে পারে নাই, তবে প্রাচীন বাঙ্গলার হিন্দীর সহিত সম্পর্ক আছে যে, ইহা বুঝা যায়। বিদ্যাপতি বাছিয়া বাছিয়া মধ্যে মধ্যে শ্রুতিমধুর কথা সংগ্রহ করেন, তাঁহার সাজ সজ্জার একটু পারিপাট্য আছে; চণ্ডীদাস সাদাসিধা, ভাব আসিতেই হুহু করিয়া লিখিয়া যান, অন্যদিকে তাঁহার বড় একটা লক্ষ্য থাকে না। বিদ্যাপতি যেন কিছু গুছাইয়া বসিয়াছেন; চণ্ডীদাসের কোন দিকে খেয়াল নাই। কিন্তু সে যাহা হৌক, পাঠকেরা ভুল না বুঝেন যে, বিদ্যাপতি ভাবের অভাবেই পরিচয়স্থল। বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের ভাবে ভাষায় তফাৎ থাকিতে পারে, কিন্তু একজনের একেবারে ভাবের অভাব নাই। আর ভাবের স্বাতন্ত্র্যই যদি না থাকিবে, তবে দুই জন কবি বলা কেন?

বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসকে প্রেমের কবি বলা যাইতে পারে। প্রেমের সুরে চণ্ডীদাস যেমন গাহিতে পারিয়াছেন, বিদ্যাপতি তেমন পারেন নাই। চণ্ডীদাসের কবিতায় সর্ব্বত্রই প্রেমের বিশেষ বিকাশ হইয়াছে। সুখের প্রতিই তাঁহার এক মাত্র টান নহে। একটা উচ্চ ভাবের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য আছে—প্রেম আর মোহ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ তাহা তিনি জানেন। চণ্ডীদাস ত বলিয়াইছেন,

"পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলায় তথা॥"

বাস্তবিক, প্রেম কি যেখানে সেখানে মিলে? প্রেমের দুয়ারে যে প্রাণ বলি দিতে পারে, সেই প্রেম পায়। আপনাকে প্রেমে ঢালিয়া দিতে হইবে, প্রেমে আর আপনায় স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। যাহারা সুখের জন্য প্রেম চাহে, তাহাদের কপালে সুখ উঠে না।

"সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঞি॥"

আমাদের বর্ত্তমান একজন কবিও তাহাই বলিয়াছেন, "এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না।" চণ্ডীদাস পিরীতিকে সকল রসের সার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,

"পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার পরাণ তার॥"

বিদ্যাপতিও প্রেমের উপরে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের মত উচ্চ-ভাবের কথা তাঁহার মন্তব্যে পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতি কহিয়াছেন,

"প্রেম কারণ জীউ উপেখয়ে
জগজন কো নাহি জানে।"

প্রেমের জন্য জীবন উপেক্ষা করে, বিদ্যাপতি স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি চণ্ডী-দাসের উপরি উদ্ধৃত কবিতায় প্রেমের মহান্ ভাব যেমন ব্যক্ত হইয়াছে, বিদ্যা-পতির লেখায় কি এ ভাব তেমন পরিস্ফুট হইয়াছে? চণ্ডীদাসের কথার ধরণে একটা সরল সুন্দর ভাব আছে, বিদ্যাপতিতে তাহা নাই। কিন্তু পাঠকেরা একেবারে হতাশ হইবেন না, বিদ্যাপতির দুই একটী গান যাহা আছে, তাহা বাঙ্গলা সাহিত্যের বিশেষ গৌরব, অন্য কোনও সাহিত্যে বোধ করি তেমনটী নাই।

চণ্ডীদাস প্রেমের জ্বালা বেশ বুঝেন, যাহারা জ্বালা সহিতে পারে না তাহারা প্রেমের রাজ্যে বাস করিবার অযোগ্য। জ্বলনেই ত প্রেম, সুখের মাঝে কি প্রেম তেমন ফুটিতে পায়?

"দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি॥"

চণ্ডীদাস আর এক স্থলে বলিয়াছেন,

"সদা জ্বালা যার, তবে সে তাহার
মিলয়ে পিরীতি ধন।"

কিন্তু থাক্, শুধু শেষ দুই লাইনের মন্তব্যটুকু দেখিয়া দুই জন কবির স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ-রূপে উপলব্ধি করা যায় না। দুই জনের রূপ বর্ণনা, দুই জনের মিলন বিরহের ভাব প্রকাশ, দুই জনের উপমা অলঙ্কার, এ সকল বিশেষ করিয়া মিলাইয়া দেখিতে হইবে। তবেই না দুই জন কবির স্বাতন্ত্র্য সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে? চণ্ডীদাস যে প্রেমধনে ধনী, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় না থাকিতে পারে, কিন্তু আরও কিছু না বলিলে—আরও ভাল করিয়া বিদ্যাপতির রচনার সহিত তাঁহার লেখার তুলনা না করিলে আমরা দুইজন কবির প্রাণ ধরিতে পারি না।

চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতির সহিত তুলনায় আমরা দুঃখের কবি বলিতে পারি। চণ্ডী-দাস যে তাঁহার লেখায় অনবরত দুঃখের কথা পাড়িয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার রচনায়, হয়ত অজ্ঞাতসারে, কেমন একটা দুঃখের ভাব প্রবেশ করিয়াছে। লেখা দেখিয়া মনে হয়, কবির জীবনে তেমন সুখের প্রসাদ লাভ ঘটে নাই। প্রাচীন কবি-দিগের সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে আমরা কিছু বলিতে পারি না, যেখানে পণ্ডিতদিগেরই পদস্খলন সম্ভাবনার অসদ্ভাব নাই, সেখানে আমরা জোর করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করি কিরূপে? কিন্তু সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, চণ্ডীদাসের জীবনে দুঃখ কষ্টের বিশেষ প্রভাব

পড়িয়াছে। মোদ্দা তাহা হৌক বা না হৌক্, তাঁহার হৃদয় দুঃখভাবসিক্ত ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আপাততঃ সে কথা লইয়া তর্ক করিতে বসিবার আবশ্যক দেখি না। কথাটায় তর্কের বিশেষ কিছু নাইও।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধার রূপে হৃদয় হারাইয়াছেন, রাধার সৌন্দর্য্যে কোনও পবিত্র মহান্ ভাবের বিকাশ দেখিয়া নহে, রাধার রাঙ্গা অধরে, নলিন নয়নেই তিনি আকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম—যদি ইহাকেও প্রেম বলিতে হয়!—রূপজ-মোহ মাত্র। অতীন্দ্রিয় ভাবের এখানে সম্পূর্ণ অভাব। এ প্রেম যৌবনের জোয়ারেই টিঁকিয়া থাকে, তাহার পর যৌবনাবসানে মরিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ গুণের অথবা উচ্চ ভাবের ধার দিয়াও যান নাই। ভোগলালসা পরিতৃপ্তি বৈ তাঁহার অপর কোনও উদ্দেশ্য দেখা যায় না। এখন দেখিতে হইবে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ রাধার সৌন্দর্য্য কিরূপ দেখিয়াছেন।

বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণ রাধার বাহ্যসৌন্দর্য্য বৈ কিছুই দেখেন নাই। তিনি রাধার প্রত্যেক অঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়াছেন—অধরের রাঙিমা, নয়নের চাহনি, চরণের গজেন্দ্র গমন। রাধা হাসিয়া কথা বলিতেছেন, সে হাসির সৌন্দর্য্য কিরূপ? না, শরৎ পূর্ণিমার চন্দ্র যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছে। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ রাধার সকল বাহ্য সৌন্দর্য্য এক করিয়া মোটামুটী ভাবে প্রায় দেখেন নাই। কেবল দু'এক জায়গায় রাধাকে এক করিয়া দেখিয়াছেন মাত্র। সেখানে রাধার সহিত নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের তুলনা করিয়াছেন। অন্য উপমাও এক আধটী আছে। কিন্তু সকল উপমাগুলিই রাধার বাহিরের জিনিসে—তা' চন্দ্রেই হৌক্, বিদ্যুতেই হৌক্, আর যাহাতেই হৌক। শ্রীকৃষ্ণের উপর সে সৌন্দর্য্যের প্রভাব একটী শ্লোকে বেশ ভাল করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সে শ্লোকটী,

"সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘ মালা সঞে তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥" ইত্যাদি।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণও রাধার বাহ্যসৌন্দর্য্য-মুগ্ধ। তিনিও রাধার বদন-কমল, হরিণনয়ন দেখিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ বিদ্যাপতির কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধাকে দেখিয়াছেন ভাল করিয়া। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ রাধার তাঁহার প্রতি লক্ষ্যই অধিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন, সমস্ত রাধাকে দেখিবার—তেমন বিশেষ করিয়া দেখিবার—তাঁহার সুবিধা হইয়া উঠে নাই, কিন্তু খানিকটা রাধাকে তিনি বেশ করিয়া দেখিয়াছেন। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ রাধার আড়নয়নে ঈষৎ হাসি লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত রাধাকে—আপাদ-মস্তক—তিনি দেখিতে ভুলেন নাই। রাধাকে ভাগে ভাগে অঙ্গে অঙ্গে ছাড়া এক করিয়াও তিনি অনেকটা দেখিয়াছেন। বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাস রাধার মধ্য হইতে দেখিয়া তুলনা দিয়াছেন। যেমন,

"হিয়ার মালা, যৌবনের ডালা,
পসারী পসারল যেন।"

এখন এই পূর্ব্বরাগে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ কিরূপভাবের রাধাকে দেখিয়াছেন, দেখিতে হইবে। দুই জনের রাধাই হাবভাবশূন্যা নহেন। কিন্তু বিদ্যাপতির রাধা ফিকির কৌশলে দক্ষা অধিক। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ দেখিয়াছেন, রাধার হাসির চাহনি পর্য্যন্ত। কিন্তু বিদ্যাপতির কৃষ্ণ দেখিয়াছেন আরও ঢের। রাধা হাসিয়া তাঁহার পানে ফিরিয়া দেখেন, দূরে গিয়া সখীদিগের ডাকিবার ছলে শ্রীকৃষ্ণের পানে চাহিয়া লয়েন, ইত্যাদি। শুধু ইহাই নহে, মুক্তাহার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সখীদিগকে মুক্তা কুড়াইতে বলেন, এই অবসরে তাঁহার শ্যাম দর্শন হয়। এ রাধা চণ্ডীদাসের রাধা অপেক্ষা পাকা। চণ্ডীদাসের রাধার এতটা কৈতব শুনা যায় না।

কিন্তু শুধু শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের উপর নির্ভর করিয়া রাধা সম্বন্ধে এত কথা বলা কি ভাল দেখায়? নায়িকার পূর্ব্বরাগটাও মনোযোগ সহকারে দেখা আবশ্যক। রাধিকা সুন্দরীও ত শ্রীকৃষ্ণে মজগুল। বিদ্যাপতির রাধিকা, চণ্ডীদাসের রাধিকা দুই জনেই শ্যামের রূপে মুগ্ধ, দুই জনেই বংশীধরের বাঁশীর সুরে আকুল। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার কথায় এই আকুলতা যেমন ব্যক্ত হইয়াছে, বিদ্যাপতির রাধায় তেমন হয় নাই। বিদ্যাপতির রাধা সখীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর কথা বলিতেছেন,

"কি কহব রে সখি ইহ দুঃখওর।
বাঁশী নিশাস গরলে তনু ভোর॥
হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু মনোলাজ॥" ইত্যাদি।

আর চণ্ডীদাসের রাধিকা? এক কথায় তাঁহার সব বলা হইয়াছে—"বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা?" তাইত, এত নাম থাকিতে বাঁশীতে রাধা নামই বাজে কেন? রাধাপেক্ষা কি সংসারে আর মিষ্ট নাম নাই? তাহা ত নয়, নাম ত ঢের আছে। কিন্তু– কিন্তু মাধবের নিকট রাধা বৈ-আর নাম নাই। তাই না? তাহা নয়ত কি।

বিদ্যাপতির কবিতায় অনেক কথা বলিয়া একটী ভাব প্রকাশ হইয়াছে, চণ্ডীদাস ভাবটুকু ছুঁইয়া, গেছেন মাত্র। আর যেখানে অনেক কথা তিনি বলিয়াছেন, সেখানে ভাবেরও প্রায় বিস্তৃতি লক্ষিত হয়। এই আকুলতার ভাব প্রকাশক তাঁহার একটী গান আছে। তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দি। পাঠকেরা শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন, এগান মর্ম্ম বিঁধিয়া উঠিয়াছে কি না।

"সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।

না জানি কতেক মধু,
শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম,　অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে ?
নাম পরতাপে যার
ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয় ?
যেখানে বসতি তার,　নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী ধরম কৈছে রয় ?
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব, কি হবে উপায় ?
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে,　কুলবতী কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায় ॥”

এ আকুলতা, হাসি বাঁশী বাদ দিয়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নায়িকার পূর্ব্বরাগে নায়কের যে রূপ বর্ণনা আছে, তাহা দেখিলেও বুঝা যায়, বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাস কত উচ্চদরের কবি। বিদ্যাপতির বর্ণনায় কেমন যেন একটা ভাবের আঁটাআঁটি আছে বলিয়া বোধ হয়। সব সময়ে ভাবগুলি যেন আপনি আসে নাই—বিদ্যাপতির সংস্কৃত সাহিত্যে দখল ছিল বলিয়া আসিয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাসে ভাবের কি স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি! হৃদয়ের কি স্বতঃ উচ্ছ্বাস! লেখনী হস্তে কড়ি কাষ্ঠের পানে চাহিয়া তাঁহাকে ভাবিতে হয় নাই। তিনি জ্যোৎস্নাকে চাহিলেন, তাঁহার সম্মুখের কাগজের উপর জ্যোৎস্না ফুটিয়া পড়িল। তিনি কৃষ্ণকে সাজাইতে কোটী যুগ চাহিলেন, তাঁহার কৃষ্ণের অঙ্গুলি-উপরে যুগযুগান্তর প্রতিবিম্বিত হইল। বিদ্যাপতি অধরের রাঙিমা, বদনের ছাঁদটী লইয়াই প্রায় সন্তুষ্ট। চণ্ডীদাস অধরের রাঙিমায় ডুবিতে চাহেন, অধরের হৃদয়ে বসিয়া তাঁহাকে চুম্বনের সুখ অনুভব করিতে হইবে। বিদ্যাপতি বলিলেন, মুখখানি ত বেশ, চাঁদই বা লাগে কোথায় ? চণ্ডীদাস বলিবেন, তাহা ত বটেই, কিন্তু শুধু তাহা দেখিয়া কি ফল, একবার চাঁদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া দেখ——দেখিবে, চন্দ্র নিংড়াইয়া যে সারের সার বাহির হইবে, ঐ মুখখানি তাহা দিয়া গঠিত। বিদ্যাপতি দূরে দাঁড়াইয়া বলিলেন ; চণ্ডীদাস আপনাকে সেই সৌন্দর্য্যে হারাইয়া বলিলেন।

পাঠকেরা এতক্ষণ মনে করিতেছেন, চণ্ডীদাসের দিকে আমরা কিছু ঢলিয়া পড়িয়াছি, নহিলে বিদ্যাপতির বিরহ বর্ণনার এখনও উল্লেখ করা হইল না কেন। আমরা

একেবারে কাহারও দিকে ঢলিয়া পড়ি নাই, তবে ক্রমে ক্রমে সকল কথা বলিব, একেবারে চারিদিক লইয়া আলোচনার বিশেষ সুবিধা বোধ হয় না। বিদ্যাপতির বিরহ ছাড়িবার জিনিস নহে।. তাঁহার বিরহের কতকগুলি গান বড়ই চমৎকার ভাবময়। স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন,

"সজল নয়ান করি, পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।"

প্রিয়তমের পথ চাহিয়া দিন আর কাটে না। সময় ত আগেকার মতই চলিয়াছে, আগেকার মতই দিন আসে যায়, কিন্তু রাধার কত যুগ কাটিয়া গেল। পথ পানে চাহিয়া থাকিলে কি তবে যুগ যুগ কাটিয়া যায়? যায় বৈকি। দিন হুহু করিয়া চলিয়া যায়, তবু দিন ফুরায় না। রাধারও তিলে তিলে যুগ কাটিয়া যাইতেছে, তাই তাঁহার দিন কাটিতেছে না। আর এই দিন কাটে না বলিয়াই তাঁহার সজলনয়ান। রাধার "তিল এক হয় যুগ চারি।"

রাধা যে শুধু সজল নয়নে পথ চাহিয়াই থাকেন, তাহা নহে। বিরহের মধ্যে অভিশাপ লাগিয়া আছে। কিন্তু অভিশাপ কাহাকে? কালকে বুঝি? কালকে হইলে ত রক্ষা ছিল, কিন্তু রাধা কালকেই বিরহের কারণ ঠাহরান নাই, তাঁহার লক্ষ্য সচেতন পদার্থে। রাধার অভিশাপ শুনিলেই তাহা বুঝা যায়।

"নারীর দীর্ঘ নিশ্বাস, পড়ুক তাহার পাশ
পিয়া মোর যার পাশ বৈসে।"

তাহার পাশে এই দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ুক। এ কি সহজ কথা? তাহার বুকে শেল বিঁধাইয়া দিলে বুঝি প্রাণের আশ মিটে না, দীর্ঘ নিশ্বাসে তাহার কোমল হৃদয় খাক হইয়া যাক্--সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া মরুক্। রাধা, রাধা, তুমি তাহার হৃদয়ে ছুরিকা বিঁধাইয়া দাও, তাহার হৃদয়ের শোণিতে তোমার বিরহ-জ্বালার উপশম কর, কিন্তু এ অভিশাপ দিওনা গো। এ অভিশাপ তাহাকে—কাহাকে কে জানে?—তাহাকে দিও না।

চণ্ডীদাসের রাধাও আগে ভাগে অভিসম্পাত করিয়া বসেন। কিন্তু তাঁহার আবার এ রোগ কেন? কারণ অবশ্যই আছে।

"সই কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া!
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে?

আমার অন্তর　　যেমন করিছে,
তেমতি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া　　সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি,　　ছাড়িয়া পিরীতি,
আর জানি কার হয়?
আপনা আপনি,　　মন বুঝাইতে,
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ　　হরণ করিলে
কাহার পরাণে সয়?
যুবতী হইয়া,　　শ্যাম ভাঙাইয়া,
এমতি করিল কে?
আমার পরাণ　　যেমতি করিছে,
তেমতি হউক সে।"

পাঠকেরা চণ্ডীদাসের রাধার অভিশাপের সহিত বিদ্যাপতির রাধার অভিশাপের তুলনা করিয়া দেখিলে দুই জনের মধ্যে একটা বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাইবেন। দুই-জনেরই অভিশাপের মর্ম্ম কি এক নয়? মর্ম্ম একই বটে, দুই জনেই সেই "পিয়া মোর যার পাশ বৈসে" তাহাকে অভিশাপ দিতেছেন। দুই জনেরই শাপের মূল এক। কিন্তু দুই জন এক ভাবে অভিশাপ দিলেও দুই জনের কি তফাৎ! একজন বলিলেন, তাহার পার্শ্বে এই দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ুক, তাহার হৃদয়ে আর কিছুই বাঁচিয়া থাকিয়া কাজ নাই, কেবল এই মর্ম্মভেদী অনন্ত যাতনাময় নিশ্বাস সেখানে কাঁদিয়া বেড়াক্। আর একজন বলিলেন, আমার হৃদয় যেরূপ করিতেছে তাহার হৃদয়ও সেইরূপ হৌক। তোমার হৃদয় কি করিতেছে তুমিই জান, আমরা তাহা জানিতে চাহি না, কিন্তু পরের হৃদয় তুমি ভাঙ্গিতে চাহ কেন? তোমার হৃদয়ের সুখশান্তিটুকু কি তাহাকে দিতে পার? কৈ তাহাত চাহ না। তাহা চাহিবে কেন? তবে আর অভিশাপ কিসের? তোমার দীর্ঘ নিশ্বাস তাহার হৃদয়ে মাথা ঠুকিয়া কাঁদিয়া মরুক, ইহাই না তোমার বাসনা? তুমি সেই রাধা—বিদ্যাপতির হাত হইতে চণ্ডীদাসের হাতে আসিয়াছ মাত্র, কিন্তু তুমি সেই।

সে যাহা হৌক, বিদ্যাপতির বিরহ গানগুলিতে কেমন একটী ভাব আছে। তাঁহার "এ ভরা বাদর" শুনিলে বর্ষাকালের বিরহের ভাব কেমন যেন হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তাঁহার "সময় বসন্ত, কান্ত রহুঁ দূরদেশ" শুনিলে বসন্তের বিরহও তেমনি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু বিরহের অথবা মিলনের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বিদ্যাপতির কবিতার মর্ম্মগত একটা কি ভাব আছে, আমাদিগকে দেখিতে হইবে। চণ্ডীদাসের কবিতায় পিরীতি ভরপুর।

তাঁহার কবিতা পিরীতিময়। তাঁহার ভাব, "পিরীতি নগরে বসতি করিব, পিরীতে বাঁধির ঘর।" তিনি পিরীতি পিরীতি করিয়া মাতিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গানগুলিতে এত পিরীতি আছে যে, সকলগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলে একখানি রীতিমত পুঁথি হয়। বিদ্যাপতির কবিতাকে চণ্ডীদাসের তুলনায় যৌবনাচ্ছন্ন বলা যাইতে পারে। চণ্ডীদাসের কবিতায় যৌবনের অভাব দেখা যায় না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা যৌবনাচ্ছন্ন নহে। আর বিদ্যাপতিতে কেমন একটা অতৃপ্তির ভাব দেখা যায়। তাঁহার এই অতৃপ্তির একটী গান একেবারে বিখ্যাত। সে গান আমাদের,

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণ হিঁ শুনলু,
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়াইনু,
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥"

এ গানটী আমরা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করি নাই, মধ্যে খানিকটা তুলিয়া দিয়াছি মাত্র। বিদ্যাপতির কবিতায় আরও স্থানে স্থানে এই ভাবের বিকাশ হইয়াছে। তাঁহার একটী বাসন্তী বিরহের গানেও আছে,

"অনিমিখ নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে
তিরপিত না হোয় নয়ান।"

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস সম্বন্ধে মোটামুটী অনেক কথা বলা হইয়াছে। আর অধিক বকাবকি করিয়া পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। এখন সংক্ষেপে ইহাঁদের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া শেষ করা যাক্। বিদ্যাপতির কবিতা দেখিলে তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক, তাঁহার লেখায় সংস্কৃত সাহিত্যের ছায়া দেখা যায়। তাঁহার উপরে জয়দেবের বিশেষ প্রভাব। চণ্ডীদাস ঠাকুরে কাহারও বড় প্রভাব দেখা যায় না। জয়দেব তিনি পড়িয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু তাঁহার লেখায় জয়দেবের তেমন প্রভাব ত কৈ লক্ষিত হয় না। চণ্ডীদাসের লেখার স্থানে স্থানে তাঁহার নাট্যরসাস্বাদন ক্ষমতারও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। মানময়ী রাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য দেখিলেই আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবে। চণ্ডীদাসের ছন্দ প্রায়ই কিছু ছুটন্ত; বিদ্যাপতি কিছু ধীর। কিন্তু লেখা দেখিয়া চণ্ডীদাসকে যেমন সহজে চেনা যায়, বিদ্যাপতিকে তেমন সহজে ধরা যায় না। চণ্ডীদাস আপনার লেখায় ফুটিয়াছেন অধিক।

শান্ত সমুদ্র।

সুনীল আকাশ তলে
পসারিয়া নীল জলে
মহাকায় সাগর ঘুমায়;
সুপ্ত সিন্ধু বক্ষ পরে
চলে বায়ু খেলা করে,
খেলা ছলে ধীরে বহে যায়;
ঘন নীল অম্বুরাশি
সুখ স্বপ্নে উঠে হাসি
তরঙ্গের তর তর স্বরে
হাসি-ছায়া জলে পড়ে
নিস্তরঙ্গ সিন্ধু নড়ে
মৃদু মৃদু সোহাগের ভরে।
ধীরে আছাড়িয়া কূলে
কৃষ্ণকায় শৈলমূলে,
কলকলে করে জল খেলা;
শুভ্র শুভ্র ফেন মালা,
সাজায় কুসুম ডালা—
সুচিকন অসীম সে বেলা!
সায়াহ্নের শান্ত রবি
লোহিত মুখের ছবি
ঝাঁপ দিয়া পশিবারে চায়—
একধারে নীলাকাশ,
এক ধারে মেঘরাশ,
বিশাল মুকুরে পড়ে ছায়।
শিরেতে কনক রেখা
অঙ্গে নানা ছবি লেখা
মেঘের অঞ্চল লুটে জলে।
শুধু হাসি, সুধু খেলা,
শুধু সে ঘুমের মেলা,
ঘুম মাখা জল কল কলে।

জল পক্ষী কত শত
উড়ে আসে অবিরত
শৈল শৃঙ্গে পোহায় যামিনী ;
ধীরে সন্ধ্যা ভেসে আসে,
পূর্ণ শশী পূর্ব্বাকাশে,
চারিদিকে মধুর চাঁদিনী ;
চারিদিকে জলময়,
চারিদিকে মধুময়,
সলিলের শান্তি নিকেতন ;
সুন্দরে সুন্দরী ধীরে
সুধায় বসিয়া তীরে
'সাগরেতে ঝটিকা কেমন !'

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

অব্দ।

বাঙ্গলা দেশে যে সকল অব্দ প্রচলিত ছিল কিম্বা আছে, তৎসমস্তের যথাসাধ্য বিবরণ প্রকাশ করা আমাদের অভিপ্রায়। ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের কৃপায় একটি বিদেশীয় ও বিজাতীয় অব্দ আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছে, বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ সকলেই অন্য অব্দগুলিকে বিস্মৃতি-সাগরে ডুবাইয়া দিতে যত্নবান হইয়াছেন। স্কুলের পাঠ্য ইতিহাস-লেখকগণ ইহার প্রধান উদ্যোগী। এজন্য আমাদের দেশীয় প্রাচীন অব্দগুলি মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা ক্রমে ক্রমে সেই সকল অব্দের উল্লেখ করিব।

১। কলিগতাব্দ—৪৯৯০ বৎসর গত হইল মাঘী পূর্ণিমায় এই অব্দ আরম্ভ হয়। প্রাচীন হিন্দু রাজন্যবর্গ মধ্যে কোন কোন নরপতি এই অব্দ ব্যবহার করিতেন, কিন্তু এক্ষণে দেশীয় পঞ্জিকা ব্যতীত অন্য কিছুতেই এই অব্দ ব্যবহার হইতে দেখা যায় না।

২। পাণ্ডবাব্দ—শ্রীহট্ট প্রদেশে যে দুইখণ্ড তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সময় এই অব্দ প্রচলিত হয়, এজন্যই ইহাকে

পাণ্ডবাব্দ বলে। রাজস্থানের ইতিহাস লেখক কর্ণেল টড সাহেব বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ বেণ্টলি সাহেবের মতানুসরণ করিয়া বলেন যে, খৃষ্টাব্দ প্রচলিত হইবার ১১৭৯ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের অব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। তৎপরে অন্যান্য ইংরাজ লেখকগণ ইহাঁদের মতানুসরণ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় লেখকগণ অক্ষুব্ধ হৃদয়ে টড সাহেবের পদানুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় বেণ্টলি ও টডের গণনা ভ্রমাত্মক। কারণ এসম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহির কিম্বা কাশ্মীরের ইতিহাস লেখক কহ্লণ পণ্ডিতের মত তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। রাজতরঙ্গিনীর মতে ৬৫৩ কলিগতাব্দে যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেন। রাজাবলীর মতে তিনি ১২৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইহা অসম্ভব নহে। তাঁহার ৭৬ বৎসর বয়ঃক্রমে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। যদি এই সময় হইতে তাঁহার অব্দ গণনা করা যায়, তাহা হইলে এক্ষণে (৪৯৯০—৭২৯=) ৪২৬১ পাণ্ডবাব্দ চলিতেছ লেখা যাইতে পারে। কিন্তু বরাহমিহির বলেন ২৫২৬ পূর্ব্ব শকাব্দে যখন মঘা নক্ষত্রে সপ্তর্ষি মণ্ডল অবস্থিতি করিতেছিল, সেই সময় যুধিষ্ঠির রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। তদনুসারে এক্ষণে (২৫২৬+১৮১১=) ৪৩৩৭ পাণ্ডবাব্দ চলিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যুধিষ্ঠিরের জন্মকাল হইতে (৪৯৯০—৬৫৩=৪৩৩৭) পাণ্ডবাব্দ গণনা করা হইয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে বরাহ মিহির জীবিত ছিলেন। প্রায় সার্দ্ধ সপ্তশতাব্দী পূর্ব্বে কহ্লণ পণ্ডিত রাজতরঙ্গিনী রচনা করেন। এই প্রাচীন পণ্ডিতদ্বয়ের বিশদ মত পরিত্যাগ করিয়া আমরা সাহেবী কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে নিতান্ত অক্ষম।

৩। জৈনাব্দ—জৈনদিগের চতুর্ব্বিংশ জন তীর্থঙ্কর ছিলেন, ইহাঁদিগকে জিন বলে। জিনগণ দ্বারা প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম "জৈনধর্ম্ম" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। চতুর্ব্বিংশতি বা শেষ তীর্থঙ্করের নাম মহবীর। নিচ্ছবি (মিথিলা) রাজ্যের প্রধান নগরী বৈশালীর অন্তর্গত কুন্দগ্রাম নামক পল্লিতে মহবীর ৭০৭ পূর্ব্বশকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সেই দিবস হইতে জৈনাব্দের গণনা হইয়াছে। তদনুসারে এক্ষণে (৭০৭+১৮১১=) ২৫১৮ জৈনাব্দ চলিতেছে। অনেকেরই বিশ্বাস যে বিখ্যাত শেঠবংশের সহিত জৈনধর্ম্ম এদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু আমরা যেরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, মহারাজ অশোকের অভ্যুদয়েরও পূর্ব্বে জৈনধর্ম্ম বাঙ্গলায় প্রচলিত হইয়াছিল। অশোকের কিঞ্চিদূন সহস্র বৎসর পরে যখন চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিয়োন সাঙ এ দেশে আগমন করেন, তৎকালেও বাঙ্গলায় জৈন সম্প্রদায়ই প্রবল ছিল। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে জৈনদিগের দেবমূর্ত্তি সমূহ ভূগর্ভে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল বাঙ্গলায় জৈনদিগের প্রাধান্য ছিল।

৪। বুদ্ধাব্দ -শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ ৭০১ পূর্ব্বশকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৮০ বৎসর

বয়ঃক্রমে ৬২১ পূর্ব্বশকাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই দিবস হইতে এই অব্দ গণনা হইতেছে। সুতরাং এক্ষণে (৬২১ + ১৮১১ =) ২৪৩২ বুদ্ধাব্দ চলিতেছে। *

৫। সম্বৎ—উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য ১৩৫ পূর্ব্বশকাব্দে এই অব্দ প্রচলিত করেন।

৬। শকাব্দ—বাঙ্গলায় শকাব্দই বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। অদ্যাপি আমাদের জন্মপত্রিকায় এই অব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। প্রবাদ অনুসারে প্রতিষ্ঠানপুরের অধিপতি শালিবাহন শকদিগকে দমন করিয়া এই অব্দ সংস্থাপন করেন। কিন্তু গবেষণা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, গুপ্তবংশীয় সম্রাট মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য এই অব্দ প্রচলিত করেন। (১২৯৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের ভারতীতে প্রকাশিত "গুপ্তরাজগণ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) প্রতিষ্ঠানপুর মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্গত, গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। তদ্দেশাধিপতির সহিত শকজাতির কলহের কোন কারণ ছিল না। কোন কোন লেখক অনুমান করেন শকাব্দ প্রবর্ত্তক শালিবাহন মগধ দেশের অধিপতি ছিলেন; তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের অন্য নাম শালিবাহন বিবেচনা করিতে হইবে। গুপ্ত রাজগণ প্রথমতঃ কেবল মগধ দেশের অধিপতি ছিলেন। তৎপরে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার কুলতিলক পুত্র সমুদ্রগুপ্ত পরাক্রম সমগ্র উত্তর ভারত আপনাদের করতলস্থ করিয়াছিলেন।

৭। হর্ষাব্দ—কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের রাজ্যাভিষেক কাল হইতে এই অব্দ গণনা হইয়াছিল। আবু রিহান আল বিরোণী এই অব্দের

---

* বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব কাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ রহিয়াছে, আমরা তাহার কয়েকটি এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

১। শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভুটান দেশীয় লামা পদ্মকল্প লিখিয়াছেন—১১৩৪ শকাব্দে বুদ্ধাব্দ আরম্ভ হয়।

২। চীনদেশীয়বিখ্যাত ইতিহাস লেখক মাতঁওয়ালীন শকাব্দের একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, তাঁহার মতে ১১০৫ পূর্ব্বশকাব্দে বুদ্ধাব্দ আরম্ভ হয়।

৩। কহ্লণ পণ্ডিতের মতে ১৪১০ পূর্ব্বশকাব্দে বুদ্ধদেবের তিরোভাব হইয়াছিল।

৪। ব্রহ্মার প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ সমূহে লিখিত আছে যে, ৬২২ পূর্ব্ব শকাব্দে বুদ্ধাব্দ প্রচলিত হইয়াছিল।

৫। সিংহলদেশীয় প্রাচীন ইতিহাস মহাবংশের মতে ৬২১ পূর্ব্ব শকাব্দে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন।

৬। শ্যাম দেশীয় ইতিহাস-লেখকদিগের মতে ৬২২ পূর্ব্ব শকাব্দে বুদ্ধাব্দ প্রচলিত হইয়াছিল।

৭। আসামের রাজগুরুর মতে অজাতশত্রুর রাজ্যাভিষেকের অষ্টাদশবর্ষে ও চন্দ্রগুপ্তের ১৯৬ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন। এই গণনা দ্বারা ৬২২ পূর্ব্ব শকাব্দে বুদ্ধের তিরোভাব নির্ণীত হইতেছে।

উল্লেখ করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন ভ্রাতৃ হত্যার প্রতিশোধ লইবার মানসে প্রাচীন গৌড় নগর বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গলার রাজন্যবর্গ হইতে করগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অব্দ বাঙ্গলায় প্রচলিত হইয়াছিল কিনা, তাহা স্থির রূপে লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন। সম্ভবতঃ ৫৩০ শকাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

৮। ত্রিপুরাব্দ—ত্রিপুরেশ্বরদিগের অধিকৃত স্থানে এই অব্দ প্রচলিত রহিয়াছে। ৫১২ শকাব্দে এই অব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান ১৮১১ শকাব্দে ১২৯৯ ত্রিপুরাব্দ চলিতেছে। সম্ভবতঃ মহারাজ বীররাজ এই অব্দ প্রচলিত করেন।

৯। মল্লাব্দ—বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের অধিকৃত স্থানে এই অব্দ প্রচলিত ছিল। এই রাজবংশের স্থাপনকর্ত্তা আদিমল্ল ৬১৮. শকাব্দে এই অব্দ প্রচলিত করেন। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে মল্লাব্দের বয়ঃক্রম ১১৯৩ হইতেছে। কোন কোন লেখক বলেন ১০২ মল্লাব্দে আদিমল্লদেব বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মক। বংশ স্থাপনকর্ত্তা আদিমল্লের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মল্লাব্দ প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা প্রত্যয়োপযোগী নহে।

১০। পালাব্দ। প্রবল বিক্রম পালগৌড়েশ্বরগণ সকলেই আপনাদের রাজ্যাভিষেক কাল হইতে এক একটি নূতন অব্দ গণনা করিতেন। এজন্য তাঁহাদের কোন অব্দ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

১১। লক্ষ্মণাব্দ—বল্লালসেন দেবের পুত্র মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণ সেন দেব ১০২৮ শকাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া এই অব্দ প্রচলিত করেন। দীর্ঘকাল এই অব্দ বাঙ্গলায় প্রচলিত ছিল। অদ্যাপি মিথিলার পণ্ডিত সমাজে সামান্যরূপে ইহা "ল সং" আখ্যা দ্বারা প্রচলিত রহিয়াছে। *

১২। হিজিরি—মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনায় পলায়নের দিবস হইতে তাঁহার শিষ্যগণ এই অব্দ গণনা করিতেছেন। ৫৪৪ শকাব্দের ১ লা শ্রাবণ এই ঘটনা হইয়াছিল। চান্দ্র মাস অনুসারে এই অব্দের গণনা হইয়া থাকে, তদনুসারে বর্ত্তমান ১৮১১ শকাব্দের প্রথমভাগে ১৩০৬ হিজিরি চলিতেছে, ২০ শ্রাবণ ১৩০৭ হিজিরি আরম্ভ হইবে।

১৩। সন বা বঙ্গাব্দ। মোগল সম্রাট আকবর হিজিরি অব্দ চান্দ্র মাসের পরিবর্ত্তে সৌর মাস অনুসারে গণনার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। আকবরের প্রবর্ত্তিত প্রথা

---

* বিজ্ঞবর বেবেরিজ সাহেব লক্ষ্মণাব্দের আরম্ভ কাল লইয়া একটি সুন্দর তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। (J. A. S. B. Vol. LVII. part 1. pp. 1—7.) আমরা পশ্চাৎ ইহার মীমাংসা করিতে যত্ন করিব।

অনুসারে গণিত হইয়া সেই অব্দ আর্য্যাবর্ত্তে ও দক্ষিণাপথে "ফসলি," উড়িষ্যায় "বিলায়তী বা আমলী" ও বাঙ্গলায় "সন" আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইয়াছে। ১৪৭৭ শকাব্দের ৯৬৪ হিজিরি হইতে সৌর মাস অনুসারে প্রথম গণনা হইয়াছিল, তদনুসারে এক্ষণে (৯৬৪ + ৩৩২ =) ১২৯৬ বঙ্গাব্দ বা সন চলিতেছে।

১৪। কুচাব্দ—এই অব্দ কুচবিহার রাজ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। ইহা তথায় "রাজশক" নামে খ্যাত। কুচবিহারের বর্ত্তমান রাজবংশের আদিপুরুষ বিশ্বসিংহ দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৪ কুচাব্দে (১৪৪৫ শকাব্দে) সিংহাসনে আরোহণ করেন। বোধ হয় বিশ্বসিংহের মাতামহ হাজুকুচের মৃত্যু কিম্বা বিশ্বসিংহের মাসতুতা ভ্রাতা চন্দনের অভিষেক কাল (১৪৩১ শকাব্দ) হইতে কুচাব্দের গণনা হইয়াছে। বিশ্বসিংহ ও চন্দন উভয়েই হাজুর দৌহিত্র, তন্মধ্যে চন্দনই জ্যেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং হাজুর মৃত্যুর পর চন্দন মাতামহের পরিত্যক্ত আসন অধিকার করেন। চন্দনের মৃত্যুর পর হারুয়া মেচের কুলতিলক পুত্র বিশ্বসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তন্ত্র লেখক ব্রাহ্মণগণ গরিব হারুয়া মেচকে "বরখাস্ত" করিয়া মহাদেবকে বিশ্বসিংহের পিতৃস্থানে "নিযুক্ত" করিয়াছেন।

১৫। খৃষ্টাব্দ—বাঙ্গলার বিখ্যাত লেখকগণ কোন বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতে হইলেই অধিকাংশ স্থলে "পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ" কিম্বা "খৃষ্টাব্দ," না লিখিয়া "খৃষ্ট জন্মাইবার এত বৎসর পূর্ব্বে কিম্বা পরে এই ঘটনা হইয়াছিল" এরূপ লিখিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের এই সকল লেখা পাঠ করিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। কারণ তাঁহারা ইহা অবগত নহেন যে ভ্রমক্রমে খৃষ্টের চতুর্থ বৎসর হইতে এই অব্দ গণনা হইয়া আসিতেছে। ৮১ পূর্ব্ব শকাব্দে যীশু খৃষ্টের জন্ম, কিন্তু ৭৮ পূর্ব্ব শকাব্দ হইতে খৃষ্টাব্দের গণনা আরম্ভ হইয়াছে।

১৬। ব্রাহ্মসম্বৎ—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে দিবস যোড়াসাঁকোস্থিত ১৭৫ নং ভবনে আদি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, সেই দিবস হইতে ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসম্বতের গণনা করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান ১৮১১ শকাব্দে ৬০ ব্রাহ্মসম্বৎ চলিতেছে।

১৭। চৈতন্যাব্দ—চৈতন্যের সহচরগণ বোধ হয় প্রায় তিন শত বৎসর নিদ্রিত ছিলেন। দীর্ঘকালের পর তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। শ্রীহট্ট দেশীয় বৈদিক কুল কমলের ভাস্কর স্বরূপ—প্রেমাবতার চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুণী পূর্ণিমায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার কতিপয় অনুচর সেই দিবস হইতে এই অব্দ গণনা করিয়া সম্প্রতি ইহা প্রচার করিতে লালায়িত হইয়াছেন।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

ভৈরবী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"কিসের ভিড় ?"

"এক জন ভৈরবী এসেছে।"

এই বলিয়া দুই জনে ভিড় ঠেলিয়া ভিড়ের ভিতর প্রবেশ করিল। দুই জনই বলিষ্ঠ তরুণ পুরুষ—দুই জনই কাশীর গুণ্ডা।

মণিকর্ণিকার ঘাটে এক জন ভৈরবী আসিয়াছে। তাহাকে দেখিবার জন্যই এত ভিড়।

বেলা এখনও এক প্রহর হয় নাই। গঙ্গার জলে প্রভাত সূর্য্যের আলো পড়িয়াছে। মাঘ মাস। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে লোকে স্নান করিতে যাইতেছে। অনেকে স্নান করিয়া ঘাটের উপর রৌদ্রে দাঁড়াইয়া আছে। অনেকে বিশ্বেশ্বরের দর্শনে চলিয়াছে।

গুণ্ডা দুই জন দুই হাতে ভিড় সরাইয়া যে দিকে ভৈরবী বসিয়াছিল, সেই দিকে চলিল। ঘাটে নামিবার সিঁড়ীর এক ধারে ভৈরবী বসিয়া আছে। মুখ গঙ্গার দিকে। চারিদিক হইতে লোক ঘিরিয়াছে, কিন্তু ভৈরবীর বড় নিকটে কেহ নাই। একটু দূর হইতে দাঁড়াইয়া সকলে দেখিতেছে।

আগন্তুক দুই জন সিঁড়ীতে নামিয়া ভৈরবীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। আর সকলে একটু তফাতে দাঁড়াইয়া ছিল, ইহারা আরও নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। ইহারা ভয় অথবা সম্মান বড় জানে না, বিশেষ স্ত্রীলোক দেখিলে কখনই সম্ভ্রম করে না।

ভৈরবীকে দেখিয়া ভিড়ের কারণ বুঝিতে পারিল। ভৈরবী তরুণী—অপূর্ব্ব সুন্দরী। মাথায় দীর্ঘ জটা, জটা পড়িবার পূর্ব্বে বোধ হয় সে কেশরাশি বড় সুন্দর ছিল। বোধ হয় সেই চুলের মাঝখানে মুখখানি বড় শোভা পাইত। মাথায় জটা পড়িয়াও রূপ কমে নাই। কিন্তু এখনকার সৌন্দর্য্য কোমল নহে। ভৈরবী তেজস্বিনী, অঙ্গ হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইতেছে। সর্ব্বাঙ্গ গেরুয়ায় আবৃত; হাত, পা, মাথা কেবল দেখা যাইতেছে। মাথায় কাপড় নাই, জটারাশি পৃষ্ঠের চারিদিকে পড়িয়াছে—ধূলায় লুটিতেছে। লৌহ-নির্ম্মিত ত্রিশূল কোলে পড়িয়া রহিয়াছে।

ভিড়ের দিকে ভৈরবীর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। গঙ্গার জলে যেখানে ছোট ছোট ঢেউয়ের উপর সূর্য্যরশ্মি জ্বলিতেছে—ঢেউ হইতে ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছে, সেই খানে তাহার দৃষ্টি। মুখ গম্ভীর, মুখে শ্রান্তির চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। পায়ে পথের ধূলা, চক্ষু ঈষৎ ক্লিষ্ট, তাই যেন শীতল জলের দিকে চাহিয়া চক্ষুশ্রান্তি দূর করিতেছে। এমন সময়

উপরোক্ত দুই ব্যক্তি আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল—গঙ্গার জল, সূর্য্যের আলোক আর ভৈরবীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের ছায়া ভৈরবীর অঙ্গে পড়িল।

ভৈরবী চক্ষু তুলিয়া দেখিল দুই জন যুবা পুরুষ একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। মুখ ফিরাইয়া দেখিল বিস্তর লোক তাহাকে ঘিরিয়াছে। তখন সে নিঃশব্দে ত্রিশূল হাতে করিয়া উঠিল। ত্রিশূলের ফলক শাণিত, তাহাতে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

তাহাকে দেখিয়া সকলে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল। দাঁড়াইলে সকলে দেখিল যে ভৈরবীর আকৃতি কিছু দীর্ঘ, আয়তন পূর্ণ, গৈরিক বসনেও অঙ্গের লাবণ্য লুক্কায়িত হয় নাই। ভৈরবী দ্রুতপদে বিশ্বেশ্বরের মন্দির লক্ষ্য করিয়া চলিল। যুবক দুই জন তাহার সঙ্গ লইল।

একজন বলিল, "মায়ি, এখানে যদি তুমি নূতন আসিয়া থাক ত আমাদের সঙ্গে আইস, আমরা তোমায় ভাল বাসা দেখাইয়া দিতেছি।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের পাণ্ডারা আমাদের আত্মীয়। সেই-খানেই তুমি চল। সর্ব্বদা বিশ্বেশ্বরের নিকটে থাকিবে।"

ভৈরবী দুই জনের মুখের প্রতি চাহিয়া মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বলিল, "তোমরা আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর।" এই বলিয়া আরও দ্রুতগতি চলিয়া গেল।

ভৈরবীর কথা শুনিয়া দুই জনে একটু পিছাইয়া পড়িল, কিন্তু দৃষ্টির বাহির হইল না। ভৈরবী কোথা যায়, কি করে তাহাদের জানিবার ইচ্ছা। ভৈরবী যুবতী, পরমা-সুন্দরী, নিরাশ্রিতা, অরক্ষিতা। তাহার পাছু লাগিলে কোন ভয় নাই। অন্ততঃ কোথা যায় দেখিতে হইবে।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকট আসিয়া ভৈরবী একটু দাঁড়াইল, কি যেন ভাবিতে লাগিল। কিছু পরে মন্দিরে প্রবেশ করিল। তাহাকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী পুরুষদ্বয় পরামর্শ করিতে লাগিল। পরামর্শ স্থির হইলে একজন মন্দিরের ভিতরে গেল, আর এক জন বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই রাত্রে গঙ্গাতীরে এক ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে ভৈরবী আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাত্রে সেখানে জনমনুষ্য থাকে না, নিকটে কাহারও বাস নাই। কখন কোন উদা-সীন সন্ন্যাসী সেখানে দু এক রাত্রি যাপন করে, আবার অন্যত্র চলিয়া যায়। দ্বার, গবাক্ষ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, গঙ্গার কলপ্রবাহধ্বনি সেই মন্দির মধ্যে দিবানিশি শ্রুত হই-তেছে। বাহিরে যেমন শীত, মন্দিরের ভিতরেও প্রায় সেইরূপ শীত। এক বসনা ভৈরবী নিশি যাপন করিবার অভিলাষে মন্দিরে প্রবেশ করিল।

জ্যোৎস্না রাত্রি। দ্বিপ্রহর প্রায় অতীত হইয়াছে, নগরীর কলরব প্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। দূরে শ্মশানে অগ্নি জ্বলিতেছে, শ্মশানের কুক্কুরগুলা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখন ডাকিতেছে। ভগ্ন মন্দিরের নীচে দিয়া জ্যোৎস্নায় গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। হিমে জ্যোৎস্নার আলোক অস্পষ্ট; অতিশয় শীতল পবন বহিতেছে। এমন সময় দুই ব্যক্তি প্রচ্ছন্ন-গতিতে সেই ভগ্ন মন্দিরে প্রবেশ করিল।

ভৈরবী শুইয়াছিল, নিদ্রা যায় নাই। পদশব্দে উঠিয়া বসিল। জ্যোৎস্নালোকে দেখিল যে দুই জন প্রাতে তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল, সেই দুই জন। দুই জনে সুরা পান করিয়াছে, এক জনের হাতে একটা মদের বোতল, আর এক জনের হাতে একটা পাত্রে মাংস। গন্ধে মন্দির আমোদিত হইল।

ভৈরবী উঠিয়া দাঁড়াইল। ত্রিশূল হাতে ছিল, ত্রিশূলের মুখ মাটীর দিকে। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া প্রথম ব্যক্তি কিছু জড়িতস্বরে কহিল, "উঠিতেছ কেন? তোমার জন্য আমরা এই প্রসাদ আনিয়াছি। ভৈরবীর প্রসাদ গ্রহণ কর।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বোধ হয় অতি অল্পই মদ্য পান করিয়াছিল, ভৈরবীকে উঠিতে দেখিয়া দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল। বলিল "যাও কোথা? যেখানে তোমাকে আনিবার বড় ইচ্ছা ছিল, সেখানে তুমি নিজে আসিয়াছ। এখন আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে চাও কেন? আমরা অনেক যত্ন করিয়া তোমার জন্য ভৈরবীর প্রসাদ আনিয়াছি।" এই বলিয়া মাংস পাত্র ভৈরবীর সম্মুখে রাখিল।

যুবতী নিঃসহায়, রাত্রি গভীর, বিজন স্থান। দুই বলিষ্ঠ পাষণ্ড সুরাপানে মত্ত হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আসিয়াছে। কে তাহাকে রক্ষা করিবে?

কিন্তু ভৈরবীর মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই। দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা সমাপ্ত হইলে ধীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "সকল ভৈরবী কি সুরাপান করে?"

"না করিলে কি ভৈরবী হয়?"

ভৈরবী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রে তোমরা এখানে কেন আসিয়াছ?"

প্রথম ব্যক্তি হাসিয়া উত্তর করিল, "তা কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে আছে?"

ভৈরবী বলিল, "আমি অসহায় স্ত্রীলোক, আমার উপর অত্যাচার করিলে তোমাদের কি লাভ হইবে?"

"কে তোমার উপর অত্যাচার করিতেছে? ঘাড়ে করিয়া খাবার বহিয়া আনা কি অত্যাচার করা?"

ভৈরবী বলিল, "তোমাদের আর কোন অভিপ্রায় নাই?"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "অত কথায় কাজ নাই, খাইতে আরম্ভ কর।"

"আমি ব্রহ্মচারিণী।"

"অমন অনেক দেখিয়াছি। গোড়ায় সকলেই অমন বলে, তার পর সব পার হইয়া যায়।"

ভৈরবী আবার কথা ফিরাইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কাশী অত্যন্ত পবিত্র তীর্থ তোমরা জান ?"

উভয়ে ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "না আজ শুনিলাম। তুমি আসিয়া বুঝি কাশী পবিত্র হইয়াছে।"

ভৈরবী বলিল, "এমন পুণ্যস্থানে তোমরা অহোরাত্র পাপচেষ্টায় কেন ভ্রমণ কর ?"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "পাপ কি ? তোমার রূপে আমরা মজিয়াছি, তাহাতে আবার পাপ কি ? আর পাপই যদি হয় ত কাশীবাসীর ভয় কি ? কাশীতে মরিলেই ত পাপ মুক্ত হইব।"

"মূর্খ ! স্বর্গে পাপাচরণ করিলেও অতল নরকে পতিত হইতে হয়। নরকে গেলেও তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। কত হতভাগিনীর সর্ব্বনাশ তোরা করিয়াছিস্—স্বয়ং বিশ্বেশ্বর জানেন।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথমকে বলিল, "এখানে কি শাস্ত্র বিচার করিতে আসিয়াছিস্ ? মাগী ত থাইবে না, শাস্ত্রালাপে রাত কাটাইতে চায়।"

এই বলিয়া সে ভৈরবীকে ধরিতে উদ্যত হইল।

অকস্মাৎ ভৈরবীর মূর্ত্তি ফিরিল। এতক্ষণ ধীরভাবে, ধীরস্বরে কিছু দুঃখিতের মত কথা কহিতেছিল, সহসা ত্রিশূল তুলিয়া সাক্ষাৎ ভৈরবীর মত দাঁড়াইল। আয়ত চক্ষু সহসা জ্বলিয়া উঠিল, জ্যোৎস্নায় তাহার মুখ ভীম শোভা ধারণ করিল। কণ্ঠস্বরে গঙ্গাতীর প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিল, "তোরা জানিস্ আমি কে ?"

মাতাল দুইটা একটু বিস্মিত হইয়া কহিল "না।"

পূর্ব্ববৎ ভৈরবী বলিল, "আমাকে জানিস্ না বলিয়াই এখানে আসিয়াছিস্, নহিলে ব্যাঘ্রীর অপেক্ষা ভীষণ জানিয়াও আমার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতিস্। যে সকল বিপদ হইতে আমাকে ভৈরবী রক্ষা করিয়াছেন, শুনিলে তোদের হৃৎকম্প হয়। তোরা কাপুরুষ, তোদের আমার ভয় কি ? পথ ছাড়িয়া দে!"

যে পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সাহস ফিরিয়া আসিতেছিল, বিস্ময়ও অপনীত হইতেছিল। ভৈরবীর বাক্যে কহিল, "অত তর্জ্জন গর্জ্জন কেন ? একটু স্থির হওনা।"

দৃঢ় মুষ্টিতে ত্রিশূল ধরিয়া ভৈরবী বলিল, "মরিবি ? তবে মর্। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক্!"

দ্বাররক্ষক দেখিল, এ বিদ্রূপ নয়—প্রাণসংশয়। ভয়ে পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। ভৈরবী

ত্রিশূল হস্তে সদর্পে দ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহার অনুবর্ত্তী হইতে দুই বীরের সাহস হইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সিপাহী যুদ্ধের পর দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। শান্তি পুনর্ব্বার সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইংরাজেরা নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। নানা সাহেব ধরা পড়ে নাই, সে দুঃখ তখন ইংরাজের হৃদয়ে প্রবল রহিয়াছে। দেশে দেশে গুপ্তচর ফিরিতেছে, কোথায় কোন বিদ্রোহী লুকাইয়া আছে, তাহাদিগকে ধৃত করিবে। যুদ্ধে যাহারা ইংরাজের বিপক্ষে ছিল, তাহাদের মার্জ্জনা হইল বটে, কিন্তু যাহারা বিদ্রোহের নেতা, তাহাদিগের মার্জ্জনা নাই। নানা সাহেব প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিদ্রোহীর অনুসন্ধানে রাজ্যময় চর প্রেরিত হইতেছিল।

এই সময় কাশীতে একজন গুপ্তচর উপনীত হইল। সরকারের নিয়োগ-পত্র তাহার নিকট ছিল, সেই পত্র সে মাজিষ্ট্রেটকে দেখাইল। মাজিষ্ট্রেট পত্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কোন বিদ্রোহী লুকাইয়া আছে?"

সে ব্যক্তির নাম মোমতাজ আলি। বলিল, "হুজুর, ঠিক বলিতে পারি না। যে রকম সন্ধান পাইয়াছি, তাহাতে বোধ হয় কোন নামজাদা লোক সম্প্রতি এদিকে আসিয়াছে।"

মাজিষ্ট্রেট ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "চল, আমি তোমার সঙ্গে গিয়া তল্লাস করি।"

মোমতাজ আলি বলিল, "আপনি আসিলে হইবে না। এ কাজে গোলমাল হইলে চিড়িয়া ভাগিবে। আমি গোপনে সন্ধান করিব।"

মাজিষ্ট্রেট একটু নিরাশ—একটু নারাজ হইলেন, বলিলেন, "তোমার যেমন ইচ্ছা হয় সেইরূপ কর।"

মোমতাজ বলিল, "হুজুর, দারোগাকে হুকুম করুন।"

নিয়োগ-পত্রে লেখা ছিল যে চরেরা যেমন সাহায্য প্রার্থনা করিবে, মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে সেইমত সাহায্য দিবেন। মাজিষ্ট্রেট দারোগাকে ডাকাইলেন। ডাকাইয়া বলিলেন, "এই ব্যক্তি যখন যত সিপাহী চাহে ইহাকে দিবে। এ গোইন্দা।"

দারোগা বুঝিল, বলিল, "বহুৎ খুব খোদাবন্দ।"

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দারোগা মোমতাজ আলির সঙ্গে অনেক কথা পাড়িলেন। কথা প্রসঙ্গে আসল কথাটা বাহির করিয়া লইবার ইচ্ছা। কিন্তু মোমতাজ আলি দারোগার চেয়ে অনেক পাকা লোক। দারোগা কোন কথাই

বাহির করিতে পারিলেন না। কাহার সন্ধানে মোমতাজ আলি কাশীতে আসিয়াছে সেই জানে।

দারোগা জিজ্ঞাসা করায় মোমতাজ আলি বলিল, “এখন কোন সাহায্যের আবশ্যক নাই, যখন প্রয়োজন হইবে, যে কয়জন লোক আবশ্যক হয় চাহিয়া লইব।” এই বলিয়া সে নিজের বাসায় চলিয়া গেল।

বাসায় গিয়া মোমতাজ আলি বেশ পরিবর্ত্তন করিল। মুসলমানের বেশ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিল। বৈকালে বিশ্বেশ্বর দর্শনে চলিল, পথে কেহ সম্ভাষণ করিলে বলে, “জয়, বিশ্বেশ্বরের জয়!” কোন মতে চিনিবার সম্ভাবনা নাই যে লোকটা কোন কালে মুসলমান ছিল! কথাবার্ত্তা, ভাব ভঙ্গী সমুদায় উদাসীন সন্ন্যাসীর মত। যেদিকে বড় বেশী লোক, সেই দিকে গিয়া দাঁড়ায়, লোকে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে তাহাই শুনিবার ইচ্ছা। মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ না করিয়া এদিক ওদিক ভ্রমণ করিতে লাগিল। প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে।

কয়েকজন যুবক এক জায়গায় দাঁড়াইয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কপট সন্ন্যাসী সেই দিকে গেল। একজন বলিতেছে, “সেই অবধি কি আর আসে না?”

আর একজন বলিল, “কই দেখতে ত পাই নে।”

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, “আঃ এমন সুন্দরী হাতছাড়া করিতে আছে? এখানে আসিয়া আবার পলাইল। ধিক্ তোদের!”

চতুর্থ বলিল, “না, পলায় নাই; এখানেই কোথাও আছে, খুঁজিলে আবার পাওয়া যাইবে।”

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, “তাহার পাছু না লাগাই ভাল। সে ছুঁড়ী বড় ভয়ানক।”

তৃতীয় ব্যক্তি অত্যন্ত ঘৃণার সহিত বলিল, “গঙ্গা কাছে আছে, ডুবিয়া মর্। একটা স্ত্রীলোককে এত ভয়। তুই আবার মেয়ে মানুষের মর্ম্ম জানিস্।”

দ্বিতীয় ব্যক্তি কিছু গরম হইয়া বলিল, “তুই একবার পড়িস্ তার পাল্লায় ত টের পাস্। সব জাঁক তবে বেরোয়।”

তৃতীয় বলিল, “তুই আর কথা কোস্‌নে। গোঁপ কামাইয়া মেয়েমানুষের সঙ্গে থাক্ গে।”

এই রূপ কিছুক্ষণ কথা বার্ত্তার পর তাহারা আপন আপন পথে গেল। দুই জন একত্রে এক পথে চলিল, ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় বক্তা ছিল। মোমতাজ আলি সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিল। কয়েক পদ গিয়া তাহাদের সঙ্গে জুটিল। জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা কি কথাবার্ত্তা কহিতেছিলে?”

দুই জনই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সন্ন্যাসীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। তখন বেশ

অন্ধকার হইয়াছে। পথের অস্পষ্ট আলোকে দেখিল সন্ন্যাসী দীর্ঘকায়, মুখে একটু হাসি।

প্রথম ব্যক্তি কিছু রুষ্টভাবে বলিল, "আমাদের কথায় তোমার কাজ কি? আমাদের কাছে ভণ্ডামি করিও না। অনেক বেটা কপটীকে আমরা শিক্ষা দিয়াছি।"

দ্বিতীয় কহিল, "বোধ হয় তুমি আমাদের কথা শুনিয়া থাকিবে। কি সন্ন্যাসী ঠাকুর! তোমায় যে বড় রসিক দেখিতেছি। আমরা মেয়ে মানুষের কথাবার্ত্তা কই, তোমার শুনিয়া কি হইবে?" এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

সন্ন্যাসীর মুখে পূর্ব্বের মত একটু হাসি লাগিয়াছিল। বলিল, "আমায় বল না, আমি তোমাদের সাহায্য করিতে পারি।"

প্রথম ব্যক্তি কহিল, "মন্ত্র জান নাকি?"

সন্ন্যাসী বলিল, "মন্ত্রও জানি—অন্য উপায়ও জানি।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "বাবাজি! ভাগ বসাইবে না ত? মেয়েমানুষটী পাওয়া গেলে তাহাকে লইয়া সরিয়া পড়িবে না ত?"

"মহাভারত! তোমাদের কথাবার্ত্তায় বোধ হইতেছে আমি সে ভৈরবীকে কোথাও দেখিয়াছি। তাহার মুখে তোমরা কোন চিহ্ন দেখিয়াছ?"

দুই জনে উত্তর করিল, "দেখিয়াছি। তাহার চিবুকের নীচে একটী কাল তিল আছে।"

"তবে সেই।"

"কে?"

"একজন বৈষ্ণবী। যাহার সঙ্গে ছিল সে তাহাকে মথুরার পথে ছাড়িয়া আর এক মাগীর সঙ্গে পলাইয়াছে, তাই রাগ করিয়া ভৈরবী সাজিয়া এখানে আসিয়াছে।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "তবে এত তেজ কেন? আমাদের খুন করিয়া ফেলিয়াছিল আর কি? বৈষ্ণবী আবার এমন সতী!"

সন্ন্যাসী বলিল, "সতী নয়, পুরুষ জাতির উপর রাগ হইয়াছে। কিছু দিন পরে ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। এইবার দেখিতে পাইলেই তোমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে।

দ্বিতীয় বলিল, "তোমায় বিশ্বাস নাই বাবাজি! তুমি না তাহাকে লইয়া পলাও।"

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া বলিল, "তাহার কোন ভয় নাই। আমরা একত্রে মিলিয়া তাহার অনুসন্ধান করিব। যাহাতে তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হয়, আমি সে উপায় করিব। তোমরা আমায় কিছু অর্থ দিও।"

প্রথম ব্যক্তি বলিল, "তুমি আপনার কাজ গুছাইতে চাও। তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। তাহাকে পাইলে তোমায় দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিব।"

মনে মনে বলিল, "দক্ষিণা হাতে না দিয়া পিঠে দিব।"

সন্ন্যাসী বলিল, "তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট।"

বিদায় কালে সন্ন্যাসী বলিল, "কাল বৈকালে আমার সঙ্গে আবার এই স্থানে দেখা হইবে। ততক্ষণ তোমরা অন্বেষণ কর, আমিও খুঁজিব। তাহার দেখা পাইলে সকলে মিলিয়া পরামর্শ করা যাইবে। যাইবার সময় সন্ন্যাসী মনে মনে বলিয়া গেল, "আমার কার্য্য সিদ্ধি হইলে আমিও তোমাদের কিছু দক্ষিণা দিব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পর দিবস সেই স্থানে সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেই দুই ব্যক্তির আবার সাক্ষাৎ হইল। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

তাহারা বলিল, "খবর ভাল।"

"ভৈরবীর সন্ধান পাইয়াছ?"

"পাইয়াছি।"

"কোথায় আছে?"

"তাহা বলিতে পারিলাম না। প্রাতঃকালে গঙ্গার তীরে দেখিয়াছিলাম। মণি-কর্ণিকার ঘাটে বসিয়াছিল। তাহার পর যখন লোকের বড় ভিড়, কোথায় সরিয়া গেল দেখিতে পাইলাম না।"

"কাল আবার আসিবে?"

"বোধ হয়।"

সন্ন্যাসী বলিল, "আচ্ছা, কাল প্রাতে আমার সঙ্গে তোমাদের আবার দেখা হইবে। তোমরা ঘাটের কাছে থাকিও।"

বাসায় গিয়া সন্ন্যাসী নিজবেশ ধারণ করিয়া দারোগার কাছে গেল। বলিল, "কাল সকাল বেলা আমার সঙ্গে পাঁচ জন বলিষ্ঠ ও হুঁশিয়ার সিপাহী চাই। আমি তাহাদিগকে এখন একবার দেখিতে চাই।"

দারোগা বলিল; "যাহার সন্ধান করিতেছিলে তাহাকে পাইয়াছ?"

মোমতাজ আলি বলিল, "হাঁ।"

দারোগা বলিল, "তবে আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

মোমতাজ আলি বলিল, "না। তাহা হইলে সে ভাগিবে। আমার সঙ্গে কেবল সিপাহী কয়জন থাকিবে। ধরা পড়িলে তুমি দেখিতে পাইবে।"

সিপাহীরা আসিলে মোমতাজ আলি বলিল, কাল সকালে তোমরা সশস্ত্র হইয়া এখানে আসিবে। গায়ে একটা এমন কাপড় ঢাকা চাই যাহাতে হঠাৎ লোকে তোমাদের না চিনিতে পারে।"

পর দিবস প্রভাত কালে সিপাহীরা আদেশ মত সজ্জিত হইয়া আসিল। মোম-

তাজ আলি কোমরে তরবারি বাঁধিয়া নিজের বেশ ধারণ করিল। একটা রেজাই দিয়া গা ঢাকিল। সিপাহীদিগকে বলিল, "তোমরা আমার একটু পিছনে থাকিবে। সকলে এক সঙ্গে আসিবে না। আমি ইশারা করিবামাত্র সকলে আমার নিকটে আসিবে।"

এই বলিয়া মোমতাজ আলি মণিকর্ণিকার ঘাটের অভিমুখে চলিল। সিপাহীরা কিছু পশ্চাতে চলিল। ঘাটের কিছু দূরে সেই দুই ব্যক্তি অপেক্ষা করিতেছিল। মোমতাজ আলিকে দেখিয়া বলিল, "বাঃ বাবাজি, আজ যে অন্যরূপ দেখিতেছি।"

মোমতাজ আলি পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল। সিপাহীরা দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইল। মোমতাজ আলি বলিল, "গ্রেপ্তার কর।"

অমনি চারিজন সিপাহী দুইজনকে ধরিল। অঙ্গ বস্ত্র খসিয়া পড়াতে গুণ্ডাদ্বয় দেখিল তাহারা সিপাহীর হাতে পড়িয়াছে।

সে দুই ব্যক্তির মুখ শুকাইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের কি অপরাধ?"

মোমতাজ আলি বলিল, "তোমরা বিদ্রোহীর সঙ্গী। বিদ্রোহীকে তোমরা লুকাইয়া রাখিয়াছিলে।" তাহার পর সিপাহীদিগের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তোমরা তিন জন ইহাদিগকে দারোগা সাহেবের নিকটে লইয়া যাও। ইহারা বিদ্রোহীকে আশ্রয় দিয়াছে বলিয়া ইহাদের বিচার হইবে।"

সিপাহীরা বলিল, "ইহারা গুণ্ডা।"

মোমতাজ আলি বলিল, "সেইজন্য ইহাদিগকে সাবধানে লইয়া যাইবে।"

যেখানে এই ব্যাপার ঘটিতেছিল, সেটা একটা সঙ্কীর্ণ গলি। লোক জন বড় একটা ছিল না। মোমতাজ আলি বলিল, 'বাকি দুইজন আমার সঙ্গে আইস।"

তিন জন সিপাহী দুই গুণ্ডাকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। মোমতাজ আলি অবশিষ্ট দুই সিপাহী লইয়া ঘাটের দিকে চলিল। বলিল, "সাবধান ও আমা হইতে কিছু দূরে থাকিবে। যেন তোমাদিগকে কেহ না চিনিতে পারে।"

গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া মোমতাজ আলি দেখিল অনেক লোক যাতায়াত করিতেছে। ঘাটের নীচের একটা সিঁড়িতে ভৈরবী বসিয়া আছে। মোমতাজ আলি সিপাহীদিগকে বলিল, "তোমরা ঘাটের উপর থাক। আমি আসিতেছি।"

এই বলিয়া মোমতাজ আলি নামিয়া ভৈরবীর কাছে গেল। সিপাহীরা উপরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। একজন ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, "এই বুঝি বিদ্রোহী? ইহাকেই বুঝি গ্রেপ্তার করিতে হইবে? তাহা হইলে আমি একা গ্রেপ্তার করিতে রাজি।"

তাহার সঙ্গী কহিল, "বোধ হয় কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছে। হয়ত মাগী কিছু খবর দিতে পারিবে।"

মোমতাজ আলি ভৈরবীর নিকটে গিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় চিনিতে পার?"

ভৈরবী ফিরিয়া চাহিয়া একটু চমকিয়া উঠিল। কিছু বিস্মিতের মত বলিল, "মোমতাজ আলি! তুমি এখানে?"

মোমতাজ আলি ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তুমি যে এখানে আসিয়াছ? তোমার বড় সাহস।"

ভৈরবী কিছু ক্লান্ত স্বরে কহিল, "আর কোথায় যাইব?"

মোমতাজ আলি বলিল, "আমি কেন আসিয়াছি জান?"

"প্রতিশোধের জন্য?"

মোমতাজ আলি বলিল, "আমাকে সেরূপ অপমান করিয়া ভাল কর নাই।"

ভৈরবী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। বলিল, "আমার পিতার দাস হইয়া তুমি আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিলে। সেই জন্য শিক্ষা দিয়াছিলাম।"

মোমতাজ আলি বলিল, "তোমার প্রতি সরকারের হুকুম জান?"

ভৈরবী বলিল, "ধরিতে পারিলে ফাঁসি। তুমি ধরাইয়া দিতে আসিয়াছ?"

মোমতাজ আলি বলিল, "আমি গোইন্দা। বিদ্রোহী ধরা আমার কাজ।"

ভৈরবীর মুখে একটু ক্লান্তির লক্ষণ দেখা দিল। গঙ্গার জলে ক্ষুদ্র তরঙ্গ মালার উপর প্রভাত সূর্য্যের আলোক হিল্লোলিত হইতেছিল। ভৈরবী জলের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি বসিয়া আছি। তুমি লোকজন লইয়া আসিয়া আমায় ধরিয়া লইয়া চল।"

মোমতাজ আলি ক্ষুধিত লোচনে ভৈরবীর মুখ দেখিতেছিল। কহিল, "ধরা পড়িলে তোমার ফাঁসি হইবে না, যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড হইবে। তুমি যেমন সুন্দরী, কারাগারে কি তোমার ধর্ম্মরক্ষা হইবে?"

ভৈরবী মোমতাজ আলির দিকে চাহিল; কহিল, "আজ পর্য্যন্ত কেহ আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে?"

মোমতাজ আলি কিছু বিরক্তির সহিত কহিল, "যেখানে তোমার ক্ষমতা, সেখানে তোমার কোন ভয় ছিল না। শত্রুর হাতে পড়িলে কে তোমায় রক্ষা করিবে? আমি যদি তোমায় না ধরাইয়া দিই ত আর কেহ তোমায় ধরিবে।"

ভৈরবী কহিল, "তুমি কি অভিপ্রায়ে আমার কাছে আসিয়াছ?"

মোমতাজ আলি কহিল, "চারিদিকে অনেক লোক দাঁড়াইয়া আছে। অনেকে আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে, মনে মনে সন্দেহ করিতে পারে। তুমি আমার সঙ্গে আইস, তোমার কোন ভয় নাই। ইংরাজ তোমায় কখন ধরিতে পারিবে না।"

ভৈরবী কহিল, "তোমার সঙ্গে কি নিকা হইবে না কি?"

মোমতাজ আলি কহিল, "তুমি যাহা বল তাহাই হইবে। এখন বিলম্ব করিও না, আমার সঙ্গে উঠিয়া আইস।"

"যদি না যাই?"

মোমতাজ আলি পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদুস্বরে কহিল, "তাহা হইলে বিদ্রোহী বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইব।"

ভৈরবী সন্দিগ্ধার মত জিজ্ঞাসা করিল, "একা ?"

"না, সঙ্গে দুইজন সিপাহী আছে।"

"তাহাদিগকে ডাক।"

"তুমি আমার সঙ্গে পলায়ন করিবে না ?"

"না।"

মোমতাজ আলি সিপাহীদিগকে সঙ্কেত করিল। তাহারা সিঁড়ী নামিতে লাগিল।

ভৈরবী বিদ্যুতের মত উঠিয়া দাঁড়াইল—হস্তস্থিত ত্রিশূল তুলিয়া মোমতাজ আলির সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। মোমতাজ আলি ভীত হইয়া একটু পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইল। ভৈরবী বেগে ত্রিশূল আপনার হৃদয়ে বিদ্ধ করিল।

চারিদিক হইতে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। মোমতাজ আলি ত্রস্তে ভৈরবীর নিকটে গেল। ত্রিশূল একেবারে হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করিয়াছিল। শোণিতের সূক্ষ্ম ধারা বহিয়া গঙ্গা সলিলে মিশাইতে লাগিল। সূর্য্যের কিরণ ভৈরবীর মুখে পড়িতেছিল। ত্রিশূল বক্ষে বিঁধিয়া ভৈরবী একেবারে জলের ধারে পড়িয়াছিল, চঞ্চল জলতরঙ্গ তাহার মুখে আঘাত করিতে লাগিল।

চারিদিক হইতে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কি হইল ? কি হইল ? এ কে ?"

মোমতাজ আলি অবনত মস্তকে ভৈরবীর মৃতদেহ নিরীক্ষণ করিতেছিল। কহিল, 'রাণী চন্দা।"

"আজমগড়ে ইংরাজের সঙ্গে যে বড় লড়াই করিয়াছিল ?"

মোমতাজ আলি সংক্ষেপে, নীরস স্বরে কহিল, "সেই !"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

রমাবাই।

গত বারের ভারতীতে রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, তাহা আগা গোড়া সমস্তই রমাবাইয়ের মতের উপর আক্রমণ। ইহা নিতান্তই ভুল।

লেখক রমণীগণের পুরুষ আশ্রয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিতান্ত সঙ্গত বাক্য। আমাদের দেশে কোন মেয়ের দল আজ কাল নাকীসুরে "আমরা পুরুষের অধীন,

আমরা পুরুষের আশ্রয়ে আছি, আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়”—এরূপ কথা বলিতেছেন কি না—তাহা জানি না। কিন্তু রমাবাই তাঁহার বক্তৃতায় এরূপ ভাবের কথা বলেন নাই। রমাবাই পুরুষআশ্রয়ের বিপক্ষ মতাবলম্বী নহেন; পতিভক্তি অকর্ত্তব্য বিবেচনা করেন না—তবে আশ্রয়ের নামে যে সকল পুরুষ-অত্যাচার সমাজে অহরহঃ সংঘটিত হয়, তাহা রমাবাই মঙ্গলজনক জ্ঞান করেন না। সুতরাং তাহার প্রতিকার তাঁহার বিবেচনায় অত্যাবশ্যক। আমার বিশ্বাস—ইয়োরোপ, আমেরিকায় স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার লইয়া যে মহা আন্দোলন চলিয়াছে, পুরুষ-অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার ইচ্ছাই সেই আন্দোলনের সুচনামূল, প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা পুরুষের অত্যাচার সহিতে কুণ্ঠিত—আশ্রয় লইতে নহে। যে দিন তাহা হইবে, সে দিন জগতে মনুষ্য জাতি লোপের সূত্রপাত হইবে—কেননা সেদিন স্ত্রীলোক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহিবে না, বিবাহ বন্ধনের অর্থই পুরুষের আশ্রয়গ্রহণ।

আর একটি কথা, স্ত্রীজাতি সর্ব্বতোভাবে পুরুষের সমকক্ষ—এ কথা তিনি যে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা প্রসঙ্গে। তিনি বলেন শিক্ষাতেই যখন স্ত্রীলোক যথার্থ পুরুষের সহধর্ম্মিনী, সঙ্গিনী হইতে পারে—তাহার কর্ত্তব্য পালনের উপযুক্ত হইতে পারে, কেবল তাহাই নহে, স্ত্রীলোকদিগের সুশিক্ষার উপরই যখন জাতীয় মহত্ত্ব নির্ভর করিতেছে—তখন কেন পুরুষগণ তাহাদের শিক্ষার প্রতি অমনোযোগী? তাঁহারা কি মনে করেন স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের সমকক্ষ নহেন? তাহারা সর্ব্বতোভাবেই পুরুষের সমকক্ষ—কেবল মদ্যপানে নহে। ইহা হইতে এই ‘সমকক্ষের’ অর্থ আমরা এই বুঝিয়াছিলাম—স্ত্রীলোকেও পুরুষের মত জ্ঞান ধর্ম্মে সমান অধিকারী। কেবল দাস্যবৃত্তি ছাড়া তাহাদের জীবনের গুরুতর উদ্দেশ্য আছে,—নিজে মানুষ হইতে এবং অন্যকে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর করিতে তাহারও অধিকার আছে।

তবে লেখক উক্ত ‘সমকক্ষ’ কথা যে অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, যদি রমাবাই তদর্থেই উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন—তিনি নিতান্ত একটা অপহ্নত কথা বলেন নাই; সুতরাং তাহা হইলেও লেখক যত সহজে কথাটা হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন—তত সহজে তাহা হাসিয়া উড়ান যায় না। স্ত্রীলোকের এক রকম গ্রহণশক্তি ও ধারণা শক্তি আছে, কিন্তু সৃজন শক্তি নাই, এ কথা লেখক কিরূপে স্থির করিলেন তাহা ত বুঝিতে পারি না। ইয়োরোপে স্ত্রীশিক্ষা আরম্ভ কত অল্প দিন হইয়াছে, ইহার মধ্যেই কত উচ্চ উৎকৃষ্ট উপন্যাস স্ত্রীলোকের লেখনী-নির্গত হইয়াছে, তাহা লেখক ভুলিলেন কেন? কাব্য উপন্যাসের বিশেষ প্রভেদ প্রধানতঃ একের ভাষা গদ্যময়—অন্যের ভাষা ছন্দময়। কবিত্ব কল্পনা ও মনুষ্য চরিত্রজ্ঞান উভয়ের মধ্যেই আছে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সৃজন শক্তির রূপভেদ থাকিলেও ক্ষমতার বিকাশে কেহ হীন নহে।

ইহা ত গেল একটা সাধারণ কথা—কিন্তু কাব্যেও যে রমণী তাঁহার সৃজন বুদ্ধির পরিচয় দেন নাই, তাহাও নহে। মিশেষ হেমান্স, মিশেষ ব্রাউনিং কোন অংশেই বার্ণ্‌স্‌ অপেক্ষা নিকৃষ্ট কবি নহেন, তবে রমণীদিগের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কোন সেক্সপিয়ার জন্মগ্রহণ করেন নাই, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু তেমনি উপন্যাস রাজ্যে কোন পুরুষ জর্জ্জ এলিয়টকে এখনো অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং ভবিষ্যতের কথা নহে—স্ত্রীলোক যে বুদ্ধিতে পুরুষের অসমকক্ষ, এখন আর এমনটা নিতান্ত জোর করিয়া বলা যায় না—অন্ততঃ দু এক কথায় ইহা আর মীমাংসার বিষয় নহে। সুতরাং রমাবাইয়ের মুখে একথা অশোভন নহে, বিশেষ স্ত্রীলোকে যে বহিঃপ্রকৃতির সহিত সংগ্রামে সমর্থ, রমাবাইয়ের নিজের জীবনই যখন তাহার একটি দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশের কোন পুরুষ তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে প্রণোদিত হইয়া সাত সমুদ্র ত্রয়োদশ নদী পারে গিয়া স্বকার্য্য সিদ্ধি করিয়া আসিয়াছেন? এখানে রমণী হৃদয় ও পুরুষের কার্য্যক্ষমতা একত্র মিলিত হইয়াছে। বোম্বাই নগরের শারদা-সদন তাঁহার নিজের অদম্য যত্নের ফল। তাহার নিয়মাবলী আমরা এই উপলক্ষে বামাবোধিনী হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১। উদ্দেশ্য—সাধারণরূপে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষাবিধান বিশেষরূপে উচ্চ বর্ণের ও অন্যান্য নিরাশ্রিতা বিধবাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন এতদুদ্দেশ্যে ১৮৮৯ সালের ১১ই মার্চ্চ শুক্রবার "শারদা সদন" নামক বিদ্যালয় নূতন উইলসন কলেজের পশ্চাৎভাগে চৌপাটী নামক স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। "শারদা সদনের" কার্য্য নির্ব্বাহার্থে নিম্নলিখিত নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল।

২। নিয়ম—যে কোন বিদ্যার্থিনী বিদ্যালয়ে আসিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারিণীর নামে লিখিত আবেদন পাঠাইবেন অথবা সমক্ষে যাইয়া দেখা করিবেন। সাহায্যকারী মণ্ডলীর তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অনুকূল অথবা প্রতিকূল মত হইলে জানান যাইবে। যাঁহারা লিখিত আবেদন পাঠাইবেন, তাঁহারা নাম গ্রাম জেলা সমস্ত ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

যাঁহারা বিদ্যালয় হইতে দূরে অবস্থিতি করিবেন, তাঁহাদিগকে একজন স্ত্রীলোক অথবা গাড়ী পাঠাইয়া আনান যাইবে ও পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

৩। বিদ্যার্থিনী—বিদ্যালয়ে প্রথম উচ্চ বর্ণের বিধবা ও অন্যান্য নিরাশ্রয় উচ্চ বর্ণের স্ত্রীলোকদিগকে স্থান দেওয়া যাইবে, তৎপর অন্যান্য বিদ্যার্থিনীদিগকে গ্রহণ করা হইবে। বিদ্যার্থিনীদের বয়স ২০ বৎসরের ন্যূন হওয়া আবশ্যক। বিদ্যালয়ে গৃহীত হইবার পূর্ব্বে বিদ্যার্থিনীদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে সাহায্যকারী মণ্ডলী বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন। তাঁহাদের স্বভাব চরিত্র ভাল বলিয়া প্রমাণিত না হইলে তাঁহারা গৃহীত হইবেন না।

৪। শিক্ষা—বিদ্যার্থিনীদের শক্তি ও ইচ্ছানুসারে সাধারণ ও বিশেষ এই দুই প্রকার শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

সাধারণ শিক্ষা—মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, ইংরেজী ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়া যাইবে। সেইরূপ ব্যাকরণ, ভূগোল বিদ্যা, খগোল বিদ্যা, ইতিহাস, গণিত, রসায়ন শাস্ত্র, বনস্পতি শাস্ত্র, প্রাণিশাস্ত্র, ভূগর্ভশাস্ত্র, আরোগ্যশাস্ত্র, শারীর শাস্ত্র প্রভৃতি আব শ্যকানুসারে শিক্ষা দেওয়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন নীতি, মর্য্যাদা, ব্যবহার গৃহব্যবস্থা প্রভৃতি আবশ্যক বিষয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে।

৫। ব্যবহারিক শিক্ষা—সেলাই কাজ, বুনন কাজ, উলের কাজ, চিত্র লেখা, চিনা বাসনে ছবি ও চিত্র আঁকা, মাটীর বাসন চিত্র করা, সুন্দর বাঁশের কাজ ও কিন্ডার গার্টেন নামক বালশিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

৬। বেতন—যাহারা বেতন দিতে সমর্থ, তাহাদের নিকট হইতে লওয়া যাইবে। যাহারা বেতন দিতে অসমর্থ, তাহাদিগকে ফ্রি ভরতি করা যাইবে।

৭। নিরাশ্রয় বিদ্যার্থিনীদিগকে আশ্রয় দান—সাহায্যকারী মণ্ডলী যাহাদিগকে আপন জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ মনে করিবেন, তাহাদিগকে অন্ন বস্ত্র পুস্তক ও বিদ্যালয়ে থাকিতে দিবেন। এই প্রকার বিদ্যার্থিনীদিগের মধ্যেও বিধবাদের বিষয় প্রথম বিবেচিত হইবে।

৮। বিদ্যালয়বাসিনী—যাহারা সাধারণরূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহে সমর্থ এবং বিদ্যালয়ে আসিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে বাড়ী ভাড়া ভিন্ন অন্য খরচ দিতে হইবে। যাহারা সকল খরচ দিতে সমর্থ, শুধু তাহাদের নিকট হইতেই সকল খরচ গ্রহণ করা যাইবে।

৯। ধর্ম্ম স্বাতন্ত্র্য—বিদ্যার্থিনীদের ধর্ম্মমত ও রীতি নীতি সম্বন্ধে যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য বিশেষ ধর্ম্মমত শিক্ষা দেওয়া হইবে না।

বিদ্যালয় সম্বন্ধে অন্য কোন বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে হইলে পণ্ডিতা রমা বাই কিম্বা নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদিগের নিকট পত্র লিখিয়া অথবা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিবেন। সাহায্যকারী মণ্ডলীর মধ্যে কয়েক জনের নাম :—রাও বাহাদুর মহাদেব গোবিন্দ রেনেডে (পুনা), ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডকার (পুনা), রাও বাহাদুর শঙ্কর পণ্ডিত (আহমদনগর), রাও সাহেব মহিপতরাম রূপরাম (আহমদাবাদ), অনারেবল কাশীনাথ ত্রৈম্বক তেল্যঙ (বোম্বাই), রাও সাহেব বাবন আবজি মোদক (বোম্বাই), ডাক্তর আত্মারাম পাণ্ডুরাম (বোম্বাই), ডাক্তার সদাশিব বামন কাফ (বোম্বাই)।

পণ্ডিতা রমাবাই,

বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপিকা।

প্রকৃতির পরিচায়ক লক্ষণ।

প্রকৃতির পরিচায়ক লক্ষণ কি?

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন।

[প্রকৃতির পরিচায়ক লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে তাহার সহজ উপায় এই যে, প্রথমতঃ জগতের মুখ্য শ্রেণী-গুলির বিভিন্ন প্রকৃতি কিরূপ, তাহা ভাগ ভাগ করিয়া দেখা;—মুখ্য-শ্রেণী কি? না (১) অপ্রাণ জড় বস্তু—যেমন পঞ্চভূত; (২) সপ্রাণ জড় বস্তু—যেমন বৃক্ষ লতা গুল্ম; (৩) সংকীর্ণ চেতন-পদার্থ—যেমন পশু পক্ষী কীট-পতঙ্গ; (৪) ব্যাপক চেতন-পদার্থ—যেমন মনুষ্য। প্রথমতঃ এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা;—দ্বিতীয়তঃ সমস্তের সাধারণ প্রকৃতি কিরূপ তাহার প্রতি প্রণিধান করা;—ইহাই সহজ উপায়। অপ্রাণ ভৌতিক বস্তু-সকলের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি কিরূপ তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি; কি? না আকর্ষণ বিকর্ষণ। ইহাকেই আমরা বলি—ভৌতিক প্রকৃতি; এখন জৈবিক প্রকৃতি কিরূপ তাহা দেখা যা'ক্।

উদ্ভিদ্-রাজ্যেই জৈবিক প্রকৃতির প্রথম সূত্র-পাত। অতএব, বৃক্ষের উৎপাদন-কার্য্য প্রকৃতি দ্বারা কিরূপে সংঘটিত হয়, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে আলোচিতব্য। "বৃক্ষ-উৎপাদন" এই যে একটি ক্রিয়া—ইহার মূলে, বীজের প্রকৃতি, জলের প্রকৃতি, বায়ুর প্রকৃতি, মৃত্তিকার প্রকৃতি, এইরূপ বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন প্রকৃতি একত্র যোটবদ্ধ হইয়া কার্য্য করে; আর সেই যে বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন কার্য্য—তাহা একই কার্য্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। কেননা, মুখ্য কার্য্য যাহা—তাহা এক বই দুই নহে—কি? না বৃক্ষের উৎপাদন; সেই একটি মুখ্য-কার্য্যের অভ্যন্তরে অনেক-গুলি শাখা-কার্য্য অন্তর্ভূত;—(১) প্রয়োজনীয় ধাতু-সকলের বাহকতা-কার্য্য ইহা প্রধানতঃ জলের কার্য্য; (২) ঐ সকল ধাতুর সংশোধন বা সংস্করণ—ইহা প্রধানতঃ আলোক উত্তাপ এবং বায়ুর কার্য্য; (৩) ঐ সকল ধাতুর উপকরণ সংস্থান—ইহা প্রধানতঃ মৃত্তিকার কার্য্য; (৪) সমস্তের সামঞ্জস্য সাধন—ইহাই প্রধানতঃ বীজের কার্য্য। এখানে মুখ্য কার্য্য যেমন এক বই দুই নহে—কি? না বৃক্ষের উৎপাদন কার্য্য; আর, সেই একটি-মাত্র মুখ্য-কার্য্যের যেমন অনেকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—(১) জলের কার্য্য, (২) বায়ু প্রভৃতির কার্য্য, (৩) মৃত্তিকার কার্য্য ইত্যাদি—তেমনি, সেই মুখ্য কার্য্যটির মৌলিক কারণ এক বই দুই নহে—কি? না বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি; বৃক্ষোৎপাদনের আর আর যত প্রকার আনুষঙ্গিক কারণ আছে—যেমন, জলের ধাতু-বাহকতা-শক্তি—বায়ু প্রভৃতির ধাতু-শোধন-

শক্তি—মৃত্তিকার ধাতুপোষণ শক্তি—সমস্তই এক সেই বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তিরই অন্তর্ভূত। অঙ্কুরিত হইবার শক্তি যাহা বীজে আছে এবং বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া তুলিবার শক্তি যাহা জলবায়ু মৃত্তিকা-প্রভৃতিতে আছে,—এই দুই বিভিন্ন শক্তি একই বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তির দুইটি বিভিন্ন অবয়ব। বাচনিক সুবিধার জন্য—অঙ্কুরিত হইবার শক্তি যাহা বীজে আছে—তাহা কৈন্দ্রিক শক্তি বলিয়া সংজ্ঞিত হউক; আর, বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া তুলিবার শক্তি যাহা জল-বায়ু-মৃত্তিকা প্রভৃতিতে আছে—তাহা পারিধ শক্তি বলিয়া সংজ্ঞিত হউক; তাহা হইলেই দাঁড়াইবে যে, কৈন্দ্রিক এবং পারিধ এই দুইটি শক্তি একই বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তির দুইটি পৃষ্ঠ—বা দুইটি অপরিহার্য্য অবয়ব; কেননা বৃক্ষ উৎপাদন করিতে হইলে ঐ দুইটি শক্তির একটিকে ছাড়িয়া আর একটি একাকী কোনো কার্য্যেরই নহে। কৈন্দ্রিক এবং পারিধ এই দুই প্রকার শক্তি যাহা দেখা গেল, দুয়ের মধ্যে বিশেষ একটি প্রভেদ এই যে, বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া তুলিবার শক্তি যাহা জল-বায়ু-মৃত্তিকা প্রভৃতিতে আছে, তাহা সাধারণতঃ সকল জাতীয় বৃক্ষ-উৎপাদনেই সহায়তা করে, কিন্তু অঙ্কুরিত হইবার শক্তি যাহা বীজে আছে তাহা সেরূপ নহে—সাধারণতঃ সকল-জাতীয় বৃক্ষের উৎপাদনে আদবেই তাহার কোনো হস্ত নাই—বিশেষ কোনো-এক-জাতীয় বৃক্ষ উৎপাদন করাই তাহার একমাত্র কার্য্য। শাল তাল তমাল প্রভৃতি সাধারণতঃ সকল জাতীয় বৃক্ষের উৎপাদনেই জল-বায়ু-মৃত্তিকার হস্ত রহিয়াছে, কিন্তু তালের বীজ শুদ্ধ কেবল তাল-বৃক্ষের উৎপাদনেই পটু, শালের বীজ শাল-বৃক্ষের উৎপাদনেই তৎপর—সাধারণতঃ সকল জাতীয় বৃক্ষের উৎপাদনে নহে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে (১) কৈন্দ্রিক বৃক্ষোৎপাদন-শক্তি বিশেষ-কোনো-এক-জাতীয় বৃক্ষ উৎপাদনেই তৎপর; (২) পারিধ বৃক্ষোৎপাদন শক্তি সাধারণতঃ সকল জাতীয় বৃক্ষোৎপাদনেই তৎপর। কাজেই বলিতে হয় যে, জল-বায়ু-মৃত্তিকাতে বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি যাহা আছে তাহা সাধারণতঃ সকল বৃক্ষেরই উৎপাদিকা-শক্তি; কিন্তু আম্র-বীজের বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তি কেবল আম্র-বৃক্ষেরই উৎপাদিকা-শক্তি—কাঁটাল বৃক্ষের বা আর কোনো বৃক্ষের নহে। বিশেষ বিশেষ বীজ হইতে অবশ্য বিশেষ-বিশেষ-জাতীয় বৃক্ষই উৎপন্ন হয়; কিন্তু ডারউইন্ হেকেল্ প্রভৃতির ক্রমাভিব্যক্তির সিদ্ধান্ত মানিতে গেলে এই রূপ দাঁড়ায় যে, একই আদিম জাতীয় উদ্ভিদ্ ক্রমাভিব্যক্তির নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কাল-ক্রমে নানা জাতীয় বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং সকল জাতীয় বৃক্ষই একই আদিম-জাতীয় বৃক্ষের সন্তান-সন্ততি। জল-বায়ু-মৃত্তিকা প্রভৃতির সহিত সেই আদিম-জাতীয় ঔদ্ভিদ বীজের সাদৃশ্য এই যে, সাধারণতঃ সকল-জাতীয় বৃক্ষের উৎপাদনেই যেমন জল-বায়ু-মৃত্তিকার হস্ত রহিয়াছে—তেমনি, সাধারণতঃ সকল জাতীয় বৃক্ষই আদিম জাতীয় ঔদ্ভিদ বীজ হইতে উত্তরোত্তর ক্রমে অভিব্যক্ত হইয়াছে। অতএব, বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) মৌলিক বৃক্ষোৎ-

পাদিকা শক্তি (অর্থাৎ আদিম-জাতীয় বৃক্ষ-উৎপাদনের শক্তি); (২) কৈন্দ্রিক বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তি (অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ জাতীয় বৃক্ষের উৎপাদিকা-শক্তি যাহা বিশেষ বিশেষ বীজে বর্ত্তমান); (৩) পারিধ বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তি (অর্থাৎ বৃক্ষ উৎপাদন করিয়া তুলিবার শক্তি যাহা জল-বায়ু মৃত্তিকায় বিদ্যমান আছে); প্রত্যেক বৃক্ষের উৎপাদনেই এই তিন প্রকার বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তির সমবেত সহকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমাভিব্যক্তির সিদ্ধান্ত অনুসারে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, বিশেষ বিশেষ বীজের বিশেষ বিশেষ বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তি সেই আদিম-জাতীয় বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তিরই বিশেষ বিশেষ পরিণাম; শুধু তা নয়—আদিম জাতীয় বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তি (এক কথায়—মৌলিক বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তি) আজিও সকল জাতীয় বৃক্ষের অভ্যন্তরেই কার্য্য করিতেছে। এমন কি—বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতেরা মনুষ্যের ভ্রূণ পরীক্ষা করিয়া এইরূপ দেখিয়াছেন যে, জননী গর্ভে আদিম জীব হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত একটি ধারাবাহিক জৈবিক ক্রম পরম্পরা অল্পে অল্পে উন্মেষিত হয়—কাজেই বলিতে হইতেছে যে, বিশেষ বিশেষ জীবোৎপাদিকা-শক্তি মৌলিক জীবোৎপাদিকা শক্তিরই প্রকারভেদ; তবেই হইতেছে যে, যত প্রকার জীবোৎপাদিকা-শক্তি আছে, সমস্তেরই অভ্যন্তরে মৌলিক জীবোৎপাদিকা-শক্তি নিরন্তর কার্য্য করিতেছে—এবং সেই মৌলিক জীবোৎপাদিকা-শক্তিই ক্রমাভিব্যক্তির নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন জীবে পরিণত হইতেছে। স্থাবর এবং জঙ্গম জীবের মধ্যে (অর্থাৎ অচেতন বৃক্ষাদির এবং সচেতন পশ্বাদির মধ্যে) যত কিছু সাজাত্য এবং বৈজাত্য (অর্থাৎ সমজাতীয় ভাব এবং ভিন্ন জাতীয় ভাব) দৃষ্টিগোচর হয়—সমস্তই ক্রমাভিব্যক্তির ফল। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ক্রমাভিব্যক্তির নিয়মকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন (১) সন্ততির নিয়ম (Law of heredity)—ইহাই সাজাত্যের মূল প্রবর্ত্তক; এবং (২) সঙ্গতির নিয়ম (Law of adaptation)—ইহাই বৈজাত্যের মূল প্রবর্ত্তক। প্রচলিত প্রবাদ এই যে, "বাপ-কা বেটা সেপাই-কা ঘোড়া" ইহাই সন্ততির নিয়ম (Law of heredity); এবং শাস্ত্রে আছে "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি" অথবা "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ" ইহাই সঙ্গতির নিয়ম (Law of adaptation)। সন্ততির নিয়ম এই যে, যেমন পিতামাতা তেমনি সন্তান-সন্ততি; সঙ্গতির নিয়ম এই যে, যেমন সঙ্গ তেমনি পাত্র। সন্ততি এবং সঙ্গতির নিয়মের উপর সাজাত্য এবং বৈজাত্য কিরূপ নির্ভর করে, তাহার একটি উদাহরণ;—মনে কর একজন বাঙ্গালির জ্যেষ্ঠ পুত্র ভারতবর্ষে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; তাহার পরে পিতামাতা কিয়ৎ বৎসর ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালীন সেই স্থানে তাঁহাদের দ্বিতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল;—প্রথমতঃ দুই পুত্রই এক পিতা-মাতার সন্তান সুতরাং দুই পুত্রেরই এরূপ কতকগুলি গুণ অবশ্যই আছে—যাহা পৈতৃক-লক্ষণাক্রান্ত; ইহাতেই সন্ততির নিয়ম সূচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, খুবই সম্ভব যে, দ্বিতীয় পুত্রে এরূপ কতকগুলি লক্ষণ

বর্ত্তিয়াছে—যাহা ইংলণ্ডের জল-বায়ু মৃত্তিকার ফল; যেমন—কটা চুল—ধব্‌ধোবে শ্বেত বর্ণ—ইত্যাদি; এগুলি পৈতৃক গুণ নহে—এমন কি, এই গুণগুলি দেখিয়া দ্বিতীয় পুত্রকে লোকে সহসা ইংরাজ ঠাওরাইতে পারে। ইহাতেই সঙ্গতির নিয়ম সূচিত হয়। সন্ততির নিয়মে সাজাত্য সংঘটিত হয়—বাঙ্গালির পুত্র বাঙ্গালি লক্ষণাক্রান্ত হয়—ইংরাজের পুত্র ইংরাজি লক্ষণাক্রান্ত হয়—ইত্যাদি; সঙ্গতির নিয়মে বৈজাত্য সংঘটিত হয়—বাঙ্গালির পুত্র ইংরাজি লক্ষণাক্রান্ত হয়—ইংরাজের পুত্র আমেরিকীয় লক্ষণাক্রান্ত হয়—ইত্যাদি। সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে একই পিতামাতার কোনো দুই পুত্রই সর্ব্বাংশে সমান নহে; কিন্তু আবার এটাও ঠিক্ যে, কোনো না কোনো অংশে একই পিতামাতার সকল পুত্রই সমান, কেননা পৈতৃকগুণ সকল পুত্রেই কোনো না কোনো অংশে বর্ত্তিতেছে। আধুনিক জীবতত্ত্বজ্ঞদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, নানা জাতীয় জীবগণের মধ্যে যেখানে যত সাজাত্য দেখিতে পাওয়া যায় সমস্তই সন্ততির নিয়মাধীন; আর, যেখানে যত বৈজাত্য দেখিতে পাওয়া যায়—সমস্তই সঙ্গতির নিয়মাধীন।

ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, একই মৌলিক বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি (অর্থাৎ আদিম জাতীয় বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি, কাল ক্রমে বিশেষ বিশেষ নানা জাতীয় বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তিতে পরিণত হইয়াছে; এবং এ যাহা হইয়াছে—তাহা শুদ্ধ কেবল দুইটি নিয়মের প্রসাদাৎ (১) সন্ততির নিয়ম; এবং (২) সঙ্গতির নিয়ম;—ইহাই সাজাত্য-বৈজাত্যের ভিত্তি-মূল। পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে, বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তি (সাধারণতঃ ধরিতে গেলে—জীবোৎপাদিকা-শক্তি) দুই অংশে বিভক্ত—(১) কৈন্দ্রিক-শক্তি এবং (২) পারিধ শক্তি। প্রথমতঃ, যে বীজ যে-জাতীয় বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—সে বীজ শুদ্ধ কেবল সেই জাতীয় বৃক্ষ উৎপাদনেই তৎপর—ইহাই কৈন্দ্রিক শক্তির পরিচায়ক; দ্বিতীয়তঃ জল-বায়ু-মৃত্তিকা—যাহার সহিত পূর্ব্বে ঐ বীজটির কোনো সম্পর্কই ছিল না—এক্ষণে সেই জল-বায়ু-মৃত্তিকাই উৎপদ্যমান বৃক্ষের পুষ্টি সাধনে অহর্নিশ নিযুক্ত রহিয়াছে;—ইহাই পারিধ শক্তির পরিচায়ক। আম্র বীজ চতুর্দ্দিকস্থ জল-বায়ু মৃত্তিকাকে আম্র-বৃক্ষে পরিণত করে—পর-বস্তুকে আত্মসাৎ করিবার এই যে শক্তি—ইহাই আম্র-বৃক্ষের কৈন্দ্রিক শক্তি; আর, আম্র-বৃক্ষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিণত হইবার শক্তি যাহা জল-বায়ু-মৃত্তিকাতে বর্ত্তমান আছে—তাহাই আম্র-বৃক্ষের পারিধ শক্তি। কৈন্দ্রিক শক্তি সন্ততির নিয়মানুসারে বৃক্ষের সাজাত্য সমর্থনে প্রবৃত্ত হয়, এবং পারিধ শক্তি সঙ্গতির নিয়মানুসারে বৃক্ষের বৈজাত্য সংঘটনে প্রবৃত্ত হয়। কৈন্দ্রিক শক্তি দ্বারা বৃক্ষ বহির্বস্তু-সকলেতে আপনার গুণ সঞ্চার করে এবং পারিধ শক্তি দ্বারা বহির্বস্তু সকলের গুণে আক্রান্ত হয়। বৈজাত্য শব্দে অনেকে ভুল বুঝিতে পারেন—মনে করিতে পারেন যে, সঙ্গতির নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আম্র-বৃক্ষের জাতি একেবারেই পরিবর্ত্তিত

হইয়া গিয়া অবশেষে হয় তো এমনও হইতে পারে যে, আম্র-বীজ কোন্ দিন বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া কাঁটাল বৃক্ষ উৎপাদন করিয়া বসিল। যদি সঙ্গতির নিয়ম একাকী সর্ব্বে-সর্ব্বা হইত, তাহা হইলে এরূপ হইবার কোনো বাধা ছিল না; কিন্তু সঙ্গতির নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে সন্ততির নিয়ম অবিচ্ছেদে লাগিয়া থাকাতে ওরূপ অব্যবস্থিত জাত্যন্তর সংঘটনের পথ একেবারেই অবরুদ্ধ। এই জন্য বৈজাত্য যাহা ঘটিবার—তাহা আম্র-বৃক্ষের স্বজাতির গণ্ডি'র অভ্যন্তরেই ঘটে; সে গণ্ডি উল্লঙ্ঘন করিয়া বৈজাত্য ঘটিতে পারে না। বিস্বাদু বন্য আম্রের জাতি পরিবর্ত্তিত হইয়া কাল-ক্রমে তাহা যে সুস্বাদু ঔদ্যানিক আম্রে পরিণত হয়—তাহাই তাহার যথেষ্ট বৈজাত্য সংঘটন; কেন না, বৈজাত্য-সংঘটন এবং সাজাত্য-সমর্থন, দুইই সমান আবশ্যক; কৈন্দ্রিক শক্তি এবং পারিধ শক্তি দুয়েরই সমান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া; সন্ততির নিয়ম এবং সঙ্গতির নিয়ম দুয়েরই সমান বলবত্তা। এইরূপে বৃক্ষের উৎপাদন-ক্রিয়ার অভ্যন্তরে আমরা তিনটি যুগলাঙ্গের সন্ধান পাইতেছি যথা—

শক্তি	নিয়ম	ফল
(১) কৈন্দ্রিক	(১) সন্ততি-প্রবণতা	(১) সাজাত্য
(২) পারিধ	(২) সঙ্গতি-প্রবণতা	(২) বৈজাত্য

এখন বক্তব্য এই যে, কৈন্দ্রিক এবং পারিধ শক্তি যাহা উল্লিখিত হইল তাহা দুই শক্তি নহে কিন্তু একই শক্তির দুই পৃষ্ঠ বা দুই অবিচ্ছেদ্য অবয়ব। এই উপলক্ষে ডাক্তার সাল্‌জার্ তাঁহার একটি অতীব সারবান প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না;—

"The modern exponents of evolution, represent their theory in such a manner, as if the eventual progressive variation of plants and animals, were simply the work of chance. Their theory is this: that inheritance is the standing law in the organic world; that consequently like should invariably beget like; that, as far as the inner economy of organisms is concerned, there should be no deviation whatever from the parental form; that organisms are, however, invariably influenced, in their growth and development by their surroundings; while they are, on the other hand, possessed of the faculty of adapting themselves to the requirements of different surroundings; and that it is in virtue of the faculty of adaptation that deviations from the parent stock occur. Those deviations or varieties may either have less fitness to live and procreate, than the individuals of the original species, in which case, they would sooner or later be exterminated for want of food supply; as they could not sustain for long the struggle for existence against superior organisms: or, they—

the new varieties --may be endowed with a greater fitness for existence, in which case, the original stock have to make room for them, according to the principle of the survival of the fittest. Whether a given species is to progress in its form and structure or not, would accordingly entirely depend upon the nature of the variety that happens to be produced under the pressure of altered environment. On the whole, it is conceded that the records of Geology unmistakably show systematic progress; but it is alleged that this proves only, that the chance-productions of the fit varieties, have by far outlived those of less fitness for life; but it does not prove as yet, that there is a natural, inner tendency, towards the invariable production of superior varieties.

Now I have argued this point at some other occasion and have shown that there is good reason to believe that the tendency towards variation is by no means solely the outcome of the influence of surroundings, but is innate in every organism. The correct view on the subject of organic evolution, I have shown to be, that the phenomena of inheritance and variation, as characteristic of vital activity, are not the expressions of two, somewhat opposite, laws; but of one law, which might best be named, 'the law of diverging inheritance.' It is a law, according to which a living organism tends to propagate, not its exact likeness, but its similar. As proof of the correctness of my contention, I have pointed to the fact mentioned as a matter of curiosity by Darwin, that both animals and plants deteriorate when kept for generations under the same influence of soil and climate. In the case of animals, the advantage to be derived from crossing is well known to every breeder. This then goes to show that the tendency towards variation, far from being impressed upon living beings by some foreign, unfavourable condition, is innate in them, and that the outward conditions help only to realise an instinct that is essential; so essential, indeed, that the species of plants or animals placed beyond the reach of its realisation, degenerates, and in the long run, perishes."

অতএব সন্ততি-প্রবণতা এবং সঙ্গতি-প্রবণতা এই যে দুইটি জৈবিক নিয়ম তাহা একই নিয়মের দুইটি পৃষ্ঠ--সে নিয়ম আর কিছুঁ নয়—"বিক্রয়মান সন্ততির নিয়ম" (Law of diverging inheritance) বিক্রয়মান অর্থাৎ ক্রমাগতই বিকারোন্মুখ; বিকার শব্দে সচরাচর কু'য়ের দিকে পরিণতি বুঝায়—কিন্তু বিকার শব্দের মুখ্য অর্থ তাহা নহে,—বিকার শব্দের মুখ্য অর্থ বিভিন্ন আকারে পরিণতি—বৈচিত্র্যে পরিণতি; এই অর্থে—সমস্ত জগৎই একই মূল প্রকৃতির বিকৃতি। নানাবিধ বীজের কৈন্দ্রিক জীবোৎপাদিকা শক্তি একই মৌলিক জীবোৎপাদিকা শক্তির বিভিন্ন পরিণাম; আর, মৌলিক

জীবোৎপাদিকা শক্তি যাহা বিশেষতঃ আদিম জীবে বর্ত্তমান ছিল এবং সাধারণতঃ সকল জীবেই অদ্যাপি বর্ত্তমান, ও পারিধ বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি যাহা জল-বায়ু-মৃত্তিকার অভ্যন্তরে সর্ব্বকালেই বর্ত্তমান—এই যে দুই শক্তি (মৌলিক এবং পারিধ শক্তি) এ দুই শক্তি একই শক্তির এ পিট ও-পিট। অণ্ডের প্রথম অবস্থায় তাহার অভ্যন্তরে একই প্রকার সদৃশাকার উপাদান সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকে—ক্রমে তাহার একস্থানে একটি ক্ষুদ্র জীবাঙ্কুর (Nucleus) পরিস্ফুট হয়; সেই জীবাঙ্কুরটিই অবশিষ্ট অণ্ড দ্রব্যের ভোক্তা, এবং অবশিষ্ট অণ্ড দ্রব্য সেই জীবাঙ্কুরটির ভোজ্য-সামগ্রী। এ যেমন একটি ব্যাপার—তেমনি, জল-বায়ু মৃত্তিকার একাকার অবস্থা ভিন্নাকারে পরিণত হইয়া বীজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—ইহাই উপমা সঙ্গত। বীজের সহিত জল-বায়ু মৃত্তিকার যে একটি পোষ্য-পোষক সম্বন্ধ আছে—তাহা অবশ্য জল-বায়ু মৃত্তিকা এবং বীজ উভয়ের গোড়ার বৃত্তান্ত হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; সেই মূল-স্থানে অবশ্য কৈন্দ্রিক এবং পারিধ দুই শক্তিই একীভূত—অণ্ডের অভ্যন্তরে ভোক্তা এবং ভোজ্য-সামগ্রী দুইই একত্রে অবস্থিতি করে—দুইই গোড়ায় এক। বিশাল ভাগীরথীর সাগর-সঙ্গম প্রদেশে এপার-হইতে ওপার দেখা যায় না—কিন্তু গোমুখীর মুখরন্ধ্রে দুই পার একত্রে মিলিয়া-মিশিয়া অবস্থিতি করিতেছে। তেমনি, ভাবিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হয় যে, একই মূল-শক্তি প্রথমতঃ বীজকে আর আর ভৌতিক পদার্থ হইতে বিশেষিত করিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ, বীজের অভ্যন্তরে তাহা কৈন্দ্রিক বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তিতে পরিণত হইয়াছে—এবং জল-বায়ু-মৃত্তিকার অভ্যন্তরে পারিধ বৃক্ষোৎপাদিকা-শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। গোড়া'র সেই যে জীবোৎপাদিকা-শক্তি—যাহা সাধারণতঃ সর্ব্বজগতের অভ্যন্তরে কার্য্য করিতেছে—কোন স্থানেই যাহার কার্য্যের বিরাম নাই—তাহাই জৈবিক প্রকৃতি শব্দের বাচ্য। ভৌতিক প্রকৃতি কি—তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি (আকর্ষণ-বিকর্ষণ); জৈবিক প্রকৃতি কি তাহা আমরা এক্ষণে দেখিলাম—সন্ততি-প্রবণতা এবং সঙ্গতি-প্রবণতা; অতঃপর মানসিক প্রকৃতি কিরূপ তাহা দেখা যাউক্; এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন লক্ষণের অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা মূল-প্রকৃতির পরিচায়ক লক্ষণ সর্ব্বশেষে স্থিরীকৃত হইবে। শ্রীদ্বি]

জীবন-ট্র্যাজেডি।

মরণের কথা উঠিলেই লোকে সাধারণতঃ ট্র্যাজেডি ভাবিয়া গম্ভীর হইয়া আসে, বাক্য সংযত করিয়া স্থিরনেত্রে চাহিয়া থাকে—চিরজন্ম হৃদয়ে মুদ্রিত থাকিবার মত কি বুঝি ঘটনা আসিতেছে। হাসিতে ভরসা হয় না, কোথায় রসভঙ্গ হইবে, ভাব মারা যাইবে। লোকে কতকটা কাঁদিবার অবস্থায় আসিয়া অপেক্ষা করে। হাসির

কথা যদি উঠে হাসে বটে, কিন্তু নয়নের ছল-ছল ভাব তখনও যায় নাই। মৃত্যুর রহস্য রাজ্যে আমরা বিভীষিকার একটা করাল কাল মূর্ত্তি খাড়া করিয়া রাখিয়াছি, দিন রাত্রি সেই মূর্ত্তি পানে চাহিয়া বিরহের স্বপ্ন দেখিতেছি; সুতরাং মৃত্যু আমাদের নিকট ট্র্যাজেডি বৈ আর কি? আরম্ভের কথা ভাবিবার আমরা বড় একটা অবসর পাই না, জীবন পড়িয়া থাকে; উপসংহার পড়িয়া দেখি নায়ক নায়িকার কে এক জন সরিয়া গিয়াছে। আমরা কাঁদিয়া উঠি।

কিন্তু যে ঘটনা স্রোতের মধ্য দিয়া সে উপসংহার রচিত হইয়াছে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে আমরা কখনই নিশ্চিত কিছু বলিতে পারি না। উপসংহারেই ত কাব্য বুঝা যায় না – গঠন দেখিয়াই ট্র্যাজেডি কিনা বলা যায়। সুতরাং মৃত্যুকে ট্র্যাজেডি প্রমাণ করিতে হইলে জীবনের গঠনে তাহার অনুকূল ঘটনা আছে কি না—আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। তাহার পর দেখিতে হইবে, মৃত্যুর পরিচ্ছেদটী উঠাইয়া লইলে জীবন কিরূপ প্রতিভাত হয়। বিরহ মাত্রই ট্র্যাজেডি নহে, বিরহ-বিশেষ ট্র্যাজেডি বটে। সেইরূপ মিলন বিশেষ ট্র্যাজেডি, আবার মিলন বিশেষ ট্র্যাজেডি ছাড়িয়া সামান্য প্রহসন। একটী সূক্ষ্ম সূত্রের উপরে ট্র্যাজেডি নির্ভর করে। মিলনই হোক, বিরহই হোক, তাহার ভিতরে অন্তঃসলিলা নদীর মত একটী ভাব বহিয়া চলিয়াছে; ট্র্যাজেডি সেই ভাবে। এই জন্য কাঠাম দেখিয়া কিছু বুঝিবার নাই—জীবনের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হইবে।

জীবন সম্বন্ধে আমরা হাসিয়া কথা কহি, এই হেতু তাহাকে ট্র্যাজেডি হইতে বিস্তর তফাৎ মনে হয়। জীবন যেন কিছুই নয়, কতকগুলা দিনসমষ্টিমাত্র—কোন প্রকারে কাটিয়া যাওয়া বিষয়। দৈনন্দিন ঘটনা সমূহের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আমরা তাহার ট্র্যাজেডি-গাম্ভীর্য্য তেমন উপলব্ধি করিতে পারি না, নিতান্ত প্রহসন না বলিলেও মৃত্যুর তুলনায় লঘুরকম একটা কিছু বুঝি। আমরা জীবনটা উপভোগ করিয়া লই, তাঁহার দেহটা যত দেখি আত্মা তত দেখি না। আর মৃত্যুর দেহের দিকে চাহিতে বড় ভরসা হয় না, কল্পনায় তাহার যে ভাব আছে সেই ভাবেই মুগ্ধ হইয়া থাকি।

জীবনের ট্র্যাজেডি কিন্তু কোথায়? সুখের গভীরতায় আমরা যে দুঃখ-প্রবাহ অনুভব করি, সেইখানেই জীবনের ট্র্যাজেডি। বাহিরে সারাদিন হাসিলেও আমাদের অন্তরে একটা অশ্রুসিক্ত ভাব বহিয়া যায়, আমাদের মিলনের মধ্যে এমন একটা বিরহ-বিদ্ধ ভাব থাকে, যাহাতে জীবন নিতান্ত লঘু হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের শত সহস্র অস্ফুট ভাবেই ট্র্যাজেডি বজায় থাকে—সুখের মধ্যে দুঃখ, শান্তির মধ্যে অতৃপ্তি, ইত্যাদি। কাঁদিয়া ফেলিলেই অনেক স্থলে কমেডি হইয়া দাঁড়ায়, দীর্ঘনিশ্বাস আসিয়া ট্র্যাজেডি রচনা করে। আমরা অতীতে দাঁড়াইয়া বর্ত্তমান অনুভব করি, সেই বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া দেখি, ট্র্যাজেডি ক্রমাগতই যেন ঘনাইয়া আসে।

এত বড় ট্র্যাজেডি আর আছে নাকি? কোথা হইতে কোন্ হৃদয় আসিয়া অপর হৃদয়ের সহিত মিলিত হইল, সমস্ত মিলন-আনন্দের মধ্যে ভাবনা চিন্তা ভয় মাত্র জাগিয়া। যে উদ্দেশ্যের জন্য খাটিয়া যাও, উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই ট্র্যাজেডি। সব যেন ফুরাইল, অবসন্ন উদ্যম এখনও সেই অতৃপ্ত। এই অতৃপ্তিতেই ট্র্যাজেডি; এবং এই জন্যই মৃত্যু উপসংহারে জীবন ট্র্যাজেডি ভালরূপে ফুটিতে পারিয়াছে।

মৃত্যু আসিয়া জীবনের হৃদয়ে একটা ছায়া ফেলিয়া দিল। তাহার মধ্যে এমন একটা অব্যক্ত অস্ফুট রহস্য-সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠিল যে, হৃদয়ের গভীরতায় তাহা চিরদিন মুদ্রিত হইয়া থাকে। উপসংহার লঘু হইলে ত ট্র্যাজেডি মাটী হইয়া যায়। মৃত্যুর উপসংহার জীবন-ট্র্যাজেডির উপযুক্তই হইয়াছে। এমন গম্ভীর ভাবময় উপসংহার কোথায় মিলিবে? বিস্তৃত অতীত এবং আরও বিস্তৃত ভবিষ্যৎ, এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-বন্ধন। ভবিষ্যতের পৃষ্ঠা আর খুলিল না, অতীতের মধ্য হইতেই ভবিষ্যৎকে অতি ক্ষীণ দেখা যাইতেছে।

জীবন বিশেষ যে ট্র্যাজেডি এবং অনেক জীবন ট্র্যাজেডি নয়, তাহা নহে। পাষাণের মধ্য দিয়াও এক দিন নিভৃতে নির্জ্জনে অশ্রুস্রোত বহে, সেইখানেই তাহার ট্র্যাজেডি। অশ্রুস্রোত জমিয়া গিয়া যখন কঠিন হইয়া যায়, হৃদয় উঠিতে পারে না, তখনও তাহা ট্র্যাজেডি। তবে সকল জীবন অবশ্য সমান ট্র্যাজেডি নয়, এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

জীবন যদি তবে ট্র্যাজেডিই হইল, হাস্যরস কোথা হইতে আসিল? হাস্যরস যে ট্র্যাজেডিতে থাকিতেই পারে না এমন কোন আইন নাই। তবে হাস্যরসের প্রাচুর্য্যে গাম্ভীর্য্য অনেক সময় নষ্ট হইবার সম্ভাবনা বলিয়াই তাহা ট্র্যাজেডির অনুকূল রস নহে। তাই বলিয়া প্রথম হইতে চোখ রগড়াইতে আরম্ভ করিলেও ট্র্যাজেডি হয় না। আমাদের জীবনে সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য। হাস্যের অধরে অশ্রুর রেখা—হাসিয়া হাসিয়া গড়াইয়া যাও, কিন্তু কাঁদিতে হইবে। এমন চমৎকার নিখুঁৎ ট্র্যাজেডি আর নাই। যত বড় আলঙ্কারিক আসুন না কেন, ইহার একটী দোষ বাহির করিতে পারিবেন না।

আর ইহা ট্র্যাজেডি নয়, এ কথা কেহ বলিতে পারে? জন্মের মধ্যে মৃত্যু বসিয়া—আরম্ভের মধ্যে অবসান। আর শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য যতই আলোচনা করিয়া দেখ, প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ট্র্যাজেডি। শৈশবের সারল্যের মধ্যেও সন্দেহের বীজ রহিয়াছে—কৈশোর যৌবনের অনুরাগ উৎসাহ উদ্যমের মধ্য দিয়া গিয়া সেই সন্দেহ বার্দ্ধক্যে ফুটিয়া উঠে। পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদের মধ্য দিয়া নীরবে এই গম্ভীর মহা-ট্র্যাজেডি গঠিত হইতেছে। এই ট্র্যাজেডির আদর্শেই মহাভারত, রামায়ণ, হ্যাম্লেট।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কিন্তু জীবন ট্র্যাজেডি বুঝেন নাই। জীবনের উপসংহার মৃত্যু; তাঁহাদের নিয়মানুসারে গ্রন্থের উপসংহারে মৃত্যু থাকিবার যো নাই। নায়ক নায়িকার

মিলন না হইলে তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন। মিলন হইলেও ট্র্যাজেডি অবশ্য হইতে পারে, দুই চারি জনের মৃত্যুতেও ট্র্যাজেডি না হইতে পারে, কিন্তু এ সম্বন্ধে আইন থাকা অবশ্য ভাল নয়। স্বভাবে যাহা নাই—সাহিত্যে তাহা জোর করিয়া রাখা কেন?

স্বভাবে ট্র্যাজেডিরই অভিনয় চলিয়াছে বোধ হয়। প্রহসন দেখিয়া আমাদের এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রহসনের মধ্যে অনেক সময় ট্র্যাজেডি ঘুমাইয়া থাকে। প্রহসন কাষ্ঠহাসি হাসিয়া ট্র্যাজেডির অভিনয় দেখাইয়া দেয় মাত্র। অনেকেই দেখিয়া হাসে, কিন্তু যাহাদের হৃদয় আছে ঘরে আসিয়া কাঁদে। বলা বাহুল্য, উদ্দেশ্য বিহীন কতকগুলা বিদ্বেষপূর্ণ ব্যঙ্গোক্তি প্রহসন নহে। কিন্তু প্রহসন অবশ্য ট্র্যাজেডিও নহে, তবে অনেক সময় ট্র্যাজেডির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বটে।

জীবন ট্র্যাজেডিকে ব্যক্ত করিবার জন্য প্রহসন ঘটনা দুইচারিটা থাকে। কিন্তু সে প্রহসনের পরিণাম ট্র্যাজেডি। বৈচিত্র্যের জন্য তাহাতে সৌন্দর্য্য সুব্যক্ত হয়। তবে তাহাকে প্রহসন বলা কতদূর সঙ্গত সন্দেহ। জীবন কাঁদিয়া জন্ম গ্রহণ করে, কাঁদিয়া হাসিয়া মরে; দর্শকেরা কিন্তু তখনই কাঁদিয়া উঠে। এইখানেই জীবনের সমস্ত ট্র্যাজেডি।

চিরকুমারী।

তোমরা স্বামীপার্শ্ববর্ত্তিনী, তোমরা আমার কথা বুঝিবে না। তোমাদের কৌমার্য্য সুখের ছিল, এখন বিবাহের সুখ ভোগ করিতেছ। স্বামীর বামার্দ্ধভাগিনী, সন্তানপালিনী সুন্দরী আমার কথা বুঝিবেন না, হয়ত শুনিবেন না। আমি কুমারী। বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহ হয় নাই। আমি দরিদ্রকন্যা, নিতান্ত শৈশবাবস্থায় পিতার মৃত্যু হয়। মাতা বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহাকেও কাল হরণ করিল। আত্মীয় কুটুম্ব কেহ নাই, দাঁড়াই কোথায়? গ্রামস্থ লোকে আশ্রয় দিল, আশ্রয় পাইলাম। দেখিতে দেখিতে বড় হইয়া উঠিলাম! কেহ কেহ বিবাহের সম্বন্ধ করিল, কেহ কহিল চাঁদা তুলিয়া বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। দুই একজন দেখিতে আসিল—মস্ত ডাগর মেয়ে, মনস্থ হইল না। দুই একটা সম্বন্ধ আসিল, আমার মনস্থ হইল না। বিবাহ হইল না। কিছু দিন পরে বিবাহের আর কোন কথা উঠিত না। কুলীন কন্যার ফুল গাছের সঙ্গে যেমন বিবাহ হইত, আমার তাহাও হইল না। আমি জগতে একা আসিয়া একাই আছি। বিবাহের সুখ, বৈধব্যের দুঃখ, কিছু জানি না। আমি একাকিনী। পুরুষ যেমন একা থাকে তেমন নয়। আমি আপনাকে লইয়া আপনার প্রাণের মধ্যে একাকিনী আছি।

এমন করিয়া আর ভাল লাগে না। এমন করিয়া আপনাকে লইয়া আর থাকিতে পারি না। আপনার কাণে আপনার কাহিনী আর বলিতে পারি না। আমার সুখ কি দুঃখ তাহা আমি জানি না—কেন না লোকে যাহাকে সুখদুঃখ বলে, আমার কপালে তাহা কখন ঘটে নাই। এইমাত্র বুঝিতেছি যে এখন মন কেমন অস্থির হইয়াছে। এখন আর ঘরে বাঁধা, এ জগতে বাঁধা থাকিতে ইচ্ছা হয় না। ইচ্ছা হয় আকাশময় উড়িয়া বেড়াই, গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই। এই অস্থির প্রাণের অস্থির কথা তোমরা শুনিবে কি? তোমরা সংসারারণ্যে বিচিত্র উপবন রচিত করিয়া, জগতের সুখসৌন্দর্য্য, স্নেহপ্রণয় উপভোগ করিতেছ, তোমরা সব যুগল যুগল, যে একা সেও হৃদয়মধ্যে আর কাহার মূর্ত্তি ধ্যান করে, তোমরা আমার এ কথায় মন দিবে কি? তোমাদের যে সুখ, সে সুখ আমার নাই, তোমাদের যে দুঃখ আমার সে দুঃখ নাই, তোমাদের যে আশা, আমার সে আশা নাই, তোমরা আমার কথা শুনিবে কি? আমার মন আমি বুঝি না, তোমরা যদি আমার কথা শুন, তবে আমি আপনার মন বুঝিতে পারি। তোমরা যদি আমার কথা শুনিয়া অশ্রুমোচন কর, তবে আমি বুঝিব যে আমি এই আজন্মকাল দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছি। আর যদি তোমরা হাস, তাহা হইলে আমি আমার এই অবস্থা সুখের বলিয়া জানিব। তোমরা কি আমার কথা শুনিবে না?

এ জগতে কেন আসিলাম? পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কি হইল? আমি মরিলে কি ক্ষতি ছিল? আমি মরিলে কেহ ত কাঁদিবে না। যাহার থাকিয়া কোন কাজ নাই, সে আর থাকে কেন? প্রকৃতির এই যে চিরন্তন নিয়ম, পরে পরের জন্য ভাবিবে, পরে পরের জন্য কাঁদিবে, সে নিয়ম ভঙ্গ করিবার আমার কি অধিকার? কালের যে স্রোতে সব ভাসিয়া যায়, অনাদি কাল হইতে বহমান এই খরতর স্রোতে আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যায় না কেন? আমি ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড, কালের আবর্ত্ত চক্র আমায় গ্রাস করে না কেন?

দেখ, আমারও এককালে রূপযৌবন ছিল—সৌন্দর্য্য, লাবণ্য সব ছিল। আমি মরুভূমে ফুটি নাই। আমাকে পরিগ্রহ করে, এমনও দুই চারি জন ছিল, কিন্তু আমার বিবাহে মন সরিল না। দেখিলাম, আমাকে বিবাহ করিয়া কেহ সুখী হইবে না। একবার কেবল চিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল, একবার আমার সঙ্কল্প বিচলিত হইয়াছিল। যৌবন নদীর কূলে কূলে জল, সেই সময় একবার কেবল প্রণয়ের তরঙ্গে জীবনের মূল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর, সে ভ্রমও ভাঙ্গিয়া গেল। আমি সব কথা বলিতে বসিয়াছি, সে কথাও বলিব। তোমরা বুঝিয়া দেখ, আমাকে পাপ স্পর্শ করিয়াছে কি না।

একদিন প্রাতে আমি পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলাম।

পথে একজন যুবাপুরুষ দাঁড়াইয়া ছিল। সে আমাকে চাহিয়া দেখিল, আমিও একবার চাহিলাম। চারি চক্ষে মিলিল। তখনি চক্ষু নত করিলাম। তোমাদের প্রণয় কেমন আমি তাহা জানি না, আমি কখন প্রণয় সম্ভাষণ করি নাই, কেহ আমাকে প্রেমের কথা বলে নাই। কখন কোন পুরুষকে দেখিয়া আমার কোনরূপ চিত্তবৈকল্য হয় নাই। গঙ্গাস্নানের পথে মজিলাম। আর কিছু নয়, একবার দেখামাত্র। তাহার পর সব ভুলিয়া গেলাম। অবশিষ্ট পথ যেন স্বপ্নের মত বোধ হইল। সঙ্গিনীগণ কি বলাবলি করিতেছিল, কিছু শুনিতে পাইলাম না। সম্মুখে স্বর্গ হাসিতেছিল। প্রস্ফুটিত পারিজাত মন্দারের সৌরভে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। গঙ্গাজলে নামিতে বোধ হইল মন্দাকিনীর জলে অবগাহন করিতেছি। হরি! হরি! চক্ষের মিলনে এত সুখ! না জানি হৃদয়ের মিলন কেমন! গৃহে ফিরিতে পথে আবার সেই মূর্ত্তি দেখিলাম। আবার! এবার চাহিতে চমক হইল, স্বর্গস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিলাম সেই দেবতুল্য চক্ষে ইন্দ্রিয়-লালসার কটাক্ষ। গৃহে আসিয়া শুনিলাম সে পশুবৃত্ত পাপিষ্ঠ, যুবতীদিগের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ভ্রমণ করে। স্বর্গ চুরমার হইয়া গেল। আর আমি পথে বাহির হইতাম না।

প্রণয় কাহাকে বলে? তোমরা পতির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, পতিমুখ দেখিয়া যখন আনন্দে ভাসিতে থাক, সেই সময় কি প্রণয় অনুভূত কর? আমি ত প্রণয় জানি না, তবে সেই চক্ষে চক্ষে সম্মিলন, সেই অননুভূতপূর্ব্ব মোহের আবেশ, সেই স্বর্গচিত্র মনে পড়ে বটে। তাহাই কি প্রণয়? ধিক্ এমন প্রণয়ে! যাহাকে স্পর্শ করিতে হইলে ঘৃণা হয়, তাহার সহিত আবার প্রণয় কিসের? হয়ত প্রণয় তাহাকে বলে না। হয়ত যে টুকু চক্ষে চক্ষে মিলিত হয়, সেই টুকু প্রণয়। যে কয় মুহূর্ত্ত চক্ষু মিলন হয়, সেই কয় মুহূর্ত্ত উভয়ে উভয়ের উপযোগী। সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ, দুর্ব্বৃত্ত পুরুষের হৃদয়ে যে টুকু দেবভাব ছিল, সেই টুকু আমার প্রাণের সহিত মিশিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নন্দনকাননে বিচরণ করিয়া থাকিবে। নহিলে, যাহার ছায়া মাড়াইতে নাই, সে আমার চিত্ত হরণ করে কি রূপে?

তোমরা কি মনে কর আমি বলিতে পারি না, কিন্তু আমি ভাবি যে রমণীর প্রণয়ের প্রতিদান পুরুষে সম্ভবে না। এ কথা বলাতে গৌরব কিছু নাই, বরঞ্চ অগৌরব আছে। আমাদের প্রকৃতি পুরুষের অনুরূপ হইলে কি ক্ষতি ছিল? পুরুষে যেমন ভালবাসে, আমরাও সেইরূপ ভালবাসিলে কি ক্ষতি ছিল? আবার পুরুষেরা বলেন যে রমণী সহজে ভোলে। হায়! পুরুষে আপন মন বুঝিতে পারে না, আমাদের কি বুঝিবে!

এখন আর সে কাল নাই। যৌবনের ফুল ঝরিয়াছে, কোন দিন জীবন বৃক্ষের মূল শুকাইবে। এখন আর প্রণয়ের কথায় কাজ কি? যখন যৌবন ছিল, তখনই প্রেমের

চিন্তাকে কখন মনে স্থান দিই নাই, এখন আর সে কথায় কাজ কি? লোকে মনে করে যাহার যৌবন নাই, তাহার প্রণয়ের কথায় কোন অধিকার নাই। কেহ কি বুঝে না যে অতৃপ্ত লালসা চিরকাল সমান থাকে, কালক্রমে বাড়ে বই কমে না? আমি শুধু প্রণয়ের কথা বলি না, কেন না সে তৃষা আমাকে কখন দহন করে নাই, একবার স্পর্শ করিয়াছিল মাত্র। মানুষের আকাঙ্ক্ষা অপরিহার্য্য, বাসনা অতৃপ্য। যদি বয়সের সঙ্গে সব ফুরাইত, তবে কবির কল্পনা কোথায় থাকিত? কবি বার্দ্ধক্যে বালকের অমৃতময় হাসি কিরূপে কল্পনা করিত? জগতে স্নেহ আছে, আশা আছে, ধর্ম্ম আছে, সব কি বয়সের সঙ্গে যায়? আমি কিছু চাহি না, আমি কিছু পাই নাই। জগতে আমার জন্য কিছু নাই, আর কোথাও কি আমার জন্য কিছু নাই? আছে কি না, তাহাও এতদিন জানিবার কোন ইচ্ছা ছিল না, ভাবিতাম কোথাও কিছু থাকিলে আপনি জানিতে পাইব। সে নিশ্চেষ্টতা এখন গিয়াছে। এখন জানিতে ইচ্ছা করে। আমি যদি কোথাও কোন সুখ দুঃখের ভাগিনী না হইব, তবে আমি এই ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড পূরিয়া রাখিয়াছি কেন? আমি সরিলে ত অপরের স্থান হইত। ইচ্ছা হয় আকাশের জ্যোতিস্তরঙ্গে আরোহণ করিয়া অন্য কোন গ্রহে ভাসিয়া যাই, দেখি সেখানে আমার ভাগ্যে সুখ দুঃখ কিছু আছে কি না। নিয়তির চক্র কাহাকেও পেষণ করে, কাহাকেও আকাশে তুলিয়া লইয়া যায়, আমাকে ফেলিয়া গেল কেন? আমার ভাগ্যে জীবলোকের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল কেন? ব্যতিক্রম মাত্রেই কি দুঃখময়? তাহাত জানি না। আমি ত বলিতেছি, আমার এ সুখ কি দুঃখ তাহা আমি জানি না।

ইচ্ছা করে একবার খুঁজিয়া দেখি, একবার আকাশ পাতাল তন্ন তন্ন করিয়া দেখি, কোথাও আমায় কেহ চিনিতে পারে কি না। কে জানে, কোথায় কি আছে? আকাশের কক্ষায় কত গ্রহ, কত উপগ্রহ, কত নক্ষত্র আছে, সেই বিশাল আলোক সমুদ্রের মধ্যে এ হৃদয় আলোকিত করিবার জন্য কি একটী কিরণ নাই? কোথাও কি কোন জ্যোতির্ম্ময় দিব্য মূর্ত্তি আমার অপেক্ষায় বসিয়া নাই? তোমরা বিদ্রূপ করিও না। যে যাহার পথ চাহিয়া থাকে, সে যৌবন চায় না। যৌবন এক দণ্ডের জোয়ার, প্রণয় চিরবাহিনী স্রোতস্বিনী। আকাশে কোথাও কিছু না থাকে, পাতালেও কি নাই? অন্ধকারের কুক্ষি মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি—কোথাও কোন নিভৃত স্থানে আমার জন্য অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই কি? অন্ধকারে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কেহ কি আমার নাম ধরিয়া ডাকে না? না ডাকে ক্ষতি কি? এতদিন ত কেহ ডাকে নাই, কেহ কখন না ডাকিলেই বা আমার কি ক্ষতি? তবু খুঁজিতে ইচ্ছা করে। মন কিছুতেই বুঝে না। জগতে কিছুই নিষ্প্রয়োজন নহে, কেবল কি আমি বিনা আবশ্যকে জন্মগ্রহণ করিয়াছি? যে নিয়মে বিশ্ব বদ্ধ, সে নিয়মের এমন ব্যভিচার কেন হইবে?

যুবতীর প্রণয়, মাতার স্নেহ কেমন? প্রণয়ের সম্ভাষণ কেমন, সন্তানের জন্য অগাধ

সাগর তুল্য স্নেহ কেমন? এক হৃদয়ের জন্য অন্য হৃদয়ের তৃষা কোথা হইতে আইসে? একে অপরের মুখ চাহিয়া থাকে কেন? আমি কাহারও মুখাপেক্ষা করি না, তাহাতে ত আমি সুখ দুঃখ কিছু বুঝিতে পারি না। না পারি, এ চিত্তচাঞ্চল্য ত দূর করিতে পারি না। মায়ার মোহময় বন্ধন হইতে কে আমায় অন্তরিত করিল? নিয়মের শৃঙ্খলে বিশ্ব চরাচর কে বাঁধিল? গ্রহগণ কেন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে? বিশ্বের ভিতর কেহ স্বতন্ত্র থাকে না কেন? একে কেন অপরের উপর নির্ভর করে? কেহ কি আমায় কখন স্পর্শ করিবে না, কেহ কি আমার মুখ চাহিবে না?

তোমরা একবার আমায় বল, আমি শ্রবণ ভরিয়া শুনি। বল, তোমরা প্রণয়ে কি সুখ পাও, স্নেহে কি সান্ত্বনা পাও? আমার এ দুরন্ত চিত্ত বশ করিতে পারিলাম না। মানুষের নিকট মন গোপন করিয়াছি, আপনার নিকট হইতে গোপন করিব কিরূপে? হয়ত এ হৃদয়ে প্রেমের উৎস অথবা স্নেহের প্রবাহ লুক্কায়িত ছিল, নিরুদ্ধ করিল কে? আমি নদী প্রবাহে জলবিন্দু, স্রোতে মিশিলাম না কেন?

বুঝি এখানে আমাকে আপনার বলে, এমন কেহ নাই। বোধ হয় আমি আর এক জগতের জীব, এখানে ভ্রমক্রমে নীত হইয়াছি। এখানে ত কেহ আমার কোন সংশয় ভঞ্জন করিল না। এ জগৎ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইব, দেখিব আমার জন্য কি কোথাও কিছু নাই! মেঘ হইতে দূরে, গ্রহ হইতে দূরে, আকাশ হইতে দূরে, নক্ষত্র হইতে দূরে গমন করিব। যেখানে স্থল, জল, আকাশ কিছুই নাই—কর্ণে শব্দ প্রবেশ করে না, চক্ষে দৃশ্য প্রতিভাত হয় না, নিশ্বাস বহে না, ত্বগ্ স্পর্শ অনুভূত করে না, মন অচল হয়। সেই শব্দশূন্য, আলোকশূন্য, অন্ধকারশূন্য, বায়ুশূন্য, কালশূন্য প্রদেশে একেলা দাঁড়াইয়া রহিব, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিব সেখানে কোন জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আগমন করে কি না, সেই চির নীরবে কোন শব্দ বাহিত হয় কি না। সেখানে চিত্তের অস্থৈর্য্য থাকিবে না, সেখানে অনন্তকাল আর কাহারও প্রতীক্ষা করিতে আপত্তি কি? এখন এই দুরন্ত চিত্তাস্থিরতা আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে, তখন এক মাত্র চিন্তায় পরিণত হইবে। সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে কষ্ট হইবে না, কারণ কাল পরিমাণের কোন উপায় রহিবে না। ধীর, শান্ত চিত্তে রজনী যেরূপ নীরবে দিবসের প্রতীক্ষা করে, সেই রূপ আপন অভিলষিতের পথ চাহিয়া থাকিব। প্রণয় অথবা স্নেহ, ধর্ম্ম অথবা শান্তি কি আসিবে, কে আসিবে, তাহা জানি না, কিন্তু এ হৃদয়ের শূন্য পূরিবে। যে আমার জন্য নির্ম্মিত, সে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে। উভয়ের দীর্ঘস্থায়ী উদ্বেগ ঘুচিবে। সে দিন কি আসিবে?

তবে কি ইহ জগতে আমার জন্য স্থান নাই?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

ভাবগত সাহিত্যের আলোচনা করিয়া জাতি বিশেষের মধ্যে উন্নত ভাবের কতদূর চর্চ্চা হইয়াছিল যেমন বুঝা যায়, সমাজের সাধারণ অবস্থা বুঝিবার তেমন সুবিধা হয় না। কবির ভাব সাধারণের অপেক্ষা চিরকালই উন্নত, এই জন্য তাহা দেখিয়া সাধারণের ভাব সম্বন্ধে অকাট্যরূপে বিশেষ কিছু বলা যায় না, তবে জাতির অবস্থা যে এমনতর উন্নত হইয়াছিল যাহাতে তেমন কবি জন্মাইতে পারিয়াছেন—এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় বটে। সমাজের সাধারণ অবস্থা বুঝিতে হইলে ভাবের হিমাদ্রিশিখর হইতে একটু নামিয়া আসিতে হয়, যে সাহিত্যে সমাজের বাহ্যচিত্র যথেষ্ট অঙ্কিত হইয়াছে, এই রূপ সাহিত্যের অনুশীলন আবশ্যক। কারণ, মুখভঙ্গী দেখিয়া তাহা হইলে সহজেই মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিবার সুবিধা হইবে।

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর গ্রন্থই এবিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মুকুন্দরামে ভাবের হিল্লোল কোথাও বড় খেলিতে পায় নাই, কবিত্ব বিকশিয়া উঠিয়া সৌন্দর্য্যের রহস্যদ্বার খুলিয়া দেয় না। বস্তুর অতীত প্রদেশে তাঁহার তেমন আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায় না—চর্ম্ম চক্ষুতে যাহা যেরূপ দেখিয়াছেন, তিনি সেইরূপই বর্ণনা করিতে বসিয়াছেন। উচ্চদরের কবি তিনি নহেন, কিন্তু সাজাইয়া গল্প করিবার তাঁহার ক্ষমতা আছে। আর থোড় বড়ি মোচার ঘণ্টে তাঁহার অভিজ্ঞতারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হাটে যাইলে তিনি হাটশুদ্ধ জিনিষের দর জানিয়া আসেন, ঘরে আসিয়া পাকশালায় গিয়া পাচককে রন্ধন সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করেন, সংসারের কাজ কর্ম্মে অনেক গৃহিণী তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মত মুকুন্দরাম হৃদয়ের সুগভীর ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহারও বিরহ বেদনা আছে, মিলন-আনন্দ আছে, কিন্তু সে বেদনায় দেহই জ্বলিয়াছে অধিক, সে মিলনে দেহই বাঁচিয়া গিয়াছে। দেহকে বাঁচান তাঁহার কতকটা আবশ্যকও হইয়াছিল—তাঁহার স্ত্রীচরিত্রগুলির কি কীলযুদ্ধে সামান্য ব্যুৎপত্তি! মুকুন্দরাম হৃদয়ের ভাষায় গান গাহিলে সপত্নীবর্গের গুম্‌গুম্ কীলশব্দে এবং সম্মার্জ্জিত তারকণ্ঠ সম্ভাষণে তাহা ডুবিয়া যাইত। যাহা হৌক্, এখন আর সে আশঙ্কা নাই, কবিকঙ্কণ বিরহবিধুরাদিগের রুদ্ধ নিশ্বাস বড় অনুভব করেন নাই; বিরহিণীদ্বয়ের কীলাকীলি দেখিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের বোধ করি হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, দূর হইতেই তাই তিনি কাজ সারিয়াছেন।

মুকুন্দরাম জীবনে কষ্ট পাইয়াছেন অনেক। জীবনী লেখা উদ্দেশ্য না হইলেও এখানে আমরা তাঁহার দুঃখ কষ্ট সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিতে পারি। কারণ, চণ্ডী

গ্রন্থের উৎপত্তি কারণে কবি নিজেই আপনার দুরবস্থার কথা বলিতে বসিয়াছেন। অত্যাচারী মুসলমান ডিহিদারের নিষ্ঠুরতায় তাঁহাকে গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল; অনশনে, অর্দ্ধাহারে, দয়াবানের ভিক্ষাদানে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া অবশেষে নরপতি রঘুনাথের আশ্রয়ে আসিয়া তিনি বাঁচিয়া যান। পথে চণ্ডীর আদেশে তিনি যে কাব্য রচনা করিতে বসেন, এইখানে আসিয়াই সম্ভবতঃ তাহা পরিপুষ্ট ও সম্পূর্ণ হয়।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী মোটামুটী দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে কালকেতুর কথা বর্ণিত হইয়াছে—কালকেতুর জন্ম, বিক্রম, বিবাহ, যুদ্ধ ইত্যাদি ; দ্বিতীয় খণ্ডে ধনপতি সদাগরের কথা—লহনা খুল্লনার দ্বন্দ্ব, বিরহ, অভিসার প্রভৃতি। সাময়িক সমাজের অবস্থা বুঝিবার সুবিধা অবশ্য দ্বিতীয় খণ্ডে। কিন্তু প্রথম খণ্ডটীও বাদ দেওয়া যায় না, তাহাতেও শিখিবার বিষয় অনেক আছে। আমরা প্রথম খণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল কথা আলোচনা করিব।

স্বর্গের নীলাম্বরের প্রতি কোনও বিশেষ কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেব তাঁহাকে অভিশাপ দেন যে, মর্ত্ত্যভূমে ব্যাধকুলে তাহার জন্ম হইবে। মহাদেবের শাপে ধর্ম্ম কেতুর গৃহে তাহার জন্ম হয়—নাম হইল কালকেতু। কালকেতু নিতান্ত দুধের ছেলে নয়—ব্যাধের ঘরে ব্যাধ হইয়াই সে জন্মাইয়াছে। তাহার বলিষ্ঠ গঠন, বিশাল বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু। কবিকঙ্কণ বর্ণনা করিয়াছেন,

"নাক মুখ চক্ষু কাণ কুন্দে যেন নিরমাণ,
দুই বাহু লোহার সাবল।"

শুধু ইহা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই—কালকেতুর প্রত্যেক অঙ্গের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মৃদুস্পর্শনে বীরভাব প্রকাশ করিতে তিনি পারেন নাই, কিন্তু মোটা মোটা বর্ণনা করিয়া একরকম বুঝাইয়াছেন। কালকেতুর শারীরিক বলই সম্বল, অসাধারণ হৃদয়ের বল তাহার চরিত্রে দেখা যায় না। আমাদের মুকুন্দরামও শরীরের কবি। তাঁহার ভাবময় বর্ণনা নহে—প্রচলিত নিয়মানুসারে তিনি বক্ষ বর্ণনা করিতে বসিলেই কপাটের সহিত তুলনা করেন, নেত্র বর্ণনা করিতে হইলেই আকর্ণ দীর্ঘ। কালকেতুর বর্ণনা আর একটু উদ্ধৃত করিয়া দি, পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন।

"কপাট বিশাল বুক, নিন্দি ইন্দীবর মুখ,
আকর্ণ দীঘল বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ,
মতি পাঁতি জিনিয়া দশন॥
দুই চক্ষু জিনি নাটা, ঘুরে যেন কড়ি-ভাঁটা,
কাণে শোভে ফটিক কুণ্ডল॥"

কালকেতুর বিক্রমও সাধারণ নহে। তাড়া দিয়া সে হরিণ ধরিতে পারে, ধনুক শরের আবশ্যক হয় না।

এমন পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যাধকে সুতরাং চিন্তিত হইতে হইয়াছিল—অনুরূপ কন্যা মিলে কোথায়? বিধাতা সদয় হইলেন, ফুল্লরা মিলিল। পুরোহিত সোমাই পণ্ডিতের সহিত ধর্ম্মকেতুর বিরলে একদিন অনেক কথাবার্ত্তা হয়—কথাবার্ত্তা আর কি, কালকেতুর বিবাহ। এ কথাবার্ত্তাগুলি কিন্তু পড়িয়া সুখ আছে—সব কেমন স্বাভাবিক। প্রাচীন বঙ্গের সামাজিক অবস্থা ইহাতে বেশ বুঝা যায়। তাহার পর কালকেতুর বিবাহ হইল। মুকুন্দরাম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবাহের অনুষ্ঠানগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, চোখে যাহা পড়িয়াছে—কিছুই বাদ যায় নাই।

বিবাহাদি করিয়া কালকেতু স্বগৃহে ফিরিল। ধর্ম্মকেতুর পুত্রবধূটীও মিলিয়াছে ভাল। ধর্ম্মকেতুর সুখের অন্ত নাই। নিদয়াও আনন্দিত হৃদয়। ফুল্লরা রাঁধে বাড়ে, শ্বশুর শাশুড়ীকে মন দিয়া খাওয়ায়, তাঁহাদের সেবার কোনও ত্রুটি হয় না। সংসারে এখন সব সুশৃঙ্খলা, গোলযোগ ঝঞ্ঝা নাই। সংসারে শান্তি ভোগ করিয়া অবশেষে নিদয়া সহিত ধর্ম্মকেতু বারাণসীধামে মুক্তিচিন্তা করিতে চলিয়া গেল। ফুল্লরাই গৃহের গৃহিণী হইল।

কালকেতু বনে বনে প্রতিদিন শীকার করিয়া বেড়ায়। হস্তীর শুণ্ড ধরিয়া সে আছাড় মারে, ব্যাঘ্রকে ফাঁদ পাতিয়া ধরে, মহিষকে তাড়া দিয়া ধরিয়া ফেলে। ফুল্লরা হাটে গিয়া গজদন্ত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মহিষশৃঙ্গ বিক্রয় করিয়া পয়সা আনে। এইরূপে দম্পতীর দিন কাটিয়া যায়। ফুল্লরার গৃহিণীপনায় কালকেতুর বিপুল উদর পরিপূর্ণ থাকে—সে চির প্রদীপ্ত জঠরানলও পরিতৃপ্ত হয়। গৃহিণী না হইলে কালকেতুর ক্ষুধা কি যে সে নিবারণ করিতে পারে? কবিকঙ্কণ বর্ণনা করিয়াছেন,

> "মুচড়িয়া গোঁপ দুটা বান্ধে নিয়া ঘাড়ে।
> একশ্বাসে সাত ঘড়া আমানি উজাড়ে॥
> চারি হাঁড়ি অন্ন বীর খায় ক্ষুদ জাউ।
> দালি খাইল ছয় হাঁড়ি মিশাইয়া লাউ॥
> ঝুড়ি দুই তিন খাইল আলু ওল পোড়া।
> বন পুঁই ভার দুই কলমী কাঁচড়া॥"

বীরের ছোটগ্রাস মুকুন্দরাম তাল সমান বলিয়াছেন। বড় গ্রাস বোধ করি ছোটখাট লোকে আঁকড়িয়া পায় না।

কালকেতুর সহিত অরণ্যের পশুদের একবার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। পশুরা তাহার তাড়নে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে চণ্ডীর শরণাপন্ন হইয়া তাহারা বাঁচিয়া যায়। চণ্ডী গোধিকাবেশে কালকেতুকে দর্শন দেন। মৃগয়ায় বিফল-মনোরথ হইয়া

কালকেতু সেই গোধিকাকে জাল দড়ি দিয়া বাঁধিয়া আনে। গৃহে আসিয়া ব্যাধ গোধিকাকে চুপড়ি চাপা দিয়া রাখিয়া দিল। গোধিকা কিয়ৎক্ষণ পরে নিজ যথার্থ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বাহির হইল।

কালকেতু গৃহে নাই, ফুল্লরা আসিয়া দেখে যে, তাহার গৃহে এক ষোড়শী রূপসী নীরবে বসিয়া আছে। রূপসীর লাবণ্য দেখিয়া ফুল্লরা অবাক হইয়া গিয়াছে—এমনতর সুন্দরী সে বুঝি জীবনে দেখে নাই। সুন্দরী আবার এত দেশ থাকিতে ফুল্লরার কুটীর দ্বারে বসিয়া। সুতরাং ব্যাধনিতম্বিনীর আরও আশ্চর্য্য ঠেকিতেছে। ফুল্লরা বিস্ময় পূর্ণ-হৃদয়ে সাহস করিয়া যুবতীর একাকিনী এরূপভাবে পরগৃহে অবস্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ফুল্লরা সন্দেহ করিতেছিল—কুলবধূ কেহ স্বামীর সহিত অথবা শ্বাশুড়ী ননদের সহিত ঝগড়া করিয়া রাগের মাথায় চলিয়া আসিয়াছে। সেই জন্য সে খুলিয়া বলিল, যদি এরূপ কিছু হইয়া থাকে, সুন্দরীর সঙ্গে গিয়া দুই পাঁচ কথা বুঝাইয়া বলিয়া তাঁহাদিগকে সে শান্ত করিয়া আসিবে।

ফুল্লরার সান্ত্বনায় চণ্ডীর মুখ ফুটিল। তিনি বাঁধা আইনানুসারে উগ্রপতি এবং সোহাগিনী সপত্নীর বিরুদ্ধে ফুল্লরা সমীপে এক নালিস রুজু করিলেন। বীরের জন্য তিনি যে সকল কষ্ট সহিতে পারেন, সে কথারও আভাস দিতে ভুলিলেন না। ফুল্লরার কিন্তু তাহাতে মন উঠিল না; সীতা সাবিত্রী বেদবতীর উদাহরণ সমেত একটা লম্বা রকম বক্তৃতা ঝাড়িয়া বুঝাইল, ভালয় ভালয় দিন থাকিতে স্বামী গৃহে প্রতিগমন করাই কর্ত্তব্য। চণ্ডী ঘাড় নাড়িলেন—ফুল্লরার কুটীর হইতে সহজে তিনি নড়িতে সম্মত নহেন।

ফুল্লরা মহা বিপদে পড়িল—এ ষোড়শী রূপসীটাকে কিছুতেই যে বিদায় করা যায় না। ফুল্লরা বার মাসের দুঃখ গাহিল। কিন্তু গাহিলে হইবে কি? চণ্ডী নড়িবার কথা ভুলিয়াও বলেন না—তাঁহার ধনে এবার অবধি ফুল্লরার অংশ রহিল বলিয়া ভরসা দিলেন। ফুল্লরা বেগতিক দেখিয়া স্বামীর নিকটে দৌড়িয়া গিয়া বলিল যে, কাহার ষোড়শী কন্যা ঘরে আনিয়া তিনি মরিবার উপায় করিতেছেন। কালকেতু শুনিয়াই অবাক। ফুল্লরাকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিল, মিথ্যা হইলে নাসিকা শূর্পণখার অবস্থা প্রাপ্ত হইবে বুঝিয়া যেন সত্য বলা হয়। ফুল্লরা কালকেতুকে লইয়া আসিয়া দেখাইল। কালকেতু ভাবিল, তাইত এ ব্যক্তি এখানে কে?

কালকেতু রূপসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, ফুল্লরা সমেত গিয়া তাঁহাকে আত্মীয় স্বজনের নিকট পৌছাইয়া দিয়া আসিতে চাহিল। অনেক পীড়াপীড়িতে চণ্ডী মহিষমর্দ্দিনীরূপ ধারণ করিলেন। তখন কালকেতু ভয়ে মূর্চ্ছা যায়। চণ্ডী অভয় প্রদান করিলেন, এবং কালকেতুকে অনেক ধনরত্নের অধিকারী করিয়া দিলেন। সেই অবধি ব্যাধনন্দনের কপাল খুলিয়া গেল।

চণ্ডীর অনুগ্রহে কালকেতু গুজরাট দেশে এক নূতন নগর নির্ম্মাণ করিল। বীরের নগরে অনেক হিন্দু মুসলমান প্রজা আসিয়া জুটিল। মুসলমানেরা সহরের পশ্চিমভাগে বাস করিবার অনুমতি পাইল। মুকুন্দরাম মুসলমান পাড়ার এক দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাটী হইয়াছে ভাল। তাহা পড়িতে মজা লাগে। মোটা মোটা মুসলমানী কথায় তাহার মধ্যে যেন একটা হাস্য তরঙ্গ উথলিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ হইলেও আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কলিঙ্গ নগর ছাড়ি,　　প্রজা লয় ঘর বাড়ী,
নানা জাতি বীরের নগরে।
বীরের লইয়া পাণ　　বৈসে যত মুসলমান,
পশ্চিম দিক বীর দেয় তারে।
আইসে চড়িয়া তাজি　　সৈয়দ মোল্লা কাজি,
খয়রাতে বীর দেয় বাড়ী।
পুরের পশ্চিম পটী　　বসাইল হাষণহাটী
এক মুদনী গৃহ বাড়ী।
ফজর সময়ে উঠি,　　বিছায়া লোহিত পাটী,
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছিলিমিলি মালা ধরে,　　জপে পীর পগম্বরে,
পীরের মোকামে দেয় সাঁজ।
দশ বিশ বেরাদরে　　বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কিতাব কোরাণ।
বেসাইয়া কেহ হাটে　　পীরের শীরিনি বাঁটে,
সাঁঝে বাজে দগড় নিসান।
বড়ই দানিসবন্দ,　　কাহাকে না কয়ে ছন্দ,
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বোজ বেশ,　　মাথে নাহি রাখে কেশ,
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।
না ছাড়ে আপন পথে,　　দশ রেখা টুপি মাথে,
ইজার পরয়ে দৃঢ় নাড়ি।
যার দেখে খালি মাথা,　　তা সনে না কহে কথা,
সারিয়া ঢেলার মারে বাড়ি।
আপন টবর লৈয়া　　বসিলা গাঁয়ের মিয়া,
ভুঞ্জিয়াত গায়ে মুছে হাত।

স্থর লোহানি পানী, কুড়ানি বটুনি হুনি,
পাঠান বসিল নানা মত।
বসিল অনেক মিয়া আপন তরফ লৈয়া,
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পড়ায়া নিকা দান পায় সিকা সিকা,
দোয়া করে কলমা পড়িয়া।
করে ধরি খর ছুরী, কুকুড়া জবাই করি,
দশগণ্ডা দরে পায় কড়ি।
বকরি জবাই যথা, মোল্লারে দেয় মাথা,
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি।
যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তবখান
মখদম পড়ায় পঠনা।”

মুকুন্দরাম ব্রাহ্মণ পাড়ারও বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা আরও দীর্ঘ। বেদজ্ঞ পণ্ডিত হইতে মূর্খ বিপ্র পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার বর্ণনার হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। তাহার পর ক্রমে ক্রমে কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতিরও বর্ণনা হইয়াছে। কবিত্বরস এ সকল বর্ণনায় লোকে বড় নাকি আশা করে না, তাই এগুলি পড়িতে মন্দ নয়। নহিলে স্বভাবের সৌন্দর্য্য কিম্বা হৃদয়ের গভীর ভাব বর্ণনা করিতে মুকুন্দরাম আদবেই পারেন না। তিনি কাঠাম গড়িতে পারেন, কিন্তু কাঠামায় প্রাণ সঞ্চার করিতে পারেন না। সাধারণ ভাব কথাবার্ত্তা যেমন তেমনি তিনি বেশ বর্ণনা করেন বটে।

যাহা হৌক, কালকেতুর অদৃষ্টে নিরাপদে রাজ্যভোগ অধিক দিন ঘটিল না। ভাঁড়ু দত্তের ধূর্ত্ততায় কলিঙ্গরাজের সহিত কালুর যুদ্ধ হইল। জয়লক্ষ্মী কলিঙ্গরাজের দিকেই ঢলিয়া পড়িলেন। কালকেতু কারাগারে বন্দী; সে স্বাধীনতা নাই, সে রাজ্য-সুখ নাই, কালকেতুর লক্ষ্মী বুঝি চঞ্চলা হইয়াছেন। চণ্ডীর অনুগ্রহে কালুর অদৃষ্ট আবার ফিরিল। কলিঙ্গাধিপতি সসম্মানে কালকেতুকে পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। গুজরাটের রাজা হইয়া কালকেতু ভাঁড়ুদত্তকে মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দিয়া যথেষ্ট অপমানিত করিলেন। তাহার পর কিছু দিন অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য-সুখ ভোগ করিয়া পুত্র পুষ্পকেতুর করে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন, এবং ব্যাধ জন্ম হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নীলাম্বর স্বর্গধামে উপনীত হইলেন।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পূর্ব্বভাগ এইখানেই সমাপ্ত হইল। উত্তর ভাগের সহিত এখণ্ডের বিশেষ কিছু যোগ নাই। সে উপাখ্যান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড়ু দত্তের তাহাতে নাম গন্ধও নাই। তবে গ্রন্থের প্রায় শেষে চণ্ডী কালকেতুর উদ্ধারের কথা একবার বলিয়াছেন বুঝি। পূর্ব্ব খণ্ডের পাত্র-পাত্রী উত্তরখণ্ডে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই

ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। চণ্ডীর প্রভাব দেখান বোধ করি গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, সেই জন্য দুইটী বিভিন্ন উপাখ্যান রচনা করিয়া কেবলমাত্র চণ্ডীর অনুগ্রহ-সূত্রে দুইটীকে একত্র গাঁথিয়া দিয়াছেন। সংসারের সকল সুখ দুঃখের মধ্যেই চণ্ডীর মঙ্গল হস্ত বিদ্যমান—তাঁহার অনুগ্রহ বিনা এখানে কোনও কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না।

কবিকঙ্কণের লেখায় বরাবর কেমন একটী ধর্ম্মের সুর আছে। লেখা পড়িলেই মনে হয় ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। মুকুন্দরাম জীবনে দুঃখ কষ্ট সহিয়াছেন অনেক, আর এই সকল দুঃখ কষ্টের মধ্যে তিনি যেন মায়ের স্নেহ অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার লেখার ধরণ কতকটা পৌরাণিক—অসম্ভব রকম বর্ণনা করিয়া একটা গম্ভীর মূর্ত্তি খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বুঝা যায়। জম্‌কালো মূর্ত্তি আঁকিবার তাঁহার যতটা চেষ্টা ছিল, গম্ভীর প্রশান্ত হৃদয় গঠন করিবার তেমন ঝোঁক ছিল না। কালকেতু উপাখ্যান খণ্ডেই কি, আর ধনপতি সদাগর কথায়ই বা কি—তাঁহার একটী চরিত্রও গম্ভীর হয় নাই। স্বয়ং চণ্ডীই গম্ভীর নহেন।

যাহাই হোক্, সাধারণ চরিত্র-চিত্রণে তাঁহার ক্ষমতার নিতান্ত অভাব দেখা যায় না। কালকেতু, ভাঁড়ুদত্ত প্রভৃতির চিত্র বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে। ধনপতি সদাগর, খুল্লনা, লহনা, দুর্ব্বলা প্রভৃতির চরিত্রও অস্বাভাবিক হয় নাই। কিন্তু থাক, এ সকল চরিত্র সম্বন্ধে এখন কিছু না বলাই ভাল। ধনপতি উপাখ্যান আলোচনার সময় দেখা যাইবে।

ফুল্লরার বারমাস্যা বঙ্গদেশে খুব বিখ্যাত। অনেকে কবিকঙ্কণের কবিত্বের নমুনা স্বরূপ বারমাস্যা হইতে দু'এক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখান। বারমাস্যায় ফুল্লরা দুঃখ করিতেছে, আষাঢ় মাসে নিত্য ঘর পড়ে, শ্রাবণ মাসে ভগ্ন কুটীরে জল পড়িতে থাকে—গায়ে আচ্ছাদন নাই, ভাদ্র মাসে দুরন্ত বাদলে কিরাতের উপার্জ্জন করিবার তেমন সুবিধা নাই, আশ্বিনে সকলে উত্তম বসন পরিধান করে—ফুল্লরার তখন উদর চিন্তা, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ফুল্লরার বার মাসের দুঃখে কবিত্ব কোথায়ও ত দেখা যায় না। ফুল্লরার দুঃখ যদি কবিত্ব-রসসিক্ত হয়, তাহা হইলে দুয়ারে দুয়ারে দুইবেলা যে সকল অভাগিনীরা একমুষ্টি অন্নের জন্য কাঁদিয়া বেড়ায়, তাহাদের কথাই বা কবিত্ব নহে কেন? ফুল্লরা আপনার দুঃখগুলি আওড়াইয়া গিয়াছে মাত্র, এমন করিয়া কিছু বলে নাই যাহাতে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় ভাবে একেবারে গলিয়া যায়। তবে দুঃখের কথা শুনিলেই লোকের দয়াবৃত্তি উত্তেজিত হয়। ফুল্লরার দুঃখ দেখিয়া আমাদের সাহায্য করিতে ইচ্ছা করে বটে। বারমাস্যা অতি দীর্ঘ না হইলে পাঠকদের দেখিবার জন্য আমরা উঠাইয়া দিতাম—ফুল্লরার বারমাস্যায় কবিত্ব আছে কি না তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন। কান্না মাত্রই কবিত্ব হইলে এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য ছিল না, কিন্তু তাহা ত আর নয়, কবিত্ব স্বতন্ত্র জিনিস।

কালকেতু প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আর অধিক কথা না বলিয়া এইবারে আমরা ধনপতি

সদাগরের গৃহে দৃষ্টিপাত করি। ইন্দ্রাণী নীলাম্বরকে পাইয়া সুখী হইয়াছেন, সমালোচনা করিয়া তাঁহার সুখের মধ্যে আমরা একটা ভয় রাখিয়া দি কেন? আমাদের ধনপতি ত জুটিয়াছেন।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর দ্বিতীয় খণ্ড—ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। পূর্ব্ব খণ্ডের উপাখ্যান অপেক্ষা এ উপাখ্যানটী মনোরম বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালীর ঘরের ব্যাপার ইহাতে বেশ চিত্রিত হইয়াছে, আলোচনা করিবার মত চরিত্রও আছে। তবে চরিত্র গুলিতে সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু বিশেষ প্রভাব। বিশেষতঃ খুল্লনার জীবনের দু'একটী ঘটনায়। মৃত স্বামী ক্রোড়ে লইয়া খুল্লনা যখন ক্রন্দন করিতেছে এবং হৃদয়ের কাতরতা দেখিয়া চণ্ডী ধনপতিকে বাঁচাইয়া দিলেন, তখন মহাভারতের কথা কাহার না মনে পড়ে? তদ্ভিন্ন স্বর্গচ্যুতদিগের মর্ত্ত্যবাস, স্বর্গগমন প্রভৃতি ঘটনায়ও পুরাণের অল্পবিস্তর অনুচিকীর্ষা প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। মুকুন্দরামের নিজত্ব যথেষ্ট আছে, তাঁহার চরিত্রগুলি বাঙ্গালী বটে।

স্বর্গের নর্ত্তকী রত্নমালা তালভঙ্গ অপরাধে মর্ত্ত্যে আসিয়া খুল্লনারূপে জন্মগ্রহণ করে। ঘটনাচক্রে খুল্লনার সহিত ধনপতি সদাগরের বিবাহ হয়। ধনপতির অনুপস্থিতিতে দাসী দুর্ব্বলার পরামর্শে জ্যেষ্ঠা সপত্নী লহনার নিকট খুল্লনা অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে। ধনপতি গৃহে আসিয়া লহনার অত্যাচার সকলই জানিতে পারেন, লহনাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনাও করেন। তাহার পর বিশেষ কারণে অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় খুল্লনাকে ছাড়িয়া তাঁহাকে সিংহলে যাইতে হয়। অদৃষ্ট দোষে সেখানে তাঁহার কপালে কারাগার জুটে। অবশেষে বহুদিন পরে চণ্ডীর কৃপায় খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত গিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া এবং রাজকন্যা সুশীলাকে বিবাহ করিয়া আনে। দেশে আসিয়া আবার জয়াবতীর সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ হইল। কিয়দ্দিবস পরে খুল্লনা স্বর্গে চলিয়া গেল।

সংক্ষেপে ধনপতি-উপাখ্যানের কাঠাম এই। কিন্তু ইহার মধ্যে কথোপকথন, মান অভিমান, জাল পত্র, দ্বন্দ্ব কোলাহল, শিক্ষা দীক্ষা অনেক বিষয় অবশ্য আছে। তাহা না থাকিলে গ্রন্থ লোকে পড়িবে কেন? খুল্লনার সহিত ধনপতির বিবাহ হইল। সকলে বলিল, খুল্লনার বর মিলিয়াছে ভাল। যুবতীরা অনেকে স্বাভাবিক ঔদার্য্যগুণে এবং পরশ্রীতে অনাসক্তি হেতু অকাতরে অনুপস্থিত স্বামীবর্গের সবিশেষণ রূপ গুণের বর্ণনা করিয়া লইলেন। দিনকতকের জন্য পাড়া জমিল—গল্পের বিষয় কাহাকেও ভাবিতে হয় না, সাথী খুঁজিতে হয় না, সব কূলে কূলে পরিপূর্ণ।

লহনার একটু অভিমান হইল। শাস্ত্রে কি চতুষ্পাঠীতে দুই বিবাহের ব্যবস্থা আছে বলিয়া স্ত্রী কি স্বামীর হৃদয় খানিকটা ছাড়িতে পারে? ধনপতি বুঝাইতে বাকি রাখিলেন না। লহনাও জবাব দিলেন। ধনপতি লহনার যথাসাধ্য মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করিলেন। লহনা ঘাড় নাড়ে। ধনপতির উপর রাগের ঝালটা পড়িবে খুল্লনার পৃষ্ঠে।

এদিকে গৌড়াধিপতির শুকপক্ষীর স্বর্ণপিঞ্জর নির্ম্মাণের জন্য সদাগরের ডাক পড়িল। লহনার হস্তে খুল্লনাকে সমর্পণ করিয়া ধনপতি গৌড়ে চলিলেন। দিনকতকের জন্য সতীনে সতীনে বনিল ভাল। কিন্তু চিরদিন কি এ মিল থাকে? বিধাতা সপত্নীকে সহজশত্রু করিয়া গড়িয়াছেন, মানুষে কি করিবে? ধনপতি সদাগরের গৃহে আবার দাসী আছে। যে গৃহে পরিচারিকা আছে, সেখানে সপত্নী না থাকিলেও দ্বন্দ্বের কখনও অসদ্ভাব হয় না। সেখানে প্রত্যেক ধূলিকণায় জীবন্ত নিঃস্বার্থ নিন্দা-কীটাণুর মত বিচরণ করিতেছে, সুতরাং সেখানে চির-মনান্তর। ধনপতির গৃহে দুর্ব্বলার বলে দুই সতীনের মধ্যে অল্পদিনেই বেশ বাধিয়া গেল। এতদিনে ধনপতির গৃহে লক্ষ্মীশ্রী হইল।

দুর্ব্বলা বলিল, লহনা ঠাকুরাণী ত বুঝেন না—দুধ কলা দিয়া সাপ পুষিতেছেন। তা' দাসী বাঁদীর কিছু বলা ভাল দেখায় না, যোদ্দা এই বেলা দিন থাকিতে উপায় করা ভাল। লহনার মনের কোণে দুর্ব্বলার কথা ঠাঁই পাইল। লীলাবতীর ডাক পড়িল, অনেক রকম মন্ত্র তন্ত্র ঔষধের ব্যবস্থা হইল, ধনপতির নামে একটা জাল-সাক্ষর পত্রও বাহির হইল—তাহাতে অবশ্য খুল্লনাকে নিরাভরণা করিয়া ছাগরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিবার আদেশ আছে। খুল্লনা নিতান্ত বোকা মেয়ে নয়; লহনাকে সে চাপিয়া ধরিল, এত প্রভুর অক্ষর নহে—দিদির সব উপহাস। লহনাও বুঝাইল যে, পত্র ধনপতিরই বটে। খুল্লনা পত্রবাহককে দেখিতে চাহিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে জমিয়া গেল—দন্তযুদ্ধ দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিণত হইল। তখন পাড়া প্রতিবাসীর কাহারও জানিতে কিছু বাকি রহিল না। ব্যাখ্যা টীকারও সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ধনপতি সদাগর! তুমিই ধন্য।

খুল্লনা ছাগল চরাইয়া বেড়ায়। যথা সময়ে বসন্ত আসিল। মুকুন্দরাম খুল্লনার মুখে এক খেদ গুঁজিয়া দিলেন। সুতরাং খুল্লনা তাহা ভালরূপ হজম করিতে পারে নাই। দুর্ব্বলা খুল্লনার কষ্টের কথা তাহার পিত্রালয়ে গিয়া সুবিধামত গল্প করিয়া আসিয়াছে। রম্ভাবতী কাঁদিতেছেন। চণ্ডী খুল্লনাকে রম্ভাবতী বেশে একদিন ছলনা করিলেন। তাহার পর খুল্লনার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া লহনাকে স্বপ্নাদেশ করেন। স্বপ্নাদেশের পর খুল্লনার একটু আদর যত্ন বাড়িল।

সাধুকেও স্বপ্নাদেশ হইল। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাজ সারিয়া ধনপতি তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিলেন। ধনপতি এক ভোজ খাইলেন, খুল্লনার উপর রন্ধনের ভার পড়িল। দুর্ব্বলা হাট হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিল। মুকুন্দরাম তাহার এক নিখুঁৎ হিসাব দিয়াছেন; হাট বাজারে মুকুন্দকে কেহ ঠকাইতে পারে না। ক্রমে ক্রমে জাল পত্র ইত্যাদি বাহির হইল। ভোজ-পরিতৃপ্ত সাধু লহনাকে ভৎর্সনা করিলেন।

একদিন সাধুর বাড়ীতে কুটুম্ব ভোজন হইল। খুল্লনা এতদিন বনে বনে হেথা সেথা

ছাগল চরাইয়া বেড়াইয়াছে, এই জন্য সে যদি পরীক্ষা দেয় তবে সকলে সাধুর আলয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন, নচেৎ নয়। অগত্যা খুল্লনাকে পরীক্ষা দিতে হইল। জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া খুল্লনা তাহার মধ্যে রহিল। অগ্নিসংযোগে গৃহ পুড়িয়া গেল, চণ্ডীর অনুগ্রহে খুল্লনা বাঁচিল। নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য হইল।

কবিকঙ্কণের এইখানকার বর্ণনাগুলি পড়িলে বঙ্গসমাজের দলাদলির অবস্থা বেশ বুঝা যায়। লোকের ছিদ্র পাইলে বাঙ্গালী জাতি যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, এমন আর কোনও জাতি নহে। খুল্লনাকে পঞ্চাশবার পরীক্ষা দিতে হইয়াছে—জলে, স্থলে, অগ্নিতে কিছুতেই আর বাকি নাই। আত্মীয় স্বজনেরা খুল্লনাকে সভামধ্যে পরীক্ষা করিয়া করিয়া মজা দেখিবার জন্য ব্যস্ত; পরীক্ষায় চরিত্র নির্ম্মল প্রমাণ হইলে তাঁহাদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। কুলবধূকে কুলকলঙ্ক প্রমাণ করিতে পারিলে আনন্দের সীমা নাই—মহৎ কার্য্য করিয়া লোকে হৃদয়ে যে তৃপ্তি অনুভব করে, ইহার নিকটে তাহা কিছুই নহে। রামচন্দ্রের প্রজারা অগ্নিপরীক্ষার পর সতীকে সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়া দুঃখিত হইয়াছিল। ধনপতির বুদ্ধিদৃপ্ত বাঙ্গালী আত্মীয়েরা খুল্লনাকে দুশ্চরিত্রা প্রমাণ করিতে পারিল না বলিয়া দুঃখিত হইল।

তাহার পর ধীরে ধীরে কিছু দিন কাটিয়া গেল। নৃপতির আদেশে গর্ভবতী খুল্লনাকে ছাড়িয়া চন্দনের জন্য সদাগরকে পুনরায় সিংহলে যাইতে হইবে। খুল্লনার বড়ই দুঃখ, ধনপতিরও সুখ নাই, কিন্তু কি করিবেন—রাজাজ্ঞা পালন না করিলে নয়। ধনপতি পোতাদি সজ্জিত করিতে বলিলেন। খুল্লনা স্বামীর মঙ্গল কামনায় প্রতিদিন চণ্ডী পূজা করে। লহনার কূটমন্ত্রে ভুলিয়া ধনপতি একদিন পূজার সময় খুল্লনা সুন্দরীকে চুল ধরিয়া টানিয়া অপমান করিলেন—পূজার ঘটবারি প্রভৃতি লঙ্ঘন করিতে সাধুর কিছু মাত্র দ্বিধা উপস্থিত হইল না। আর স্ত্রীর গায়ে হাত তুলিতে বীর বঙ্গসন্তানের দ্বিধা ত কোন কালেই বড় উপস্থিত হয় না। স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন বাঙ্গলা দেশে স্ত্রৈণের লক্ষণ। খুল্লনা ত অপমান সহিল। চণ্ডী কিন্তু তাহা সহিতে পারিলেন না, সদাগরকে নাকের জলে চোখের জলে করিবেন স্থির করিলেন। মগরার নিকট সদাগরের ছয়খানা পোত ডুবিয়া গেল।

ঝড় বৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইয়া অবশিষ্ট একখানি জাহাজ লইয়াই ধনপতি চলিলেন। মুকুন্দরাম উদার সিন্ধুর বিশেষ বর্ণনা করিতে পারেন নাই, অনেকগুলি জায়গার নাম করিয়াছেন মাত্র। কবি হইলে সিন্ধুর ভাবে তাঁহার কল্পনা উদ্দীপিত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু মুকুন্দরাম ভূগোল জ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট আছেন।

ধনপতি পথে কমলেকামিনী দর্শন করিলেন। সিংহলের রাজসভায় সে কথা বলিতে ভুলিলেন না। কিন্তু রাজা যখন ধনপতির সহিত কমলেকামিনী দেখিতে গেলেন, কিছুই দেখা গেল না। ফল হইল, ধনপতির কারাবাস। ধনপতি এখনও

চণ্ডীকে ডাকেন না—স্ত্রী-দেবতা পূজা করিতে তিনি বড়ই নারাজ। আর ঘরে তাঁহার যে চণ্ডী আছেন, চণ্ডীকে ডাকিতে ভাল লাগিবে কেন?

এদিকে খুল্লনার সাধভক্ষণ। লহনা জ্যেষ্ঠা, সপত্নী হইলেও খুল্লনার এ সময়ে দেখিতে হইবে। খুল্লনাকে কি খাইতে ভাল লাগে না লাগে জিজ্ঞাসা করিতে খুল্লনা বলিল,

"আপনার মত পাই, তবে গ্রাস চারি খাই
পোড়া মাছে জামীরের রস।
উদরে পরম ব্যথা, শুন দিদি দুঃখ কথা,
ওদন ব্যঞ্জন নিমবারি।
যদি পাই মিঠা ঘোল, বদলী-শকুল ঝোল,
তবে খাই গ্রাস পাঁচ চারি।
লতা পাতা বন শাক, খর জ্বালে করি পাক,
সন্তলিবে যোয়ানী ফোড়ন দিয়া।
সন্তাল লবণ তথি দিবে হিং জীরা মেথি,
বহিন গণি যদি কর দয়া।
নিধান করিয়া খই, তাহাতে মহিষা দই,
আমড়া সংযোগে রাঙ্গা শাক।
যদি পাই কিছু পুপ, আমে মসুরীর সুপ,
আমশীতে প্রাণ পাই, রাখ।
আমি যেন পাই সোণা শকুল মাছের পোনা,
পোড়া কাসুন্দি দিয়া তথি।
হরিদ্রা রঞ্জিন কাঞ্জী, উদর পূরিয়া ভুঞ্জি,
বন শাকে বড়ই পিরীতি।"

ক্ষুধা তৃষ্ণা দিন দশ না থাকাতে খুল্লনার এই কয়টী জিনিস খাইতে সাধ হইয়াছে। সুতরাং দুর্ব্বলা চুপড়ি হস্তে পাড়ার বাড়ী বাড়ী শাক তুলিতে বাহির হইল। মুকুন্দরাম শাকের এক লম্বা ফর্দ্দ দিয়াছেন; সে ফর্দ্দ মুখস্থ করিয়া রাখিতে পারিলে গৃহিণীপনার অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। ফর্দ্দানুযায়ী পঞ্চাশ রকম ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। খুল্লনা সাধ ভক্ষণ করিল।

সাধ ভক্ষণের পর যথারীতি শ্রীমন্তের জন্ম হইল। শ্রীমন্ত রূপে গুণে অদ্বিতীয়। বিদ্যাটাও হইল বড় মন্দ নয়। গুরুর সহিত ঝগড়াটাও হইয়াছিল ভাল। আইনানুযায়ী অভিমান পালা সাঙ্গ করিয়া শ্রীমন্ত ধনপতির উদ্দেশে সিংহল যাত্রা করিল। খুল্লনার নিষেধ বড় টিঁকিল না। সিংহল যাত্রার বর্ণনা করিবার কিছুই নাই। মুকুন্দ-

রাম পূর্ব্ববৎ দেশের নাম আওড়াইয়াছেন। শ্রীমন্ত কমলেকামিনী দর্শন করিল, রাজসভায় সে গল্প বলিল, ধনপতির মত সকল অবস্থাই ঘটিল। শ্রীমন্তকে মশানে পর্য্যন্ত লইয়া গেল। তবে চণ্ডী নাকি সহায় আছেন, তাই ছিরা বাঁচিয়া গেল। শুধু বাঁচিয়া যাওয়া নয়, সুশীলার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ হইল। ধনপতি সসম্মানে কারামুক্ত হইলেন।

চণ্ডী খুল্লনাবেশে একদিন শ্রীমন্তকে স্বপ্ন দিলেন। শ্রীমন্ত কাঁদিয়া উঠিল। সুশীলার প্রবোধ-বাক্যেও শ্রীমন্তের মন বুঝিল না। অবশেষে ধনপতি, সুশীলা, শ্রীমন্ত সাধুর আলয়ে চলিলেন। মগরায় নষ্ট ধন সম্পত্তির পুনরুদ্ধার হইল। সাধু স্বদেশে আসিয়া পঁহুছিলেন। বিক্রমকেশরীর নিকট কমলেকামিনীর কথা হইল। শ্রীমন্তের মশানবাসও হইল। চণ্ডীর কৃপায় এ যাত্রাও কোনও অনিষ্ট ঘটিল না। বিক্রম কেশরী শ্রীমন্তের করে জয়াবতীকে সমর্পণ করিলেন। সুশীলার অভিমান হইল। এখন এ দুই সতীনে কীলাকীলি আরম্ভ হইলেই জমিয়া যায়।

কিন্তু ততদূর কিছু ঘটিল না। খুল্লনা পুত্র পুত্রবধূ সমেত স্বর্গে চলিলেন। শ্রীমন্ত স্বর্গের মালাধর ছিলেন—শাপে মর্ত্ত্যে জন্ম হয়। এখন সকলেই শাপমুক্ত। এইবারে আমরাও মুক্ত হইব। ধনপতি সদাগর কাঁদিতে লাগিলেন। চণ্ডী লহনার গর্ভে সুপুত্র জন্মিবে বলিয়া ধনপতিকে বুঝাইলেন। ধনপতির বুঝিতে বেশীক্ষণ গেল না।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর গল্প সম্বন্ধে এতদূর যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা বোধ হয় যথেষ্ট। ইহাপেক্ষা অধিক বলিতে গেলে সমস্ত গ্রন্থটী অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া দিতে হয়। এইবারে সংক্ষেপে তাহার প্রধান চরিত্রগুলি একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক্—ধনপতি, শ্রীমন্ত, লহনা, খুল্লনা, দুর্ব্বলা। সুশীলা, জয়াবতীকে গ্রন্থকার অন্তঃপুর হইতে বড় বাহির করেন নাই, বিবাহ রজনীতে এবং অন্য দু'এক দিন মাত্র দেখিয়া ইহাঁদের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা চলে না।

ধনপতি সদাগর জাতিতে গন্ধবণিক। ব্যবসা বাণিজ্যে তিনি যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছেন। সাধারণতঃ ধনী বণিক্ সন্তানেরা যেরূপ হইয়া থাকে, তিনি তাহাই ছিলেন। অসাধারণ মহত্ত্ব অথবা বিশেষ কোনও কাজ করিবার দিকে লক্ষ্য তাঁহার ছিল না। ঘর সংসারই তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব। তাহার নিকট স্বর্গও বোধ হয় তুচ্ছ। তদানীন্তন সমাজের প্রথা যেরূপ ছিল, ধনপতি তাহার সহিত ঠিক মিলিয়াছিলেন। আত্ম সুখের জন্য তিনি দুই বিবাহ করেন। ভাবের দিক দিয়াও তিনি যান না। তবে, লহনার সন্তানাদি ছিল না বলিয়া তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহের পক্ষে দুই চারি কথা অবশ্য বলা যায়। আর ইহাও বলিতে হয় যে, খুল্লনার রূপে মুগ্ধ না হইলে তাঁহার আবার বিবাহ হইত কি না সন্দেহ। বর্ত্তমানবিদ্রূপীরা উপহাস রসিকতায় প্রাচীন কালকে যাহাই প্রতিপন্ন করুন না কেন, রূপের আকর্ষণ তখন যে যথেষ্ট ছিল, তাহাতে সন্দেহ

নাই। আমাদের ধনপতি সদাগর সে সময়ের একজন সাধারণ বাঙ্গালী। আদর্শ সৃষ্টি করিবার মত কল্পনা কবিকঙ্কণের ছিল না, তিনি সেরূপ চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহার ধনপতি প্রতিদিন ঘরে ঘরে দেখা যায়। রাগ হইল, স্ত্রীকে দুই ঘা বসাইয়া দিয়া ধনপতি স্থির হইলেন। তাঁহার কাপুরুষত্বও মনে হয় না, স্ত্রীকে সম্মান প্রদর্শন বলিলে অবাক্ হইয়া থাকেন মাত্র। সমাজ যন্ত্রে প্রতিদিন যে সকল জীব বাহির হইতেছে, ধনপতি তাহাদের হইতে স্বতন্ত্র নহেন।

শ্রীমন্তের ভাবও পিতার মত। স্বর্গ হইতে আসিয়াছে বলিয়া তাহার নবীনত্ব কিছু নাই। কবিকঙ্কণের স্বর্গের ভাব যে তেমন উন্নত তাহাও নহে। স্বর্গ পার্থিব সুখময় একটা স্বতন্ত্র দেশ মাত্র। শ্রীমন্ত সেই দেশের অধিবাসী। সুশীলাকে বিবাহ করিয়াই জয়াবতীর পাণিগ্রহণ করিতে শ্রীমন্তের বিশেষ সঙ্কোচ বোধ হইল না। বিবাহের পবিত্র উচ্চ আদর্শ ছিরার মনে কোনও কালে জাগিয়াছে কি না সন্দেহ। শ্রীমন্ত একীকরণ, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে মিলন, এ সকলের বড় ধার ধারে না। হয়ত যাহার অর্থই বুঝে না এমনতর কতকগুলা বড় বড় কথা উচ্চারণ করিয়া তাহাকে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। স্ত্রী সেবা করিতেই আছে। সুতরাং পঞ্চাশটা বিবাহ করিলে চব্বিশ ঘণ্টা পাখার বাতাস খাইবার সুবিধা। জঠরানলবিহীনা স্ত্রী মিলিলে খরচের হিসাবে আরও ভাল। শ্রীমন্ত, বোধ হয়, এই ভাবের অধিক ঊর্দ্ধে উঠে নাই।

ধনপতি ও শ্রীমন্তের চরিত্রে কবিকঙ্কণের সৃষ্টি-কল্পনার অভাব বেশ বুঝা যায়। অদ্ভুতরকম কল্পনা বাঙ্গালী জাতির চিরকালই আসে, তাহার কথা অবশ্য বলিতেছি না। কবিকঙ্কণে যে কল্পনার অভাব, তাহা উন্নত, মহান্, গম্ভীর কল্পনা। লাগাম ছাড়া কল্পনা আলস্যের চিরসহচর। আমাদের তাহার অভাব হইতেই পারে না। কবিকঙ্কণ যে তেমন কবি ছিলেন তাহাও নহে। লেখক তিনি একজন বটে।

কিন্তু খুল্লনা লহনার কথা আলোচনা না করিয়া সম্মানার্হ প্রাচীন কবির সৃষ্টি কল্পনার অভাব বলাটা কি ভাল দেখায়? ভাল অবশ্য দেখায় না, কিন্তু সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা বোধ হয় হয় না। লহনাকে কবি নিজেই বড় ভাল চক্ষে দেখেন নাই। চণ্ডীর প্রিয়পাত্রী খুল্লনাই তাঁহার প্রিয়। কিন্তু প্রিয় হইলেও খুল্লনা অসাধারণ গুণবতী নহে। লহনার সহিত দ্বন্দ্বে আঁটিয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই খুল্লনাকে আমাদের মায়া করে। খুল্লনাকে কবি সীতা সাবিত্রীর মত করিবার কতকটা প্রয়াস পাইয়াছেন—অগ্নি-পরীক্ষা, মৃতস্বামী ক্রোড়ে ক্রন্দন দেখিলেই বুঝা যায়। খুল্লনাতে সে পাতিব্রত্যতেজের মোদ্দা তেমন বিকাশ হয় নাই। রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া খুল্লনা যেন অভিনয় করিয়াছে। খুল্লনা স্ত্রীমাত্রেই সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে সেইরূপই, তবে মুকুন্দরাম রামায়ণ মহাভারতের ছায়া দিয়া তাহার চারিদিকে একটা সৌন্দর্য্য ফুটাইবার চেষ্টা

করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র, যে কারণেই হৌক, সংস্কৃত মহাকাব্যের চরিত্রগুলির মত ফুটে নাই। সে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি, স্বতঃ উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্য এখানে কোথায়? তবে খুল্লনার কুলবধূ ভাবটী রক্ষিত হইয়াছে স্বীকার্য্য। লহনারও সে ভাব আছে। খুল্লনাপেক্ষা কিন্তু লহনা ধূর্ত্তা, কঠিনা।

ভাবের চরিত্র কবিকঙ্কণে নাই। সংসারের দৈনন্দিন খুঁটিনাটীর মধ্যেই মুকুন্দরামের অবস্থিতি। দুর্ব্বলা দাসী হাট বাজার করে, কবিকঙ্কণ তাহার নিখুঁৎ হিসাব প্রস্তুত করেন। দুর্ব্বলা তাঁহার সকল কার্য্যে দক্ষা। সে চোরকে চুরীর পরামর্শ দিয়া গৃহস্থকে সাবধান করিয়া দেয়। দুই সতীনে ঝগড়া লাগাইয়া দিয়া সে তামাসা দেখে। মন্থরার মত উচ্চ শ্রেণীর হৃদয় তাহার নহে। পাঠকেরা মন্থরার সুখ্যাতি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন; কিন্তু বাস্তবিক আমরা যতটা মনে করি—মন্থরা ততহীনপ্রকৃতি নহে। ভরতের মঙ্গল কামনা করিয়াই সে কৈকেয়ীকে দশরথের নিকট বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিল। ভরতকে সে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছে, তাহার টান হইবে না? সে যদি ভরতের প্রকৃতি বুঝিত, এমন কাজ কখনই করিত না। তাহার বুদ্ধির অভাব থাকিতে পারে দুরদৃষ্টির অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার হৃদয়ে যথার্থ ভালবাসা ছিল—তামাসা দেখার জন্য অথবা নিজের দুইখান কাপড়ের জন্য সে লাগালাগি করিয়া বেড়াইত না। তাহার যে দুর্ব্বলতা—ভদ্রগৃহেও সেরূপ দুর্ব্বলতা সাধারণ বলা যাইতে পারে। দুর্ব্বলার প্রকৃতি যথার্থই নীচ। সে লহনাকে কুপরামর্শ দিয়া খুল্লনার নিকটে আর একরকম সাজাইয়া বলে, খুল্লনার নামে লহনার কাছে আবার নিন্দা করে। মন্থরার মত ভালবাসা দুর্ব্বলায় নাই। দুর্ব্বলা টাকার ঘুঘু।

মুকুন্দরামের ভাষায় কথা বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক করে না; যে দু'এক স্থান উদ্ধৃত করিয়াছি, পাঠকেরা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার বর্ণনা স্থানে স্থানে একটু সংক্ষিপ্ত হইলে আরও ভাল হইত বোধ হয়। এক ভাব—এমন কি প্রায় এক ভাষা লইয়া তিনি কিছু বাহুল্যরূপে মধ্যে মধ্যে বকিয়াছেনও। যাহা হৌক্, প্রাচীন কবি আমাদের গৌরবের স্থল। তাঁহাদের দোষ সংশোধিত হইয়াই ভবিষ্যৎনূতন কবির রচনা ফুটিয়া উঠে।

সেই !

১

নয়নে নয়ন করে করতল,
থর থর তনু আঁখি ছলছল,
স্বপনের তীরে ভ্রমিয়ে বিকল,
  দুজনে আপনা-হারা !
উথলিত প্রেম হৃদয়ের মাঝে,
বাধ বাধ বাণী আধ আধ লাজে,
শান্ত নিশীথিনী চৌদিকে বিরাজে
  ছায়াময়ী মায়া পারা !

২

গলে বাঁধিতাম এলানো চিকুর,
মুখেতে খেলিত সমীর মেদুর,
আধ-ফুটো কথা পিরীতি-বিধুর,
  শিথিল অলস প্রাণ ;
আকুল আকাশে অজচ্ছল তারা,
অনন্ত আকাশ কারাগার পারা
ভাবিয়ে কাটিত বিভাবরী সারা,
  পাপিয়া গাহিত গান ।

৩

পরাণে পরাণ স্বপনে স্বপন,
দুই প্রাণ মন দোঁহে নিমগন,
নেহারিয়ে মুখ বিশ্ব-বিস্মরণ,
  দুজনে যেতাম মিশি ;
তটিনীর তীর চাঁদিনীর আলো,
জলে পাদপের ছায়া কালো কালো,
আধ কল কথা লাগিত রে ভাল,
  জাগিয়া শুনিত নিশি ।

৪

কত সে আরতি কত অনুরাগ,
ভাঙা ভাঙা ভাঙা কত সে সোহাগ

আবেশ-আকুল, কখনো বিরাগ,
অভিমানে ভরা আঁখি,
কত সে যতন কত সে যাতনা,
অদর্শন হলে কত সে ভাবনা,
হেরিলে আবার মধুর গঞ্জনা
আঁখিতে আঁখিটী রাখি !

পিট্রোলিয়ম।

আজি কালি আমাদিগের দেশে কেরোসিন তৈল প্রচলিত হইয়াছে ; এই তৈলের আর একটি নাম পিট্রোলিয়ম বা প্রস্তর-জাত তৈল। ইহার দুঃসহ গন্ধ হইতে অনেক লোকেই ভুগিয়াছেন। সাধারণ পিট্রোলিয়মের বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রা, আর উৎকৃষ্ট পিট্রোলিয়ম পরিষ্কার জলের ন্যায় বর্ণহীন। পিট্রোলিয়ম সাধারণতঃ তরল, কিন্তু কোন কোন পিট্রোলিয়ম স্বাভাবিক অবস্থায় মাখমের ন্যায় অর্দ্ধ কঠিন অর্দ্ধ তরল। পূর্ব্বকালে ইয়োরোপীয় প্রদেশ সমূহে পিট্রোলিয়ম জনসমাজে অপরিচিত ছিল না, ফলতঃ হেরোডোটস, প্লুটার্ক, প্লিনি প্রভৃতি পুরাকালীন লেখকদিগের গ্রন্থে এই তৈলের উল্লেখ আছে। যাহা হউক তৎকালে ইহার বহুল ব্যবহার হইত না ; ইহা তখন অতি অল্প মাত্রায় আমদানি হইত, আর তন্নিমিত্ত লোকে ইহা কেবল ঔষধার্থে ব্যবহার করিত, এখনকার ন্যায় সাধারণ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত না। ১৮৫৯ অব্দে আমেরিকায় পিট্রোলিয়মের ব্যবসায় প্রথম আরম্ভ হয়, আর সেই সময় হইতে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। পিট্রোলিয়ম ভূগর্ভস্থ কি পুরাতন কি নূতন সমুদয় প্রকার প্রস্তরময় স্তরেই দেখা যায়। ইহা একটী বস্তু নহে, অনেকগুলি বস্তুর মিশ্রণ মাত্র। এই পদার্থগুলির প্রত্যেকটীতেই কার্ব্বন (অঙ্গার) ও হাইড্রোজন (উদকজান) এই দুই প্রকার মূল পদার্থ আছে, আর সেই জন্য ইহাদিগকে রসায়ন বিজ্ঞানে সংক্ষেপে হাইড্রো-কার্ব্বন বলা হইয়া থাকে। প্রস্তরময় স্তরে উক্ত তৈল কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে—এই প্রশ্নের দুই প্রকার উত্তর হইতে পারে। এক উত্তর এই যে বৃক্ষাদি পদার্থ ভূগর্ভে পাথুরিয়া কয়লায় পরিণত হয় এবং তাহা হইতে উত্তাপ সংযোগে ঐ হাইড্রোজেন ও কার্ব্বনের যৌগিক উৎপন্ন হইয়াছে ; আর এক উত্তর এই যে লৌহ প্রভৃতি ধাতুর মধ্যে অনেক সময় অঙ্গার থাকে, ভূগর্ভে উত্তপ্ত দ্রব লৌহে মনে কর কোন প্রকারে জল আসিয়া পড়িয়াছে,

আর তখন ঐ উত্তাপে জল বিযুক্ত হওয়ায় উহার হাইড্রোজন উক্ত লৌহস্থ কার্ব্বনের সহিত যাইয়া সংযুক্ত হইয়াছে। এই দুই সিদ্ধান্তের কোন্‌টী অধিক সম্ভবপর ইহা নির্ণয় করা কঠিন। পরীক্ষা হইতে ইহার কোন মীমাংসা হওয়া সহজ নহে; পরীক্ষা করিলে এক পক্ষে দেখা যায় যে, বৃক্ষের কিম্বা জন্তুর দেহ মাটীতে পুতিয়া রাখিলে উহা ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া অঙ্গারে পরিণত হয় এবং কতকগুলি অঙ্গার (পাথুরিয়া কয়লা) উত্তপ্ত হইলে উহার হাইড্রোজন ও কার্ব্বন হইতে অনেকগুলি যৌগিক পদার্থ জন্মে। পরীক্ষায় আবার অপর পক্ষে ইহা দেখা যায় যে, অঙ্গারযুক্ত লৌহ বিশেষ কতকগুলি অম্ল বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে উহার অঙ্গার ঐ সকল বস্তুর উদকজানের সহিত যুক্ত হইয়া হাইড্রো—কার্ব্বন উৎপাদন করে।

পিট্রোলিয়ম পৃথিবীর নানাস্থানে পাওয়া যায়; আমেরিকায় পেন্‌সিলভেনিয়া, ক্যানেডা, ওহিয়ো, ভার্জিনিয়া, টেনেসি, কেন্‌টকি ও ক্যালিফোর্ণিয়া এই কয় প্রদেশে উহার আকর আছে। ইয়োরোপে জ্যাণ্টে দ্বীপ, ক্রাইমিয়া ও ককেস্‌স্‌ এই কয় স্থলে উক্ত তৈলের প্রস্রবণ আছে; আর ইটালী, গ্যালিসিয়া, বেভারিয়া, হ্যানোভার, হলষ্টাইন ও আল্‌সাস্‌ ইয়োরোপের এই কয়েক দেশেও উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাস্পিয়ান্‌ হ্রদের পশ্চিম উপকূলে বাকু নামক স্থানে বহুকাল হইতে পিট্রোলিয়মজাত অগ্নি জ্বলিয়া আসিতেছে, তথাকার লোকে উহা দেবতাবোধে পূজা করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে তথায় এই অগ্নির শিখা ৩০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চে উঠে। পারস্য, ব্রহ্মদেশ, চীন, ভারতবর্ষ, ত্রিনিদাদ্‌, বার্ব্বেডোস্‌, ইত্যাদি দেশেও পিট্রোলিয়ম উৎপন্ন হয়।

আমেরিকায় পিট্রোলিয়মের কারখানা খুলিবার বার বৎসর পূর্ব্বে ১৮৪৭ অব্দে ইংলণ্ডে ডার্বিশায়ার জেলায় আল্‌ফ্রেটন নামক স্থানে ডাক্তার লায়ন প্লেফেয়ার পিট্রোলিয়মের এক খনি আবিষ্কার করেন। দুই তিন বৎসরের পর এই খনি নিঃশেষ হইয়া যায়; অতঃপর নূতন কোন পদার্থ হইতে পিট্রোলিয়ম তৈল প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়। অনেক পরীক্ষার পর ১৮৫০ অব্দে ইয়ং নামে একব্যক্তি "বগহেড কোল" বলিয়া যে এক প্রকার পাথুরিয়া কয়লা ইংলণ্ডে পাওয়া যায়, তাহা হইতে ঐ তৈল প্রস্তুত করা লাভজনক ইহা স্থির করেন। উক্ত কয়লা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে উহা হইতে প্রচুর মাত্রায় তৈল চোয়ান যাইতে পারে।

আমেরিকায় পেন্‌সিলভেনিয়া প্রদেশে পিট্রোলিয়ম তৈল বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল; তথাকার আদিম অধিবাসীরা উহা ঔষধার্থে প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহার করিত। কিন্তু প্রথমতঃ এই তৈল অতি অল্প মাত্রায় পাওয়া যাইত; ইহার দৃষ্টান্ত এই যে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে উহার মূল্য প্রত্যেক গ্যালনে ৪০ টাকারও অধিক লাগিত; আর ১৮৪৩ অব্দে কেবল আড়াই টাকা মাত্র। ভূগর্ভ হইতে কূপ খনন করিয়া পিট্রোলিয়ম সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব বিসেল নামক একব্যক্তি প্রথম উত্থাপন করেন;

অতঃপর ১৮৫৯ অব্দে ২৭ এ অগষ্ট তারিখে টাইটস্‌ভিল নামক স্থানে মিঃ ড্রেক কর্তৃক প্রথম কূপ খনিত হয়। এই কূপ হইতে প্রতিদিন প্রায় ৮৮০ গ্যালন তৈল উত্থিত হইত। ইহার অনতিবিলম্বেই পিট্রোলিয়ম ব্যবসায় করিবার নিমিত্ত সমুদয় লোক এক প্রকার উন্মত্ত হইয়া উঠে, ১৮৬১ অব্দে এই উন্মত্ততা সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং তখন হইতে বহুসংখ্যক পিট্রোলিয়ম কূপ খনন করা হইয়াছে। অবিশুদ্ধ পিট্রোলিয়ম প্রথমতঃ প্রদীপে জ্বালাইবার নিমিত্ত ইয়োরোপাদি দেশসমূহে প্রচলিত হয়, এবং ইহা এক্ষণে এত অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়াছে যে, কেবল পেন্‌সিলভেনিয়া হইতেই প্রতি বৎসর ২০০ লক্ষ গ্যালনেরও অধিক তৈল সংগৃহীত হয়। পিট্রোলিয়ম তৈলের সহিত কতক পরিমাণে গ্যাসও উত্থিত হইয়া থাকে এবং এই গ্যাস কোন কোন স্থলে জ্বালাইয়া জীবনের নানা প্রকার কার্য্য সমাধা হয়। পিট্রোলিয়ম কূপ অতিশয় গভীর; পেন্‌সিলভেনিয়ায় পিট্‌স্‌বর্গ নগরের ৩০ মাইল দূরে দুইটী প্রসিদ্ধ কূপ আছে, তাহাদিগের গভীরতা প্রায় ১৬০০ ফুট। এই দুইটী কূপের মধ্য হইতে এক্ষণে অবিরত গ্যাস উত্থিত হইতেছে; এই গ্যাস কি ভয়ানক বেগের সহিত বাহির হয়, তাহা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। উল্লিখিত দুইটী কূপের একটীর নাম ডেলামিটার; ইহা পর্ব্বত বেষ্টিত একটী উপত্যকায় অবস্থিত। এই কূপ হইতে পাইপ দিয়া নানা দিকে গ্যাস লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এই গ্যাস জ্বালাইয়া রাত্রে আলোক করা হয়, এবং তদ্ভিন্ন কল চালান, লৌহ গলান ইত্যাদি অনেক কাজও নির্ব্বাহ হয়। এই কূপের একটী তিন ইঞ্চ ব্যাস বিশিষ্ট পাইপ দিয়া ৪০ ফুট উচ্চ অগ্নিশিখা উঠিয়াছে, ইহার উত্তাপ ও শব্দ অতিশয় অধিক। উত্তাপ এত অধিক যে চতুষ্পার্শ্বে ৫০ ফুট ব্যাপিয়া সমুদয় জমি একেবারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে; শীত কালে যখন নিকটস্থ পর্ব্বত সমূহ বরফে আচ্ছন্ন থাকে, তখনও এই শিখার উত্তাপ গুণে দূরস্থ জমি গ্রীষ্মকালের ন্যায় সবুজ তৃণে আবৃত থাকে। শিখার আওয়াজ এত চড়া যে রাত্রিকালে যখন চতুর্দ্দিক নিঃস্তব্ধ হয়, তখন ১৫ মাইল দূর হইতেও উহা শুনিতে পাওয়া যায়; ৪ মাইল দূরে উহার শব্দ নিকটে একটী রেলগাড়ি চলিয়া যাওয়ার শব্দের ন্যায়; এবং নিকটে আসিলে শব্দ এত অধিক হয় যে মানুষের কথা অতি কষ্টে শুনিতে পাওয়া যায়।

পিট্রোলিয়ম উত্তপ্ত করিলে উহা অন্যান্য তরল পদার্থের ন্যায় ফুটিতে থাকে; কিন্তু উহার সমুদয় অংশ এক প্রকার উত্তাপে ফুটে না। কতক অংশ একটু মাত্র উত্তাপ পাইলেই বায়বীয় আকার ধারণ করে—কতক অংশ ৮০° উষ্ণ হইলে ফুটিয়া থাকে; আর কতক অংশ ১৭০° উষ্ণ হইলে ফুটে। এই শেষোক্ত অংশ প্রদীপে জ্বালাইবার উপযুক্ত; যে অংশগুলি সামান্য উত্তাপে বাষ্পাকার ধারণ করে, তাহা জ্বালাইলে বিলক্ষণ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এইরূপ তৈল জ্বলিয়া প্রদীপ ফাটিয়া যায় এবং চতুর্দ্দিক অগ্নিময় হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত পিট্রোলিয়ম তৈল বাজারে বিক্রয় হইবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট

কর্তৃক উহার উদ্দীপক-বিন্দু নিরূপিত হয়; অর্থাৎ কতদূর উষ্ণ না হইলে তৈল জ্বলিয়া উঠিবে না—ইহা স্থির করা হয়। ১৮৭১ অব্দে ইংলণ্ডে এক আইন পাশ হয়, তাহা দ্বারা ইহা নির্দ্ধারিত হয় যে যে তৈল হইতে ১০০° ফা উষ্ণতায় উদ্দীপ্য বাষ্প নির্গত হইবে, তাহা বিক্রয় হইতে দেওয়া হইবে না। সাধারণতঃ যে পিট্রোলিয়ম তৈল জ্বালান হইয়া থাকে, তাহা ১৭০°র উপরে ফুটিয়া থাকে এবং ১৫০° ফা উত্তপ্ত না হইলে উদ্দীপ্য বাষ্প উৎপন্ন করে না।

পিট্রোলিয়ম প্রদীপে জ্বালান ভিন্ন নানা প্রকার ব্যবসায় কার্য্যে উপকারে আইসে; যে সকল কার্য্যে রবার মিশ্রিত করিবার প্রয়োজন হয়, সে সকল কার্য্যের নিমিত্ত টার্পিন তৈলের পরিবর্ত্তে সময় সময় পিট্রোলিয়ম ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন আবার পশমের ব্যবসায়েও পিট্রোলিয়ম প্রয়োগ হয়।

স্বাভাবিক পিট্রোলিয়মে কতকগুলি কঠিন অংশ মিশ্রিত থাকে; উত্তাপ দ্বারা এই কঠিন অংশ তরল অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে, অর্থাৎ উত্তাপ পাইলে তরল অংশ বাষ্পাকার ধারণ করিয়া চলিয়া আইসে এবং পরে শীতল হইলে পুনরায় তরল হয়। আর কঠিন অংশ উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলে তবে বাষ্পাকারে উত্থিত হয় এবং এই বাষ্প বিভিন্ন পাত্রে ঠাণ্ডা করিলে কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়। এই কঠিন অংশকে পারাফিন কহে এবং ইহা হইতে এক প্রকার মমবাতি প্রস্তুত হয়—তাহার নাম পারাফিন বাতি।

এই প্রবন্ধটী আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ইচ্ছামত লিখিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই সার হেন্‌রি রস্কো প্রণীত রসায়ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

গাজিপুর পত্র।

আমরা একদিন বিকালে নৌকায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম, পশ্চিমে স্তরবিন্যস্ত নানাবর্ণ উজ্জ্বল মেঘের মধ্যে সূর্য্য অস্তে যাইতেছিলেন, পূর্ব্বাকাশ সিন্দূর মেঘে ছাইয়া পড়িয়াছিল, উভয়দিকের এই বিচিত্র আভায় নদী লালেলাল হইয়া উঠিয়াছিল। গঙ্গার উপর কতবার এ শোভা দেখিয়াছি—তথাপি সমস্তই নূতন লাগিতে লাগিল। লোহিত আভাময় শ্যামল গাছপালার মধ্য দিয়া হঠাৎ এক একবার যখন পশ্চিমের বিচিত্র বর্ণ ঘন লোহিত আকাশ খণ্ডে চোখে পড়িতে লাগিল, গঙ্গার উপর আকাশের লাল ছায়া যখন তরঙ্গে তরঙ্গে খেলিয়া চলিতে লাগিল, আকাশের বর্ণ সৌন্দর্য্য স্নাত-

পিককুল কুহরিত শ্যামল দিগন্ত হইতে যখন প্রতিহত কিরণ কণা আনন্দ হিল্লোল-রূপে বিকিরিত হইতে লাগিল—তখন মনে হইতে লাগিল জ্যোৎস্না দৃশ্যও এত মনোহর নহে। মানুষের জীবন এমনি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের উপর স্থিত!

ভ্রাতা গাহিতে লাগিলেন—

আজি কি হরষ সমীর বহে প্রাণে—
(এ কি) প্রেম কুসুম ফুটে হৃদি কাননে।
ভগবত মঙ্গল কিরণে—উজল জগত শত বরণে
নাথ নাথ বলি, প্রাণ মন খুলি
গায় সবে একতানে, পূরে দিশি দিশি আনন্দ তানে

এই আনন্দ গান, আনন্দ দৃশ্যের মধ্যে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সহসা উপকূলের এক কুটীরতীর হইতে জয়ধ্বনি উঠিল, দেখিলাম তীরে আসীন বিভূতি-চর্চ্চিত রুদ্রাক্ষধারী এক সাধু দুই হাত তুলিয়া আমাদের আশীষ করিতেছে, অন্যান্য স্ত্রী পুরুষ সেইখানে দাঁড়াইয়া আমাদের অভিবাদন করিতেছে। সাধু পুরুষটি আমাদের গোয়ালিনীর স্বামী—এখানে সকলে ইহাকে ভক্ত বলে। ইহার অবস্থা অনেকটা তুকারামের মত। ধ্যান ভজন হরিনামেই ইহার দিন কাটে, স্ত্রী পুত্র সংসার মরুক বাঁচুক সেদিকে তাহার দৃষ্টি নাই, গোয়ালিনী তাই সর্ব্বদাই তাহাকে গালি পাড়ে—কিন্তু তাহাতেও তাহার আনন্দের কিম্বা ভজনের কিছুমাত্র ব্যাঘাৎ হয় না।

ভক্তের হৃদয়ের আনন্দ ভক্তিভাব তাহার মুখেতেও প্রকাশ দেখিলাম—তাহাকে দেখিয়া আমাদেরও আনন্দ হইতে লাগিল।

তাহাদের কুটীর ছাড়াইয়া কিছু দূরে দূরে দুইটি মাটির ঢিবি সতীদাহের চিহ্ন স্বরূপ এখনো বর্ত্তমান।

পবহারী বাবার আশ্রমও নদীতীরে। আশ্রম শিষ্যপূর্ণ দেখিলাম, কিন্তু গুরুর সহিত তাঁহাদের এখন দেখা হয় না—তিনি গুহামধ্যে ধ্যান মগ্ন, কবে তিনি উঠিবেন তাহাও কেহ তাহারা জানে না। সুতরাং তাঁহাকে দেখিবার আশা আমার ত্যাগ করিতে হইয়াছে। গাজিপুরে আর একজন সন্ন্যাসীর নাম শুনিয়াছি, তিনি গাছে ঝুলিয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া ভক্তি হওয়া দূরে থাক—তাহার বিপরীত ভাব মনে উদিত হয়, সুতরাং তাঁহাকে দেখিতে যাই নাই।

পবহারী বাবার আশ্রম হইতে আরো কিছুদূর গিয়া আমরা ফিরিলাম। তাহার আগেই সন্ধ্যা হইয়াছিল—চাঁদ উঠিয়াছিল, উজ্জ্বল লোহিত আভার পরিবর্ত্তে ম্লানতর রজতাভায় চারিদিক আপ্লুত হইয়া পড়িয়াছিল, আবার গান আরম্ভ হইয়াছিল; জলের মৃদু কল্লোল, দাঁড়ের ঝপ ঝপ শব্দ, আর সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি অপূর্ব্বএক মিলন তান তুলিয়াছিল। নৌকা যখন আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি স্বল্প জলের মধ্যে আসিয়া পড়িল,

দাঁড়িরা দাঁড় ফেলিয়া লগী ঠেলিতে লাগিল—তখন গান বন্ধ হইল—আমাদের স্বপ্নের ভাবও ভাঙ্গিয়া গেল, আমরা কঠোর সত্য জগতে ফিরিয়া আসিলাম, বন্ধুবর গাজি মহাশয় তখন রাজা বৈদ্যনাথের লগী ঠেলার গল্প আরম্ভ করিলেন। গল্পটি আমরা অনেকবার শুনিয়াছি, তোমাকে একবার না শুনাইয়া থাকিতে পারিতেছি না।

কানপুরের রাজা বৈদ্যনাথের নিজের শরীরটি যেমন প্রকাণ্ড—তাঁহার চড়িবার ঘোড়াটি তেমনি ক্ষীণকায় ছিল। তদারোহণে তিনি প্রত্যহই গঙ্গাস্নানে যাইতেন। যাইবার সময় তেমন বাধা বিঘ্ন হইত না, কিন্তু আসিবার সময় গঙ্গাজলপূর্ণ দুইটি কলস অশ্ব-পৃষ্ঠের দুই দিকে ঝুলাইয়া নিজে মধ্যে অধিরোহণ পূর্ব্বক যখন গৃহাভিমুখী হইতেন, তখন অশ্ব চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িত,—সেই সময় নদীতে যেমন করিয়া লগী ঠেলে, সেই অনুকরণে তিনি এক বংশ দণ্ড মাটীতে চালনা করিতেন এবং এইরূপে ঘোড়া গঙ্গা-জল ও আপনাকে লইয়া নিরাপদে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিতেন।

নৌকা ভ্রমণ সেদিন আমাদের এত ভাল লাগিল, যে সকলেই একবাক্যে কিছুদিন বোটে করিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রথমে দূর দূরান্তর, শেষে কাশী পর্য্যন্ত যাইবার কথা হইল। গাজিপুর হইতে কাশী জল পথে ৪। ৫ দিনের রাস্তা, সুতরাং এই প্রস্তাব আমাদের পার্লামেণ্টে সেরাত্রে মহা উৎসাহ সহকারে উত্থাপিত, অনুমোদিত এবং পেষীকৃত হইয়া গেল কিন্তু রাতটা পোহাইবামাত্র সমস্তই শৃগালের যুক্তিতে পরিণত হইল। আমাদের গাজি মহাশয় যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ইহাতে অধিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন—তিনি পরদিন এই যাত্রার নানারূপ অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া সকলকে নিরুৎসাহ করিয়া দিলেন। হইলে কি হয়—কাঙ্গালকে একবার ধানের ক্ষেত দেখাইলে কি রক্ষা আছে? কাশী দেখিব বলিয়া আমি তখন এমনি বাঁকিয়া বসিলাম যে ভ্রাতা অগত্যা স্থল পথে আমাকে কাশী দেখাইয়া আনিতে বাধ্য হইলেন।

কলিকাতা হইতে গাজিপুরের পথে যে নামা উঠার হেঙ্গামের কথা বলিয়াছি, কাশীর পথের নিকট তাহা সামান্য। গাজিপুর হইতে কাশী মোট ৪। ৫ ঘণ্টার পথ—কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে ৪। ৫ বার নামা উঠা করিতে হয়। ষ্টীমার হইতে তাড়িঘাটে নাম—তাড়িঘাট হইতে দিলদারনগরে নাম—তাহার কয়েক ষ্টেসন অগ্রসর হইয়া আবার মোগলসরাইয়ে নাম,—সেখানে ভিন্ন ট্রেণ ধরিয়া তবে কাশীতে পৌঁছাও। সমস্ত পথটা তুমি যেন বিলিয়ার্ডের একটা গোলা,—ঢুঁ খাইয়া কেবলি ফেরাফেরি করিতেছ—আর মাঝে মাঝে অল্পক্ষণের জন্য ট্রেণরূপ থলিগত হইতেছ। যাহা হউক বেলা থাকিতেই আমাদের যাত্রার বিলিয়ার্ড খেলা শেষ হইল; আমরা গোলাগুলা প্যাক হইয়া বিশ্রাম স্থলে পৌঁছিলাম।

পথের মধ্যে একটি ঘটনা হইয়াছিল উল্লেখ যোগ্য। আমরা দুই জনে দিলদার

নগরের গাড়ীতে বসিয়া আছি—দুইজন ভদ্র মুসলমান—(তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধ) আমাদের গাড়ীর নিকট আসিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দাঁড়াইল, একজন জিজ্ঞাসা করিল—"আপলোক কাঁহাসে আতা?" ভ্রাতা কি উত্তর দিবেন ইতস্ততঃ করিতেছেন—তাহারা ভাবিল আমরা তাহাদের ভাষা বুঝি না, বৃদ্ধ সেই মর্ম্মে তাহার সঙ্গীকে বলিল—"দেখিলে ত আমি বলিয়াছিলাম—উহারা এখানকার নয়"—বলিয়াই আবার ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপলোক কোন মুলুক্কা আদমি?" ভ্রাতা প্রসন্নমুখে হাসিয়া বলিলেন "হামলোক বাঙ্গলা মুলুক সে আয়া।" এই কথায় কিজানি তাহাদের কি ভাবোদয় হইল, উভয়েই হাত তুলিয়া সেলাম করিতে করিতে গদগদ হইয়া বলিল—"বহুত খুব বহুত খুব" বলিয়া চলিয়া গেল।

এখন তুমি কাশীর বিবরণ শুনিতে চাও? কোথা হইতে আরম্ভ করিব? ইতিহাস হইতে? আচ্ছা সেই ভাল, নহিলে দস্তুর রক্ষা হয় না। মান্ধাতার আমল হইতে গাজিপুরের ইতিহাস পাইয়াছ—কিন্তু কাশীর স্থাপয়িতা স্বয়ং বিশ্বেশ্বর—সুতরাং কাশী অনাদি পুরাতন—অর্থাৎ পৃথিবী যখন সমুদ্র মগ্ন ছিল, সেই প্রলয়কাল হইতেই কাশী বর্ত্তমান। কথাটা বিশ্বাস না কর কাশীপুরাণ পড়িয়া দেখ। তবে এ পরামর্শ দিয়া কতটা বন্ধুর কাজ করিতেছি বলিতে পারি না; কাশীপুরাণ পড়িলে জীবন্তে গাধা হইবার একটা সম্ভাবনা আছে। অন্ততঃ একজন এইরূপ হইয়াছিলেন। তিনি আগে চুনারে বেশ মোটা মাহিনার চাকরী করিতেন; হঠাৎ কাশীপুরাণ পড়িতে পড়িতে একদিন দেখিলেন—কাশীর পরপারে মরিলে লোকে গাধা হয়। চুনার কাশীর পরপার, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই ত তাঁহার গাধা হইবার সম্ভাবনা মনে জাগিতে লাগিল। তিনি সেই দিনই চুনারের কর্ম্মত্যাগের দরখাস্ত করিলেন এবং কাল বিলম্ব না করিয়া চুনার পার হইয়া ট্রেণে উঠিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এইরূপে তিনি ভবিষ্যৎ গর্দ্দভত্ব হইতে রক্ষা পাইতে গিয়া বর্ত্তমানে গর্দ্দভ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। চুনারের কর্ম্ম ছাড়িয়া ইনি গাজিপুরে এক সামান্য মাহিনার কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গাজিপুরে ইনি গাধা বাবু নামে খ্যাত। ভরসা করি মৃত্যুর পর তিনি মুক্তি লাভ করিবেন।

এখন কাশীর ভূবিবরণ! কাশীতে মন্দির অজস্র, তাহার মধ্যে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। কাশীতে ঘাট অনেক—সকল ঘাটই পুণ্যঘাট। মহারাজ মানসিংহ নির্ম্মিত কাশীর মান মন্দির বিখ্যাত, কাশী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে সারনাথের মন্দির—ভগ্নাবশেষ বৌদ্ধকীর্ত্তি বিরাজমান, কাশীর কলেজ বাটী প্রকাণ্ড, কাশী পণ্ডিত-প্রধান স্থান; কাশীর জরির কাপড় প্রসিদ্ধ—কাশীর খেলেনা সুন্দর। আর কত বলিব? তবে যদি তুমি বল কলিকাতায় বসিয়াই তুমি এসব জান, এ আর নূতন কথা কি—তাহা হইলে আমাকেও স্বীকার করিতে হয়, যাহা বলিলাম তাহা আমারো নূতন জ্ঞান নহে, কেন না কাশী আসিয়া আমি কাশীর প্রায় কিছুই দেখি নাই। কাশী বেড়াইবার

মধ্যে—পৌঁছিবার পরদিন বিকালে বোটে করিয়া সহরের দৃশ্যটা একবার দেখিতে গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু হাতে হাতে তখনি কাশীপ্রাপ্তির সম্ভাবনার সূত্রপাত হওয়ায় তাহার দিকে বড় ভাল করিয়া মনোনিবেশ করিতে পারি নাই। বোটে চড়িয়াই আমরা দেখিলাম বোটখানার নিতান্ত ভগ্নদশা, কিন্তু তখন ফিরিলে আর বোটে বেড়ানই হয় না—সুতরাং কি করা যায়—সেই জীর্ণ ক্ষুদ্র বোটেই কয়জনে প্যাক হইয়া বসা গেল। বোট স্রোতের টানে বেশ চলিতে লাগিল, তীরের অবিচ্ছিন্ন সংলগ্ন মন্দির, বাটীর পার্শ্ব দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। নানাবর্ণের, নানা আকৃতির নানারূপ দৈর্ঘ্যের মন্দির অঙ্গে অঙ্গে সংলগ্ন, মাঝে মাঝে কোন মন্দিরের চূড়া স্বর্ণময়, কোন মন্দিরের অর্দ্ধভাগে মসজিদ, মন্দিরের সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘাট—ঘাটে ঘাটে কত-দেশের স্ত্রীপুরুষ স্নান করিতেছে। কোন কোন মন্দিরের নিম্ন তলায় গঙ্গার জলে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুস্থানের সমস্ত রাজাগণের এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্দির এখানে বিরাজিত। সম্প্রতি নেপাল রাজ এক নূতন মন্দির করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গঙ্গার উপর নৌকা হইতে কাশী দেখিলে মনে হয় যেন সহরটি গঙ্গার জলের মধ্য হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে। সহরের মধ্য হইতে যে বাড়ীগুলি এক তালা, দোতালা দেখায়, গঙ্গা হইতে দেখিলে সেগুলিকে ৪।৫ তালা বলিয়া মনে হয়। জলের মধ্য হইতে এইরূপ উচ্চ অট্টালিকা এবং তাহার মধ্যে মধ্যে পাকা ঘাটগুলি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকায় গঙ্গার দিক হইতে কাশীর অত শোভা দেখায়। আমরা মুগ্ধ নেত্রে এই সুন্দর দৃশ্য দেখিতেছি এমন সময় নৌকার মুখ ফিরিল ? মাঝি বলিল, যদি সন্ধ্যার আগে বাড়ী যাইতে হয় ত এখনি ফেরা আবশ্যক—কেননা স্রোতের বিপরীতে যাইতে হইবে। সে কি ঘোরতর সংগ্রাম ! বর্ষার দুর্দ্দম্য স্রোত-জলের মাঝে মাঝে মগ্ন বাড়ীর অংশ মস্তক তুলিয়া আছে—তাহার চারি দিকে ভীষণ আবর্ত্ত ঘূর্ণায়মান—নৌকা সেই আবর্ত্তের দ্বারা ভীমবলে আকৃষ্ট হইয়া তাহার উপর পড়িতে চাহে—মাঝিরা প্রাণপণে তাহা অতিক্রম করিয়া নৌকাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে চাহে; একবার যদি এই মগ্ন ভিত্তিতে আসিয়া নৌকা আহত হয় ত আর রক্ষা নাই—এইরূপে কত নৌকা এ সময় ডুবি হয়। মাঝিরা মহা চীৎকার করিতে করিতে প্রত্যেক মুহূর্ত্তের বিপদের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল; আমাদের মনে হইতে লাগিল—কাশী-দর্শনের পুণ্য ফল বুঝি আমরা সদ্য সদ্য হাতে হাতেই লাভ করি। অধম আমরা—তাহাতে কিন্তু আমাদের মনে কিছুমাত্র আনন্দের উদয় হয় নাই, যখন কোন প্রকারে এই পুণ্যের হস্ত হইতে আমাদের অব্যা-হতির সম্ভাবনা দেখিলাম, তখনি পরম পুণ্য জ্ঞান করিলাম।

এই ত কাশীর কথা আমার সাঙ্গ হইল; না আর একটি বলিবার আছে। নৌকা হইতে ফিরিয়া বাড়ী আসিবার সময় পথে একস্থলে দেখিলাম—বৃক্ষ বিলম্বিত এক দড়ির দোলনায় উপবিষ্ট এক যুবতীকে দুইজন বালক দুলাইয়া দিতেছে। কাশীর যত দৃশ্য

দেখিয়াছি—সর্ব্বাপেক্ষা এই দৃশ্যটি সুন্দর লাগিল, রমণীর অঙ্গ সৌষ্ঠব প্রতি দোলায় দোলায় যেন তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছিল—সেখানে বাঁশরী বাজিতেছিল না, কিন্তু সেই ঝুলনে শ্যামের বাঁশরীরব শুনিতে শুনিতে আমরা বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সেই রাতটা কাশীতে ছিলাম—পরদিনই আমরা গাজিপুরে আসিয়া পড়িয়াছি। আবার শীঘ্রই কলিকাত'য় গিয়া পড়িব।

জীবন ও মৃত্যু।

(প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তা)

মৃত্যু সম্বন্ধিনী চিন্তার ফল দুই—মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করা অথবা মৃত্যুর রহস্য অভেদ্য স্বীকার করা। সনৎসুজাত মৃত্যুকে তৃণময় ব্যাঘ্রের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন; অর্থাৎ তৃণময় ব্যাঘ্র যেমন ভীষণ-দর্শন, প্রকৃত পক্ষে সেরূপ ভীষণ নহে; মৃত্যুও সেইরূপ অকিঞ্চিৎকর। মৃত্যুভয় তাহা হইলে আর থাকে না। এই জন্য প্রাচীন মুনি ঋষি প্রভৃতি জ্ঞানীগণ মৃত্যুকে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। আর এক দিকে কেহ কেহ মৃত্যুর রহস্য জ্ঞানাতীত বিবেচনা করিয়া সে চিন্তা পরিত্যাগ করে। পরিত্যাগ করে বলিলে বোধ হয় ঠিক বলা হয় না—কারণ অপরিতৃপ্ত কৌতূহল লইয়া নিবৃত্ত হওয়া মনুষ্যের স্বভাব নহে। মৃত্যু সম্বন্ধে একটা না একটা বিশ্বাস—হয় দৃঢ় বিশ্বাস, না হয় শিথিল বিশ্বাস নিশ্চিত হয়। অধিকাংশ লোকে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া একটা কিছু আছে এই রকম একটা অস্পষ্ট বিশ্বাসকে মনে স্থান দেয়। মৃত্যু সম্বন্ধে আমরা কিছু জানিতে পারি না এই বিশ্বাস হইলে জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ আরও দৃঢ় হয়। আত্মার চিরন্তন ভ্রমণপথে মৃত্যুকে যে ভয়ের কারণ বিবেচনা করে না, তাহার পরলোকের প্রতি সমধিক অনুরাগ হয়; যে মৃত্যুকে জ্ঞানাতিরিক্ত বিবেচনা করে, সে ইহলোকের চিন্তাতেই সর্ব্বক্ষণ মগ্ন থাকে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিবর্গ ও আধুনিক ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কি প্রভেদ—এ বিচার সদা সর্ব্বদাই উঠিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়েরা অবশ্য বলিবেন যে প্রাচীনেরা আধুনিকদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইয়োরোপীয়েরা বলেন যে আধুনিক পণ্ডিতেরা জগতের অধিক হিত সাধন করিতেছেন। ইয়োরোপে তপস্যা বনবাসের বিড়ম্বনা নাই,

পূর্ব্বে ঋষিগণ বনে বাস করিতেন। এ দুই মতে প্রভেদ এই যে পূর্ব্বকালে চিন্তা মৃত্যুমুখী ছিল, এখন চিন্তা জীবন মুখী। পূর্ব্বে পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম লইয়া সকলে চিন্তা করিত, এখন সকলে বিবর্ত্তবাদ লইয়া ব্যস্ত। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ নির্জ্জনে তপস্যা করিতেন, এখন পণ্ডিতেরা সমাজ-বিপ্লব কিরূপে সাধিত হয়, তাহাই চিন্তা করেন। পূর্ব্বে লোক শিক্ষকেরা ত্যাগ শিখাইতেন, এখন জীবনের সুখভোগের নূতন নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে। প্রাচীনেরা বল্কল ধারণ করিতেন, আধুনিকেরা অঙ্গরাগে ব্যাপৃত। পূর্ব্বে বৃদ্ধ রাজা রাজত্ব ত্যাগ করিয়া বনে যাইতেন, এখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে রাজাগণ পরের রাজত্ব হরণ করিবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু এই প্রভেদ উপায়ের প্রভেদ মাত্র, উদ্দেশ্যে কোন প্রভেদ নাই। জীবনের প্রকৃত সুখ ও শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করাই সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভোগ সুখে সেই শ্রেষ্ঠতা সম্পাদিত হয় না বিবেচনা করিয়া ঋষিগণ জীবনের বহির্দ্দেশে সুখের অন্বেষণ করিতেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে ভোগ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলে কেবল লালসা বৃদ্ধি হয় মাত্র, সুখ পাওয়া যায় না। দুরন্ত আকাঙ্ক্ষাকে নিগ্রহ করাই সুখের একমাত্র উপায়। শরীর নশ্বর, শরীর যাহা কিছু ভোগ করিতে চায় তাহাও নশ্বর, অতএব শারীরিক সুখভোগে জীবন অতিবাহিত করা অকর্ত্তব্য। শরীরের সুস্থতা ও স্বচ্ছন্দতা যে নিষ্প্রয়োজন এ কথা তাঁহারা বলিতেন না, কিন্তু শরীরের প্রাধান্য তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। আত্মার আশ্রয়স্থান বলিয়াই শরীরের যত্ন করা কর্ত্তব্য কিন্তু শরীরকে স্বেচ্ছাধীন হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। জীবন কিসে শ্রেষ্ঠ হয়? ইন্দ্রিয়লব্ধ ভোগসুখে নিরত রহিলে তাহাতে সুখও নাই, তাহাতে জীবনও শ্রেষ্ঠ হয় না। ইন্দ্রিয়বৃত্তি যতই বাড়িবে, মানুষ ততই পশুর মত হইয়া উঠিবে। জীবনের বাহিরে চল, লোকালয়ের প্রলোভন ত্যাগ কর, বনে বনে ভ্রমণ কর, নির্জ্জনে পূর্ণ সত্তার চিন্তা কর, ইন্দ্রিয়গ্রামকে অনুক্ষণ দমন কর, তাহা হইলে জীবন শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহা হইলে সুবিমল অনন্ত সুখ ভোগ করিবে। যাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত, যাহা স্পর্শ করিতে পারা যায় না, তাহারই চিন্তা কর, জীবনের এই ক্ষুদ্র অন্ধকার কক্ষ জ্ঞানের আলোক দ্বারা আলোকিত কর। জীবনের সুখ, জীবনের শ্রেষ্ঠতা, জীবনের শান্তি, জীবনের বল সমুদয় জীবনের বাহিরে। জীবনের বাহিরে দাঁড়াইয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিয়া জীবনের সুখ-ভোগ কর। প্রাণবায়ু যেমন শরীরের বাহিরে অবস্থিত, জীবনের জীবনী-শক্তি সেইরূপ জীবনের বহির্ভাগে অবস্থিত। দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু দ্বারা যেমন আমরা প্রাণ ধারণে সক্ষম হই না, যেমন পলে পলে নিশ্বাস প্রশ্বাসের আবশ্যক, সর্ব্বত্রগামী সমীরণের মনুষ্যশরীরে প্রবেশ যেমন আবশ্যক, জগতান্তর হইতে ইহজগতে তেমনি নূতন জীবনের আগমন আবশ্যক। বায়ুর সঙ্গে শরীরের যেমন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, জীবনের সহিত জীবনাতীতের সেইরূপ সম্বন্ধ। সমীরণের মুক্ত প্রবাহের ন্যায় অনন্ত জীবনের অসংখ্য

নির্ঝর হইতে জীবনস্রোত বহিয়া আসিতেছে, সেই স্রোতে আমাদের উত্তপ্ত জীবন শীতল হইতেছে, জীবনের শীতল, কোমল, উর্ব্বর ক্ষেত্রে বিশ্বাসের কল্পতরু দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতেছে। পৃথিবীর আলোকদাতা সূর্য্য যেমন পৃথিবীর বাহিরে, জীবনের আলোকদাতা জ্ঞানসূর্য্য সেইরূপ জীবনের বাহিরে। লোকালয়ের গণ্ডগোল, জীবনের অন্ধকার দূরে রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াও। জ্ঞানের আলোক যেন অন্ধকারে, যেন সংসারের কুজ্ঝটিকায় না আবৃত হয়। সংসারের ঐশ্বর্য্য সুখে নিরন্তর তাচ্ছিল্য ও ঔদাস্য প্রকাশ করিবে। অর্দ্ধ জগতের সম্রাট আলেকজাণ্ডার সাহঙ্কারে যখন ডাইও-জিনিসকে ইচ্ছামত প্রার্থনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন গ্রীক পণ্ডিত কহিয়াছিলেন, “তুমি সূর্য্যালোক আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়াছ। আলোকের পথ ত্যাগ কর, আমি রৌদ্র সেবন করি।” তাঁহার আর কোন প্রার্থনা ছিল না। পণ্ডিতের ও জ্ঞানীর এই উপযুক্ত কথা।

আধুনিকেরা বলেন, জীবনের বাহিরে কি আছে তাহার অনুসন্ধানেই জীবন সমাপ্ত করিলে কি হইবে? জীবনের বাহিরে কি আছে তাহা কোন কালেই আমরা প্রকৃতরূপে জানিতে পারিব না। যাহা কিছু আমরা জানি, তাহা অনুমান অথবা বিশ্বাসমূলক। যাহা কেবল অনুমেয়, তাহার বিচারে চিরকাল কাটাইলে কি হইবে? জীবনের বাহিরে যাহাই থাকুক, জীবনের ভিতরে যাহা আছে তাহাই আমাদিগের আয়ত্ত, তাহাই লাভ করিবার আমাদিগের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আকাশের বিদ্যুৎ আমাদের গৃহে প্রদীপরূপে জ্বালাইব, পৃথিবীর গর্ভে যে সকল রত্ন লুক্কায়িত আছে, তাহা অধিকৃত করিব, জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধিত করিব, এই সকল আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। তপস্যা, যোগ প্রভৃতি হয় মূর্খের—না হয় বাতুলের কর্ম্ম। অনাহারে বনে বসিয়া প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিশ্চেষ্ট রহিলে কি ফলোদয় হয়? জীবন ধারণের যে সকল নিয়ম আছে, তাহা লঙ্ঘন করিলেই দোষ। জীবনের পরে কি আছে তাহা জানিবার আমাদের সাধ্য নাই, কিন্তু জীবনের মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যাহা আমরা জানি না, কিন্তু চেষ্টা করিলে জানিতে পারি এবং জানিলে বিস্তর লাভের সম্ভাবনা। জগতে যাহা কিছু দেখিতেছি সমুদয় আমাদের সুখের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, আমরা যতই অনুসন্ধান করিব, ততই সুখের নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইবে। যাঁহারা মৃত্যু-চিন্তায় চিরজীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহাদের দ্বারা জগতের কি উপকার হইয়াছে? জীবন একটা বৃহৎ উদ্যান প্রদেশ স্বরূপ; মৃত্যু সেই উদ্যানের নির্গম দ্বার। উদ্যানে নানাবিধ ফল ফুলের বৃক্ষ আছে, কোন স্থানে নির্ঝর বহিতেছে, কোথাও দুর্গম, জটিল, শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য;—কোথাও কত প্রকার ফল মূল ওষধি আছে, কোথাও কোন নিভৃত স্থানে রত্নরাজি লুক্কায়িত রহিয়াছে। আমরা সকলে এই উদ্যানের মধ্যে বিচরণ করিতেছি। যাহারা উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ না করিয়া, অথবা কোন সুখে

কোন ভয়ানক অথবা বীভৎস ব্যাপার দেখিয়া একেবারে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে, অথবা নিষ্ক্রমণ-দ্বার দেখিয়া বাহিরে কি আছে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়, তাহাদিগের বুদ্ধির কি প্রশংসা করিতে হইবে? সে দ্বারে মাথা খুঁড়িলেও বাহিরে কি আছে কিছুই জানা যায় না, অথচ জীবনের উদ্যানেও দীর্ঘকাল কেহ থাকিতে পাইবে না। সকলকেই সেই দ্বার দিয়া বাহিরে যাইতে হইবে, কিন্তু একবার বাহির হইলে আর ফিরিয়া আসিবার সাধ্য নাই। সেই রন্ধ্রশূন্য বজ্রকঠিন দ্বারের সম্মুখে বসিয়া অনর্থক বাহিরে দেখিবার বিফল চেষ্টা শ্রেয়—না উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া কোথায় কি ফল আছে, কোথায় কি রত্ন আছে অন্বেষণ করা শ্রেয়? উদ্যানে আমরা নিজে ভ্রমণ করিয়া অন্যকে পথ দেখাইয়া দিই যাহাতে তাহাদের পথভ্রম না হয়, যে সকল বিপদ হইতে আমরা উদ্ধার হইয়াছি, তাহারা যেন সে সকল বিপদে না পতিত হয়। উদ্যানের বাহিরে যাহা আছে, তাহা আমরা উদ্যানের ভিতর যে পর্য্যন্ত আছি সে পর্য্যন্ত জানিতে পারিব না। কৌতূহল নিবৃত্তি করা কঠিন, কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার নিষ্ফল চেষ্টায় দুর্লভ জীবন সমাপন করা মূঢ়ের কর্ম্ম। জীবন প্রত্যক্ষ, জীবনের ফল প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত।

উভয় পক্ষে এইরূপ আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিকে যতটা মতভেদ মনে করা যায়, প্রকৃতপক্ষে সেরূপ মতভেদ নাই। জীবনের বিস্তৃতি সংসাধন করাই আমাদের একমাত্র ইচ্ছা। প্রাচীনেরা ইহজীবনকে নিতান্ত অসার বিবেচনা করিয়া অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত হইতেন কিন্তু তাঁহারাও অজ্ঞাতসারে জীবনের সীমা বিস্তৃত করিতেন, অন্য রাজ্যের অংশ অধিকৃত করিয়া জীবনের সহিত সংযোজিত করিতেন। প্রাচীনই হউন অথবা আধুনিকই হউন, জীবনের পূর্ণ উন্নতির পথ কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই; যদি কেহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মানব জাতি এখনও সে পথের অন্ত দেখিতে পায় নাই। জীবন অসম্পূর্ণ, প্রকৃতি অসম্পূর্ণ, উন্নতির উপায় অসম্পূর্ণ। জীবনের সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণতা প্রাচীন কালেও সম্পাদিত হয় নাই, এখনও সম্পাদিত হয় নাই। প্রাচীনের অভাব আধুনিক মোচন করিতেছেন, আধুনিকের অভাব ভবিষ্যতে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারা মোচন করিবেন। যেমন এক অভাব পূর্ণ হইতেছে, অমনি আর এক অভাব উৎপন্ন হইতেছে। জীবনে পূর্ণতা অসম্ভব—কারণ মৃত্যু নহিলে জীবন পূর্ণ হয় না। পূর্ণতা আমরা কোন মতে পাইতে পারি না; আংশিক পূর্ণতার অধিক আর কিছু আমাদের প্রাপ্য নাই। যাঁহারা মানব জাতির মঙ্গল কামনা করেন, যাঁহারা জগতে সত্য প্রচার করেন, তাঁহারা পূর্ণের অংশ লাভ করিবার চেষ্টা করেন। আংশিক পূর্ণতার হ্রাস বৃদ্ধি মানব জাতির উন্নতি ও অবনতির একমাত্র কারণ।

জীবনের অথবা মানব প্রকৃতির কল্পিত পূর্ণতা নাই এমত নহে। কল্পনার অসাধ্য

কিছুই নাই। জীবনের কল্পিত আদর্শ চিরকালই আছে। কেবল কল্পনা নহে, সাক্ষাৎ আদর্শেরও দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য বিশেষের চরিত্র আদর্শস্বরূপ অর্থাৎ পূর্ণ—এ কথা সর্ব্বদাই শ্রবণ করিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাঁহাদিগের ত কথাই নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের অপেক্ষা ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও লোকে পূর্ণস্বভাব বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু এই পূর্ণতা আদর্শ চরিত্র, ইহাও জীবনের পক্ষে অসম্পূর্ণ। ব্যক্তিগত সুখ ও সম্পূর্ণতা জাতিগত হইতে পারে না। যাহাতে এক জনের সুখ, তাহাতেই আর একজনের অসুখ। জীবনের এমন কোন আদর্শ নাই যাহার সহিত জীবন মাত্রেরই সামঞ্জস্য সম্ভব।

অতএব জীবন অসম্পূর্ণ, সুখ অসম্পূর্ণ।

পূর্ণতা প্রাপ্তির লালসা ও সেই চেষ্টা সর্ব্বদা মানবহৃদয়ে প্রবল। প্রাচীনের ধ্যান, আধুনিকের বিজ্ঞান, মৃত্যুর চিন্তা, জীবনের সেবা, সমুদয়েরই উদ্দেশ্য এক। জীবনের নিত্য পরিবর্ত্তন, নিত্য উত্থান পতন, নিত্য হ্রাস বৃদ্ধি চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধির সহিত উপমিত হইতে পারে, কেবল জীবনে পূর্ণিমার উপমা নাই। জীবনের চন্দ্র জ্যোৎস্না-পক্ষের চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। শেষ কলা মৃত্যু। মৃত্যু হইলে জীবন পূর্ণ হয়, কিন্তু সে পূর্ণিমার চন্দ্র আমরা দেখিতে পাই না—অথচ দর্শনাকাঙ্ক্ষাও অনিবার্য্য। এই জন্য জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তাও অনিবার্য্য, ও সিদ্ধান্তশূন্য বলিয়া অনন্ত।

এই চিরস্রোত চিন্তার এক মাত্র সীমা আছে। যখন যুক্তি ত্যাগ করিয়া মানুষ বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন শান্তি ও সান্ত্বনার মুখ দেখিতে পায়। নতুবা জীবন ও মৃত্যুর রহস্য অভেদ্য।

কিন্তু বিনা যুক্তিতে যে বিশ্বাস করে, যাহার পরলোকে অথবা মৃত্যু সম্বন্ধে বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ অথবা অনায়াসলব্ধ, তাহার বিশ্বাস শিথিলমূল। বংশ পরম্পরায় বিশ্বাস চিন্তার অভাব প্রকাশ করে। সৌভাগ্যবশতঃ এই জাতীয় মনুষ্যসংখ্যাই পৃথিবীতে অধিক। তাহা না হইলে, সকলে জীবনের কিয়দংশ এই কূট চিন্তায় অতিবাহিত করিলে অনর্থ ঘটিত। জীবন ও মৃত্যু মোটামুটি ধরিতে গেলে পরস্পরের সহিত নির্লিপ্ত। জীবনের রাজ্য স্বতন্ত্র, মৃত্যুর রাজ্য স্বতন্ত্র। দুই রাজ্যে বিবাদ নাই। যে এক দেশের প্রজা, তাহার অন্য দেশের সহিত সম্বন্ধ নাই। স্থূল কথা এই। সূক্ষ্ম বিচার স্বতন্ত্র। সমাজ ও সংসার স্থূল কথাতেই পরিচালিত হয়।

জীবন ও মৃত্যুবিষয়িণী চিন্তার যেমন অন্ত নাই, সেইরূপ তদ্বিষয়িণী প্রবন্ধেরও সমাপ্তি নাই। সমাপ্তি অর্থে সম্পূর্ণতা, পূর্ণতা-জনিত বিরতি। এরূপ বিরতি এমন বিষয়ে অসম্ভব। যেখানে এক জনের চিন্তার সমাপন, সেইখানেই আর এক জনের চিন্তার আরম্ভ। এইরূপ কাল-সূত্র-গ্রথিত অসংখ্য চিন্তামালা নিয়ত মলিন হইতেছে, পুনরায় নবীন কুসুমে নবগ্রথিত হইতেছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

স্নেহলতা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অবশেষে স্নেহলতার মনস্কামনা পূর্ণ হইল, পাকস্পর্শ হইয়া গেলে, বিবাহের অষ্টম দিবসে নব দম্পতি জগৎ বাবুর বাড়ী শুভাগমন করিলেন। এই পুরাতন, পরিচিত আত্মীয় ভূমিতে আর একবার পদার্পণ করিয়া স্নেহলতার হৃদয় পরিপূর্ণ আনন্দে মগ্ন হইল, বায়ুহীন অন্ধকার বদ্ধ-কোটর হইতে নির্গত হইয়া সহসা যেন সে প্রসারিত, জ্যোৎস্না প্লাবিত বসন্ত-পূর্ণ, মুক্ত কাননে দাঁড়াইয়া রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। পাল্কী উঠানে নামিবার আগেই চারু টগর দাস দাসীগণ সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, জগৎ বাবু আসিতে পারেন নাই, কেননা তিনি মোহনকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য বাহিরে ছিলেন। স্নেহলতা যখন তাঁহাদের মধ্যে দাঁড়াইল—তখন আহ্লাদে তাহার মুখে আর কথা ফুটিল না, অতিরিক্ত সুখে লজ্জাবতী লতার মত সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহার অধর পুটের হাসির রেখা, নয়নের আনন্দ দৃষ্টি পুলকে ম্লান হইয়া পড়িল। দাসীরা বলিল—"ওমা দিদিমণির দুদিনে লজ্জা হয়েছে দেখ, দিদিমণি প্রণাম হই, ভুলে যাওনিত?" চারু বলিল—"স্নেহ দাঁড়ালি কেন বাগানে চল"—

টগর বলিল—"না মায়ের কাছে দিদি যাবে"—

টগর তাহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল, চারু অনুবর্ত্তী হইল। তাহারা উপরের বারান্দায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে জগৎ বাবু তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সমস্ত দিন স্নেহলতার সেদিন একটা স্বপ্নের মত কাটিয়া গেল, চারু টগরের সহিত হাসিয়া খেলিয়া, জগৎ বাবুর সহিত গল্প করিয়া, বাগানে ফুল তুলিয়া, ছাতে ছুটাছুটি করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সে দিনটা তাহার ফুরাইয়া গেল। সন্ধ্যা বেলা যখন শুনিল—পাল্কী প্রস্তুত এখনি যাইতে হইবে—তখন তাহার মনে হইল—"সে কি? এইমাত্র ত এখানে আসিয়াছি?" স্নেহলতা কাঁদিয়া গৃহিণীকে বলিল—"মাসীমা আজ যাইব না।"

টগর তাহার হইয়া মাকে অনুরোধ করিতে লাগিল; গৃহিণী কোমলভাবে বলিলেন—"বাছা আজ ধূলাপায়ে কি থাকিতে আছে, ইহার পর আনিব"—

জগৎ বাবু আসিতে স্নেহলতা তাঁহাকে ধরিয়া পড়িল—জগৎ বাবু বলিলেন—"আজ না পাঠাইলে কি হয়? আজ যা, হপ্তা খানেকের মধ্যেই আবার আনিতে পাঠাইব।"

স্নেহলতা আর কি বলিবে? বিষাদাশ্রু-জলের মধ্যে দিবসের সমস্ত সুখ ধৌত করিয়া সে আবার পাল্কীর মধ্যে উঠিল।

সাত দিন পরে জগৎ বাবু লইতে পাঠাইবেন—কিন্তু এ সাত দিন তাহার কি করিয়া

কাটে? বাড়ীতে একটি সমবয়স্কা নাই, বই হাতে করিবার যো নাই, (একদিন তাহার হাতে বই দেখিয়া কর্ত্রীঠাকরুণ সর্ব্বনাশ বাধাইয়াছিলেন) নববধূ—সংসারের কোন কাজ কর্ম্মের ভার হাতে নাই, ছাতে কি বাগানে বেড়াইবার যো নাই, সারাদিন এক গৃহে বসিয়া থাক, ইচ্ছা হইলে শুইতেও পার কিম্বা ঘরের মধ্যে কি বারান্দায় বেড়াইতেও পার, এই স্বাধীনতা টুকু অবশ্য আছে।

জগৎ বাবু তাহার সঙ্গে যে দাসী দিয়াছিলেন, ফুলশয্যার দিনই জ্যেঠাইমা তাহাকে ফেরৎ পাঠাইয়াছেন। "কেন এখানে কি দাসী নাই—যে বৌয়ের বাড়ী হইতে দাসী আসিয়া থাকিবে?" সে কাছে থাকিলেও স্নেহলতা এখন বর্ত্তিয়া যাইত। এখানকার দাসী আবশ্যক মত মাঝে মাঝে স্নেহলতার কাছে এক একবার আসে, স্নানাহারের সময় তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যায়—প্রয়োজন মত বস্ত্রাদি প্রদান করে, এবং সময় সময় দুদণ্ড বসিয়া গল্পও করে। স্নেহলতা তাহার সহিত কথা কয়না—কেননা সে নববধূ, কিন্তু এই নির্জ্জন বন্ধুহীন কারাগারের মধ্যে উহার কথাবার্ত্তা শুনিলেও সে ভাল থাকে।

মোহন যদি স্নেহের কাছে এসময় মাঝে মাঝে আসিতে পারিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ এই কারাগারও স্নেহের সহনীয় বোধ হইত। বালক স্বামীর বন্ধুত্ব, স্নেহ মমতাই বালিকা স্ত্রীগণের এ সময়ের অসীম সান্ত্বনা, এই সান্ত্বনা বলেই তাহারা ক্রমে পরকে আপনার করিতে শিখে, নিজের পিতা মাতা গৃহ ভুলিয়া পরের গৃহ অসঙ্কোচে আপন করিয়া লয়। কিন্তু মোহন শিবপুরে থাকে, আগে শনি রবিবারে সেখান হইতে বাড়ী আসিত, কিন্তু তাহার একটা পরীক্ষা সন্নিকট, সেই নিমিত্ত পিতা আপাততঃ তাহাকে বাড়ী আসিতে বারণ করিয়াছেন। তবুও লুকাইয়া ইহার মধ্যে একদিন সে বাড়ী আসিয়াছিল, ভাবিয়াছিল রাত্রে আসিয়া রাত্রেই চলিয়া যাইবে, কেহ জানিতে পারিবে না, কিন্তু সে যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, তখনো জ্যেঠাইমা বারান্দায় বসিয়া হরিনাম করিতেছিলেন, সেই বারান্দা দিয়াই স্নেহের গৃহে যাইবার পথ, সুতরাং মোহন ধরা পড়িয়া বিস্তর লাঞ্ছিত হইল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার চলিয়া যাইতে হইল।

শ্বশুর গৃহের এই সকল নানারূপ অধীনতা, অসুবিধার মধ্যে স্নেহের দু একটি সুবিধা ভোগে অসঙ্কোচ অধিকার আছে। সে কাঁদিতে পারে, আর পুতুল খেলিতে জ্যেঠাইমা বারণ করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় অধিকারটি পাইয়াও তাহার না পাইবার মধ্যে হইয়া পড়িয়াছিল। সময় সময় স্নেহ বাক্স হইতে পুতুলগুলি বাহির করিত, (দানে স্নেহ যত পুতুল পাইয়াছিল, তাহার ঘরে দাসীরা তাহা রাখিয়া দিয়াছিল।) বাহির করিয়া গৃহে সাজাইত, সাজাইয়া তাহাদের লইয়া খেলিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহাতেও মন লাগিত না। যখন সে জগৎ বাবুর বাড়ী ছিল, তখন কাজ কর্ম্ম লেখাপড়ার পর একটু অবসর পাইলে পুতুল খেলিয়া তাহার কত আনন্দ হইত, মাটির পুতুলকে সাজাইয়া তাহার সহিত কথা কহিয়া সে সজাব সখ্যতাভাব অনুভব করিত। এখন মাঝে মাঝে সে পুতুল হাতে

করিয়া বসে, খেলিতে যায়, তাহাকে কাপড় পরাইতে আরম্ভ করে, কিন্তু শেষে কিছুই হইয়া ওঠে না; হাতের পুতুল হাতে থাকে—সে কেবল বাড়ীর কথা ভাবে। গৃহিণীর ভর্ৎসনাও এখন তাহার সুখের বলিয়া মনে হয়, তাহার স্মৃতিতেও সে মাতার স্নেহ দেখিতে পায়। এইখানে বাসের পরিবর্ত্তে চিরদিন সেই ভর্ৎসনাও স্নেহ সহিতে প্রস্তুত।

যাহা হউক কোন প্রকারে স্নেহের এই দুঃখের সপ্তাহও কাটিল, হারার মা একদিন আসিয়া হাজির হইল। আনন্দে স্নেহলতার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। কিন্তু দাসী স্নেহকে লইয়া যাইবার কথা উত্থাপন করিতেই জ্যেঠাইমা আপত্তি করিয়া বসিলেন। বলিলেন "সামনে চৈত মাস, এখন পাঠালে বৌকে আর মাস খানেক আনতে পারব না। বড় মেয়ে এত ঘন ঘনই বা যাওয়া কেন? এই ত জোড়ে সেদিন গেল। নিজের ঘর দোর চিনে নিক্।"

দাসী বলিল—"চিনবে বই কি! যখন বড় হবে সোয়ামী চিনবে তখন আমরা ডাকলেও আর যেতে চাবে না। তা ছেলেমানুষ আরো দু বছর যাক। কেঁদে বাছা সারা হয়"।

যদিইবা স্নেহলতার যাওয়া হইত, এ কথার পর আর সে সম্ভাবনা রহিল না। কর্ত্রী বলিলেন—"কেন আমরা ত আর বেঁধে মারিনে যে এত কান্না? আর মেয়েমানুষের এতই কি সোহাগীপোনা? যাওয়া হবে না—বলোগে বেহাইকে"।

স্নেহলতা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া সব শুনিল। দাসী যখন মুখ চুন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল তখন সে খুব কাঁদিতেছে। হারার মাও নিজের চোখের জল মুছিতে মুছিতে শ্বাশুড়ি মাগীর শ্রাদ্ধ কামনা করিতে লাগিল, আর নানা মতে স্নেহকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। কিন্তু বেশীক্ষণ বাপের বাড়ীর দাসীর সহিত বৌকে একত্র থাকিতে দেওয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণী বিবেচনা সঙ্গত জ্ঞান করিলেন না, অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনিও এই গৃহে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং এত শীঘ্র মেয়েকে লইতে পাঠাইয়াছেন এই অপরাধে বেহাই বেয়ানকে এমন দুদশ কথা শোনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, যে দাসী পলাইতে পথ পাইল না।

জগৎ বাবু পরদিন কুঞ্জ বাবুর সহিত দেখা করিয়া স্নেহলতাকে বাড়ী লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে তিনি কোন আপত্তি প্রকাশ করিলেন না। কেবল বৌঠাকরুণের মতটা পাওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। জগৎ বাবু তাহা শুনিয়া নিজেই বেয়ান ঠাকরুণের সহিত দেখা করিলেন, ও অনেক করিয়া বলিয়া কহিয়া তাঁহার সম্মতিও আদায় করিলেন; এবং পাছে বিলম্বে আবার কোন বাধা পড়ে এই ভাবিয়া জগৎ বাবু সেই দিনই তাঁহার সঙ্গে স্নেহলতাকে বাড়ী লইয়া আসিলেন।

চৈত্র মাস স্নেহলতা জগৎ বাবুর বাড়ীই রহিল। বৈশাখ না পড়িতে শ্বশুরবাড়ী হইতে

পাল্কী লে[illegible] তাঁহাকে লইতে [illegible]র হইল। স্নেহলতা গেল, সেইরূপ কাঁদিয়াই গেল; [illegible] বাবু নিকট কথা [illegible] গেল আবার শীঘ্র আনিতে পাঠাইবেন। কিন্তু এবার [illegible] ১০।[illegible] পরে হারাই[illegible]আর যখন কর্ত্রী ঠাকরুণের নিকট আসিয়া স্নেহকে লইয়া যাইবার কথা পাড়ি[illegible] আগুণ হইয়া উঠিলেন। "এই সমস্ত চৈৎ কাটা-ইয়া মাঝে [illegible] এখানে [illegible]য়াছে—এরি মধ্যে যাওয়া! মেয়ের যদি এতই সোহাগ ত বিয়ে [illegible] আবশ্যক কি ছিল? রোজ রোজ বৌ পাঠান আমাদের দস্তুর নয়, এতে [illegible] যদি রাগ করেন ত ঘরের ভাত দুটি বেশী করে যেন খান।"

[illegible]মা ত চলিয়া গেল, জগৎ বাবু সব শুনিয়া ভাবিলেন—দাসী না পাঠাইয়া [illegible]ই ভাল করিতেন। পরদিন নিজে বেয়ান ঠাকরুণের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে অনুনয় বিনয় আরম্ভ করি[illegible]ন। ডাক্তারের কেমন কথা—কর্ত্রী ঠাকরুণ তাহা এড়াইতে পারেন না, অগত্যা তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। বলিলেন "আচ্ছা কাল পাঠাইব—কিন্তু আর যেন নিয়ে যাবার কথা মুখে এন না।"

এই সুসংবাদ লইয়া জগৎ ব[illegible]হের সহিত দেখা করিতে গেলেন। পরদিন আর দাসী না পাঠাইয়া স্নেহকে আনিতে চারু ও টগরকে পাঠাইয়া দিলেন।

সে দিন স্নেহলতার স্ফূর্ত্তি দেখে কে? তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে শ্বশুর গৃহে থাকিয়াও সে ভুলিয়া গেল যে শ্বশুর গৃহে আছে। তাহার মাথার ঘোমটা চারু খুলিয়া দিল,—সে তাহা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করায় টগর তাহার হাতটা ধরিয়া রাখিল—বড় হাসি জমিল। এইরূপ হাসিখুসীর মধ্যে কোলঙ্গার কতকগুলি ছবির প্রতি চারুর নজর পড়িল,—সেখানে গিয়া সেগুলি হস্তগত করিয়া সে বলিল—"বেশ ছবি ত কোথা পেলি স্নেহ?" টগরও স্নেহকে ছাড়িয়া সেই দিকে ছুটিল, ছবিগুলি দেখিয়া বলিল—"জামাই বাবু বুঝি দিয়েছে?"

স্নেহ বলিল 'হাঁ'—বলিয়াই তাহার মনে হইল—ভাল কাজ করে নাই, বলিতে লজ্জা করা উচিত ছিল। ইহা ভাবিয়াই লজ্জায় স্নেহের মুখ লাল হইয়া উঠিল। টগর হাততালি দিয়া উঠিল—চারুও হাসিতে লাগিল, স্নেহলতাও হাসিতে লাগিল। এই আমোদের মধ্যে মাথায় কাপড় দিতে আর তাহার মনে রহিল না। তাহাদের হাসির গড়রা শুনিয়া কর্ত্রী ঠাকরুণ বারান্দা হইতে ঘরের ভিতর উঁকি মারিয়া দেখিলেন—বৌয়ের ভাই বোন আসিয়াছে। আস্তে আস্তে 'হুঁ' করিয়া চলিয়া গেলেন। চারু টগর একটু পরে তাঁহার কাছে আসিয়া যখন বলিল—"স্নেহকে লইতে আসিয়াছি"—তিনি বলিলেন "আজ এ বারবেলায় কি বৌ পাঠান হয় গা?"

চারু বলিল—"কেন বাবাকে ত তুমি কাল কথা দিয়েছ?" জ্যেঠাইমা হরিনামের মালা ঠক্‌ঠক্ করিয়া বলিলেন—"কাল আমার মনে ছিল না আজ কাল-মঙ্গলবার, তা একদিনে ত আর যুগ ওলটাবে না, আর এক দিন তখন যাবে।"

চারু রাগিয়া গেল—বলিল—"আর [illegible] যাই—আমাদের এ অপমান।" এক দিন জগৎ বাবুর মার খাইয়া সে যেমন [illegible]ান করিয়াছিল, আজও সেইরূপ অপমানিত জ্ঞানে সে মস্ত ফুলিয়া উঠিল। [illegible] সঙ্গে আর এক[illegible]র দেখা পর্য্যন্ত করিতে ভুলিয়া টপ্পরের হাত ধরিয়া মস মস ক[illegible]তে গিয়া উঠিল। [illegible] মোহনের সহিত তাহার দেখা হইল, তাহাদে[illegible] দেখিয়া মোহন থামাইতে বলিল। চারুর নিকট সমস্ত শুনিয়া মোহন বিশেষ দুঃখি[illegible] পড়িল—বলিল "চারু, জ্যেঠাই মা ত পাগল, কিছুই বোঝেন না তাঁহার কথায় [illegible]ও না, আমি পরে পাঠাইতে চেষ্টা করিব।"

চারু তাহার কথায় কিছু উত্তর করিল না—কেবল ছোট্ট মু[illegible] গোমশা করিয়া মস্ত লোকের চালে জোরে বলিল—"কোচমান [illegible]া"।

গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। মোহন বিরক্ত মনে বাহিরের ঘরে আসিয়া একটু বসিল। যখন সন্ধ্যা দীপ জ্বলিল, সন্ধ্যারতি বাজিল, সে আস্তে আস্তে স্নেহের ঘরে চলিল—মোহন জানিত সে সময় জ্যেঠাই মা ঠাকুর ঘরে থাকিবেন। স্নেহ তখন বিছানায় শুইয়া কাঁদিতেছিল, মোহন তাহার কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হইয়াছে?"

স্নেহের আজ লজ্জা করিবার কথা মনে নাই, সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমি বাড়ী যাব—বাড়ী যাব।" মোহন বলিল "আচ্ছা যাইও, আমি জ্যেঠাইমাকে বলিব।"

সে কাঁদিয়া বলিল "জ্যেঠাইমা শুনিবেন না—যাইতে দিবেন না।"

মোহন বলিল "যাহাতে শুনেন আমি সেইরূপ করিব—তুমি কেঁদ না।"

মোহন তাহার অশ্রু মুছাইতে লাগিল, তাহাকে পাখা করিতে লাগিল, শীঘ্র যাওয়া হইবে বলিয়া বার বার আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল।

যাহা হউক পরদিন সে স্কুলে যাইবার আগেই জ্যেঠাইমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

জ্যেঠাইমা তখন বিকালের কুটনা কুটিতেছিলেন, কুটিতে কুটিতে বলিলেন—"কি রে মোহন—এখানে যে?"

মোহন বলিল "এই জ্যেঠাইমা একবার দেখতে এলুম—আসতে নেই কি?"

জ্যেঠাইমা বলিলেন—"আসিস ত নে, এত দিন হাতে করে মানুষ করেছি—এখন ত কাছে ঘেঁসিস নে।"

মোহন বলিল "দরকার হলেই আসি।"

জ্যেঠাইমার হাত বঁটিতে রহিল—তিনি মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দরকার শুনি"

মোহনের আর কথা বাহির হইল না, যেন থতমত খাইয়া বলিল, "এই দেখা শুনার দরকার—তুমি ত ডাকনা জ্যেঠাই মা।"

জ্যেঠাইমা বলিলেন "ডাকতে কি পারি? তোরা বাড়ী ভিতরে দুদণ্ড বসলে তোর

বাবা রাগ করে। দেখলিত কিশো[illegible]—তোর বাবা রাগ করলে আমার উপর ? তা বস ঐ সিন্ধুকের উপর।”

মোহন বলিল—“না জ্যেঠাইমা [illegible]যাচ্ছি। কাল বিকালে আসব ছুটি আছে।” বলিয়া মোহন চলিয়া গেল, দেখিল [illegible] কথা বলা তাহার পক্ষে অসম্ভব। ভাবিল কাল আসিয়া বলিবে। পরদিন আসিয়া দেখিল—জ্যেঠাইমার মেজাজ বড় ভাল নাই।

মোহনকে দেখিয়া তিনি বলিলেন “[illegible] মোহন—এমনো মেয়ে ঘরে এনেছি, মুখে একবার হাসি দেখলুম না, কেবল যাব [illegible]”

মোহন সুবিধা পাইয়া বলিল, “জ্যেঠাইমা তা পাঠাওনা”—

জ্যেঠাইমা বলি[illegible]—“একেত স্বভাব, চরিত্রের শিরি ঐ, বৌ মানুষ একবার মাথায় কাপড় ওঠেনা (কাল তিনি মাথা খোলা [illegible]থেছিলেন) রোজ রোজ বাপের বাড়ী গেলে বেশ শিক্ষে হবে।”

মোহন বলিল—“ছেলে মানুষ, নিতে এলে পাঠালে না সেটা কি ভাল ?”

শ্বাশুড়ি বলিলেন—“বৌত নয় এ যে রাক্ষসী—তোকে শুদ্ধ যে যাদু করেছে, তাই বুঝি কাল সকালে এখানে এসেছিলি।”

মোহনের রাগ হইল—বলিল “হ্যাঁ জ্যেঠাইমা সেই জন্যই এসেছিলুম, তা সেটা ত আর দোষের কথা নয়।”

জ্যেঠাইমা বলিলেন—‘বটে এত দূর। ওমা আমি কোথায় যাব মা।”

দুই এক কথায় তাহাদের বেশ চলিল, কর্ত্রী ঠাকরুণ কাঁদিতে কাঁদিতে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন, দাসী চাকর যাহাকে সম্মুখে দেখিলেন—সবাইকে বলিলেন মোহন স্ত্রীর হইয়া তাঁহার সহিত ঝগড়া করিয়াছে। কিশোরী বাড়ী আসিতে তাহাকে ঐ কথা বলিলেন, ঠাকুরপোকে বাহির বাটী হইতে ডাকাইয়া ঐ কথা বলিলেন। কুঞ্জমোহন সব শুনিয়া বলিলেন—“বটে এর মধ্যে স্ত্রীর ভেড়া হইয়াছে! তা স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাইতে ইচ্ছা হয় পাঠাক—আর আনিতে না পাঠাইলেই হইল।”

এই অবিচারের কষ্টে মোহন নীরবে জ্বলিয়া উঠিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মোহন হিত করিতে গিয়া বিপরীত করিয়া বসিল। স্নেহলতার আর শীঘ্র জগৎ বাবুর বাড়ী যাইবার বড় আশা রহিল না। পিতার অবিচারে মোহন যত না কষ্ট পাইল, স্নেহের কষ্ট ভাবিয়া তাহার ততোধিক কষ্ট হইল।

আমাদের দেশে বধূদিগের কষ্টই বিখ্যাত, কিন্তু ইহাঁদিগের স্বামী বেচারাগণের কষ্ট ইহাঁদের অপেক্ষা কোন অংশেই ত ন্যূন মনে হয় না। স্ত্রীর প্রতি গুরুজনের অবিচার দেখিলে স্বামী যদিও লোকাচার ভয়ে, গুরুজন ভয়ে মুখে সাধারণতঃ স্ত্রীর

হইয়া কিছু বলিতে পারেন না, কিন্তু নীরবে এজন্য তিনি যথেষ্ট সহ্য করেন। বধূদিগের সহস্র দুঃখের মধ্যেও এই সান্ত্বনা আছে। কিন্তু স্বামীর একে উক্ত নীরব জ্বালা, তাহার উপর কোন দিক হইতেই প্রায় তাঁহার অদৃষ্টে সহানুভূতি নাই।—স্পষ্ট অস্পষ্টভাবে স্ত্রীর পক্ষ লইলে গুরুজনের লাঞ্ছনা, না লইলে স্ত্রীর অভিমান।

যেথানে অবস্থা অন্যরূপ, যেথানে স্বামী উপার্জ্জন করেন—স্ত্রী গৃহিণী, সেখানে স্ত্রীর কোন কষ্ট নাই। সংসার ক্ষমতার বশ, সুতরাং স্বামীর আত্মীয়বর্গ সেখানে তাঁহারই অধীন, তাঁহারই অনুগ্রহ ভাজন; এবং সাধারণতঃ সেখানে তিনিও এই ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু এস্থলেও স্বামীর অবস্থা সমানই শোচনীয়। স্ত্রী অন্যায় করিলে আত্মীয়দিগের নিকট তিনিই অপরাধী, স্ত্রীকে কিছু বলিলেও তিনি স্ত্রীর নিকট অপরাধী, উভয়দিক হইতেই তিনি পক্ষপাতী। এরূপ স্থলে স্বামীবেচারাগণ ঠিক যেন খেলিবার গোলা, নিজের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ অনধিকার, তাঁহার অস্তিত্ব কেবল পরের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইবার জন্য।

যাহা হউক এখানে আপাততঃ এতকথা অপ্রাসঙ্গিক, কেননা স্ত্রীর জন্য মোহনের সহ্য করিতে হইলেও স্ত্রীর অভিমান এখনো তাহার সহ্য করিতে হয় নাই।

যে দিন জেঠাইমার সহিত মোহনের বিবাদ হইল, সে রাত্রে সে যখন অন্তঃপুরে শুইতে গিয়াছিল—তখন স্নেহলতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং সেদিন শিবপুর যাইবার আগে আর তাহার সহিত কোন কথাই হইল না? সে কেবল শুইবার আগে বিছানায় বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নেহের সেই নিদ্রিত বিষণ্ণ বালিকা-মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল, তাহার পর সেই বিষণ্ণ বালিকা-মুখ চিন্তা করিতে করিতে শুইয়া পড়িল। রাত্রে তাহার ভাল ঘুম হইল না, মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নে চমকিয়া উঠিতে লাগিল, অবশেষে একেবারে যখন জাগিয়া উঠিল তখন প্রভাত হইয়াছে, কিন্তু তখনো চন্দ্র অস্তমিত হয় নাই, দেখিল উষার আলোক ক্ষীণ চন্দ্রালোকের সহিত মিশ্রিত হইয়া ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিতেছে এবং সেই রজত শুভ্র স্নিগ্ধ ভাতি স্নেহের সরল শুভ্র মুখে অতি মধুর সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়াছে। মোহন কাতর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অতৃপ্তচিত্তে সেখান হইতে চলিয়া গেল। সমস্ত পথ কেবল তাহার সেই বিষণ্ণ বালিকা-মুখ-কান্তি মনে পড়িতে লাগিল, সমস্ত জীবন তাহা তাহার স্মৃতি বিজড়িত হইয়াছিল, বিদেশে অপরিচিতের মধ্যে ঐ মুখ খানি চোখের সমুখে দেখিয়া সে একদিন জগৎ বিস্মৃত হইয়াছিল।

এ দিকে চাকর মুখে সব শুনিয়া জগৎ বাবুর বড় রাগ হইল। কিন্তু মেয়ে যার তার কি আর রাগ করা সাজে? কিল খাইয়াও তার কিল চুরি করিতে হয়! জগৎ বাবু কুঞ্জ বাবুর সহিত দেখা করিলেন, কিন্তু বিবাদের দিক দিয়াও গেলেন না, বলিলেন, "কিহে বেহাই, কাল স্নেহকে পাঠাইবে সব ঠিক ঠাক, মাঝে হইতে এ আবার কি?"

কুঞ্জ বাবু বলিলেন—"মেয়েদের ব্যাপার জানত! আমাদের ওতে কোন হাতই নেই। তা কিছু মনে কোরো না। জামাইষষ্টি ত শীঘ্র আসছে, তখন নিয়েগেলেই হবে। গিন্নি বড় রেগে আছেন, এ কটা দিন যাক।"

কুঞ্জ বাবু যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াকে এত সন্তুষ্ট করিয়া চলেন তাহার কারণ এই, তাঁহার অধিকৃত বিষয়ের এক তৃতীয়াংশ ইঁহার প্রাপ্য। ইনি রাগ করিয়া যদি স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন ত সে অংশ কুঞ্জ বাবুর হাত ছাড়া হইয়া যায়। জীবনের যার লোক বল অর্থ বল কিছুই নাই, তাই তাহাকে তিনি স্বচ্ছন্দে ফাঁকি দিতে পারিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে সে সম্ভাবনা নাই। ভ্রাতৃজায়া ঠাকরুণের আত্মীয়গণের এই বিষয়ের উপর প্রখর দৃষ্টি, তাঁহারা সর্ব্বদাই ইঁহাকে পিত্রালয়ে আসিয়া থাকিতে পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু কুঞ্জ বাবু ইঁহাকে এত দূর বশ করিয়া লইয়াছেন যে তাঁহার সংসার ফেলিয়া ইনি যাইতে পারেন না।

কুঞ্জ বাবুর গৃহে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর কিরূপ প্রাধান্য তাহা জগৎ বাবু জানিতেন, সুতরাং বুঝিলেন কর্ত্রীর বিনা মতে কিছুই হইবে না, তিনি ইহার পর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু কর্ত্রীঠাকরুণ আজ অটল, কিছুতেই তিন জামাইষষ্ঠির আগে বৌকে তাঁহার বাড়ী পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। কি করেন, স্নেহকে যতদূর পারেন বুঝাইয়া তিনি বাড়ী প্রত্যাগমন করিলেন।

বাড়ী আসিয়া গৃহিণীর নিকটও তাঁহার লাঞ্ছনার শেষ রহিল না। চারু টগর স্নেহকে আনিতে গেল, আর বেয়ান কি না মেয়ে পাঠাইল না! এতদূর অপমান! এ অপমান গৃহিণী জগৎ বাবুর ন্যায় প্রশান্ত ভাবে অবশ্য গ্রহণ করেন নাই, গৃহিণী দাসী পাঠাইয়া বেয়ানকে দু কথা শুনাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, 'আর কি—না হয় মেয়েকে আর না পাঠাইবে এই বইত নয়?'

জগৎ বাবু বলিলেন—"তাহা করিতে হইবে না, আমি নিজে গিয়া যা বলিবার বলিব। স্নেহকে লইয়াও আসিব।" কিন্তু জগৎ বাবু যখন মুখ চুন করিয়া একাকী ফিরিয়া আসিলেন, তখন গৃহিণীর মুখ বড় বাড়িয়া উঠিল। জগৎ বাবু উভয় সঙ্কটে পড়িলেন, আর স্নেহলতার দুর্দ্দশাও বাড়িল। চারু টগরের তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া একেবারে বারণ হইয়া গেল। অবশ্য জগৎ বাবু তাহাকে মাঝে মাঝে দেখিয়া আসিতেন, গৃহিণী তাহা নিবারণ করিতে পারিলেন না।

ইহার ১০।১৫ দিন পরে জামাইষষ্ঠির উৎসব আসিয়া পড়িল। আগের দিন জগৎ বাবু নিজে কুঞ্জ বাবুর নিকট গিয়া জামাতা কন্যাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। পরদিন দাস দাসীগণ তত্ত্ব লইয়া গেল। তত্ত্ব আসিতে দেখিয়াই জ্যেঠাইমা নাসিকা উত্তোলন করিলেন, একেই ত তাঁহার খুঁৎধরা স্বভাব, তাহার উপর স্নেহলতার সম্পর্ক যেখানে আছে—আজ কাল সেখানেই তাঁহার বিষদৃষ্টি। আর দেখিয়াই তাঁহার

মনে হইল তাহা বোম্বাই নয়, মিষ্টান্ন না দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন—তাহা নেহাৎ ওছা বাজারে। কাপড় জোড়ার প্রতি আড় নয়ানে দৃষ্টিপাত করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—এমন খেলো কাপড় তিনি জন্মে দেখেন নাই। এইরূপে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ ভাষ্যের টিপ্পনি প্রয়োগ করিয়া উপসংহারে বলিলেন—"এত অশ্রেদ্ধার তত্ত্ব করাই বা কেন? কেইবা হা প্রত্যাশ করে ছিল"!

গৃহিণীর দাসী কমলির আর সহ্য হইল না, গৃহিণী তাহাকে বলিয়াও ছিলেন—সুবিধা পাইলে যেন খাশুড়ি মাগীকে দু কথা বলিতে না ছাড়ে।

সে বলিল 'হায় হায় বাবু বেনা বনে মুক্তা ছড়িয়েছেন গো!"

আর কি রক্ষা আছে, খাশুড়ি জ্বলিয়া উঠিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন—"এ মাগী কি বলে? এ তত্ত্ব পাঠান—না অপমান করা? বের সর্ব্বনাশী তোদের তত্ত্ব নিয়ে যা"

কমলি এতদূর হইবে মনে করে নাই, সে থমকিয়া গেল, অন্য সকলেরি আত্মা-পুরুষ শুকাইয়া উঠিল।

হারার মা বলিল—"হ্যাঁইমা, বেয়ান ঠাকরুণ রক্ষা কর, ওর কথা কিছু মনে করোনা, ও একটা ক্ষ্যাপা। মাঠাকরুণ ত আর ও কথা বলতে বলেন নি।"

জ্যেঠাইমা বলিলেন—"বলতে বলেনি? সেই বলেছে, দাসীর নাকি অতবড় আস্পর্দ্ধা! তা মাঠাকরুণ তোদের তোদেরি আছেন, আমার তিনি কি করবেন? বের সর্ব্বনাশীরা বের।"

মহা গোল বাধিয়া গেল, দাসীরা অবাক হইয়া দাঁড়াইল, খাশুড়ি হন হন করিয়া খড় খড়ি ঘরে আসিয়া ঠাকুর পো পো করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, ঠাকুর পো সশঙ্কিত হইয়া উপস্থিত হইলেন, কর্ত্রী বলিলেন—"তোর সংসারে আর আমি থাকব না—বেয়াই বাড়ীর লোক এসে এরূপ অপমান করে।" তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে এমন দশখানা সাজাইয়া বলিলেন যে কুঞ্জ বাবুও নূতন কুটুম্বের বেয়াদবীতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, বেয়ান ঠাকরুণ যে তাহাদিগকে অপমান করিতেই দাসীদের শিক্ষিত করিয়া পাঠাইয়াছেন—তাহাতে তাঁহারো সন্দেহ রহিল না। তিনি বলিলেন "সওগাত ফেরত দাও। বেহাইকে আমি সমস্তই বলিয়া পাঠাইতেছি।"

তিনি পত্র লিখিতে বাহিরে গেলেন। জগৎ বাবুর দাস দাসীগণ সওগাত লইয়া চুনমুখে ফিরিয়া গেল, কর্ত্রী ঠাকরুণ কাতর হৃদয় রুদ্যমান স্নেহলতাকে সুতীব্র ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। "ঐ লক্ষীছাড়াই ত যত নষ্টের গোড়া, ঐ জঞ্জাল ঘরে এনেই ত ঘরে আগুন লাগলো," এই সময় পশ্চাৎ হইতে একজন বলিল—"জঞ্জাল রাখার আবশ্যক কি? উহাকে পাঠাইয়া দাও না?"

কর্ত্রী ফিরিয়া দেখিলেন—মোহন। এই মাত্র সে বাড়ীতে পা দিয়াছে। তাহার সাহসে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, স্ত্রীর হইয়া এরূপ স্পষ্ট কথা! বলিলেন "ও

বাবারে কোথায় যাব! এমন রাক্ষসীর হাতে ছেলেকে দিলুম! আমাদের খুড়ি জ্যেঠি বলে আর গ্রাহ্যিই নেই?"

তিনি মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে আর এক বার খড় খড়ি ঘরের দিকে ছুটিলেন। ইত্যবসরে মোহন স্নেহলতাকে গিয়া বলিল—"এস পাল্কীতে এস, তোমার জন্য নীচে পালকী ঠিক রাখিয়া আসিয়াছি।" মোহন বাড়ী ঢুকিবার সময় পালকী বেহারাদের চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাহাদের বসিতে বলিয়াছিল। ভিতরে যে কি ব্যাপার হইয়াছে সে তখনো জানিত না, ভাবিয়াছিল "কোন গতিকে জ্যেঠাইমাকে প্রসন্ন করিয়া দেখি যদি স্নেহকে পাঠাইতে পারি।"

কিন্তু তাহা পারিল না, তাঁহাকে অপ্রসন্ন করিয়াই পাঠাইতে উদ্যত হইল। স্নেহলতা যদি জানিত সে চলিয়া গেলে মোহনের কিরূপ সহ্য করিতে হইবে, তাহা হইলে তাহার পদ সেই গৃহেই আবদ্ধ থাকিয়া যাইত, কিন্তু স্নেহলতা বালিকা, স্বামীর কথায় তাহার নিজের সুখ-রাজ্য সে কেবল উদ্ঘাটিত দেখিল, স্বামীর স্নেহ সে পূর্ণ উচ্ছ্বাসভরে গ্রহণ করিল, সে তাহার সঙ্গে পাল্কীতে গিয়া উঠিল, ইহার পরিণাম আর সে দেখিল না।

যখন স্নেহলতা চলিয়া গেল তখন কুঞ্জ বাবু কি জ্যেঠাইমা তাহা জানিতে পারিলেন না। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন—তখন তাঁহারা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন। জ্যেঠাইমা স্নেহলতার উপর গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন; কুঞ্জবাবু মোহনকে জানাইয়া দিলেন—"তাঁহার বাড়ীতে আর তাহার স্থান নাই। তাঁহার উপর সে যেন কোন প্রত্যাশা না রাখে! সে তাঁহার পুত্র নহে, সে কুলাঙ্গার।"

মোহন সেদিন জগৎ বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়া জগৎ বাবুকে সমস্তই বলিল। জগৎ বাবু শুনিয়া নিতান্তই দুঃখিত হইলেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে শিবপুরের ব্যয় লইবার জন্য মোহনকে অনুরোধ করিলেন। শ্বশুরের নিকট হইতে সাহায্য লইতে তাহার লজ্জা বোধ হইল, কিন্তু অন্য উপায় নাই, ঋণ স্বরূপ তাহা লইতে সম্মত হইয়া সে তখন আর এক প্রস্তাব করিল। বলিল—"শিবপুরে পাঁচ বৎসর না পড়িয়া এঞ্জিনিয়ার হওয়া যায় না, কিন্তু লুড়কিতে তিন বৎসরেই শেষ পরীক্ষা, সুতরাং তাহার এখনকার অবস্থায় লুড়কিতে যাওয়াই ভাল। দেড় বৎসর আগে, তাহা হইলে সে উপার্জ্জন সক্ষম হইবে।" জগৎ বাবুও ইহা যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করিলেন। তাহাই স্থির হইল, এক হপ্তার মধ্যেই মোহন কলিকাতা ত্যাগ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

এ সংসারে কাহার জীবনের সহিত কাহার সম্পর্ক কিছুই বোঝা যায় না। পিতা-পুত্রে বিবাদ হইল, মোহন কুঞ্জ বাবুর অবাধ্য হইয়া স্বাধীন ভাবে লুড়কিতে চলিয়া গেল—ইহার ফলভোগ করিতে হইল—জীবনের মার।

পিতার সাহায্যে বঞ্চিত হইয়াও যে মোহনের কিছু ক্ষতি হইল না—উপায়হীন দীনহীন ভাবে তাহাকে যে পুনর্ব্বার তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইতে হইল না—এই জন্যই আরো বিশেষরূপে কুঞ্জ বাবু তাহার প্রতি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাহায্যকারীগণের প্রতি মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইলেন। জ্যেঠাইমাও রাগ করিতে কিছু কম করিলেন না—কিন্তু তাঁহার রাগ মোহনের উপর তত নহে যত স্নেহলতা এবং তাহার দলবলের উপর। "সেই সর্ব্বনাশী হইতেই এমনটা ঘটিল—সংসার ছারখারে গেল!"

সৌভাগ্যবশতঃ স্নেহলতা এবং মোহন এখন তাঁহাদের আয়ত্তের বাহিরে—তাই এই ক্রোধের দংশন জ্বালা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইল না, কিন্তু সেই জন্যই—যাহারা এই ক্রোধ গ্রাসের মধ্যে পড়িল—তাহাদের বড় বেশী রকম সহ্য করিতে হইল। ক্রুদ্ধ সর্প পাত্রাপাত্র মানে না যাহারা সৌভাগ্যবান, তাহারা এড়াইয়া যায়—যাহারা দুর্ভাগা, তাহারা সম্মুখে পড়ে। অন্য কাহারো কিছু করিতে না পারিয়া—কুঞ্জ বাবু এবং তাঁহার ভ্রাতৃজায়া অবশেষে আপনাদিগের সংযুক্ত-ক্রোধ-বজ্র নিরীহ জীবনের মার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন,—তাঁহার অপরাধ তিনিই স্নেহলতার সহিত প্রথমে মোহনের বিবাহ প্রস্তাব করেন।

যখন জগদম্বা দেবী শুনিলেন মোহনকে জগৎ বাবু লুড়কী পাঠাইয়াছেন, তখন সত্যই তিনি জগদম্বার মত সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড জিহ্বা অবিরল বেগে মোহনের বন্ধুবর্গের (তাঁহার বিবেচনায় বৈরীবর্গের) মুণ্ডনিপাতনে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাঁহার দুইভুজা দশভুজা আকারে সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে লাগিল। এরূপ সময়ে দাস দাসীদিগের বড়ই আমোদ, তাহারা তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া নানারূপ অভিনন্দন ও অনুমোদন বাক্য বর্ষণে তাঁহাকে দ্বিগুণ উত্তেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

সে দিন একাদশী, কর্ত্রীর আহারের বালাই নাই, সুতরাং তিনি হরিনামের মালা হাতে করিয়া সমস্ত দিনটা নির্ব্বিঘ্নে মনের সাধে এইরূপে পরের স্বর্গারোহণ ও সদ্গতি কামনায় যাপন করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার পরোপকারী প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ প্রশমিত না হওয়ায় বিকালে প্রিয়দাসী ক্ষেমঙ্করীকে ডাকিয়া বলিলেন—"ক্ষেমি তুই একবার পোড়ারমুখোটার বাড়ী যেতে পারিস, একবার ভাল করে দু কথা না শোনালে আমার মন যে ঠাণ্ডা হচ্ছে না?"

ক্ষেমি বলিল—"ডাক্তার বাবুর বাড়ী! না বাবু তা আমি পারব না, পরের বাড়ী—আমাকে যদি ঝাঁটা মেরে তাড়িয়েই দিলে—তখন মুখখানা কোথায় থাকবে"?

জগদম্বা বুঝিলেন—ঠিক কথা, বলিলেন—"তবে একবার জীবনের মার বাড়ী যা, তাত পারবি! আমার নাম করে এই কথা গুলো একবার ভাল করে শুনিয়ে দিয়ে আয়, দেখিস একটা কথা কমিয়ে জমিয়ে বলিসনে।"

জীবনের মাকে গালি দিতে যাইতে ক্ষেমি কোন আপত্তি দেখিল না, জোর করিয়া বলিল—"হুঁ্যা তা আর পারব না—আমাকে আবার শেখাতে হয় গা? ধুড়ধুড়ি নেড়ে দিয়ে আসব। এই আমি চল্লুন।"

ক্ষেমি চলিয়া গেল—একটু পরে কর্ত্তা ঠাকরুণ হাঁকিলেন—"ও ক্ষেমি ক্ষেমি গেলি কি? ক্ষেমি নীচে হইতে উত্তর করিল "না এখনো যাইনি—এই বাসন কখানা ধুয়ে যাব"।

কর্ত্রী ঠাকরুণ বলিলেন—"তোর আর গিয়ে কাজ নেই—একখানা পাল্কী ডাক আমিই যাই। সে কিতম্নি হতভাগীর বুকের পাটা কতখানি একবার দেখে আসি।"

ক্ষেমির জিহ্বা শক্তির প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস সত্বেও বর্ত্তমান স্থলে তিনি তাহার উপর নির্ভর করিতে পারিলেন না,—একাদশীর উপবাস—এবং সমস্ত দিনের চীৎকার ক্লান্তি ভুলিয়াও অবশেষে স্বয়ং জীবনের মার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে বাক্যবাণে বিঁধাইয়া, কাঁদাইয়া, জর্জ্জর আকুল করিয়া তুলিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

কর্ত্রী ঠাকরুণত এইরূপে জীবনের মাকে মুখের কথায় প্রতিশোধ প্রদান করিলেন, কিন্তু কর্ত্তা বাবুর প্রতিশোধ ফাঁকা কথার গর্জ্জন নহে। ইহার পর নিয়মিত সময়ে যে দিন জীবনের ভৃত্য কুঞ্জবাবুর নিকট মাসহারা চাহিতে গেল; সে দিন সে শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"মা মাসহারা বন্ধ"।

এ দিকে সেদিন বিকালে জীবন বিএ পাশের খবর লইয়া বড় আহ্লাদে বাড়ী ফিরিতেছিল। ইহার মধ্যেই মনে মনে সে নবজীবন আরম্ভ করিয়া ফেলিয়াছে। জীবন প্লীডার হইতে চায়, এজন্য এখনো তিন বৎসর তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু আশার দৃষ্টিতে, কল্পনার স্বপ্নে কালের ব্যবধান সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার চোখে বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ আপাততঃ এক হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার বিস্তৃত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ব্যতীত সে এখন আর কিছুই দেখিতেছিল না।

পাঠক হাসিও না—যৌবনের উৎসাহে, জীবনের আরম্ভে আপনার প্রতি কাহার না অসীম বিশ্বাস? আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে কে তখন সন্দেহ মাত্র করে?

এখন জীবন একজন প্রতিষ্ঠালব্ধ প্লীডার, সম্মুখে তাহার অতুল যশ, অতুল ঐশ্বর্য্য। কিন্তু এ যশ এ ঐশ্বর্য্য তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র; অদূরে ঐ ইংলণ্ডের কামভূমি বিদ্যমান, জীবন তাহাতে পদার্পণের সুখ অনুভব করিতেছিল। এইরূপ হৃদয় ভরা আশা আনন্দ কল্পনা স্বপ্ন লইয়া জীবন দ্রুতপদে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। বাড়ীর সদরে ভৃত্যকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মা কোথা?"

"ভৃত্য বলিল উপরে?"

কিন্তু জীবনের উপরে উঠিবার সবুর সহিল না, নীচে হইতেই মা মা করিয়া ডাকিতে ডাকিতে লম্ফে লম্ফে সোপানাবলী উত্তরণ করিয়া বারান্দায় আসিয়া পড়িল। জীবনের মা তাহার অপেক্ষায় প্রতিদিন যেমন এ সময় বারান্দায় বসিয়া থাকিতেন, আজও সেইরূপ ছিলেন। কিন্তু অন্যদিনের মত হাসিয়া তিনি জীবনকে আদর করিয়া লইলেন না—তাহার নয়নে অশ্রু, মূর্ত্তি বিষণ্ণ গম্ভীর। তাহাকে দেখিয়া জীবনের মুখের কথা মুখে রহিয়া গেল। সে মায়ের পাশে আসিয়া বসিয়া বলিল—মা কি হয়েছে? আবার কি জ্যেঠাই মা এসে ঝগড়া করে গেছেন?" জীবনের মা বলিলেন—"না বাবা। তোমার কাকা আমাদের মাসহারা বন্ধ করেছেন। কিকরে বা দাসী চাকরদের মাইনে দিই—আর ডাল চাল আনাই। আর সব ত গেছে, কর্ত্তার যে ঘড়ি চেনটা তোর জন্য রেখেছিলুম, বাঁধা দিতে পাঠিয়েছি।"

কঠোর বজ্রশব্দে জীবন তাহার সুখস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। জীবনের মা অশ্রু মুছিয়া বলিলেন—"বাছা সংসারে অনেক দুঃখ সয়েছি। ভেবেছিলুম তোকে সেসব কিছু জানতে দেবনা, ঠাকুর পো তাও দিলে না।"

জীবন কিছু উত্তর করিল না, উপরের সুবিস্তৃত আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। অপরাহ্ণ অবসান প্রায়, মেঘের নানাবর্ণ-বিন্যাস মিলাইয়া গিয়াছে। গগণতল এখন অতি ম্লান নীল শুভ্র। চক্রবাক পক্ষীর দীর্ঘ শ্রেণী সেই স্নিগ্ধ ম্লান গগণ খণ্ড অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল, দুইখানি ঘুড়ি অবিশ্রান্ত বেগে উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে হঠাৎ নামিয়া পড়িল। জীবনের আশা কল্পনারও বুঝি এই পরিণাম! জীবন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া মাতার দিকে চাহিল। আকাশের ম্লানবর্ণ মাতা পুত্রের মুখে পড়িয়া তাহাদের বিষণ্ণ মুখ কি দারুণ ম্লান করিয়া তুলিয়াছিল। জীবনের সেই ম্লান মুখ দেখিয়া মাতার বুক ফাটিয়া উঠিল। তিনি চক্ষু নত করিয়া অশ্রু মুছিতে লাগিলেন। জীবন সংযত হইয়া ধীরে ধীরে বলিল—"মা আমি পাশ হয়েছি—৩০ টাকা জলপানী পাব—তাতে চলবে না?"

জীবনের মা সেই কথায় হঠাৎ যেন অকূল সাগরে কূল দেখিতে পাইলেন, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "হরি দয়াময়—তুমি আছ ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তুমি থাকিতে কে আমাদের অকূলে ভাসায়?"

মাতাকে আশাযুক্ত দেখিয়া জীবনও আশ্বস্ত হইল। প্রথম আবেগ শমিত হইলে কিছু পরে জীবনের মা আবার বলিলেন "৩০ টাকায় দৈনিক বাজার খরচটা আমাদের চলে যাবে। কিন্তু আরো ত অন্য খরচ আছে। বামুনঠাকুরুণকে জবাব দিয়ে আমি নিজে রাঁধব, দুটো চাকর দাসীও জবাব দেব। কিন্তু বাজার হাট আছে, ঘরের করনা আছে—একটা দাসী একটা চাকর ত চাই। তা ছাড়া তোরও ত আর তিন বছর পড়া বাকি। সে খরচ—"

জীবন বলিল—"মা তুমি ভেবোনা, আমি চাকরী করব। এত পাশ হয়েছি—একটা চাকরী সহজেই মিলবে।"

ছেলের আইন পড়ার কত সাধ তাহা জীবনের মা জানেন সুতরাং এই কথায় তাঁহার বড় দুঃখ হইল—

বলিলেন "চাকরী করতে করতে কি পড়া যায় ?"

সে বলিল "তা যায়।"

মা বলিলেন "কিন্তু চাকরীও ত মেলা সহজ নয়—মুরুব্বি চাই।"

আমার মামাত ভাই চারটে পাশ দিয়েছে, কিন্তু তার মুরুব্বি নেই, এত দিন চেষ্টা বেষ্টা করে ৩০ টাকার এক মাষ্টারি মিলেছে। তা আমাদের মুরুব্বিই বা কে ? এক জগৎ বাবু—যদি তিনি কিছু উপায় করেন।"

জীবন স্বভাবতঃ আশ্বস্ত হৃদয়, মাতার কথায় সে নিরাশ হইল না, চাকরী করিতে ইচ্ছা করিলে যে সহজে চাকরী মিলিবে না—ইহা তাহার মনেই হইল না, সে বলিল "আচ্ছা জগৎ বাবুকে ত প্রথমে বলিয়া দেখা যাক্—না হয় পরে অন্য চেষ্টা দেখা যাইবে ?" তাহাই স্থির হইল, পরদিন মাতা পুত্রে জগৎ বাবুর বাড়ী আগমন করিলেন।

প্রেম

সই পিরীতি পরাণ চাহে,
কত জন্ম ঘুরে, কোন্ সুর পুরে
না জানি মিলিবে কাহে ?
সই, দরশ পরশ, সুখে যার আশ,
পিরীতি না তারে চিনে,
হায় ! নয়নে নয়ন মিলাইতে জন,
না জানি আকুল কেনে ?
সই, হিয়ার মাঝারে অলখিতে তারে,
আসে যায় প্রেম কথা,
তবু, না হেরিলে চিত, নহে তিরপিত,
ভাবিতে লাগয়ে ব্যথা,
জানি মধু নিশি, পরকাশি শশী,
পাতিলে রূপের ফাঁদে,
পাইতে তাহারে পরাণ কাতরে
মাধুরী জড়িত সাধে।
তবু প্রেমগুণ হেন সুনিপুণ
বিধাতার নিরমাণ,
হৃদে উপজিয়া, হৃদে পশে গিয়া,
সুদূরে জুড়ায় প্রাণ!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

ভাদ্রমাসের ভরাগঙ্গা।

ভাগীরথী কুলুকুলু কুলুকুলু চিরদিন যেমন আজও সেইরূপ আপনার মনে সুখ দুঃখের গান গাহিয়া বাহিয়া চলিয়াছে। দুই পার্শ্বে তটভূমি স্নিগ্ধ শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত; তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া কূলে লুটাইয়া পড়িতেছে, তৃণ-শয্যার উপর দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে। কূলে কূলে বট অশ্বত্থ আম্র বৃক্ষ স্তবকে স্তবকে সজ্জিত, তাহাদের মাথার উপর দিয়া দিশাহারা নীলাকাশ গড়াইয়া গিয়াছে। নিম্নে জাহ্নবী-প্রবাহ, ঊর্দ্ধে নীলিমা প্রবাহ। এই দুই প্রবাহের সন্ধিস্থলে প্রভাতে প্রদোষে কোকিল ডাকিয়া যায়, পাপিয়া গাহিয়া যায়; দুই প্রবাহেরও যেমন অন্ত নাই, কোকিল পাপিয়ার সুরেরও অন্ত নাই।

এই অনন্তভাবময় গঙ্গাতীরে দীর্ঘ বর্ষার পর নীরবে ভাদ্র আসিয়া দাঁড়াইল। অধীর আনন্দে তরঙ্গিণীর হৃদয় উথলিয়া উঠিয়াছে—তরঙ্গিণী পূর্ণতোয়া। চঞ্চল কল্লোল-প্রবাহ ভাদ্র-চরণস্পর্শে আরও চঞ্চল। সে মৃদু কুলুকুলু ধ্বনির আর বিরাম নাই। পূর্ণ-যৌবনার পূর্ণ রূপরাশি কি স্থির থাকিতে পারে? সৌন্দর্য্যের তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া নামিয়া সে আবেগময় রূপরাশি গভীর সাগর-হৃদয়ে মিশিতে ছুটিয়াছে। প্রেম উচ্ছ্বসিয়া উঠে, বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, আনন্দ আপনাকে আপনি ধরে না।

ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গা কূলে কূলে টলমল। আকাশে মেঘ আসিয়া সূর্য্যালোক আড়াল করে,- ভরা গঙ্গায় ছায়া আলোক পাশাপাশি বহিয়া যায়। উজ্জ্বল আলোক বক্ষের উপর দিয়া মৃদু মলয়ানিলের মত কাল ছায়া ছুঁইয়া যায়, চঞ্চল আলোক-হৃদয় নীরবে ঈষৎ যেন শিহরিয়া উঠে। এই তরঙ্গভঙ্গিমান্ ছায়ালোকবৈচিত্র্যের কূলে দাঁড়াইয়া ভাদ্র—ছায়ালোকময়, মেঘ-রৌদ্রময়, গম্ভীর। ভাদ্রের আগমনে গঙ্গাও বড় গম্ভীর; এত চাঞ্চল্য, এত আবেগ, কিন্তু গাম্ভীর্য্যের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। গাম্ভীর্য্য কাণায় কাণায়।

পূর্ণিমা নিশায় জ্যোৎস্নালোকে ভাগীরথী ঝিকিমিকি খেলা করে। নভোমণ্ডলে শরচ্চন্দ্র কলায় কলায় পূর্ণ, জাহ্নবীও ধরিত্রীর কোলে কোলে পূর্ণ। বেলা ভূমিতে গুচ্ছে গুচ্ছে সজ্জিত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে—শ্যামল-শাখা-পল্লব-ফল-পুষ্প-তরঙ্গে পূর্ণিমার রজত-প্রবাহ বহিয়া যায়। সে তরঙ্গায়িত সৌন্দর্য্য-প্রবাহেও কেমন পূর্ণ ভাব। রজত ধারা যেন শাখায় শাখায় কম্পিত হইয়া তীরদেশ হইতে জাহ্নবী-হৃদয়ে গিয়া মিশিয়াছে। সৌন্দর্য্যে সৌন্দর্য্য উথলিয়া উঠে। ভরা ভাদ্রের সৌন্দর্য্য ভরপূর।

অন্ধকার রজনীতে এ সৌন্দর্য্য-সম্মিলন তেমন উপভোগ করা যায় না, কিন্তু ভরা-ভাদ্রের গাম্ভীর্য্য তখন পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সে এক শ্মশান-গাম্ভীর্য্য; ভাগীরথীকূলে শ্মশানক্ষেত্রে বসিয়াই তাহা উপভোগ করিতে হয়। অন্ধকারের মধ্যেও কেমন যেন পূর্ণতা বিরাজমান। ধরণীর গায়ে গায়ে নদী, তাহার উপর পুঞ্জীভূত অন্ধকার ঝুঁকিয়া

পড়িয়াছে; পূর্ণ অন্ধকারে পূর্ণ তরঙ্গিণী-হৃদয়ে আলিঙ্গন। আর গভীর নিশাথে ভাগীরথী কূলে কূলে কুলুকুলু।

বাসন্তী নদী চুপি চুপি সৈকতদেশ চুম্বন করিয়া বহিয়া যায়। ভাদ্রমাসে ত আর সে গঙ্গা নাই। গঙ্গা সমস্ত হৃদয় দিয়া ধরণীকে আপনার মধ্যে অনুভব করিতে চায়। দুর্দ্দম্য অধীর আবেগে হৃদয় তোলপাড়। রুদ্ধ বাসনা আপনার সহিত সংগ্রাম করিয়া বাহির হইবে। গঙ্গাহৃদয় আজ যৌবন-প্লাবিত। আপনার যৌবনে সে ধরণীকে আচ্ছন্ন করিতে চাহে! তবেই যেন তাহার সাগর-সঙ্গম পূর্ণ হয়।

চির-কল্লোলময়ীর কল্লোল-তান আজ যেন কিছু স্বতন্ত্র। ঐ কল্লোল-কাহিনী শুনিতে প্রতিদিন উষা আসিয়া তাহার তীরে ফুল ছড়াইয়া যায়, সন্ধ্যা আসিয়া সেই কুসুম শয্যার উপরে ম্লান মুখখানি নত করিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু গঙ্গে! আজ এ কল্লোলে কি গান গাহিতেছ যে, উষার চিরবিকশিত রুচি মুখখানিতেও সন্ধ্যার গম্ভীর ছায়া ফুটিয়াছে, সন্ধ্যা আজ আরও সন্ধ্যাময়ী? সন্ধ্যা প্রতিদিনই নিবিষ্ট-চিত্তে বসিয়া থাকে, আজ তাহার চিত্ত আরও নিবিষ্ট। আজ আর সে ভাগীরথী-তীর ছাড়িতে চাহে না। উষা আজ আর ফুল ছড়াইতে পারিল না, তাহার আঁচল হইতে অজ্ঞাতসারে ফুলগুলি টুপ্‌টাপ্ ঝরিয়া পড়িল। গঙ্গে, এ কল্লোলে কি রাগিণী গাহ?

যে রাগিণীই হোক, এ গান বড় মধুর। এ গান শুনিয়া যে কাঁদিতে জানে কাঁদে, যে কাঁদিতে না পারে হাসিয়া যায়। আইনবদ্ধ কণ্ঠ-ধ্বনির মত পদে পদে ইহার সঙ্কোচ নাই। কুলু কুলু কুলু কুলু স্বাভাবিক স্বরে স্বাভাবিক ভাবে এ গান সেই অনন্ত সাগরাভিমুখে বহিয়া চলিয়াছে—দিন নাই, রাত নাই, অবিরল মৃদু মৃদু তান।

সময় সময় গঙ্গা-হৃদয় এমন স্থির যে, একটী তরঙ্গ উঠে না, স্তিমিত পবনে চিরপ্রবহমান তরল স্রোতমাত্র বহিয়া যায়। দূরে দূরে নিস্তরঙ্গ নদী-হৃদয়ে বৃন্তচ্যুত শতবর্ণের ফুল প্রবল স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে কুসুমশ্রেণী বিন্দুপুঞ্জবৎ—ধরণী পূর্ণ-যৌবনার কণ্ঠে যেন মালা পরাইয়া দিয়াছেন, সে অনুপম যৌবন-লাবণ্যের নিকট সে মালা ক্ষীণ দীপ্তি।

সহসা আবার নদী যখন উছলিয়া উঠে, কুসুমগুলি তরঙ্গে তরঙ্গে ব্যথিত হইতে থাকে। যৌবনোচ্ছ্বাসে মালা যেন ছিঁড়িয়া যায়। তড়িৎ প্রবাহে হৃদয় পূর্ণানন্দে কলকল গাহিয়া উঠে।

এইরূপে অধীর চাঞ্চল্য, আনন্দ, উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়া ভাদ্র ধীরে ধীরে সরিয়া যায়। বেলা ভূমিতে মধ্যে মধ্যে কেবল তাহার নিঃশব্দ পদ-চিহ্নগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে। কালে কালে তাহাও মুছিয়া আসে। কৃশাঙ্গী জাহ্নবী ধরণীর কোল হইতে চরণে গিয়া দাঁড়ায়—চরণ ধৌত করিয়া প্রতিদিন ম্লান মুখে বহিয়া যায়।

আধুনিক মত ও চিন্তা।

মানসিক উন্নতির নিয়ম।

হর্বর্ট্ স্পেন্সর বলেন যে চিত্তবৃত্তির প্রাতিভাতিকতা অর্থাৎ পরোক্ষতা (representativeness) যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণেই মানসিক উন্নতি প্রকাশ পায়। সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-বোধ-সমূহ যখন প্রাতিভাতিক আকারে পরিণত হয়, তখনই আমাদের বস্তুজ্ঞান জন্মে—আবার বস্তুজ্ঞান-সমূহ প্রাতিভাতিক আকার ধারণ করিয়া সহজ যুক্তির পত্তন ভূমি হয়—আবার সহজ যুক্তির সিদ্ধান্ত-সমূহ প্রাতিভাতিক আকারে পরিণত হইয়া জটিলতর যুক্তির অবলম্বন হয়। এই প্রকারে সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় বোধের দূরত্ব অনুসারেই মানসিক উন্নতির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়।

শিশু, অসভ্য ও সভ্য মানবের চিত্তবৃত্তির উদ্যম ও উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। কোলের শিশু যাহা সামনে পায় তাহাই মুখের ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া দেয়—ইহাতে প্রকাশ পায়, তাহার অন্তঃকরণে সাক্ষাৎ অনুভূতিরই প্রাধান্য। যে শিশু আর একটু বড় হইয়াছে, সে খেলনা-সকল টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দেখে—তাসের ঘর নির্ম্মাণ করে, পুষ্প চয়ন করিয়া একত্র জড় করে—ইহাতে তাহার প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বৃত্তির সমধিক পরিচালনা দেখা যায়—সাক্ষাৎ অনুভূতি-সমূহ প্রাতিভাতিক অনুভূতির সহযোগে সে চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তুর গুণ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়। বিশেষতঃ যখন সে ঘর-কন্নার নকল করিয়া পুতুল লইয়া খেলা করে, তখন এই প্রাতিভাতিক অনুভূতির আরও জাজ্বল্যমান প্রকাশ দেখা যায়—বালক ও অসভ্য মনুষ্যের প্রাতিভাতিকতা ইহা অপেক্ষাও অধিক মাত্রায় প্রকাশ পায়। কিন্তু সে প্রাতিভাতিকতা তাহাদিগের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা সকলকে ছাড়াইয়া উঠে না। দুঃসাহসিক কার্য্য, বাহুবল ও নিপুণতা লইয়া রেষারিষি এই সমস্তই অসভ্য মানবের কথোপকথনের বিষয়—ও যুবকবৃন্দের আষমানী কল্পনার খোরাক।

এই সকল প্রতিভাতি কেবল ব্যক্তি বিশেষের কার্য্য কলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেবল সভ্য সমাজের মানবগণকে পরিপক্ক বয়সে প্রাতিভাতিক অবস্থা হইতে প্রাতি-প্রতিভাতিক অবস্থার উচ্চ উচ্চতর সোপানে ক্রমশঃ আরোহণ করিতে দেখা যায়—তাহারা বিশেষ বিশেষ মানবিক ক্রিয়া-পদ্ধতি সমূহকে সাধারণ নিয়মের মধ্যে ভুক্ত করিতে চেষ্টা করে। ক্রমে মানব যখন জ্ঞান উদ্যমের উন্নত আদর্শে উপনীত হয়, তখন তাহাকে উচ্চতম প্রাতিভাতিক চিন্তায় নিয়ত মগ্ন দেখা যায়। তাহার দৃষ্টান্ত মনে কর কোন্ সভ্য দেশের রাজ-মন্ত্রী। কোন সরকারি-পত্রের প্রত্যুত্তর প্রদানে,

কত অসংখ্য লোকের স্বার্থ ও অলক্ষিত প্রভাব তাঁহার কল্পনা পটে জাগরূক হয়; কোন আইনের পাণ্ডুলিপি করিবার সময় দলাদলির সমন্বয়, সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মতামত, সংবাদ পত্রের সমালোচনা, কতদিকের কত চিন্তা তাঁর মনে প্রতিভাত হয়। এবং সেই আইনের সমর্থন করিয়া যখন তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে হয়, তখন পক্ষের বিপক্ষের ভাল মন্দ সুবিধা অসুবিধা কত কি তাঁহাকে প্রদর্শন করিতে হয়। এই সমস্ত তাঁহার বহুদর্শন-সমষ্টির প্রাতিপ্রতিভাতিক পরিণাম।

জ্ঞানের বিষয় যেরূপ দেখা গেল, অনুভূতি বিষয়েও সেইরূপ লক্ষিত হয়।

শিশুর চিত্তে ঐন্দ্রিয়ক সুখ দুঃখ সহকারে আনন্দ ক্রোধ ভয় প্রভৃতির অস্পষ্ট ভাবের সঞ্চার হয়। এই সকল ভাব দৈহিক অনুভূতির সাক্ষাৎ প্রতিভাতি মাত্র—তাহার উর্দ্ধে বড় উত্থিত হয় না। এবং এই সকল ভাব নিম্ন-শ্রেণীর জীবদিগের মধ্যেও দেখা যায়। ক্ষুদ্র বালকের চিত্তে আর একটু জটিলতর ভাবের প্রকাশ দেখা যায়—প্রশংসা-লাভের ইচ্ছা, অধিকার-বাসনা প্রভৃতি প্রবৃত্তি সকল এই বয়সে সক্রিয় হইয়া উঠে। এই সকল প্রবৃত্তি প্রাতিপ্রতিভাতিক শ্রেণীর অন্তর্ভূত। ইহার পর, যাহাতে সহানুভূতির সংস্রব আছে—এইরূপ উচ্চতর প্রবৃত্তি সকলের অভ্যুদয় দেখা যায়। অন্যের শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টি, যাহা অল্প বয়সে বড় দেখা যায় না, তাহা একটু অধিক বয়সে প্রকাশ পায়। নিম্ন-শ্রেণীর মনুষ্য প্রাতিভাতিকতার নিম্ন ধাপের মধ্যেই বরাবর থাকিয়া যায়। ন্যায়পরতার অঙ্কুরমাত্র হয় তো দেখা যায়, তাহার প্রাতিপ্রতিভাতিক অনুভাব তাহার উর্দ্ধে বড় উঠিতে দেখা যায় না। কিন্তু সভ্য মনুষ্যের মধ্যে—অন্ততঃ উচ্চ আদর্শের সভ্য মনুষ্যের মধ্যে জনহিতৈষিতা তো একটি প্রধান লক্ষণ, এমন কি সাধারণের হিতের জন্য কখন কখন তাহাদিগকে আত্মহিত বিসর্জ্জন করিতে দেখা যায়। এই সব স্থলে অত্যুন্নত প্রাতিপ্রতিভাতিক চিন্তাসমূহ অত্যুন্নত প্রাতিপ্রতিভাতিক ভাব-সমূহের প্রসবিতা। চতুষ্পার্শ্বস্থ সামান্য বস্তু ইতর লোকদিগকে আকর্ষণ করে, কিন্তু যাঁহারা জ্ঞান-ভাবে সমুন্নত তাঁহারা সে সমস্ত তুচ্ছ করিয়া এরূপ বৃহৎ কল্পনাকে মনে স্থান দেন যাহাতে প্রাতিপ্রতিভাতিকতা চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়। মানব সমাজের উন্নতি সহকারে যে পরিমাণে জৈবনিক কার্য্য কলাপের বহুলতা ও বিচিত্রতা সাধিত হয়, অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে মনের প্রাতিভাতিক শক্তিরও বৃদ্ধি হয় এবং প্রাতিভাতিক শক্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, মানব-সমাজেরও উন্নতি সেই পরিমাণে সাধিত হয়। উভয়ই পরস্পর সাপেক্ষ। প্রাতিভাতিকশক্তির ন্যূনতা হইলে দীর্ঘ কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা লক্ষ্য হয় না। যখন কোন জাতির মধ্যে সমাজ বন্ধনের পূর্ণতা হইয়াছে, বহুকালপ্রগ্রাহী ব্যক্তি-বিশেষ-সমূহের পরীক্ষিত জ্ঞানের ফল প্রথাকারে পরিণত হইয়াছে, যুগযুগান্তর-প্রবাহিত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ হইয়া তাহাদের মধ্যে হইতে পূর্ব্বাপরবর্ত্তিতা-যোগ উদ্ভাবনের সুবিধা হইয়াছে;

তখনই সুদীর্ঘ কার্য্যকারণশৃঙ্খলা সামাজিক প্রাকৃতিক ও জৈবনিক কার্য্যে পরিলক্ষিত হইতে পারে। প্রাতিভাতিক শক্তির সমধিক উন্নতি না হইলে এরূপ কখনই ঘটিতে পারে না। এইহেতু পুরাকালীন অসভ্যদিগের মধ্যে দূরদৃষ্টির অভাব। ভবিষ্যতের ফলাফল, কার্য্যের দূর-পরিণাম তাহারা মনে সুস্পষ্টরূপে ধারণা করিতে পারে না, কোন অনুপস্থিত অথচ অবশ্যম্ভাবী ঘটনার জন্য তাহারা প্রস্তুত থাকিতে পারে না, ভবিষ্যতের ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহারা স্বীয় উত্তেজিত উদ্দাম প্রবৃত্তি সকলকে দমন করিতে পারে না।

জন সমাজে জ্ঞানের যত বহুলতা ও বিচিত্রতা হয়, ততই চিন্তার প্রসর ও পরিবর্ত্তনশীলতা বৃদ্ধি হয় এবং বিশ্বাসের দুর্নম্যতার হ্রাস হয়। অনুন্নত সমাজের লোকদিগের জ্ঞানের গতি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হওয়ায়, একই পথ দিয়া তারা আনা-গোনা করে—অন্য পথের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না—চিরকাল যে উপায় অবলম্বিত হইয়া আসিয়াছে তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে তাহারা অক্ষম, তাহাদিগের চিন্তাকে এক দিক হইতে আর একদিকে ফিরাইতে পারে না—নিজের ভ্রম তাহারা বুঝিতে পারে না—যাহা একবার বিশ্বাস করে, তাহা আর ছাড়িতে চাহে না। কিন্তু সভ্যতার যত উন্নতি হয়—চিন্তার প্রসর ও চিন্তার স্বাধীনতা ততই বৃদ্ধি হয়, প্রচলিত বিশ্বাস সকলকে পুনরায় সমালোচনা করিতে গিয়া ভ্রম বাহির হয়—এবং একবার ভ্রম বাহির হইলে, ভবিষ্যতেও ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিতে পারে এই-রূপ সন্দেহ জন্মে—সুতরাং নিজের সিদ্ধান্ত সকলই যে অভ্রান্ত—এরূপ অন্ধ বিশ্বাস আর থাকিতে পারে না। ভ্রম বাহির হইলে তাহারা নিজ মত পরিবর্ত্তনেও বিমুখ হয় না।

অসভ্যেরা কেবল স্থূল ঘটনা সকল বিশ্লিষ্ট ভাবে দেখে তাহাদের মধ্যে কোন সাধারণ নিয়ম দেখিতে পায় না—কিন্তু জন সমাজের যত উন্নতি হয়, প্রাতিভাতিক শক্তির যত বৃদ্ধি হয়, ততই স্থূল ঘটনা হইতে সূক্ষ্ম নিয়ম আবিষ্কৃত হয়—বিচিত্রতার মধ্যে একতা উপলব্ধি হয়, কার্য্য সকলের উপযুক্ত কারণ নির্দ্ধারিত হয় এবং সকল বিষয়েরই যথার্থ্য নিরূপণ করিবার চেষ্টা হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফুলজানি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তা গৃহে ফিরিতে না ফিরিতে গৃহিণী শুনিলেন তিনি বেয়ান বাড়ী গিয়াছিলেন। কেন গিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে ত পরামর্শ করিয়া যান নাই! এই প্রথম নম্বর অপরাধ। দ্বিতীয় বিয়ের চৰ্দ্দিন যেতে না যেতে সেখানে যাওয়া—একি কুলক্ষণ! জগদ্ধাত্রী হাড়ে

হাড়ে জ্বলিয়া গেলেন, স্থির করিলেন আজই বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবেন। কাজেই কর্ত্তার সাক্ষাৎকার লাভের পূর্ব্বেই তিনি মেঝেয় পড়িয়া চখের জলে অর্দ্ধেক আঁচল ভিজাইয়া দিলেন।

মুখের শীকার ছুটিয়া গেলে ক্ষুধিত শার্দ্দূলের যে অবস্থা—ক্রোধ এবং ভবিষ্যৎ আহার্য্যান্বেষণের চেষ্টাময় উদ্বেগ, সেই ভাবে নায়েব মহাশয় ফিরিয়া আসিয়া আপনার বৈঠকখানায় বসিলেন। দুঃখীরাম তখন কার্য্যান্তরে ছিল, অতএব তামাক সাজিতে অযথা দেরি হইয়া গেল। দুঃখীরাম, দুঃখীরাম, দুখে, দুখো প্রভৃতি নামের অপভ্রংশ—রোষ কষায়িত লোচন এবং ক্রমোচ্চ তীব্রকণ্ঠে বারম্বার ঘোষিত হইলেও যখন হাজরা-পুত্রের সাড়া পাওয়া গেল না, তখন কাজেই নায়েব মহাশয়ের বাৎসল্য রসের গালি ক্রমে মধুর রসের দিকে অগ্রসর হইল। শ্যালক নামে তিনবার অভিহিত হইবার পর দুঃখী নিতান্ত দুঃখিতভাবে মনিব সমীপবর্ত্তী হইল এবং কলিকা লইয়া প্রস্থান করিল। সকলেই ভরসা করিয়াছিল, এত গর্জ্জনের পর দুঃখীর পৃষ্ঠোপরি কিঞ্চিৎ বর্ষণ হইবে, আর কেহ হইলে হইতও তাই, কিন্তু দুঃখী প্রিয় ভৃত্য, তাহার জন্য নায়েব মহাশয়ের আইনে কতকগুলা বর্জ্জিত বিধি ছিল।

দুঃখীরাম অতঃপর খুব তাড়াতাড়ি তামাক সাজিয়া আনিল বটে কিন্তু একটা কুখবরও সেই সঙ্গে লইয়া আসিল। মনিব মহাশয় সতৃষ্ণ নয়নে তামাক ইচ্ছা করিয়া ভৃত্যের স্ফীত এবং কলিকার অগ্নি-প্রেরিত-রক্তিমাভায় উজ্জ্বল গণ্ড দুইখানির উপর প্রসন্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দুঃখীরাম মা ঠাকুরাণীর দুর্জ্জয় মানের সম্বাদ দিল। প্রভুর উপর আজ তাহার মহা অভিমান হইয়াছিল, বিশেষ তিনি প্রতিপালক। পিতা হইয়া যে রাগভরে নিতান্ত বিরুদ্ধ সম্বন্ধ ধরিয়া থাকেন এবং এইমাত্র ধরিয়াছিলেন, সে অপমান তাহার হৃদয়ে বাজিতেছিল। সুতরাং নায়েব মহাশয় একেবারে শুকাইয়া গিয়া যখন ভৃত্যের নিকট কর্ত্রী ঠাকুরাণীর মানের কারণ অতিশয় ব্যস্ততা সহকারে বারম্বার জিজ্ঞাসু হইলেন, সে তখন নিতান্ত নির্ব্বিকার ভাবে একটী আধটী কথা কহিয়া কেবল তাঁহার কৌতূহল ও উদ্বেগ যুগপৎ বৃদ্ধি করিয়া একরূপ প্রতিশোধ লইতে লাগিল। "তা আমি কি জানি হুজুর, তিনি কি আমাকে বলে কয়ে রাগ করেচেন?" "জুতো ঝেড়ে আমাদের গুজরাণ—ওসব কথার আমরা কি জানি বাবু!" "মা ঠাকরুণের জন্যেই এ বাড়ীতে থাকা, তাঁর দুক্ষু দেখ্‌লে ভারি দুক্ষু হয়।"

এই সকল কথা দুঃখীরাম মুখ মহা ভার করিয়া বলিতেছিল বটে কিন্তু তাহার ফল স্বরূপ মনিবের কুঞ্চিত ভাব দেখিয়া তাহার মনে প্রতিশোধ-সুলভ একটা সুখ জন্মিতেছিল। ঘোষ মহাশয় সাধারণতঃ মনুষ্য চরিত্র এবং অসাধারণতঃ প্রজা চরিত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইলেও দুঃখীরাম-চরিতামৃতের মর্ম্মভেদ করিয়া উঠিতে পারিতেন না, কাজেই তাহার ভার ভার মুখখানায় বিশ্বাসী ভৃত্যের দারুণ অভিমান ছাড়া আর কিছুই দেখিতে

পাইতেছিলেন না। কিন্তু তাহার হৃদয়-যন্ত্রের লীলা লহরী তখন দেখিতে পাইলে নায়েব মহাশয় কূপবাসী ভেকের ন্যায় বলিয়া উঠিতেন সন্দেহ নাই—"বাপু হে তোমার খেলা, আমার মরণ।" ফলতঃ আর তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। "নদী যথা ধায় সিন্ধু পানে" মুক্তকচ্ছ এবং দোদুল্যমান উদর ঘোষ মহাশয় অন্দর পথে ধাবিত হইলেন। আলবোলা হাতে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে তাঁহার উপযুক্ত ভৃত্যও প্রভুর পশ্চাদনুসরণ করিল।

ঘোষ মহাশয় বুঝিয়াছিলেন কিসের জন্য অভিমান। বাস্তবিক তিনি মনে মনে স্বীকার করিলেন যে কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে না সুধাইয়া তাঁহার বৈবাহিক গৃহে সে ভাবে যাওয়াটা ভাল হয় নাই। কিন্তু কৃত কার্য্যের জন্য বিনা ওজরে স্ত্রীজাতির কাছে অপরাধ স্বীকার করা অথবা মনের আসল মতলব প্রকাশ করিয়া বলা যে বৈধ, চাণক্য পণ্ডিত কৈ এমন উপদেশ দেন নাই। কাজেই ঘোষ মহাশয় গৃহিণী সম্ভাষণের জন্য মনে মনে একটা সওয়াল জবাবের খসরা তৈয়ার করিলেন। এ দিকে জগদ্ধাত্রী এতক্ষণ গুন্ গুন্ সুর ধরিয়া হর্ম্ম্যতল আশ্রয় করিয়াছিলেন—এক এক বার বঙ্কিম দৃষ্টিতে স্বামীর পথ চাহিতেছিলেন। অতএব নায়েব মহাশয়ের অন্দর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রোরুদ্যমান কণ্ঠ একেবারে পঞ্চমে চড়িয়া গেল। কর্ত্তা শুনিলেন পনর বৎসর পরে গৃহিণীর পিতৃশোক উছলিয়া উঠিতেছে—কেন না রোদনের ছন্দোবন্ধময় ভাষায় জগদ্ধাত্রী বলিতেছিলেন, "বাবা গো, কেন আমার এমন বিয়ে দিয়েছিলে।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"বলি ও গিন্নি—ছি! ক্ষেপ্‌লে নাকি?"

গৃহিণীর পদপ্রান্তে বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া রোদন বেগের লাঘব ভরসা করিয়া কর্ত্তা শেষে আর থাকিতে পারিলেন না। কেন না ভূত পূর্ব্ব বিবাহের জন্য পিতৃ আত্মাকে বিধিমতে অনুযোগ করিয়া শোকাভিভূতা কন্যা মাতৃ আত্মাকে আসরে নামাইবার উপক্রমণিকা প্রচার করিবেন—এইরূপ বোধ হইল। কাজেই কর্ত্তাকে উপায়ান্তর না দেখিয়া একটু স্নেহ মাখা ভৎর্সনার সুরে জবাব সুরু করিতে হইল। "ক্ষেপ্‌লে নাকি গিন্নি! গাঁয়ে বেহাই বাড়ী, ছেলেকে একবার দেখে এসেছি, এই বইত নয়? ছি—ছেলে মানুষি করো না, ওঠ, লক্ষীটী আমার!" ইত্যাদি।

দুঃখীরাম সকলিকা ফরসীটী বারান্দায় রাখিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল, এতক্ষণে তাহার প্রতি ঘোষজার দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু তাম্রকূট সুন্দরীও (পাঠক পাঠিকা ব্যাকরণের ব্যাভিচার ধরিবেন না, এপক্ষ লেখক আধুনিক স্ত্রীজাতির পৌরুষ উপাধি ধারণের প্রতি সহানুভূতি রাখেন)—তাম্রকূট মহাশয়া ও তাঁহার দীর্ঘ অবহেলায় অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া শেষে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিলেন। লক্ষীর অনুগ্রহ লাভ করিতে গেলে

যেমন সরস্বতীর নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, গৃহিণীর মান রাখিতে তেমনি বোধ করি মাদক রসজ্ঞতার কাছেও চির বিদায় লওয়ার প্রয়োজন। যখনকার কথা আমরা বলিতে বসিয়াছি, তখন একথা তত না খাটুক, এখন খাটিতেছে।

স্বামীর সোহাগের ফলে মানিনী একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন দেখিয়া নায়েব মহাশয়ের ধড়ে প্রাণ আসিল। সাহস পাইয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—

"আমি ভাবিনি যে ছেলেকে দেখ্‌তে গেলে তুমি এমন রাগ্‌বে। তা তোমায় না জিজ্ঞেস্ করে গিয়ে ভাল করিনি গিন্নি—শেষে পস্তাতে হচ্চে। ভাল কথা, লোকে বেহানের অনেক নিন্দে করে, আগে তা আমি পিত্তয় করতাম না। কিন্তু আজ্ দেখ্‌লাম সত্যি! এমন অহঙ্কার, তা আগে জান্‌তাম না!"

এ অমোঘ অস্ত্র। সাধারণতঃ শ্রীমতী জগদ্ধাত্রী দাসী পরনিন্দায় থাকেন ভাল, তার উপর বেহাইনের নিন্দা! নায়েব মহাশয় কিছু সন্ধান করিয়া বাণক্ষেপ করেন নাই, বেহাইনের উপর তাঁহার বাস্তবিক অভক্তি হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এ ক্ষেত্রে যেমন করিয়াই হোক্ লক্ষ্য বিঁধিয়া গেল। ইহার ফলে গৃহিণীর রোদন বন্ধ এবং মান স্রোত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইল। বিস্মিত ঘোষজা শুনিলেন সহধর্ম্মিণী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন, "কাঙ্গালের কথা বাসি হলে মিষ্টি নাগে। তখুনি বলেছিলাম বলি মন্তুরি তন্তুরি বেয়ান করো না। আমার যেমন পোড়া কপাল, কতদিকে কত যন্ত্রণাই দিলে পোড়ার মুখো মিন্‌সে!"

এ সকলের জন্য নায়েব মহাশয় সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু কথা শেষ করিয়া গৃহিণী যে আবার জোরে জোরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন, ইহাতে তাঁহার ভয় হইল পাছে কাঁচিয়া বর্ষণ সুরু হয়। অতএব বাক্য শৃঙ্খল রক্ষা করিবার জন্য তিনি পুনশ্চ কহিলেন——

"পুরোকে দেখে একবার মনে কর্‌লাম স্ত্রীলোকের সংসার, চাকর বাকরে লুটে পুটে খায়, বেহাইন ঠাক্‌রুণকে দুটো সলাই না হয় দিই! তা আমার যুক্তি পরামর্শ বড় বড় মুৎসুদ্দিরা ঘাড় পেতে শোনে, কিন্তু বল্‌ব কি গিন্নি—বেয়ান কিনা তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিলে। আমি ত একেবারে অবাক্! কিসের যে অহঙ্কার তাত জানিনে! বড় মানুষের মেয়ে হলে বটে তা সওয়া যায়। ওঁর বাপ মার বংশ যে কি—তা আর আমার জান্‌তে বাকী নেই!"

অমনি গৃহিণীর মনে আত্ম-পিতৃবংশ-গৌরব জাগিয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন—

"বাবা বল্‌তেন ছোট লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা কর্‌তে নেই! আমার কথা যে না শোনে, আমি তাকে বলে কেন অপমান হব?"

মহেশ্বর বাস্তবিক বেহাইনের দৃঢ়তায় চটিয়া আসিয়াছিলেন, তার উপর গৃহিণীকে

উত্তেজিত করিয়া একটা মতলব হাসিল করাও তাঁহার ইচ্ছা, অতএব কিঞ্চিৎ কাতর হইয়া বলিলেন—

"ঘাট হয়েচে গিন্নি, তোমার বুদ্ধি নিয়ে চল্‌লে এ অপমান আমার হত না। আর তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজই কর্‌ব না, দিব্বি কর্‌চি গিন্নি! এ অপমানের শোধ নিতেই হইবে। কি করে তা হয় বল?"

গৃ। "তার আবার কি? পালকী বেহারা পাঠিয়ে দাও, ওবেলা ছেলে বউ নিয়ে আসুক্। মরণ আর কি! অহঙ্কার নিয়ে ধুয়ে ধুয়ে খান এখন"।

মহেশ্বরের মতলব সিদ্ধ হইল। তিনিও ইহাই আঁচিয়া রাখিযাছিলেন, নহিলে বেহাইনকে যুগপৎ নরম ও জব্দ করার উপায়ান্তর নাই। প্রকাশ্যে তিনি গৃহিণীর বুদ্ধির অনেক সাধুবাদ করিলেন এবং তাঁরস্বরে দুঃখীরামকে ডাকিতে লাগিলেন।

জগদ্ধাত্রী বলিলেন "কিন্তু তোমার কাজে কথায় একরত্তিও পেত্তয় নেই। তখুনি যদি বেয়ান বলে কিছু টাকা দেব, তুমি অম্‌নি কুকুরের মতন ছেলে বউ আবার বয়ে দিয়ে আস্‌বে। ছি! এত লোভ কি করতে আচে? এর পর ব্যাঙেও তোমায় নাতি মার্‌বে"।

এই বক্তৃতা কতক্ষণ চলিত বলা যায় না, কিন্তু দুঃখীরাম আসিয়া পড়াতে গৃহিণী ঠাকুরাণীকে ইহা বন্ধ করিতে হইল। কর্ত্তাও সম্প্রতি আর অধিক বাক্য যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

আকবরের জন্ম। *

(হুমায়ুনের পলায়ন)

"সমস্ত দল বল লইয়া হুমায়ুন বাদসাহ চৌসাবের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে সেরসার সৈন্যগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিল। বাদসাহ মন্ত্রীগণের সহিত

* বর্ত্তমান প্রস্তাবটী "তেজ্‌কেরে অল্ ভেকিয়াৎ" নামক পুস্তকের একটী অংশ হইতে সঙ্কলিত হইল। পুস্তকখানি এক্ষণে অতীব দুষ্প্রাপ্য। ইহার এক খণ্ড বহুকাল পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌএ পাওয়া গিয়াছিল। সেই গ্রন্থখানি এক্ষণে বিলাতে ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।

জোহর ইহার রচয়িতা। এই ব্যক্তি হুমায়ুনের "আফ্‌তাব্‌চি" বা "ভৃঙ্গার বাহক" ছিল। হুমায়ুন যে সময়ে বক্‌সারের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়নে রত, সেই সময়ের ঘটনা লইয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা। মূল পুস্তকে ঘটনাটী দৈনন্দিন-লিপির (Diary) ন্যায় লিখিত। আমরাও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি।

উত্তেজিত করিয়া একটা মতলব হাসিল করাও তাঁহার ইচ্ছা, অতএব কিঞ্চিৎ কাতর হইয়া বলিলেন—

"ঘাট হয়েচে গিন্নি, তোমার বুদ্ধি নিয়ে চল্‌লে এ অপমান আমার হত না। আর তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজই কর্‌ব না, দিব্বি কর্‌চি গিন্নি! এ অপমানের শোধ নিতেই হইবে। কি করে তা হয় বল?"

গৃ। "তার আবার কি? পালকী বেহারা পাঠিয়ে দাও, ওবেলা ছেলে বউ নিয়ে আসুক্। মরণ আর কি! অহঙ্কার নিয়ে ধুয়ে ধুয়ে খান এখন"।

মহেশ্বরের মতলব সিদ্ধ হইল। তিনিও ইহাই আঁচিয়া রাখিয়াছিলেন, নহিলে বেহাইনকে যুগপৎ নরম ও জব্দ করার উপায়ান্তর নাই। প্রকাশ্যে তিনি গৃহিণীর বুদ্ধির অনেক সাধুবাদ করিলেন এবং তাঁরস্বরে দুঃখীরামকে ডাকিতে লাগিলেন।

জগদ্ধাত্রী বলিলেন "কিন্তু তোমার কাজে কথায় একরত্তিও পেত্তয় নেই। তখুনি যদি বেয়ান বলে কিছু টাকা দেব, তুমি অম্‌নি কুকুরের মতন ছেলে বউ আবার বয়ে দিয়ে আস্‌বে। ছি! এত লোভ কি করতে আচে? এর পর ব্যাঙেও তোমায় নাতি মার্‌বে"।

এই বক্তৃতা কতক্ষণ চলিত বলা যায় না, কিন্তু দুঃখীরাম আসিয়া পড়াতে গৃহিণী ঠাকুরাণীকে ইহা বন্ধ করিতে হইল। কর্ত্তাও সম্প্রতি আর অধিক বাক্য যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

আকবরের জন্ম। *

(হুমায়ুনের পলায়ন)

"সমস্ত দল বল লইয়া হুমায়ুন বাদসাহ চৌসাবের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে সেরসার সৈন্যগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিল। বাদসাহ মন্ত্রীগণের সহিত

* বর্ত্তমান প্রস্তাবটী "তেজ্‌কেরে অল্ ভেকিয়াৎ" নামক পুস্তকের একটী অংশ হইতে সঙ্কলিত হইল। পুস্তকখানি এক্ষণে অতীব দুষ্প্রাপ্য। ইহার এক খণ্ড বহুকাল পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌএ পাওয়া গিয়াছিল। সেই গ্রন্থখানি এক্ষণে বিলাতে ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে।

জৌহর ইহার রচয়িতা। এই ব্যক্তি হুমায়ুনের "আফ্‌তাব্‌চি" বা "ভৃঙ্গার বাহক" ছিল। হুমায়ুন যে সময়ে বক্‌সারের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়নে রত, সেই সময়ের ঘটনা লইয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা। মূল পুস্তকে ঘটনাটী দৈনন্দিন-লিপির (Diary) ন্যায় লিখিত। আমরাও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি।

মন্ত্রণা করিলেন। কাশিমবেগ নামক একজন সুচতুর সেনানী বলিল—"হুজুর শত্রু সৈন্য অদ্য প্রায় উনিশ ক্রোশ রাস্তা হাটিয়া আসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের অশ্বারোহীগণ এখনও পরিশ্রান্ত হয় নাই, অনুমতি প্রদান করুন—আমরা উহাদিগকে এই অবসরে আক্রমণ করি।" কিন্তু মনীদ্‌বেগ বলিলেন "হুজুর অত তাড়াতাড়ির প্রয়োজন নাই।" বাদসাহ সেই কথা শুনিলেন, কিন্তু আমাদের সৈন্যেরা ইহাতে নিরুৎসাহ হইল। সের খাঁও অদূরে ছাউনি গাড়িলেন। তাঁহার বন্দোবস্তটা পাকা ধরণের হইল। আমরা শুধু শিবির সন্নিবেশ করিলাম, কিন্তু তিনি স্বীয় শিবিরের চারিদিকে গড়খাই করিয়া দিলেন। আমাদের সৈন্যের সহিত মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের অনেক লোক মরিতে লাগিল। প্রায় দুই মাস কাল এইরূপে কাটিয়া গেল।

বর্ষা আসিল। চারিদিক জলে পরিপূর্ণ হইল। সের খাঁর গড়খাই সেই বর্ষার প্রবল বন্যায় ভাসিয়া গেল। তিনি সেখান হইতে ৩।৪ ক্রোশ দূরে এক পাহাড়ের নীচে গিয়া ছাউনি গাড়িলেন। এখানেও আমাদের উভয় পক্ষে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইতে লাগিল। অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব হইল। সেখ ক্ষলিল নামক একজন মোল্লাকে সের খাঁর নিকট পাঠান হইল। কারণ অন্য লোক গেলে তিনি হয়ত তাহাকে আটক করিতে পারেন। সের খাঁ মোল্লাকে বলিয়া দিলেন—"হুমায়ুন সাহ যদি চুনার দুর্গ ও তৎসন্নিহিত প্রদেশগুলি আমায় অর্পণ করেন, তাহা হইলে আমি সন্ধি করিতে স্বীকৃত আছি।" হুমায়ুন সাহ প্রথমে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। বিশ্বাসঘাতক সের খাঁ!!!! তাহার ন্যায় নীচ প্রকৃতি অতি অল্প লোকেরই আছে। সে নিজের "জবান খাড়া" রাখিতে পারে নাই। সন্ধির প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবা মাত্রই সে তাহার প্রধান প্রধান সেনানীদিগকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল—"তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ—যে সমস্ত মোগল সৈন্য এই অবসরে একেবারে ধ্বংস করিতে পার? কল্যকার প্রভাতে আর যেন তাহাদের মুখ দেখিতে না হয়।" এ প্রস্তাবে কেহই কথা কহিল না, কেহই অগ্রসর হইল না—কেবল ক্ষুয়াস খাঁ নামক একজন আফ্‌গান সেনানী সদর্পে বলিল--"যদি বাছা বাছা সৈন্য ও শিক্ষিত হস্তী পাই, তাহা হইলে দেখি—মোগলদের লণ্ডভণ্ড করিতে পারি কি না? আল্লা আমাদের কৃপা করেন কি না।"

ক্ষুয়াস খাঁ সের খাঁর সম্মতিক্রমে কতকগুলি বাছা বাছা সৈন্য লইয়া বেলা দশটার সময় শিবির হইতে বাহির হইলেন। বীরের ন্যায় সম্মুখ যুদ্ধ তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না—সুতরাং চোরের ন্যায় গর্হিত উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত দিন পর্ব্বত গুহায় লুকায়িত থাকিয়া, তিনি রাত্রির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মোল্লা সেখ ক্ষলিল, এই বিষয়ে হুমায়ুনকে সাবধান করিয়া দিলেও সের খাঁ যে এইরূপ মান-

হানিকর,নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন—ইহা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। কিন্তু পর দিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দলবদ্ধ আফ্গান সেনা দেখিয়া ভ্রান্ত বাদসাহের চমক ভাঙ্গিল। সহসা আফ্গানগণ আমাদের সন্নিহিত হওয়াতে আমাদের সেনা মধ্যে অতিশয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। দামামা ধ্বনি শুনিয়া ৩০০ শত অশ্বারোহী বাদসাহের চারিপার্শ্বে একত্রিত হইল। শত্রু দলের কয়েক জন হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমাদের দলে মীর বাজিক অতিশয় সাহসী ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র গুরখাআলি ও তাতাবেগ পিতার ন্যায় সাহসী ছিল। ইহারা দুনালী বন্দুক ও রাজকীয় বর্ষা লইয়া সর্ব্বদা বাদসাহের শরীর রক্ষা করিত। হুমায়ুন সাহ ইহাদিগকেই শত্রুর হস্তী আক্রমণ করিতে হুকুম দিলেন। কিন্তু ইহারা ইতস্ততঃ করাতে বাদসাহ স্বয়ং বর্ষা হাতে করিয়া শত্রুর দিকে ধাবিত হইলেন। বাদসাহ ক্ষিপ্র হস্তে তীর লইয়া শত্রু পক্ষের অগ্রগামী সেনা নায়কের হস্তীর মস্তক বিদ্ধ করিলেন; কিন্তু পশ্চাৎ হইতে তীর আসিয়া বাদসাহের দক্ষিণ হস্ত বিদ্ধ করিল। ক্রমশঃ শত্রুদল আসিয়া চারিদিক ঘেরিতে আরম্ভ করাতে আমাদের সৈন্য দলে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। বাদসাহ চারিদিক হইতে শত্রুবেষ্টিত হইয়া তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণকে সহায়তার জন্য ডাকিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহার আহ্বান শুনিল না। সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাদসাহের সঙ্গে যে কয়েক জন সেনা গিয়াছিল, তাহারা সকলেই প্রায় নিহত হইয়াছে—জন কয়েক কেবল জীবিত। তাহাদের মধ্যে এক জন বলিল—“হুজুর আপনি বাচিলে জগতের অনেক কার্য্য হইবে—আপনি আমার ঘোড়া লইয়া শত্রুর একধার ভেদ করিয়া পলাইয়া যান—আমার অদৃষ্টে যা আছে তাহাই হইবে।” বাদসাহ এই প্রকার আত্মোৎসর্গ দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন; বলিলেন—“আমি তোমায় ছাড়িয়া যাইব না। হিন্দুস্থানের সিংহাসন অপেক্ষা তোমার প্রাণ আমার পক্ষে বহুমূল্য। সিংহাসন যাক্ তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু তোমার জীবনের মূল্যে তাহা কিনিতে পারিব না।” কিন্তু প্রভুভক্ত ভৃত্য কোনমতেই ছাড়িল না, সে বাদসাহকে নিজের অশ্ব দিয়া নীচে দাঁড়াইল। হুমায়ুন অগত্যা ত্বরিত গতিতে শত্রু ব্যূহ ভেদ করিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলেন, অশ্বকে নদীতে নামাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু খরতর স্রোত দেখিয়া অশ্বটা কোন মতেই জলে নামিতে চাহিল না। পরিশেষে ভীষণ পীড়নে অশ্ব জলে নামিল কিন্তু কিয়দ্দূর গিয়াই নিশ্বাস বন্ধ হইয়া ডুবিয়া মরিল। হুমায়ুন সেই নদী-বক্ষে ভাসিতে লাগিলেন।

ভারতেশ্বরের জীবন নদী গর্ব্ভে সমাহিত হইবার উপক্রম হইল। নদীর কূলে একটা ভিস্তি মশকে করিয়া জল ভরিতেছিল; সে এক জন লোক জলমগ্ন হয় দেখিয়া স্বীয় জলপূর্ণ মশক ভাসাইয়া দিল। বাদসাহ সেই মশক ধরিয়া নদীর অপর পারে

উঠিলেন—ভিস্তিকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল আমার নাম"নিজাম"। বাদসাহ বলিলেন"আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—হিন্দুস্থানের সিংহাসন আমার হইলে আমি তোমাকে আমার পার্শ্বে বসাইব ও নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার (একজন বিখ্যাত ফকীর) ন্যায় চিরবিখ্যাত করিব।"* বাদসাহ এই যুদ্ধে উদ্ধার পাইলেন বটে কিন্তু নদী পার হইতে গিয়া তাঁহার অনেক সৈন্য নিহত হইল।

বাদসাহ নিজের আড্ডায় আসিলেন—অবশিষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিলেন কিন্তু দেখিলেন মীর ফরিদ ও সাহ মহম্মদ নামক দুইজন আফগান তখনও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। সুতরাং তিনি স্বল্পাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া যমুনাতীরে কালপীতে উপস্থিত হইলেন। পরে কালপী হইতে আগ্রা যাত্রা করিলেন। আগরার সান্নিধ্যে তাঁহার ভ্রাতা কামরাণ "জার আফ্মান" নামক উদ্যানে অবস্থান করিতেছিলেন। এই খানে ভ্রাতায় ভ্রাতায় আলিঙ্গন হইল। পরে হুমায়ুন সিংহাসনে বসিলেন। * * * দিল্লীতে নূতন দরবার হইল। বাদসাহ সমস্ত রাজকুমার ও আমীরদের এই দরবারে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করাতে বাদসাহ পুনরায় সের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

নবতী সহস্র অশ্বারোহী তাঁহার সঙ্গে অভয়পুর হইতে যাত্রা করিল। সৈন্যদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য তিনি পথিমধ্যে তাহাদের খেলোয়াৎ প্রভৃতি দিয়া সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। কনোজে আসিয়া শুনিলেন সের খাঁ দলবল লইয়া অপর পারে অবস্থিত। বাদসাহ সৈন্যগণকে নদীপার হইতে হুকুম দিলেন। ওপারে গিয়া সৈন্যরাজি দলে দলে বিভক্ত হইল। রাজকুমার হিন্দাল একদল সৈন্য লইয়া সেরখাঁর পুত্র জেলালখাঁকে বাধা দিবার জন্য বাদসাহের দক্ষিণে চলিলেন। বাদসাহ স্বয়ং মধ্য দিকের ভার লইলেন। বামে রাজপুত্র আস্কেরী আউসখাঁর জন্য প্রস্তুত হইয়া চলিলেন।

---

* এবিষয়ে একটী গল্প আছে—কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না। বাদসাহ সিংহাসন অধিকার করিয়া নানাবিধ কাজের ভিড়েও তাঁহার প্রাণ রক্ষাকর্ত্তা নিজাম ভিস্তির কথা ভুলেন নাই। তিনি ভিস্তির সন্ধান লইয়া তাহাকে রাজধানীতে আনাইলেন, প্রতিজ্ঞামত তাহাকে নিজের রত্ন খচিত সিংহাসনে বসাইলেন, এবং প্রকারান্তরে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিখ্যাত করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন। ভিস্তির খ্যাতি লাভের কারণ এই—বাদসাহ তাহাকে একটী সম্পূর্ণ দিনের শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন। সে চিরকাল চর্ম্ম বহন করিয়া আসিয়াছে, তাহার লক্ষ্য চর্ম্মের দিকেই গেল। ভিস্তি সেই এক দিনের মধ্যে রাজধানীতে চামড়ার টাকা চালাইল।

এ গল্প আমি পশ্চিমে অবস্থানকালীন শুনিয়াছি। আরও শুনিয়াছি হুমায়ুন এই ভিস্তিকে পরে স্বীয় পারিষদরূপে গ্রহণ করেন, এবং বহু ধন সম্পত্তি দানে ইহার অবস্থারও উন্নতি করিয়া দেন।

কিয়ৎক্ষণ ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। ইতিমধ্যে বাদসাহের নিকট সংবাদ আসিল, রাজকুমার হিন্দাল তাঁহার সম্মুখস্থ আফ্‌গানদের হারাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু কুমার আস্কেরী সৈন্য লইয়া পলাইয়াছেন। যাহা হউক তত্রাচ সমস্ত ঘটনা আমাদের পক্ষে তখনও অনুকূল।

কিন্তু সহসা ঘটনা-স্রোত অন্যদিকে ফিরিল। কতকগুলি বোঝাই গাড়ী একত্রিত করিয়া পশ্চাতে একটী রক্ষা ব্যূহ (ইংরাজী Barricade ?) প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মির্জ্জা হায়দর নামক একজন সেনানী বাদসাহকে বলিল—"আপনি যদি এই গাড়ির শিকলগুলি কাটিয়া দেন্‌ তাহা হইলে আমাদের পদাতিকেরা ইহার মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আরও সুবিধাজনক স্থানে দাঁড়াইতে পারে।" বাদসাহ তাহাই যুক্তিযুক্ত ভাবিয়া শৃঙ্খল ছেদনে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে একজন কৃষ্ণ পরিচ্ছদধারী আফগান্‌ সহসা নিকটস্থ হইয়া তাঁহার অশ্বের মস্তকে বর্ষার আঘাত করিল। আহত অশ্ব যন্ত্রণায় অস্থির হওয়ায় তাহাকে স্থির রাখা বড়ই ভার হইয়া দাঁড়াইল। বাদসাহ সমস্ত সৈন্য একত্রিত করিয়া পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে উদ্যত, এমন সময়ে আমাদের দলস্থ একজন পদাতি তাঁহার অশ্বের বলগা ধরিয়া নদীর দিকে টানিয়া লইয়া চলিল। তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অগত্যা বাদসাহ স্থির হইলেন। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—অদূরে মাহুত একটা হস্তী লইয়া ফিরিতেছে। বাদসাহ তাহাকে নদী পার করিয়া দিতে বলিলেন কিন্তু মাহুত বলিল—"হাতী নদীতে ডুবিয়া মরিবে।" সে আর কথা না কহিয়া হাতী জোরে চালাইল। বাদসাহের সর্ম্ভিব্যাহারী লোক বলিল,"হুজুর এলোক ভাল নয়—চলুন মাহুতকে মারিয়া ফেলিয়া আমরা হাতী কাড়িয়া লই।" বাদসাহ স্বয়ং অস্ত্রবিদ্ধ করিয়া মাহুতকে ভূপতিত ও মূর্চ্ছিত করিলেন এবং হাতী দখল করিয়া উভয়ে নদী পার হইয়া গেলেন। নদীর পর পার এত উচ্চ ও দুরারোহ যে পার হইয়াও কোন ফল হইল না। ঘটনাক্রমে আমাদের কয়েক জন বিশ্বাসী সৈন্য পূর্ব্বেই এই স্থানে পৌছিয়াছিল। তাহারা স্বস্ব পাগড়ী খুলিয়া ঝুলাইয়া দিল, বাদসাহ উপরে উঠিলেন—এমন সময়ে যুবরাজ হিন্দাল সসৈন্যে বাদসাহের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন।

বাদসাহ এখান হইতে আগরা সহরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সৈয়দ রফিয়া উদ্দিন নামক এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির বাটীতে তাঁহাকে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইল। সৈয়দ সাহেব সামান্য রুটী ও তরমুজ দ্বারা তাঁহার আতিথ্য সংকার করিলেন। দুর্গ হইতে তাঁহার মাতা ও অন্যান্য পরিবারবর্গকে আনিবার জন্য এবং প্রয়োজন মত ধন রত্নাদি সঙ্গে লইবার জন্য কুমার হিন্দালকে পাঠান হইল। এই সময়ে সংবাদ আসিল যুবরাজ কামরাণ বিদ্রোহী হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। বাদসাহ এই সময়ে চারিদিক হইতে বিপদ-জালে পরিবেষ্টিত হইলেন। পলায়ন ভিন্ন তাঁহার আর কোন উপায় রহিল না। সেখ্‌জী এঘটনা অবগত হইয়া বাদসাহকে বলিলেন "পৃথিবীর সকল কার্য্যই কখনও

দ্রুতগামী খরস্রোত বিশিষ্টা নদীর ন্যায়—আবার কখনও বা স্থির ভাবাপন্ন জলাশয়ের ন্যায় হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে চিন্তার বিষয় কিছু নাই। দেখুন আপনি চারিদিক হইতেই শত্রু বেষ্টিত হইতেছেন, এদিকে সের খাঁ—অপর দিকে বিদ্রোহী ভাতৃগণ ও অসন্তুষ্ট সেনারাজি; সুতরাং আপনি এই প্রদেশ পরিত্যাগ করুন।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ মোল্লা আপনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্বটী তাঁহাকে উপহার দিলেন। বাদসাহ কাল বিলম্ব না করিয়া অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত পরিবারাদি সঙ্গে লইয়া একেবারে ফতেপুর শিক্রী যাত্রা করিলেন। এই স্থানে কুমার হিন্দালের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কুমার অগ্রজকে একখানি বহুমূল্য ছোরা ও স্বর্ণ খচিত তরবারি সম্মানার্থে প্রদান করিলেন। বাদসাহ শিক্রীর রাজকীয় উদ্যানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি কক্ষ মধ্যে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে পটমণ্ডপ বস্ত্র ভেদ করিয়া সহসা এক তীর আসিয়া ভূমিতে পড়িল। বাদসাহের জীবন পরমেশ্বরের কৃপায় রক্ষিত হইল—তিনি দুইজন লোককে তীর নিক্ষেপকারীর পরিচয় জানিতে পাঠাইলেন। তাহারা কোন সন্ধানই পাইল না—কিন্তু রক্তাপ্লুত কলেবরে ফিরিয়া আসিল।

এই স্থানও নিরাপদ নহে দেখিয়া বাদসাহ চোনে গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইখানে কুমার আস্কেরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। আসকেরী বলিলেন—"সের খাঁ ফরিদগুর নামক একজন সেনাপতিকে আপনার অনুসরণে পাঠাইয়াছেন—আপনি এস্থান হইতে শীঘ্র পলায়ন করুন, আর আমরা পশ্চাতে থাকিয়া তাহাকে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত রাখিয়া আপনার পলায়নের সহায়তা করি।" বাদসাহ এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিয়া কিয়দংশ সৈন্য লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত, এমন সময়ে তাঁহার নিজ সৈন্য মধ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল। বাদসাহের দুরদৃষ্ট উপস্থিত দেখিয়া অধিকাংশ সৈন্য তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। তিনি মিষ্ট বচনে, দৃঢ় স্বরে পুনরায় তাহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া সেই স্বল্প সংখ্যক সেনারাজির দক্ষিণ দিক পরিচালনের ভার হিন্দালের উপর, বামভাগের ভার ইয়াদ্ বেগের উপর দিয়া আপনি মধ্য ভাগ লইয়া পলায়নে অগ্রসর হইলেন।

চোনে হইতে প্রতিদিন ১২ ক্রোশ করিয়া হাঁটিয়া আমরা সরহিন্দে উপস্থিত হইলাম। কুমার হিন্দাল সরহিন্দে রহিলেন। বাদসাহ সট্‌লেজ নদীর তীরবর্ত্তী মচ্‌বারাতে প্রস্থান করিলেন। অনেক কষ্টে নদী পার হইয়াছেন, এমন সময়ে সংবাদ পৌঁছিল—সের খাঁ দিল্লী অধিকার করিয়াছেন, এবং তাঁহার এক দল সৈন্য মচ্‌বারার ৪০।৫০ ক্রোশ দূরে থাকিয়া তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতেছে।

কুমার হিন্দাল এই সময়ে সরহিন্দ হইতে মচবারায় আসিলেন—এবং হুমায়ুন আবার অনন্যোপায় হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিলেন। লাহোরে উপস্থিত হইলে রৌশন আলি নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার যথেষ্ট পরিচর্য্যা করিল। রৌশনের বাটী

হইতে মজঃফর বেগ নামক জনৈক লোককে অনুসরণকারী সেনাগণের তত্ত্বে পাঠান হইল; মজঃফর ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল সের খাঁ গণ্ডোয়াল বা বেয়া নদীর পর পারে উপস্থিত হইয়াছেন। বাদসাহ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এই সমস্ত ভাবিতেছেন—এমন সময়ে সংবাদ আসিল সের খাঁ সন্ধি করিবার জন্য দূত পাঠাইয়াছেন। দূত আসিল কিন্তু নানা কারণে সন্ধি হইল না। বাদসাহ মুলতানে যাইবার প্রস্তাব করিলেন, আমরা রাভী নদী পার হইয়া নদীতীর হইতে ৪ ক্রোশ দূরে হেজারা গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এইখানে সংবাদ আসিল কুমার হিন্দাল ও সেনাপতি ইয়াদগার কুমন্ত্রীদিগের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া আমাদের পক্ষ ত্যাগ করিয়া গুজরাটে গিয়াছেন। যখন লোকের দুরদৃষ্ট ঘটে তখন এইরূপই হইয়া থাকে। এক্ষণে হিন্দুস্থানের সম্রাটের সঙ্গে মোটে ৪০ চল্লিশ জন মাত্র লোক!! ইহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? আমরা হেজারা হইতে বিহেরা ও তথা হইতে কুশ্‌বে যাত্রা করিলাম। কুশ্‌বের সাশনকর্ত্তা সুলতান হোসেন মহা আদরে বাদসাহকে গ্রহণ করিলেন। কুশ্‌বে ত্যাগ করিয়া আমরা মুলতানে চলিলাম। কুশ্‌বে হইতে ছয় ক্রোশ গিয়া আমরা এমত একস্থলে উত্তীর্ণ হইলাম—যে সেখানে পথ অতি সঙ্কীর্ণ। ইহার একটু পরেই দুইটী স্বল্প পরিসর রাস্তা গিয়াছে। ইহাদের একটী কাবুলের দিকে ও অপরটী মুলতানের দিকে। বাদসাহের ভ্রাতা অর্দ্ধ বিদ্রোহী কামরাণ এই সময়ে কাবুলে যাইতেছিলেন। এই ক্ষুদ্র পথে তাঁহার সহিত বাদসাহের সাক্ষাৎ হইল। ভ্রাতার দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখ হওয়া দূরে থাক্—সৈন্য দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করা দূরে থাক্, কামরাণ সম্ভাষণও করিল না। বাদসাহ অগ্রসর হইবেন—কিন্তু কামরাণ তাহাতেও আপত্তি করিতে লাগিলেন; এক নূতন বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু পরিশেষে আবুবেক্ নামক এক সাহসী অমাত্য তিরস্কারপূর্ণ ভাষায় কুমারের ভ্রম ও কার্য্যের অবৈধতা দেখাইয়া দেওয়াতে তিনি অগত্যা ভ্রাতাকে পথ ছাড়িয়া দিলেন।

ইহার পর বাদসাহ গুলবানুতে উপস্থিত হইলেন। বাদসাহ এখানে আসিয়া শুনিলেন—সের খাঁর সেনানী ক্ষায়ুস খাঁ এখনও আমাদের অনুসরণে আসিয়া ২০ ক্রোশ পিছনে আছেন, এবং বেলুচিরা হিন্দালকে তাহাদের দেশের মধ্য দিয়া গুজরাটে যাইতে দিতে আপত্তি করায় যুবরাজ ভ্রাতার সহিত পুনরায় মিলিত হইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহার পরই দেখি যুবরাজ আসিয়া বাদসাহের চরণ বন্দনা করিলেন। ভাইএ ভাইএ গোলযোগ মিটিয়া গেল। তাঁহার সকল দোষ মাপ হইল। ইহার পর আমরা সিন্ধুনদের ২০ মাইল পশ্চিমস্থিত পাটে যাত্রা করিলাম।

হামিদ্ বানুবেগম।

আমাদের পাটে অবস্থান কালীন হিন্দালের মাতা দিল্‌দার বেগম একটী মহিলা-

ভোজ দেন। এই ভোজ-ক্ষেত্রে অনেক সদ্বংশজাতা সম্ভ্রান্ত রূপবতী রমণীগণ উপস্থিত হন। ইহাদের মধ্যে হামিদবানু বেগম একজন। এই ষোড়শবর্ষীয়া অনুপম রূপ লাবণ্যবতী, গৌরাঙ্গী, হিন্দালের শিক্ষকের কন্যা।

বাদসাহ হামিদ্‌বানুর সেই ফুল্ল-নলিনীবৎ মূর্ত্তিখানি দেখিয়া প্রেম-মোহাক্রান্ত হইলেন। পরে বিমাতার সাহায্যে সেই রূপবতীকে স্বীয় ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলেন। এই হামিদ্ বানুর গর্ভেই মোগল-কুলতিলক, ভাস্করতেজা সাহ আকবর জন্মগ্রহণ করেন।

হিন্দালের বরাবরই ইচ্ছা ছিল হামিদকে বিবাহ করেন। কিন্তু সহসা নিরাশ হওয়াতে ভ্রাতার ও মাতার উপর বিরক্ত হইয়া তিনি কান্দাহার প্রস্থান করিলেন। বাহসাহও তথায় অধিক দিন অবস্থান না করিয়া পত্নী ও দলবল লইয়া ভিকার যাত্রা করিলেন। পথকষ্টে, নিরাশায়, কুলোকের উত্তেজনায়, ভাগ্য বিড়ম্বনায় আমাদের দলের অনেক লোক কমিয়া গেল। যাহারা ছিল তাহারা বলিল, এখনত আমরা সিন্ধু পার হইয়াছি—সের খাঁ হইতে আমাদের আর ভয়ের সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ কান্দাহারে যাইতে চাহিল, কিন্তু বাদসাহ হিন্দালের উপর চটিয়াছিলেন, সুতরাং কান্দাহারে যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। অনেকে ইহাতে আরও বিরক্ত হইয়া উঠিল—দল ছাড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বাদসাহ স্বয়ং সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহাদের চৌকী দিতে লাগিলেন। আমাদের কবি বলিয়াছেন—"সুগন্ধি সেরাজীপূর্ণ পানপাত্র দেখিলে দলে দলে মক্ষিকা আসিবে—কিন্তু সেই পাত্র শ্রেফীপূর্ণ করিলে সবই পলাইবে।" আমরা এই অসন্তুষ্ট দলবল লইয়া অগত্যা স্থান পরিবর্ত্তন করিলাম। ভিকারের প্রান্ত সীমায় মাউ দেশ। এখানে আসিবার পর, অত্যন্ত জল কষ্ট উপস্থিত হইল। বাদসাহের (কেরূটি) জলপাত্র ইতিপূর্ব্বেই শূন্য হইয়াছিল—কাজেই নেমাজের জন্য যে পবিত্র জল ছিল, তাহাই পানার্থে ব্যবহার হইতে লাগিল। সমস্ত দিন চলিয়া আমরা একটী ক্ষুদ্র হ্রদের ধারে উপস্থিত হইলাম। এত রাস্তা চলিয়াছি, কেবল চারি দিকে বিশাল প্রান্তর—কোথাও বৃক্ষপূর্ণ, কোথাও বা বৃক্ষ শূন্য। এক্ষণে এই সুশীতল জল-পূর্ণ হ্রদ দেখিয়া সকলেরই আনন্দ। যত পরিমাণে জল সঙ্গে লওয়া যাইতে পারে, সেই পরিমাণে আমরা জল বোঝাই করিলাম।

এতদিন আমাদের খাওয়া দাওয়ার বড়ই কষ্ট হইতেছিল—কেবল মাত্র রুটী, জল, খর্জ্জুর ইত্যাদি খাইয়া উদর পূরণ করিতে হইতেছিল—কিন্তু বিধাতা আজ আমাদের প্রতি বড়ই সদয় হইলেন। একটী হরিণ সহসা সেই বনের পার্শ্ব দিয়া পলাইতেছিল। বোধ হয় সেটা জল খাইতে আসিয়াছিল। বাদসাহ হুকুম দিলেন—হরিণ ধর। তাড়া পাইয়া হরিণটা হ্রদের মধ্যে পড়িল। বাদসাহ ঘোড়ায় চড়িয়া তীর লইয়া আসিতেছিলেন—কিন্তু আমায় জলে পড়িতে দেখিয়া কহিলেন যদি হরিণটা ধরিতে পার ত সিকিভাগ

পাইবে। হরিণ সন্তরণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল—আমি তাহাকে ধরিয়া তীরে উঠাইলাম। ইহার পর হরিণ কাটা হইল—আমি সিকি লইলাম, বাদসাহ অৰ্দ্ধেক লইলেন—বাকি সিকি সকলে ভাগ পাইল। সেই দিন আমরা খুব পেট ভরিয়া শূল্য মাংস আহার করিলাম। অনেক দিন মাংসের মুখ দেখি নাই, সুতরাং বড় ভাল লাগিল। ইহার পর আমরা আউচ পৌঁছিলাম।

এই সময়ে বাদসাহ পত্নী সাত মাস গর্ব্ভবতী। হা দুরদৃষ্ট! হা দুর্দ্দৈব! সমস্ত হিন্দুস্থানের সম্রাট আজ কালের হস্তে ক্রীড়া পুত্তলি হইয়া চোরের ন্যায় পলায়নে রত। যে বেগম সাহেব চতুর্দ্দোলে, হস্তীপৃষ্ঠে পথভ্রমণ করিতেও কষ্ট বোধ করিতেন, যিনি সর্ব্বদা সূর্য্যের অদৃশ্য হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতেন, শত শত দাস দাসী যাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিত, সুকোমল প্রাসাদে রত্নময় খট্টায় যাঁহার লাবণ্যময় শরীর বিশ্রাম করিত—আজ তিনি সামান্য দরিদ্র পথিক পত্নীর ন্যায় পদব্রজে প্রান্তর, মরুভূমি, অতিবাহিত করিতেছেন। শত শত প্রকার সুরসাল, সুপাচ্য, দেবদুর্ল্লভ খাদ্য যাঁহার দোহদ স্বরূপ ব্যবহৃত হইত, আজ সামান্য খর্জ্জুর ও অৰ্দ্ধ সিদ্ধ চপাটী খাইয়া তাঁহার দোহদাভিলাষ নিবৃত্তি হইতেছে। আকবরের জননী আজ মুখরোচক-প্রিয়কর খাদ্যাভাবে মিয়মাণা হইয়া, পরিচর্য্যা অভাবে শীর্ণা ও মলিনমুখী হইয়া, পথশ্রান্তি ও গর্ব্ভভারে ক্লিষ্ট ও অবসন্ন হইয়া স্বামীর লুপ্ত সৌভাগ্যের অনুসারিণী হইয়াছেন।

বাদসাহ আর পত্নীর দুর্দ্দশা দেখিতে পারিলেন না—তাঁহার পাষাণবৎ বীর হৃদয় বিগলিত হইল। রাজলক্ষ্মী কাঙ্গালিনীর ন্যায় অনুসরণ করিতেছেন, ইহা তাঁহার বড়ই অসহ্য হইল। এত কষ্টেও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই কিন্তু আর তিনি সহিষ্ণুতার সহিত সদ্ভাব রাখিতে পারিলেন না।

আউচের জমীদারের নাম "বকসুইলেঙ্গা"। বাদসাহ তাঁহার নিকট প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চাহিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য লেঙ্গাকে পত্র লিখিলেন। পত্রের উত্তর দেওয়া দূরে থাক্—জিনিসপত্র পাঠান দূরে থাক্, বাদসাহের সহিত দেখা করা দূরে থাক্, যাহাতে বাজারে পয়সা দিয়াও আমরা জিনিস পত্র না কিনিতে পাই, এই নীচ-প্রবৃত্তি পরায়ণ লেঙ্গা তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। কাজে কাজেই আমরা জবর দস্তিতে যাহা পাইতাম, তাহাই খাইতাম; নতুবা গাছের পাতায় জীবন রক্ষা করিতাম। আউচ হইতে আমরা যোধপুরের সীমায় উপস্থিত হইলাম। সমস্ত রাত্রি কুচ করিয়া পর দিন বেলা দ্বাদশ ঘটিকার সময় আমরা মরুভূমিতে পৌঁছিলাম। কি ভয়ানক দৃশ্য! প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তেজ, চারিদিকে সমুদ্রবৎ অনন্ত বালুকারাশি ও বালুকাস্তূপ। সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ সেই বালির উপর পড়িয়া চারিদিকে দীপ্তিমান হইতেছে—ঠিক যেন বোধ হইতেছে আমরা এক অনন্ত মহাসমুদ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া। মাথার উপরে প্রচণ্ড

মার্ত্তণ্ড, চারিদিকে ঘোরতর মরীচিকা, পদতলে তপ্তবালুকা—আর মাঝে মাঝে বালুকা ঝটিকা উপস্থিত হইয়া আমাদের বড়ই ব্যাকুল করিল।

পথে আমাদের বড় জলকষ্ট হইল। কোথাও বৃক্ষ নাই, লতা নাই, ছায়া নাই, বসিবার জন্য শিলাখণ্ড নাই। আমরা ক্রমাগত হাঁটিতে লাগিলাম, সঙ্গে যে জল ছিল, তাহা শেষ হইয়া গেল। তৃষ্ণায় আমাদের বাক্‌রোধ, গতিরোধ হইতে লাগিল—অনেকে তৃষ্ণায় অবশ ও শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া সেই মরুভূমে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। কয়দিন কেহই জল পায় নাই। আমার নিকট বাদসাহের জলপাত্র ছিল, সকলেই তাহার উপর লক্ষ্য করিতে লাগিল। বাদসাহ একদিন রাজ্ঞীর জন্য জল চাহিলেন—কিন্তু একটি যুবক সৈনিক সেই জলের দিকে লোলুপ দৃষ্টি করাতে বাদসাহ বেগমকে না দিয়া তাহাকেই সেই জল পান করিতে দিলেন!

অবশেষে খোদা আমাদের সদয় হইলেন—আমরা দূরে একটী ক্ষুদ্র মারব দ্বীপ দেখিতে পাইলাম। জগদীশ্বরের নাম লইয়া আমরা সেই দিক লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। দ্বীপটী দেখিয়া বোধ হইল—সমুদ্রের মধ্যে যেন একটী ক্ষুদ্র মৃত্তিকাস্তূপ বৃক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া ভাসিতেছে। আমরা দ্বীপের কাছে আসিলাম। বাদসাহ অশ্ব হইতে নামিয়া নেমাজ পড়িয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। এখানে একটী ক্ষুদ্র খাল, কতকগুলি বৃক্ষ ও একটা ক্ষুদ্র তালাও পাইলাম। বাদসাহ, বেগম ও আমাদের অবশিষ্ট সঙ্গীরা সেই গাছের তলায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। যে পরিমাণে জল আমাদের সঙ্গে যাইতে পারে, তদপেক্ষা আমরা অধিক পরিমাণে জল সঞ্চয় করিলাম। যে সকল সঙ্গীরা জলাভাবে অল্প দূরে মৃতপ্রায় পড়িয়াছিল, বাদসাহ তাহাদের জন্য জল পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। তাহাদের মধ্যে কয়েক জন জলপানে নবজীবন লাভ করিয়া আসন্ন মৃত্যু হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। ইহার পর আমরা এই মারব দ্বীপের নিকট বিদায় লইয়া ফেলুদীতে যাত্রা করিলাম। ইহা যোধপুর রাজ মালদেবের রাজ্য সীমাযুক্ত। মালদেব যোধপুরাধিপতি। এই মরুময় যোধপুর সাম্রাজ্য তাঁহার অধিকারে। এক সময়ে তিনি দিল্লীর পরম বন্ধু ছিলেন। সুতরাং হুমায়ুন সাহ তাঁহাকে এক ফারমান পাঠাইলেন। সে ফারমান কে গ্রাহ্য করে? হুমায়ুন তখন সিংহাসন চ্যুত, বলহীন ও সামর্থ্যহীন, অদৃষ্ট চক্রের ঘোরতর সংঘর্ষণে পীড়িত!!! মালদেব ফারমান পাইয়াও আজ কাল করিতে লাগিলেন এবং ইতি মধ্যে আমাদের এক বাজরা ফলমূল পাঠাইয়া দিয়া আত্মীয়তাটাও করিয়া লইলেন। কিন্তু আর কোনরূপ সাহায্য তাঁহার নিকট পাওয়া গেল না। পর দিন আমরা গোপনে সংবাদ পাইলাম—মালদেব আমাদের সঙ্গে কতকগুলি বহুমূল্য মণি মুক্তাদি আছে শুনিয়া তাহা লুণ্ঠনের চেষ্টা করিতেছেন। এই সংবাদে আমরা সেইস্থল পরিত্যাগ করিলাম।

আমরা অমরকোটের পথ ধরিলাম। এই মরুর মধ্যে প্রকৃত পথ অনুসরণ করা

দুরূহ ভাবিয়া আমরা যাত্রাকালীন দুই জন পথ প্রদর্শক লইলাম। কিন্তু জানি না—তাহাদের মনে কি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল! তাহারা আমাদের পথ ভুলাইয়া বিপথে লইয়া গিয়া ও অন্যান্য অনেক অনিষ্ট করিয়া অদৃশ্য হইল। এই সময়ে আমাদের দলে বড়ই বিশৃঙ্খলা ঘটিল। অনেকেই বাদসাহের সহিত কষ্ট সহিতে অসহিষ্ণু হইয়া আমাদের ছাড়িয়া যাইতে চাহিল। বাদসাহ বলিলেন—"তোমরা যাও তাহাতে আমার আপত্তি নাই—কিন্তু বুঝিয়া দেখ—এই অনন্ত মরু ভূমিতে দলভ্রষ্ট হইয়া গিয়া কি সুখ পাইবে—বরঞ্চ এক সঙ্গে থাকা যাক্, সকলেরই অদৃষ্টে যাহা হইবে, তোমাদেরও তাই।" এই কথায় অনেকে থাকিয়া গেল।

এই সময়ে আবার বিপদের উপর বিপদ! রাত্রি প্রভাতে আমরা দেখিলাম তিন দল লোক আমাদের অনুসরণে সেই মরু মধ্যে আসিতেছে। তাহারা সকলেই অশ্বারোহী। উহারা আমাদের শত্রু কি না বাদসাহ শীঘ্রই তাহার সন্ধান লইলেন। শত্রুই স্থির হইল। তিনি হুকুম দিলেন—ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে বোঝাই নামাইয়া দিয়া পদাতিকগণ তদুপরি আরোহণ করুক। সেখ্ আলিবেগ্ নামক একজন দক্ষ কর্ম্মচারীকে লইয়া বাদসা মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন—সেখ্জী বলিলেন "আমরা এমান হোসেনের দশা পাইয়াছি—বীরের মত জীবন রক্ষা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। আমায় জন কতক লোক দিন, জানিয়া আসি উহারা কে?" সেখ্জী জনকয়েক সৈন্য লইয়া পরমেশ্বরের নাম করিয়া অগ্রসর হইলেন। পথি মধ্যে তাঁহার সহকারীদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভাই সকল আমরা সকলে একেবারে তাহাদের উপর তীর নিক্ষেপ করিব। আল্লার উপর বিশ্বাস রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। তাহাতে যাহা কপালে ঘটে ঘটিবে।" শত্রুদিগের নিকটস্থ হইয়া তাহাদের লক্ষ্য ভুক্ত হইবার পূর্ব্বেই আমরা সকলে একেবারে তীর ত্যাগ করিলাম—ঘটনাবশে সেই তীর গিয়া দলপতিকে বিদ্ধ ও ভূপতিত করিল। দলপতির মৃত্যু দেখিয়া আর সকলে ভীত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইল। আমরা তাহাদের অনুসরণ করিয়া মৃত দলপতির দেহ অধিকার করিলাম ও তাহার মস্তক বর্ষার কলস্ করিয়া একজন চোপ্দার দ্বারা বাদসাহের কাছে পাঠাইয়া দিলাম। তিনি ইহা অতিশয় শুভকর বোধ করিলেন। এইবার হইতে নিয়ম হইল বাদসাহ অগ্রভাগ ও সেখ্জী পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা করিয়া আমাদের লইয়া যাইবেন।

আমরা দিবা ভাগে পুনরায় কুচ আরম্ভ করিলাম। পথি মধ্যে আবার এক নূতন বিভ্রাট্ উপস্থিত। মালদেবের নিকট হইতে দুই জন দূত আসিয়া আমাদের বলিল—"বাদসাহ, মালদেবের বিনা অনুমতিতে তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, হিন্দুরাজ্যে গোবধ অতি নিন্দনীয়, বাদসাহ তাহাও করিয়াছেন—ইহার জন্য তাঁহাকে ফলভোগ করিতে হইবে।" আমরা অনন্যোপায় হইয়া রাজনীতি বিগর্হিত উপায় অবলম্বনে ঐ দূতদ্বয়কে আবদ্ধ করিলাম। গোলযোগটা সেদিনকার মত মিটিল।

পর দিন এক নূতন বিভ্রাট উপস্থিত। দূতদ্বয়ের অবরোধ বার্ত্তা মালদেব শীঘ্রই অবগত হইলেন। পর দিন তিনি তাঁহার পুত্রকে এক দল সৈন্য সমেত আমাদের অনুসরণে পাঠাইলেন। আমরা যেদিকে যাইতেছিলাম, ইহারা সেই দিক হইতে আসিতে ছিল—সুতরাং পথে আসিবার সময় সুশীতল জলপূর্ণ কূপ সমূহ বালি দিয়া ভরিয়া দিতে লাগিল। আমরা যতই কূপ দেখি সবই বালুকা পূর্ণ। জল কষ্ট ঐ দিবস বড় যন্ত্রণাদায়ক হইল, আমরা সেইখানে রাত্রিযাপন কল্পনা করিলাম।

বাদসাহ বলিলেন "ভাই সকল আমার জন্য তোমাদের এই কষ্ট, আমি তোমাদের বেতন দিতে পারিতেছি না—তোমরা আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছ। অদ্য তোমরা স্বচ্ছন্দে ঘুমাও, আমি তোমাদের পাহারা দিব। এই উষ্ট্রগুলাকে গোলাকারে সাজাইয়া দাও। ইহারা প্রাচীর স্বরূপ হইবে।" কিন্তু সেখ আলি বাদসাহের প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি করায় তিনি অগত্যা বিশ্রাম করিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই দিন রাত্রে আমাদের তাঁবুতে চোর আসিয়াছিল। সে হতভাগা বাদসাহের কোষ হইতে মণি খচিত তরবারি অর্দ্ধেক বাহির করিয়াছিল— কিন্তু আমরা জাগিয়া ওঠাতে অদৃশ্য হইয়া গেল। এই মরুভূমে চোর আসিল কি প্রকারে— ইহা আমরা স্থির করিতে পারিলাম না।

পরদিন প্রাতে মালদেবের পুত্রের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি কোন প্রকার বৈরীভাব দেখাইলেন না। তিনি বলিলেন "আপনারা বিনা অনুমতিতে আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছেন। যদি আমাদের সম্মতি লইতেন, তাহা হইলে আতিথ্য চর্য্যায় আমরা বিমুখ হইতাম না। তার পরে আরও দুইটী নিন্দনীয় কাজ করিয়াছেন—(১) আমাদের দূতদ্বয়কে অবরোধ, (২) হিন্দুরাজ্যে গো বধ! আপনারা ইহার প্রতিকার করিলে আমি গরু ও লোক আনাইয়া আপনাদের জল তুলাইয়া দিতে পারি ও অন্য প্রকারে সহায়তা করিতেও স্বীকৃত আছি।" আমরা সেই দূতদিগকে ফিরাইয়া দিলাম—সকল গোলযোগ তখনকার মত মিটিল।

ক্রমাগত হাঁটিয়া আমরা অমরকোটের দশ ক্রোশ দূরে পৌঁছিলাম। আমাদের দলের রোশন বেগ নামক একজন সেনানীর দুইটী ঘোড়া ছিল। সে তাহার একটী রাজ্ঞীকে দিয়াছিল ও অপরটীতে নিজে চড়িয়া আসিতেছিল। কিন্তু সহসা তাহার ঘোড়ার পদস্খলন হওয়াতে ঘোড়াটি পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। রোশান এমনি নিষ্ঠুর যে, অসঙ্কচিত ভাবে রাজ্ঞীর নিকট হইতে তাহার ঘোড়াটী ফিরাইয়া লইতে চাহিল। কিন্তু বাদসাহ রাজ্ঞীকে নিজের ঘোড়া দিয়া রোশনকে তাহার ঘোড়া ফিরাইয়া দিলেন ও স্বয়ং পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। ইহা আমাদের সহ্য হইল না। ইচ্ছা হইতে লাগিল দুরাত্মা রোশনকে দ্বিখণ্ডিত করি। কিন্তু অনন্যোপায় দেখিয়া আমার নিজের ঘোড়া বাদসাহকে দিলাম।

এত কষ্ট, পরিশ্রম ও পথশ্রান্তির পর আমরা অবশেষে অমরকোটে উপস্থিত হইলাম। দুর্গাধ্যক্ষ রাণা প্রসাদ বাদসাহের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্যতা ও সহৃদয়তা প্রকাশ করিলেন। আমরা সাত জন সওয়ার লইয়া দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিলাম। রাণা বাদসাহকে বহুমূল্য বস্ত্র, সুন্দর কারুকার্য্যময় তরবারী ও কতকগুলি লোকজন দিয়া সহায়তা করিলেন। সম্রাট রাণার আতিথ্যে প্রফুল্ল হৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট প্রণয় জন্মিল।

রাণার বাটীতে আমাদের কিছুদিন কাটিল। একদিন তিনি বাদসাহকে বলিলেন, "আমার এখানে থাকা আর আপনাদের নিরাপদ নহে। এক কাজ করুন—তাড়া বা জুন * প্রদেশে গমন করিলে তথাকার অধিবাসীগণ আপনাদের নিশ্চয়ই সহায়তা করিবে। আপনার পরিবারকে এইখানে রাখিয়া যান। আমি তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদরে রাখিব।" বাদসাহ ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া ভাবিলেনও ত্বরায় তাড়া প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বার ক্রোশ হাঁটিয়া আসিয়া আমরা এক পুষ্করিণীর ধারে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। পর-দিন প্রাতে অমরকোট হইতে একজন দূত আসিল। মহারাজা রাণা প্রসাদ এই দূত পাঠাইয়াছেন। দূত আসিয়া আমাদের সুসংবাদ দিল—বাদসাহের এক পুত্র হইয়াছে। ৯৪৯ সাবনের পূর্ণিমা তিথি এই পুত্রের জন্মক্ষণ। বাদসাহ বালকের নাম বদর উদ্দিন মহম্মদ আকবর রাখিলেন ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন। §

হা দুর্দ্দৈব! ভারত সম্রাটের একমাত্র পুত্রের জন্মোৎসব বিনা উল্লাসে কাটাইতে হইল। আজ যদি হুমায়ুনের দিল্লীর সিংহাসন থাকিত—আজ যদি তিনি কাল চক্রে এতাদৃশ শোচনীয়রূপে বিঘুর্ণিত না হইতেন—তাহা হইলে হয়ত এই জন্মোৎসবে রাজধানী কোলাহলময়ী হইয়া সকলেরই মনে আনন্দোচ্ছ্বাস বহাইত।

এই সুসংবাদ শুনিবামাত্র অন্যান্য অমাত্যগণ বাদসাহের কাছে আসিয়া বসিলেন। ক্ষীণজ্যোতি জলদজালাবৃত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় বাদ সাহের মুখমণ্ডল হর্ষ বিষাদের অপরি-স্ফুট ছায়ায় অঙ্কিত। তিনি আমায় দুইশত "সাহরূখী" (রজতমুদ্রা) একটী রূপার বলয় ও একটী মৃগনাভি আনিতে বলিলেন। আমি তাঁহার আদেশ পালন করিলাম। বাদ-সাহ সেই মুদ্রাগুলি, আত্মীয়বর্গ মধ্যে বিতরণ করিলেন, কস্তুরীটী একখানি পাত্রে

---

* জুন (Joun) ম্যাপে পাওয়া যায় না—কিন্তু আইনআকবরীতে ইহা হাজিকান সরকারের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। আবুল ফজলের মতে ইহা সিন্ধুতীরবর্ত্তী একটী সুন্দর স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

§ বদর উদ্দিন শব্দের অর্থ "ধর্ম্মজ্যোতিঃ"। কিন্তু প্রাইস প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা বলেন—নাম "জালাল উদ্দিন" রাখা হইয়াছিল। আমরাও তাই বলি। Vide Price's Mahomedan Hist. Vol. III P. 807.

ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া সকলকে বিতরণ করিলেন এবং তাহাদের নিকট এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন "আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন এই মৃগনাভির গন্ধে যেমন এই ক্ষুদ্র শিবির আমোদিত হইতেছে—আমার নবজাত পুত্রের যশঃসৌরভে যেন সমস্ত দিক এইরূপ আমোদিত হয়।" ইহার পর দামামা ও তুর্য্য নিনাদে এই সংবাদ সেই নির্ম্মল প্রান্তরে বিঘোষিত হইল; এবং সেই ক্ষীণ উল্লাস-শব্দ প্রান্তরে উঠিয়া নীল নভোমণ্ডল তলে লয় পাইল।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

অন্তরঙ্গ-তত্ত্ব।

১

একদল লোক আছে, যাহারা পরোক্ষে আত্মীয়তা প্রকাশ করিতে বড় ভাল বাসে। কোনও রকমে সুবিধা করিয়া তোমার সহিত একদিন তাহারা আলাপ করিয়া লয়, এবং পর দিন হইতে আপনাদের তোমার অন্তরঙ্গ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পায়। পরোক্ষে এমনি ভাব দেখায়, যেন তাহাদের নিকট তুমি অন্তঃপুর বাহির করিয়াছ, অসজ্জিত অবস্থায় তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক রহস্য-দ্বারের মধ্য দিয়া যাচিয়া তাহাদিগকে লইয়া গিয়াছ। কল্পনার সাহায্যে তোমার সম্বন্ধে তাহারা অনেক রহস্য উদ্ভাবন করে; তুমি অস্বীকার করিলেও তাহারা তাহাতে অবিশ্বাস করিতে পারে না। তোমার অন্তরঙ্গত্ব প্রকাশ করিয়া তাহাদের বিশেষ কোন লাভ হয় না বটে, কিন্তু স্বভাব ত লাভালাভ দেখিয়া কাজ করে না। তুমি যাহা না জান, বাহিরে বসিয়া তোমার ঘরের কথা তাহারা তাহা সমস্তই জানে। কারণ, গোঁফে চাড়া দিয়া তোমার সম্বন্ধে তাহারা এরূপ অকাট্য সত্য বলিবে যে, তাহাদের আত্মাভিমানপূর্ণ বাক্য-স্রোতের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া কোন প্রকারে তুমি নিজ সম্বন্ধে সামান্য অভিজ্ঞতাও প্রমাণ করিতে পারিবে না।

এইরূপ অন্তর্যামী পরোক্ষ আত্মীয়বর্গের তোমার জন্য কিন্তু অনেক পরিশ্রম সহ্য করিতে হয়। তোমার পরিবারের পাঁচ সাত জন সভ্যের নাম, তোমার গাড়ী ঘোড়ার সংখ্যা, সত্য মিথ্যা তোমার গোটাকতক গুণ এবং দোষ, ইহা তাহাদিগকে নিশিদিন কণ্ঠাগ্রে বহিয়া বেড়াইতে হয়। কারণ, মর্ত্তাভূমে তোমার সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিলে তাহাদের মন্তব্য না দিয়া থাকিবার যো নাই। সাধারণ মতের বিরুদ্ধেও তাহারা কতকগুলা অসাধারণ মত আঁটিয়া রাখে—অসাধারণ কিছু না বলিলে অন্তরঙ্গত্ব লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? বিশ্বাস করাইবার জন্য তাহারা শত প্রকার উপায় অবলম্বন

করে, ধর্ম্ম প্রচারকেরা তত উপায় জানিলে ঘরে ঘরে বুদ্ধ খৃষ্ট চৈতন্যের আবির্ভাব হইত। তোমার মতামত তাহারা তোমাপেক্ষা নিঃসংশয়রূপে বুঝিয়াছে, যে হেতু দুই বেলা অন্ন ব্যঞ্জনের সহিত তাহারা এই বিশ্বাস নিঃশব্দে হজম করিতেছে। এই সকল আত্মীয়তা প্রকাশকেরা যদি প্রচারক-ব্রতে ব্রতী হয়, তাহা হইলে দেশের লোকে জ্বালাতন হইয়া উঠিলেও তাহাদের বিরুদ্ধে কথা বলে না। সেটা কি সুবিধা নয়?

পরোক্ষ আত্মীয়দের কথায় বুদ্ধিমান্ বিবেচকেরা অবশ্য সহজে ভুলেন না। সকলেরই একটা দল আছে; সেই দলই তাহার সাধারণ। এইরূপ গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গদিগেরও রীতিমত সমাজ আছে। সমাজ মন্দিরে একটী ছিদ্র আছে; সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া মিটিমিটি অবিশ্বাস চক্ষুতে চাহিয়া ইহারা বিশ্বসংসার সম্বন্ধে অকাট্য সত্য সংগ্রহ করে। সংগ্রহ যাহার যত অধিক হয়, স্ব-সমাজে তাহারই তত প্রতিপত্তি।

২

প্রত্যক্ষ আত্মীয়ের সংখ্যাও সংসারে বিরল নহে। পরোক্ষ আত্মীয় অপেক্ষা তাহারা তোমার নিকটে নিকটে ঘুরে, এবং তোমাকেই তাহাদের অন্তরঙ্গত্ব বিশ্বাস করাইতে চায়। তোমার জন্য তাহাদের কাঁদুনির বিরাম নাই—তোমার ভাবনা ভাবিয়াই তাহারা আকুল। হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করা নাকি বড় শক্ত ব্যাপার, অথচ তাহারা তোমার হৃদয়ে বসিয়া কাঁদিবার ভাণ করে, এই জন্য সারাক্ষণই তাহাদিগকে চোখের জল মুছিতে হয়। তোমার শত্রু পক্ষ খাড়া করিয়া উদ্দেশে তাহার গালি পাড়ে। অন্তরঙ্গত্ব প্রকাশ করিবার যত উপায় থাকিতে পারে, কোনটীকেই তাহারা বাদ দেয় না। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-বাহুল্যে তোমার যথার্থ আত্মীয়দের সম্বন্ধে অনেক জটিল রহস্যও বাহির হয়; না বুঝ তোমার দোষ, কিন্তু প্রত্যক্ষ আত্মীয়বর্গের বুঝাইবার যত্নের ক্রুটী লক্ষিত হয় না। তুমি না বুঝিলে তাহারা দুঃখিত হয়, ঘাড় নাড়ে, অন্ধকারে অন্ধকারে পুঞ্জীভূত হইয়া তোমার দুঃখের কাহিনী—তোমার সুদূর ভবিষ্যৎ, তোমার বোধশক্তির হীনতা, তোমার কত অজ্ঞাত অমঙ্গলবার্ত্তা—গাহিতে থাকে।

প্রত্যক্ষ আত্মীয়বর্গ যে বাহিরে অন্তরঙ্গত্ব প্রকাশ করিতে চাহে না, তাহা নহে। তোমার চারিদিকে মধুপের মত ঘুরিবার উদ্দেশ্যই তাই। কিন্তু তোমাকেও তাহারা অন্তরঙ্গত্ব না বুঝাইয়া তৃপ্ত হইতে পারে না। তোমার সকল অধিকার মধ্যে তাহারা গলা জাহির করে, দানপত্র লিখিয়া দিলেও লোকে এত চীৎকার করে না। তোমার বিষয় লইয়া তাহারা এরূপ ভাবে নাড়াচাড়া করে, যেন তাহাদের করকমলে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তুমি সন্ন্যাসী হইয়াছ। পরোক্ষ আত্মীয়বর্গের তোমার সহিত বড় সম্পর্ক নাই, প্রত্যক্ষ আত্মীয়বর্গ তোমার সহিত কতকটা জড়িত। তোমাকে তাহারা আত্মীয়তা জানাইতে চায়, এই জন্য অপরের আত্মীয়ভাবের অভাব প্রমাণ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। কিন্তু গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গ উভয়ই। প্রেমের বন্ধন যেখানে নাই,

সেখানে অন্তরঙ্গত্ব হয় কিরূপে? তর্ক করিয়া ত অন্তরঙ্গত্ব প্রমাণ করা যায় না। আর লৌকিকতার অনুরোধে বিনয় করিয়া লোকে যে আত্মীয়তা প্রকাশ করে, অন্তরঙ্গত্ব হইতে তাহা বহুদূর। তাহা কেবল সামাজিক প্রথার আবরণ।

যথার্থ অন্তরঙ্গত্ব আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত নয়। অগাধ জলেই অন্তরঙ্গত্ব জন্মায় কি না। শফরীবর্গ অল্প জলে লাফালাফি করে, এবং এই লাফালাফিতেই শীঘ্র ধরা দেয়। প্রত্যক্ষ আত্মীয়বর্গ স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। লম্ফ ঝম্পের উপরেই ইহাদের সমাজে প্রতিপত্তি নির্ভর করে। আর পণ্ডিতেরা এই লম্ফ ঝম্পের ব্যাপার দেখিয়াই আত্মীয়বর্গের জাতি নির্ণয় করেন।

৩

চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া স্ত্রীজাতির মধ্যেই অন্তরঙ্গত্ব অধিক বলিয়া মনে হয় না? স্ত্রী সম্মিলনীতে হৃদয়ের অন্তঃপুর ত আর থাকে না, যাহা কিছু গোপনীয় ছিল—ব্যক্ত হইয়া পড়ে। যেমন করিয়া হৌক্ দুইটী জিহ্বা একত্র হইলে স্বামীবর্গ সমালোচিত হয়েন, শত্রু মিত্র যথাযথ বর্ণে দেখা দেন, টীকা টিপ্পনী অলঙ্কার বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। সুতরাং স্ত্রীজাতির মধ্যে অন্তরঙ্গত্বের বিশেষ প্রাদুর্ভাব অনুমান করা নিতান্ত অন্যায় নহে। হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে যাহার দিন রাত্রি প্রবেশাধিকার আছে, সেই ত অন্তরঙ্গ। স্ত্রী সম্মিলনীতে এ অধিকার প্রায় দেখা যায়। তাই ত বলিতেছি, স্ত্রীজাতি অন্তরঙ্গের দল।

সত্যই কি তবে স্ত্রীজাতি অন্তরঙ্গপূর্ণ? বাহির হইতে দেখিলে তাহাই মনে হয় বটে, কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। স্ত্রীহৃদয়ে তেমন অন্তঃপুব বন্দোবস্ত নাই। লঘু হৃদয় সহজেই ঝরিয়া যায়—অন্তরঙ্গত্ব জন্মাইবার বহু পূর্ব্বেই স্ত্রীহৃদয় শূন্য হইয়া পড়ে। তাহাদের কথাবার্ত্তায় অন্তরঙ্গত্ব মনে হইলেও তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে। স্ত্রীলোকেরা প্রথম আলাপেই লোহার সিন্দুক খুলিয়া বসে, সম্পর্ক পাতাইয়া লয়, কিন্তু পুরুষের মত স্থায়ী আত্মীয়তা তাহাদের অল্পই জন্মে। আর অন্তঃপুর ঘুরাইয়া লইয়া আসিলেও তাহারা যে যাহাকে তাহাকে সেখানে থাকিতে দেয় তাহা নহে। আমার বোধ হয়, আল্‌গা স্বভাব বশতঃ তাহারা অনেক সময় অন্তঃপুরের জানালা দরজা এরূপ ভাবে খুলিয়া রাখে যে, বাহির হইতে উঁকি মারিয়া লোকে ঘরের দেয়ালের ঝুল কালি দেখিয়া লয়। কিন্তু তাহাতে উঁকিবিদ্যাপারদর্শীদিগের অন্তরঙ্গত্ব ত প্রমাণ হয় না। আল্‌গা প্রকৃতিকেও অন্তরঙ্গ ঠাহরান যায় না।

অন্তরঙ্গত্ব কোথায়? যেখানে দুই হৃদয়ের মধ্যে ব্যবধান নাই, যেখানে অজ্ঞাতসারে নিন্দাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অথবা সারল্য প্রদর্শনার্থে কথা বাহির হয় না, হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে নিঃস্বার্থ নীরব প্রেম উছলিয়া উঠিয়া পরস্পরের সকল দুঃখ যন্ত্রণা মুছিয়া দেয়, সেইখানেই অন্তরঙ্গত্ব। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হইতেই তাহার উৎ-

পত্তি, কিন্তু এ আত্মীয়তা অবশ্য জাঁতায় পেষা নহে। স্বাধীনভাব না থাকিলে অন্তরঙ্গত্ব জন্মায় না।

এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার আবশ্যক নাই। বরঞ্চ কিছু বাহুল্যই হইয়াছে বোধ হয়। এখন পাঠকবর্গ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া এবার মধ্যম হইতে উত্তম পুরুষে আসিয়া দাঁড়াই। দাঁড়াইয়া স্ফীতবক্ষে গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া সকলকে সাবধান করিয়া দি, শফরীবর্গকে অন্তরঙ্গ ভাবিয়া সে দিকে কেহ তাকাইয়া না থাকেন। কারণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে জানিলেই শফরীবর্গ অধিক লাফালাফি আরম্ভ করে।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহত্ত্ব।

১

মহত্ত্ব সকলে সহিতে পারে না। মহত্ত্বের সম্মুখে আপনার ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিয়া অনেকে তাহার উপর রাগিয়া থাকে—মহত্ত্বকে অবিশ্বাস করিয়া তৃপ্ত হইতে চায়। মহত্ত্ব কিছু বলে না, সারাক্ষণ তাহাদেরই পানে তাকাইয়া থাকে না, এই জন্য মহত্ত্বের প্রতি তাহারা আরও অধিক বিরক্ত হয়। মহত্ত্বের খুঁৎ ধরিবার জন্য তাহারা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ে, মহত্ত্বের নিন্দা করিতে পারিলে আপনাদের ভাগ্যবান্ বিবেচনা করে। মহত্ত্বের উদার ভাবের মধ্যে আপনাদের সঙ্কীর্ণ হৃদয় দিয়া তাহারা সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-সাধন-উদ্দেশ্য দেখিতে পায়, এবং প্রতিপলকে তাহার পদস্খলন আশা করিয়া অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকে। পদস্খলন হওয়া মানবের পক্ষে কোন কালেই অসম্ভব নয় সুতরাং মহত্ত্বের সামান্য পদস্খলন হইলে মহত্ত্বঅসহিষ্ণুদিগের সুখের সীমা থাকে না। দৈবাৎ যদি তাহার পদস্খলন না দেখিতে পায়, আড়াল হইতে মহত্ত্বের দেহে পঙ্ক নিক্ষেপ করে।

মহত্ত্বের কথা উঠিলেই তাহারা আরও মহত্ত্ব আশা করে, নহিলে মহত্ত্ব রহিল কোথায়? সামান্য উদারতা তাহাদের চক্ষে পড়ে না, আরও উদারতা নহিলে হইল কি? তাহাদের হিসাবে মহত্ত্ব ঈশ্বরের পর আর কাহারও থাকিতে পারে না, তবে স্বয়ম্ভু মহত্ত্বঅসহিষ্ণু সমালোচক-বৃন্দের কতকটা মহত্ত্ব আছে অবশ্য। তাহা না থাকিলে মহত্ত্ব যে বিচারবিহীন হইয়া মারা যায়। মহত্ত্ব আপনার কর্ত্তব্যে রাজপথ দিয়া সাহস করিয়া চলিয়া যায়, কাতর সমালোচকবর্গের বিবর্ণ বদন-মণ্ডল সম্মুখে রাখিয়া চলা

তাহার পোষায় না ; এই জন্য তাহার নামে ছড়া বাঁধিয়া গল্প রটাইয়া তাহারা তৃপ্তি লাভ করে। তাহারা দেখায়, মহত্বকে তাহারা পরম আয়ত্ত করিয়াছে, অপরে তেমন পারে নাই ; সুতরাং তাহাদের মহত্বের দোষ না দেখিলে চলে না।

মহত্বকে বুঝিবার জন্য যে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক, ইহা তাহারা বুঝে না। উপযুক্ত শিক্ষা নহিলে উন্নত উদার মহত্বকে কখনও ধরা যায় না। মহত্বকে ভাণ বলিয়া মনে হয়—কাপট্য বৈ তাহাতে আর কিছুই যেন নাই। মহত্বকে বুঝিতে হইলে তাহার সমাজ ভুক্ত হইতে হইবে, তাহার শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইবে, স্ব-পাণ্ডিত্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কিন্তু অসহিষ্ণুরা এত কষ্ট স্বীকার করিতে সম্মত নহে। তাহাদের বিশ্বাস, স্বভাবতই তাহারা শিক্ষিত। অন্ততঃ তাহারা এইরূপ ভাণ করে। এবং শিক্ষা অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়া বুদ্ধি-দৃপ্ত স্ফীতবক্ষের জোরে মহত্বে৷ মহত্বকে গালি দিয়া তৃপ্ত হয়।

২

অক্ষমতাই মহত্বের উপর বিরক্তির প্রধান কারণ। আলস্য পরিহার করিয়া কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য নির্ভয়ে খাটিয়া যাওয়া অনেকের পোষায় না। তাহারাই আপনাকে প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় মহত্বের নিন্দা রটাইয়া বেড়ায়। মহত্বের উন্নত মস্তকের আড়ালে তাহারা ঢাকা পড়িয়া যায়, এই জন্য লাফালাফি না করিলে তাহাদের কেহ দেখিতে পায় না। অকারণে ভীত হইয়া কৃষ্ণ সর্প যেমন মানব শরীরে দংশন করে, মহত্ব অসহিষ্ণু অলসেরা সেইরূপ মহত্বের উদার সরল দৃষ্টিতে সঙ্কুচিত হইয়া তাহার হৃদয়ে গোপনে ছুরিকা বিঁধাইতে পারিলে ছাড়ে না। অসহিষ্ণুরা কিন্তু মহৎ ভাবের প্রতি বিরক্তি বাহিরে প্রকাশ করে না, কেবল মহৎ জীবনকে কাপট্য প্রমাণ করিতে গিয়াই তাহারা ধরা দেয়। জীবন্ত মহত্বের সুখ্যাতি শুনিলেই তাহারা মৃত মহত্বের নাম দিয়া তাহা ঢাকিতে চায়। প্রেত ভূমির অন্ধকারেই তাহাদের যাহা কিছু আশা ভরসা।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কতকগুলি মৃত মহত্বের নাম তাহারা সংগ্রহ করিয়া রাখে, আবশ্যক হইলেই আওড়াইয়া যায়। নাম আওড়াইবার সময়ে তাহারা এমনি ভাবভঙ্গী প্রকাশ করে, যেন পূর্ব্বজন্ম আসিয়া তাহাদের স্মৃতিপথে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। মৃত মহত্বের কোষ্ঠী পর্য্যন্ত তাহারা প্রস্তুত করিয়া দেয়—কে বলিবে যে, কল্পনা সে কোষ্ঠীর রচয়িতা ? জীবন্ত মহত্বের মধ্যে স্ব-সমাজের অগ্রণী অসহিষ্ণুবর্গকেই তাহারা দেখিতে পায়। পাছে তাহাদের সারল্য সম্বন্ধে কাহারও মনে সন্দেহের উদয় হয়, এই জন্য তাহারা আগেভাগেই মহত্বের কৌটিল্য প্রমাণ করিতে বসে। কিন্তু তাহাতেও তাহারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না, সুবিধামত কথায় কথায় আপনাদের সারল্য ব্যক্ত করে। তাহাদের হৃদয়ের জ্বালা কিন্তু কিছুতেই ঘুচে না।

মহত্ত্বকে আক্রমণ করার একটা সুবিধা এই যে, তাহার নিকট প্রতি আক্রমণের বড় আশঙ্কা নাই। যদি বা সে ফিরিয়া দাঁড়ায় তাহাতে সপক্ষ পিপীলিকাবর্গের গৌরব বৃদ্ধি বৈ হ্রাস হয় না। সুতরাং এরূপ অবসর ক্ষুদ্রেরা ছাড়িতে পারে না। সহিষ্ণু মহত্ত্বকে না ধরিলে ক্ষুদ্রত্ব ধরিবে কাহাকে? এমন নিরাপদ ত আর কোথাও নয়। এই জন্যই তাহারা মহত্ত্বকে ভেংচাইয়া কৃতার্থ হয়, মহত্ত্বের নিন্দা রটাইয়া সুখ উপভোগ বিপক্ষতাচরণই তাহাদের জীবনের কার্য্য।

৩

কিন্তু মহত্ত্বকে তাহারা কি চাপিয়া মারিতে পারে? সে আপনার প্রতিভার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে থাকে, নীরবে নিঃশব্দে চতুর্দ্দিকের অন্ধকার কুয়াসার উপরে হৃদয়ের জ্যোতি বিকীর্ণ করে। ক্ষুদ্রত্ব ক্ষণিকের জন্য তাহাকে আড়াল করিতে পারে, কিন্তু মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের কনক-কিরণ-মালা ক্ষীণ মেঘে কতক্ষণ ঢাকা থাকে? সহস্র বাধার মধ্য হইতেও মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠে। একবার জমি পাইলে মহত্ত্বকে চাপিয়া রাখা যায় না।

সমাধি মন্দিরেই কিন্তু মহত্ত্বের গৌরব। জীবনে তাহাকে চিরদিন সহিতেই হইয়াছে, মরিবার পর তাহার চিতাভস্ম পূজা করিবার জন্য লোকারণ্য। অসহিষ্ণুরা তাহার নাম জপিতে থাকে, তাহার নাম শুনিলে প্রেমে গলিয়া যায়। বোধ করি, তাহাদের তখন অনুতাপ উপস্থিত হয় যে, জীবনে তাহাকে অনর্থক কত কষ্ট দিয়াছে। মহত্ত্ব মরিয়াই যথার্থ বাঁচিয়া উঠে।

মহত্ত্বের মরিবার ক্ষমতা আছে। সত্যের জন্য সে অকাতরে জীবন দান করিতে পারে। এই জন্য অমর ভবনে তাহার কখনও স্থানাভাব হয় না। তাহার রাজ্যে তুচ্ছ কানাকানি নাই, পরশ্রী কাতরা হিংসা মায়াবিনী নাই, সেখানে সত্যের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রেম নিশিদিন সত্যের মন্দিরে প্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়া আছে, যে এস সে এস সত্যের মঙ্গল-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া যাও। সত্যের বিভীষিকা ঘুচিয়া যাইবে। তাহার কি বিভীষিকা আছে? মিথ্যারই ত যত বিভীষিকা।

সত্যের মন্দিরে মহত্ত্ব নির্ভয়ে উপাসনা করিতেছে। মিথ্যা-ছলিতেরা মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া মহত্ত্বকে গালি পাড়িতেছে। তাহার কর্ণে সে গালি অমৃত বর্ষণ করিতেছে। মহত্ত্বের উদার হৃদয়ে সে সুবিন্যস্ত বাক্যাবলীর রেখা পড়ে না। মহত্ত্ব দৃষ্টিতে কাতর তাহাদিগকে ডাকিতেছে—সত্য হইতে কেহই না বঞ্চিত হইয়া থাকে। কর্ত্তব্য সাধনেই তাহার সুখ। সে নির্ভয়ে কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চলিয়াছে; এখন যে এস যে যাও।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্তোত্র।

কে আছে জগতে বল
তোমা হতে প্রিয়তম ?
আত্মীয় স্বজন যারা,
তারা কি তোমার সম ?

সংসারের যাহা কিছু,
সব দূর দূরান্তরে।
কেবল তুমি হে দেব
অন্তরেরই অন্তরে—

কাঁদিব হরষে হেরি,
সুন্দর রচনা দিলে,
ফুটিলে গগণে তারা,
ধরণী ছাইলে ফুলে।

ভালবাসা মা পেয়েছি,
পেয়েছি স্বরগ হাতে;
ভাই বোন তারা সব,
সুখ শান্তি সাথে সাথে।

আপন অভাব তুমি—
আপনি করেছ দূর;
তুমিই পিপাসা দেব
তুমি বারি সুপ্রচুর।

আলোক তোমার জ্যোতি,
আঁধার তোমারই ছায়া;
আলোকে আনন্দ ভাসে
আঁধারে ঘেরিছে মায়া।

তুমি ভাল বাসিয়াছ—
জগৎ বেসেছে ভাল,
আঁধার ছিল এ প্রাণ
তাইত জ্বেলেছো আলো।

এক ফোঁটা ইহকাল
দুদিনে ফুরায়ে যেত!
পরকাল আনি তাই
জীবন বাড়ালে এত।

মৃত্যুর বিকট ছায়া—
মুখেতে পড়েছে যার,
বল বিভো তোমা ছাড়া,
কোথা শান্তি আছে তার ?

আজ যারে ভাল বাসি,
কাল তারে ছেড়ে যাব
আজ যে বাসিল ভাল,
কাল তারে কোথা পাব ?

প্রাণের মাঝারে যদি
ওকথা শুনিতে পাই;
কি আর চাহিব দেব
যা প্রভো তোমাতে নাই!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

গান শিক্ষা।

(১২৯৫ শকের ভারতী ১২ ভাগ নবম সংখ্যায় ৪৮৪ পৃষ্ঠায় যে স্বর-লিপি আছে তাহা দেখ।)

গুজরাটি ভজন—তাল ঝাঁপতাল।

যাওরে অনন্ত ধামে মোহ মায়া পাসরি
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি, যে লোকে ;
কেবলি আনন্দ স্রোত চলিছে প্রবাহি।
যাওরে অনন্ত ধামে, অমৃত নিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে।
দেবঋষি রাজঋষি ব্রহ্মঋষি যে লোকে
ধ্যান ভরে গান করে একতানে।
যাও রে অনন্তধামে জ্যোতির্ময় আলয়ে,
শুভ্র সেই চির বিমল পুণ্য কিরণে।
যায় যেথা দানব্রত সত্যব্রত পুণ্যবাণ,
যাও বৎস যাও সেই দেব-সদনে।

গ২ গ১ স১। গ২ র১ স১ ন১। স২ র১ গ১ গম১। র১ প১ ম১ গ২। স২ র১ র১প১।
যাও রে অ— ন—ন্ত ধামে মোহ মা—য়া পা — শরি, দুঃ—খ—আঁ—

প১ ধ১ প১ ম১ ম১। গ১ গর১ স১ র১ গ১। রগর১ স৪ ॥
ধা — র যেথা কি—ছু—ই না — — — হি।

স১ র১ ম১ ম১ ম১। ম১ প১ প১ প১ প১। প১ ধো১ ধো১ ধো১ নো ধো১।
জ—রা — নাহি, ম—র—ণ না—হি শো — ক না—হি

প১ ধোপ১ ম১ প২। গ১ গ১ ম১ ধো১ ধো১। প১ ধো১ প১ ম১ পম১।
যে — লোকে কে—ব—লি — আ —ন— ন্দ স্রো— — ত

গ১ ম১ গ১ রগ১ স১। রগ১ মপ১ ম৩ ॥
চ—লি ছে — প্র —বা — — হি ॥

শ্রীইন্দিরা দেবী

জীবন-সংগ্রাম।

প্রাণী জগতের দিকে নেত্র পাত কর, দেখিতে পাইবে সকলেই একই উদ্দেশ্যে চলিতেছে ফিরিতেছে—সকলেই একই আকাঙ্ক্ষা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছে এবং তাহারই পূরণাভিলাষে দেহ মন পাত করিতেছে। যদিও তাহাদের কার্য্যপ্রণালী সকল এত বিভিন্নরূপ যে, ঐ সকল কার্য্য কলাপের মধ্যে যে কোন ঐক্যতা আছে, তাহা সহসা প্রতীয়মান হয় না, কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহাদের ঐক্যতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকে না। বুদ্ধিমান মানুষের সহিত ইতর প্রাণীদিগের যে কোন সংস্রব আছে, তাহা যদিও বুঝিয়া উঠা ভার—কিন্তু বাহিরের আবরণটি একবার উন্মোচন কর—অমনি দেখিতে পাইবে তাহার প্রত্যেক কার্য্যের সহিত ঐ সামান্য জন্তুটির কত সাদৃশ্য আছে।

ধর্ম্মযাজকের অশ্রু বিগলিত প্রার্থনা নিচয়—সন্যাসীর কঠোর যোগাভ্যাস—আর বৈষয়িকের অর্থান্বেষণ—সকলেরই উদ্দেশ্য এক, তবে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিয়াছেন মাত্র। কে যে সুপথে আর কে যে বিপথে চলিয়াছেন, তাহার আলোচনায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু সকলেই যে জীবন সংগ্রামে (Struggle for existence) জয়ী হইবার আশায় চলিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সমুদয় চেতন পদার্থের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ কার্য্য প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। সামান্য উদ্ভিদ প্রাণী হইতে অত্যুন্নত মানুষ পর্য্যন্ত সকলেই জন্ম, বৃদ্ধি, গতি, উৎপাদন এবং মৃত্যু এই সকল কার্য্য সমানরূপে সমাধা করিয়া থাকে; এবং এই সকলই জীবনের অন্যতম লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। যে সকল জীব এই সকল কার্য্য বিশেষ কোন প্রণালীবদ্ধ হইয়া সম্পন্ন করে, তাহাদিগকে আমরা অপেক্ষাকৃত উন্নত জীব বলিয়া বিবেচনা করি; আর যাহাদের কার্য্যের মধ্যে শৃঙ্খলা ও বিধির সহিত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাদিগকে আমরা উন্নতির চরম সীমায় স্থাপন করি। মনুষ্য জাতি উন্নতির এই শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন; অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে জন্ম, বৃদ্ধি, উৎপাদন প্রভৃতি জৈবনিক কার্য্য সকল অতি সুন্দররূপে এবং বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা চালিত হইয়া সম্পাদিত হয়। মনুষ্যজাতি যে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহার এইরূপ ব্যাখ্যা করাতে অনেকে ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিবেন; কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদের ক্রোধের কোন কারণ নাই। একটি মনুষ্য-জীবনের ঘটনাবলী একবার পর্য্যালোচনা কয়িয়া দেখুন;—দেখিতে পাইবেন তাহা কেবল জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনা নিয়মের সমষ্টিমাত্র। এই সঙ্গে আবার যদি একটি নিকৃষ্টতম জন্তুর জীবন ইতিহাস পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন তাহাও উপরোক্ত জৈবনিক কার্য্য সকলের সমষ্টি মাত্র।

এই যে অনন্ত বিশ্বরাজ্যে অনন্ত উন্নতি বিরাজ করিতেছে, ইহার কি কোন তত্ত্ব নিরূপণ করিতে আমরা সক্ষম ? বহু শতাব্দি হইতে এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ মাথা ঘামাইতেছেন কিন্তু কেহই ইহার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই ; কিন্তু ইহার মধ্যে যে এক আশ্চর্য্য কৌশল বিরাজিত, তাহা সকলেই অনুভব করিয়াছিলেন। Aristotleএর সময় হইতে অনেক দার্শনিকই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, অতি সামান্য সামান্য জীবের ক্রমোন্নতিতেই উন্নত জীব সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। Aristotleও স্বয়ং ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। লেমার্ক (Lamerk), জিয়ফেরি (Geofery), সেণ্ট হেলার (St. Halar) ; কবি গোয়েথ (Poet Goeth), ডাক্তার ইরাসমাস ডার্‌উইন্* (Dr Erasmus Darwin) প্রভৃতি আরও অনেকে এই মতের উন্নতি বিধানে যত্নবান ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই এই ক্রমোন্নতির মূলে যে মহতী শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহার নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। হার্‌বার্ট স্পেন্‌সার (H. spencer) ইহাকে জীবন-সংগ্রাম নামে আখ্যায়িত করেন ;—ডার্‌উইন ইহারই নামান্তর করিয়া "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নামের বিভিন্নতা হইলেও মূলে যে ইহারা এক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে ডাক্তার হুপার, (Dr. Hooper) প্রফেসার হাক্সলি (Prof. Huxley) এবং সার চার্লস্ লায়েল (Sir Charles Lyall) প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে পরিগণিত।

অধিক অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে "জীবন-সংগ্রাম" কথাটি কি অর্থে ব্যবহার হয়, তাহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। মনে করুন এক টুকরা জমীতে আমরা কতকগুলি বীজ বপন করিলাম ; তাহাতে এক সহস্র বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। সেই ভূখণ্ডে যে পরিমাণে, জল (Moisture), অম্লজান (Oxygen), যবক্ষার জান (Nitrogen) এবং অন্যান্য গলনীয় পদার্থ (Soluble salts) বিদ্যমান আছে, তাহাতে ঐ এক সহস্র বৃক্ষের পুষ্টি সাধন হওয়া অসম্ভব। যাহারা অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর সামগ্রী শোষণ করিতে সক্ষম হইবে, তাহারাই বৃদ্ধি পাইবে, এবং অবশিষ্ট সকলে জীবন হীন হইয়া শুষ্ক হইয়া যাইবে—অর্থাৎ ঐ সহস্র বৃক্ষের মধ্যে এক সংগ্রাম বাধিয়াছে—যাহারা উপযুক্ত, তাহাদেরই জয় হইবে—"Survival of the fittest is the final out-come !"

কিন্তু এই খানেই জীবন-সংগ্রাম শেষ হইল না। যাহারা অধিক পরিমাণে ফল প্রসব করিতে পারিবে, তাহাদেরই অধিক বংশ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু ফুলের উপরেই ফল উৎপাদন শক্তি নির্ভর করে ; অর্থাৎ যে সকল বৃক্ষের ফুল অধিক পরিমাণে উপস্থিত হইবে, সেই সকল বৃক্ষই সুচারুরূপে ফল উৎপাদনে সমর্থ হইবে। সকলেই

* ইনি চার্লস্ ডারউইনের (Charles Darwin) পিতামহ

অবগত আছেন যে মক্ষিকাকুল এই গর্ভ সঞ্চারণ কার্য্যের প্রধান উপায়। মধু অন্বেষণে যখন তাহারা ফুলে ফুলে ভ্রমণ করে, তখন জ্ঞাতসারেই (?) হউক বা অজ্ঞাত-সারেই হউক তাহারা একটি ফুলের পরাগ কেশর হইতে ফুল-রেণু লইয়া অন্য ফুলের গর্ভ কেশরের সহিত সংযোজিত করে এবং এই প্রথাতেই অধিকাংশ পুষ্প ফলবতী হয়। * অতএব দেখুন যে সকল বৃক্ষ অধিক পরিমাণে মক্ষিকা আকর্ষণে সমর্থ, তাহাদেরই উপসৃষ্ট (fertilized) হইবাব অধিক সম্ভাবনা; অর্থাৎ যাহাদের ফুলে অধিক পরিমাণে মধু সঞ্চারিত হইবে—যাহারা মনোমোহন কার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইবে, তাহারাই বিশিষ্ট রূপে ফল উৎপাদনে সমর্থ হইবে। খালি ফল প্রসব করিলেই আবার চলিবে না। কারণ যদি সেই সকল ফল সেই জমী টুকুর উপরেই পতিত হয়, তাহা হইলে তন্মধ্যস্থ বীজ সকলের বৃদ্ধি পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। অতএব এমন কোন উপায় চাই যদ্দারা ঐ বীজ সকল অন্যস্থানে নীত হইতে পারে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পক্ষীজাতি এই কার্য্যের উপায় স্বরূপ। তাঁহারা ফল খাইবার কালীন বীজ সকল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া ফেলে এবং যে সকল বৃক্ষের বীজ বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, তাহাদেরই অধিক পরিমাণে বংশ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ইহাতেও একটু গোল আছে। পাখিরা সকল বৃক্ষের ফল সমান রূপে পসন্দ করে না। যে বৃক্ষের ফল খুব সুমিষ্ট এবং দেখিতে খুব সুন্দর, তাহারাই অধিকাংশ পক্ষী আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় এবং তাহাদেরই বীজ অধিক পরিমাণে, স্থানান্তরিত হয়, সুতরাং তাহাদেরই বংশ বৃদ্ধির অধিক সম্ভাবনা। এখন যদি একবার সেই সহস্র বৃক্ষের পরিণাম চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যে হয় ত ১০০ বৃক্ষ উত্তম বংশ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে; এবং অবশিষ্ট সকলের মধ্যে কেহবা অপ্রাপ্ত বয়সে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, আর কেহ বা উত্তম ফল প্রসব করিতে অসমর্থ হওয়ায় কালক্রমে তাহাদের বংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহাতে এই পর্য্যন্ত বুঝা যাইতেছে যে, যে পরিমাণে আহার ও স্থানের সংস্থান আছে, তাহা অপেক্ষা অধিক প্রাণী বৃদ্ধিই এই মহাসংগ্রামের একমাত্র কারণ। সেই স্বল্পায়তন ভূক্ষেত্রে এক সহস্র বৃক্ষ উৎপন্ন করা হইয়াছিল বলিয়াই না তাহাদের মধ্যে এই সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছিল? প্রকৃতও যে এইরূপ হইতেছে তাহার প্রমাণ কি? এই অনন্ত প্রসারিত ধরণীর মধ্যে জীব জন্তুদের আহার ও স্থানের সঙ্কুলান হয় না ইহা কি সম্ভবপর? বর্ত্তমান শতাব্দির মধ্যে যে কয়েক বার জন সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ পাঠ কর, এ প্রশ্নের উত্তর পাইবে। এই

* গর্ভ সঞ্চারণের আরও অনেক উপায় আছে, আমরা উদাহরণ স্বরূপ একটিই উল্লেখ করিলাম।

পঁচিশ বৎসরের মধ্যে মনুষ্য জাতির লোক সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে; এবং এই পরিমাণে যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে কয়েক সহস্র বৎসর পরে দাঁড়াইবার স্থান হওয়া দুষ্কর হইবে। লিনিয়াস্ (Lænens) গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যদি কোন ওষধিতরু (Annual plant) বৎসরে কেবলমাত্র দুইটি করিয়া বীজ উৎপন্ন করে (যদিও এরূপ কোন বৃক্ষই নাই) এবং ঐ বীজ হইতে যদি পর বৎসর আর দুইটি হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে সেই একটি বৃক্ষ হইতে ২০ বৎসর পরে ১০০০,০০০. বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। সমুদয় জন্তুর মধ্যে হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা কম সন্তান প্রসব করে। তত্রাচ তাহার সমুদয় সন্তান সন্ততি যদি বংশ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে কি পরিমাণে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, ডারউইন্ সাহেব তাহার একটি হিসাব দিয়াছেন। হস্তীরা ৩০ বৎসর বয়সের সময় হইতে সন্তান উৎপাদন করিতে আরম্ভ করে এবং ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাদের সন্তান উৎপাদন শক্তি বর্ত্তমান থাকে। এক জোড়া হস্তী এই ৬০ বৎসরের মধ্যে অনূ্যন ৩ জোড়া সন্তান প্রসব করে। এই হিসাবে যদি ক্রমাগত, সন্তান সন্ততি ক্রমে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি চলিতে থাকে, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ৫০০ বৎসর পরে ১৫০০০,০০০ হস্তী বর্ত্তমান রহিয়াছে, আর এই ১৫০০০০০০ হস্তীই এক জোড়া মাত্র হস্তী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। † এখন একবার কল্পনা করুন দেখি, যদি পৃথিবীর সমুদয় হস্তীই এইরূপে বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে, তাহা হইলে কয়েক বৎসর পরে কি অন্য কোন জাতির দাঁড়াইবার স্থান হইবে? এক হস্তীজাতিতেই জগৎ সংসার ছাইয়া যাইবে। ডারউইন বলিয়াছেন "Living beings multiply in Geometrical rates."

তবেই দেখা যাইতেছে যে সমুদয় জীবজন্তু অতি আশ্চর্য্যরূপে বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এমন কি এ সুবিশাল বিশ্ব সংসারে সকলের আহার ও স্থানের সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। অপরিমেয় আহার ও স্থান না পাইয়া প্রাণী সমূহের মধ্যে এক সংগ্রাম বাধিযাছে—যাহারা উপযুক্ত তাহারাই জয়ী হইতেছে এবং উত্তরোত্তর তাহাদেরই বংশ বৃদ্ধি পাইতেছে। কত সহস্র সহস্র জীব, কত সহস্র সহস্র জাতি এই মহা সংগ্রামে বিজিত ও পরাজিত হইয়া অনন্ত কাল-সাগরে লীন হইয়া যাইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? একটি মৎস্য হয়ত এক লক্ষ ডিম্ব প্রসব করিল, কিন্তু তাহা হইতে দশটি মৎস্য উৎপন্ন হইল কি না সন্দেহ। একটি বৃক্ষে হয়ত সহস্র সহস্র ফুল হইতেছে কিন্তু তাহার মধ্যে কয়টি ফল উৎপাদনে সমর্থ হয়? বড়ই আবেগের সহিত কবি গাহিয়াছেনঃ—

† Vide Darwin's "Origin of Species" page 75—"Geometrical rates of increase."

"ফুটিতে পারিত ফুল,
না ফুটিয়া ঝরে গেল।
গাহিতে পারিত পাখী
না গাহিয়া মরে গেল।"

যুদ্ধ-বিগ্রহ মড়ক প্রভৃতি বিপ্লব সকল ভাবপ্রবণ বাঙ্গালি হৃদয়ে বিভীষিকা উৎপন্ন করে। যুদ্ধ বিগ্রহের নামে পৈশাচিক পাশবিক ইত্যাকার শব্দে দেশ কম্পিত হইতে থাকে। কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ বিপ্লব সকল যে জাতি সমূহের উন্নতির মূল কারণ, তাহা কি কেহ কখন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? নিরামিষভোজীর দল কয়েকটি ছাগ ও মৎস্যের প্রাণ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন— কিন্তু এই অনন্ত সংসারে যে অনন্ত জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে তাহার কি করিয়াছেন? প্রাকৃতিক নিয়মের উপর হস্তক্ষেপ!!

এখন এই পর্য্যন্ত বুঝা গেল যে জীবগণ সকলেই দিবানিশি এক মহা সংগ্রামে বদ্ধ-পরিকর—এ যুদ্ধ জাতিগত কিন্তু কেবল এই জাতিগত যুদ্ধই যে জীব সকলের উন্নতির কারণ, তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি সকলের পরস্পরের মধ্যেও এই সংগ্রাম পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; ইহাকে অন্তর্জাতিক বলা যাইতে পারে। ইংরাজ ও আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের সহিত বহু শতাব্দি ধরিয়া যে যুদ্ধ চলিতেছিল—আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে যে যুদ্ধ এবং উপস্থিত সময়ে ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ এ সমুদয়ই অন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা বা International struggles। এই সকলের ফল কি দাঁড়াইতেছে? অনার্য্য ও আমেরিকার বর্ব্বরগণ সুসভ্যের সমকক্ষ হইতে পারিল না——এবং এক্ষণে পরাজিত ও পদ-দলিত হইয়া ক্রমে ক্রমে দলে দলে পৃথিবী হইতে বিদায় লইতেছে। ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে যে সংগ্রাম, তাহা অতি আশা-প্রদ। যখন আমাদের মধ্যে জীবন সংগ্রাম আরও ভয়ানকরূপে চলিতে থাকিবে, তখন ভারতের অনুপযুক্ত সন্তানগণ জগৎ সংসার হইতে অপসৃত হইবেন, আর উপযুক্তের দল উন্নতির পর উন্নতি সাধন করিয়া ইংরাজের সমকক্ষ হইবেন। দিন দিন আমাদের মধ্যে জীবন সংগ্রাম যেরূপ ভীষণ হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে এরূপ বোধ হয় যে আমাদের আশা দুরাশা নহে।

এই ত গেল মনুষ্য সমাজের কথা। নিকৃষ্ট জাতিদের মধ্যেও এই জীবন সংগ্রাম ভীষণতর রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে জাতি একটু কোন বিশেষ সুবিধা পাইতেছে, সেই অন্য জাতিকে পরাজিত করিতেছে এবং এই পরাজিত জাতি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে "The slightest advantageous variation gives its successors a chance of surviving the others." আমরা যতই দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমন করি ততই দেখিতে পাই এক একটি জাতি ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। কোন উচ্চ পর্ব্বতে [illegible] সময়ও এখন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই যে যাহা [illegible]

অপেক্ষাকৃত শীত সহ্য করিতে পারে, তাহারাই বর্ত্তমান থাকে এবং অবশিষ্ট সকলে বিনষ্ট হইয়া যায়—উপযুক্তেরই সর্ব্বত্র জয়।

ভূগর্ভ পরীক্ষা করিয়া দেখুন—সেখানেও এই জীবন সংগ্রামের স্মৃতি চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যুগ যুগান্তর ধরিয়া যে এই ব্যাপার চলিতেছে, তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অধুনাতন স্তর হইতে যতই আমরা নিম্ন দিকে অগ্রসর হই, ততই এক জাতীয় জীব সকলের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিভিন্নতা লক্ষ্য হইতে থাকে, এবং এই বিভিন্নতা উত্তরোত্তর এতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে অবশেষে এমন কতকগুলি আকৃতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, যাহাদের আধুনিক প্রতিনিধি (Modern representatives) কোথাও লক্ষিত হয় না; অর্থাৎ ঐ সকল জীব মহা সমরে পরাজিত হইয়া যবনিকার অন্তরালে আশ্রয় লইয়াছে। ভূগর্ভ পরীক্ষা দ্বারা ইহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ইক্‌থিয়সরিয়া, (Ich thyosauria) ডাইন সরিয়া (Dino sauria) প্রভৃতি "লুপ্ত শ্রেণী" সকল (Extinct orders) যদিও উরগ জাতীয় (Reptelia) বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তথাপি তাহাদের বর্ত্তমান প্রতিনিধি কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা পশুবিদ্যা কথঞ্চিৎরূপেও পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই এবিষয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

আমরা জীবন-সংগ্রাম বিষয়টি পাঠকদের হৃদয়ঙ্গম করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। বস্তুতঃ বিষয়টি এতই বিস্তৃত যে অল্পের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহার বিচার করা অসম্ভব। যাহা হউক এখন দেখা উচিত এই যে অবিরাম অনুক্ষণ সংগ্রাম চলিতেছে, তাহার ফল কি হইতেছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আরও কয়েকটি আবশ্যকীয় বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া লওয়া উচিত। আগামীবারে তাহা পাঠকদিগকে নিবেদন করিব।

শ্রী——— মিত্র।

প্রাণের মানুষ।

দুখ নাহি ক'রো যদি নাহি মিলে
প্রাণের মতন মানুষ হেথা,
পরাণ যাহার পরাণে তোমার
একই তারেতে গাঁথা।
সুখ গান তব পরাণ গাইলে
যাহার পরাণ গায়,
দুখ গানে তব পরাণ কাঁদিলে
প্রাণে যার ব্যথা পায়।
লতার হৃদয়ে সরমে লুকানো
ফুলের মুখানি হেরে,
ফুলের হৃদয়ে প্রণয়ে আঁখির
শিশির অরুণ করে ;

তরুর তলায় উঁকিঝুঁকি মারি
অরুণের খেলা ছায়ার সনে,
ভাঙ্গিয়ে ভাঙ্গিয়ে শতরূপী হ'য়ে
চন্দ্রমার খেলা সরসীর প্রাণে ;
হেরিবারে তুমি যে আনন্দ পাও,
যে ভাব সাগরে তুমি ডুবে যাও,
সেভাবে ডোবেনা ভগিনীর প্রাণ,
তাই কি তাহার স্নেহ তুচ্ছ জ্ঞান ?
উষা নরে গাহে কি আশার গাথা
সন্ধ্যা নরে কহে কি ব্যথার কথা,
গভীরা রজনী কি গভীর কথা
কহে নরে, কহে অনন্ত আকাশ,
অনন্ত সমুদ্র, মানুষের প্রাণে,
সে কথা শোনেনা তোমার ভাই,
স্নেহ তুমি তার হেলিবে তাই ?
আকাশের তারা কি কহে মানুষে,
বনের কুসুম কি ভাষণ ভাষে
ভ্রমরের কাণে, ঝরণা কন্দরে
কি গীত গাইয়া চলেরে প্রান্তরে,
সূর্য্যমুখী সূর্য্যে সদা চায় কেন,
সাগর সদাই সাঁ সাঁ করে কেন,
তারা একে অন্যে কিবা কথা কয়,
জলদ অনল বুকে কেন বয়,
বোঝেনারে বোন, তুচ্ছ স্নেহ তাই ?
ভালবাসা ওরে এত কি ধরায় ?
রোগের সময়ে বসেনি কি পাশে,
শোকের সময়ে পরাণের ভাষে
ঢালে নি কি শান্তি হৃদয়ে তোমার ?
না-রে—
সংসারেতে স্নেহ দয়া বেশী নাই—
ঠেলোনারে যাহা পথে মিলে যায়
জলটুকু দিয়াছে যে তৃষ্ণার সময়ে,
অন্নটুটি দিয়াছে যে ক্ষুধার সময়ে,
নিরাশে যখন দহমান প্রাণ
আশা বারিবিন্দু যে করেছে দান,
রোগযাতনায় অস্থির যখন
পাশে যে বসেছে করুণ বদন,
মধুমুখে যে বা ডেকেছে কখন,
তারে ও সদাই করোরে স্মরণ।
দেখিবে জীবন সুমধুর হবে,
মরুভূর মত আর না লাগিবে।
যদিও প্রাণের মানুষ না মিলে
ডুবাইতে প্রাণ তাহার সলিলে,
আছে বহু ক্ষুদ্র নির্ম্মল তটিনা—
শীতল পরাণ করিতে যে পারে,
আছে বহু তরু ঘন পত্রবান
করে যাহা পান্থে শীত ছায়া দান।
চেওনারে বেশী, চেওনারে তারে
ধরণাতে যাহা মিলিবারে নারে
সে প্রেম সে স্নেহ মিলে যাহা হেথা
তাই লও প্রাণে—বিদুরিবে ব্যথা।
কে বলিবে কেন পরাণের জন
মিলেনা হেথায় ? আর যদি মিলে
সংসার আসিয়া দাঁড়ায় আগুলে।
হইলে ধরায় এহেন মিলন
অতি সুখময় হইত জীবন,
ধরার বন্ধন বড় দৃঢ় হত,
মিলাও না হেথা তাহ বুঝি পিত,
প্রাণের মানুষে ; মিলাইবে সেথা
জীবন যেথায় শেষ হইবে না,
বিরহ যেথায় কভু ঘটিবে না।

শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

রাজনৈতিক সংবাদ।

কাশ্মীর ব্যাপার। কাশ্মীর লইয়া আজ কাল প্রবল আন্দোলন চলিতেছে, এবং যত দিন কাশ্মীর সম্বন্ধে কোন একটি মীমাংসার শেষ না হইতেছে, আমাদের বিশ্বাস তত দিন কাশ্মীর সম্বন্ধে এই গোলযোগের শেষ হইবে না; কাশ্মীর এখন ব্রীটিস্ সিংহের করতল গত, আজিও উদরস্থ হয় নাই; যত দিন উদরস্থ না হইবে, তত দিনই নানা লোকে নানা কথা বলিবে। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য কাশ্মীর সম্বন্ধে দুই একটি কথা লিখিতেছি।

যদি কাশ্মীরের মহারাজের অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতাই এই অধঃপতনের প্রধান কারণ। তাঁহার সহিত আরও কতকগুলি প্রতাপশালী লোক জুটিয়া মহারাজের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ততর করিয়া তুলিয়াছে।

কোন ক্রমে অমর সিংহ প্রধান মন্ত্রী হইয়া মহারাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। তিনি অনতিবিলম্বেই রেসিডেণ্ট ও অন্যান্য প্রধান ইংরাজ রাজ পুরুষ-দিগের সহানুভূতি লাভ করিলেন; এবং শীঘ্রই রেসিডেণ্টকে মহারাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিলেন। ক্রমে অমর সিংহের প্রভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল, নীলাম্বর বাবু ও পণ্ডিত সূর্য্যবল কাশ্মীর রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন, মহারাজের ভবিষ্যৎ গগন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। মহারাজ রুষের সহিত পরামর্শ করিতেছেন দলীপ সিংহের সহিত ষড়যন্ত্র আঁটিতেছেন প্রভৃতি নানা কথা গবর্ণমেণ্টের কানে আসিতে লাগিল, মিথ্যা কথা একটা বলিলেইত হয় না, তাহা প্রমাণ করা চাইত, কিন্তু কোন প্রমাণই সংগ্রহ হইল না, সুতরাং সমস্তই থামিয়া গেল, কাশ্মীর সম্বন্ধে আর বড় কিছু শোনা গেল না।

সহসা এক দিন পাওনিয়ার পত্রে বাহির হইল মহারাজ রেসিডেণ্ট সাহেবকে বিষপান করাইয়া মারিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন, এমন কি তাঁহার এই সম্বন্ধীয় কতকগুলি চিঠিপত্রও ধরা পড়িয়াছে! তাঁহার প্রভুভক্ত মন্ত্রীবর অমর সিংহ ঐ সমস্ত পত্রাদির সত্যতা প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, পাইওনিয়ার প্রমুখ সংবাদ পত্রগুলি মার কাট্ বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিলেন; মনে করিলাম,এ ত মলহর রাও হোলকারেরই পালা অভিনীত হইতেছে—তবে আর মহারাজের অব্যাহতি নাই। কিন্তু কিছু দিন পরেই শুনিলাম যে এ সমস্ত চিঠিই জাল, সুতরাং সে গোলযোগও একপ্রকার নিবৃত্ত হইল।

কিন্তু এ অবস্থায়ও আর বেশী দিন অতিবাহিত হইল না। রাজকার্য্যে অপটুতা ও রাজ্যে বিশৃঙ্খলতার জন্য মহারাজ রাজ্যচ্যুত হইলেন। কথাটা শুনিয়া আমরা অধিক

আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই! তবে শোনা গেল মহারাজ ইচ্ছা করিয়া রাজ্যভার ত্যাগ করিয়াছেন তাহাতেই একটু আশ্চর্য্য হইতে হইয়াছিল। মনে হইতেছিল যে চারিদিকের গোলযোগ দেখিয়া, তাঁহার গৃহ শত্রু সংখ্যায় পূর্ণ বুঝিয়া মহারাজ বোধ হয় রাজ্যভার হইতে অবসর লইয়াছেন। যাহার পদে পদে বিপদ, আজ না হউক দুদিন পরে হউক যাহার সিংহাসন পরহস্তগত হইবার সম্ভাবনা, তখন এ গুরুভার ত্যাগ করিয়া শান্তির আশ্রয় লওয়াই স্বাভাবিক বোধ হইল। কিন্তু রহস্যপূর্ণ কাশ্মীর ব্যাপারের "এই রাজ্যভার হইতে অবসর" লইবার ভিতর ও রহস্য আছে। কিছু দিন গত হইল মহারাজ তাঁহার দুঃখ ও বিপদ কাহিনী জ্ঞাত করিয়া বড়লাট বাহাদুরকে একপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে শুদ্ধ কর্ণেল নিস্‌বেটের প্ররোচনায় তিনি রাজ্য ত্যাগ-পত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, আমরা শুনিলাম যে কর্ণেল নিস্‌বেট তাঁহাকে কাশ্মীব রাজধানী হইতে অন্যত্র যাইতে দিতেও নারাজ।

মহারাজ আর কত দুঃখ সহ্য করিবেন? তিনি ঘৃণা, লজ্জা, অপমানে মৃতপ্রায় হইয়া বড় লাট বাহাদুবকে এক পত্র লিখিয়া তাঁহার দুরবস্থার কথা জানাইলেন, এমন কঠিন হৃদয় পাষণ্ড অতি অল্পই আছে যে মহারাজের এই পত্র পড়িয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে।

আমরা এই স্থানে মহারাজের পত্রের ভাবার্থ প্রকাশ করিতেছি। তিনি বলেন যে বড় লাট বাহাদুর তাঁহাকে স্বাধীনতা দেন; তিনি নিজে কয়েকজন অমাত্য নির্ব্বাচন করিয়া দু চারি বৎসর রাজ্য করুন, যদি তিনি রাজ্য শাসনের অনুপযুক্ত হন, তবে বিদূরিত হইবার উপযুক্ত পাত্র হইবেন। আর যদি বড় লাট বাহাদুর এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ না করেন, তবে মহারাজকে সম্মুখে ডাকিয়া গুলি করিয়া তাহার যন্ত্রণাময় জীবনের শেষ করুন।

আমরা অনেক দিন হইতে বড় লাট বাহাদুরের নিকট হইতে উত্তরের প্রত্যাশা করিতেছিলাম. বহুদিন পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লাট বাহাদুর যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

"আপনাকে সিংহাসন চ্যুত করিবার কল্পনা আমি করি নাই। ভূত পূর্ব্ব গবর্ণরজেনেরেলের শেষ শাসন সময়ে তৎকালীন রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহাকে কাশ্মীর রাজ্যের বিশৃঙ্খলতার কথা অনেকবার জানাইয়াছিলেন। বড় লাট সাহেব গত ২৫ জুলাই আপনাকে সাবধান করিয়া এক পত্র লেখেন। আপনি ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত দেওয়ান লছমনদাসকে গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতসারে পদচ্যুত করিয়া যে অন্যায় করিয়াছেন, সে কথা এবং অন্যান্য কথা ঐ পত্রে জানান হয়। কাউন্সিল দ্বারা নূতন ধরণে রাজ্য শাসনের কথাও ঐ পত্রে লিখিত হয়, আপনি এই প্রস্তাবে সম্মতও হইয়াছিলেন।

আপনি নিজেই উক্ত কাউন্সিলের সভাপতি হইয়াছিলেন, আপনার ইচ্ছাক্রমেই রেসিডেণ্ট প্লাউডেনকে সরাইয়া, আপনার ইচ্ছানুরূপ নূতন লোক রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন।

আপনি পুনর্ব্বার স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসনের প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেই সময়ই আপনাকে পরীক্ষার অবসর দেওয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরীক্ষার ফল বড় অসন্তোষজনক হয়, বর্ত্তমান বর্ষের প্রথমে আমি যে সকল পত্রের কথা শুনিতে পাই, তাহার মধ্যে অনেকগুলি সত্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আপনাকে এ জন্য রাজ্য চ্যুত করা হয় নাই,—আপনিও একথা ঠিক বুঝিয়াছেন, সমস্ত পত্রই যদি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও আপনার যে দুরভিসন্ধি আছে এ কথা বিশ্বাস হয় না।

ইহার পরও সময়ে সময়ে নানাবিধ বিশৃঙ্খলতার সংবাদ পাইলেও আমি কিছু করি নাই, কিন্তু আপনি ৭ই মার্চ্চ কর্ণেল নিস্‌বেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনি যে রাজ কার্য্য চালনে অনিচ্ছুক এ কথা বলেন। তাহার পরই রাজা অমর সিংহের দ্বারা ইস্তফা পাঠাইয়া দেন।

ভারত গবর্ণমেণ্ট বিশেষ বিবেচনা করিয়া আপনাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন। ষ্টেট্ সেক্রেটারীরও এই কার্য্যে মত আছে। রেসিডেণ্ট এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীর ষড়-যন্ত্রে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে এরূপ বলা বৃথা, আর কর্ণের নিসবেটের জেদে পড়িয়া আপনি রাজ্য ত্যাগে সম্মত হইয়াছিলেন, ইহাও ন্যায়সঙ্গত কথা নহে।

যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, আপনার উপযুক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে আপনার মানসম্ভ্রম সমস্তই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, প্রধান সেনাপতি কাশ্মীরে গিয়া আপনাকে কত সম্মান করিয়াছেন! যাহা হউক আপনি আর বর্ত্তমান শাসন প্রণালীতে বাধা দিবার চেষ্টা করিবেন না। সাধুতা অবলম্বন করুন, কাশ্মীর হইতে বিগত কুশাসনের ফল দূর হওয়া পর্য্যন্ত এই বন্দোবস্তই থাকিবে। তাহার পর আপনাকে রাজ কার্য্যে যথেষ্ট অধিকার দেওয়া যাইলেও যাইতে পারে। It may be possible to give your Highness a larger share in the control of the public affairs of Cashmere."

বড় লাট বাহাদুর কাশ্মীরের মহারাজকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে কি মহা-রাজকে স্থানে স্থানে তামাসা করা হইয়াছে? "এক স্থানে লেখা হইয়াছে—সেনা-পতি কাশ্মীরে গিয়া আপনার কত সম্মান করিয়াছেন তাহা জ্ঞাত আছেন।" ইহার অর্থ বুঝিলাম না; হাত ধরিয়া সিংহাসন হইতে হড় হড় করিয়া নামাইয়া দিয়া দুই হাতে সেলাম করিলাম এটা তামাসা ভিন্ন আর কি? জুতা মারিয়া প্রণাম করা আর এই রকম সম্মান দেখান কি একই জিনিষ নহে?

সম্প্রতি ভারত সেক্রেটারী লর্ড ক্রশ বলিয়াছেন—কাশ্মীর গ্রহণ করিতে তাঁহাদের

কোনই ইচ্ছা নাই। কাশ্মীর রাজ রাজ্য শাসন কার্য্যে তাঁহার যোগ্যতা দেখাইতে পারিলেই তাঁহার রাজ্য তাহাকে পুনরর্পিত হইবে।

কিন্তু তাঁহার যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার করিবে কে?

ত্রিপুরা রহস্য। কাশ্মীরের শ্রাদ্ধ শেষ হইতে না হইতে ত্রিপুরা লইয়া গোলযোগ বাধিয়া উঠে এবং কাশ্মীর রাজ্যের অনুকরণে তিনিও রাজ্য ত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

স্বাধীন ত্রিপুরায় একজন করিয়া প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী থাকেন, ইহাঁকে পোলিটিক্যাল এজেণ্ট বলে। রেসিডেণ্ট ও পোলিটিক্যাল এজেণ্ট প্রায় এক প্রকারেরই জিনিষ। রাজ্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়াদি গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে উপস্থিত করাই এই পোলিটিক্যাল এজেণ্টের কাজ।

ত্রিপুরা রাজ্যের পোলিটিক্যাল এজেণ্টের নাম প্রাইস। ইতিপূর্ব্বে যিনি ম্যানেজার ছিলেন তাঁহার নাম মেণ্ডিস্, এই শেষোক্ত ব্যক্তি নানা উপায়ে ত্রিপুরার মহারাজার অনেকগুলি টাকা আত্মসাৎ করেন; বলা বাহুল্য সে উপায়গুলি 'সু' উপায় নহে, "ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে" তাঁহার এই অবৈধ উপায়ে অর্থ সঞ্চয়ের কথা গোপনে থাকিল না, মহারাজ তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন।

প্রাইস ইহার পর গভর্ণমেণ্টকে এইরূপ রিপোর্ট লেখেন

"রাজ কার্য্যের দিকে মহারাজের লক্ষ্য নাই, কর্ম্মচারীগণ অবিশ্বাসী, রাজ পরিবার অনাহারে কাল যাপন করিতেছেন। রাজ্যের সুবন্দোবস্তের জন্য মহারাজকে অনেক বার বলা হইয়াছে, কিন্তু সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট যদি পশ্চিম বঙ্গের বা মধ্য বঙ্গের কোন বহুদর্শী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্কে রাজ মন্ত্রী নিযুক্ত করেন, এবং ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার মেণ্ডিস্ সাহেবকে ম্যানেজার নিযুক্ত করেন, তবে বড় ভাল হয়, কারণ মেণ্ডিস সাহেব রাজ্যের অবস্থা বিশেষরূপ অবগত আছেন।"

ত্রিপুরাধিপতি রাজকার্য্যে উদাসীন হইলে ইহার সুবন্দবস্ত আবশ্যক সত্য—কিন্তু এই রিপোর্ট পাঠ করিলে আমাদের মোটামুটি বোধ হয় যে প্রাইস সাহেব বন্ধুবর মেণ্ডিসের পদচ্যুতির বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের কাছে নালিস করিতেছেন। নতুবা প্রকাশ্য জুয়াচুরীর জন্য যে মেণ্ডিস্ পদচ্যুত হইলেন, তাঁহাকেই আবার নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ? যাহাই হউক তাহার পর ত্রিপুরার পলিটিক্যাল এজেণ্ট এবং ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রিয়ার কর্ত্তৃক নির্জ্জনে নীত হইয়া মহারাজ রাজ্য ত্যাগ পত্র স্বাক্ষরে বাধ্য হইয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার। 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিল বিল' পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করিবার জন্য শীঘ্রই ব্রীটস্ পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত করা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাপক

সভারও কিছু সংস্কার হইবে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকে আয় ব্যয় সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিতে ও প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার দেওয়া হইবে, প্রাদেশিক সভা সমূহকেও উক্ত ক্ষমতা দেওয়া হইবে। এতদ্ভিন্ন শেষোক্ত সভাগুলির সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৩০ জন করা হইবে কিন্তু নির্ব্বাচন প্রণালী প্রচলিত হইবে না।

ব্যবস্থাপক সভার সংস্কারের জন্য কয়েক বৎসর হইতে আমাদিগের দেশে বিশেষ আন্দোলন হইতেছে, তন্মধ্যে কন্‌গ্রেসে এ বিষয় লইয়া যে আন্দোলন হয়, তাহাই প্রধান। ব্যবস্থাপক সভার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ভূতপূর্ব্ব লাট ডফারিণও অনুভব করিয়াছিলেন; এবং কিরূপভাবে পরিবর্ত্তন কর্ত্তব্য তাহার কিছু কিছু আভাসও দিয়াছেন; কিন্তু শুনিতেছি আমাদের বর্ত্তমান বড় লাট বাহাদুর ও ষ্টেট সেক্রেটারী উভয়েই নির্ব্বাচন প্রণালীর সম্পূর্ণ বিরোধী। লর্ড ডফারিণ এই নির্ব্বাচন প্রণালীর পক্ষপাতী না হইলেও তিনি আংশিকভাবে ঐ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার বিপক্ষে ছিলেন না; কিন্তু বর্ত্তমান লাট বাহাদুর এই আংশিক প্রচলনও (partial introduction) অবিহিত মনে করিয়াছেন। কেন যে ইহাঁরা এ বিষয়ে আপত্তি করিতেছেন, তাহ আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তবে আমরা এইমাত্র বলি যে এই নির্ব্বাচন প্রণালীই যখন আমাদের আন্দোলনের প্রধান বিষয় এবং যখন এ বিষয়েই আমাদের 'কর্ত্তাদের' সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখিতেছি, তখন আমাদের আন্দোলন ত্যাগ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। সম্ভবতঃ এ বিষয় লইয়া ব্রীটিস মহাসভায় যথেষ্ট বাদানুবাদ হইবে, আমরা আশা করি ভারত বন্ধুগণ, ভারতবাসীর সুবিধার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। '১০' এর '১' বাদ দিয়া '০' টি লইয়া নাড়াচাড়া করিলে আমাদের যে লাভালাভ সমানই, তাহা বলা বাহুল্য।

নূতন আইন। আমরা শুনিতেছি শীঘ্রই নাকি একটি আইন প্রচলিত হইবে। এই আইনের উদ্দেশ্য প্রকারান্তরে দেশীয় সংবাদপত্রের (কি বাঙ্গলা ইংরাজি) মুখ বন্ধ করা; 'প্রকারান্তরে বন্ধ' কথাটা বোধ হয় পাঠক মহাশয়ের নিকট তত পরিষ্কার হইল না; দেশীয় সংবাদপত্রগুলিকে "হাতে না মারিয়া ভাতে মারাই" উদ্দেশ্য। ইতিপূর্ব্বে সরকারী নানাবিধ গোপনীয় সংবাদ সংবাদপত্রে বাহির হইয়া যাইত। এবং সেই সকল সংবাদ লইয়া চতুর্দ্দিক আন্দোলনের ধূমে আচ্ছন্ন হইত, অধিক কি সিমলা পর্য্যন্তও সেই ধূম পৌঁছিত; তাই লাট বাহাদুর দল বেদল লইয়া একটি আইন প্রণয়ন করিতে বসিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য এই যে কোন ভারতবর্ষের সংবাদপত্র আর গবর্ণমেণ্টের কোন গোপনীয় সংবাদ প্রকাশ করিতে পারিবেন না। যদিও ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা কি তাহা আজও বিশেষ জানা যায় নাই, কোন দুর্গাদির নক্সা শত্রু হস্তে পড়িয়া দেশের যাহাতে বিশেষ হানি না হইতে পারে, সেই জন্যই এ আইন করা দরকার হইয়াছে যদিও তাঁহারা বলিতেছেন; তথাপি ইহার প্রধান উদ্দেশ্য যে কি—তদ্বিষয়ে অতি অল্পই সন্দেহ।

লর্ড লিটন যখন ৯ আইন পাশ করেন, তখন তিনি রাতারাতিই সে কাজ শেষ করিয়াছিলেন, একাজটাও অনেকটা সেই প্রকারের, কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিনা যে এরূপভাবে দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিবার প্রয়োজন কি? প্রজার হিতের জন্য, তাহারা কি বলে তাহা শুনিবার জন্য চেষ্টা করাই গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাদের কথা কহিতে দেওয়া হইবে না, তাহারা বুকের উপর শেল পরিবে তাহা জানিয়াও কথা কহিতে পারিবে না—কথা কহিবার অধিকার বিলোপ করা হইবে—ইহা সুসভ্য প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্টের নিকট আশা করি না। কৈ আমরা লর্ড লিটনের কঠোর শাসনে উৎপীড়িত হইয়া মহাত্মা রিপনের শাসনছত্রের ছায়ায় যে শান্তি উপভোগ করিতেছিলাম—তাহা কৈ? কপাল দোষে রিপনকে হারাইয়া ভারতবাসী ডফারীণকে পাইয়াছিল, মনে হইয়াছিল ভারতবাসী ল্যানস্‌ডাউন বাহাদুরকে পাইয়া ডফারীণের কথা ভুলিয়া যাইবে, রিপনের কথা মনে পড়িবে কিন্তু লিটনের কথা মনে পড়ে কেন? সকলই ভারতের অদৃষ্ট দোষ।

কুলি-আইন। সংবাদ আসিয়াছে যে আসামে কুলি পাঠান সম্বন্ধে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা বিলাতে প্রকাশ হইয়াছে; আমাদের ছোটলাট বাহাদুরও আমাদের চিফ কমিসনর সাহেব উভয়ে মিলিয়া কুলিচালান প্রথার সংশোধন করিতেছেন এবং কুলিদের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে সুবন্দবস্ত করিতেছেন বলিয়া ষ্টেটসেক্রেটারী নাকি আর এ আইন সংশোধনের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। ষ্টেটসেক্রেটারী মহাশয় মনে করেন যে কুলিদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার, উৎপীড়ন, কুলিদের এসমস্তই অলীক অথবা অতিরঞ্জিত কথা। কুলির দল যে দুরন্ত চা-করদিগের কঠোর শাসনে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহা সভ্যতা ও স্বাধীনতার আগার শ্বেতদ্বীপের সুন্দর প্রাসাদে বসিয়া যিনি দেব দুর্ল্লভ সুখ, সম্মান উপভোগ করিতেছেন, তিনি কিরূপে বুঝিবেন? ব্রীটিস কবীশ্বর সেকস্‌পীয়ার কি অনর্থক বলিয়াছেন যে—

"He jests at scars who never felt a wound."

কারাগার সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত। ভারতীয় কারাগারগুলির নূতন বন্দোবস্ত হইবে ঠিক হইয়াছে। ভারতস্থ সমস্ত কারাগারগুলি ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষাধীন আসিবে, কারাগার সমূহের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য একজন ইন্‌স্পেক্টর জেনেরাল নিযুক্ত হইবেন, এবং প্রত্যেকপ্রদেশে এই ইন্‌স্পেক্টর জেনেরেলের অধীনে একজন করিয়া ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হইবেন। এক প্রদেশ হইতে কর্ম্মচারীবর্গ অন্য প্রদেশে বদলীও হইবেন। শুনা যায় ডাক্তার লেথব্রীজ সাহেব নাকি প্রথম ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হইবেন। অনেক পয়সা খরচ হইবে সন্দেহ নাই। আমরা অম্লান বদনে ক্রমাগতই পয়সা ঢালিতেছি, এ বিষয়েও যে আপত্তি হইবে তাহা বোধ হয় না, তবে আমরা বড়ই সুখী হইব যদি সেই পয়সা খরচ করিয়া প্রকৃতই

কারাবাসীদিগের দুঃখ কষ্ট ও অত্যাচারের একটু কম হয়। কারাগার হইতে যে সকল কয়েদী ফিরিয়া আসে, প্রায়ই দেখা যায় তাহাদের হৃদয় উৎসাহহীন ও জীবন আশা শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, সাধু চরিত্রের লোকও সামান্য দোষে কারাবাসী হইলে, নানা বিধ অসৎ লোকের সহবাসে তাহাদের হৃদয় ঘোর অপবিত্র হইয়া যায়। দণ্ড বিধানের প্রধান উদ্দেশ্য চরিত্র সংশোধন, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য অন্য লোককে সাবধান করা। কিন্তু এই প্রথম উদ্দেশ্য অতি অল্প পরিমাণেই সাধিত হয়। আমরা আশা করি এই নূতন ব্যবস্থা প্রচলনের পর হইতে কারাগারের প্রকৃতই একটু সংস্কার হইবে।

তিব্বত হাঙ্গামা। আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট ডফারিণ তিব্বতে বাণিজ্য পথ খুলিবার জন্য যে চেষ্টা করিলেন, যে কোটি কোটি অর্থ ব্যয় করিলেন—তাহা বৃথা হইল। তিনি সিকিমে তিব্বতের লামাদের প্রাধান্য দূর করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়া চীন গবর্ণমেণ্টকে মধ্যস্থ মানেন। কিন্তু ইহাতে বিপরীত ফল হইবার উপক্রম হইয়াছে, বিবাদ মিটিল না। গবর্ণমেণ্টের কোন মুখপত্র বলেন যে সিকিম হইত তিব্বত সৈন্য তাড়াইয়া সীমান্ত প্রদেশে একদল সৈন্য স্থায়ীরূপে রাখিতে হইবে। সেই উপলক্ষে চীনের সহিত গোলযোগ বাধা কিছু আশ্চর্য্য নহে; শুনিতেছি তিন দল সৈন্য নাকি তিব্বত প্রান্ত হইতে ফিরিতেছে কিন্তু তাহা হইলেও একদল সৈন্য সিকিম ও তিব্বত সীমান্তে রক্ষিত হইবে। দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইতেছে তিব্বতের সহিত সংঘর্ষণ অনিবার্য্য।

লুসাই সংগ্রাম। লুসাই সংগ্রামের 'উদ্যোগ পর্ব্ব' আরম্ভ হইয়াছে। শীঘ্রই যুদ্ধ যাত্রা আরম্ভ হইবে। মান্দ্রাজের প্রধান সেনাপতি নাকি ব্রহ্ম দেশ হইতেই লুসাই আক্রমণের পরামর্শ দিয়াছেন। এই পরামর্শ গৃহীত হইবে কিনা বলা যায় না। সিমলায় বড় লাট বাহাদুরের সভায় এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিতেছে, কি ফল হইবে তাহা হয়ত শীঘ্রই আমরা শুনিতে পাইব।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

নব্যবঙ্গের আন্দোলন।

আজ কাল গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে সকল আন্দোলন চলিতেছে তাহা দেখিয়া আশা ও আনন্দ জন্মে। কিন্তু যেখানে ভালবাসা বেশি সেখানে আশঙ্কাও বেশি। স্বজাতির উন্নতি যদি বাস্তবিক প্রিয় এবং ঈপ্সিত হয় তবে ভাবনার কারণ সম্বন্ধে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধভাবে কেবল আনন্দ করিয়া বেড়ান স্বাভাবিক নহে।

যাঁহারা স্বজাতিবৎসল, তাঁহাদের কি মাঝে মাঝে সর্ব্বদাই এরূপ আশঙ্কা উদয় হয় না, এই যে সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখিতেছি এ কি সত্য না স্বপ্ন? যদি একান্ত অমূলক হয় তবে আগেভাগে তাড়াতাড়ি আনন্দ করিয়া বেড়ান পরিণামে দ্বিগুণ লজ্জা ও বিষাদের কারণ হইবে।

ন্যাশনাল শব্দটা যখন বাঙ্গলা দেশে প্রথম প্রচার হয় তখনকার কথা মনে পড়ে। একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া হঠাৎ দেখা গেল, চারিদিকে ন্যাশনাল পেপার, ন্যাশনাল মেলা, ন্যাশনাল সং (song) ন্যাশনাল থিয়েটার;—ন্যাশনাল কুজ্ঝটিকায় দশদিক আচ্ছন্ন।

হঠাৎ এরূপ ঘটিবার কারণ ছিল। প্রথম ইংরাজি শিখিয়া বাঙ্গালী যুবকেরা বিকট বিজাতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। গোরু খাওয়া তাঁহারা নৈতিক কর্ত্তব্য স্বরূপ জ্ঞান করিতেন এবং প্রাচীন হিন্দুজাতিকে গবাদি চতুষ্পদের সহিত একশ্রেণীভুক্ত বলিয়া তাঁহাদের ভ্রম জন্মিত। ইতিমধ্যে মহাত্মা রামমোহনরায়প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশে অল্পে অল্পে মূল বিস্তার করিতে লাগিল। আমাদের দেশে যে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ বহু প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল এই জ্ঞানই স্বদেশীয় প্রাচীনকালের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণের মূল কারণ হইল। এমন সময়ে য়ুরোপেও সংস্কৃত ভাষার আদিমতা, আমাদের প্রাচীন দর্শনের গভীরতা, শকুন্তলা প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যের মাধুর্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইল। তখন হিন্দু সভ্যতার কাহিনী বিলাত হইতে জাহাজে চড়িয়া হিন্দুস্থানে আসিয়া পৌঁছিল। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ পুঁথি খুলিয়া অনুসন্ধান করিতে বসিয়া গেলেন, আমরা পুঁথি বন্ধ করিয়া ঢোল লইয়া ন্যাশনাল বোল বাজাইতে বাজাইতে ভারি খুসি হইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। তাঁহারা বিশুদ্ধ জ্ঞানস্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত স্বাভাবিক বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ দুষ্প্রাপ্য দুর্ব্বোধ সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে ইতিহাস উদ্ধার করিতে লাগিলেন, আর আমরা তখন হইতে এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসারে আমাদের শাস্ত্রালোড়নের পরিশ্রম স্বীকার করিলাম না অথচ শাস্ত্রের উপরিভাগ হইতে অহঙ্কাররস শোষণ করিয়া লইয়া বিপরীত মাত্রায় স্ফীত হইয়া উঠিলাম।

যে জাতি স্বদেশের প্রাচীনকাল লইয়া বহুদিন হইতে অবিশ্রাম অহঙ্কার করিয়া আসিতেছে অথচ স্বদেশের প্রাচীনকালের যথার্থ অবস্থা সম্বন্ধে জানিবার জন্য তিলমাত্র শ্রম স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে তাহাদের রচিত একটা আন্দোলন দেখিলে প্রথমেই সন্দেহ জন্মে যে ইহার সহিত যতটুকু অহঙ্কার আস্ফালনের যোগ ততটুকুই তাহাদের লক্ষ্য ও অবলম্বনস্থল, প্রকৃত আত্মবিসর্জ্জন অনেক দূরে আছে।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "গীত সূত্রসার" নামক অতি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন "ভারতীয় লোকের প্রাচীন বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও আদর আছে বটে। কিন্তু তাহা ইতিহাসপ্রিয়তাজনিত নহে, তাহা আলস্য ও নিশ্চেষ্ট

তার ফল।” এ কথা আমার সত্য বলিয়া বোধ হয়। মনে আছে বাল্যকালে যখন ন্যাশনাল ছিলাম তখন অর্দ্ধশ্রুত ইতিহাসের অনতিস্ফুট আলোকে অহরহ প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তিসম্বন্ধে জাগ্রতস্বপ্ন দেখিয়া চরম আনন্দ লাভ করিতাম। ইংরাজের উপর তখন আমাদের কি আক্রোশই ছিল! তাহার কারণ আছে। যখন কাহারও মনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে তিনি তাঁহার প্রতিবেশীর সমকক্ষ সমযোগ্য লোক, অথচ কাজেকর্ম্মে কিছুতেই তাহার প্রমাণ হইতেছে না, তখন উক্ত প্রতিবেশির বাপান্ত না করিলে তাঁহার মন শান্তিলাভ করে না। আমরা ন্যাশনাল অবস্থায় ঘরে বসিয়া এবং সভায় দাঁড়াইয়া নিস্ফল আক্রোশে ইংরাজ জাতির বাপান্ত করিতাম; বলিতাম আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ যখন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতেছেন তখন ইংরাজের পূর্ব্বপুরুষ গায়ে রং মাখিয়া কাচা মাংস খাইয়া বনে বনে নেকড়িয়া বাঘের সহিত লড়াই করিয়া বেড়াইতেছে। আবার বিদ্রূপ করিয়া এমনো বলিতাম—ডারুয়িন ইংরাজ তাই আদিম পূর্ব্বপুরুষদিগকে বানর বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইংরাজের লালমূর্ত্তি ও কদলিপ্রিয়তার উল্লেখ পূর্ব্বক চতুর্ভুজ জাতীয় রক্তমুখচ্ছবি জীবের সহিত তুলনা করিয়া ন্যাশনাল পাঠকদিগের মনে সবিশেষ কৌতুক উদ্দীপন করিতাম। ইংরাজী বই পড়িতাম, ইংরাজি কাগজ লিখিতাম, ইংরাজি খাদ্য একটু বিশেষ ভালবাসিতাম, ইংরাজি জিনিষপত্র বিশেষ আদরের সহিত ব্যবহার করিতাম, মূর্ত্তিমান ইংরাজ দেখিলে মনে বিশেষ সম্ভ্রমের উদয় হইত, অথচ তাহাতে করিয়া ইংরাজের প্রতি রাগ বাড়িত বই কমিত না। দেশে ডাকাতী হয় না বলিয়া আক্ষেপ করিতাম, বলিতাম অতিশাসনে দেশ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল, আবার গ্রামের কাছাকাছি ডাকাতীর সংবাদ পাইলে ইংরাজ শাসনের শৈথিল্যের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইত।

এই ন্যাশনাল উদ্দীপনা এককালে অত্যন্ত টনটনে হইয়া উঠিয়াছিল এখন ইহা chronic ভাব ধারণ করাতে ইহার প্রকাশ্য দব্‌দবানি অনেকটা কমিয়াছে। অনেকটা সংহত হইয়া এখন ইহা Political agitation আকার ধারণ করিয়াছে।

এই আজিটেষনের মধ্যে একটা ভাব এই লক্ষ্য হয় যে, আমাদের নিজের কিছুই করিবার নাই, কেবল পশ্চাৎ হইতে মাঝে মাঝে গবর্ণমেণ্টের কোর্ত্তা ধরিয়া যথাসাধ্য টান দেওয়া আবশ্যক। আমরা বড়, তবু আমাদিগকে ভারি ছোট দেখাইতেছে, সে কেবল তোমরা চাপিয়া রাখিয়াছ বলিয়া। স্প্রিংয়ের পুঁতুল বাক্সর মধ্যে চাপা থাকে ডালা খুলিবামাত্র এক লম্ফে নিজমূর্ত্তি ধারণ করে। আমাদেরও সেই অবস্থা। কিছুই করিবার নাই—তোমরা বাহির হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টিপন্ দিয়া ডালা খুলিয়া দাও আমরা ক্যাঁচ্‌-শব্দ করিয়া গাত্রোত্থান করি।

আবার এই সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা আমাদের সাহিত্যের নেতা তাঁহারা সম্প্রতি এক বিশেষ ভাব ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন আমাদের মত এমন সমাজ আর পৃথি-

রীতে কোথাও নাই। হিন্দু বিবাহ আধ্যাত্মিক, এবং বাল্যবিবাহ ব্যতীত তাহার সেই পরম আধ্যাত্মিকতা রক্ষা হয় না, আবার একান্নবর্ত্তী প্রথা না থাকিলে উক্ত বিবাহ টেঁকে না,—এবং যেহেতুক হিন্দুবিবাহ আধ্যাত্মিক বিধবা বিবাহ অসম্ভব, এদিকে জাতিভেদ প্রথা এই অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক সমাজের শৃঙ্খলা শ্রমবিভাগও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির কারণ। অতএব আমাদের সমাজ একেবারে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন। য়ুরোপীয় সমাজ ইন্দ্রিয়সুখের উপরেই গঠিত, এইজন্য তাহার মধ্যে আদ্যোপান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা। আবার বলেন আমাদের দেশের প্রচলিত উপধর্ম্ম মানবজাতির একমাত্র অবলম্বনীয়, উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মানব বুদ্ধির অতীত।

সবসুদ্ধ দাঁড়াইতেছে এই সমাজ বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে হাত দিবার বিষয় আমাদের কিছুই নাই। যাহা আছে সর্ব্বাপেক্ষা ভালই আছে এখন কেবল গবর্ণমেণ্ট আমাদের ডানা খুলিয়া দিলেই হয়। মাঝে একবার দিনকতক সমাজ সংস্কারের ধুয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষিত যুবকেরা সকলেই জাতিভেদ বাল্যবিবাহ প্রভৃতির অপকারিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ ছিল। কিন্তু তথাপি কেবল দুই চারি ঘর উৎপীড়িত সমাজবহির্ভূত ব্রাহ্ম পরিবার ছাড়া আর সর্ব্বত্রই সমাজনিয়ম পূর্ব্ববৎ সমানই ছিল। জড়তা এবং কর্ত্তব্যের সংগ্রামে জড়তাই জয়লাভ করিল, অবশেষে কালক্রমে তাহার সহিত অহঙ্কার আসিয়া যোগ দিল। মাঝে যে ঈষৎ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল তাহা দূর হইয়া বাঙ্গালী ঠাণ্ডা হইয়া বসিল। তাকিয়া ঠেসান্ দিয়া বসাকে যখন আবার কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করি তখন যেমন নিরনুতাপ আরাম ও নিঃস্বপ্ন নিদ্রার সুযোগ এমন অন্য সময়ে নহে। আমরা প্রাচীন দেশাচারকে স্ফীত তাকিয়ার মত বানাইয়া লইয়া পশ্চাতের দিকে সমস্ত স্থূল শরীরটিকে হেলান্ দিয়া রাখিয়াছি—সম্মুখে অগ্রসর হওয়াই একটা গুরুতর অন্যায় বলিয়া জ্ঞান করিতেছি—কেবল মাঝে মাঝে পাশ ফিরিয়া গবর্ণমেণ্টকে ডাকিয়া বলিতেছি "বাবা, এই খাটসুদ্ধ তাকিয়াসুদ্ধ তুলিয়া তোমাদের বিলাতের বানান' একটা কলের গাড়িতে তুলিয়া দাও আমি ভোঁ হইয়া উন্নতির টর্ম্মিনসে গিয়া পৌঁছিব।"

নব্য বঙ্গেরা প্রথম অবস্থায় গরু খাইত এবং মনে করিত এই সহজ উপায়ে ইংরাজ হইতে পারিবে। দ্বিতীয় অবস্থায় আবিষ্কার করিল পূর্ব্বপুরুষেরাও গরু খাইতেন অতএব তাঁহারা য়ুরোপীয় অপেক্ষা সভ্যতায় ন্যূন ছিলেন না, সুতরাং আমরা ইংরাজের চেয়ে কম নহি। সম্প্রতি তৃতীয় অবস্থায় গোবর খাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং মনে মনে ইংরাজকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। বৈজ্ঞানিক যুক্তির সহিত প্রমাণ হইয়া গেছে, গরুর চেয়ে গোবরে ঢের বেশি আধ্যাত্মিকতা আছে; সমস্ত মাথাটার মধ্যে কিছুই নাই, থাকুক্ শুদ্ধ পশ্চাদ্দিকে টিকিটুকুর ডগায় আধ্যাত্মিকতা গলায় ফাঁশ লাগাইয়া ঝুলিতে থাকে। পূর্ব্বে যখন দেশে বড় বড় বনেদি টিকি ছিল তখন সে ছিল ভাল। আজকাল শিক্ষিত লোকদের মাথার পিছনে যে ক্ষুদ্রকায় হঠাৎ-টিকি প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহা হইতে কেবল একটা অনাবশ্যক অস্বাভাবিক কৃত্রিম দাম্ভিকতা উৎপন্ন হইতেছে।

যদি কোন দুঃসাহসিক ব্যক্তি এমন কথা বলেন যে কেবল গবর্ণমেণ্টকে ডাকাডাকি না করিয়া আমাদের নিজের হাতেও কিছু কাজ করা আবশ্যক তাহা হইলে সে কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দিতে ইচ্ছা করে। তাহার প্রধান কারণ আমার এই মনে হয় যে, কি কি উপায়ে আমাদের দেশের অভাববিশেষ নিরাকৃত হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে—কম কাজ করিয়া বেশি করিতেছি দেখানই উদ্দেশ্য। তা ছাড়া আমাদের যে কিছু দোষ আছে, আমাদের যে কোন বিষয়ে

চেষ্টা করিয়া যোগ্য হওয়া আবশ্যক একথা আমারা সহ্য করিতে পারি না। মনে হয় ওরকম কথা Patriotic নহে। মনে হয় ও কথা সত্য হইলেও বলা উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সচেতন হইয়া উঠিবে। অতএব নিদেন Policyর জন্য বলা আবশ্যক আমাদের যাহা হইবার তাহা বেবাক হইয়া গেছে, এখন তোমাদের পালা। আমরা সকলেই সকল বিষয়ের জন্য যোগ্য, এখন তোমরা যোগ্যের সহিত যোগ্যকে যোজনা কর। আমি নিজের কথা আলোচনা করিয়া এবং আমার অভিজ্ঞতার প্রতি নির্ভর করিয়া বলিতে পারি, আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই আছেন যাঁহারা আমাদের রাজ্যশাসনতন্ত্র এবং Representative Governmentএর মূল নিয়ম এবং আমাদের দেশে বর্ত্তমানকালে তাহার উপযোগিতা ও সম্ভাবনা-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত আছেন অথবা প্রকৃত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তদ্বিষয়ে কিছু জানিতে অভিলাষী আছেন। কিন্তু আমরা সকলেই জানি রাজ্যশাসনের আমরা যোগ্য, Representative Government লাভে আমরা অধিকারী। কথাগুলা উচ্চারণ করিতে পারিলেই যে প্রকৃত বস্তুতে অধিকার জন্মে তাহা নহে। অন্য দেশের লোকেরা যাহা প্রাণপণ চেষ্টায়, স্বাভাবিক মহত্ব ও প্রবল বীরত্বের প্রভাবে আবিষ্কার ও উপার্জ্জন করিয়াছে, আমরা তাহা কানে শুনিয়াই আপনাদিগকে অধিকারী জ্ঞান করিতেছি। শিক্ষা করিবার পরিশ্রমটুকুও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যদি গবর্ণমেণ্ট এমন একটা নিয়মজারী করিতেন যে আমাদের দেশের শাসনতন্ত্র এবং Representative Government-এর সম্বন্ধে একটা বিশেষ পরীক্ষায় আপনার সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রকাশ না করিলে সে বিষয়ে কাহাকেও কথা কহিতে দিবেন না, তাহা হইলে বোধ করি কথাবার্ত্তা এক প্রকার বন্ধ হয়। আমাদের চরিত্রে আমাদের জীবনে আমরা যোগ্যতা লাভ করিব না, পরিশ্রম করিয়া কতকগুলি fact শিক্ষা তাহাও করিব না। দেশের যে সকল অভাব মোচন অধিক পরিমাণে আমাদের নিজের সাধ্যায়ত্ত তাহাতেও হস্তক্ষেপ করিব না, অথচ কোন্ মুখে বলিব আমরা আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত Political agitation যোগ দিয়াছি? *

---

* লেখক আমাদের এখনকার পলিটিক্যাল আন্দোলন যেরূপ অসার মনে করেন একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিবেন তাহা নহে। এই আন্দোলনের মধ্যেই—কাজ করিবার একটি ইচ্ছা জাতীয় মহত্ত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হইবার একটি উদ্যম প্রকাশ পাইতেছে, তবে লেখক একদিনেই যদি আমাদের শত শত বৎসরের অবনতির বিনাশ দেখিতে চান তাহা কি করিয়া পাইবেন? লেখক বলিয়াছেন "আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই আছেন যাঁহারা আমাদের রাজ্যশাসনতন্ত্র এবং Representative Governmentএর মূল নিয়ম এবং আমাদের দেশে বর্ত্তমানকালে তাহার উপযোগিতা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত আছেন অথবা প্রকৃত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তদ্বিষয়ে কিছু জানিতে অভিলাষী আছেন''। অবশ্য দেশের অধিকাংশ লোক যদি যোগ্য হইত তাহা হইলে ত সমস্ত গোল চুকিয়া যাইত, এরূপ পলিটিক্যাল আন্দোলনেরই বা তাহা হইলে আবশ্যক কোথা? কিন্তু আমাদের দেশ কোন ছার কথা ইয়ুরোপের কোন দেশেই কি অধিকাংশ লোকে রাজ্যশাসনতন্ত্রের মর্ম্মগত নিয়ম বিচার করিয়া কাজ করে? এরূপ স্থলে সর্ব্বত্রই নেতাগণ প্রধান, তাঁহাদের প্রাণগত চেষ্টা, মহত্বই জাতীয় উন্নতির কারণ। আমাদিগের পলিটিক্যাল নেতাগণের সকলে না হউন যখন অনেকেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনে প্রাণগত চেষ্টা করিতেছেন, তখন

এ সকল agitation এর উপর যে সাধারণ লোকের বিশেষ বিশ্বাস আছে তাহাও দেখিতে পাই না। এ সকল বিষয়ে কেহ ঝট করিয়া টাকা দিতে চাহে না, বলে—ও কতদিন টিঁকিবে! আর তাহা ছাড়া আমাদের দেশে এক প্রবাদ প্রচলিত আছে—কোম্পানিকা মাল দরিয়ামে ডাল্! সাধারণ কার্য্যে টাকা দিয়া লোকের বিশ্বাস হয় না যে সে টাকার যথোপযুক্ত সদ্ব্যয় হইবে। মনে করে পাঁচজনের টাকা গোলেমালে দশ জনের ট্যাঁকে অদৃশ্য হইয়া যাইবে অথবা এমন এলোমেলোভাবে খরচ হইবে যে সমস্তটাই ন দেবায় নধর্ম্মায় হইবে। আমরা বলি "ভাগের মা গঙ্গা পায় না" অর্থাৎ মাকে গঙ্গাযাত্রা করান এক বিষম লেঠা, নিতান্ত কেহ না থাকিলে কাজেই কায়ক্লেশে নিজেকে ভার লইতে হয় কিন্তু যখন আরো পাঁচটা ভাই আছে তখন আর কে ওঠে! আমরা আমাদের জাত ভাইকে এমন চিনি যে কাহারো বিশ্বাস হয় না যে সাধারণের কাজ সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। এমন কি, বাণিজ্যে, যাহাতে সকলেরই স্বার্থ আছে তাহাতেও আমরা পাঁচজনে মিলিয়া লাগিতে পারি না। একেত পরস্পরকে অবিশ্বাস করিব অথচ নিজেও কাজ করিব না। কাহারো সততা এবং সত্যনিষ্ঠার উপর বিশ্বাস নাই। গোড়াতেই মনে হয় সমস্তটা ফাঁকি একটা হুজুক মাত্র।

ইহার কারণ আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে নিহিত। আমরা সত্যপরায়ণ নহি সুতরাং কোন কাজেই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। বিশ্বাস ব্যতীত কোন কাজই হয় না, আবার বিশ্বাসযোগ্য না হইলে বিশ্বাস করা যায় না। অতএব গোড়ায় দরকার চরিত্র গঠন। জাতির মধ্যে উদ্যম, সত্যপরতা, আত্মনির্ভর, সংসাহস না থাকিলে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া রেপ্রেজেণ্টেটিব গবর্ণমেণ্ট ভিক্ষা চাহিতে বসা বিড়ম্বনা। আমার মনে হয় আমাদের দেশের লোকদের ডাকিয়া ক্রমাগত এই কথা বলা আবশ্যক যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রসাদে সুশাসন প্রভৃতি যে সকল ভাল জিনিষ পাইয়াছি, কোন জাতি সে গুলি পড়িয়া পায় নাই, তাহার জন্য বিস্তর যোঝাযুঝি, সংযম, আত্মশিক্ষা, ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমরা যে সকল অধিকার অনায়াসে অযাচিত ভাবে পাইয়াছি, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়া প্রাণপণে যেন তাহার যোগ্য হইবার চেষ্টা করি—কারণ পড়িয়া পাওয়াকে পাওয়া বলে না, কেন না তাহার স্থায়িত্ব নাই, তাহাতে কেবল নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্টভাবে সুখে থাকা যায় মাত্র কিন্তু তাহাতে জাতীয় চরিত্রের বিশেষ উন্নতি হয় না। আমরা যে সুখ পাইতেছি আমরা তাহার যোগ্য নহি, আমরা যে দুঃখ পাইতেছি সে কেবল আমাদের নিজের দোষে। একথা শুনিলে লোকে অত্যন্ত উল্লাসিত হইয়া উঠিবে না—একথা কেবল মাত্র জয়ধ্বজায় লিখিয়া উড়াইয়া বেড়াইবার কথা নহে, একথার অর্থ নিজে কাজ কর, ধৈর্য্যসহকারে শিক্ষা লাভ কর, বিনয়ের সহিত গভীর লজ্জার সহিত আপনার দোষ ও অযোগ্যতা স্বীকার করিয়া তাহা আপন যত্নে দূর করিবার চেষ্টা কর যাহাদের কাছে সহস্র বিষয়ে ঋণী আছ তাহাদের ঋণ স্বীকার কর, সে ঋণ ধীরে ধীরে শোধ কর। আমাদের লোকের একটি যে দোষ আছে ভিক্ষাকে আমরা হক্ মনে করি, পরের উপার্জ্জনের উপর অতি অসঙ্কোচে

কি এই আন্দোলনকে আমরা সার শূন্য বলিতে পারি? চরিত্র মাহাত্ম্য নহিলে কোন উন্নতি হয় না সত্য, কিন্তু ইহারদিকে আমাদের যে লক্ষ্য পড়িয়াছে—তাহার উক্তরূপ অনেক প্রমাণ দেখা যাইতেছে, তাহা ছাড়া লেখকের বর্ত্তমান প্রবন্ধই তাহার একটি প্রমাণ। ভাং সং।

আপনার ভাগ বসাই, আবার তাহাতে সামান্য ত্রুটি হইলে চোখ রাঙাইয়া উঠি এই প্রকৃতিগত অভ্যাস যেন ত্যাগ করি। কেবল অলসভাবে পড়িয়া পড়িয়া পরের কর্ত্তব্য সমালোচনা করিয়া নিজের কর্ত্তব্য ভুলিয়া না যাই। গবর্ণমেণ্টের "আহ্লাদে ছেলেটির মত কেবল সকল বিষয়েই আবদার করিব এবং নিজের দোষ স্মরণ করাইয়া দিলেই অমনি ফুলিয়া দাপাইয়া কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা খুঁড়িয়া কুরুক্ষেত্র করিয়া দিব এই ভাবটি ত্যাগ করি। আজ কাল যে কাণ্ড চলিতেছে তাহাতে ইহার উল্টা ভাবটাই আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট সহস্র বিষয়ে অপরাধী এবং আমাদের কোন অপরাধ নাই—অলস এবং অহঙ্কারী লোকদের মন হইতে এভাবটা দূর করাই একান্ত চেষ্টাসাধ্য, এ ভাব মুদ্রিত করিবার জন্য বিশেষ আয়োজনের অপেক্ষা করে না।

প্লেটো—টিমীয়স।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা এক্ষণে বিশ্বের যে নূতন করিয়া আলোচনা আরম্ভ করিতেছি, সে নিমিত্ত বস্তু সমূহের প্রশস্ততর বিভাগ আবশ্যক; কারণ পূর্ব্বে আমরা দুইটি মাত্র শ্রেণী স্বীকার করি, এক্ষণে তৃতীয় আর একটি গ্রাহ্য। পূর্ব্বের আলোচনায় ঐ দুইটি শ্রেণীই যথেষ্ট হইয়াছিল; আমরা অনুমান করিয়াছিলাম যে এক শ্রেণীর বস্তু পরিবর্ত্তন বিহীন ও বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞেয় এবং আর এক শ্রেণীর বস্তু উক্ত শ্রেণীর আদর্শে গঠিত, দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর, ও পরিবর্ত্তনশীল [অর্থাৎ এক শ্রেণী দৃষ্টি গ্রাহ্য নহে কেবল বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞেয়, অপরিবর্ত্তনীয়, এবং আদর্শ স্বরূপ; অপর শ্রেণী দৃষ্টি গ্রাহ্য, পরিবর্ত্তনশীল এবং প্রথম শ্রেণীর অনুকরণ মাত্র।] তৃতীয় শ্রেণীর উল্লেখ আমরা তখন করি নাই; কিন্তু এক্ষণে বোধ হইতেছে যে এই তৃতীয় শ্রেণী ব্যতীত আলোচনা সম্পূর্ণ হইবে না। এই তৃতীয় শ্রেণীর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা সহজ নহে; ইহা সম্ভূতির পাত্র ও ধাত্রী স্বরূপ। আমি এ বিষয়ে যাহা সত্য তাহা বলিলাম; ইহার বিশদরূপ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। কিন্তু এ নিমিত্ত আমাদিগের কতকগুলি জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে; যেমন অগ্নি প্রভৃতির প্রকৃতি কি এবং ভৌতিক পদার্থ সমূহের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ কি।

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে যাহাকে আমরা এক্ষণে জল কহিতেছি, তাহা জমিলে শিলা ও মৃত্তিকা জন্মে, আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয় হইতে এইরূপই প্রতীতি হয়। আবার

ঐ একই ভৌতিক পদার্থ যখন গলিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তখন বাষ্প ও বায়ু উৎপন্ন হয়। বায়ু আবার জ্বলিয়া অগ্নি হয় এবং অগ্নি নিবিয়া ঘনীভূত হইলে বায়ু হয়; পুনশ্চ বায়ু একত্রীভূত ও ঘনীকৃত হইলে মেঘ ও বাষ্প জন্মে, আর ইহাদিগের হইতে জল এবং জল হইতে মৃত্তিকা ও শিলা উৎপাদিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে সম্ভূতি ব্যাপার এক আকৃতি হইতে অপর আকৃতি ইত্যাকারে চক্র ঘূর্ণনবৎ ঘটিতেছে [অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে জল, জল হইতে বায়ু, আর বায়ু হইতে অগ্নি, এবং অগ্নি হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জল, ও জল হইতে মৃত্তিকা।] ভৌতিক পদার্থদিগের যেখানে আকৃতির কোন স্থিরতা নাই অর্থাৎ যেখানে এক অপরে এবং অপর একে ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সেখানে কেহ কিরূপে সাহস করিয়া বলিতে পারে যে তাহাদিগের মধ্যে এইটী অমুক বস্তু, তাহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে? কেহই পারে না। কিন্তু যেরূপ করিয়া বলিলে ভ্রম হইবার কোন আশঙ্কা নাই, তাহা এই:—অগ্নি দেখিলে আমরা এরূপ বলিব না যে 'ইহা অগ্নি' [কারণ 'ইহা' এক্ষণে অগ্নি, পরমুহূর্ত্তে বায়ু ইত্যাদিতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে] কিন্তু এই মাত্র বলিব যে 'এইরূপ একটী প্রকৃতিকে অগ্নি কহে'। সেইরূপ জলের সম্বন্ধে বলিব না 'উহা জল,' এইমাত্র বলিব যে 'ঐরূপ একটী প্রকৃতি জল'। এইরূপে আমরা পদার্থ সমূহকে ইহা, উহা ইত্যাদি বিশেষক পদ দ্বারা নির্দ্দেশ করিব না, কারণ তাহা হইলে এই বুঝাইবে যে পদার্থ সমূহ বরাবর এক এক নির্দ্ধারিত প্রকৃতিতে থাকে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, তাহারা প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। অতএব আমরা ইহা বলিব যে সমুদয় অগ্নিতে একটী সাধারণ প্রকৃতি আছে, সেইরূপ সমুদয় জলে আর একটী সাধারণ প্রকৃতি আছে ইত্যাদি। যে পাত্রে এই সকল সাধারণ প্রকৃতির জন্ম, আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটে তাহাই 'ইহা,' 'উহা' নামে বাচ্য। [অর্থাৎ প্লেটোর মতে একটী এমন কোন বস্তু আছে, যাহার নিজের কোন আকৃতি নাই, কিন্তু যাহাতে কখনও বা অগ্নি, কখনও বা জল ইত্যাদি সাধারণ প্রকৃতির আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং তদনুসারে উহা অগ্নি, জল ইত্যাদির আকৃতি ধারণ করে। উপরে যে তৃতীয় শ্রেণীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা এই আকৃতিহীন বস্তু যাহা সম্ভূতির পাত্র স্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে।] এই বিষয়টী আমি আর একরূপে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি। মনে কর কেহ সোণা হইতে নানা প্রকার আকৃতি গড়িতেছে এবং ক্রমাগত এক আকৃতি আর একটীতে এবং ইহা আবার আর একটী আকৃতিতে ইত্যাদি রূপে পরিবর্ত্তিত করিতেছে;—কোন ব্যক্তি উহাদিগের একটী লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "উহা কি?" এই প্রশ্নের সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রমশূন্য ও প্রকৃত উত্তর এই—"উহা সুবর্ণ;" উত্তরে এরূপ বলা উচিত নয় যে উহা একটী ত্রিভুজ কিম্বা অপর কোন আকৃতি। কারণ এই সকল আকৃতির কোন চিরস্থায়ী বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, উহাদিগের ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হইতেছে। উপরে যেরূপ কল্পিত

হইয়াছে, তদনুসারে স্বর্ণ এই মুহূর্ত্তে ত্রিভুজাকার হইলেও প্রশ্নের উত্তর দিতে না দিতে উহা অপর কোন আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইবে। সুতরাং প্রশ্নকর্ত্তা যদি 'উহা সোণা' এই সাধারণ উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হয়েন, তা জ্ঞানের নিমিত্ত উহাই যথেষ্ট হইবে। যে সাধারণ প্রকৃতি বা পাত্র কখনও এ বস্তু কখন ওবস্তু ইত্যাদি আকার ধারণ করিতেছে, তাহার সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। এই সাধারণ পাত্র বরাবর এক প্রকৃতিতে থাকে, কারণ যদিচ ইহা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর আকৃতি গ্রহণ করিতেছে বটে, তথাপি কখনও স্বকীয় প্রকৃতি হারায় না এবং যে সকল বস্তুর আকৃতি উহাতে প্রতিফলিত হইতেছে, কখনও তাহাদিগের প্রকৃতি গ্রহণ করে না। [যেমন জল ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির পাত্রে ঢালিলে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ করে, কিন্তু জল জলই থাকে, পাত্রের সহিত এক প্রকৃতি হইয়া যায় না। আবার যেমন মমের উপর যেরূপ ইচ্ছা মোহরের ছাপ উঠান যাইতে পারে, অথচ মম মমই থাকে।] জগতে কতকগুলি অবিনশ্বর অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু আছে, যাহাদিগের অনুকরণে সমুদয় দৃষ্টিগ্রাহ্য পদার্থ গঠিত হইয়াছে। এই সকল পদার্থ গঠনের নিমিত্ত উক্ত অবিনশ্বর আদর্শ সমূহের প্রতিবিম্ব উল্লিখিত সাধারণ পাত্রে পতিত হওয়া আবশ্যক। কিরূপ অদ্ভুত ও বোধাগম্য পদ্ধতিতে এই সকল প্রতিবিম্ব নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা আমরা পরে দেখিব। কিন্তু এক্ষণে আমরা কেবল তিন প্রকার প্রকৃতি অনুমান করিতেছি মাত্র। প্রথম, যাহা সম্ভূত হইতেছে; দ্বিতীয়, যাহাতে সম্ভূতি ঘটিতেছে; এবং তৃতীয়, যাহার আদর্শে প্রথমটী জন্মিতেছে। দ্বিতীয় প্রকৃতির কোন প্রকার স্বকীয় আকৃতি থাকিতে পারে না, কারণ উহার ধর্ম্মই এই যে উহা চিরস্থায়ী আদর্শ সমূহের আকৃতি ক্রমাগত প্রাপ্ত হইতেছে [উহার নিজের কোন চিরস্থায়ী আকৃতি থাকিলে উহা অন্য যে সে আকৃতি ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছে না।] অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে প্রকৃতি সমুদয় সৃষ্ট ও দৃষ্টি কিম্বা অপর কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থ সমূহের মাতা ও পাত্র স্বরূপ তাহাকে মৃত্তিকা কিম্বা বায়ু কিম্বা অগ্নি কিম্বা জল কিম্বা ইহাদিগের কোন যৌগিক কিম্বা ইহাদিগের কোন মৌলিক বলা যাইতে পারে না। উহা এক প্রকার অদৃশ্য নিরাকৃতি বস্তু, উহা সমুদয় বস্তু ধারণ করিয়া থাকে (অর্থাৎ উহা হইতে সমুদয় বস্তু জন্মিয়া থাকে,) এবং উহা কোন অদ্ভুত প্রকারে বুদ্ধির গোচর চিরস্থায়ী আদর্শ সমূহের প্রকৃতির কিয়দংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; উহার প্রকৃতি মনে ধারণা করা অতিশয় দুরূহ। [পূর্ব্বেকার গ্রীক দার্শনিকদিগের মধ্যে কেহ বা জল, কেহ বা অগ্নি ইত্যাদি কোন বস্তুকে সমুদয় সৃষ্ট বস্তুর মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্লেটো তাঁহাদিগের মত গ্রহণ না করিয়া স্বকীয় উল্লিখিত মত প্রচার করেন; তাঁহার মতে, আমরা যে সমুদয় সৃষ্ট বস্তু দেখিতে পাই, তাহা কতকগুলি চিরস্থায়ী ইন্দ্রিয়ের অগোচর বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্য আদর্শের অনুকরণে গঠিত। এই সমুদয় আদর্শের প্রতিবিম্ব উপরে লিখিত নিরাকৃতি সাধারণ প্রকৃতির উপর পতিত হইলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ সমূহ উৎপন্ন হয়। এই সাধারণ

প্রকৃতিতে যখন জলের প্রকৃতি প্রবেশ করে, তখন উহা জলের আকৃতি ধারণ করে, যখন অগ্নির—তখন অগ্নি, ইত্যাদি।]

এক্ষণে আমরা এই প্রশ্নটী অনুধাবন করিব। জগতে স্বকীয় অস্তিত্ববিশিষ্ট অগ্নি আছে কি না? অর্থাৎ অগ্নির বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব আছে কি না? এবং আমরা যে সমুদয় বস্তুর কথা বলিয়া থাকি, সে সমুদয়েরই বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে, না আমরা চক্ষু কিম্বা শারীরিক কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বস্তু অনুভব করি, কেবল সেগুলিরই অস্তিত্ব আছে এবং তাহা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর নাই? এই বিষয়টী ছাড়িয়া যাওয়া আমাদিগের উচিত হইবে না; কিম্বা ইহার কোন মীমাংসা হইতে পারে না এরূপ বলাও ঠিক হইবে না। যাহা হউক এ সম্বন্ধে আমার মত এস্থলে সংক্ষেপে প্রকটিত করিতেছি।

আমার মত এই:—জ্ঞান যদি দুই প্রকারের হয়, এক প্রকার যাহা কেবল মানসিক জ্ঞান—আর এক প্রকার যাহা ইন্দ্রিয়জ, তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে কতকগুলি এরূপ ভাব বা চিন্তা আছে যাহারা ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে, কেবল মাত্র মন দ্বারা জ্ঞাতব্য অথচ যাহারা বাস্তবিক অস্তিত্ববিশিষ্ট (মনের চিন্তা মাত্র নহে।) কিন্তু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যদি মানসিক জ্ঞান হইতে বিভিন্ন না হয়, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে যে যাহা কিছু আমরা শারীরিক ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করি, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃত ও নিশ্চয়। কিন্তু উপরে যে বিভেদটী উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে; উহার একটীকে আমরা যথার্থ জ্ঞান, আর অপরটীকে মত বলিয়া থাকি; যথার্থ জ্ঞান শিক্ষা দ্বারা (যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা) প্রচারিত হইয়া থাকে, আর মত কেবলমাত্র অনুভূতির উদ্দীপন দ্বারা। [যেমন যদি কেহ বলে "পৃথিবী গোলাকার" আর ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত যুক্তি প্রদর্শন করে, তাহা হইলে ইহা যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হইবে; আর যদি কেহ বলে "অমুক তোমার শত্রু" আর এ বিষয়ে তোমার বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি প্রদর্শন না করিয়া কেবল তোমার রাগ দ্বেষাদি অনুভূতির উদ্রেক করাইতে চেষ্টা পায়, তাহা হইলে ইহা কেবল মাত্র মতের বিষয় হইবে অর্থাৎ সত্য হইলেও পারে—না হইলেও পারে।] যথার্থ জ্ঞান প্রকৃত বুদ্ধিবৃত্তির চালনা দ্বারা জন্মিয়া থাকে, আর মত তাহা নহে। যথার্থ জ্ঞান অনুনয় বিনয়াদি দ্বারা টলিত হয় না, মত তাহা হইতে পারে; আবার যথার্থ জ্ঞান কেবলমাত্র দেবগণের এবং অতি অল্প সংখ্যক মনুষ্যেরই আছে, কিন্তু মত সমুদয় মানুষেরই আছে। যখন দেখা যাইতেছে যে জ্ঞান দুই প্রকারের, এক যথার্থ জ্ঞান যাহা অপরিবর্ত্তনীয়—আর ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা মত, যাহা পরিবর্ত্তনশীল, তখন আমাদিগের ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে ঐ দুই প্রকার জ্ঞানের বিষয় দুই প্রকার বস্তু আছে। এক প্রকার বস্তু যাহা অপরিবর্ত্তনীয়, অসৃষ্ট (অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে

হইতে বিদ্যমান) ও অবিনশ্বর, যাহা কখনও বাহির হইতে নিজের মধ্যে কিছু গ্রহণ করে না এবং যাহা নিজে অন্য কোন বস্তুতে প্রবেশ করে না, দৃষ্টি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় সমূহের অগোচর, কেবলমাত্র জ্ঞানবৃত্তির গোচর। আর এক প্রকার বস্তু যাহার নাম প্রথম প্রকারের সহিত এক এবং যাহা উহার সদৃশ, ইন্দ্রিয়ের গোচর, সম্ভূতিবিশিষ্ট (অসৃষ্ট নহে,) সর্ব্বদা গতিশীল, এবং যাহা কখনও বা স্থানে আবির্ভূত হইতেছে এবং কখনও বা স্থান হইতে অন্তর্হিত হইতেছে (অতএব যাহার স্থিতি আছে অর্থাৎ অস্তিত্বকালে স্থান ব্যাপিয়া থাকে।) দ্বিতীয় প্রকার বস্তু ইন্দ্রিয় ও মতের বিষয় (প্রথম প্রকারের বস্তু বাস্তবিক জ্ঞানের বিষয়।) ইহা ব্যতীত তৃতীয় আর এক প্রকার বস্তু আছে যাহাকে স্থান কহে; ইহা চিরস্থায়ী ও অনাদি, ইহার ক্ষয় নাই, এবং ইহা সমুদয় সৃষ্ট পদার্থের আবাস স্বরূপ। ইন্দ্রিয় দ্বারা ইহার উপলব্ধি হয় না, একপ্রকার অপ্রকৃত জ্ঞান বৃত্তির দ্বারা (অর্থাৎ যে জ্ঞানবৃত্তির দ্বারা প্রথম প্রকার বস্তু উপলব্ধ হয় তাহা নহে, তাহার নকল আর এক প্রকার জ্ঞানবৃত্তির দ্বারা) ইহা উপলব্ধ হয়, ইহা যেন আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, ইহা যেন আমরা স্বপ্নে দেখিয়া থাকি এবং (একপ্রকার ঘুমন্ত অবস্থায় যেন) আমরা বলি যে যাহা কিছু (ইন্দ্রিয়ের গোচর) বিদ্যমান আছে তাহা স্থান ব্যপিয়া থাকে এবং যাহা আকাশেও নাই, পৃথিবীতেও নাই (অর্থাৎ কোন স্থানে নাই) তাহার কোন অস্তিত্ব নাই।

এখানে দেখা যাইতেছে যে প্লেটো সমুদয় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রকারের বস্তু একপ্রকার ইন্দ্রিয়ের অগোচর কতকগুলি চিন্তার (উল্লিখিত প্রথম প্রকারের বস্তুর) অনুকরণে গঠিত অনুমান করিয়াছেন। কোন রূপে স্থানের (উল্লিখিত তৃতীয় প্রকার বস্তু যাহা প্লেটো পূর্ব্বে সম্ভূতির পাত্র ও ধাত্রী ও মাতা স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) উপর ঐ সকল চিন্তার ছায়া পতিত হয় আর তখন স্থানে তদনুযায়ী ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু জন্মিয়া থাকে। এই বস্তু ঐ চিন্তার আদর্শে গঠিত বলিয়া উহাদিগের একই নাম: যেমন মনে কর অগ্নির একটী আদর্শ আছে যাহা চিন্তার বিষয় ও অবিনশ্বর ও বাস্তবিক অস্তিত্ব বিশিষ্ট, এই আদর্শের প্রতিবিম্ব যখন স্থানে পতিত হইবে তখন দৃশ্যমান অগ্নি সম্ভূত হইবে; কিন্তু এই দৃশ্যমান অগ্নি ক্ষণস্থায়ী, উহার যেমন আবির্ভাব আছে, তেমনই আবার উহার তিরোভাব আছে, উহা বাস্তবিক পক্ষে বিশেষ কিছুই নহে। উহার সম্বন্ধে আমরা কোন নিশ্চয় কিছু বলিতে পারি না, উহা কেবল মতের বিষয় মাত্র কিন্তু বাস্তবিক অগ্নি (যাহার আদর্শে দৃশ্যমান অগ্নি জন্মিয়া থাকে) চিন্তার বিষয় এবং উহার সম্বন্ধে নিশ্চয় সত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে। সাধারণ লোকে এই নিশ্চয় সত্য অবধারণে সক্ষম নহে, কেবল মাত্র দেবগণ ও তাঁহাদিগের প্রিয়পাত্র কতকগুলি দার্শনিক তাহা অবধারণ করিতে পারেন। সাধারণ লোকে কেবল দৃশ্যমান বস্তু সমূহের জ্ঞানেই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু এই মাত্র বলা হইয়াছে যে এই সকল বস্তু ক্ষণস্থায়ী, অতএব ইহাদিগের পক্ষে কোন চিরস্থায়ী নিশ্চয় সত্য নির্ণীত হইতে পারে না। ইহাদিগের পক্ষে যাহা বলা যায়, তাহা কেবল মতের বিষয় মাত্র, সত্য হইতেও পারে—না হইতেও পারে। প্লেটো বলিয়াছেন যে চিন্তনীয় বস্তুর প্রতিবিম্ব স্থানে পতিত হইলে দৃশ্যমান বস্তু জন্মে; কিন্তু একথাটী রূপকমাত্র; এই প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কি এবং উহা কিরূপেই বা স্থানে পতিত হয়?

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

সংসারাশ্রম। শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত।

উপন্যাস খানির আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

রত্নাবলী। শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত।

সংস্কৃত রত্নাবলীর ইহা অনুবাদ। মূল কাব্যের সরসতা আমরা ইহাতে পাইলাম না। অনুবাদককে সে জন্য আমরা দোষী করিতেছি না। সংস্কৃত ভাষায় লালিত্য ও ভাব বঙ্গ ভাষায় রক্ষা করা বড় সুকঠিন।

কবিতাহার। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত।

বিজন সঙ্গীত। লেখকের ইহাতে নাম নাই।

দুই খানিই কবিতা পুস্তক. দুই খানির মধ্যে বিজন সঙ্গীত অনেক ভাল।

কবিতা। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত।

ইহার অনেকগুলি কবিতাই কবিতা, আমরা নিম্নে একটি উদ্ধৃত করিলাম।

আয় আয়।

১

কে গো তুমি, কোথা হোতে উদাস করিয়ে প্রাণ ডাকিছ আমায়?
অবিরাম—অবিশ্রাম উচ্চারিছ কর্ণে মম "আয়, আয়, আয়,!"?
নিস্তরঙ্গ সাগরের সীমাহারা প্রাণ সম অবোধ্য, ভৈরব;
বসন্ত মলয় সম. স্নিগ্ধ যাদুমন্ত্রপূত, ঐ তোর রব!
এ যে গো অনন্ত শূন্য, কোথা পাব কূল তার? কোথা যাব আর?
এখনো শুনিছি দূরে, ঐ শব্দ "আয় আয়." শ্রান্তি নাহি তার!
এ নহে কল্পনা ছায়া, বৃথা মোহ, বৃথা মায়া, অলীক স্বপন;
ওই ডাকে "আয় আয়," ওই দূরে শোনা যায়, প্রত্যক্ষ কেমন!

২

বিমুগ্ধ উন্মত্ত প্রাণ! অসীম ও শূন্যে ছুটে পার কি বেড়াতে?
সীমার প্রাচীর বেড়া, জগতের কারাগার, পার কি এড়াতে?
কত বার, কত বার, অনন্তের সূত্রগাছি. গিয়াছি ছিঁড়িতে!
কত বার, কত বার, পড়িয়াছি ধরাতলে অনন্তে উড়িতে!
কত বার, কত বার, শব্দ শূন্য কারাগারে বেঁধেছি আমারে!
কত বার, কত বার, মুদিয়া নয়ন দুটী ডুবেছি আঁধারে!
তবুও, তবুও শুনি, ওই "আয় আয়" ধ্বনি ডাকেরে আমায়—!
ডুবিতে পারি না ছাই, উড়িতেও শক্তি নাই, কি শৃঙ্খল পায়!!

স্নেহলতা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

জগৎ বাবুর অন্তঃপুরে—সেই পূর্ব্বোক্ত পরিচিত শয়ন কক্ষে—সেই জীর্ণ মাদুর খাটির উপর বসিয়া জীবনের মা জগৎবাবুর স্ত্রীকে তাঁহার দুঃখের কথা কহিতেছিলেন। তাঁহাদের কথায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে আজ আর কেহ সেখানে ছিল না। টগর "ঠাকুরপো"দের বাড়ী গিয়াছে, স্নেহলতা অন্যঘরে। প্রয়োজন না হইলে সে আপনা হইতে গৃহিণীর ঘরে বড় আসে না।

জীবনের মার দুঃখের কথা শুনিয়া গৃহিণীও চোখ মুছিয়া বলিলেন—"এমন অধর্ম্মে লোক গা! বিষয় সব দখল কল্লে আর ভাইপোকে পথে দাঁড় করালে! ভগবান এত অধর্ম্মি কখনোই সইবেন না। আমি বলছি, জীবনের মা, তোদের ধন তোদের হবে। কিছুদিন সবুর কর ওর হাতেনাতে হবে।"

জীবনের মা অশ্রু মুছিয়া বলিলেন—"আমি বোন তা চাইনে, আমার কিশোরী, মোহন ভাল থাক কুঞ্জমোহন দুঃখ না পাক, তবে আমাদের বিষয় আমরা ফিরে পেলেই হোল। এতটুক ছেলে নিয়ে বিধবা হয়েছি দিদি—ভেবেছিলাম ছেলের কষ্ট যেন না দেখতে হয়। তাও বিধাতা সইলে না, এই দুঃখ।"

গৃহিণী বলিলেন—"কাঁদিসনে জীবনের মা, হবে সব হবে, তোর ছেলে দুঃখ পাবে না। অত সুবোধ ছেলে লেখাপড়ার অত মন ও কি কিছু ক'রে উঠতে পারবে না? তা অনেক দিন জীবনকে দেখিনি, বাছা ছোট বেলায় সর্ব্বদাই আসত—আর আনিসনে কেন?"

জীবনের মা বলিলেন—"সেও বাইরে জগৎবাবুর কাছে এসেছে—যদি চাকরী বাকরী একটা করে দিতে পারেন। তোমরাই ত বোন আমাদের ভরসা।"

গৃহিণী বলিলেন—"তা চাকরী হবে বই কি—যাতে হয় তা আমি দেখব, তোরা কি পথে দাঁড়াবি নাকি!"

দুঃখে নহে, কৃতজ্ঞতার প্রাচুর্য্যে এবার জীবনের মার চক্ষু জলপূর্ণ হইল। চিরজীবন তিনি গৃহিণীর পূর্ণ মমতা পাইয়া আসিতেছেন অথচ তিনি তাঁহার কে? রক্ত সম্পর্কে তিনি তাঁহার কেহই নহেন! দুই জনের পিত্রালয় একপাড়ায়, এইহেতু তাঁহারা বাল্য সখীত্বে আবদ্ধ মাত্র। এই সখীত্ব গৃহিণী আজীবন সমান ভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

পাঠক যদি স্নেহলতার প্রতি ব্যবহার হইতে গৃহিণীকে হৃদয় হীন ভাবিয়া থাকেন ত তাঁহার সে ভ্রম এবার দূর হইবে। বাস্তবিক তিনি নির্ম্মম কিম্বা দানকুণ্ঠও নহেন।

তিনি যাঁহাকে ভাল বাসেন যাঁহাদের আত্মীয় মনে করেন—অকুণ্ঠিত চিত্তে তিনি তাঁহাদের কষ্ট প্রশমণ করিতে উদ্যত। তবে তাঁহার এই মমতার ভাব সার্ব্বভৌমিক উদারতার উপর স্থাপিত নহে, অন্ততঃ জগৎ বাবুর আত্মীয় স্বজনের প্রতি সব সময় তাঁহার এ ভাব অকাতরে পেঁীছায় না।

জীবন আসিয়াছে শুনিয়া গৃহিণী যথার্থই সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন—"এসেছে, বেশ করেছে, চাকরী একটা হবেই। তা বাইরে এল এখানে একবার আসবে না?" ও হারার মা বাইরে থেকে জীবনকে একবার ডাক দেখি"

হারার মা তখন বিছানা করিবার জন্য ঘরে ঢুকিতেছিল—কিন্তু আর না ঢুকিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। কিছু পরেই বারান্দায় জুতার শব্দ শোনা গেল, স্নেহলতা অন্যঘর হইতে ভাবিল জগৎবাবু আসিতেছেন—সে তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, একজন অপরিচিতকে দেখিয়া সহসা বিস্মিত হইল, তাহার পর অপ্রস্তুত হইয়া দৌড়িয়া চলিয়া গেল।

জীবনকে দেখিয়া গৃহিণীও বিস্মিত হইলেন। প্রায় আট দশ বৎসর জীবন এখানে আসে নাই—সুতরাং তিনি যাহাকে দেখিবেন ভাবিয়াছিলেন তাহার পরিবর্ত্তে এক অপরিচিত সুশ্রী যুবাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

জীবনের সুদীর্ঘ দেহে, প্রফুল্ল বর্ণে, কুঞ্চিত কেশবিন্যস্ত সুগঠিত মস্তকে, বুদ্ধি প্রকাশক ললাটে, আশাকল্পনা-প্রদীপ্ত আয়ত চক্ষুতে, সুশ্রী নাসিকায়, নবীন শ্মশ্রুযুক্ত সুবঙ্কিম ওষ্ঠাধরে—তাহার সমস্ত আকৃতিতে এক মনোহর সমুজ্জ্বল ভাব—উদার বুদ্ধির মাধুর্য্য প্রস্ফুটিত।

গৃহিণী মাতৃস্নেহ পূর্ণ নয়নে সেই মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া পরিতৃপ্ত হৃদয়ে বলিলেন "সেই এতটুক ছেলে এখন এত বড় হয়েছে! আহা মরে যাই—বড় ছিরিমান হয়ে উঠেছে, বেঁচে থাক। বোস; বাবা কোচের উপর।"

জীবন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিল।

গৃহিণী জীবনের মাকে বলিলেন—"বলি ছেলে এত বড় হয়েছে—এখনো বিয়ে দিসনি কেন?

জীবনের মা। "ঢের বলেছি দিদি, তা ও কি শোনে? তা এখন মনে হচ্ছে—না শুনেছে ভালই হয়েছে—পরের মেয়েকে এনে কেন কষ্ট দেওয়া। নিজে রোজগার করে তখন নিজে বৌ করবে।"

জীবন দেখিল বড় বেগতিক এইরূপ কথা চলিলেই তাহার হইয়াছে! সে একথা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি বলিল—"মাসীমা চারু কোথা? তাকে ত দেখলুম না।" জীবনের কৌশল সফল হইল।

গৃহিণী বলিলেন—"চারু কোথায় বুঝি বেড়াতে গেছে এই এল বলে।"

জীবনের মা বলিলেন—"জীবন জগৎবাবু চাকরীর কথা কি বল্লেন?

জীবন। "বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে ৫০ টাকা মাইনের একটা মাষ্টারী খালি হয়েছে, জগৎবাবু বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে আমাকে সঙ্গে করে এখনি নিয়ে যাবেন বলেছেন, তাপর দেখা যাক কি হয়।"

গৃহিণী বলিলেন—"জীবনের মা তুই কিচ্ছু ভাবনা করিসনে, উনি বল্লে বিদ্যাসাগর কক্ষণো সে কথা রদ করতে পারবেন না।"

জীবনের মার মুখে আনন্দ ব্যাপ্ত হইল—তিনি বলিলেন—"জগতের ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক—বোন তোরাই আমার যথার্থ আপনার, আপনার লোকে কেউ এমন আপনার হয় না।"

কিছুক্ষণ এইরূপ কথাবার্ত্তার পর জীবন বাহিরে চলিয়া গেল, জগৎ বাবু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে চলিয়া গেলে গৃহিণী জীবনের মাকে বলিলেন "আর কি বলব বোন—দেখে যেন সন্তানস্নেহ উদয় হোল, মনে হোল যেন আমার চিরকেলে আপনার, এ বোন আমার আপনার না হয়ে যায় না; জীবনকেই আমার জামাই করব—"

জীবনের মা বলিলেন "আমার ত তাতে অসাধ নেই। বলে কাঙ্গলা ভাত খাবি—না হাত ধোব কোথায়। কিন্তু ছেলে এখন করবে না; কি সোটাটি মোসাটি করেছে—তাতে পিতীজ্ঞে করে বসেছে ২১ বছর না হলে বিয়ে করবে না।"

গৃহিণী। "বেশ ত তা আরো দুবছর যাক না,—টগর ত এই শত্রু মুখে ছাই দিয়ে সবে নয়ে পা দিয়েছে—এর মধ্যে কিছু আর সময় যায়নি—তা জানা শোনা ঘর রাখতে ত ক্ষেতি নেই।"

জীবনের মার ইহাতে অমতের কারণ ছিল না;—টগর যদিও একটু দুষ্ট,—তা ছেলে মানুষ অমন হয়ে থাকে—বড় হলে আপনিই বুদ্ধি হবে। বিশেষ গৃহিণী তাঁহাদের এত করেন—তাঁর কথা তিনি রাখিবেন না? অমন কুটুম্বই বা আর কোথায় পাইবেন?

তবে এ সম্বন্ধে একেবারে খাঁটি কথা দিতে জীবনের মা সঙ্কুচিত হইলেন, কেন না জীবনের উপর তাহার ভরষা বড় কম, তিনি কথা দিবেন—আর জীবন যদি বাঁকিয়া বসে? সুতরাং তিনি বলিলেন—'তা ভাই ছেলেকে বলব? সে যে খামখেয়ালে, হয়ত বলে বসবে, টাকা কড়ি নেই তোমার ভাত কাপড় যোগাতে পারিনে আবার বিয়ে করব?"

গৃহিণী। সে কি কথা জীবনের মা, অত বিষয় রয়েছে—একবার কেবল কোর্টে যাবার অপিক্ষে?

জীবনের মা। "তা টাকা নইলে ত বোন মকদ্দমা চলে না।"

গৃহিণী। বিয়ে হলে তুই কি ভাবচিস টাকার জন্য মকদ্দামা আটকাবে? আমি

মকদ্দামা চালিয়ে নেব—আমার মেয়ে জামাই কি আমার পর? তাদের সুখ দেখব না।”

জীবনের মার নয়নে নূতন আশার রাজ্য খুলিয়া গেল, বলিলেন “তা দিদি আমার ত খুবই ইচ্ছে এ বিয়ে হোক”

গৃহিণী। তাই হবে। বিয়েও হবে—বিষয়ও হবে—সবই হবে। কুঞ্জ বাবুর মুখ-খানা তখন একবার দেখব। জানিস, কুঞ্জ বাবুর বাড়ীর পাশের যে খালি জায়গা সেইখানে তাদের চোখের উপর তেতালা বাড়ী ফাঁদবি—মিন্সে আর মাগী জ্বালায় দম আটকে মরবে—”

বলিয়া গৃহিণী অঙ্গ দুলাইয়া মাদুরের উপর বেশ ভাল করিয়া বসিলেন, যেন তাঁহার ইচ্ছা সেই মুহূর্ত্তে সফল হইয়া গেল।

জীবনের মা বলিলেন ‘ভগবান দিন দেন সবই হবে। আমার আর কি? বৌ ছেলে সুখে থাকলেই আমার সুখ।”

গৃহিণী। বৌ ছেলে নাতি নাতনী ইশ্বর্য্যি সম্পৎ সব তোর হবে, দুদিন সবুর কর”

এই রূপে ইহাঁরা জীবনের ভবিষ্যৎ সুখসম্পদ কল্পনা করিয়া এখন হইতে লঙ্কা ভাগে প্রবৃত্ত হইলেন আর ওদিকে জীবন বেচারা তাহার সে সুখে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইয়া সামান্য এক চাকরীর জন্য বিব্রত হইয়া বেড়াইতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

যে কর্ম্মের জন্য জগৎ বাবু জীবনকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যাসাগরের কাছে গেলেন, সে কর্ম্ম জীবন পাইবে স্থির হইল। বিদ্যাসাগরের আর্ত্তবৎসলতা ও যোগ্যানুরাগ কে না জানে, জীবনকে দেখিয়া এবং তাহার অবস্থা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার উপকারে প্রতিশ্রুত হইলেন। জীবন কৃতকার্য্য হইয়া বাড়ী প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু ইহাতে তাহার যেরূপ সন্তুষ্ট হওয়া উচিত ছিল তাহা হইল না। বরঞ্চ বিপরীত। অন্ন বস্ত্রের চিন্তায় এ দুই দিন সে যে রূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই উৎকণ্ঠা হইতে মুক্ত হইয়া সে যখন তাহার জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অবসর প্রাপ্ত হইল, তখন একটা দারুণ নৈরাশ্য সে অনুভব করিতে লাগিল। তাহার আশা—কল্পনার কি এই পরিণাম? একটা সামান্য চাকরিতে সে কি তাহার জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা কামনা বিসর্জ্জন দিল? জীবন তাহার অবস্থার শোচনীয়তা, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু অধিকক্ষণ তাহার এ তীব্র নৈরাশ্য মনে স্থান পাইল না, সে দেখিল, তাহার বর্ত্তমান জীবন ক্ষণস্থায়ী, তাহার ভবিষ্যৎ আশা সফল করিবার জন্য মাত্র তাহাকে অল্প দিনের জন্য এই জীবন বহন করিতে হইবে, তাহার পর তাহার বাসনার রাজ্য উন্মুক্ত।

জীবনের নৈরাশ্য পীড়িত হৃদয় বলযুক্ত হইল। আশার আলোকে তাহার হৃদয় ক্রমে ক্রমে আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখন এই কৃতকার্য্যতাতেও ক্রমে সে সন্তুষ্টি অনুভব করিল। আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতে কে কবে যথার্থ সুখী হইয়াছে, আশাই সুখ, যাহারা সর্ব্বদাই আশাপূর্ণ তাহারাই সুখী! বাড়ীতে আসিয়া জীবন আর এক রূপে সুখী হইল, মা এই কর্ম্মের খবরে বড় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি জগৎ বাবুর বাড়ী হইতে সবে মাত্র সেই বাড়ী আসিতেছেন, গৃহিণীর কথাবার্ত্তা তখনো তাঁহার মনে জাগিতেছে, জীবনের ভবিষ্যৎ ধনসম্পদ তখনো সত্যকার মত তাঁহার মনে আন্দোলিত হইতেছে, এই সময় জীবনের নিকট সুসংবাদ পাইয়া তিনি বড়ই আহ্লাদিত হইলেন, তাঁহার মনে হইল, তাহাদিগের অদৃষ্ট সুপ্রসন্নের ইহা পূর্ব্ব সূচনা। তিনি আহ্লাদে আত্ম দমনে অসমর্থ হইয়া বলিলেন "জীবন, বাবা আমার, লক্ষ্মী ছেলে আর 'না' বলিসনে।"

জীবন বলিল—"কিসে?"

মা। "এই বিয়েতে। চারুর মার ভারী সাধ তোকে জামাই করেন। বাবা তাঁরা আমাদের এত উপকার করেন, তাঁর কথা কি ঠেলা যায়।"

এই কথায় জীবনের স্নেহলতাকে সহসা মনে পড়িল, তাহার ফুলের মত মধুর মূর্ত্তি সেই বিস্মিত কোমল দৃষ্টি, সেই চকিত আগমন, চকিত পলায়ন ছবির মত নয়নে জাগিল, তাহার টেনিসনের এই দুইলাইন মনে পড়িল—

"Airy fairy Lilian
Flitting fairy Lilian"

সে মনে মনে বলিল "হ্যাঁ যদি এখন বিবাহ করিতাম ত ইহাকে বিবাহ করিতে আপত্তি ছিল না—" মুখে বলিল "মা তুমি ত জান আমার এখন বিয়ে করার যো নেই। তবে আবার ও কথা কেন?"

মা। তা এখনকার কথা ত হচ্ছে না। দিদি দুবছর এখনো মেয়েকে রাখতে রাজি—যদি কেবল তুই রাজি হ'স।

জী। দুবছর পরে আমাদের অবস্থা কি হবে কে জানে? এখন থেকে ও সব বিষয় কিছু ঠিক করা যায়?"

মা। বাছা তা যদি বলিস, বিয়ে করলে অবস্থাও আমাদের ফিরবে। অমন মুরুব্বি পাবি—মকদ্দামার আর ভাবনা নেই, বিষয় আশয় সব হাতে এসে পড়বে। তোর কি বাছা তাহলে এই সামান্য চাকরী নিয়ে থাকতে হবে?

জীবন। "না না তুমি যেন ঐ সব ভেবে এখন থেকে কথা দিয়ে বস না।"

মা। "আচ্ছা বাবা তারা যে এত ধরে পড়েছে তা কি বলব তুইই বল? তারা যদি না থাকত ত এতদিন কোথায় দাঁড়াতুম ভাব দেখি।"

জী। তাত সত্যি। কিন্তু আমি বিয়ে করব ভেবে ত আর তাঁরা এত করেন নি। বলবে এই, এখন হবার যো নেই।"

মা। তাত বলেছি, কিন্তু তারা রাখতে ত রাজি"

জী। না না রাখার আবশ্যক নেই—বলো আমি কোথায় যাই—কোথায় থাকি—

মা। সে আবার কি কথা?

জী। সে কিছুই না—চাকরী করতে গেলে কি এক জায়গায় থাকা ঘটে?

মা। "এক কথা কত বলব বাছা, বিয়ে হলে চাকরী করতে হবে না, চারুর মা বলেছে মকদ্দামা করবে"

জীবন হাসিয়া বলিল "তা তুমি বলনা কেন, বিয়ের আবশ্যক কি? অমনিই যদি মকদ্দামার খরচটা দেন ত বড়ই উপকার হয়, তার পর আমি সব শোধ করব"

জীবনের মা রাগিয়া গেলেন, বলিলেন "আমি পারব না তুই বলতে পারিস বলিস। তারা মেয়ে দিতে সাধছে আমাদের ভাগ্যি"

জীবন স্নেহলতাকে দেখিয়াছিল এবং তাহাকেই জগৎ বাবুর মেয়ে ভাবিয়াছিল—সুতরাং মায়ের কথাটা মনে মনে অস্বীকার করিতে পারিল না—কিন্তু হাসিয়া বলিল—"কেন মা তোমার ছেলের কি কিছু গুণ নেই—যাতে লোকে মেয়ে দিতে ভাগ্যি ভাবে"

জীবনের মার রাগ পড়িয়া গেল, বলিলেন "তাই বুঝি এত [illegible]র! না বাছা লক্ষ্মী ছেলে বল বিয়ে করবি"

জীবন। না মা আমি এখন কিছু বলতে পারিনে।

মা। তবে কখন বলবি?

জীবন। আরো ত দুবছর যাক।

জীবন ভাবিল আপাততঃ এই বলাই সুবিধা, অনেক অনুরোধ কান্নাকাটির হাত হইতে বাঁচা যায়।

জীবনের মা ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন, জীবন কখনো এরূপ ঠাণ্ডা হইয়া পূর্ব্বে বিবাহের কথা শোনে নাই, সুতরাং তাঁহারও মনে ইহাতে আশা হইল, ভাবিলেন জীবন অর্দ্ধ সম্মত, ক্রমে ক্রমে তাহাকে রাজি করিতে পারিবেন, বেশী কিছু করিতে গেলে সব গোল হইয়া পড়িবে।

এদিকে গৃহিণী ঘন ঘন তত্ত্ব করিতে লাগিলেন, বর কন্যার মাতায় মাতায় বেশ এক রকম বোঝাবোঝি হইয়া গেল, জীবন যাহাই বলুক তাঁহারা জানিয়া রাখিলেন—এই বিবাহই হইবে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। চারু এখন ষোড়শ বর্ষীয় বা[illegible]ন্তু সে আর আপ-

নাকে বালক মনে করে না। যে চারু দুই বৎসর পূর্ব্বে পিতার মার খাইয়া কাঁদিয়াছিল সে চারুকে এ চারু এখন নিতান্তই স্নেহ দৃষ্টিতে দেখে! সে ঘটনা মনে করিতেও এখন তাহার ভারী হাসি পায়—লজ্জাও করে। দুই বৎসরের মধ্যে চারু আপনার নিকট এমনি একটা মান্যগণ্য মস্ত লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। না হইবেই বা কেন, সে এখন এণ্ট্রেন্স ক্লাশে পড়ে—কত বয়োজ্যেষ্ঠ বালক তাহার সমপাঠী, কত উচ্চ ক্লাশের বিদ্যাবুদ্ধিমান ছাত্রের সহিত তাহার আলাপ—ইহার উপর আবার গুপ্তসভার সে একজন মেম্বর। কত ছাত্র এই মান্য পদ লাভের প্রত্যাশী হইয়াও নিরাশ—কিন্তু চারু বিনা প্রয়াসে অযাচিত ভাবে এই সভ্যপদ লাভ করিয়াছে। সূর্য্যকিরণ মেঘে আচ্ছন্ন থাকিবার নহে, চারুর যোগ্যতা চারুকে স্বতঃপ্রকাশ করিয়াছে।

চারুর প্রতিষ্ঠার এই কারণ—

একদিন তাহার এক সমপাঠী তাহার পকেটে পেন্সিল খুঁজিতে গিয়া এক টুকরা কাগজ লাভ করিয়াছিল—কাগজখানি আর কিছু নহে একটি ক্ষুদ্র কবিতা। সমপাঠী ছুটির ঘণ্টার সময় সমস্ত বালকদের সমক্ষে মহা রহস্যে যখন পড়িল—

এমনি চাঁদিনী নিশি
পুলক-কম্পিত দিশি
এমনি বিজন উপবনে,
মুখেতে চাঁদের আলো—
দীপ্ত আঁখি তারা কালো
চেয়েছিল নয়নে নয়নে।

ছেলেদের মধ্যে তখন ভারী হাসি পড়িয়া গেল। একজন বলিল—"কে সে? আর একজন বলিল—যার কাল চোখ?" অন্য জন বলিল—"তাত জানি—কিন্তু কাল চোখ কার? সকলের কৌতূহল দৃষ্টি ও বিদ্রূপ প্রশ্নের মধ্যে চারু মৌন হইয়া রহিল, বাস্তবিক চারু কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এ কবিতা লেখে নাই—সুতরাং সে নিজেই জানিত না ইহার নায়িকা কে। সে ভাবিল কেন সত্যকার মানুষ লক্ষ্য না করিয়া কি কবিতা লেখা যায় না? কবির কল্পনা তবে কি? বিদ্রূপকারী বালকদিগের এই সামান্য কল্পনার অভাব দেখিয়া তাহার নিতান্তই ঘৃণা উপস্থিত হইল। এইরূপ চলিতেছে এমন সময় আর একজন ছাত্র এইখানে আগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ব্যাপার কি?' সকলে বলিল—"আরে মশায় আমাদের চারু বাবু কবি! শুনবেন—এমনি চাঁদিনী নিশি পুলক কম্পিত দিশি"—

আর একজন বলিল—দিশি মশায় বুড় মানুষের মত কাঁপে—হোহো—

সকলে হাত তালি দিয়া হোহো করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। যাহার হাতে কাগজ ছিল তাহার পড়া বন্ধ হইল। নবাগত ব্যক্তি তখন তাহার হাত হইতে কাগজ

খানি টানিয়া লইয়া নিজে পড়িতে আরম্ভ করিল, শেষ করিয়া বলিল—"বাঃ বেশ ত হয়েছে—অতি সুন্দর।" চারুর আহ্লাদে মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিশোরীর মত সমজদার বুদ্ধিমান বিজ্ঞ ব্যক্তির প্রশংসা পাইলে কাহার না আহ্লাদ হয়। এইখানে বলা আবশ্যক—কিশোরী এণ্ট্রেন্স ফেল হইবার পর দুবৎসর আর পড়ে নাই, পিতার অনুরোধে বাধ্য হইয়া আবার সম্প্রতি এণ্ট্রেন্স ক্লাশে ভর্ত্তি হইয়াছে। কিশোরীর কথায় অন্য ছাত্রদিগেরও হঠাৎ যে কবিতা সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল—সকলেই ইহার পর প্রশংসা দৃষ্টিতে চারুর দিকে চাহিল।

সেই হইতে ক্রমে কিশোরী ও চারুর সঙ্গে বড় ভাব। কিশোরীকে কবিতা না শোনাইলে আর চারুর মন ওঠে না। কিশোরীর একটা বিশেষগুণ অনুগত লোকের প্রতি তাহার বিশেষ কৃপা—সুতরাং সেও চারুকে বন্ধু জ্ঞান করে। কিশোরীই তাহাকে তাহাদের গুপ্ত সভার মেম্বর করিয়াছে—সেখানকার সে Poet Loriate.

আজ রবিবার। জগৎ বাবুর চন্দননগরের বাগানে উক্ত সভার অধিবেশন। বেলা দুইটা হইতে বাগানবাটির একতল গৃহের এক রুদ্ধ দ্বারের বর্হিদেশে দুইজন ছাত্র দণ্ডায়মান। আশে পাশে গাছ পালা—এবং মাথায় গাড়ী বারান্দার আচ্ছাদন সত্ত্বেও প্রথম আশ্বিনের প্রখর রৌদ্রের ঝাঁজে তাহারা পুড়িয়া উঠিতেছে—তবুও তাহাদের পদ নিশ্চল। কিন্তু পা ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছে বলিয়া তাহারা মন ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। মনের অধীরতায় তাহাদের দৃষ্টি ক্রমাগত একদিক হইতে অপর দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছে আর বিরক্তিসূচক বাক্য গুলা অভিধান ঝাড়া করিয়া তুলিয়াও তাহাদের আশ মিটিতেছে না।

এইরূপে যখন তিনটা বাজিয়া গেল—তখন গেটের মধ্যে দুইজন লোক প্রবেশ করিল, ক্রমে তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাদের জন্যই উল্লিখিত ছাত্র দুইজন এতক্ষণ বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। নবাগতদিগের সহিত দুই একটা কথা কহিবার পরেই উহারা তাহাদের চোখ বাঁধিয়া দ্বারে আঘাত করিল। দ্বার মুক্ত হইলে তাহাদিগের হাত ধরিয়া ছাত্র দুইজন যেমন ভিতরে প্রবেশ করিল—অমনি পুনর্ব্বার দ্বার বন্ধ হইল—আর সকলে সমস্বরে গাহিয়া উঠিল—

আজি হতে একসূত্রে গাঁথিনু জীবন
জীবনে মরণে রব শপথ বন্ধন।

বহুকণ্ঠের সমস্বর গীতে রুদ্ধ গৃহ সহসা ঝটিকাতরঙ্গিত হইয়া উঠিল—অন্ধ নবাগত দুইজনের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, কি না জানি ভয়ঙ্কর গোপনীয় ব্যাপার গৃহ মধ্যে চলিতেছে, কি না জানি অনিবার্য্য বিপদের মধ্যে তাহারা জীবন লইয়া আসিয়াছে? যদিও উহারা বিপরীত বাণীতেই আশ্বস্ত হইয়া এ সভায় যোগদান করিতে আসিয়াছে, কিন্তু

গান থামিবামাত্র সভাপতি নিকটবর্ত্তী হইয়া পদ্মবিদ্ধ দুইখানি খড়্গ তাহাদের দুই জনের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন—

এই পদ্ম ভারতের চিহ্ন স্বরূপ,—এই খড়্গ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার চিহ্ন স্বরূপ। ইহা ধারণ করিয়া শপথ কর—— ”

এইবার একসঙ্গে সুগম্ভীর স্বর উঠিল

ইহা ধারণ করিয়া শপথ কর——”

সভাপতি।—আজ হইতে তুমি ভারতের মঙ্গল কার্য্যে প্রাণপণ করিবে—আজ হইতে আমাদের সহিত ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হইলে?”

আবার সকলে। ইহা ধারণ করিয়া শপথ কর—”

সভাপতি। কোন কারণে সভা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত কিম্বা সভা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও ইহার কার্য্য কলাপ প্রকাশ করিবে না—আজিকার বিশ্বাস ভঙ্গ করিবে না—”

সকলে।—জীবনে মরণে এই বিশ্বাস পালন করিবে?”

নবাগতগণ কি শুনিতেছিল কি বলিতেছিল যেন বুঝিল না কেবল কম্পিত কণ্ঠে তাহা আবৃত্তি করিয়া গেল মাত্র। তখন তাহাদের চক্ষুর বন্ধন উন্মোচিত হইল; এবং একে একে প্রত্যেক সভ্যগণ তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া আর একবার সমস্বরে সকলে গান ধরিল—

এক সূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন
জীবন মরণে রব শপথ বন্ধন
ভারত মাতার তরে সঁপিনু এ প্রাণ
সাক্ষী পুণ্য তরবারি সাক্ষী ভগবান
প্রাণ খুলে আনন্দেতে গাও জয় গান
সহায় আছেন ধর্ম্ম কারে আর ভয়।

ইহা চারুর রচনা—যখন সকলে এক সঙ্গে ইহা গাহিয়া উঠিল, চারুর আপনাকে সেক্‌স্‌পিয়ারের সমকক্ষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ।

কেন ফুল ফোটে বনে।

জানিনে কার তরে ফুল
ফোটে বনে!
শুধু ফুল কুড়িয়ে বেড়াই
আপন মনে।
বুঝি নে ফুলের কথা,
কি যে তার প্রাণের ব্যথা,
নিশিদিন মালা গাঁথা
আমার মনে;
জানিনে কার তরে ফুল
ফোটে বনে!

জানিনে কোন্ সুখে, কোন্
চাঁদের করে,
হেসে ফুল ফুলের জীবন
সফল করে।
নিয়ে যায় দুখের রাশি,
দিয়ে যায় সুখের হাসি,
ঢেলে যায় প্রাণের আশা
সমীরণে;
জানিনে কোন্ সাধে ফুল
ফোটে বনে!

বুঝিনে কোন্ বিরহীর
প্রাণের আশা—
ফোটে ফুল আপনি লয়ে
প্রেমের ভাষা!
নিরালয় বনে থেকে
মধু দেয় ভ্রমর ডেকে,
সেধে যায় প্রেমের ব্রত
সংগোপনে;
জানিনে কার প্রেমে ফুল
ফোটে বনে!

কে আমার গহন বনে
বাজায় বাঁশী,
শুনে ফুল আপনি ফোটে
রাশি রাশি।
যেন তার মুখের কথা
শুনেছি কবে কোথা,
দেখেছি কবে তারে
কোন্ স্বপনে;
জানিনে কার তরে ফুল
ফোটে বনে!

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কৃতজ্ঞতা।

১

সহায়-ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন অনেক সময় এরূপ দুরূহ ব্যাপার যে, লোকে সহজে সাহায্য লাভ স্বীকার করিতে চাহে না। ভ্রান্ত-সংস্কার বশতঃ সাহায্য-দাতাকে

সম্মান করা অনেকে খোসামোদ বলিয়া বুঝে। আশ্রয় পাইবার অল্প দিন পরে সে কথা ভুলিয়া যায়। মনে হয়, সংসারে সকলই স্বঘটিত। প্রথমে যেখানে আশ্রয়ের মহত্ত্ব বৈ আর কিছুই উপলব্ধি হইত না, অন্ধ অহঙ্কারের কল্যাণে ক্রমে সেখানে গূঢ় স্বার্থ-সাধনাভিলাষ বিকশিত হইয়া উঠে। দুর্দ্দম্য দুরাশায় শোষণস্পৃহা যতই বলবতী হইতে থাকে, ততই আত্মাভিমান স্ফীত হইয়া উঠিয়া সহায়ের খুঁৎ বাহির করিতে আরম্ভ করে। স্বীয় উদার মহত্ত্বের গুণে সহায় সেদিকে দৃকপাতও করে না; কিন্তু আশ্রিত শফরী সহায়কে অসাধারণ স্ফীতি দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে যত্নের ক্রটী দেখায় না। সুবিধামত সহায়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া আপনার ক্ষমতা অনুভব করে।

লোকে যতক্ষণ কাহারও নিকট সাহায্য না পায়, ততক্ষণ তাহাকে স্বর্গে রাখিয়া দেখে। কিন্তু আশ্রয় পাইলে তাহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আশ্রয় দাতার পতনে নিজের যদি কোনও অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে অনেকেই বিশেষ আনন্দ লাভ করে। এই জন্য ভূতপূর্ব্ব সহায়কে পদদলিত দেখিতে কত তৃপ্তি! আশ্রয় দিয়া সে ব্যক্তি যেন চোর-দায়ে ধরা পড়িয়াছে। সংসারের নিয়মানুসারে অতিথি সর্ব্বসুখ উপভোগ করিয়াও সামান্য ক্রটী কল্পনায় অভিশাপ দিবার অধিকারী। আর যে ব্যক্তি অতিথির আশ্রয়, অভিশাপ না জুটিলেই সে ব্যক্তি কৃতার্থ। এমনি ধারাই বটে! তাই অনেক দুঃখেই থ্যাকারে বলিয়াছেন যে, যত নবাবীর মূলে ঋণ।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, কৃতজ্ঞতা বড়ই কঠিন ধর্ম্ম। বাস্তবিক, সংসারে আশ্রিত অতিথিরই অত্যাচার অধিক। আশ্রয় সহিষ্ণু। উদাহরণের জন্য দূরে যাইতে হইবে না। সর্ব্বাপেক্ষা নিকট জননী সন্তানের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট। উদাহরণ আরও অনেক মিলে, কিন্তু তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। আবশ্যক হয়, পাঠকেরা নিজেই খুঁজিয়া লইবেন।

২

কৃতজ্ঞতা ত আর কিছু নয়—হৃদয়ে আশ্রয়ের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া তাহার নিকট আপনাকে বলিদান। মহত্ত্ব অনুভব করিতে আত্মাভিমান যদি স্ফীত হইয়া উঠে, কৃতজ্ঞতা আসিতে পায় না। আশ্রয়কে দায়গ্রস্ত বলিয়া বোধ হয়। মোহদৃপ্ত যেমন মোহাতীত মঙ্গলে অবিশ্বাস করিয়া আপনাকে ধন্য বিবেচনা করে, অতিবুদ্ধি-দৃপ্ত আত্মগণ্ডি বদ্ধ সেইরূপ আপনার চতুঃসীমার বাহিরে সন্দেহ-মিটিমিটি কুটিল কটাক্ষে চাহিয়া আত্ম গৌরবে পুলকিত ও মুগ্ধ হইয়া থাকে। আশ্রয় দানের মধ্যে সে গভীর রহস্য পূর্ণ জটিল উদ্দেশ্য দেখিতে পায়, সুতরাং তাহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা ঠাঁই পায় না। সরল চিত্তই কৃতজ্ঞতার প্রিয় আবাস।

কিন্তু সরল চিত্ত কাহাকে বলে? কথা-উদ্গীরণ ক্ষমতাই কি সরল চিত্তের লক্ষণ? তাহা যদি হয়, তবে বাঙ্গলা দেশের দলাদলি-দক্ষ আলুগা প্রকৃতিগুলিই সরল

প্রতিমা। বাট্‌না বাঁটিতে, কুট্‌না কুটিতে যাহারা অম্লান-বদনে প্রতিবেশীর কুষ্মাণ্ডের খুঁৎ এবং অলাবুর ছিদ্রের উল্লেখ করিয়া তৃপ্ত হয়, তাহারাই তাহা হইলে সরলচিত্তের আদর্শ। কিন্তু তাহা ত আর নয়। সরল চিত্ত সোজা কথার বাঁকা টীকা এবং অনর্থ অর্থ করে না। কৌটিল্য সারাদিন সরল রেখার অভাব লইয়া হাহাকার করিয়া মরে, সারল্য সংসারে সরলরেখা দেখিতে পায়। যাহা হোক্, সরলতা সম্বন্ধে এখানে অধিক কথা বলা শোভা পায় না, কথায় কথায় আভাস যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট।

কৃতজ্ঞতা সরল হৃদয়ের স্বভাব। সরল-হৃদয় সাধু অতিথি আশ্রয়ের ছোটখাট ক্রটী লইয়া দিন কাটায় না। আশ্রয়ের ভাবের মহত্ত্বেই তাহার তৃপ্তি। সংসারে দোষ নাই কাহার? মানুষ কিছু আর পূর্ণপুরুষ নহে। ইহা জানিয়া সরল হৃদয় কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ক্ষমা-শীল। কৃতজ্ঞতা ক্ষমাশীলতার সহচর।

৩

সভ্যতার আইনের গুণে চিঠিপত্রে এবং বাক্যালাপে ছুইকেলা রাশিকৃত কৃতজ্ঞতা ভগ্ন অট্টালিকার জীর্ণ ইষ্টক-স্তূপের মত বিতরিত হয়। কিন্তু আইন-ঐন্দ্রজালিকের এ কৃতজ্ঞতা মুহূর্ত্তের শোভা মাত্র। ইহাতে হৃদয়ের অদম্য আবেগ, অন্তরের সুগভীর উচ্ছ্বাস আদবেই প্রকাশ পায় না। প্রকৃত কৃতজ্ঞতার নীরবতাই ভাষা। সংস্কৃত অভিধান খুলিয়া সে দুরূহ সমাস-দীর্ঘ কতকগুলা জড় পাষাণ কথা সংগ্রহ করিয়া রাখে না। সহজ ভাষা, সরল ভাব লইয়াই তাহার কারবার। প্রাণ দিয়া সে যাহা করিয়া যায়, প্রাণান্তেও মুখে তাহা বলে না। কিন্তু না বলিলেও বুঝিতে কতক্ষণ? মেঘ করিয়া থাকিলেও উষার বিকাশ অনুভব করিতে বিলম্ব হয় না।

কৃতজ্ঞতার আইন আদালত নাই। আইন আদালত দুষ্ট অধার্ম্মিকের দণ্ডের জন্য। কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মপ্রাণ সুতরাং তাহার আদালতের আবশ্যকতা কম। উপকার স্বীকার করিতে সে কোনও কালে কুণ্ঠিত নহে। প্রত্যুপকার করিতে পারিলে ত বাঁচিয়া যায়। এই জন্য প্রেমের মত কৃতজ্ঞ কেহই নয়। প্রেম নীরবে কাজ করিয়া যায়, কিছু প্রত্যাশা করে না। প্রেমহীন কৃতজ্ঞতা মায়া মরীচিকা মাত্র। যথার্থ কৃতজ্ঞতার প্রেমেই প্রতিষ্ঠা।

সংসারে কৃতজ্ঞ ব্যক্তির অবশ্য অভাব নাই, কিন্তু কৃতজ্ঞতা অনেক সময় দায়ে পড়িয়া আসে। সুবিধা পাইলেই সে বন্ধন ছিন্ন করিতে চায়। পাঠকেরা ভুল বুঝিতে পারেন যে, সংসারের উপর বিরাগবশতঃ আমরা সংসারে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা দেখিতে পাই না, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। প্রকৃত কৃতজ্ঞতা এই সংসারেই আছে। তবে কৃতজ্ঞতা যে বড় কঠিন ধর্ম্ম ইহা দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ সংসারে যেরূপ দেখা যায়, হইতেই আমাদের সিদ্ধান্ত।

বড়মানুষী।

১

বড়মানুষী সম্বন্ধে সাধারণে নানা প্রকার কল্পনা দেখা যায়। আমাদের দেশে বড়মানুষীর সহিত আলস্যাধার তাকিয়া-কুল এবং অবসর-লালায়িত মোসাহেববর্গবেষ্টিত শূন্য-গর্ভ বিপুল উদর-পুঙ্গবের ভাব অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। বড়মানুষীর তাম্রকূট-ধূমোদ্গীরিত পর-সমালোচনাচ্ছন্ন পাষাণ-সিংহাসনে নির্ম্মম শকুনি-ব্রতের প্রতিষ্ঠা না করিয়া অনেকে তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কোনও ভাব মনে আনিতে অক্ষম। বড়মানুষীর দুয়ারে নাগরা ব্যবহার-দক্ষ চাপরাস-স্ফীত গালপাট্টাদীপ্তমুখশ্রী দোবে চোবে এবং পাঁড়ে বংশের ডাল-রুটী-ধ্বংসক্ষম চিরপ্রদীপ্ত জঠরানল প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত বলিয়া খ্যাত। শাসন-দণ্ড-হস্তে সে যেন কেবল সংসারে দাঁত খিচাইতেই আসিয়াছে। কিন্তু সাধারণের যাহাই বিশ্বাস হউক্ না কেন, তাহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হানি নাই।

প্রাচ্য বড়মানুষী সম্বন্ধে সাধারণের কল্পনা বিশেষ ভ্রমাত্মক বলা যায় না। নিরীহ পথিক পৃষ্ঠে গাড়োয়ানের পার্শ্বদেশ হইতে বিস্তৃত চাবুক-আস্ফালনই অনেক সময় ধন-দৃপ্ত আত্ম-প্রকাশ-ব্যস্ত বড়মানুষীর পরিচয়। দানে ধন ব্যয় করিবার ক্ষমতা সকলের নাই, অথচ বড়মানুষী প্রদর্শন করিতে হইবে; সুতরাং কিংখাপের একটা জামা গায়ে দিয়া সারাক্ষণ পৃথিবীর দিকে কুঞ্চিত-কটাক্ষে চাহিয়া না থাকিলে চলে না। আপনাকে দিনরাত সাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে হইবে, সাধারণের জন্য পাদুকার তলদেশে একটা দাঁড়াইবার স্থান চাই মাত্র। তাহা নয়ত বড়মানুষী প্রমাণ হয় কি রূপে?

বড়মানুষীর সুখ আছে কিনা জানি না, কিন্তু সোয়াস্তি নাই। বিনয় তাহার স্বভাব নহে, অথচ তাহাকে কথাবার্ত্তায় বিনয় প্রকাশ করিতে হইবে। এই জন্য ব্যস্ততায় সে ধরা পড়ে। দীর্ঘ আড়ম্বরের কল্যাণে তাহাকে অনেক কথা কণ্ঠস্থ করিতে হয়। বিনয়ীর এক কথার স্থলে বিনয়-প্রদর্শনেচ্ছু বড়মানুষীর দশ কথা চাই। কথায় কথায় তাহার রজত কাঞ্চনের আভা ব্যক্ত করিতে হইবে, এই জন্য সে বিনয়ের একটা কাচ-গৃহ নির্ম্মাণ করে, যাহাতে স্বর্ণ রজত প্রদর্শনের কোনও অসুবিধা না হয়, অথচ আন্তরিক প্রদর্শন-চেষ্টা না প্রকাশ পায়। স্বর্ণ-সম্পর্ক-শূন্য বড়মানুষী গিল্টিবিদ্যায় কাজ হাসিল করিয়া লয়। সংক্ষেপে বড়মানুষীর মূলমন্ত্র প্রদর্শনী।

২

অনেকে মনে করেন, বড়মানুষীর মূল কারণ অর্থ। অনেক সময় বটে, কিন্তু সকল সময় বড়মানুষী অর্থ-প্রসূত নহে। বড়মানুষী একটা স্বভাব। অনেক অর্থহীন ব্যক্তি

বড়মানুষী করিয়া মারা গিয়াছে। অর্থবান্ ব্যক্তিরও বড়মানুষীর অভাব দেখা যায়। আমার বোধ হয়, অর্থের উপরে যাহাদের প্রভুত্ব আছে তাহাদের মধ্যে বড়মানুষী নাই। অর্থ-সর্ব্বস্ব অর্থের দাসেরাই বড়মানুষীপ্রিয়। বড়মানুষী প্রবৃত্তি বিশেষ। তাহাকে অর্থ মূলক বলা ন্যায় সঙ্গত নহে, ধর্ম্মমূলক বলাও চলে না, প্রবৃত্তি অথবা স্বভাবমূলক বলাই বোধ করি ঠিক। অর্থের দাসেরাও অনেক সময় বড়মানুষী প্রিয় নয়। কৃপণ তাহা হইলে থাকে কোথায়?

বড়মানুষীর জীবন উপভোগ করা হয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রটী-ভীত প্রদর্শনী অনুষ্ঠান আচ্ছন্ন হইয়া সে হাবুডুবু খাইতে থাকে। কিন্তু স্ফীতি-আতিশয্যে নিজে তাহা বুঝিতে পারে না। আপনার বড়ত্ব সম্বন্ধে সে নিঃসংশয় কি না, তাই মনে করিতে পারে না, যে, তাহাকে গ্রাস করিতে পারে সংসারে এরূপ কিছু আছে। বিস্ফোটকের মত তাহার গায়ে মোসাহেবকুল আঁটিয়া বসিয়া থাকে, তাই তাহার যত স্ফীতি-সুখ। কিন্তু স্ফোটক-স্ফীতি দেখিয়া রুগ্ন ব্যক্তিকে সুস্থ ঠাহরাইবে কে?

বড়মানুষীর জীবন উপভোগ করিবার সুবিধা নাই শুনিলে আশ্চর্য্য ঠেকে বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য ঠেকিবার কিছু নাই। জাঁকজমকই উপভোগের প্রধান ব্যাঘাত। সারাক্ষণ যদি আপনার ধনাগার খুলিয়া বসিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে ধন উপভোগ করিবার সময় কোথায়? জীবন উপভোগ করিতে হইলে আপনাকে একটু টানিয়া রাখিতে হইবে—নিশিদিন অট্টহাস্যের মধ্যে কি শান্তি অনুভব করা যায়? আপনার প্রতি চাহিবার অবসর চাই। আপনার প্রাণের মধ্যে বসিয়া আপনার হৃদয়ে আপনাকে আলিঙ্গন করা চাই। কিন্তু সে অবসর ত আর হট্টগোলে মিলে না। এই জন্যই বড়মানুষীর মধ্যে জীবন উপভোগের ব্যাঘাত অনেক।

৩

বড়মানুষ আর বড়লোকে প্রভেদ বিস্তর। বড়লোকের ধন যথেষ্ট থাকিলেও অভিমান কম। সে সারাদিন ধন দেখাইবার জন্য, ক্ষমতা জাহির করিবার জন্য ব্যস্ত নয়। তাহার মধ্যে একটী উচ্চ ভাব আছে, সেই ভাবেই তাহার বড়লোকত্ব। আপনার কপালে ছাপ দিয়া, কপোলে ব্যাখ্যা লিখিয়া তাহার আপনাকে প্রকাশ করিতে হয় না। বড়মানুষী আপনার মূর্খতা লইয়া পণ্ডিতবর্গের সম্মুখে অকাতরে আস্ফালন করিয়া তৃপ্ত হয়। বড়লোকত্ব ধীর, গম্ভীর, আস্ফালন-শূন্য। পণ্ডিতেরা বড়মানুষীর আস্ফালন দেখিয়া লাঙ্গুল কল্পনা করেন, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড রচনা করেন। বড়লোক অপেক্ষাকৃত হীন বিদ্য হইলেও তাঁহারা সম্মান করেন। কারণ, তাহার আস্ফালন-অভাব।

বড়মানুষীর আস্ফালন অতি ভয়ানক। বিরক্তিকর এবং হাস্যকর। সে আস্ফালনে প্রতিবেশীবর্গের অর্দ্ধেক রাত্রি নিদ্রা হয় না। আপনার অশান্তিতে বড়মানুষী পাড়ার শান্তি পর্য্যন্ত বিনাশ করে। এক প্রকার অচেতন অজ্ঞান মত্ততায় অবরুদ্ধ

হইয়া সে কেবল অশান্তি-যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকে মাত্র। কিন্তু কতক্ষণ? মত্ততা-সুখে মানুষ কি সর্ব্বক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে পারে? তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে, আপনার উপরে পর্য্যন্ত বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। তখন সে বিতৃষ্ণা ঢাকিবার জন্য, সে হৃদয়ভেদী যাতনা লুকাইবার জন্য বড়মানুষী আরও মত্ততাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। বাহিরের লোকে বড়মানুষীর নিরুদ্বিগ্ন সুখ কল্পনা করিয়া অবাক্ হইয়া দেখে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, বড়মানুষীর সোয়াস্তি নাই, তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই। ধূমধাম কেবল একটা আবরণ মাত্র।

রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় বড়মানুষীগ্রস্ত ব্যক্তির হৃদয় স্ফূর্ত্তি পায় না, প্রাণের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ হয় না, নিশিদিন আপনার ঘন অন্ধকারে আবৃত হইয়া তাহার অবসান হয়। সাময়িক অর্থ-স্বচ্ছলতার উপর মোসাহেব-ছারপোকা-কুলের রক্তাভাবজনিত হাহাকার শুনা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ত আর সান্ত্বনা হয় না। বরঞ্চ কষ্ট বৃদ্ধি হয়। তাই বড়মানুষীতে তৃপ্তি কোথায়, আনন্দ কোথায়? কেবলই মুহূর্ত্তের ভোঁভাঁ।

উপভোগ।

১

সংসারে সকলেই সব দেখে, কিন্তু উপভোগ করে কয় জন? ইন্দ্রিয় বিশেষের সাহায্যে ফুলের গন্ধ সকলেই পায়, কিন্তু সে সৌরভে আকুল হয় অল্প লোকে। উপভোগ করিবার ক্ষমতা স্বতন্ত্র—তাহা দর্শন স্পর্শনের অতীত। আমরা যে বস্তু যতটা উপভোগ করি, ততটা তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া লই। বহির্জগতে রাখিয়া তেমন উপভোগ করা যায় না, বিস্তৃত অন্তর্জগতে আনিয়া এই জন্য ভোগ্য বস্তুকে আমরা প্রাণাবৃত করিয়া ফেলি। বাস্তবিক, দেহকে কি কেহ উপভোগ করিতে পারে? আভ্যন্তরীণ প্রাণ পরিব্যাপ্ত হইয়াই দেহ যাহা উপভোগ্য। মৃত দেহ ত কেবল স্মৃতির বিলাপ-মন্দির।

এই জন্য যাহারা দেহ উপভোগ করিতে চায়, তাহারা বঞ্চিত হয়। পাঁচজনকে দেখাইবার জন্য যাহার উদ্যান রচনা তাহার উপভোগ করিবার অবসর অল্প। যে ব্যক্তির উদ্যান তাহার সৌন্দর্য্য-প্রেমের স্ফূর্ত্তি, সেই যথার্থ তাহা উপভোগ করে। উপভোগের মূলে হৃদয়ের সুগভীর প্রেম প্রকাশ পায়। মৃত্যুর পরেও আমরা প্রিয়জন-সঙ্গ-সুখ উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হই কেন? যাহারা জড়দেহ উপভোগ করে, চিতাভস্মের সহিতই তাহাদের সকল অবসান হয়। কিন্তু প্রাণোপভোগীর উপভোগের বিনাশ নাই—কারণ, প্রাণ অবিনশ্বর।

দেহ অনুপভোগ্য। স্বর্ণের ফুল, রজত পত্র প্রাণহীন; তাহা উপভোগ করে কে? উপভোগবৃত্তিবিহীন বড়মানুষীর বাগানেই তাহা শোভা পায়। প্রকৃতির প্রাণময়

আনন্দময় স্ফূর্ত্তি অভাবে তাহারা শুষ্ক। গোলাপ বেল চম্পকের মত তাহাদের ভাষা নাই। পরশ্রীকাতরতার মত তাহারা যেন আপনার মধ্যে মরিয়া আছে। তাহাদের দেখিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায় না, দুঃখ হয় মাত্র। স্বর্ণ কুসুমের মধ্যে যদি প্রকৃতির প্রাণ বিকশিয়া উঠিত, তাহা হইলে কি আর তাহা অনুপভোগ্য জড় হইয়া থাকে?

২

জড়তাই উপভোগের প্রধান ব্যাঘাত। জড়ের সহিত কেহ ত আর কথা কহিতে পারে না। সুতরাং হৃদয়ে হৃদয়ে আদান প্রদান বন্ধ হয়। এই জন্য প্রকৃতির যেখানে যত প্রাণের বিকাশ সেখানেই উপভোগের আনন্দ। মরুভূমি অপেক্ষা বৃক্ষসমাচ্ছন্ন বনভূমি তৃপ্তিকর, শ্যামল প্রান্তর অপেক্ষা কল্লোল ধ্বনিত নদীকূল শান্তিপ্রদ। জড়-সংঘর্ষণে হৃদয় জড়ীভূত হইয়া যায়। প্রাণ প্রাণকে আকর্ষণ করে, জাগাইয়া তুলে। প্রাণে প্রাণ উথলিয়া উঠে। প্রাণানন্দ জড় হৃদয় উপভোগ করিতে অক্ষম।

ভাষা যেথানে যেমন সু-অভিব্যক্ত সেখানেই সেইরূপ আনন্দোপভোগ। শব্দময়ী কথার কথা বলিতেছি না, ভাবময়ী ভাষার কথা হইতেছে। প্রেম ভাবের অভিব্যক্তি-তেই ভাষার সৌন্দর্য্য। ভাষাই উপভোগের প্রধান উপায়। উপভোগ্য—ভাব। কবিরা ফুলের ভাষা শুনিতে পান, প্রকৃতির ভাষা বুঝিতে পারেন, এই জন্য তাঁহারাই প্রকৃতিকে যথার্থ উপভোগ করেন। তুমি প্রকৃতি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া থাক, ভাষা-বিদ্ কবি প্রকৃতির কাহিনী শুনিয়া তাহার আনন্দটুকু আপনার মধ্যে অনুভব করেন। তাঁহার দীপ্ত মুখশ্রীতে আমাদের নিকট তাহা প্রকাশিত হয়। ছাপার অক্ষরের মধ্য হইতে এই দীপ্ত শ্রী উঁকি মারে বলিয়াই কবিতার আনন্দ।

যাহারা সাজসজ্জা লইয়া ব্যস্ত, তাহারা আমাদিগকে বোধ হয় ভাল রূপ বুঝিতে পারিবে না। তাহারা ভাব চাহে না, আনন্দ চাহে না, চাহে আর বুঝে কেবল হাঁক-ডাক। গৃহসজ্জার আরামোপযোগী পারিপাট্য অপেক্ষা আধিক্য এবং অধিক মূল্যতার প্রতিই তাহাদের অনুরাগ, কবিতার সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাহারা দুর্বোধ্য সংস্কৃত অভিধান-মথিত শব্দাবলী লইয়া সন্তুষ্ট, সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য ভাব-প্রকাশ ছাড়িয়া উপায় সা-রে-গা-মায় তন্ময়। অন্তর্জগতে গতিবিধি অভাবে উপভোগের অতীন্দ্রিয়তা তাহাদের নিকট অজ্ঞাত।

৩

দুঃখ আমাদের উপভোগ-ক্ষমতার নিকষ-পাষাণ। দুঃখে অল্প বিস্তর কাতর হয় সকলেই। সুতরাং তাহাতে বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। কিন্তু দুঃখকে উপভোগ করিয়া যে ব্যক্তি আনন্দ অনুভব করে, তাহার উপভোগ ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখের মর্ম্মস্থল বাহিয়া আশা নিরাশা-ময় অভাব-ভাব-ময় কি যেন একটা সূক্ষ্ম ভাবের নদী বহিয়া গিয়াছে, সেই সূক্ষ্ম মিলায়-মিলায় ভাবে দুঃখের উপভোগানন্দ।

স্থূল-বস্তুগত-প্রাণ এ ভাব ধরিতে না পারিয়া সুখের স্বর্ণ-সিংহাসন উপভোগ করিবার কল্পনায় ফিরে।

সুখ কি উপভোগ করা যায় না? যায়, কিন্তু অনেকেই তাহা উপভোগ করিতে পারে না। সুখের সেবা করা যত সহজ, সুখ-উপভোগ তত সহজ নয়। সুখ উপভোগ করিতে হইলে দুঃখের প্রাণ চাই। উচ্চকণ্ঠ-হাস্যের উপরেই যদি সুখ নির্ভর করিত, তাহা হইলে কথা ছিল বটে। কিন্তু তাহা ত আর নয়। দুঃখের মধ্যেই সুখের অজ্ঞাতবাস।

প্রাণের মধ্যে আনন্দ অনুভবই উপভোগ। উচ্ছৃঙ্খল সুখকে অনেক সময় আনন্দ বলিয়া ভ্রম হয়। এই জন্য আমরা অনেকবার যথার্থ উপভোগ হইতে বঞ্চিত হই। উপভোগানন্দে এমন একটী সংযম-ভাব আছে, যাহা সুখে নাই, মোহে নাই, যাহা টানিয়া বুনিয়া আনা যায় না। এই সংযম-ভাবেই উপভোগের মাধুরী। উচ্ছৃঙ্খলতায় একটা কাল্পনিক ক্ষণিক সুখ থাকিতে পারে, কিন্তু সংযম-ভাবের গভীর আনন্দ সেখানে কোথায়? উপভোগ সংযম-পূর্ণ। এই জন্যই আনন্দ উপভোগে।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফুলজানি।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

খবরাখবর নহিলে সংসার চলে না। দেশে যখন রেলের গাড়ী, তারের দূত ছিল না, তখনও খবর ছিল। সহরের খবর বড় রাখি না, কিন্তু পল্লীগ্রামের সেই সনাতন খবর বাহিকারা আজিও বিরাজ করিতেছেন। কর্ত্তা গৃহিণী যখন কথায় বার্ত্তায় নিযুক্ত, তখন হরিশপুরের প্রধান খবরবাহিকা যিনি, তিনি ঘোষ মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত ছিলেন। নয়নের মাসী চারি আনা পয়সা ধার করিতে ঘোষপত্নীর কাছে আসিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার দেখা না পাওয়াতে যথায় কন্যা মোক্ষদা মাছ কুটিতে নিযুক্ত, হাসিমুখে গুড়ি গুড়ি তথায় গিয়া বসিলেন।

নয়নের মাসীর অবশ্য বয়স হইয়াছে, নহিলে গুড়িগুড়ি হাঁটিবে কেন? কিন্তু স্বয়ং সে তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। যাহারা তাহাকে বলিত, শোকাতাপা মানুষ বলে কম বয়সে নয়নের মাসীর কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাদের কথাই ঠিক্ এইরূপ তাহার বিশ্বাস। কিন্তু সে যেমনই হউক, মান্ধাতার আমলের খবর তাহার ওষ্ঠাগ্রে,

আর অধিকাংশ গল্পের সঙ্গে আপনাকে অধিনায়িকা ভাবে জড়িত করিতে নয়নের মাসীর বড় ভাল লাগিত। এই অসঙ্গতি সত্বেও জগদ্ধাত্রী নয়নের মাসীকে প্রায় সমবয়স্কা জানিয়া পেটের কথা খুলিয়া বলিতেন।

মোক্ষদা একটু তেজে মেয়ে, ঠকামি এবং মিছায় তেমন রাজি নহে, কাজেই নয়নের মাসী হাসির উত্তরে হাসি মাখা অভ্যর্থনায় বঞ্চিত হইল। তা হউক, বৃদ্ধা বসিবার উদ্যোগ করিলে মোক্ষদা একটু ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল "বস।" নয়নের মাসী বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াবধি কলহের একটা ঘ্রাণ পাইতেছিল—ঘ্রাণ শক্তির প্রখরতা জীব বিশেষেরই একচেটিয়া নহে—কাজেই কোন ওছিলায় নিগূঢ় তত্ত্বটুকু জানিতে ব্যস্ত হইল। কিন্তু মোক্ষদা মেয়ে বড় শক্ত, সহজে তার কাছে কথা পাওয়া যায় না—সেটা নয়নের মাসীর জানা ছিল। বুড়ী ভাবিয়া চিন্তিয়া সুধাইল—"মাছ এল কোত্থেকে গো?"

মো। "অত জানিনে বাপু! কুট্‌চি এই জানি।"

বুড়ী। "আমি ভেবেছিলাম বুঝি নতুন কুটুম বাড়ীর মাছ। তা হাঁ মা তোমার মাছই নাকি তোমার বাপের—"

নয়নের মাসী আর বলিতে পাইল না। মোক্ষদা ঘৃণা প্রকাশ করিয়া তাহাকে বাধা দিল।—"ও সব কথায় আমি থাকিনে! যত অনাছিষ্টির খবর কি তোমার কাছে বাছা!" কাজেই বুড়ী অপ্রতিভ্ হইয়া নতমুখে নখে মাটী খুঁড়িতে লাগিল।

এমন সময়ে দুঃখীরামের ডাক পড়িল। নায়েবি গলাবাজির সপ্তমে সে ডাক, বাড়ীর প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিল। "এজ্ঞে" বলিয়া দুঃখী নিজের তরফে যে জবাব দিল, তাহার মাত্রাও ন্যূন নহে। নয়নের মাসী অপ্রতিভ্ হইয়া গিয়াছিল, এই গর্জ্জনের পর গর্জ্জনে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টার ন্যায় তাহারও যেন চমক ভাঙ্গিল।

চুপ করিয়া থাকা নয়নের মাসীর কর্ম্ম নহে। তাহার বয়সের সে ধর্ম্মও নহে। সে যেন আপন মনে বলিতে লাগিল—"আহা দেখ্‌লে চোক জুড়োয়! এই সে দিন মোক্ষর মার বিয়ে হলো—সে যেন কাল—এর মধ্যে মেয়েরও ছেলে হবার বয়স হলো!"

মোক্ষদা আবার একটু রঙ্গপ্রিয়। কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধার ন্যায় তাহার দিকে চাহিল। বুড়ী ভাবিল, এইবার মেয়েটার মন ফিরেছে! সে আবার বলিতে লাগিল,—

"সে দিনের কথা বাছা মোক্ষ! তোমার মা তখন নবছরের ফুট্‌ফুটে মেয়েটী, আমি কোলে করে বাড়ী বাড়ী বউ দেখিয়ে এনেচি। সেই হতেই ত আমার সঙ্গে অত ভাব!—এক বয়সী কি না! তা সে সব এখন স্বপন বলে মনে হয়। এই যে বাছা তুমি এখানে বসে বসে মাছ কুট্‌চো, এইখেনে একটা তালগাছ ছিলো, কত তালই তাতে ফল্‌তো। ভাদ্দর মাসের রাত্তিরে ভিজে ভিজে তোমার পিসিতে আর আমাতে কত তালই কুড়িয়েচি। বল্লে না পিত্তয় যাবে মা, এক দিন একটা বেহ্মদত্তি আমাদের

দুজনকে তাড়া করেছেলো, খড়ম পায়ে, গলায় পৈতের গোছ—তোমার বাপ তখন ছেলে মানুষ।—কতবার কোলে করেচি!”

মোক্ষদার হাসি চাপিয়া রাখা ভার হইল। এমন সময়ে মা আসিলেন এবং নয়নের মাসীর সঙ্গে চোখোচোখি হইলে এক মুখ হাসিলেন। মোক্ষদা এই সুযোগে হাসিয়া কুটিকুটি হইল।

কাহারও অল্প বিস্তর বুঝিতে বাকী রহিল না কেন মোক্ষদা হাসিতেছে। নয়নের মাসী আবার অপ্রতিভ্ হইল। দেখিয়া মা বলিলেন—“কি ছাই হাঁসিস্। এখনও মাছ কোটা হলো না। জামাইয়ের খবর না পেয়ে আমি ভেবে মরচি, তোর বাপু কেবল হাঁসি!” জামাইয়ের কথা তুলিয়া মা কন্যাকে অবনত মুখী করিলেন, নহিলে মায়ে ঝিয়ে একবার বোঝা পড়ার সম্ভাবনা ছিল।

অতঃপর গৃহিণী নয়নের মাসীকে বলিলেন—“আর শুনেচো গো, আমাদের এঁরা পুরনকে একবার দেখ্‌তে গিয়ে অপমান হয়ে এয়েচেন! আমার ভজুনি পূজুনি বেয়ান অপমানের আর কিছু বাকী রাখেন নি! তা ওঁকে হলে আমাকে হলো কিনা তুমিই বলত নয়নের মাসী!” নয়নের মাসী বিস্ময়ে হাঁ করিয়া ভ্রূ বিস্তার করিলেন।

তারপর বলা বাহুল্য জগদ্ধাত্রী একে একে সকল পেটের কথাই নয়নের মাসীর কাছে খুলিলেন—অবশ্য মেয়ের সামনে নহে। চাবি আনা পয়সার উপলক্ষে নয়নের মাসীর আগমন হইয়াছিল, মায় সিধা এবং মনের কথা তাহার সাড়ে আঠার আনা হইল। অতটা হজম করা তাহার বয়সের কর্ম্ম নহে। অতএব পথে যাইতে নয়নের মাসী অনেকটা খোলসা হইয়া গেল। পদ্ধতিটা কিরূপ পরে দেখা যাইবে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুরনের শ্বশুরবাড়ী যে দিকে, তাহার ঠিক বিপরীত দিকে নয়নের মাসীর ঘর। কিন্তু ঘোষপত্নীর কাছে ক্ষুধার আতিশয্য এবং বরাবর গৃহ গমনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া থাকিলেও বৃদ্ধার পদযুগল তাহাকে বোসেদের বাড়ীর পানে লইয়া চলিল। পথে কলহের একটা মৃদু মধুর সৌরভ তাহার নাসারন্ধ্র পরিতৃপ্ত করিতেছিল, অতএব রাস্তার লোকে ঘোষ ও বোসেদের ঝকড়ার কথা লইয়া কাণা কাণি করিতেছে না দেখিয়া নয়নের মাসীর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সৌভাগ্য ক্রমে সৌরভীর মার সঙ্গে তাহার দেখা হইল। সৌরভীর মা নয়নের মাসীর চেয়ে বয়সে ছোট এবং দ্বিতীয় দরজার খবর বাহিকা, কাজেই তাহার ঘ্রাণশক্তি কিঞ্চিৎ প্রখরতর। সে তাহার প্রথম দরজার “অপসয়ে”র প্রতি অঙ্গ দোলনে, প্রতি পদক্ষেপে লোমহর্ষণ কিছু ব্যাপারের আভাস পাইতেছিল।

সৌরভীর মাকে দূর হইতে দেখিয়াই নয়নের মাসীর জিভ সামলান দায় হইয়া উঠি-

য়াছিল, সে কাছে আসিলে তাহাকে শুনাইয়া যেন আপন মনে বলিতে লাগিল— "যাদের ভালবাসি তারা যে দুক্ষু পায় সে আমাদেরি কপাল। কে জান্‌তো বল বিয়ের আটদিন যেতে না যেতে এমনই ঘট্‌বে।"

সৌরভীর মা আঁচিয়া লইল ব্যাপার খানা কি। তথাপি আগ্রহে একটু একটু ভীতি বিহ্বল স্বরে সুধাইল ব্যাপার কি ?

বুড়ী। "কিছুই তোরা শুনিস্ নি গো—গাঁ ঢি ঢি হয়ে গেল যে! নায়েব মোশাইয়ের সঙ্গে বোসেদের বউমার ঝকড়া। নতুন কুটুমে কুটুমে এরি ভেতর চোকো চোকি রইল না। আহা ভাবলে কান্না পায়।" বলিতে বলিতে স্বর কিঞ্চিৎ হ্রস্ব করিয়া এদিক ওদিক্ চাহিয়া নয়নের মাসী অতি বিশ্বস্ত ভাবে তাঁহার শ্রোত্রীকে জানাইয়া দিলেন যে দৈবজ্ঞ বলিয়াছে, কনেটী বড় অলক্ষণযুক্তা, দুইটী সংসার ছারখার করিতে জন্মেছে।

সৌরভীর মা অবাক হইয়া দণ্ডকাল হাঁ করিয়া বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর দুইজনে বোসেদের বাড়ীর বউমার সম্বন্ধে কিছু কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আপন আপন পথে চলিয়া গেল। তাহার ফলে ঘোষ মহাশয়ের শয়ন কক্ষে স্ত্রী পুরুষের যে পরামর্শ হইয়াছিল, শাখা পল্লবিত অবস্থায় তাহা স্নানের ঘাটে ফুলকুমারীর মার কাণে উঠিল। ভব সুন্দরী নিস্তারিণীকে সম্বোধন করিয়া সুধাইলেন—

"বউ সত্যি কথা কি ?"

নি। "কি সত্যি ঠাকুরঝি ?"

ভব। "এই আজ সকাল বেলার কথাটা। তোমার সঙ্গে পুরনের মা বাড়ী বয়ে এসে নাকি ঝকড়া করে গেছে, আর ছেলে বউ নিতে নাকি বেহারা পালকী পাটিয়েচে ?"

নিস্তারিণী অবিশ্বাসের ক্ষীণ হাসি হাসিলেন। ভব সুন্দরীকে অপ্রতিভ হইতে দেখিয়া সৌরভীর মা বলিল, "কেন বউমা, কিছুই কি তুমি জান না ? দুঃখীরাম বেহারা পালকী নিয়ে যে বর কনে আনতে গেল, এই মাত্তর আমি দেখে আস্‌চি।"

আর অবিশ্বাসের স্থান রহিল না। নিস্তারিণীকে নীরব দেখিয়া সৌরভীর মা পথে নয়নের মাসীর সঙ্গে তার যে কথা হইয়াছিল, কিছু ছাঁটিয়া ছুটিয়া এবং আবশ্যক-মত দুই এক স্থলে বাড়াইয়া সেই স্নান যাত্রী সমবেত কুলকামিনী মহলে তাহাই ব্যক্ত করিল। স্থির ধীর ভাবে নিস্তারিণী তাহা শুনিলেন। রোজ যেমন স্নান করেন, আজও তেমনি স্নান করিলেন—কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। তখন গৃহে ফিরিলেন।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন কথা সত্য। বহির্ব্বাটীতে দুঃখীরাম পালকী বেহারা লইয়া হাজির।—মনিবের আজ্ঞা ওবেলা, কিন্তু ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনা তাহার অভ্যাস—কাজেই তাহার আর দেরি সহে নাই। এদিকে সদুঃখীরাম পালকীর আগ-মন বার্ত্তা পাইয়া পুরন্দর পূর্ব্বেই অপথে পিতৃ গৃহাভিমুখে ছুটিয়া পলাইয়াছিল। নিস্তা-

রিণী সকল শুনিলেন, কাপড় ছাড়িয়া দুঃখীরামকে ডাকাইলেন। গৃহের ভিতর হইতে স্থির অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"তোমার মনিবকে বলো মেয়ে আমি বিক্রয় করিনি! জামাতা উপযুক্ত হয়ে যদি তাকে কখন স্মরণ করে, তখন পাঠাব।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ফুলের মা ধীরে ধীরে আহ্নিকের ঘরে প্রবেশ করিলেন! হৃদয়ে ঝটিকা বহিতেছিল। তখন সাধ্বী স্বামী-পাদুকা হৃদয়ে ধারণ করিয়া নীরবে তাহা অশ্রুসিক্ত করিলেন।

ক্রমশঃ।

অভাগীর কাছে সখি নিন্দিওনা তাঁহারে।

১

অভাগীর কাছে সখি নিন্দিও না তাঁহারে।
জান না কেমন জন
দুখিনীর প্রাণধন;
দয়ার সাগর ওলো নাহি হেন সংসারে,
জান না, নিঠুর সখি বলিও না তাঁহারে।

২

বাসে না আমায় ভাল পরাণের পতি আর,
আহার সমুখে রাখি
সারা নিশা জেগে থাকি,
কোন রাতি আসে ঘরে, আসে না লো আরবার;
ফাটিতে চাহে লো হিয়া—স্রোতে বহে অশ্রু-ধার।

৩

শাশুড়ি আমার সই, বড়ই লো স্নেহ তাঁর;
অভাগীর দুখ দেখি
সারা দিন অশ্রুমুখী,
পেটের সন্তানে কটু কহিছেন অনিবার;
শুনিয়া ফাটে লো হিয়া, নিন্দিও না তাঁরে আর।

৪

সরলা আমার আহা! কত মধু প্রাণে তার;
কাঁদিতে হেরিলে মোরে
নীরবে জড়া'য়ে ধরে,
বুকে লুকাইয়া কাঁদে, মানে না বারণ আর;
স্নেহেতে গলিয়া মোরে
কতই বাখান করে;
দাদারে দুখেতে নিন্দে; নিন্দিও না তাঁরে আর!

৫

সকলেই নিন্দে তাঁরে, সহিতে পারিনা আর।
ওলো কেহ নাহি জানে
কত দয়া তাঁর প্রাণে,
প্রতিভা ধরম কত, দেবত্ব কতই তার।
আমারে বাসে না ভাল তাই কি সে নিন্দি-বার?

৬

নারীর পরাণ ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর মোর প্রাণ;
এ হিয়ার ভাল বাসা
তাঁর সে প্রাণের তৃষা
কেমনেলো নিবাইবে? তাহে সই নাহি জ্ঞান।

তাঁহার দর্শন তরে
পরাণ কেমন করে,
দেখিলে কতই সুখ—ইহাও খুলিয়া প্রাণ
ফুটিয়া কহিতে নারি, রসনা এমনি আন !

৭

দরিদ্র দুহিতা আমি, ছিলাম কুটীরে সই,
রূপহীন, গুণহীন
জ্ঞানশূন্য, আশাহীন,
বুকেতে রাখিবে কেহ যতনে তুলিয়া লই,
স্বপনে ও হেন আশা অভাগী করেনি সই।

৮

এ হেন আমারে সখি—কেন নারি বুঝিতে,
তুলিয়া লইল বুকে,
স্নেহেতে চুমিল মুখে
অতুলন রূপে গুণে যে জন এ মহীতে,
হেলায় রমণীরত্ন পারিত যে লভিতে।

৯

আহা ! কতই যতন সই প্রাণপতি করিত ;
শত মধু সম্বোধনে,
শত কথা সকরুণে,
যতন শতেক ক্ষুদ্রে দুখিনীরে তুষিত ;
এত সুখ অভাগীর
ভাবিতে ভাবিতে নীর
সুখ-নিপীড়নে নেত্রে কতই না বর্ষিত !

১০

ওলো, জ্ঞানের কতই কথা প্রাণপতি কহিত;
কত বা ধরম কথা
মধুর প্রেমের গাথা
মধুর সে কণ্ঠে কহি দুখিনীরে মোহিত ;
সে সব তত্ত্বের কথা
নাহি বুঝিতাম যথা
কতই আদরে সখি বুঝাইয়া কহিত।

১১

আমার কপালে কেন এত সুখ ধরিবে !
করেছি কি পুণ্য হেন
এমন পতির প্রাণ
অভাগীর প্রাণ সনে যাহে বাঁধা রহিবে ?
ভাগ্য দোষ অভাগীর তাঁরে কেন নিন্দিবে ?

১২

বাসে না আমারে ভাল, কাঁদি না লো তাহে সই,
দুখিনীর জন্ম দুখে,
জানি নাই কভু সুখে,
অন্যের অসহ্য দুখ অনায়াসে সয়ে রই।
যেহেতু ফাটে লো প্রাণ,
ভাসে যাহে দুনয়ান,
ভাবিতে সে দুখ কথা চেতনা রহেনা সই।

১৩

কহিব কি সখি আর, কপাল ভেঙ্গেছে হায়!
নিশা-শেষে যবে ঘরে
আসে প্রাণপতি ফিরে,
চাহিতে সে মুখপানে পরাণ ফাটিতে চায়,
দেবের শরীর আজি কোন মতে চেনা যায়!

১৪

আরক্ত নয়ন তাঁর, যেন লো ফাটিয়া পড়ে,
দাঁড়াইতে কাঁপে কায়,
অস্থিমাত্র আছে তায়,
তাঁর সে বদনে আজি ফুটে কথা নাহি সরে!
কহিব কি সখি আর কপাল গিয়াছে পুড়ে!

১৫

কেন লো এ অভাগিনী পড়িল নয়নে তাঁর ;
রূপ গুণবতী দেখি
বিবাহ করিলে সখি
না জানি কতই সুখে বহিত জীবন ধার !
এ হেন সুখের পথে আমি লো কণ্টক তাঁর!

১৬

আমারি লাগিয়া সই বিন্দু সুখ নাহি তাঁর।
দুখ দাহ ভুলিবারে
পতি সুরাপান করে,
অতৃপ্ত-প্রণয়-তৃষা নিবাইতে, বারিধার
চাহে লো সেথায় যেথা কণামাত্র নাহি তার।

১৭

রাক্ষসী আমি লো সই, দেবের সমান জন
জীবনেতে মৃত প্রায়
দুখিনীর যন্ত্রনায়!
আজো কেন বেঁচে আছি,দিলে যদি এ জীবন
সুখস্রোতনীরে প্রাণ বহে তাঁর অনুক্ষণ।

১৮

আমি কে তাঁহার পথে কাঁটা হয়ে রহিবার।
এত দয়া সে করিল,
এত ভাল যে বাসিল,
তাঁরি সর্ব্বনাশ ওলো করিতেছি অনিবার!
মরা ভাল তাঁর তরে,
আছি তাহে প্রাণ ধরে
কেমনে-বল না সই শুনি তবে নিন্দা তাঁর।

১৯

সকলেই নিন্দে তাঁরে, সহিতে পারি না আর!
ওলো কেহ নাহি জানে
কত দয়া তাঁর প্রাণে,
প্রতিভা, ধরম কত, দেবত্ব কতই তাঁর।
আমারে বাসে না ভাল, তাই কি সে নিন্দি-
বার।

শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

স্মৃতি ও কবিতা

বস্তুর রাজ্যে কবিতার খেলিবার প্রায় সুবিধা হয় না, কোনও প্রকারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়। কিন্তু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া সে একেবারে রিক্ত হস্তে ফিরে না, কাঠামর একটা আবছায়া স্মৃতি লইয়া ঘরে ফিরে। সেই স্মৃতি হইতে টানিয়া টানিয়া কবিতা আপনাকে ফুটাইয়া তুলে। বস্তুর আব ছায়ার মধ্য হইতে প্রাণ বাহির করাই তাহার কাজ। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সহিত তাহার বড় একটা সম্বন্ধ নাই। এই জন্য কবিত্ব ভাবে। ছন্দে, কথায়, অনুপ্রাসে এবং শ্লেষপ্রয়োগে কবিত্ব নহে। ভাব প্রকাশের সহায়তা করে বলিয়াই ইহাদের যাহা কিছু মর্য্যাদা।

স্মৃতির মন্দিরেই কবিতার প্রতিষ্ঠা। প্রমাণস্বরূপ অনেক বড় বড় কবির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাঁহারা বস্তু দেখিয়া কবিতা লেখেন নাই, অনেক কাল পরে অবশিষ্ট স্মৃতিটুকু লইয়াই কবিতা রচনা করিয়াছেন। হিমাদ্রির উন্নতশৃঙ্গ দেখিয়া হৃদয় ভাবে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন সে ভাব কি প্রকাশ করা যায়? কবির তখন আপনার উপরে দখল নাই। ধ্যানমগ্ন যোগীর মত আপনার হৃদয়ে তিনি তখন সেই মহান

গম্ভীর ভাব অনুভব করিয়া আকুল। তখন কবিতা লিখিতে বসিলে সে ভাব অনুভব করা যায় না, সুতরাং কবিতা বাহির হয় না। কবির হৃদয়ে কবিতা রচিত হইলে তবে তিনি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন।

চিত্রে বস্তুর ছায়া থাকে, কবিতায় ছায়াও থাকে না—যাহা থাকে, আবছায়া। তাহা ছায়া বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু ছায়ার যতটুকু বস্তুগত অস্তিত্ব তাহাও তাহার নাই। কবিতায় ছায়া-ভাব; ছায়া-বস্তু কোথায়? ভাব স্মৃতিতেই জমিয়া আসে, বস্তু তখন একেবারেই মুছিয়া গিয়াছে। এই কারণে, কবিতা স্মৃতিময়ী। স্মৃতি-আচ্ছন্ন হইয়াই সে থাকে, বস্তু আচ্ছন্ন হইয়া থাকে না। বস্তু-আচ্ছাদনে ভাবের সম্যক্ স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত হয়। মনোরাজ্য সম্বন্ধে যাঁহারা কখনও আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, কবিতায় বস্তু একেবারে বাদ যায় নাই, অথচ কবিতা বস্তু-আচ্ছন্ন নহে কেন। মনোরাজ্যে যাঁহাদের গতিবিধি নাই, তাঁহাদিগকে এ কথা বুঝান অসম্ভব।

কবিতার বিষয় অনেক সময় বস্তু। কিন্তু বস্তুর মধ্যে যে অশরীরী প্রাণ আছে, তাহা ব্যক্ত করিয়া তুলাই যথার্থ কবিতার কাজ। কাঠাম গড়িতে কুম্ভকার মাত্রেই পারে, কিন্তু কাঠাম যে প্রাণে ওতপ্রোত, সেই প্রাণ প্রস্ফুটিত করা যে সে ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। কাঠামর বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে শারীর-বিজ্ঞান আছে। কবিতার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। কবিতায় প্রতিভার বিকাশ, প্রাণের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি আবশ্যক। গণ্ডির মধ্যে কবিতা বাঁচে না, কবিতা বিশেষরূপে ভাবগত। তাহা যতই বস্তুর নিকটে সরিয়া আসে, ততই শ্লোকে ছড়ায় অথবা ঐ জাতীয় কোন-কিছুতে পরিণত হয়। বস্তুর আড়ালে ভাব ঢাকা পড়ে। অতি দীর্ঘ উচ্চ প্রাচীর গাঁথিয়া কে কবে গৃহের শোভা ব্যক্ত করিতে পারিয়াছে?

কবির মনে স্মৃতিই প্রথম কবিতা রচনা করে। কিন্তু অপার্থিব সুতরাং অদৃষ্ট বিষয়ে স্মৃতি রচনা করিবে কিরূপে? বলা বাহুল্য, কল্পনারও একটা স্মৃতি আছে। কবি কল্পনায় একটা বিষয় খাড়া করিয়া তুলেন, তাহার পর তাঁহার মনে তাহার কেবল একটা অস্পষ্ট আকুলি ব্যাকুলি মাত্র থাকিয়া যায়। অদৃষ্ট বিষয়ের কবি এই স্মৃতি। একেবারে স্মৃতি-সম্পর্ক-শূন্য কবিতা বোধ হয় নাই। তবে স্মৃতি অবশ্য বস্তুরও আছে, ভাবের ও আছে। কিন্তু বস্তুর স্মৃতিও অনেকটা ভাবময়। স্মৃতিতে ত আর বস্তু থাকিতে পারে না।

স্মৃতিতে প্রথম উচ্ছ্বাসটা অনেক সংযত হইয়া আসে। উচ্ছ্বাস-বাহুল্যে অভিভূত জড়ভাব থাকে না। উচ্ছ্বাসের যখন পূর্ণ আবেগ তখন নীরবতা বৈ তাহার ভাষা নাই। উচ্ছ্বাসকে আপনার অধীনে আনিতে পারিলে তখনই ভাষা ব্যক্ত করা যায়। কিন্তু সে ভাষাও তেমনি উচ্ছ্বাসময়ী, আবেগময়ী; নীরস বাহবার মত তাহা কেবল মুখের ভাষা নয়—ভাবের ভাষা, হৃদয়ের ভাষা, আবেগের ভাষা।

সুবৃহৎ সংযত কল্পনাই যথার্থ কবির পরিচয়। অসংযত কল্পনা শিশুরই শোভা পায়। কবি কল্পনার চালক—দাস নহেন। যথেষ্ট সংযম না থাকিলে সুসংলগ্ন ভাবের কবি হওয়া যায় না। স্মৃতি সংযমের এক প্রধান উপকরণ বলা যাইতে পারে। এই জন্য বোধ হয়, কবিতার জন্ম প্রায়ই স্মৃতিতে।

স্মৃতিতে সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে ব্যক্ত হয় কি না। অনেক জিনিষের সৌন্দর্য্য কেবল অতীতের মধ্য হইতেই বিকশিত হইয়াছে। ঝরা ফুলের সৌন্দর্য্য কেন? তাহার মধ্যে অতীতের সৌরভ বিলীন হইয়া আছে বলিয়াই নয়? সে যদি কলিকাবস্থা হইতে ব্যক্ত হইয়া না ঝরিয়া পড়িত, তাহা হইলে আমাদের নিকট কি তাহার বিশেষ সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইত? অতীতের সৌরভ-স্মৃতি-সমাচ্ছন্ন হইয়াই সে সুন্দর। আমাদের হৃদয়ের অনেক ভাবেরও নিজস্ব সৌন্দর্য্য যত থাক না থাক্ প্রাচীন স্মৃতিতে তাহা অনেক সময় বিশেষ সুন্দর হইয়া উঠে। গীতি-কবিতার যাঁহারা অনুশীলন করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

বিদ্যাপতির রাধা গাহিয়াছেন, "জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।" কৃষ্ণের বস্তুগত রূপ উপভোগ করিতে করিতে রাধা কি এমন কথা বলিতে পারিতেন? কৃষ্ণ যখন চোখের আড়ালে, তাঁহার রূপ কেবল স্মৃতিতে জাগিয়া আছে, তখনই রাধা এই কথা বলিয়া উঠিলেন। বস্তু উপভোগের সময় তাঁহার এ ভাব স্ফূর্ত্তি পায় নাই। বস্তু যখন সরিয়া গেল, ভাব বিকশিত হইল। উদাহরণের অভাব নাই, ঘরের কাছেই অনেক দৃষ্টান্ত মিলে।

বস্তু যতক্ষণ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য থাকে, ততক্ষণ তাহা হৃদয়ে তেমন মিশাইতে পারে না। নয়ন দেখিয়া দেখিয়া অবশ হইয়া আসে, নয়ন-তারাতেই বস্তুর ছায়া পড়ে। তাহার পর বস্তু যেমন দৃষ্টির অতীত হয়, ছায়া নয়ন-তারা ছাড়িয়া একেবারে হৃদয়ে মিশায়—ছায়া তখন ভাবে পর্য্যবসিত। এই ভাবময় হৃদয় যখন পূর্ণ উচ্ছ্বাসে বিকশিয়া উঠে, তখনই কবিতা সৃষ্ট হয়। সে প্রবল ভাব স্রোত রোধ করা যায় না। কৃত্রিম উপায়ও সে স্রোত বহাইতে পারে না। কবিতার প্রাণ স্বাভাবিকতা।

কবিতা স্মৃতির অভিব্যক্তি। স্মৃতির অভিব্যক্তি মাত্রই কিন্তু কবিতা নহে। কবিতার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে হইলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট নয়। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের অন্ধকার গহ্বর হইতে অতি সন্তর্পণে একটী সুবৃহৎ সংজ্ঞা বাহির করিবারও আবশ্যক নাই। কবিতা কাহাকে বলে, সাধারণতঃ সকলেই বুঝে। চেষ্টা করিলেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্ব তর্কখণ্ডনী সংজ্ঞা আমরা বাহির করিতে পারি কি না সন্দেহ।

সংস্কৃত অলঙ্কারের অনুবাদ করিয়া বলা যাইতে পারে, কাব্য রসাত্মক বাক্য। কিন্তু আমাদের নিকট এ অনুবাদিত সংজ্ঞা বিশেষ ভাব প্রকাশক নহে। আমরা রসাত্মক বাক্য বলিতে যাহা বুঝি, কবিতা হইতে তাহা অনেক সময় বহুদূর। অতএব পাঁজি

পুঁথি শাস্ত্র যথা সম্ভব বাদ দিয়া প্রবন্ধ সমাপ্তির দিকে মনোযোগ দেওয়া যাক্।

স্মৃতির সহিত কবিতা যে বিশেষরূপে সম্বন্ধ, ইহা দেখান গিয়াছে। সকল নিয়মেরই স্থল বিশেষে ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ কবিতারচনা স্মৃতিতে। স্মৃতিকে এই জন্য কবি বলিলে বোধ করি বড় অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য।

প্রাণী-জগতের মধ্যে এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, একই আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পন্ন দুইটি জীব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ কর, তোমার বন্ধুর মুখচ্ছবি যাহা তোমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহার অবিকল প্রতিরূপ কোথাও দেখিতে পাইবে না। সমুদয় বিশ্বরাজ্য অনুসন্ধান কর—তোমার স্নেহ-পালিত কুকুরটির ঠিক অনুরূপ কোথাও মিলিবে না। এই আকৃতি ও প্রকৃতি গত বিভিন্নতা রহিয়াছে বলিয়াই, শত সহস্র মানবের মধ্যেও আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজনকে বাছিয়া লই—সন্তান আপন মাতার ক্রোড় খুঁজিয়া লয়—পিপীলিকা আপন দলস্থ সকলকে চিনিতে পারে—এবং একটি পারাবত সহস্র সহস্র পারাবতের মধ্যেও আপন সাথির অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য হয়। তুমি আমি হয় ত এক দল মেষের মধ্য হইতে বিশেষ কোন একটিকে বাছিয়া লইতে অক্ষম, কিন্তু মেষ পালককে জিজ্ঞাসা কর, সে তৎক্ষণাৎ তাহার দলস্থ প্রত্যেকটিকে বাছিয়া আনিবে। সুইস্ দেশীয় একটি শিকারীর বিষয় এইরূপ কথিত আছে যে, যে মৃগশিশু একবার তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়াছে, পুনরায় তাহাকে দেখিলেই সে চিনিতে পারিত। তোমার আমার নিকট যে বিভিন্নতা দুর্ব্বোধ্য, অন্যের নিকট তাহাই সুস্পষ্ট, আবার অন্যের নিকট যাহা অস্পষ্ট, তোমার আমার নিকট হয়ত তাহাই সহজবোধ্য।

এই আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য আমাদিগকে বহু দূরে যাইতে হইবে না। সকল জীবই দুইটি প্রাণীর সম্মিলন হইতে উৎপন্ন হয়। মাতা ও পিতা উভয়েরই অনুরূপ কতক পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। উভয়ের সমষ্টিতে যাহার উৎপত্তি, তাহা যে উভয় হইতেই কতক পরিমাণে স্বতন্ত্র হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আবার এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের মধ্যে থাকিয়া মাতা ও পিতার দিন দিন পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; সেই জন্য তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সন্তানগণের মধ্যেও বিভিন্নতা লক্ষিত হইতেছে। এইরূপে পিতা মাতা সন্তান

হইতে, সন্তান ভ্রাতা ভগিনী হইতে পৃথকীকৃত হইতেছেন। ইহা ব্যতীত প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের আরও বিশেষ বিশেষ কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা গতবারে দেখাইয়াছি যে জীবন সংগ্রামে যাহারা উপযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহাদেরই সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উপযুক্ত কাহারা? যাহারা তাহাদের পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া চলিতে পারে—যাহারা অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত আপনাদিগকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে পারে, তাহারাই বাঁচিবার উপযুক্ত। মনে করুন কোন দেশের জল বায়ুর পরিবর্ত্তন ঘটিল—ছিল উষ্ণ প্রধান, হইল শীত প্রধান। এখন এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের সহিত যদি তদ্দেশীয় জীব সকল আপনাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তন সম্পন্ন করিতে সক্ষম না হয়, তাহা হইলে তাহাদের টেঁকিয়া থাকা দুষ্কর। অবশ্য এইরূপ পরিবর্ত্তন এক দিনের মধ্যে হইতে পারে না; প্রকৃতিতে হঠাৎ পরিবর্ত্তন একেবারেই অসম্ভব। ভূবিদ্যার ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন কোন দেশের জল বায়ু ক্রমে ক্রমে, হয়ত যুগযুগান্তর ধরিয়া এতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে তাহা অতি আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হয়। আবার সেই সঙ্গে তদ্দেশীয় প্রাণী সমূহের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তন আরও কৌতুকাবহ। বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন দেশে এইরূপ পরিবর্ত্তন চলিতেছে। কিন্তু উপস্থিত প্রবন্ধে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা অসঙ্গত বোধে তাহা প্রত্যাখ্যান করা হইল।

এইরূপে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত যে জীবসকল আপনাদিগকেও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ডাক্তার হুকার হিমালয় অঞ্চল হইতে কতকগুলি আঙ্গুরের বীজ লইয়া ইংলণ্ডে তাহাদিগকে বপন করেন। তাহাতে কতকগুলি বৃক্ষ উৎপন্ন হয়; কিন্তু দেখা যায় যে তদ্দেশীয় শীতোপযোগী এক পরিবর্ত্তন তাহাদের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে, যাহা হিমালয়োৎপন্ন বৃক্ষ সকলে কখনও লক্ষিত হয় নাই। কোন ব্যক্তি সাইবেরিয়া হইতে কতকগুলি লোমযুক্ত কুকুর ভারতবর্ষের ন্যায় কোন উষ্ণ প্রধান দেশে লইয়া যান। কিছু দিন পরে দেখা যায় যে তাহাদের লোমগুলি সমুদয় খসিয়া পড়িয়াছে। এসিয়াটিক্ মিউজিয়ামে ফ্লাট ফিস্ (flat fishes) নামক এক প্রকার মৎস্য অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। ইহাদের পরিবর্ত্তন অতি আশ্চর্য্যজনক। সকল মৎস্যেরই চক্ষু ও নাসিকা দ্বয় মধ্যরেখার উভয় পার্শ্বে স্থাপিত এবং সন্তরণ কালে সকল মৎস্যেরই পৃষ্ঠদেশ উপরের দিকে থাকে কিন্তু ইহাদের চক্ষু ও নাসিকাদ্বয় মধ্য রেখার এক পার্শ্বেই স্থাপিত এবং সন্তরণ কালে ইহারা এক পাশ হইয়া সন্তরণ করে। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শৈশবাবস্থায় ইহাদের এরূপ কোন পরিবর্ত্তন দৃষ্টি গোচর হয় না, তখন তাহারা অন্যান্য মৎস্যের ন্যায় সহজ ভাবেই সন্তরণ করে এবং চক্ষু ও

নাসিকাদ্বয়ও উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত থাকে। কিন্তু বয়ঃবৃদ্ধি সহকারে তাহাদের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন প্রকাশ পাইতে থাকে! প্রথমতঃ তাহারা একপাশ হইয়া সন্তরণ করিতে আরম্ভকরে— সচরাচর বামদিক্‌টিই নীচের দিকে থাকে। তাহার পর নীচের দিকের চক্ষুটি ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে মস্তকের অস্থি সকলও অতি বিকৃত ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ এই যে ইহা দ্বারা তাহাদের শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণের অধিক সম্ভাবনা থাকে। সন্তরণ কালে ইহাদের চক্ষুহীন-পার্শ্ব স্থলের দিকে থাকে—কারণ সে দিক হইতে শত্রু আগমনের কম সম্ভাবনা। এবং অপরদিকটি, যেদিকে দুইটি চক্ষুই এক্ষণে স্থাপিত হইয়াছে—সমুদ্রের দিকে রাখিয়া শত্রু আগমন অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারে।

ওয়ালেস সাহেব বলেন, যে সকল দেশ বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বে স্থাপিত—যেখানকার অরণ্যানী চির শ্যামল পত্ররাজিতে শোভিত—যেখানে বৃক্ষ লতাদি চিরবসন্ত উপভোগ করে—সে স্থানের অধিকাংশ পক্ষীই শ্যামবর্ণ। ইহা তাহাদের শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় স্বরূপ—শ্যামে শ্যাম মিলাইয়া তাহারা ব্যাধের অনুসন্ধান ব্যর্থ করিতে সমর্থ হয়? *

অধুনাতন ঘোটক সকলের আমরা একটি অঙ্গুলিই দেখিতে পাই এবং সেটিও খুররূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে অতি প্রাচীন সময়ে অন্যান্য নখীদিগের ন্যায় ঘোটকেরও পাঁচটি অঙ্গুলিই বর্ত্তমান ছিল। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত এক একটি করিয়া খসিয়া পড়িয়াছে। তিমি মৎস্যেরও এক সময় অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের ন্যায় হস্তপদাদি ছিল—এক সময় তাহারাও আমাদের ন্যায় স্থলচর প্রাণীছিল;—অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত তাহারা এক্ষণে জলচর হইয়াছে, হস্ত পদাদি অঙ্গ সকল সন্তরণোপযোগী-পতত্রে (Fins) পরিণত হইয়াছে। এইরূপে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত কতশত জীব যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অভ্যাস ও অনভ্যাস বশতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল অনেক সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এপ্‌টারিক্সের (Aptarix) ডানা আছে কিন্তু উড়িবার শক্তি নাই। দক্ষিণ আমেরিকায় খরগস জাতীয় এক প্রকার জীব আছে, তাহারা গর্ত্তের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া তাহাদের দৃষ্টি শক্তি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কাঁকড়া জাতীয় কতকগুলি জন্তুর চক্ষুর বোঁটাটি (Foot stalk for the eye) আছে কিন্তু চক্ষুটি নাই। এ সমস্তই অনভ্যাসের দোষে ঘটিয়াছে। আবার এক জাতীয় স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের স্তন এত দীর্ঘ যে পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে। ইহারা সন্তানদিগকে পৃষ্ঠে রাখিয়া স্তন পান করায় এবং এই জন্য তাহাদের স্তনের এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তবেই দেখুন

* Vide westminster review, July 1867 page 5.

অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত এবং অভ্যাস ও অনভ্যাস বশত; জন্তুদিগের অঙ্গ বিশেষের পরিবর্ত্তন কি আশ্চর্য্যরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অনেকে বলিতে পারেন অঙ্গ বিশেষের পরিবর্ত্তন না হয় সম্ভবপর হইল; কিন্তু তাই বলিয়া যে সমুদয় আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য ঘটিতেছে, তাহা ত বোধ হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যন্ত্রাদি অতি গূঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ। দৃষ্টতঃ যদিও আমরা একটির সহিত অপরটির কি সম্বন্ধ তাহা অনেক সময় স্থির করিতে সক্ষম নহি, কিন্তু কার্য্যতঃ একটির পরিবর্ত্তনে অপরটিকে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা আর অস্বীকার করিতে পারি না। শ্বেতকায় বিড়ালের চক্ষু নীলবর্ণ হয় এবং তাহারা সচরাচর বধির হইয়া থাকে। পর্‌পাও পায়রার বাহিরের দুইটি আঙ্গুল চামড়া দিয়া জোড়া। লোমহীন কুকুরের দন্ত সকল অসম্পূর্ণ থাকে। যে সকল পায়রার চঞ্চু ছোট, তাহাদের পাও ছোট হইয়া থাকে। ওয়াইমোন সাহেব (Proff Wyman) এ প্রকার আনুসঙ্গিক পরিবর্ত্তনের একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। তাঁহার ফ্লরিডা বাস কালীন তিনি একদিবস অবগত হইলেন যে তদ্দেশীয় শুক্ল বর্ণ শূকর সকলের খুর খসিয়া পড়িতেছে। তিনি ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন—বর্ণের সহিত যে খুরের কি সম্বন্ধ তাহা স্থির করিতে পারিলেন না—কিছু সন্দিহানও হইলেন। অবশেষে এক শূকর পালকের নিকট ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করায় জানিতে পারিলেন যে সেই দেশে পয়েণ্টরুট্ Point root নামক এক প্রকার মূল জন্মে; সেই মূল ভক্ষণ করিয়াই শূকরদিগের মধ্যে এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কৃষ্ণ ও শুক্ল এই উভয় জাতীয় শূকরেই উক্ত মূল আহার করিয়া থাকে, কিন্তু পরিবর্ত্তন ঘটে কেবল শুক্ল জাতীয়দিগের মধ্যে। আরও দেখা যায় যে ইহাদের অস্থি সকলও ঈষৎ রক্তিমাভ হইয়া উঠে। এইরূপে দেখুন একটি অঙ্গের পরিবর্ত্তনের সহিত অতি দূর সম্পর্কীয় অঙ্গ সকলও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পরিবর্ত্তনশীল জগতের মধ্যে থাকিয়া পরিবর্ত্তন অসম্ভব বলা বাতুলের কার্য্য। সেই উলঙ্গ অথবা বল্কল পরিহিত আদি মানবের সহিত উপস্থিত মানব সমাজের তুলনা কর—কোন পরিবর্ত্তন বোধ হয় কি? আমাদের আদি পুরুষগণ যখন গৃহাভাবে পর্ব্বতগুহায় বাস করিতেন—অগ্নি অভাবে অপক্ক মাংস খাইয়া উদর পূর্ত্তি করিতেন—বস্ত্রাভাবে বল্কল অথবা বৃক্ষপত্র পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেন—তদানিন্তন সময়ের সহিত বর্ত্তমান সময়ের একবার তুলনা কর—কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। আমাদের আকৃতি পরিবর্ত্তনশীল—সমাজ পরিবর্ত্তনশীল—সমুদয় জীব জগৎ পরিবর্ত্তনশীল।

কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া ইউরোপীয় জাতিসমূহ আপনাদের গৃহপালিত পশু পক্ষী এবং উদ্যানজাত বৃক্ষলতাদির কি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন, তাহা

আমরা কল্পনাতেও ধারণা করিতে অক্ষম। উদ্যানপালক অনাবশ্যকীয় বৃক্ষগুলিকে উৎপাটন করিয়া আবশ্যকীয়গুলির উৎকর্ষ সাধন করেন; একটি বৃক্ষে নূতন ফুল হইতে দেখিলেই, যে যে অবস্থায় তাহার উৎপত্তি হইয়াছে, সেই সেই অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া তজ্জাতীয় অন্যান্য বৃক্ষ হইতেও সেইরূপ ফুল উৎপাদনের চেষ্টা করে, উদ্যানপালকের ন্যায় পশুপালকও এক জাতীয় জীব সকলের মধ্যে জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাত সারেই হউক অতি অদ্ভুত পার্থক্য সম্পাদন করিয়া থাকে। এক্ষণে আমরা যত বিভিন্ন জাতীয় কুক্কুট দেখিতে পাই, সে সমুদয়ই একজাতীয় কুক্কুট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। * ইহা ডারউইন বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন; এবং ভারতবর্ষের ব্লাইথ সাহেবও তদ্রূপ পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার সহিত ঐক্যমত হইয়াছেন। পাতিহাঁস ও খরগোসের ভিন্ন ভিন্ন জাতি সকল যে একজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা সকল পশু-তত্ত্ববিদই স্বীকার করিয়াছেন। কত বিভিন্ন জাতীয় পারাবত যে আজকাল আমাদের নয়ন গোচর হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। গোলা, পরপাঁও, গৃহবাজ, লক্কা, লোটন প্রভৃতির মধ্যে এত পার্থক্য যে, তাহারা যে সকলেই ভিন্ন জাতীয়, তাহা বলিতে কেহই সঙ্কুচিত হইবেন না। কিন্তু ডারউইনের বহু আয়াস সাধ্য পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে ইহারা সকলেই "গোলা" জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। † আমেরিকা হইতে একজাতীয় আলু আনিয়া আমাদের দেশে প্রথম আলুর চাস আরম্ভ হয়, কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষে নানা জাতীয় আলু উৎপন্ন হইতেছে। আমাদের দেশে আজ কাল অনেক প্রকার ধান্যের নাম শুনিতে পাওয়া যায়—রামসাল, কনকচূর, আউস, বরুই ইত্যাদি। কিন্তু এ সমুদয়ই এক জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে আমাদের উদ্যানজাত বৃক্ষ লতাদি এবং গৃহ পালিত পশু পক্ষী সকল, কয়েকটি বন্য জাতির উৎকর্ষ সাধনে উৎপন্ন হইয়াছে। কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া যে এই সকল পার্থক্য সাধিত হইয়াছে, তাহা বিস্তৃতরূপে এস্থলে বলা অসম্ভব। তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখা উচিত যে প্রকৃতির যে সকল সামান্য সামান্য বৈচিত্র্য আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই, সেই সামান্য গুলিকে একত্র করিয়াই এই সকল অসামান্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। বৈজিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বারান্তরে বিশেষ করিয়া কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের আর একটি বিশেষ কারণ "যৌন নির্ব্বাচন প্রথা" বা Sexual selection। সঙ্গ লাভেচ্ছা প্রাণি জগতে অত্যন্ত বলবতী। স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয় শ্রেণীস্থ জীবের মধ্যে এক আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক আকর্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

* From wild Indian fowl—Gallus conkioa.

† From rock segion or calamba livia.

স্ত্রী, পুরুষের জন্য লালায়িত—পুরুষ, স্ত্রী লাভের জন্য ব্যাকুল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সকল পুরুষই যে স্ত্রী লাভে সমর্থ হয় এবং সকল স্ত্রীই যে পুরুষ লাভে কৃতকার্য্য হয়, তাহা নহে। সঙ্গ লাভের জন্য যোগ্যতার পরিচয় আবশ্যক। সুন্দরী ও গুণবতী ভার্য্যা কে না পসন্দ করে? মূর্খ ও কুরূপ সন্তানের বিবাহের জন্য পিতা মাতাকে কত কষ্ট পাইতে হয় তাহা কে না অবগত আছেন? নিকৃষ্ট প্রাণীদের মধ্যেও যোগ্যতা অনুসারে সঙ্গ লাভ ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ পক্ষীদের মধ্যে রূপগুণের পক্ষপাতিত্ব কিছু বিশেষ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ এক জাতীয় পক্ষীর বিষয় শুনা যায় যাহাদের সঙ্গীত স্পৃহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। যাহার কল কণ্ঠ অধিক মনমোহিনী হইবে—যে মনভাঙ্গা, হৃদয় ভাঙ্গা সঙ্গীত গাহিতে পারিবে তাহাকে বরণ করিবার জন্যই অনেকে লালায়িত। কোন কোন জাতির মধ্যে বীরত্বের আদরও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। দুইটি পক্ষী যদি একটি পক্ষিণীর প্রণয়প্রার্থী হয় তাহা হইলে বীরত্ব হিসাবে তাহাদের বিবাদ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে; অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে দ্বন্দযুদ্ধ লড়িতে হয়। যতক্ষণ যুদ্ধ হইতে থাকে, পক্ষিণী এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখিতে থাকে। যাহার জয় হয়, সে তৎক্ষণাৎ তাহারই অনুগামিনী হয়। কিন্তু গুণ অপেক্ষা রূপের আদরই অধিক দেখিতে পাওয়া যায় (১)। অধিকাংশ পক্ষীর মধ্যেই রূপের তারতম্য অনুসারে সঙ্গলাভ ঘটিয়া থাকে। যাহার পুচ্ছে অধিক বর্ণসমাবেশ থাকিবে—গ্রীবা সুঠাম হইবে—চরণদ্বয় সুগঠন হইবে—চঞ্চু বিসদৃশ লম্বা না হইবে, তাহারই অধিক প্রণয়প্রার্থী যুটিবে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই আবার কুলীন, অর্থাৎ বহুবিহাহটা দোষণীয় মনে করে না, সুতরাং কেহবা ৮।১০টি বিবাহ করিল আর কেহবা চির কৌমার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিল।

এখন দেখা উচিত প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্বন্ধে "যৌন নির্ব্বাচন" কিরূপে কার্য্য করিতেছে। মানিলাম রূপ গুণের তারতম্য অনুসারে ইহারা সঙ্গলাভে কৃতকার্য্য বা অকৃতকার্য্য হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে বৈচিত্র্য ঘটিতেছে কিরূপে? যাহারা অবিবাহিত রহিল তাহাদেরত বংশ একেবারেই লোপ পাইল। যাহারা বিবাহিত হইল তাহারাই বংশ রক্ষা করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু এক বংশেই যৌন নির্ব্বাচনের কার্য্য শেষ হইল না, তাহাদের বংশধরগণের মধ্যেও সেইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধিল। যাহারা আরও উৎকর্ষতা দেখাইতে পারিল, তাহারাই জয় লাভ করিল। বংশ পরম্পরায় এই "প্রণয় সংগ্রাম" চলিয়া আসিতে লাগিল এবং তাহারাও উন্নত হইতে উন্নততর সোপানে উঠিতে লাগিল। এক বংশে যে পরিবর্ত্তন অলক্ষিত ছিল, পরবংশে তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইল। সে সময় যে বংশটির উজ্জ্বলতার অভাব ছিল, এক্ষণে তাহা পূর্ণ বিকশিত হইল। এই উন্নতি সোপানে যাহারা একটুকু অধিক অগ্রসর হইল, তাহারাই

---

১ মনুষ্য সমাজেই বা ইহার কম কি?

নূতনত্ব লাভ করিল এবং পরিশেষে হয়ত একটি ভিন্ন জাতি বলিয়া গণ্য হইল। ইহাদের লিখিত ইতিহাস নাই সুতরাং অজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিলেন সৃষ্টির আদি হইতে জাতি সমূহ সৃষ্ট হইয়াছে।

এইরূপে ক্রমোন্নতি প্রভাবে যে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, তাহার সীমা পরিসীমা নাই। কি আশ্চর্য্য উপায়ে সামান্য কীটাণুকীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়—স্রষ্টার সৃষ্টিকৌশল দেখিয়া অবাক ও স্তম্ভিত হইতে হয়। স্রষ্টার সৃষ্টি-কৌশলের অবমাননা করা দূরে থাকুক "নির্ব্বাচন তত্ত্ব" তাহার মহত্ত্ব আরও বিশেষ করিয়া প্রতিপন্ন করে—অসীমের অসীমত্ব প্রচার করে। কবি বন ফুলের মনোহারিত্ব দর্শনে পাগল হইয়াছেন—পাপিয়ার কলকণ্ঠ শ্রবণে ব্যাকুল হইয়াছেন—প্রজাপতির পক্ষদ্বয়ে বর্ণ সমাবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। রজত-রেখা-সন্নিভ নির্জ্জন নির্ঝারণীর উল্লাস—বীচিমালাপূর্ণ মহা সাগরের দিগন্ত প্রসারিত নীলিমার সহিত অনন্ত নীলাকাশের উদ্বাহ দেখিয়া তাঁহার মন বিলোড়িত হইয়াছে—তিনি আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্ এই বৈচিত্র্য যবনিকা উত্তোলিত করিয়াছেন—যবনিকার অন্তরালে যে নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

সন্ধ্যা।

জগৎকে আপনার ছায়ালোক-রহস্যে ঘিরিয়া শান্তনেত্রে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে দিগন্তের কনক-ক্রোড় হইতে নামিয়া আসে। চঞ্চল চরণের চারিধারে চুম্বন-অধীর শুভ্র মেঘখণ্ড লাবণ্য বিভাসিত হইয়া ভাসিয়া বেড়ায়। সন্ধ্যার অঞ্চলস্পর্শে তাহারা ঈষৎ দূরে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়; সন্ধ্যা স্বর্ণরেখ-সুরপথ দিয়া নীরবে নামিয়া যায়। ধরণীর কুঞ্জ বনে বনে ফুল ফুটিয়া উঠে, সৌরভ-স্নেহে শ্রান্তি ভুলিয়া শাখায় শাখায় সমাগত বিহগেরা আনন্দ-আকুল স্বরে সন্ধ্যাকে সাদর-সম্ভাষণ করে। স্বভাবের কুসুম শয্যায় সন্ধ্যা স্নেহময়ী মা'র মত আসিয়া বসে। জগৎ যেন এতক্ষণে পূর্ণ হইয়া উঠে।

ছায়াময়ী সন্ধ্যার আবির্ভাবে জগৎও ছায়াপুরী বলিয়া বোধ হয়। ছায়ার মত নীরবে নিঃশব্দে মানবেরা যায় আসে, ধরণীতে তাহার চিহ্ন পড়ে না। সন্ধ্যার অঞ্চলবায়ে স্তব্ধতা কেবল মৃদু মৃদু শিহরে মাত্র, কিন্তু তাহার মুখ ফুটে না। ধ্যানরত যোগীহৃদয়ে সংযত নিশ্বাস যেমন বহে কি না বহে, সেইরূপ সন্ধ্যার হৃদয়ের মধ্যে জগৎস্রোত বহে কি না বহে। হৃদয়ের উত্থান পতন অনুভব করা যায় কি না যায়। সন্ধ্যা

যেন কেমন ভাবে তন্ময়ী। স্থির অচঞ্চল নেত্রে জগতের কূলে বসিয়া মায়াময় অতীত সূত্রে মৃত্যু প্রতিদিনই শত শত ভগ্নহৃদয় লইয়া গাঁথিতেছে, সন্ধ্যা অনিমেষ নয়নে সেই দিকে চাহিয়া।

কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া সন্ধ্যা এইরূপ নীরবে ম্লাননেত্রে চাহিয়া থাকে? কে জানে! সন্ধ্যা আসে—মায়ের মতন জগৎকে স্নেহ ঢালিয়া দিয়া চলিয়া যায়। হৃদয়ের অপরিসীম স্নেহেই সন্ধ্যা সুন্দর, জগৎকে স্নেহ করিয়াই তাহার একমাত্র তৃপ্তি। দীপ্ত মুখশ্রীতে পূর্ণ স্নেহ বিভাসিত। সেই স্নেহে প্রতিভাসিত হইয়া জগৎ পুলকদেহ, আনন্দোদ্বেলিত-হৃদয়, নীরব, শান্ত। শান্তিময়ী সন্ধ্যায় সকল কোলাহল অবসান হইয়াছে। সমাপন-গান গাহিয়া দিবা অস্তাচল পাদদেশে লুটাইয়া পড়িল, গানের শেষ ক্ষীণ তানটুকু লীন-প্রায়।

সন্ধ্যা নীরব, গম্ভীর। নীরবতাই তাহার ভাষা। সে ভাষা ভাবে পূর্ণ, ভাবে ব্যক্ত, শব্দাড়ম্বর বিহীন। সন্ধ্যার নয়নের কোণে, অধর-রেখায়, বিকশিত মুখ লাবণ্যে তাহার বিকাশ। সে আবেগময় মর্ম্মস্পর্শী গম্ভীর ভাব কি শব্দের ভাষায় প্রকাশ করা যায়। এ ভাব অস্ফুট, কোথাও অর্দ্ধস্ফুট, হৃদয়ের উপর ইহার পূর্ণ প্রভাব। ইহার কতকটা ব্যক্ত মাত্র, বাকিটুকু অনুভব করিয়া লইতে হয়।

সন্ধ্যার ভাবে জগতের প্রাণের মধ্যে কেমন একটা সৌম্য গাম্ভীর্য্য বিকশিত হইয়া উঠে। সুখের তীব্রতা মুছিয়া গিয়া দুঃখের আনন্দের মত সেখানে একটী মধুর স্নিগ্ধ ভাব থাকিয়া যায়। তীব্র সুখে ত আর গভীরতা নাই। সন্ধ্যার গভীর ভাবে এই জন্য সুখ-জ্বালা থাকিতে পায় না। সন্ধ্যা যেমন নীরবে ধীরে ধীরে মেঘাতীত মায়াপুরী হইতে নামিয়া আসে, আমাদের হৃদয়ও সেইরূপ নীরবে অজ্ঞাতসারে সান্ধ্য ভাবাচ্ছন্ন হইয়া আসে। দিবসের প্রখরভাবাবসানে হৃদয় প্রশান্ত ভাব ধারণ করে।

সন্ধ্যা নামিয়া আসে; মাতৃস্নেহ অনুভব করিয়া জগৎ সংগ্রামকোলাহল হইতে বিরত হয়। মুক্ত নীলাকাশে শান্ত সৌন্দর্য্য—ভ্রুকুটী নাই, অন্ধকার নাই, আলোকের তীব্রতাও নাই; মুক্ত মানব-হৃদয়েও নীরব পবিত্রতা—কুটিলতা মায়াবিনীর গরল-নিশ্বাসে হৃদয় দূষিত নহে। বহিঃপ্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতি যেন মায়ের কোলে আশ্রয় পাইয়া নিঃশঙ্ক, কলঙ্ক মুক্ত, প্রেমাপ্লুত।

সন্ধ্যা একাকিনী বসিয়া। শিথিল কেশপাশ কপোল বাহিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। আলুথালু কেশগুচ্ছের মধ্য হইতে সন্ধ্যা-তারা অস্পষ্ট দেখা যায়—অতি ক্ষীণ, মিটিমিটি। জগৎ সন্ধ্যার কোলের নিকট সরিয়া আসিয়া বসে। মৃদু শান্ত হাসি হাসিয়া সন্ধ্যা তাহাকে স্নেহ দেয়। সে সুগভীর স্নেহাকর্ষণে জগৎ আর বাহিরে যাইতে পারে না।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহীব্যক্তি যেমন সংসারে থাকিয়াও সংসারাচ্ছন্ন নহেন—অনাসক্ত, সন্ধ্যাকালে জগৎও কতকটা সেইরূপ হইয়া পড়ে। আপনার মধ্যেই সে শান্তি পায়, আপ-

নার মধ্যে প্রতিষ্ঠা অনুভব করে; এই জন্য তাহার চাঞ্চল্য তখন স্থির হইয়া আসে, সে আপনাকে সংযত করিয়া আনে। তাহার হৃদয়ের উপর দিয়া যোগানন্দের মত এক পবিত্র বিদ্যুৎ-অনুভূতি-স্রোত বহিয়া যায়। তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

সন্ধ্যা খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠে। তাহার কি অধিকক্ষণ থাকিবার যো আছে? সে যেখানে না যাইবে, সেখানে প্রেম জাগিবে না, হাসি ফুটিবে না। সেখানে দিকে দিকে অট্টহাস্যময় হাহাকর শুধু প্রতিধ্বনিত হইবে। সন্ধ্যা উঠে—যেমন আসিয়াছিল তেমনি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে উঠিয়া যায়। সহস্র তারকাখচিত অন্ধকার-বসনে আলুলায়িতকুন্তলা নিশীথিনী সন্ধ্যাকে বিদায় দিতে আসে। জগৎকে তাহার হস্তে সঁপিয়া দিয়া সন্ধ্যা ম্লাননেত্রে বিদায় গ্রহণ করে।

সন্ধ্যা যায়—আলোক-ধৌত রজত-ছায়াপথ দিয়া একাকিনী চলিয়া যায়। চঞ্চল কোমল চরণ দু'খানি ভূমি ছোঁয় কি না ছোঁয়। পথে যায় যায়, এক একবার পশ্চাতে ফিরিয়া চায়। সে কি আর সাধ করিয়া যায়? সে না যাইলে সুর-কাননে ফুল আর ফুটিবে না, সৌরভ ছুটিবে না। তাহাকে না দেখিলে উষার চির বিকশিত কচি মুখখানি চিরদিনের তরে ম্লান হইয়া থাকিবে। উষা আর ফুল কুড়াইতে আসিবে না। তাই সন্ধ্যা যায়—গিয়াই সে উষার শুভ্র কপোল দেশে চুম্বন করে। শুভ্র উষা আরও শুভ্র হইয়া উঠে।

সন্ধ্যার ভাবটী বড় কোমল, কিন্তু গম্ভীর। কোমলে গম্ভীরে. উজ্জ্বলে ম্লানে, তাহার সৌন্দর্য্যে এমন একটী পূর্ণতা ব্যক্ত হইয়াছে যে, সে সৌন্দর্য্যের তুলনা মিলে না। সন্ধ্যা যখন চলিয়া যায়, তাহার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত এই ভাবটী কেমন থাকিয়া যায়—এই উজ্জ্বলে ম্লানে, কোমলে গম্ভীরে, শৈশবে পূর্ণ যৌবনে আলিঙ্গন ভাব।

কতবার পশ্চাতে চাহিয়া, কতবার ধরণীপানে ফিরিয়া সন্ধ্যা নির্জ্জনে ছায়াপথ ছাড়াইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। ছায়াপথের স্বচ্ছতার মধ্য দিয়া আর তাহার চরণ-লাবণ্য ফুটিয়া পড়ে না। সে অন্তর্হিত হয়। কুহক-আসন বিছাইয়া নিশীথিনী মায়া-দণ্ড হস্তে ধরণীর পরে রাজত্ব করিতে থাকে। ভয়ে কেহ কিছু বলে না—সকলই স্তম্ভিত, নিস্পন্দ, পাষাণ-জড়।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কৃত্তিবাস ও কাশীদাস।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যত গ্রন্থ দেখা যায়, কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত বিস্তৃত পাঠকমণ্ডলী কোন গ্রন্থেরই জুটে নাই। বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হৃদয়ে রামায়ণের কাহিনী মুদ্রিত আছে, কৃত্তিবাসের দুই চারি ছত্র সকলেই আওড়াইতে পারে। ঐশ্বর্য্য-বেষ্টিত স্বর্ণ সিংহাসনের পার্শ্বে দেখ, এক খণ্ড কৃত্তিবাসের পুঁথি আছে; মধ্যবিত্তের বৈঠকখানার কোণে রামায়ণ একখান থাকা চাই; এমন কি সামান্য দোকানদারের চাল ডালের হাঁড়ির মধ্য হইতেও রামায়ণ উঁকি মারে। বাঙ্গলা দেশে কৃত্তিবাসের রামায়ণের কথা যে জানে না, তাহার জাতি ঠাহরাইয়া উঠিতে পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। রামায়ণ না জানিলে বাঙ্গালীত্বের অসম্পূর্ণতা রহিয়া যায়।

কিন্তু রামায়ণ লইয়া কৃত্তিবাসের গৌরব করিবার কি আছে? তিনি ত বাল্মীকির মত নূতন রচনা করেন নাই। রাঁধা ভাতে তিনি কেবল ঘৃত ঢালিয়াছেন, লবণ মিশাইয়াছেন বৈ ত নয়। বাল্মীকির সমান তাঁহাকে কেহ বলে ও না—বাস্তবিক তিনি তাহা নহেনও। কিন্তু এই অপরাধে তাঁহার সকল যশ হরণ করা যায় না। তাঁহার গ্রন্থ বাল্মীকিগ্রন্থের অনুবাদ নহে—তাঁহাকে কতকটা নিজের মস্তিষ্ক খাটাইতে হইয়াছে। শুনা যায়, কথকতা হইতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ-সংগ্রহ। এই জন্য বঙ্গীয় কবি বাল্মীকি হইতে বিভিন্ন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে যে সকল সৌন্দর্য্য বর্ণনা আছে, তাহা অবিকল বাল্মীকির অনুরূপ নহে। তাঁহার রামায়ণের ঘটনা বিশেষও বাল্মীকি হইতে অনেক তফাৎ। প্রথমতঃ উভয়ের আরম্ভ এক নহে। কৃত্তিবাসের রত্নাকর ব্যাপার প্রাচীন ঋষি কবির গ্রন্থে নাই। অন্যান্য পুরাণের সাহায্যে কৃত্তিবাস আরও অনেক ঘটনা অম্লানবদনে রামায়ণের মধ্যে গুঁজিয়াছেন। কথকের রসিকতাও মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে। এই সকল কারণে বাল্মীকির রামায়ণ অপেক্ষা কৃত্তিবাসে আষাঢ়েরও কতকটা প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। লক্ষ্মণ সীতাকে গণ্ডি বেড়িয়া রাখিয়া যান, মূল-রামায়ণে বোধ করি একথা নাই। বাল্মীকি কপিপুঙ্গবকে ছদ্মবেশে রাবণের মৃত্যু-বাণ হরণ করিতে দেখেন নাই। রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব আদি-কবির অজ্ঞাত। এ সকলই কৃত্তিবাসের রচনা। রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব পুরাণ বিশেষেও অবশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে পুরাণ বাল্মীকি রচিত নহে।

কৃত্তিবাস যে সময়ের লোক, তাঁহার রচনায় তাহার বিশেষ প্রভাব আছে। সময়ের প্রভাব হইতে তিনি একেবারে মুক্ত নহেন। বাল্মীকিগ্রন্থ প্রাচীন সংস্কৃত ভারতের সম্পত্তি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ শুদ্ধ বাঙ্গলাদেশের। তাঁহার গ্রন্থে বাঙ্গালীত্ব যথেষ্ট। ইহা না থাকিলে তাঁহার গ্রন্থের বিশেষ মূল্য থাকিত কিনা সন্দেহ। তাঁহার নাম

তাহা হইলে হয়ত অনুবাদকের ফর্দ্দের এক প্রান্তে সাহিত্যানুসন্ধিৎসু কতিপয় ছাত্রের গুরুভার মস্তিষ্ক-পীড়নীস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিত। গ্রন্থের এরূপ বহুল প্রচার হইত বোধ হয় না।

কিন্তু বাঙ্গালীভাবে গ্রন্থের যে বিশেষ হানি হয় নাই তাহা নিশ্চিত বলা যায়। কৃত্তিবাস বেশ স্বাভাবিক। তবে দশমুণ্ড রাবণ, ষাণ্মাসিক নিদ্রাগ্রস্ত কুম্ভকর্ণ, এ সকল অসম্ভব কল্পনার জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। এগুলি তিনি বাল্মীকির নিকট হইতে শুনিয়াছেন। সে কালে জম্‌কালো অসম্ভব বর্ণনা ফেসান ছিল—অদ্ভুত ব্যাপার নহিলে লোকে সহজে আকৃষ্ট হইত না। যোজন হস্ত, দ্বিযোজন পদ তখনকার লোকের কল্পনায় অভ্যস্ত ছিল। সম্ভব অসম্ভবের প্রতি এখনকার মত লক্ষ্য থাকিলে অনেক কেতাবেরই যশঃ সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইতে পারিত না। মানব অপেক্ষা দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, ঘোটক-বদন, লম্বোদরবর্গের সেকালে প্রভুত্ব খাটিত। এখন কল্পনা সংযত হইয়া আসিয়াছে—অসংযত অসম্ভব কল্পনার দিনকাল গিয়াছে।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুকুন্দরামের সমকালীন কবি। বাঙ্গলা সাহিত্যে পূর্ণ পৌরাণিক প্রভাব মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস হইতেই একরূপ আরম্ভ বলা যায়। কৃত্তিবাস কবির ভাষা পড়িয়া কিন্তু মুকুন্দরামের বাঙ্গলাপেক্ষা অনেক সময় ভাল লাগে। তাহার একটা কারণ বোধ হয়, কৃত্তিবাসে মুণ্ডিত-মস্তক দীর্ঘশ্মশ্রুবর্গের জবাই-দক্ষ ছুরিকা-ভাষার বড় তীব্র কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাসের খাঁটী ভাষা পাওয়াও এখন বড় দুরূহ। সংশোধক পণ্ডিতদিগের জ্বালায় কৃত্তিবাসের শব্দ-ছন্দ এখন অনেকটা অক্ষরচ্ছন্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভালবাসার আতিশয্যে কৃত্তিবাসকে তাঁহারা মাজিয়া ঘষিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু নগ্ন সৌন্দর্য্য হারাইয়া কৃত্তিবাস কৃত্তিবাসত্ব হইতে যে কতটা বঞ্চিত হইলেন তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখেন নাই। যাঁহারা কৃত্তিবাসের ভাষার নমুনা দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এ কথা বিশেষরূপে বুঝাইতে হইবে না। পরচুলায় মুখশ্রী বুঝিবার পক্ষে যে বিশেষ হানি করে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

রামায়ণের গল্পের উল্লেখ এখানে আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় না। সীতা হরণ, রাবণ বধ, সীতারবনবাস বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট অপরিচিত নহে। নব্য সম্প্রদায়ের কেহ কেহ হয়ত কৃত্তিবাস নাও পড়িয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু রামায়ণের গল্প সম্বন্ধে তাঁহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে অনুমান করা যাইতে পারে। যাত্রায়, নাট্যশালায়, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে রামায়ণের ছিটাফোঁটা অল্পবিস্তর আছেই। তথাপি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দি,

"আদ্যকাণ্ডে রামজন্ম বিবাহ সীতার।
অযোধ্যায় বনবাস ত্যজি রাজ্যভার॥

অরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরিল রাবণ।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেতে হয় সুগ্রীব মিলন॥
সুন্দরাকাণ্ডেতে হয় সাগর বন্ধন।
লঙ্কাকাণ্ডে উভয় পক্ষের মহারণ॥
উত্তরাকাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডের বিশেষ।
সীতাদেবী করিলেন পাতালে প্রবেশ॥
এই সুধাভাণ্ড সাতকাণ্ড রামায়ণ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত করেন সমাপন॥"

কৃত্তিবাস-রামায়ণের চরিত্রগুলি মূল রামায়ণেরই অনুরূপ। না হইবেই বা কেন? কৃত্তিবাস ত আর বাল্মীকিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া আপনাকে খাড়া করিয়া তুলিতে চাহেন না। সহজ ভাবে সহজ ভাষায় দেশের সাধারণের নিকট বাল্মীকির সৌন্দর্য্য প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। বাস্তবিক, কৃত্তিবাসের আত্মপ্রকাশাভিলাষ তাহার তুলনায় নাই বলিলেও চলে। তবে ঘটনাচক্রে অজ্ঞাতসারে দু'একটী চরিত্র অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে মূলে বড় প্রভেদ হয় নাই। ঘটনা বিশেষের পরিবর্ত্তনে চরিত্র-পরিবর্ত্তন বোধ হয় মাত্র। বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন তাহা নহে।

যাহা হউক, কৃত্তিবাসের কথা আর অধিক বলা অনাবশ্যক। তাঁহার রামায়ণ পড়িয়া যে সুগভীর তৃপ্তি তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গলা সাহিত্যের মহাকাব্যের মুখ রক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই আমরা কৃত্তিবাসকে বড় বলিতেছি না, তাঁহার রামায়ণ আমাদের সাহিত্যের গৌরব ত বটেই, তাহা ভিন্ন আমাদের ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত করিবারও কারণ। সীতার নিষ্কাম পবিত্রতার কাহিনী দরিদ্র স্বামী পীড়নী অলঙ্কার গত-প্রাণা বঙ্গরমণীকে অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে, অনেক স্বামীকে দিবানিশি গৃহিণীর সম্মার্জ্জনী সপ্‌সপানি ও কটাক্ষ-কুঞ্চিত তারকণ্ঠ জিহ্বা-আস্ফালনী-বিদ্যার মহিমানুভব হইতে বঞ্চিত করিয়া শান্তি দিয়াছে। রামচন্দ্রের একপত্নী-নিষ্ঠা সহস্র-একীকরণ-মত্ত দারপরিগ্রহশীল পিতাকে দুর্দ্দম্য প্রণয়াবেগ ও অধীর পরিণয়াকাঙ্ক্ষা হইতে রক্ষা করিয়া অনেক সতী সাধ্বীর মর্য্যাদা এবং মাতৃহীনের সান্ত্বনা রাখিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, মহিষী-সমাচ্ছন্ন দশরথের শেষ দশা অনেক বঙ্গ পরিবারের বিশেষ শিক্ষার স্থল। এ সকল শিক্ষা অবশ্য কৃত্তিবাসের স্বপ্রদত্ত নহে, কিন্তু তাহাতে যায় আসে কি? বাল্মীকির উপদেশগুলি বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রচার করিয়াছেন তিনিই ত বটে। সে জন্য কৃত্তিবাসের নিকট আমরা বিশেষ ঋণী।

এখন কথা এই যে, কৃত্তিবাস কিরূপ ধরণের কবি? সেকালে পদ্যই একমাত্র সাহিত্য ছিল, এবং পয়ার-ত্রিপদী-দীর্ঘত্রিপদী-রচয়িতারাই কবি ছিলেন। সুতরাং কৃত্তিবাস সে কালের হিসাবে একজন উচ্চ দরের কবি। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা কবির মধ্যে যে

অসাধারণ প্রতিভা দেখিতে চাহি, যে সুগভীর ভাবপ্রবাহ অনুসন্ধান করি, কৃত্তিবাসে তাহা কোথায়? পুরাণ-প্রভাবীকৃত কৃত্তিবাস মৌলিকতা যশাকাঙ্ক্ষা-বিহীন। আমরা সে জন্য ব্যস্ত নহি। সেকালের বঙ্গসাহিত্যে ভাবের তরফে বৈষ্ণব কবিরাই যাহা আছেন। তেমন আর কৈ? পুরাণ প্রভাবীকৃত মুকুন্দরামই বল, আর কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠ কৃত্তিবাসই বল। মুকুন্দরামের সৌন্দর্য্য-সামঞ্জস্য-জ্ঞান কমলে-কামিনীর গজাহার-কল্পনাতেই ধরা দিয়াছে। আর কালকেতুর বর্ণনা ত কুম্ভকর্ণ অপেক্ষা বিশেষ স্বাভাবিক নহে। অধিকন্তু, গাম্ভীর্য্যের অভাব।

কৃত্তিবাসের পর বঙ্গীয় মহাকাব্যের মুখ রক্ষা করিয়াছেন কাশীরাম দাস। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মত সম-সাময়িক কবি ইহাঁরা নহেন, তেমন সমবিষয়িক কবিও নহেন। কিন্তু বিষয় এক না হইলেও কাছাকাছি কতকটা বটে। এক জনের রামায়ণ, আর এক জনের মহাভারত। দুইখানি গ্রন্থই বঙ্গীয় পাঠকসমাজে সুপরিচিত ও সমাদৃত। সমাদৃত হইবার মতনও বটে। বিষয়ের মহত্ত্ব হিসাবেই দেখ, রচনার সৌন্দর্য্য হিসাবেই দেখ, আর প্রাণস্পর্শী ধর্ম্মভাবের দিকেই দেখ, দুইখানি গ্রন্থেই নিন্দনীয় বিশেষ কিছু নাই। যথার্থই,

"কৃত্তিবাস কহে কথা অমৃত সমান।
রাম নাম বিনা যার মুখে নাহি আন॥"
"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥"

রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারত বৃহৎ ব্যাপার। বাল্মীকির রামায়ণের অনেক পরে ব্যাস মহাভারত রচনা করিতে বসেন। তখন সূর্য্যবংশের দিন কাল গিয়াছে, চন্দ্রবংশ ভারতের মধ্যে প্রভাবশালী। ব্যাস বাল্মীকির অনুকরণ করিয়াছেন কি না, আমাদের দেখিবার আবশ্যক নাই। অনুকরণ হইলেও তাঁহার মৌলিকতা যথেষ্ট। কিন্তু মহাভারতের কাল যে রামায়ণের অনেক পরে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ বাল্মীকির রচনা ব্যাসের রচনাপেক্ষা সরল। তাহার পর মহাভারতের সময়ে যেরূপ জটিল রাজনীতি, লেখা পড়ার চর্চ্চা, রামায়ণের সময়ে সেরূপ কিছুই নাই। বাল্মীকির রামায়ণের মধ্যে লেখার কথা আছে এমন মনে পড়ে নাত। মহাভারতের প্রথমেই গণেশের লেখনীর কথা। রামায়ণে কৃষ্ণের মত নীতিবিদ্ই বা কোথায়? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের মত ব্যূহ-রচনাদক্ষ সেনাপতিকুলই বা কোথায়? তখন সকল বিষয়ই অনেকটা সাদাসিধা ছিল। মহাভারতের আমলে উত্তরোত্তর সকল সমস্যাই জটিল হইয়া উঠিতেছে।

আমাদের বাঙ্গলা দেশেও প্রথমে রামায়ণ রচিত হয়, পরে মহাভারত। কিন্তু তাহা দেখিয়া কৃত্তিবাসের সমাজের অবস্থার সহিত কাশীরাম দাসের সমাজের প্রভেদ

ছিল কি না বলা দায়। কাশীরাম দাসও কৃত্তিবাসের মত মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করেন নাই। কিন্তু কৃত্তিবাস, কাশীদাস উভয়েরই চরিত্রগুলি মূল গ্রন্থের অনুরূপ ত বটে। সেই জন্য কৃত্তিবাস, কাশীদাস পড়িয়াও বাল্মীকি, ব্যাসের সমাজের কথা বলিবার সুবিধা।

মহাভারতের প্রধান প্রধান স্ত্রীচরিত্র অপেক্ষা রামায়ণের প্রধান স্ত্রীচরিত্রগুলি উচ্চদরের। কুন্তীই বল, আর দ্রৌপদীই বল, সীতার পার্শ্বে বসিবার মত কেহই নয়। কৌশল্যা, কৈকেয়ীর পার্শ্বেও কুন্তী দাঁড়াইতে পারেন না। তবে দময়ন্তী, সাবিত্রী, সীতার পার্শ্বে বসিতে পারেন বটে। কিন্তু এ দুইটী চরিত্র মহাভারতের মধ্যে উপাখ্যান মধ্যে স্থান পাইয়াছে উঠাইয়া লইলেও মূলে বিশেষ কিছু যায় আসে না। সীতার মত শান্ত সংযত অথচ স্বাভাবিক ভাব কিন্তু কোনও চরিত্রেই নাই। সাবিত্রী দময়ন্তীকে পতিব্রতা পতিপ্রাণা অস্বীকার করিবার যো নাই, তথাপি সীতার মত ইহাঁদের চরিত্র ফুটে নাই।

রামায়ণের সহিত মহাভারতের কতকগুলি চরিত্রে বেশ মিল বুঝা যায়। অর্জ্জুনের সহিত লক্ষ্মণের চরিত্রের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। দুই জনেরই প্রগাঢ় ভ্রাতৃপ্রেম, দুই জনেরই বীরত্ব, দুই জনের জীবনেই প্রায় এক কারণে বনবাস। রাম ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যেও সামান্য সাদৃশ্য অনুভব হয়, তবে লক্ষ্মণ অর্জ্জুনের মতন নয়। বিভীষণ আর বিদুর কতক এক রকম। ন্যায় লইয়াই ইহাঁদের কারবার। অন্যায় দেখিলে উভয়েই জ্বলিয়া উঠেন। দুর্য্যোধনে রাবণে তেমন সাদৃশ্য নাই। দুর্য্যোধন অপেক্ষা রাবণ লোক ভাল। রাবণ গুণী, মানী, বীর, দুর্য্যোধন অপেক্ষা শতগুণে উন্নত-প্রকৃতি। তবে দোষ কাহার নাই? রাবণেরও অনেক দোষ অবশ্য ছিল—প্রধানতঃ অহঙ্কার। রামায়ণে আর যাহাই থাকুক, মহাভারতের একটী চরিত্র অভাব আছে—ভীষ্মদেব। ভীষ্মকে মহাভারত বৈ আর কোথাও দেখা যায় না। ভীষ্ম মহাভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব।

ঘটনা-বিষয়েও রামায়ণে মহাভারতে সাদৃশ্য বিস্তর। সীতা উদ্ধারের জন্যই রামের লঙ্কাজয়, রাবণবধ, কিন্তু সীতাকে পাইয়াও রাম উপভোগ করিতে পারিলেন না। পাণ্ডবেরাও রাজশ্রীর জন্যই কুরুকুল ধ্বংস করিলেন, কিন্তু রাজ্যলাভ করিয়া সকলই শূন্য মনে হইল—যাহার জন্য জীবনের সকল সুখ স্বচ্ছন্দ বিসর্জ্জন দিলেন, হাতে পাইয়া তাহা ভোগ করিতে মন উঠে না। ইহা ভিন্ন মধ্যে মধ্যে খুঁটিনাটি ঘটনার সাদৃশ্যও বড় অল্প নহে। হরধনুভঙ্গে সীতালাভ; সুদর্শন-চক্রভেদ ব্যাপারে দ্রৌপদীলাভ। মৃগভ্রমে মুনিপুত্র বধ করিয়া দশরথ শাপাক্রান্ত; মৃগরূপী মুনির নিধনে পাণ্ডু শাপাক্রান্ত। উভয়েরই মৃত্যুকারণ মুনিশাপ। বিমাতার চাতুরী বুঝিয়াও রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থে বনগমন করিলেন; যুধিষ্ঠিরাদিও কপট দ্যূত-ক্রীড়ায় হারিয়া সত্য পালনার্থে বন গমন করিলেন। কৈকেয়ী ভাবিয়াছিলেন, চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস

করিতে হইলে রামচন্দ্রকে বুঝিবা ভববাস উঠাইতে হয়, ভরতের পক্ষে তাহা হইলে রাজ্য-সুখ ভোগের পথ নিষ্কণ্টক; কুরুকুলও ঠাহরাইয়াছিলেন, দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে কাটাইতে হইলে পাণ্ডবেরা নাও টিঁকিতে পারেন, দুর্য্যোধন তাহা হইলে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। রাজ্য বঞ্চিত হইবার জন্যই উভয়ের বনবাস। কপালগুণে উভয় পক্ষেরই নিকটে যম ঘেঁষিতে সাহস করে নাই। অরণ্যে রাবণ সীতাহরণ করেন; জয়দ্রথ দ্রৌপদী হরণ করেন। তবে জয়দ্রথকে ভীমার্জ্জুনের হস্তে পড়িয়া বাপ্ বাপ্ বলিতে হইয়াছিল, তাই আশানুরূপ ফল ফলে নাই। এইরূপে রামায়ণে মহাভারতে ঘটনা-সাদৃশ্য বড় অল্প নহে। কিন্তু তাহা লইয়া আর অধিক নাড়াচাড়ায় কাজ নাই — রামায়ণ, মহাভারতের কথায় কৃত্তিবাস, কাশীদাস চাপা পড়িয়া যান বুঝি।

কৃত্তিবাসের কথা যথেষ্ট বলা হইয়াছে, নূতন বলিবার আর বিশেষ কিছু নাই। কাশীরাম দাস সম্বন্ধেই বা আর বলিব কি? উভয় কবিরই রচনা পয়ার-ত্রিপদী সমাচ্ছন্ন। ভাবপ্রবাহ তেমন নাই। আর ঘটনা ও চরিত্র তাহাও ত নিজের নূতন সৃষ্টি নহে। সে জন্য বাল্মীকি, ব্যাস পশ্চাতে আছেন। কাশীদাসের জীবনী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য। আদিপর্ব্বের শেষভাগে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কেবল তাঁহার বাসগ্রাম ও কুলসংবাদ জানা যায়।

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধিগ্রামে।
প্রিয়ঙ্কর দাসপুত্র সুধাকর নামে॥
অনুজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠভ্রাতা॥
কাশীদাস কহে কথা সাধুর চরণে।
হইবে নির্ম্মল জ্ঞান শুন এক মনে॥"

যাহা হৌক, কাশীদাসের জীবনী লইয়া আর মাথা না ঘামাইয়া মহাভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে দুই চারি কথা বলিয়া শেষ করা যাক্। কৃত্তিবাস যেমন ভাষা-রামায়ণ লিখিয়া সহজভাবে দেশের মধ্যে বাল্মীকির উপদেশ প্রচার করিয়াছেন, কাশীরাম দাসও সেইরূপ বঙ্গভাষায় মহাভারত রচনা করিয়া সহজে সর্ব্বসাধারণের নিকট ব্যাসের উপদেশ প্রচার করিয়াছেন। কিরূপে জ্ঞাতিবিরোধ আরম্ভ হয় এবং তাহার ফল কিরূপ, মহাভারতের মত উজ্জ্বল বর্ণে বোধ করি তাহা কোনও পুস্তকে চিত্রিত হয় নাই। একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায়, বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে প্রতিদিন এই কুরুপাণ্ডবদ্বন্দ্বাভিনয় চলিয়াছে। কুণ্ডলীকৃত জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে দুর্য্যোধন শকুনির প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইলেই কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যায়। শকুনি-মন্ত্রী

দুর্য্যোধন পিতৃহীন পাণ্ডবদিগকে যদি লাঞ্ছনা করিবার চেষ্টায় না ফিরিয়া মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেন, ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের মায়ায় অভিভূত হইয়া পুত্রের ক্রূর চরণে যদি আপনার ধর্ম্মবুদ্ধিকে বলি না দিতেন, তাহা হইলে ভারতের বীরকুল কি আর অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত? কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়? হিংসা-দৃপ্ত লোভ যখন জ্ঞাতি-ছদ্মবেশে দেখা দেয়, তখন সেখানে কি মঙ্গল থাকিতে পারে? ক্রূরকর্ম্মা দুর্য্যোধনের উৎপীড়নে সহিষ্ণু যুধিষ্ঠিরও স্থির থাকিতে পারেন নাই। বনবাস দিয়াও দুর্য্যোধনের আশ মিটে নাই। পাণ্ডবদিগকে অপমানিত অভিশপ্ত দেখিবার জন্য সহস্র অনুষ্ঠান! কেবলই ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া পাণ্ডবেরা জয়শীল। শ্রীকৃষ্ণের মত বন্ধু না পাইলে তাঁহাদের যে কি দশা হইত কে বলিতে পারে? ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা চিরদিন আপনার জ্বালায় জ্বলিয়া মরিয়াছেন, তাহার উপর যুদ্ধে ত পরাজয় হইলই। সিংহাসনে বসিয়াও তাঁহাদের মুহূর্ত্তের তরে শান্তি ছিল না, পাণ্ডবদিগকে হিংসা জ্বালায় জ্বালাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইতে হইয়াছে। দুই একবার বিপদে পড়িয়া পাণ্ডবদিগের দ্বারাই মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তাহাতে অশান্তি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে বৈ হ্রাস হয় নাই। কিন্তু অরণ্য মধ্যেও পাণ্ডুপুত্রদিগের শান্তি ছিল। তাহারা ফলমুল যাহা পাইতেন মাতা ও স্ত্রীর সহিত পরিতৃপ্ত হৃদয়ে আহার করিতেন। সুখ-জ্বালায় তাঁহাদিগকে জ্বলিতে হয় নাই। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও যে তাঁহারা রাজ্য-লোভ সম্বরণ করিলেন, সে কেবল এই শান্তি টুকুর জন্য।

রামায়ণ, মহাভারত হইতে আমরা মানব-চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করি। বিশেষতঃ মহাভারতে যেরূপ চরিত্র-বৈচিত্র্য দেখা যায়, এমন আর কোনও গ্রন্থে মিলে কিনা সন্দেহ। খুঁটিনাটি অঙ্গ বাদ দিয়া সাধারণ ভাবের দুএকটী বেশ শিক্ষা পাওয়া যায়। উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছি। রামায়ণ দেখাইয়াছে, রাজা দশরথ সসাগরা ধরিত্রীর সুশৃঙ্খল শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিয়াও অন্তঃপুরের সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, এই জন্য তাঁহার নিষ্কলঙ্ক বংশের কলঙ্ক রটিয়াছে, তাঁহার রাজ্যেও বিশৃঙ্খল বাধিত, কেবল সুগভীর ভ্রাতৃপ্রেম তাহা ঘটিতে দেয় নাই। মহাভারত দেখাইয়াছে, ধৃতরাষ্ট্র বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ হইয়াও অতিরিক্ত মায়াবশতঃ পুত্রবর্গের কাল হইয়াছেন, পুত্রশাসন-অক্ষমতাই তাঁহার কুলনাশের প্রধান কারণ। ইহাতে আমরা দেখিতেছি যে, বহিঃশাসনক্ষমতা সকল সময়ে অন্তঃশাসন-ক্ষমতার পরিচয় নহে। রাবণ ও দুর্য্যোধনের চরিত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, শাস্ত্রজ্ঞান ও ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান সংযম ও জ্ঞাতি-বঞ্চন-বিদ্যা-বিহীনতার প্রমাণ নহে। একই হৃদয় একই বিষয়ে বিপরীত ব্যবহার করে। এই জন্য মানব চরিত্র বুঝা বড় দায়।

মহাভারতের অনেকগুলি উপাখ্যান অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত আকারে আমাদের আষাঢ়ে গল্পের কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। বস্তুতঃ কাশীরাম দাসই তাহার মূল কারণ।

সে কালের কথক ঠাকুরেরাও তাহার কারণ হইতে পারেন। কিন্তু কারণ যাহাই হৌক, ইহাতে ফল অবশ্য ভাল বৈ মন্দ নহে। সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগের হৃদয়-গঠনে আষাঢ়ে গল্প যথেষ্ট সহায়তা করে। সেই আষাঢ়ে গল্পে যদি ধর্ম্মভাব মাখান থাকে, তাহা হইলে শিশুহৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত করিবার কি কম সুবিধা? কিন্তু এখানে আর আষাঢ়ের কথা নয়। কাশীরাম দাস মহাভারত শুনিতে আহ্বান করিতেছেন, "হইবে নির্ম্মল জ্ঞান শুন এক মনে।" সজ্জন পাঠকেরা মহাভারত শুনিতে থাকুন, আমরা জনতার মধ্যে গাঢাকা হই।

শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ পরমহংস দেবের জীবন চরিত্র

বাল্য গৃহ ত্যাগ।

এই সুখ-দুঃখময় মর্ত্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবনারায়ণ দেবের বয়ঃক্রম যখন ৫ বৎসর হইল তখন হইতে তাঁহার মনে সর্ব্বদা এই ভাব উদয় হইতে লাগিল যে আমি কে? আমার স্বরূপ কি? এবং—শুনিতে পাই সকলে বলেন পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু আছেন—তাঁহাকে ভজনা করিতে হয়; তাঁহার স্বরূপ কি? আমি কি স্বরূপ হইয়া তাঁর কি স্বরূপের ভাবনা এবং উপাসনা করিব? তাঁর উপাসনা করিলে কি হয় এবং না করিলেই বা বা কি হয়? আমি এতদিন কোথা ছিলাম কোথা হইতে আসিয়াছি এবং কোথা যাইতে হইবে? আমার কি করা কর্ত্তব্য? এবং যাঁহার গৃহে আমি শরীর ধারণ করিরাছি সেই মাতা পিতা আমার এই শরীর (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি) নির্ম্মাণ করিয়াছেন না অন্য কেহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন? কিম্বা আমি নিজে আপনার শরীরকে নির্ম্মাণ করিয়া শরীর ধারণ করিয়াছি? যদি আমি নিজে এই শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদিকে রচনা করিয়া থাকিতাম তাহা হইলে আমার মনে থাকিত কিন্তু আমার তো মনে নাই যে আমি রচিয়াছি। যদ্যপি আমি এই সকল রচিতাম তাহা হইলে আমিই নষ্ট করিতে পারিতাম। তবে আমার ভ্রম কেন? তিনি এই ভাবিতে ভাবিতে যে মাতার উদরে শরীর ধারণ করিয়াছেন, সেই মাতা—যাঁহার নাম গঙ্গাদেবি—তাঁহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে মাতঃ আপনি আমার এই শরীর ইন্দ্রিয়াদি নির্ম্মাণ করিয়া উদরে ধারণ করিয়াছেন না অপর কেহ নির্ম্মাণ করিয়া আপনার উদরে রাখিয়া দিয়াছেন? যদি অপর কেহ রাখিয়া থাকেন তবে সে ব্যক্তি কোথায়? আমি আপনার নিকট আমার মনের কোন কপটতা প্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি না। কেন যে আমার মনের ভাব এরূপ হইতেছে তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। কোন্

ব্যক্তি যে আমার অন্তর হইতে এরূপ ভাব উদয় করাইয়াছেন, হে মাতঃ তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। মাতা বিচার না করিয়া বলিলেন যে আমার কুলে এই বয়সে পাগল পুত্র জন্মাইল। তখন তাঁহার নিকট তাঁহার মধ্যম পুত্র বসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ। তাঁহাকে মাতা বলিলেন যে, "হে পুত্র তুমি তোমার পিতাকে বাহির হইতে ডাকিয়া আন। তিনি আসিয়া দেখুন যে তাঁহার পুত্রের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে। পিতার নাম ব্যাসদেব। তিনি বাটীতে আসিয়া কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন ও গঙ্গাদেবী তাঁহাকে সকল অবস্থা বলিয়া দিলেন। পিতা ব্যাসদেব ভাবিলেন যে, পুত্রের অবস্থা বড় ভালও দেখিতেছি না বড় মন্দও দেখিতেছি না"—এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার পুত্র শিবনারায়ণকে ধমকাইয়া দুই এক চড় দিয়া বলিলেন যে, "এখন হইতে তুমি কি পাগলামি আরম্ভ করিয়াছ? এখন হইতে তোমাকে প্রত্যহ পাঠশালায় পড়িতে যাইতে হইবে এবং ওঁ সং গুরু এই মন্ত্র জপ করিতে হইবে এবং অগ্নিতে নিত্য আহুতি দিতে হইবে। এবং প্রাতে ও সায়ং কালে উঠিয়া চন্দ্রমা এবং সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিবে ও হাত জুড়িয়া নম্রভাবে জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে বলিবে যে হে জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা আমার সকল অজ্ঞানতা দুঃখ মোচন করিয়া জ্ঞান প্রদান করুন যাহাতে আমি সর্ব্বদা আত্মা পরমাত্মাতে অভেদ জ্ঞান করিয়া সদা পরমানন্দে থাকি। এই সকল কথা শিবনারায়ণ পিতার কাছে শুনিয়া পিতার আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন। উঁহার জপিতে এবং আহুতি দিতে ও জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে নমস্কার করিতে স্বামি-জি'র যত প্রীতি হইত বিদ্যাভ্যাসে তত প্রীতি হইত না এবং ক্রমে ক্রমে ভিতর হইতে তেজ এবং জ্ঞান প্রকাশ হইতে লাগিল এবং আনন্দ উদয় হইতে লাগিল। বিদ্যাভ্যাস না করাতে শিক্ষক মধ্যে মধ্যে মারিতেন এবং বলিতেন যে বড় মূর্খ ছেলে। শিবনারায়ণ দেব মনে মনে বলিতেন যে, "বিদ্যাভ্যাসের তো এই সকল প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে তিনি আমার মনের ভাব না বুঝিয়া আমাকে মারিতেছেন ও মূর্খ বলিতেছেন। কেবল বিদ্যাভ্যাসের তো এই ফল দেখিতে পাইতেছি সকলে পণ্ডিত বলিয়া সম্মান করিতেছেন এবং ব্যবহার কার্য্যে কিসে দশ টাকা উপার্জ্জন হইবে তাহার চেষ্টা করিতেছেন এবং অহংকার প্রযুক্ত আমি পণ্ডিত আমি ধনী বলিয়া আপন আপন মহত্ত্ব দেখাইতেছেন কিন্তু পরমার্থ বিষয়ে কি চেষ্টা করিতেছেন? এই তো দেখিতে পাইতেছি যে যিনি বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন তিনিও আহারাদি করিতেছেন এবং প্রাণ ত্যাগ করিতেছেন এবং যে ব্যক্তি বিদ্যাভ্যাস না করিতেছেন তিনিও আহারাদি করিতেছেন এবং তাঁহারও প্রাণত্যাগ হইতেছে কিন্তু দেখিতে পাইতেছি যে ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন তিনি সৎ অসতের বিচার করিয়া ব্যবহার কার্য্য উত্তম রূপে চালাইতেছেন। ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক বিষয় বুঝা যায় এই জন্য বিদ্যা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য কিন্তু

যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা না করে তাহার সৎ অসতের বিচার না থাকাতে কষ্ট ক্লেশে ব্যবহার কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এই জন্য বিদ্যা শিক্ষা আবশ্যক, তবে যাঁহার অন্তর হইতে বিদ্যা প্রকাশ হইয়াছে তাঁহার আর বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যক করে না। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে কোন কোন বিষয়ে বিদ্বান এবং মূর্খের স্বরূপে একই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। মূর্খ ব্যক্তির যেমন আদি জন্মের অবস্থার স্মরণ নাই, আমি কে ছিলাম এবং শেষের মৃত্যুর অবস্থার অর্থাৎ কখন মৃত্যু হইবে তাহারো কোনও জ্ঞান নাই, এবং যখন প্রত্যহ গাঢ় নিদ্রা যাইতেছেন, তখনও তাঁহার স্মরণ থাকে না যে আমি মূর্খ কি পণ্ডিত, পণ্ডিতেরও এই একরূপই দশা। শিবনারায়ণ দেবের মনে এইরূপ ভাব সর্ব্বদা উদয় হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে যখন তাঁহার ৮৷৯ বয়ঃক্রম হইল তখন তাঁহার পিতা মাতা তাঁহার যজ্ঞোপবীত দিলেন। শিবনারায়ণ আপনার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে "কি যন্ত্রণা। পিতা মাতা কেন আমাকে পশুর মতন গলায় সুতা লাগাইয়া বন্ধন করিলেন। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর তিনি তো এই যজ্ঞোপবীত দেন নাই। তিনি যদ্যপি যজ্ঞোপবীত দিতেন এবং যদি তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হইত তবে তিনি আমার যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বানাইয়াছেন সেইরূপ যজ্ঞোপবীত ও আমার শরীর একত্রে গঠন করিয়া জন্ম দিতেন এবং কেহ কোনো জ্ঞানবান পুরুষকেও এরূপ জালে আবদ্ধ করিতে পারিবেন না। এ সকল ব্যাপার কেবল সামাজিক নিয়মের একটি চিহ্নমাত্র। যেমন এক একটী সাধু আপন আপন সমাজের এক একটী চিহ্ন রাখে যাহাতে জানা যায় যে এই সমাজের এই সাধু। কিন্তু যদি উপরের নানা সাজ ফেলিয়া স্বরূপতঃ স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে একই দাঁড়ায়।" এই সমস্ত বিষয় শিবনারায়ণ মনে মনে বুঝিয়া আপন অন্তরেতেই গোপন রাখিলেন কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না, কেন না অবোধ ব্যক্তিদের নিকট বলিলে তাহারা না বুঝিয়া উপহাস করিবে এবং মনে মনে কষ্ট অনুভব করিবে।

শিবনারায়ণ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে. "এখন যজ্ঞোপবীত থাকুক না কেন, পরে দেখা যাইবে; আসল সার যে পরমার্থ বিষয়ের কার্য্য তাহা করা যাউক। এই ভাবিয়া তিনি সদা সর্ব্বদা পরমার্থ বিষয়ক কার্য্য করিতে লাগিলেন, এবং যখন এদিক ওদিক কোন স্থানে শুনিতেন যে সে স্থানে এক মহাত্মা বা সন্ন্যাসী আসিয়াছেন তখন মনে মনে বিচার করিতেন যে "বড় মহাত্মা সন্ন্যাসী কাহাকে বলে, তাহার স্বরূপ কি?" যে স্থানে সাধু মহাত্মার কথা শুনিতেন সেই স্থানেই তিনি যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতেন যে, 'মহাত্মা সাধুটা কি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে সমস্ত সাধুদের দেখা যায় সে সকল ত গৃহস্থদেরও আছে। যদ্যপি শরীরের নাম বা ইন্দ্রিয়ের নাম সাধু মহাত্মা হয় তাহা হইলে সে সকলও গৃহস্থদের আছে; তাহারাও কেন সাধু না হয়? কিম্বা যদি হাড় মাংস রক্ত সাধু হয় তাহা হইলে তাহাও তো গৃহস্থদের মধ্যে আছে কিম্বা যদি বাক্য

সাধু হয় তাহা হইলে গৃহস্থেরাও তো বাক্য বলিতেছে। যদ্যপি বিভূতি (অর্থাৎ ছাই) গায়ে মাখিলে সাধু হয় তাহা হইলে তো শূকর মহিষ সকল কত ছাই কাদা মাখিয়া থাকে তাহা হইলে তো উহারাও সাধু সন্ন্যাসী হইতে পারে। কিম্বা যদি মস্তকে জটা থাকিলে সাধু হয় তাহা হইলে তো বট বৃক্ষের বড় বড় জটা বাড়িতেছে—সেও তবে মহাত্মা সন্ন্যাসী। তবে যাহাকে যে বলে মহাত্মা সাধু তাহা কি লাল, কালো, পীত, না সাদা ?" ইহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কোন এক মহাত্মা সাধুর নিকট চুপ করিয়া কেবল বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। যখন সকলে সাধুর নিকট হইতে আপন আপন বাটি চলিয়া যাইত তখন শিবনারায়ণ প্রীতিপূর্ব্বক করযোড়ে সাধুকে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, "হে মহাত্মা আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমার মনের যে নানা প্রকার ভ্রম ও সংশয় উঠিতেছে তাহা আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন। আপনাকে সকলেই সন্ন্যাসী মহাত্মা বলে, কিন্তু কেন বলে এবং মহাত্মা কি বস্তু ?" মহাত্মা ক্রোধ প্রযুক্ত বালক শিবনারায়ণকে লাঠি লইয়া মারিতে উঠিলেন এবং গালি দিয়া ২।১ চড় মারিয়া বলিলেন যে, তিন দিনের বালক গৃহস্থ হইয়া আমার সহিত ঠাট্টা করিতেছিস্ ? শিবনারায়ণ তাঁহাকে কত বুঝাইলেন তাহা শুনিয়া শিবনারায়ণকে ২।১ কিল মারিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন এবং শিব নারায়ণের পিতার কাছে মহাত্মা যাইয়া বলিলেন যে আমাকে আপনার পুত্র শিবনারায়ণ বড়ই অন্যায় কথা বলিয়াছে। পিতাও শিবনারায়ণকে ২।১ কিল মারিয়া বলিলেন, "তুমি এমন মহাত্মাকে অন্যায় কথা বলিয়াছ তুমি দূর হইয়া যাও তোমার মরণ ভাল। শিবনারায়ণ এইরূপ অবস্থাপন্ন মহাত্মার কাছে যেখানে যেখানে গিয়াছেন সেখানেই তাঁহারা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন কিন্তু যথার্থ মহাত্মা এক একজন—যিনি শান্ত ধীর গম্ভীর নিষ্ঠাবান্ ভক্তিমান ন্যায়পর দয়া ও সন্তোষযুক্ত ও মিষ্টভাষী—এমন অবস্থাপন্ন পুরুষের কাছে গিয়া শিবনারায়ণ ঐরূপ জিজ্ঞাসা করায় ঐ সকল যথার্থ মহাত্মারা মিষ্টবাক্যে আদর করিয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন, "এরূপ প্রশ্ন করিতে তোমাকে কে শিখাইয়া দিয়াছে, তাহা আমাকে বল, তাহা হইলে তোমাকে আমি বুঝাইয়া দিব; তুমি কি কার্য্য করিতেছ ? শিবনারায়ণ বলিলেন যে, আপনাকে যথার্থ বলিতেছি আমাকে কেহ শিখাইয়া দেয় নাই—আমার অন্তর হইতে এই সকল ভাব উদয় হইতেছে। কে যে আমার অন্তর হইতে এই সকল ভাব উদয় করিতেছে তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না কিন্তু আমি নিত্য কর্ম্ম এই করি—নিত্য অগ্নিতে আহুতি দেই এবং চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরকে আত্মা মাতা পিতা গুরু ভাবিয়া অন্তরেতে তাঁহাকে নমস্কার করি এবং ওঁ সৎগুরু এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উপাসনা করি ইহা ব্যতীত আর কোন প্রপঞ্চ অর্থাৎ মিথ্যা কল্পনা আমি করি না। তখন সাধু মহাত্মা বলিলেন যে, "হে শিবনারায়ণ যখন তোমাকে এই সকল কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে বলে নাই

তোমার অন্তর হইতে উঠিতেছে তখন তোমাকে আমি বুঝাইতে পারিব না—তুমি স্বয়ং আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবে; তোমাকে হাজার হাজার বার আমার নমস্কার—যে কুলে তুমি শরীর ধারণ করিয়াছ সে কুলে আমার নমস্কার।" শিবনারায়ণও মহাত্মাকে নমস্কার করিয়া বাটিতে চলিয়া আসিলেন। আসিয়া কিছু দিন পরে আপনার মাতা পিতাকে নম্রভাবে করযোড়ে বলিলেন যে, হে মাতা পিতা তোমাদের চারি পুত্র—তাহার মধ্যে আমাকে জ্ঞান যে এক পুত্র মরিয়া গিয়াছে; আমাকে আজ্ঞা দেও। এই সৃষ্টি চরাচর রাজা প্রজা বড় কষ্ট পাইতেছে; আমাকে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে—যাহাতে চরাচর সুখে থাকিতে পারে।

ক্রমশঃ।

রাজ নৈতিক সংবাদ।

নূতন আইন। গতবারে আমরা এই আইন সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াছি। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি শিমলা শৈলে বড় লাটের সভায় এই আইন খানি নিরাপত্তিতে পাশ হইয়া গিয়াছে।

যদি কোন লোক সরকারী কর্ম্মচারী হইয়া কোন উপায়ে (বৈধ বা অবৈধ) কোন দলীল পত্র নক্সা ইত্যাদি হস্তগত করিয়া তাহা এরূপ লোককে জ্ঞাত করেন বা করিবার চেষ্টা করেন, যাহা দ্বারা দেশের ক্ষতি হইতে পারে বা যাহা বিশেষ কারণে সাধারণ লোকের মঙ্গলের জন্য সে সময় প্রকাশ করা উচিত নহে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি সরকারী কার্য্যে বিশ্বাস ঘাতকতার দোষে দোষী হইবেন।

যে ব্যক্তি উপরোক্ত বিষয় কোন বিদেশীয় রাজাতে জ্ঞাত করিবেন, তাঁহার দোষ প্রমাণ হইলে তাঁহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইতে হইবে, কিম্বা অপরাধের ন্যূনাধিক্যানুসারে দুই বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সপরিশ্রম বা অপরিশ্রম কারাদণ্ড হইবে।

যে ব্যক্তি উপরোক্ত বিষয় কোন দেশীয় লোককে জ্ঞাত কবিবেন, তাঁহার উল্লিখিত বৎসর পর্য্যন্ত সপরিশ্রম বা অপরিশ্রম কারাদণ্ড হইতে পারিবে, এতদ্ভিন্ন দোষের তারতম্যানুসারে অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডই ব্যবস্থা করা যাইবে; এবং সংবাদদাতাই যে শুদ্ধ অভিযুক্ত হইবে তাহা নহে, যে ব্যক্তি সংবাদ লইবে বা লইবার চেষ্টা করিবে তাহাকেও দণ্ডার্হ হইতে হইবে।

যদি প্রমাণ হয় যে একজন সংবাদ পত্র সম্পাদক কোন রাজকর্ম্মচারীর নিকট কোন গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সেই কর্ম্মচারীকে উক্ত সংবাদ প্রকাশ করিবার জন্য উত্তেজিত বা প্রলোভিত করিয়াছেন তবে সেই সম্পাদকও সংবাদ দাতার সমান দণ্ড ভোগ করিবেন।

এই আইন সম্বন্ধে আমাদের দুই একটি কথা বলিবার আছে, কিন্তু বলিয়া কিছু ফল হইবে কি? যদি কোন বিদেশীয় রাজার নিকট দেশীয় কোন ব্যক্তি কোন গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত করেন তবে তিনি দেশের শত্রু, তাঁহার দণ্ড হওয়াই প্রার্থনীয় সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিবার নাই। কিন্তু দেশের লোক যদি দেশের কোন গোপনীয় কথা জানিতে পারে তাহাতে দোষ কি? গবর্ণমেণ্ট যদি মনঃসংযোগ করিয়া ভাবিয়া দেখিতেন তবে বুঝিতেন সংবাদ পত্রসম্পাদকদিগের এই আন্দোলনে তাঁহাদের উপকার ভিন্ন অপকার নাই। কারণ গবর্ণমেণ্ট সাধারণ লোকের মতামত জানিতে পারিয়া নিজের কার্য্য প্রণালী অধিক মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে বাধ্য হন, সুতরাং সে কার্য্যে সাধারণ লোকের কোন অসুবিধা হয় না এবং গবর্ণমেণ্টেরও সুযশ সঞ্চিত হয়। সেই জন্যই বলিতেছি এই আইনের এই অংশের প্রয়োজনীয়তা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, তবে যদি গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে যেখানে রাজার সুবিধা সেই খানেই প্রজার অসুবিধা, কিন্তু প্রজা নিজের অসুবিধা দেখিলেই চীৎকার করিবে, এদিকে গবর্ণমেণ্টের সুবিধা দেখাও সর্ব্বতোভাবে বিধেয় সুতরাং প্রজা সমষ্টির নিকট হইতে এ সমস্ত বিষয় গোপন রাখা ভিন্ন উপায় নাই, যতদিন প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত না হয় তত দিনই বিঘ্ন ও বিপদ; ইহা যদি হয় তবে বলিতে পারি না। যদি উভয়ের স্বার্থ এত ভিন্ন হইতে চলিল তবে উভয়ের মধ্যে ভালবাসা, বিশ্বাস, সহানুভূতি স্থায়ী হইবে কিরূপে?

প্রাদেশিক সমিতি। পূজার বন্ধের মধ্যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশন গৃহে প্রাদেশিক সমিতি (Provincial conference) অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তিন দিন ধরিয়া এই সমিতির কার্য্য হইয়াছিল। সভায় অনেকগুলি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, প্রথম দিনে রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতি পদে বরিত হন, প্রথমেই ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার সম্বন্ধে আন্দোলন হয়, তাহিরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর এই প্রস্তাব উত্থাপিত করেন, নির্ব্বাচন প্রণালীর প্রবর্ত্তনই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ও বাবু কৈলাশচন্দ্র বিশ্বাস যথাক্রমে এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বাবু দ্বিজদাস দত্ত আবকারী সংস্কারের জন্য পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর সামুয়েল স্মিথ ও কেইন সাহেবকে ধন্যবাদ দেন।

তৃতীয় প্রস্তাবে দেশ হইতে খোলাভাটীর উচ্ছেদের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ

করা হয় এবং যাহাতে স্থানীয় লোকের সম্মতি ভিন্ন কোন স্থানে খোলাভাটি স্থাপিত হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রার্থনা করা হয়। বাবু কালীশঙ্কর সুকুল এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন, এবং বাবু অক্ষয়চন্দ্র দাস ও নফরচন্দ্র দাস তাহার সমর্থন করেন।

দ্বিতীয় দিনে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলির প্রস্তাব হয়।

(১) কুলি কাহিনী, চা বাগিচায় কুলিদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য একটি কমিসন লইতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়। (২) কুলীদের সংস্কার, ডিষ্ট্রীক্ট পুলিস সুপারিনটেনডেণ্ট পদে লোক নিযুক্ত করিবার সময় পুলিস ইনেস্পেক্টার হইতে কিছু কিছু লোক যাহাতে মনোনীত হয় তাহা করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হয়। এবং নিম্নশ্রেণীর পুলিস কর্ম্মচারীর বেতন বৃদ্ধির জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। (৩) দেওয়ানী বিচার প্রণালী, দেওয়ানী বিচারের জন্য মুন্সেফের সংখ্যা ও সঙ্গে সঙ্গে মুন্সেফের অধীনস্থ কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য অনুরোধ হয় এবং যাহাতে দেওয়ানী মকদ্দমার খরচার হার কমে এবং অনারারী মেজিষ্টেটগণ কিছু কিছু দেওয়ানী মকদ্দমা বিচার করিতে পান তাহারও প্রস্তাব হইয়াছিল। (ক) টেকনিক্যাল এডুকেশন, শিল্প কার্য্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়।

তৃতীয় দিনে এই সমিতির শেষ অধিবেশন হয়, আত্মশাসন, স্বাস্থ্য কথা ও জাতীয় মহাসমিতির কথায় এই দিন শেষ হয়।

জাতীয় মহা সমিতি। বোম্বাইনগরে মহা সমিতির পঞ্চম অধিবেশনের খুব আন্দোলন লাগিয়া গিয়াছে কাজ বেশ হইতেছে, কিন্তু সমস্ত নিঃশব্দে। হৃদয়ভরা উৎসাহ ও অধ্যবসায় আছে কিন্তু কলরব কিছু মাত্র নাই, স্থিরভাবে দক্ষতার সহিত সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। আগামী অধিবেশনে কি কি প্রস্তাব তুলিতে হইবে, প্রতিনিধি, দর্শক ইত্যাদি সকলের সুবিধার জন্য কি করা উচিত এই সমস্ত অবধারণের জন্য প্রেসিডেন্সি আসোসিয়েশন গৃহে সপ্তাহে দুইবার করিয়া কন্‌গ্রেস কমিটি বসিতেছে। আগামীতে কাহাকে মহাসমিতির সভাপতি করা হইবে তাহাই লইয়া আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে।

প্রসিদ্ধ ধনী প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের প্রায় ২৯০০০ বর্গ গজ জমি ফাঁকা পড়িয়া আছে, তাহাই কন্‌গ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনের জন্য লওয়া ঠিক করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য ইহার জন্য কিছু ভাড়া দিতে হইবে না। এতদ্ভিন্ন ২৪০০০ বর্গ গজ পরিমিত আর এক খণ্ড জমিও পড়িয়া আছে, কন্‌গ্রেস কমিটী তাহাও গ্রহণের জন্য চেষ্টা করিতেছেন; ইতিমধ্যেই সভাস্থল প্রস্তুত হইতেছে। আগন্তুকদিগের সুবিধার জন্য যজ্ঞস্থলের নিকটে অনেকগুলি বাসার বন্দোবস্ত থাকিবে।

মামলাতদার তত্ত্ব। পাঠক মহাশয়কে বোধ হয় বোম্বাইএর স্বনামধন্য

কমিশনর আর্থার ক্রফোর্ডের কথা নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। ক্রফোর্ড সাহেবের ঘুস লইবার কথা যখন্ প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয়, তখন বোম্বাই লাট লর্ড 'রে' বড় গোলযোগে পড়িয়াছিলেন। কারণ উৎকোচ যে লইয়াছে ও যে দিয়াছে তাহারা ভিন্ন আর সে কথা তৃতীয় ব্যক্তির জানিবার সম্ভাবনা নাই—আর থাকিলেই বা পরাক্রান্ত কমিসনরের বিরুদ্ধে কে সাক্ষী দিবে? সুতরাং সে কথা প্রমাণ করা কঠিন। এরূপ অবস্থায় উৎকোচদাতাকে হস্তগত করিতে না পারিলে উৎকোচ গ্রহীতার বিচার হইতে পারে না। কিন্তু উৎকোচ দাতাকে হস্তগত করাও সহজ নহে, উৎকোচ দাতাও আইন অনুসারে দণ্ডনীয়, সুতরাং কে ইচ্ছা করিয়া কারাগারে যাইবে। লর্ড রে উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রকাশ করেন যে যাহারা ক্রফোর্ড সাহেবকে উৎকোচ দিয়াছে তাহারা যদি অপরাধ স্বীকার করে তাহা হইলে তাহাদের কোন দণ্ড দেওয়া যাইবে না। গবর্ণরের এই অভয় বাক্যে বিশ্বাস করিয়া উৎকোচ দাতাগণ সকলেই স্ব স্ব অপরাধ স্বীকার করে। বোম্বাই লাটের অঙ্গীকার অনুসারে এই সমস্ত উৎকোচ দাতাগণকে দণ্ডমুক্ত করা উচিত্ কি আইনানুসারে তাহাদিগকে দণ্ডযুক্ত করা বিধেয় তাহা স্থির করিবার জন্য ব্রিটিশ মহাসভায় মহা আন্দোলন উঠিয়াছিল। ষ্টেট সেক্রেটারী বলেন বোম্বে গবর্ণমেণ্টের এই রূপ প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ ন্যায় সঙ্গত হয় নাই। কিন্তু মহাসভায় অন্যতম সভ্য লর্ড হার্সেল বলেন যে বোম্বে গবর্ণমেণ্ট অতি বিপদে পড়িয়াই এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং ইহা ভিন্ন উৎকোচদাতাদিগের সাক্ষ্য লওয়াও ঘটিয়া উঠিত না;

যাহা হউক লর্ড ক্রস উৎকোচদাতাদিগকে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে অসম্মত, এই সমস্ত বিষয় মীমাংসার ভার তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতে নিক্ষেপ করিয়াছেন। তদনুসারে আমাদের বড় লাট সাহেব শিমলা শৈলে একখানি নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। যে সকল মামলাতদার লঘু অপরাধে অপরাধী অর্থাৎ যাহারা ক্রফোর্ড সাহেবের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও বদলীর হাত হইতে রক্ষা পাইবার ইচ্ছায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে উৎকোচ দিয়াছিল তাহারা অব্যাহতি পাইয়াছে কিন্তু যাহারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী অর্থাৎ ক্রফোর্ড সাহেবের অনুগ্রহ ক্রয়ের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক উৎকোচ দিয়াছিল তাহাদিগকে ঘরের পয়সা দিয়া বিদায়ের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

আমরা এ সম্বন্ধে কিছু বলিব না, এ সম্বন্ধে লর্ড হার্সেল যাহা বলিয়াছেন তাহাই পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিব। লর্ড হার্সেল ব্রিটিস মহাসভার একজন সভ্য; ইনি উদার নৈতিক দলভুক্ত এবং ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব লর্ড চ্যান্সেলার। আমরা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া তাঁহার সুন্দর মন্তব্যের ভাষার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না, ইংরাজিই এখানে উদ্ধৃত হইল।

"Some of the officials admitted that they gave money for their offices

and no man should be allowed to remain in the office he had purchased; but their relation to the commissioner had to be considered —their future was in his hands—their promotion, their degradation and their removal from one place to another—all depended upon him. He was satisfied that there had been a system of Blackmailing going on—the men did not believe that they had paid for their offices but that they had yielded to solicitations to pay money which if they did not do they would suffer in the future. That was not corruption, and did not make the men unfit for the public service. That being the character of the transaction it seemed to him that the government would see that more harm would be done by the pledge given being broken, than by retaining these men in the service."

লর্ড হার্সেলের ন্যায় সকলেই স্বীকার করিবেন যে গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে যত ক্ষতি, এই সমস্ত মামলাতদারদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে ততক্ষতি নাই। লর্ড ক্রস আইনজ্ঞ ও রাজনীতি বিশারদ, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার বিবেচনা শক্তি, যিনি এক দিন ইংলণ্ডের চ্যানসেলার ছিলেন, এবং উদার নৈতিকদিগের অভ্যুদয়ে যাঁহাকে আবার সেই পদে স্থায়ী দেখিব আশা আছে তাঁহার বিবেচনা শক্তি অপেক্ষা বেশি এ কথা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

ষ্টার থিয়েটার।

ষ্টার থিয়েটারে সে দিন প্রফুল্ল অভিনয় দেখিয়া প্রীত হইলাম। আট দশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যেরূপ অভিনয় দেখিয়াছি, তাহা যেন যাত্রার রূপান্তর। পুরুষদিগের চীৎকার গর্জ্জনে বীরত্ব প্রকাশ, মেয়েদের নাকিসুরে বিনাইয়া বিনাইয়া কথা, সমস্তই এমন অস্বাভাবিক, যে সে অভিনয়ের সহিত ইহার তুলনাই হয় না।

'প্রফুল্ল' করুণ রসাত্মক একখানি সামাজিক নাটক। উমাসুন্দরী তিন পুত্র লইয়া বিধবা। জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেশ যেমন সহৃদয় ভ্রাতৃ বৎসল, উচ্চ প্রকৃতি সম্পন্ন—মধ্যম পুত্র রমেশ তেমনি স্বার্থপর নীচমনা। যোগেশ নিজে কষ্ট করিয়া অন্য দুই ভ্রাতাকে প্রতিপালন করেন; এবং পরে স্বোপার্জ্জিত ধনের সমান অংশ তাহাদিগকে দান করেন, রমেশ তাহাতেও সন্তুষ্ট নহে, দাদাকে ফাঁকি দিয়া সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া দাদার পরিবারদিগকে গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দেয়—এবং অবশেষে ভ্রাতুষ্পুত্র-যাদবের প্রাণ হরণে চেষ্টা পায়।

প্রফুল্ল রমেশের পত্নী—সচ্চরিত্রা দয়ার্দ্র হৃদয়া, ন্যায় পরায়ণা পুণ্যবতী সতী — স্বামীর হস্ত হইতে যাদবকে রক্ষা করিতে গিয়া নিজে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়।

মদ্য পানের কি ফল, দেবতাকেও ইহা কিরূপে দানব করিয়া তোলে—পুস্তক-খানির তাহাই প্রধান শিক্ষা।

যোগেশের সমস্ত গুণ, দোষের মধ্যে তিনি অল্প অল্প মদ্য পান করেন, এই পানা-ভ্যাস হইতে ক্রমে তিনি কিরূপ অমানুষ হইয়া দাঁড়াইলেন—তাহা অতি সুন্দরভাবে লেখক আঁকিয়াছেন। ভরষা করি ইহা দেখিয়া অনেক নব্য যুবকের শিক্ষা লাভ হইবে।

কিন্তু যোগেশের চরিত্র যেরূপ স্বাভাবিক হইয়াছে রমেশের চরিত্র তাহা হয় নাই। লোকে স্বার্থ-পর প্ররোচনায় শত সহস্র হীন নারকী কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহার কি একটা সীমা নাই? এমন কি স্থল নাই, যেখানে দাঁড়াইলে হঠাৎ সেই নারকীর চক্ষেও নরক বিভীষিকা খুলিয়া যায়? রমেশ তাহার হিতকারী ভ্রাতাকে সর্ব্বস্বান্ত করিল, তাহার পরিবারদিগকে তাড়াইয়া দিল, ভ্রাতুষ্পুত্র যাদবকে মারিবার জন্য ধরিয়া আনিল, বেশ! কিন্তু যখন বালক যাদবকে রোগের ছলে অনাহারে দগ্ধিয়া মারা হইতেছে; বালক ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, ব্লিষ্টারের জ্বালায় আকুল—মুহুর্মুহু করুণ কণ্ঠে কাকার নিকট জল ভিক্ষা করিতেছে তাহাকে কষ্ট জানাইতেছে, তখনও যে রমেশ অটলভাবে দাঁড়াইয়া তাহার কষ্ট দেখিতেছে ইহা নিতান্তই অস্বাভাবিক। এমন কোন মানুষ আছে—এরূপ স্থলে যাহার হৃদয় মধ্যে একটা ক্ষণিক সংগ্রাম পর্য্যন্ত না বাধে! বিশেষ রমেশ ভদ্র লোক, যোগেশ সুরেশের ভাই; ভ্রাতাদিগের ন্যায় সহৃদয়তা তাহার স্বভাবে নাই থাকুক সে স্বভাবের কোন সামান্য লক্ষণ ত তাহাতে অবশ্যই থাকিবে? যাহা হউক, রমেশের অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছে। যোগেশ মনের আবেগ প্রকাশ স্থলে মাঝে মাঝে অতি মাত্রায় চীৎকার না করিলে ভাল হইত। অনেক সময় চীৎ-কার অপেক্ষা সংযত ভাষাতেই মনের আবেগ অধিক প্রকাশ পায়। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে জগমণির অভিনয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহার কথার স্বর, ধরণ ধারণ সমস্তই অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু জগমণি বাঙ্গলা দেশের স্ত্রীলোক হইয়া একবার চাপরাশি সাজে, একবার কমপাউণ্ডার হয়—নানা সাজে নানা ফন্দিতে ফিরে ইহা একটু কেমন কেমন? অভিনয়ে বাড়ীওয়ালীকে জগমণির নীচেই বসান যায়। জ্ঞানদা উমাসুন্দরী প্রফুল্লের অভিনয় যে মন্দ তাহা নহে কিন্তু তিন জনেই কিছু বিনাইয়া কথা কন।

অন্যান্য পুরুষদিগেরো প্রায় সকলেরি অভিনয় ভাল হইয়াছে। বিয়েপাগলা মদন ঘোষ, ভজহরি, ও কাঙগালির অভিনয় ইহার মধ্যে বিশেষ প্রশংসনীয়। মদন ঘোষের চরিত্রের মধ্যে লেখক অতি সুন্দর চরিত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। মদন ঘোষ 'বংশ রক্ষা বংশ রক্ষা' করিয়া পাগল, ছেলেরা এই জন্য যাকে তাকে ধরিয়া ক্রমাগত তাহার

সহিত বিবাহ দিয়া মজা করে। জগমণির সহিত ইহার শেষ বিবাহ, ইহাকে অস্ত্র করিয়া জগমণি ও রমেশ যোগেশের সর্ব্বনাশ করে। মদন ঘোষই দলিল চুরি করে, মদন ঘোষই যাদবের সন্ধান লইয়া আসে; মদন ঘোষই যাদবকে ধরিয়া রমেশের বাড়ী আনে। এতদূর ত বুড় করিল, কিন্তু যখন শেষে রমেশ যাদবকে মারিতে উদ্যত— তখন তাহার সহ্য হইল না, কেন না বংশলোপ? মদন ঘোষের মুখে শেষে কেবল বংশ লোপ! এই একটি মাত্র কথায়—তাহার চরিত্র অতি স্বাভাবিক হইয়াছে!

এক কথায় বইখানি অভিনয়ের বেশ উপযোগী, এবং অভিনয়ও প্রীতিজনক।

সমালোচনা।

পরম কল্যাণগীতা। পরম হংস শিবনারায়ণ স্বামী কৃত।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য সত্য ধর্ম্ম প্রচার। স্বামীপ্রবর ধর্ম্ম জ্ঞান উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার উদারতা পূর্ণ উপদেশ সকল পড়িলে তিনি যে যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। বইখানি সাধারণ্যে প্রচলিত হইলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্বামী মহাশয় বাঙ্গালী নহেন, সুতরাং পুস্তকের ভাষা তেমন বিশদ হয় নাই—কিন্তু বিষয়ের গুণে ভাষার দোষের প্রতি লক্ষ্য পড়ে না। আমরা নিম্নে এই পুস্তকের কোন কোন স্থান হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

পূজ্য ও পূজক শব্দ বিবরণ।

পূজ্য ও পূজকের অর্থ এই যে, পূজ্য শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ও সাকার ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণকে জানিবেন, এবং পূজক শব্দ চরাচর জীব, রাজা প্রজা আদিকে বুঝিবেন। অথবা যে আশ্রমেরই হউন জ্ঞানবান পুরুষই পূজ্য এবং অবোধ অজ্ঞানী পুরুষ পূজক কিন্তু স্বরূপেতে পূজ্য পূজক ভাব নাই। কারণ কি সকলেই পূর্ণ পরব্রহ্মকে পূজা আর নমস্কার প্রণাম করিবে, যাহাতে চিত্তশুদ্ধ হইয়া পরব্রহ্মেতে লয় হইয়া সদা নির্ভয় আনন্দরূপ থাকিবে; আর নানা প্রকারের কষ্ট, অন্ধকার ও ঘোর অজ্ঞানে ব্যাপৃত থাকিবে না। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভিন্ন আর অন্য কোন দ্বিতীয় পূজ্য নাই, হইবে না, আর হইতে পারিবে না; এবং ব্রহ্মবিৎ জ্ঞানবান পুরুষ উঁহারই তুল্য, এ জন্য পূজ্য হইয়া থাকেন। আর যদি অজ্ঞানের বশ হইয়া নানা নাম কল্পনা কর, ও যাহাকে ইচ্ছা পূজা কর তাহাতে বলহীন, তেজ হীন হইবে আর হইতেছে; পরব্রহ্মকে ত্যাগ করায় এই ফল হইয়াছে। এক্ষণে যে প্রমাণে বলিয়া দিলাম, রাজা প্রজাগণ ইহা সত্য বলিয়া জানিবেন।

প্রতিমাপ্রতিষ্ঠা বিবরণ।

রাজা প্রজা আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, আপনাদের শরীরের প্রতিমা ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আর সমস্ত আহার দিতেছেন, তাঁহার ত্রিগুণাত্মা জ্যোতির্মূর্ত্তি তেজরূপ রাত্রিদিন প্রকাশিত রহিয়াছেন; তাঁহাকে না পূজা করিয়া আপন মন হইতে মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, পাথর, ধাতু আদির প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজিতেছ এবং পূজা করাইতেছ, আর বলিতেছ যে, ইনি পরমেশ্বর বিষ্ণু ভগবান। যখন আপনিই প্রতিমাকে নির্ম্মাণ করিলেন তখন আপনিই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা, আর যখন প্রতিমাকে ভোগ দিতেছেন তখন আপনিই ইহার পালনকর্ত্তা, আর আপনি যখন তাহাকে বিসর্জ্জন করিতেছেন তখন আপনিই তাহার সংহারকর্ত্তা। আপনি তাহার শরীর উৎপন্ন করিতেছেন, আর আপনিই পালন এবং লয় করিতেছেন তবে আপনি নিজে তাহা হইতে মহৎ সন্দেহ নাই। পরব্রহ্মের প্রিয় ভক্তগণ কি না করিতে পারেন?

কিন্তু প্রতিমাদি পূজা নাস্তিক মত হইতে বরং উত্তম মত বটে; কারণ কি পরব্রহ্মের নাম লইয়া প্রতিমাকে পূজা করা হয়। আর আপনারা কেহ কেহ বলেন যে, প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ঈশ্বরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। আর ঐ প্রতিমার ধ্যান দর্শন করাতে চিত্ত একাগ্র হইবেক, এ জন্য উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। বিচারপূর্ব্বক চিত্তকে একাগ্র করিয়া শুনুন্ যে, যাঁহারা প্রতিমা জড় পদার্থতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন; কিন্তু যখন তাঁহাদের নিজের পুত্র মরিয়া যায় এবং তাহার সমস্তই ইন্দ্রিয়গণ সহিত শরীরের প্রতিমা সম্মুখে পড়িয়া থাকে, তখন সকলে মিলিয়া কেন উহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করা হয়? কেন কাঁদিতে থাকেন? উহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইলেই ত পুনশ্চ চৈতন্য হইয়া বাঁচিয়া উঠিবে, সমস্ত ব্যবহার কার্য্য করিবে। যখন দশ ইন্দ্রিয়গণ থাকাতেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না তবে জড় পদার্থতে ঈশ্বরকে রুদ্ধ করিয়া কেমনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। তিনি ত সর্ব্বব্যাপক, সকল স্থানেতে ও সকল বস্তুতেই পূর্ণভাবে বিরাজমান আছেন, ভ্রমবশতঃ কেন ভুলিয়া আছ। আপনারা বলিয়া থাকেন যে, চিত্তের একাগ্রতা জন্য প্রতিমা পূজা করা হয়। বিচার পূর্ব্বক দেখ যে, চিত্তএকাগ্রতার অর্থ এই যে, সদা চিত্ত পরব্রহ্মেতে লীন থাকে এবং দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি দ্বারা চালিত হইয়া কাহার সহিত শত্রু ভাব না করে। জয় পরাজয়, মান অভিমান, দ্বৈত ভ্রম লয় হয়; চরাচর রাজা প্রজা স্ত্রী পুরুষ আদিকে সমান দৃষ্টিতে দেখে যে, সকলই পরব্রহ্মের রূপ, আর আত্মা। সকলের প্রতি দয়া করে, শীল, সন্তোষ, ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা হইয়া থাকে, সকলে যাহাতে শুভ কর্ম্ম করে তাহার চেষ্টা করে, সত্য কথা বলে; কাহার সহিত কোন বিষয়ে বৈরভাব রাখে না, শত্রু মিত্র ভাব নষ্ট হইয়া যায়; এই সকল চিত্ত একাগ্রতার লক্ষণ বুঝিয়া লইবেন। কিন্তু ঐপ্রকার

প্রতিমা প্রতিষ্ঠাতে চিত্তের একাগ্রতা না হইয়া তাহার বিপরীত ফল হইতেছে অর্থাৎ আপনাদের পরস্পরের বৈরভাব বৃদ্ধি হইতেছে এমন কি হিন্দুদিগের মধ্যেও বিষম বৈরভাব চলিতেছে; ইহাতেই সংসার উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে ও এখনও যাই-তেছে আর যদি বলেন যে প্রথমতঃ সকলেরই চিত্তের একাগ্রতা এরূপ হইবে না; এ জন্য প্রথমে প্রতিমা পূজা করিলে চিত্তের একাগ্রতা হইতে পারে। তাহা সত্য বটে যাহার পিতার প্রতিমা (শরীর) মরিয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছে, আর দৃষ্টিতে আইসে না, সেই ব্যক্তি কাঠ, মৃত্তিকা, ধাতু আদির অথবা কাগজ আদির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সেবা করিতে পারে। আর যাহার পিতা অনাদি স্বতঃপ্রকাশ জীবিত আছেন, ঐ পুরুষের কি প্রয়োজন আছে যে, জীবিত প্রত্যক্ষ পিতা বিরাজমান তখন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কাগজের প্রতিমূর্ত্তি আর কাষ্ঠ মৃত্তিকা পাথর আদির প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করায় আর পিতা শব্দ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্যোতি-মূর্ত্তি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ পিতা বিরাজমান থাকাতে, পুত্র শব্দ রাজা প্রজা কেন তাঁহার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে? যদি ঈশ্বর জ্যোতির্মূর্ত্তি পিতা প্রত্যক্ষ না থাকি-তেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতিমা নির্ম্মাণ করা বিধেয় হইত। ঐ জগৎ পিতা জ্যোতি-র্মূর্ত্তির প্রতিমা, সমস্ত রাজা প্রজা চরাচরের মূর্ত্তি, উঁহারই প্রতি মনুষ্য চিত্ত রাখিবে। আকাশ রূপ তো মন্দির, গিরিজা ঘর, মস্‌জিদ্ উপস্থিত আছে; উহাতে এক ঈশ্বর, গাড্, আল্লাহ, খুদা অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম বিরাজমান আছেন। পুনশ্চ অপর মন্দির ও মস্‌জিদ আর গিরজা ঘর নির্ম্মাণ করিবার কি প্রয়োজন আছে? ঐ আকাশ মন্দির, মস্‌জিদ্ ও গিরজা ঘরেতে নমস্কার প্রণাম কর, নমাজ পড়; যেদিকে মুখ করিয়া প্রণাম নমস্কার ও নমাজ্ করিবে সেই দিকেই পরব্রহ্ম তিনি সকল দিক হইতে দেখিতেছেন। যখন জ্যোতির্মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ থাকিবেন, উঁহার সম্মুখে নমস্কার প্রণাম কর, নমাজ পড়; আর সেই ব্রহ্ম মূর্ত্তি জ্যোতি প্রতিমাকে ধ্যান করিয়া হৃদয়েতে ধারণ কর, সকলের চিত্ত একাগ্র হইবেক, আর সকলের সহিত পরস্পর প্রীতি বৃদ্ধি হইবেক, আর সদা আনন্দ, জ্ঞান, মুক্ত স্বরূপ নির্ভয় থাকিবেক, কাহার সহিত কাহারও বৈরভাব থাকিবে না, সকলকেই আত্মাস্বরূপ দেখিবে।

"উত্তমোব্রহ্ম সদ্ভাবো ধ্যান ভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবঃ বাহ্যপূজাধমাধমঃ॥"

ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি সর্ব্ববস্তুতে পূর্ণ পরব্রহ্ম রূপ ভাবনা করিতে থাকেন তিনি সর্ব্বোত্তম সাধক। আর যে সাধক আপনাকে জীব জ্ঞান করিয়া শিব কিনা পর-ব্রহ্মকে পাইবার জন্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য আপনাকে পৃথক্ রূপ ভাবিয়া যখন পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে থাকে; ঐ অবস্থার সাধককে মধ্যম বলা হয়। আর যে সাধক

আপনাকে পৃথক্ ও পরব্রহ্মকে পৃথক্ রূপ জানিয়া পরব্রহ্মের স্তুতি ও জপ করিতে থাকেন ঐ অবস্থার সাধককে অধম শব্দ বলা হয়। আর যে সাধক বাহ্যরূপকে কি না জড় পদার্থকে পরব্রহ্ম জানিয়া পূজা করেন সে সাধককে অধমাধম শব্দ বলা হয়। এইরূপে বুঝিবেন যে অবস্থা ভেদে তুরীয়া সুষুপ্তি, জাগ্রত ও স্বপ্ন এই চারি অবস্থা রূপান্তর উপাধি ভেদে নাম কল্পিত হয় অর্থাৎ আনন্দ শব্দ উত্তম, তদপেক্ষা বিজ্ঞান শব্দ মধ্যম, তদপেক্ষা জ্ঞানশব্দ অধম, আর তদপেক্ষা অজ্ঞান শব্দ অধমাধম ; কিন্তু সাধকের স্বরূপেতে উত্তম অধম পদ নাই, কেবল অবস্থা ভেদে গুণ কল্পনা মাত্র ; স্বরূপেতে যাহা আছেন তাহাই। এইরূপ সাধন পক্ষে বুঝিয়া লইবেন। এই চারি অবস্থা লয় হইলে সকল ভাব বুঝা যায়। আর নিরাকার ও সাকার রূপে এক পূর্ণ পরব্রহ্মই সকলেরই ইষ্ট আত্মা। আর মনেতে ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা করিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া মান্য করিতেছেন এবং আপন ইষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ভাবিতেছেন আর নানা নাম কল্পনা করিয়া অপর সকলকে যাহাতে ঐ রূপ করে তাহা করিতেছেন তাহা হইলে চিত্তের একাগ্রতা কি রূপে হইবেক ? বরং তদ্বিপরীতে পরস্পর সকলের সহিত সকলের অর্থাৎ রাজার সহিত প্রজার, পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিতের, গুরুর সহিত শিষ্যের পিতার সহিত পুত্রের বৈরভাব অনৈক্যতা, যাহা ঘটায় আমাদের পারিবারিক সুখ, গৃহলক্ষ্মী অন্তর্দ্ধ্যান হইয়াছেন বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে। অতএব আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, এই হিন্দু আর্য্যাবর্ত্ত যত অধিক পরিমাণে দেবদেবীর পূজা করেন এমন আর কোন দেশে কোন ধর্ম্মে নাই। কিন্তু এত কষ্ট ও পরাধীনতা অন্য কোন ধর্ম্মোপাসকদিগের নাই ; ইহার কারণ কি কাহারও একমতি নাই আর সকলেরই চিত্ত চঞ্চল, বিষয়তৃষ্ণায় কাতর হইয়া ব্যাকুল ভীত হইয়া রহিয়াছে। রাজা প্রজা সকল বিষয়ে দরিদ্রের ন্যায় বিষাদিত হইয়া রহিয়াছেন ; বিনা জ্যোতিস্বরূপ পরব্রহ্ম কে দুঃখ নিবারণ করিবে এবং কি রূপেই বা চিত্ত একাগ্র হইবেক ?

পতিব্রতা বর্ণন।

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, স্ত্রীলোক নিজ স্বামীর সেবা করিলে মুক্তি ফল পায়। পতি বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকের উপাসনাদি কোন প্রকার পরমার্থ কার্য্যের অনুষ্ঠানের আবশ্যক থাকে না। ইহা সত্য বটে যে, ব্যবহার কার্য্যেতে স্ত্রীলোকগণের নিজ নিজ পতিসেবা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এস্থানে জ্ঞানবান ব্যক্তি গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া প্রত্যক্ষ দেখুন্ যে, স্ত্রীর ক্ষুধা পাইলে পতির আহারে স্ত্রীর উদর পূর্ণ হয় না কিম্বা স্ত্রীর রোগ উপস্থিত হইলে পতি ঔষধি সেবন করিলে তাহার উপশম হয় না। কিন্তু স্ত্রীর রোগ উপস্থিত হইলে স্ত্রী ঔষধি সেবন করিলেই আরোগ্য হইবেক এবং স্বামী ঔষধি সেবন করিলেই আরোগ্য হইবেক। এইরূপে পরমার্থ ইত্যাদি কার্য্যে মুক্তি বিষয়ে যে যাহা

করিবে সেই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবেক। স্ত্রীলোক পরমার্থ উপাসনা করিলে সেই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবেক। এবং স্বামী পরমার্থ উপাসনা করিলে সেই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবেক। এক জনের উপাসনার ফল অপরে পাইতে পারে না কারণ ইহা পার্থিব সঞ্চিত ধন নহে যে একজন অপরকে যথেচ্ছায় দান করিবে কিম্বা উত্তরাধিকারি সত্বে বর্ত্তাইবে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই সমানভাবে পরমার্থ কার্য্য করা আবশ্যক যাহাতে উভয়েই আনন্দরূপ থাকিতে পারে।

স্ত্রী ও পুরুষের শুদ্ধাশুদ্ধ বর্ণন।

কোন কোন সাধু, ঋষি, মুনি, সন্ন্যাসী কহেন যে, অহমস্মি সচ্চিদানন্দ আমিই হই; আপনাকে শুদ্ধ (পবিত্র মনে করেন; আর স্ত্রীলোকদিগকে নিন্দা করিয়া বলেন যে তাঁহারা অশুদ্ধ, শূদ্র, ও নরক। কিন্তু দেখুন্ যে, উঁহারাও ঐ স্ত্রীলোক হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। রাজা, প্রজা, ধীর, বীর, বলবান, অবতার, পণ্ডিত, সাধু, ঋষি, মুনি, ঔলিয়া, পীর, পেগম্বর, পরমহংস, সন্ন্যাসী, অহমস্মি সচ্চিদানন্দোহহং ইত্যাদি সকলেই স্ত্রীলোক হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ও হইতেছেন এবং হইবেক আর হইয়া লয় হইয়া যাইতেছেন। যদ্যপি স্ত্রীলোক অশুদ্ধ হয় তবে উহার পুত্রও অশুদ্ধ, নরক।

* † * † * †

এই নিমিত্ত যদি স্ত্রীলোক শূদ্র, অশুদ্ধ, নরক হয় তবে সমস্ত পুরুষ, সাধু, সন্ন্যাসী, পরমহংসও শূদ্র ও অশুদ্ধ নরক; এবং যদি স্ত্রীলোক শুদ্ধ হয় তবে পুরুষ ইত্যাদি সকলেই শুদ্ধ। বিচার করিয়া দেখ যে, স্ত্রীলোকেরও যেমন হাড় মাংস, মল মূত্রের শরীর, পুরুষেরও সেইরূপ হাড় মাংস, মল মূত্রের শরীর। উভয়ের নাক কাণ কাটিলে উভয়কেই কুৎসিৎ বিশ্রী দেখায়। যদি হাড়, মাংস চামড়ার পুতুল, পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক কিম্বা উভয়েরই মৃত শরীর (মড়া) একই অগ্নিতে নিক্ষেপ করা যায় তাহা হইলে উভয়কেই ভস্ম করিয়া অগ্নি আপন রূপ করিয়া লইবেন আর নির্ব্বাণ হইয়া যাইবেন, নিরাকার (নামরূপ রহিত) হইবেন। যদি উভয় পুতুল একই রূপ না হইত তবে অগ্নিতে কেন ভস্ম হইয়া যাইবে? যদি স্ত্রীলোকের শরীর ভিন্ন পদার্থে গঠিত হইত তবে অগ্নিতে জ্বলিত (পুড়িত) আর পুরুষের শরীর জলেতে ভস্ম হইত। যদি উভয় শরীরই এক না হইবে তবে একই অগ্নিতে কেন ভস্ম হইবে। যখন উভয়ের স্থূল শরীর একেতেই লয় হয় তখন উহার সূক্ষ্ম শরীরও একই; অর্থাৎ স্ত্রীলোক শূদ্র ও অশুদ্ধ নয় এবং পুরুষও শুদ্ধ নয়। যদি স্ত্রীলোক শূদ্র ও অশুদ্ধ হয় তবে পুরুষও শূদ্র অশুদ্ধ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অবোধ অবস্থা থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত শুদ্ধ অশুদ্ধ পৃথক্ পৃথক্ স্ত্রী পুরুষ বোধ হইতে থাকে, বস্তুতঃ কেহই অশুদ্ধ অথবা শুদ্ধ নয়। স্ত্রীলোক পুরুষ উভয়েই শুদ্ধ, অর্থাৎ স্ত্রীলোকও শুদ্ধ কারণ পরব্রহ্ম হইতে

উৎপন্ন হইয়াছে এবং পরব্রহ্মের স্বরূপ। যদি পুরুষ পণ্ডিত হয় তবে তিনি পুরুষের পক্ষপাত করেন, আর যদি স্ত্রীলোক পণ্ডিত হয় তবে তিনি স্ত্রীলোকের পক্ষপাত করেন। এ রূপে নানা ধর্ম্মাবলম্বিগণ আপন আপন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়কে শুদ্ধ ও মহৎ বলিয়া মনে করেন। অজ্ঞান হেতু উভয়েতেই পশুভাব বুঝিয়া লইবেন; কিন্তু যাঁহাদের পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারা পরস্পরকে স্ত্রী কিম্বা পুরুষ বলিয়া ভেদাভেদ জ্ঞান করেন না। রাজা প্রজা! আপনারা বিচার পূর্ব্বক দেখুন যে, অবলা স্ত্রীলোকগণের কি অপরাধ যে, উহাদিগকে অশুদ্ধ বলিতেছ আর পুরুষকে অশুদ্ধ বলিতেছ না। স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতেছ না, আর সত্য ধর্ম্ম ওঁকার পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপদেশ দিতেছ না, পশু করিয়া রাখিতেছ অতএব উহাদিগের অপরাধ কি? শাস্ত্রের উপদেশ এই যে,

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতু যত্নতঃ।"

বিবাহ।

*　　　　*　　　　*

রাজা প্রজাগণ আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, নিরুপায়ী পণ্ডিতগণ আপন পুত্র কন্যার বিবাহ, শাস্ত্রের টীকা টীপ্‌নি নির্ঘণ্ট করিয়া ঠিকুজী কোষ্ঠী অনুযায়ী গণন মিলন করিয়া দণ্ড মুহূর্ত্ত ইত্যাদির শুভ কাল নির্ণয় করিয়া যথাশাস্ত্র বিধিপূর্ব্বক আপন পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন, তথাপিও তাঁহাদের পুত্র অকালে মরিয়া যায়, আর কতও কন্যা অসময়ে বিধবা হইয়া যায়; এবং কতও পুত্র কন্যার সন্তান হয় না বন্ধ্যা হয় ও মৃতবৎসাদি দোষ-জন্মায়; আর কোন কোন বিবাহের পরে বিবাহিত পুত্র কন্যার পিতাও মরিয়া যায়।

আপামর সাধারণ জ্ঞানে ব্যবহার মতে কুল শব্দে বংশ বুঝায়, অর্থাৎ যে বংশে যাহার জন্ম হয় তাহাকে সেই কুলের ব্যক্তি বলা হয়। কিন্তু আপনারা বিচার করিয়া দেখুন্ যে সর্ব্ব আদি কুল (অর্থাৎ যাহা হইতে ইহ সৃষ্টি চরাচর জগৎ ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়া যাহাতেই স্থিত রহিয়াছেন) সেই অনাদি কারণ শুদ্ধ চৈতন্য পরব্রহ্ম, যিনিই মহাদেবী, মহাশক্তি, মহামায়া রূপে এই জগৎ চরাচর ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ রহিয়াছেন, সেই এক অনাদি কারণ শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞই সর্ব্বকুল। সেই কুলকেই রাজা প্রজা সকলেরই চিন্তা করা কর্ত্তব্য এবং বিশেষ আবশ্যকীয়। সাধারণতঃ বিবাহ শব্দে আপনারা বুঝিয়া থাকেন যে, শাস্ত্রোক্ত শ্লোক দ্বারা মন্ত্রপূত হইয়া হস্তে হস্ত বন্ধন করিয়া দেওয়ার নাম বৈধ অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত বেদবিহিত বিবাহ, কিন্তু যদ্যপি তাহাই যথার্থ বিবাহ হইত তবে কেন বিবাহের পর ব্যক্তি বিশেষে বর কন্যা উভয়ে-

য়ই ব্যভিচার দোষ ঘটে? পরন্তু প্রকৃতবিবাহ শব্দ ভাবার্থে এইরূপ ঘটনা সম্ভব নয়; এ কারণ উহাকে প্রকৃত বিবাহ বলা যাইতে পারে না। অর্থাৎ উভয়ের পরস্পর সদা একমতি হওয়াই (পরস্পরের মনোবৃত্তি একত্রে মিলিত হওয়া) প্রকৃত বিবাহ। প্রচলিত বিবাহকে বহির্বিবাহ বলে, অন্তর্বিবাহ, অর্থাৎ জীব মূলা প্রকৃতির সহিত পরব্রহ্মে লীন হইলেই তাহা যথার্থ পক্ষে সিদ্ধ হয় ইহাই নিশ্চয় জানিবেন।

বিবাহ সম্বন্ধে ব্যবস্থা বিবরণ।

আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, যে এক কুলীন নাম কল্পিত শব্দের এক ব্যক্তি বিশ বিশ বাইশ বাইশ বংশের কন্যাকে বিবাহ করেন; ঐ ব্যক্তি বৃদ্ধই হউন, আর যুবাই হউন, কেবল কুলীন শব্দ কল্পিত নাম শুনিয়াই উহাকে কন্যা দেন। আর যখন ঐ ব্যক্তি মরিয়া যান সেই সমস্ত যুবতী স্ত্রীলোক বিধবা হওয়াতে ব্যভিচারিণী হইয়া থাকেন। পুত্র কন্যার পিতা মাতাকে ধিক্কার যে, কুলীন্ নাম শুনিয়া বিনা বিচারে বিবাহ দেন আর এই স্ত্রীলোকগণ যৌবন হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত কষ্ট পান। যথার্থ কুলীন শব্দের অর্থ এই যে, যাহার নবগুণ (নয়টী মহৎগুণ) আছে, যথা

"আচারো বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং॥"

এইরূপ যে পুরুষের আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ দর্শন, পরব্রহ্মেতে নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপস্যা আর দান এই নয়টী গুণ থাকে, তিনি যে কুলেতেই জন্মগ্রহণ করুন, তাঁহাকে কুলীন শব্দ বলা হয়। আর পুত্র কন্যার শৈশব অবস্থাতে বিবাহ দিতেছেন ও দেওয়াইতেছেন; কিন্তু ঐ কন্যার এ জ্ঞান নাই যে, পতি কাহাকে বলে, আর উহা দ্বারা কি সুখ হয়; এবং পুত্রেরও এ জ্ঞান নাই যে, স্ত্রী কাহাকে বলে আর উহা দ্বারা কি সুখ হয়। আর আপনারা পুত্র কন্যাকে বাল্যাবস্থাতে বিদ্যাভ্যাস করান না, এবং সত্যধর্ম্ম পূর্ণ পরব্রহ্ম সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমাকে নমস্কার প্রণাম করান না; আর মান, মর্য্যাদা, কথা কহিতে, বসিতে, সন্তোষ, দয়া, ধৈর্য্য দান করা, অগ্নিতে আহুতি দেওয়া, সত্য কথা বলা, সত্য কথা বলান, সত্যধর্ম্ম পথে চলা, ইত্যাদি শিক্ষা দেন না; যাহাতে তাহারা সুখে থাকে এবং তাহাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়। সকলের উপর আত্মদৃষ্টি থাকে, মৃত্যুর ভয় থাকে না, নির্ভয় হইয়া বিচরণ করে ও সুখী থাকে। বিদ্যা-দ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জন হয়, আর পুরুষার্থ করিয়া ধন উপার্জ্জন স্ত্রী পুত্র পরিবারগণকে প্রতিপালন করে, ক্ষুধার্ত্ত অভ্যাগতগণকে যথাশক্তি দান দেয়, আর মাতা পিতার আজ্ঞানুসারে চলে, ও জ্ঞানবান পুরুষের আজ্ঞা বিচার পূর্ব্বক পালন করে, সমস্ত লোকের উপর দয়া রাখে। এসমস্ত উত্তম শিক্ষা না দিয়া, পুত্রকে এই শিক্ষা দিতেছ

যে, তোমার বিবাহ হইবেক, উত্তম সুন্দরী কন্যা পাইবেক, সেই তোমার ইষ্ট। কন্যাকে বলিতেছেন যে, তোমার বিবাহ হইবেক, উত্তম বর পাইবেক, সেই তোমার ইষ্ট। আর এইরূপে শয়ন করিবে, বসিবে, কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া ধন লইয়া আসিবে, আর মিথ্যা পাষণ্ড ইত্যাদি প্রপঞ্চ শিখাইতেছ, আর বালক অবস্থাতে বিবাহ দিতেছ, যুবতী হইতে না হইতে কত ও বিধবা হইয়া যাইতেছে; আর যৌবন অবস্থা হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত দুঃখ পাইতেছে। উহাঁদিগকে লোকে কষ্ট দেয়; এই নিঃসহায় বিধবা স্ত্রী লোকদিগের প্রতি লোকের তাচ্ছিল্য হওয়াতে সমাজের এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। পরিবারের মধ্যে কেহ স্বচ্ছন্দে থাকে আর কেহ পশুর ন্যায় দুরবস্থায় থাকে ইহার অপেক্ষা নিষ্ঠুর দৃশ্য চিন্তায় আইসে না। ভদ্রবংশোদ্ভব জ্ঞানবান মনুষ্যের বিশেষ কর্ত্তব্য এই যে, এই নিঃসহায় বিধবা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দ ভরণ পোষণ করেন যাহাতে তাহারা আপানাদের শোচনীয় অবস্থায় সর্ব্বদা কাতর না হয়। এরূপ অপেক্ষা এই ধর্ম্ম উত্তম যে, রাজা প্রজা পণ্ডিত! আপনারা সকলে বিচার করিয়া যাহার যে মান মর্য্যাদা যোগ্য তাহা নির্ব্বাহ করিয়া দিন। তাহাতে পুত্র ও কন্যার পিতাদিগের মান অপমান বোধ করা উচিত নহে। আর বিচার করিয়া দেখুন যে, মাতা পিতার এই ধর্ম্ম যে, পুত্র ও কন্যা কোন বিষয়ে কষ্ট না পায়, সকল বিষয়ে সুখী থাকে তবে তাহাই করুন। আর পুত্র কন্যার এই ধর্ম্ম যে, যাহাতে পিতা মাতার কোন বিষয়ে কষ্ট না হয়, আর সকল প্রকারের সুখ হয় তাহাই করুন, উহাঁদের আজ্ঞা পালন করুন। আর কুমারী অথবা বিধবা কন্যা যাহার ইন্দ্রিয়গণের ভোগের কোন ইচ্ছা না হয় কেবল পতিশব্দ যে শুদ্ধ-চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম পতিতোদ্ধারণ তাহার প্রতি নিষ্ঠা শ্রদ্ধা হয়, তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। এরূপ কন্যাকে পূর্ণরূপে নমস্কার।

* * *

আপনারা (পুরুষগণ) এক দিনও সহ্য করিতে পারেন না এবং সহ্য করেন না এবং আপন স্ত্রী মরিয়া যাইলে সর্ব্বদা বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিতেছ আর পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেছ; কিন্তু নিঃসহায় স্ত্রীলোকগণ কি করিবে? নির্দ্দয় হইয়া অবিচারে বেচারা স্ত্রীলোকের উপর নানা পীড়ন করায় জ্যোতিঃস্বরূপ অপ্রসন্ন হন এবং যাহারা ঐরূপে স্ত্রীপীড়ন করে পরব্রহ্ম তাহাদের ধন, রাজ্য বৈভব অতি অল্পকালেই নষ্ট করেন ও করিবেন, ইহা নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া জানিবে। আর যাঁহার নাম স্ত্রী পুরুষ, জীব শব্দ কল্পিত হইয়াছে তিনি কথনই অশুদ্ধ হন নাই; আর তাঁহার বিবাহ কখনও হয় না, তিনি জীব সদা অনাদি শুদ্ধ ও কুমাররূপে বিরাজমান থাকেন; যদি বিবাহ করিলে অশুদ্ধ হয়, তবে আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত কতই বংশেতে জন্ম হইয়াছে, আর কতই কুলেতে বিবাহ হইয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই, তবে ত সমস্ত লোকেরই পুত্র কন্যা

বিবাহ করিয়াছে এবং তাহার এক্ষণে অশুদ্ধ আর বিবাহের যোগ্য নয়। জীব সদা কুমারই থাকেন, যদিও জীবের বহু বিবাহ হয় তিনি শুদ্ধের শুদ্ধ কুমারই থাকেন, পুরুষ বা স্ত্রী রূপেই জন্ম গ্রহণ করুন; প্রমাণ, যেরূপ সোণার স্ত্রী ও পুরুষ দুই প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া শ্লোক পাঠ করিয়া উভয়েরই বিবাহ দেন তথাপিও তাহা শুদ্ধ সোণাই থাকিবে। বিবাহের পূর্ব্বেও যেমন এবং বিবাহের পরেও তেমন। এইরূপ জীব বিবাহের পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল এবং বিবাহের পরেও সেইরূপ শুদ্ধের শুদ্ধ থাকে, কেবল বুঝিবার ভেদ।

স্নেহলতা।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কিশোরী বিকালে বেড়াইতে গিয়াছিল, সন্ধ্যা না হইতে হইতে বাড়ী ফিরিয়া তাহার পাঠ গৃহের কৌচের উপর দুম করিয়া শুইয়া পড়িয়া ডাকিল "হ'রে।" কিন্তু কলিযুগ কিছু উলটায় নাই যে, বাঙ্গালীঘরের চাকর একডাকে উত্তর দিবে, যতক্ষণ ডাকের উপর ডাক না পড়িল হাঁকের উপর হাঁক না চড়িল ততক্ষণ ভৃত্য বাবু উত্তর দেওয়াটা আবশ্যকই বিবেচনা করিলেন না, অবশেষে নিতান্তই বাড়াবাড়ি দেখিয়া মোটা গলায় পূর্ব্ব বাঙ্গলা স্বরে গলা হাঁকিলেন, "এজ্ঞে"--এবং সঙ্গে সঙ্গে নারিকেল তেলের এক সেজ বাতি হস্তে স্বয়ং গৃহে প্রবেশ করিয়া আর একবার বলিলেন "এজ্ঞে ডাহিলেন?"

কিশোরীর মেজাজ তখন অত্যন্ত চড়িয়া উঠিয়াছে, মুখ ভঙ্গি করিয়া সে ভৃত্যের অনুকরণে ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—"এজ্ঞে ডাহিলেন? এতক্ষণ কোথায় ছিলি? বাবুর সাড়াই নেই!"

ভৃত্য নিস্পরোয়া ভাবে সেজটা টেবিলে রাখিয়া বলিল "এই বাতিটা আনতেছিলাম।"

কিশোরী। যা বাড়ীভিতর থেকে আমার খাবার আন। আজ আর সেখানে থেতে যাব না।"

"এজ্ঞে তা আনছি" বলিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল, কিশোরী ডেস্ক খুলিল, যাহা খুঁজিতেছিল না পাইয়া ডেস্কের ডালাটা দুম করিয়া ফেলিয়া বিরক্ত হইয়া চৌকিতে বসিয়া পড়িল। ভৃত্য লুচির থালা ও জলের গেলাস লইয়া ঘরে ঢুকিতেই উচ্চস্বরে বলিল—"কই আমার সেণ্টটা কোথা?"

ভৃত্য হাতের জিনিস টেবিলে রাখিয়া প্রশান্তভাবে বলিল—"দোকানদার আর 'দারে' দিল না—বল্লে ৬৫ টাকা।/ আনা পাঁচ পয়সা দেনা হয়েচে—আর সে দার দিচ্ছে না—আর এ টাকা দু একদিনের মধ্যে না পালেই বাবুকে জানাবে।"

কিশোরী। ৬৫ টাকা ধার! কিসে?

ভৃত্য। রেসমের রুমলই কত আনেছি—হরেক রকম শিশিই বা কত আনেছি—অডিকলমের ত নিকাশ নাই—হিসাবটা দেখুন না বাবু"

ভৃত্য ট্যাঁক হইতে একখানা কাগজ খুলিয়া কিশোরীর হাতে দিতে গেল, কিশোরী বলিল "ও থাক পরে দেখব—৬৫ টাকা! আচ্ছা দু তিন মাসের মধ্যে আমি দিয়ে ফেলব, দোকানদারকে একটু বুঝিয়ে বলিস বুঝলি?

ভৃত্য। "তা বলব, কিন্তু আপনকার দু মাসের ত আবার খরচ চলা চাই—"

কিশোরী। সে "তোর ভাবতে হবে না, আপাততঃ এই ছয় আনা নিয়ে একটা সেণ্ট কিনে আন, বুঝলি; আমার বাইরে যেতে হবে।"

ভৃত্য পয়সা লইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু অল্পদূর গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া বলিল— "দাদাবাবু, জীবনবাবু আসছেন!"

কিশোরী। জীবন দা! তা তুই অডিকলমটা এনে আস্তে আস্তে ডেস্কের মধ্যে রাখিস—বুঝলি?

কিশোরী গৃহের বাহিরের বারান্দায় আসিতেই জীবনকে দেখিতে পাইল, তাহাকে আসিতে দেখিয়া সে সত্যই বড় আশ্চর্য্য হইল, তাহার পিতা তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত জীবন আর কখনো এবাড়ীতে আসে নাই।

কিশোরী বলিল—"এস জীবনদা ঘরে এস, সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ যে?"

জীবন বলিল—"একটা কাজের কথা আছে।"

কিশোরী আরো আশ্চর্য্য হইল। দুজনে গৃহে প্রবেশ করিলে—জীবন বলিল— "আমার আজই নয়টার ট্রেনে পশ্চিম যাইতে হইবে, যে ১০০ টাকা এই রবিবারে সভায় দিবার কথা আছে তোমাকে দিয়া যাইতেছি তুমি দিও, ইহার জন্যই আমার আসা।"

কিশোরী বলিল—'হঠাৎ পশ্চিম যাইতেছ যে?'

জীবন বলিল—'বেশী কথার সময় নাই, আমার এখনি যাইতে হইতেছে, আসিয়া সে সব বলিব'।

বলিয়া জীবন ১০০ টাকার নোট কিশোরীকে দিয়া চটপট চলিয়া গেল।

আসল কথা মোহন রুড়কিতে পীড়িত তাই জীবন সেখানে যাইতেছে। জগৎ বাবুর নিকটই টেলিগ্রাফে এ খবর আসে। কিন্তু কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া তাঁহার সেখানে যাইবার সুবিধা না হওয়ায় জীবনের নিকট তাঁহার এ কথা প্রকাশ করিতে হইয়াছে। এবার প্রথম আশ্বিনেই পূজা গিয়াছে, সুতরাং এখনো স্কুল কলেজ বন্ধ, এ সময় পশ্চিম যাইতে জীবনের কিছু মাত্র অসুবিধা নাই। জীবনকে ব্যতীত আর একজনকে মাত্র জগৎ বাবু এ কথা বলিয়াছেন। কুঞ্জবাবু মোহনের পীড়ার কথা শুনিয়া প্রথমটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন—তাহার পর বেহাইকে বলিলেন—"তোমরা তার আপনার লোক, তোমাদের কাছে খবর এসেছে—তোমরা তদ্বির কর, আমি আর কি করব।" কিন্তু জগৎ বাবু চলিয়া গেলে কুঞ্জ বাবু বুড় সরকারকে ডাকিয়া সেই দিনই তাহাকে পশ্চিমে পাঠাইবার বন্দবস্ত করিলেন, এবং যে কয়দিন পর্য্যন্ত তাঁহার আরোগ্য সংবাদ না পাইলেন সে কয়দিন ঘর হইতে বাহির হইলেন না। কিন্তু এখবর কিছু আর জীবন জানিত না—তিনি যে জগৎ বাবুকে কড়া কথা বলিয়া বিদায় করিয়াছেন তাহাই

মাত্র সে শুনিয়াছিল। সুতরাং এরূপ স্থলে কিশোরীকে মোহনের পীড়ার সংবাদ দিয়া তাহাকে কেবল বৃথা ভাবনায় ফেলিতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

জীবন চলিয়া গেল, কিছু পরেই ভৃত্য গৃহে প্রবেশ করিয়া কিশোরীর হস্তে অডি-কলমের শিশি দিয়া বলিল—"এই আনিছি। কিন্তু বড় ভাবনা ধরায়েছে, দোকানদার পাজি কিছুতেই রাজি হয় না, বলে আজ কাল টাকা না পালেই সে বাবু মশয়কে জানাবে,—আমি কত সমজাগাম কিছুতেই কথা মানে না, বলে বাবু যদি না টাকা দেন ত নালিস করবে।"

কিশোরী পকেটে হাত দিয়া বলিল—"পাজি ছোটলোক, খবরদার তুই তাকে আর খোসামোদ করিস নে, এইনে তার টাকা আজই চুকিয়ে দে, রসিদ না নিয়ে যেন দিস নে।"

কিশোরী ১০০ টাকার নোট হইতে ৭০ টাকার নোট তাহাকে দিয়া বলিল,—

"এই নে ৬৫ টাকা তাকে দিয়া বাকীটা তোর কাছে রাখ।"

ভৃত্য। ৬৫—/০—/৫—

কিশোরী। আচ্ছা তাই।"

ভৃত্য। কি জানি শেষে আমারে দুষবেন—কবেন পাঁচ আনা পাঁচ পয়সা আমার কোথায় গেল—তাই আগে থাকতে বলে রাখা ভাল—"

চাকর চলিয়া গেল—তাহার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল অত টাকা বাবু হঠাৎ কোথায় পাইলেন? অন্য কোন কারণ না পাইয়া অবশেষে স্থির করিল বাবু জ্যেঠাইমা মাগীর ঘাড় ভাঙ্গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের ন্যায় সহজ সিদ্ধান্ত। সমস্যা ভঙ্গ হইয়া গেলে তখন যেন আনন্দ করিবার অবকাশ পাইল। ভাবিল মাগী হাত তুলে ত দু পয়সা কাউকে দিসনে এমনি করে না নিলেই বা চলে কই! চাকরি করতে এসেছি দু পয়সা ত নিতে হবে। এত করে নইলে খাওয়াতে শেখালুমই বা কেন? এখনো দুপয়সা পাব বড় হলেও দু পয়সা পাব—এ রকম নইলে ত বড় মানুষের হাত ওঠে না।

চাকর কাজ উদ্ধার করিয়া চলিয়া গেল, মনিব কাজ উদ্ধারের চেষ্টায় তখন জ্যেঠাইমার কাছে বাড়ী ভিতর গেলেন। জ্যেঠাইমা তখনো বারাণ্ডায় বসিয়া হরি-নামের মালা করিতেছিলেন—কিশোরীকে দেখিয়া বলিলেন—

"কিশোর নাকি, বাবা দুদিন বিকালে খেতে আসিস নি কেন রে?

কিশোরী সেকথার উত্তর না দিয়া বলিল "জ্যেঠাইমা পূজার পার্ব্বনী?

জ্যেঠাইমা বলিলেন—"এই সে দিন কেড়ে কুড়ে যা দশটাকা হাতে ছিল নিয়ে গেলি, আবার কোথা পাব? থাকলে ত তোরি সব।"

কি। "না জ্যেঠাইমা আমিওকথা শুনব না আমায় কলেজের ছেলেরা খাওয়াতে ধরেছে।"

জ্যে। "কেন তোর বাপ যে সে দিন ঐ জন্যে ১০ টাকা দিলে?"

কি। হ্যাঁ ১০ টাকাতে ত সবই হয়? এ ত আর তোমাদের সেকালে চিঁড়ে মুড়কির ফলার নয়—বাবা ত আর তা বোঝেন না”—

জ্যে। তা তোর বাবাকে বলগে, আমি গরীব মানুষ আমি কোথায় পাব—হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ”—

কি। “সে কথা আমি শুনব না, উঠ জ্যেঠাইমা নইলে—নিই চাবি নিই—”

জ্যেঠাইমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন “ছুঁসনে আরে ছুঁসনে আমার মালা করা বন্ধ করিস নে।

কিশোরী বলিল—বাক্স খোল তবে—নইলে ছুঁই—

জ্যেঠাইমা শশব্যস্ত হইয়া খুঁটের চাবি বাঁ হাতে ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বিনীত স্বরে বলিলেন “লক্ষ্মী বাবা, আমার কিছু নেই। টাকা কি আমার আছে? সে দিন ত তুই সব নিলি”—

কিশোরী। “হরি নামের মালা হাতে করে মিথ্যা কথা, আছে কি না আছে আচ্ছা দেখছি”—কিশোরী জোর করিয়া তাহার হাতের চাবি কাড়িয়া লইল, জ্যেঠাইমা চীৎকার করিতে লাগিলেন “এমন দস্যি ছেলে দেখিনি—দাঁড়া এক্ষণি ঠাকুরপোকে বলে দিচ্ছি—আমার আর এখানে থাকা হোল না।” সে চীৎকারে কে কর্ণপাত করে? তাহার প্রতি কোন লক্ষ্যই না করিয়া কিশোরী আলমারি খুলিল। আলমারিতে একটা কৌটার ভিতর যেখানে তাঁহার টাকা পয়সা থাকিত তাহাতে কিছুই না পাইয়া বুঝিল জ্যেঠাইমা সেয়ানা হইয়াছেন। তখন আলমারির কাপড় চোপড় তোলপাড় করিয়া তাহার মধ্য হইতে একটি বাক্স বাহির করিল, এতক্ষণ জ্যেঠাইমা একটু নিশ্চিন্ত ছিলেন—কিন্তু বাক্স দেখিয়া আবার চীৎকার আরম্ভ করিলেন, বলিলেন—“লক্ষ্মী বাবা, নিসনে, আমার আর কিছু নেই, হাত খরচ চলবে না” —তিনি চীৎকার করিতে করিতে এদিকে কিশোরী বাক্স খুলিয়া ফেলিল। কিন্তু এত কষ্টের পর দেখিল মোট ১০ টাকার নোট মাত্র তাহাতে রহিয়াছে। নিতান্ত অসন্তুষ্ট ভাবে সেই নোট লইয়া বাক্সের ডালা দুম করিয়া ফেলিয়া বলিল—“হাত খরচের তোমার ভাবনা? বাজার খরচ ত তোমার হাতে। জ্যেঠাইমা আমাকে আর কিছু না দিলে হবে না।”

জ্যেঠাইমা তখন ভারী রাগিয়া উঠিয়াছেন—বলিলেন ‘সব নে, যা আছে সব নে, আমি এই ঠাকুরপোর কাছে চল্লুম।”

কিশোরী সে বিষয়ে বেশ নিশ্চিন্ত। মুখে যাহাই বলুন সে এইরূপ আবদার করে বলিয়াই তিনি তাহাকে বেশী ভাল বাসেন। কিশোরী বলিল—“তা বাবা না হয় আমাকেও বাড়ী হইতে দাদার মত বিদায় করিবেন”—

গৃহিণীর চীৎকার হঠাৎ কমিল, বলিলেন—“হ্যাঁরে মোহনের খবর কিছু পেলি—ভাল আছে ত?”

কিশোরী। খবর আমি কি পাব—ডাক্তারবাড়ী "খবর জিজ্ঞাসা করো"।

জ্যে। "তা তোর ত ডাক্তারের ছেলের সঙ্গে ভাব—কিছু শুনতে পাস নে ?"

কি। হাঁ৷ আমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা কবি ? দাদা আমাদের চিঠি লেখে না—এ অপমানের কথা তাদের জানাবার কি আবশ্যক ?"

বলিতে বলিতে চাবিটা তাঁহার পায়ের কাছে ফেলিয়া সে পিঠটান দিল।

কর্ত্রী হাঁকিলেন—"ও কিশোরী দিয়ে যা, লক্ষ্মী ছেলে, আমার হাত খরচের কিছু নেই।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কিশোরী বড় ভাবনায় পড়িল। জ্যেঠাইমার কাছ হইতে টাকা লইয়া অন্ততঃ জীবনের টাকাটা পুরাইয়া রাখিতে পারিবে তাহার এইরূপ দৃঢ় আশা ছিল। নিরাশ হইয়া বড়ই দমিয়া গেল। পরদিন আর একবার জ্যেঠাইমাকে ধরিয়া পড়িল, কিন্তু কোনই ফল হইল না। জ্যেঠাইমা ঐ নোট খানি মাত্র হাতে রাখিয়া সমস্তই তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। তখন উপায় বিহীন হইয়া সে হরিকে ধরিয়া পড়িল, "যদি সে কোন প্রকারে কাহারো নিকট হইতে তাহাকে ধার আনিয়া দিতে পারে।" হরি দেখিল বড় গোলের কথা, মনে মনে যাহা স্থির করিবার করিয়া মুখে বলিল—"তা বাবু চেষ্টা করিয়া দেখি—আপনার দরকার হইলে সব করিতে হয়।" "প্রভুভক্ত হরি আহারান্তে চাদর ছাতা লইয়া বাহিরে গেল—বাবু ভাবিলেন এমন নেমকের চাকর আর নাই। তাহার অপেক্ষায় উৎসুক ভাবে পথের দিকে চাহিয়া সেদিন কিশোরীর দিন কাটিল। এদিকে সারাদিন দেশের লোকের কাছে কাটাইয়া সন্ধ্যাবেলা চাকর বাবু আসিয়া দেখা দিলেন, কিশোরী ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হইল ?" ভৃত্য বাবু উত্তর দিল—"মশায়—কত জায়গায় যে ঘুরেছি ঠিক নাই—জলতেষ্ঠায় প্রাণ টা টা করছে।"

কিশোরী। কিন্তু টাকা—"

ভৃত্য। "টাকাত কেউ দিলে না, এমন পাজি নচ্ছার বেটারা যদি দেখেছি—কি বলব আমার হাতে টাকা নাই—দমফাটি মরচি।"

কিশোরীর মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না, একমাত্র আশায় নিরাশ হইল। তাহার সেই নিরাশ ক্লান্ত মুখ দেখিয়া ভৃত্যেরও মমতা হইতে লাগিল। বলিল "বাবু মশায় তা টাকা নিয়ে কি করবেন কি—কর্ত্তাকে চাইলে দেন না ?" কিশোরী রাগিয়া বলিল—'যা এখান থেকে। "উনি অ্যাডভাইস দিতে এলেন!"

ভৃত্য আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। কিশোরী তাহার ডেস্ক খুলিয়া অডিকলমেব শিশি হইতে ঢক ঢক করিয়া মুখে ঢালিল—ঢালিয়া কৌচে শুইয়া পড়িল। কিছু পরেই

জুতার শব্দ হইল—কিশোরী মুখ তুলিয়া দেখিল—কার্ত্তিক বাবু। শশব্যস্তে উঠিয়া আহ্বান করিয়া বলিল—"এই যে মাষ্টার মশায়—বসতে আজ্ঞা হোক, কি খবর ?"

কার্ত্তিক বাবু কিছুদিন কিশোরীকে পড়াইয়াছিলেন।

কার্ত্তিক বাবু আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"বলি এবারকার মিটিংটা কোথায় হচ্ছে—সেইটে জানতে এলুম।"

কিশোরী। সেই বাগানেই এবারো হবে—তেমন সুবিধার জায়গা অন্য কোথায় বলুন।"

কার্ত্তিক। কিন্তু আমাদের ত সেটা বড় সুবিধা মনে হয় না। রোজ রোজ ট্রেনে করে যাওয়া—আপনারা বড় মানুষ লোক আপনাদেরই তা পোষায়। Rich men are nature's favourites! আজ যেন আফিস বন্ধ আফিস খুল্লে ত কোন মতেই যেতে পারব না।"

কিশোরী। রবিবারে কি আপনাদের আফিস থাকে নাকি ?

কা। সমস্ত হপ্তা খাটব মশায়—তাপর ত বাড়ী ঘর আছে। Home, sweet home.

কিশোরী বলিল—"সুইটের কথা যদি বল তাহলে আমি ত বলি টাকার মত সুইট কিছু নেই ?"

আপাততঃ টাকার অভাবই কিশোরী কি না মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল। কার্ত্তিক বাবুও কথাটা ঠিক বলিয়া বুঝিলেন, মনে মনে করিলেন "তানইলে আর তোমাদের দলে ভিড়িয়াছি বাবা। তবে টাকাটা হাতে না পাইলে বিশ্বাস নাই।"

তিনি চৌকিখানা কিশোরীর একটু কাছে টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—"কিশোরী বাবু—আমার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে—সভার সব লোক ত বিশ্বাসী ?"

কিশোরী। কেন বলুন দেখি ? আমরাত সেইরূপ জানি।

কার্ত্তিক। আমার বিশেষ সন্দেহ হচ্ছে—কথাটা কি শুনেছেন ? কাল রাত্রের খবরটা ? কাউন্সেলে হঠাৎ রাতা রাতি gagging act টা পাশ হোল কেন বলুন দেখি ?

কিশোরী। Down right injustice!

কার্ত্তিক। আঃ সে যেন হোল,—তা আমি বলছিনে। আমার ভয় হচ্ছে বেটারা এ সভার খবরটা পেয়েছে।

কিশোরী হাসিয়া উঠিল—কার্ত্তিক বাবু বলিলেন—"আরে দাদা হাসি নয়—ইংরাজদের চেন না তোমরা,—ওরা সব খবর পায়—ওদের গুপ্তচর যেখানে সেখানে।" এমন রহস্য জমাইবার সুযোগ কে ছাড়ে। কিশোরী হাস্য সম্বরণ করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—"তাই বটে! মাষ্টার মশায় আঁচেন ঠিক! নইলে কোথাও কিচ্ছু নেই—এক বেটা ইংরাজ সেদিন গাড়ীতে মোশায় হাতাহাতি লাগায় ?

কার্ত্তিক। আমি তখনি ত ঠিকটা এঁচেছিলুম। তাহলে হাতাহাতিটা সত্যি হয়েছিল ?

তখন বাবা তোমরা লুকোলে—ভাবলে লোকটা বড়ই বোকা—অমনি বুঝে যাবে।

কিশোরী। মশায় দেশের জন্য কত লোকে প্রাণ দিচ্ছে আমরা ঐটুকু সইব না, তাও বলে বেড়াতে যাব ?

কার্ত্তিক। তা বাবা তোমরা প্রাণ দেও। আমি এ রকম জায়গায়,—না বলছি কি—বলি সত্যি কি সবাই টাকা দেবে ?

কিশোরী। কিসের ?

কার্ত্তিক। এই সাবানের জন্য ? প্রাণ বাবা সবাই কথায় কথায় দেয়—টাকাটা দেওয়াই কঠিন—"

কিশোরী কার্ত্তিক বাবুর মনের অভিপ্রায় বুঝিল, হঠাৎ তাহার এক বুদ্ধি যোগাইল, মনে হইল—তাঁহাদের যদি আপাততঃ সভা হইতে ভাগাইতে পারে ত এ যাত্রা সে বাঁচিয়া যায়। বলিল—"মশায় আপনার পাকা বুদ্ধি—আমি আর কি বলিব ? ঘরের কথা বলিতেও ইচ্ছা করে না—"

কার্ত্তিক। বুঝেছি—টাকা পাবার আশা নেই, আমিও ত ভাবছি—সব ছেলে ছোকরা, টাকা অত যোগাবে কি করে। কিন্তু তুমিই ত বাবা তখন আশা দিয়ে নিয়ে গেলে,—"

কিশোরী। আমি কি এখনো বলছি যে কিছু হবে না—"

কার্ত্তিক। তা বলছ না ত কি ? কিন্তু বাবা তুমি আছ— জীবন আছে—

কিশোরী। দাদা পশ্চিম গেছে। আর আমারো বোধ হয় টাকাটা দেবার আপাততঃ সুবিধা হোল না। কি জানেন বাবাকে বলতে সাহস পাচ্ছিনে, সম্প্রতি এই মারামারিটা হোল, কি জানি যদি বলে বসেন সভাটা ছাড়।"

কার্ত্তিক। বটে শেষে এই ! তা তোমরা প্রাণ দিতে হয় দেও আমি ত সভা ছাড়ছি। এখন ভাইটাকে বোঝাতে পারলে হয়।

কিশোরী। ওকি কথা মশায়—

কার্ত্তিক। আর বাবা ! আমি ত ধনে প্রাণে মরব বলে সভায় যোগ দিইনি। ক দিন হতে আফিসের সাহেব বেটা কথায় কথায় খুঁৎ ধরতে আরম্ভ করেছে, তখনি বুঝেছি ব্যাপারখানা কি ? আর কিছু দিন যদি সভায় থাকি মশায় চাকরীটি পর্য্যন্ত যাবে। তোমরা বড় মানুষ তোমাদের ভাবনা কি, দেশহিতৈষিতা নিঃস্বার্থপরতা তোমাদের পোষায়, আমাদের ত আর তা চলে না। [illegible]ই সেই খবরটা নিতেই এলুম ; স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলে ত খুলে বলবে না। এখন সব শুনলুম—এখন মনের কথা লুকোনর দরকার নেই। এখন যাই ভাইবেটাকে বোঝাইগে, সভার প্রতি ত তার দারুণ বিশ্বাস ; এ কথা শুনলে দেখি কেমন বিশ্বাস থাকে ? সভার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ এই পর্য্যন্ত।"

কিশোরী। কেন আসছে রবিবারটা না হয় নিদেন চলুন—resign দিতে গেলেও ত সে কথাটা তাদের বলতে হবে ?"

কার্ত্তিক। না বাবা সে মুখো আর হচ্ছি না, তা হলেই সাহেব বেটারা ধরবে, চাকরীটি যাবে। resign বাবা এই তোমার কাছেই দিলুম, তুমিই জানিও।”

কিশোরী। কিন্তু গণেশ বাবু”।

কার্ত্তিক। গণেশ বাবু! এখনো মশায় joint family system যায় নি, বড় ভাই থাকতে ছোট ভাইয়ের মত চলে না বুঝলে বাবা? সে আর এ মুখো হতে পাচ্ছে না, তার মুখের কথা আমিই বলে গেলুম। আর বলেন ত দুনামেই আমি রিজাইন লিখে দিয়ে যাই”।

কার্ত্তিক বাবু ত চলিয়া গেলেন। কিশোরী হাসিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দু এক দিন পরে খবরের কাগজে একটি সংবাদ পড়িয়া হাসির বদলে তাহার অত্যন্ত রাগ উপস্থিত হইল। খবরটা প্রত্যক্ষ বলিয়া লিখিত। সংবাদ দাতা নাকি ঘটনার সময় একগাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। (কথাটা সত্য, তবে এক কামরায় উপস্থিত ছিলেন না—এ কথাটা তিনি উল্লেখ যোগ্য মনে করেন নাই)। সহসা অকারণে একজন ইংরাজ একজন নিরীহ বাঙ্গালী ছাত্রকে ধরিয়া মারিতে আরম্ভ করিলেন, এমন তেমন মার নয়—তাহার পর ছাত্রের সঙ্গে যদিও তাঁহার দেখা হয় নাই তথাপি ছাত্র যে তাহার পর শয্যাগত হইয়াছে ইহা সংবাদ দাতার বিশ্বাস। ছাত্রের প্রকাশ্য অপরাধ সে ইংরাজের সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়াছিল। কিন্তু ভিতরের কথা, সংবাদদাতা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন—যে সাহেবের বাঙ্গালী মাত্রেরই উপর রাগ কারণ বাঙ্গালীরা বিদ্যা বুদ্ধিতে সাহেবদের সমকক্ষ হইতে চাহে। উক্ত ছাত্রটি সম্প্রতি এক দেশহিতৈষী সভা করিয়া এই সাহেবের বিশেষ ক্রোধের পাত্র হইয়াছেন। ইংরাজরা যে এই কারণে সম্প্রতি gagging act করিয়াছেন সংবাদদাতা এইরূপও আভাষ দিয়াছেন।

এই সংবাদ অবিলম্বে সমস্ত সহরে গ্রামে ব্যাপ্ত হইল, কিন্তু যাহাদের লইয়া এ ঘটনা লিখিত কিশোরী ছাড়া তাঁহারা কেহই বুঝিলেন না—যে তাঁহারা কেহ ইহার নায়ক। সুতরাং তাঁহারাও সকলে সেই অত্যাচারিত ছাত্রকে দয়া করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

তিনটা বাজে বাজে, এখনো সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়ের দেখা নাই, আগন্তুক সভ্যগণ যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে, এই সময় কিশোরী (সম্পাদক) সভাগৃহে পদার্পণ করিতেই, চারিদিক হইতে তাহার উপর বাক্যবাণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। যাদব বলিল—“এই যে কিশোরী বাবু, এতক্ষণে বুঝি ‘বার’ হোল?”

কৃষ্ণ। ওঁরা বাবু লোক মেজাজে চলেন? ওঁদের উপর কথা কয় কে?

শ্যাম। আমরা শালারাই চোরদায়ে ধরা পড়িছি!

হেম। আরে ভাই তুমি ত এলে সভাপতি মশায় কি এখনো নিদ্রে দিচ্ছেন?

কিশোরী। দাদা পশ্চিম গেছে।

নবীন এতক্ষণ কোন কথা কয় নাই, নীরবে চুরট টানিতে টানিতে ঘূর্ণমান ধূম কুণ্ডলীর দিকে চাহিয়া গুম হইয়াছিল, কিশোরীর কথা শুনিয়া এতক্ষণের পর বলিল "পশ্চিম!"

গোপাল। কথা নেই বার্ত্তা নেই হঠাৎ পশ্চিম! বেশ বেশ, তিনি যান পশ্চিম তুমি যাও দক্ষিণ আর আমরা শাগারা ১০টা থেকে এইখানে বসে থাকি!

জীবন। একতা, দৃঢ়তা, নিষ্ঠতা!

কিশোরী রাগিয়া বলিল—"কেহ ত আর এমন প্রতীজ্ঞা করে নাই যে সভার মেম্বর হইলে কোথাও যাইবে না?

বিহারী। তাহা নাই করুক—কিন্তু যখন সকলেই তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে তখন সময়ে সে কথা সভায় জানান উচিত ছিল।

কিশোরী। সম্পাদককে জানানই সভাকে জানান, তাঁহার কাজ তিনি করিয়াছিলেন, আমি দৈবক্রমে আজ সকাল সকাল আসিতে পারি নাই।

এই সময়ে নবীনের পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল—

"কিন্তু শুধু আসিবার ত কথা নয়—আরো কিছু সঙ্গে আনিবার কথা, তাহার কিছু ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন?"

কিশোরী চমকিয়া উঠিল, গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র বাক্যবাণে আক্রান্ত হওয়াতে তাহার আর চারিদিক ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ ছিল না, সুতরাং গণেশচন্দ্র যে নবীনের আড়ালে বসিয়া আছে তাহা সে দেখে নাই। কার্ত্তিকচন্দ্রের কথায় সে এমনি বুক আঁটিয়া আসিয়াছিল—যে তাহাদের কাহারো আসিবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তাহার মনে হয় নাই। হঠাৎ গণেশের কথা শুনিয়া সে নিতান্তই ভড়কিয়া গেল। তাহার কথা যোগাইল না।

চারু বলিল "কিশোরী বাবু, আমার টাকা সবটা আমি এবার আনতে পারিনি—৫০ টাকা এনেছি, ৫০ আসছে বারে দেব।"

গণেশ। একজন ত সমূলেন বিনশ্যতি—একজন ত অর্দ্ধেক, কিশোরী বাবু আপনি কি এনেছেন?

কিশোরী পকেটে হাত দিয়া বলিল—"হ্যাঁ—তা এনেছি বই কি? কিন্তু কার্ত্তিক বাবু ত আসেন নি?

গণেশ। গণেশ চন্দ্র ত এসেছেন?

কিশোরী। কিন্তু কার্ত্তিক বাবুর সঙ্গেই আমার কথা বার্ত্তা—

গণেশ। আপনি কি তাহলে আমাকে অবিশ্বাস করেন?

কিশোরী। এ অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না কিন্তু busin ess is always business.

গণেশ। কিন্তু আসলে ত আমিই কাজ করব, দাদা ত কিছু করবেন না।"

নবীন। ভাই কিশোরী! এখানে ঠিক business এর মত ব্যবহার করলে চলবে না, যখন আমরা ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হয়েছি—তখন যদি পরস্পরকে আমরা অতটুক বিশ্বাস না করতে পারি—তাহলে এ ভ্রাতৃত্বের অর্থই বা কি, আবশ্যকই বা কি?

যাদব। এখন ও কথা উত্থাপন করলে কিশোরী বাবু আপনিই দোষী হন, যদি উনি আপনার বিশ্বাসের পাত্র না তবে আপনি ওঁকে সভায় recommend করলেন কেন?

কিশোরী। আচ্ছা বেশ আমিই দোষী। সকলেই যদি এরূপ করে আমার দোষ দেখেন—আমি আপনা হতেই resign দিচ্ছি—আপনারা আর এক সেক্রেটারী দেখুন"। চারু ব্যস্ত হইয়া পড়িল, বলিল—"কিশোরী বাবু কি বলেন কি? আপনি resign দিলে কি এ সভা থাকবে? রাগের মাথায় একটা কাজ করবেন না; আমাদের উদ্দেশ্যটা ভেবে দেখুন?

কিশোরী। আমি যে এত খাটছি, টাকা বল কড়ি বল এত ত্যাগ স্বীকার করছি—পড়াশুনার হানি করছি, অনেক সময় বাপের বিরক্তিভাজন হচ্ছি, কিসের জন্য? কার জন্য?

নবীন। যেজন্যই হোক, আমাদের অনুগ্রহ করার জন্য নহে।

কিশোরী। তা কি আমি বলছি? আমি জানি আমি অযোগ্য—আমি ত আগেই resign দিয়েছি!

চারু। নবীন বাবু আপনি একটু বেশীদূর যাচ্ছেন। ওঁকে থাকতে অনুরোধ করুন।

নবীন স্বভাবতঃ নৈরাশ্যপ্রবণ। জগতের অমঙ্গল দিকটাই তাহার দৃষ্টিতে আসে—অল্পেতে আশা ভরষা ঘুচিয়া যায়, সুতরাং এই ঘটনায় সে উদাসীন হইয়া পড়িল—তাহার মনে হইল—এ সভা বাঁচিয়া কোন লাভ নাই ইহার সমস্তই বৃথা, সমস্তই sham। সে বলিল "আমিও resign দিচ্ছি। ত্যাগ স্বীকারের মর্য্যাদা কোথা—যদি আমরা তাহাতে কষ্ট অনুভব করি,—যদি আমরা তাহা ত্যাগ বলিয়া মনে করি? কিশোরীর কথায় প্রকাশ পাইতেছে এই, যে আমরা আত্মবিসর্জ্জন কাহাকে বলে জানিনা—সত্যের মর্য্যাদা, উদ্দেশ্যের মর্য্যাদা রক্ষা সুতরাং আমাদের কর্ম্ম নহে। সভার কর্ত্তা যাহারা তাহাদের মধ্যে যখন সময়ের জ্ঞান নাই অনুষ্ঠানের দৃঢ়তা নাই, অঙ্গীকার করিয়া তাহারা পালন করে না, সত্য তিরস্কারটি পর্য্যন্ত যখন তাহাদের মর্ম্মে সহেনা—তখন এ সভা বিড়ম্বনা মাত্র।

আগে নিজের চরিত্র গঠন—তবে উচ্চ কার্য্যের অনুষ্ঠান। সভা ভাঙ্গুক তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু আমাদের অযোগ্যতাই ইহার কারণ ইহাই প্রকৃত দুঃখ। কিন্তু উপায় নাই।"

অন্য যুবকেরা ইহার পর অনেকে অনেক কথা কহিল কিন্তু কিশোরী ও নবীন বড়

বেশী কথা কহিল না; সুতরাং চারিদিকের নিরানন্দ অবস্থাতেই সে দিন সভা ভঙ্গ হইল।

গুর্জ্জর।

রাজপুতানার মরুভূমি, মরীচিকা, গন্ধর্ব্ব নগর ও ওয়েসিস্ প্রভৃতি শব্দগুলি বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু দেখা হইল না। চিরবাঞ্ছিত চিতোর দর্শনের কামনা বিসর্জ্জন দিয়া ক্রমে বাষ্পীয় শকটে গুর্জ্জর দেশের সিকতাযুক্ত ভূমিতে উত্তীর্ণ হইলাম। জোয়ারা ও বাজরার ক্ষেত্র মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতে লাগিল। কৃষাণ বালক বালিকাগণ ধূমযান দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। আর স্ত্রীলোকের ঘাগরা দেখা গেল না, তাহাদের পরিধেয় এক্ষণে লম্ববস্ত্র, করভূষণ লোহিত কাষ্ঠের একখানি করিয়া বাঁউড়ি। গাড়ির মধ্য হইতে দেখাইয়া "এই গ্রামখানি গাইকোয়াড়ের, এই খানি ইংরাজের" লোকে ইত্যাকার কথোপকথন করিতেছে। রাজপুতানা মালয়া রেলওয়ের ষ্টেশন গৃহগুলি সমস্ত কঙ্গুরাদার। এস্থানে আরোহীদিগকে জল কিনিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হয়। "ব্রাহ্মনীয়া পানি" ও "মুসলমানী পানি" বলিয়া জাতি খ্যাপন করিয়া জল দিয়া বেড়াইতেছে। সাবরমতি জংশনে আমাদের টিকিটগুলি লইল। অহম্মদাবাদ পরবর্ত্তী ষ্টেশন। অনতিবিলম্বে সাবরমতি সেতু পার হইয়া অহম্মদাবাদ নগর মধ্যে গাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। ষ্টেশন হইতে বহির্গত হইবামাত্র বাড়ীওয়ালা ও বাড়ীওয়ালীদিগকে দেখিতে পাইলাম। একজনের সঙ্গে বাটীতে যাইয়া উঠিলাম। বেলা অবসান দেখিয়া তখনি "শীঘ্রং" (সিগরাম) ভাড়া করিয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। ঘর বাড়ীর আকার সুন্দর নহে, সমস্তই খোলার চাল। আমরা প্রধান রাজপথ অতিক্রম করিয়া চলিলাম। এক পার্শ্বে চাহিয়া দেখি, একটা পুরদ্বারের মধ্যে অসংখ্য লোহিত বর্ণের বৃহদাকার উষ্ণীষ প্রাঙ্গণ সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। ঐস্থানের নাম মানিক চৌক। উষ্ণীষধারীগণ রথ্যা সমাকীর্ণ করিয়া বস্ত্র ক্রয় বিক্রয় করিতেছেন। আমার চক্ষে প্রথমতঃ মানুষ পড়ে নাই কেবল পাগড়ির সমুদ্র নয়নগোচর হইয়াছিল। ক্রমে তিন দরয়াজা ছাড়াইয়া ভদ্রকালী মাতা দর্শন করিতে অবরোহণ করিতে হইল। আমাদের আগমন বিষয়ে দুই একজন নাগরিক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। স্থানটি বিলক্ষণ সমৃদ্ধ। প্রাচীন মহত্ত্বের চিহ্ন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। পরদিন প্রাতে গাড়িওয়ালাকে সহায় করিয়া ভ্রমণ আরম্ভ করিলাম। ১৪১২ খৃষ্টাব্দে সুলতান অহম্মদ শাহ কর্ত্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বে এস্থানের নাম অশ্ববল ও

কোনও সময়ে কর্ণাবতী ছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রাজমান্য রাজেশ্বর পেশওয়ার হস্ত হইতে বৃটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছে। হত্তিভাই নির্ম্মিত জৈনমন্দির দেখা হইল। পথিমধ্যে নগরশেঠ প্রেমাভাইয়ের বাটী পাওয়া গেল। কিছুদিন হইল ইনি দুইটি যমজ কুমারীর একটি আপনি বিবাহ করেন, অপরটি পুত্রের সহিত বিবাহ দেন। জুম্মা মহজিদ, রাণীকা রোজা, ভীল তনয়া রাণী শিপরী ও শাঅলমকা রোজা এবং বাদসাহদের গোরস্থান প্রভৃতির ভাস্করের কর্ম্ম অতি বিচিত্র। গুজরাতের মুসলমান রাজা অহম্মদ শা ও শাঅলম প্রভৃতি হিন্দুবংশসম্ভূত ছিলেন, এজন্য তাঁহারা যে সকল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ বাটী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার গঠন প্রণালী সম্পূর্ণ সারাসেনিক অর্থাৎ আরব্য ভাবাপন্ন নহে। কঙ্করিয়া তলাও অতি মনোরম স্থান। ইহার প্রাচীন নাম হৌজ-ই-কুতব। ১৪৫১ অব্দে সুলতান কুতবউদ্দীন (গুজরাতের রাজা) এই সরোবর খাত করেন। ইহার চতুর্দ্দিক সোপানবদ্ধ ছিল। জলাশয়টি চারিদিকে ১ মাইল হইবে। মধ্যস্থলে এক দ্বীপ আছে, তাহার নাম নগিনা অর্থাৎ অঙ্গুরী মধ্যবর্ত্তী রত্ন। ঐদ্বীপে বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ শোভমান। মধ্যস্থলে ঘটমণ্ডল। তীর হইতে দ্বীপে যাইবার জন্য তৃণ-শষ্প-শোভিত সুন্দর পথ—সেতু নহে। কয়েক বৎসর হইল কালেক্টর সাহেব সংস্কার দ্বারা এই সরোবরের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা বিধান করিয়াছেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্নানের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে এক ব্যক্তি সারঙ্গি লইয়া উপস্থিত। তাহার ব্যবসা নৃত্যগীত। অসময় বলিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে কহিলাম। সে স্বীয় যজ্ঞোপবীত আকর্ষণ করিয়া, অঙ্গরক্ষা সরাইয়া উদর দেখাইল, সুতরাং তাহাকে কিছু দিয়া বিদায় করিতে হইল। তিনি কিছু পাইয়াছেন শুনিয়া তাঁহার সতীর্থ বীণা স্কন্ধে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে নিষ্কামভাবে কেবল আশীর্ব্বাদটি করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলাম।

বড়োদা। রজনীর শেষ ভাগে গাড়ি হইতে নামিয়া ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইতে হইল। তখন উপরে রোশন. চৌকি বাজিতেছে। প্রভাতে উঠিয়া দেখি সেটি এক দেবালয়। এদেশে যে ব্যক্তি দেব গৃহ নির্ম্মাণ করে সে পান্থনিবাসেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকে। আমরা এক্ষণে আবার পবিত্র হিন্দুরাজ্যে সমাগত। সহরে লক্ষাধিক লোকের বাস। যেমন সর্ব্বত্র হইয়া থাকে প্রধান রাজপথটি অতিশয় সমৃদ্ধ। মতিবাগ ও নজরবাগ প্রভৃতি দর্শন করিয়া, বেচড়াজীর মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। ভবানী মূর্ত্তি আপাদ মস্তক হীরক অলঙ্কারে ভূষিত। আজ মহা অষ্টমী। বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। গাইকোয়াড় স্বয়ং অর্চ্চনা করিয়া গেলেন। প্রাঙ্গণে গরবো নামক সঙ্গীত হইতেছে। প্রথমতঃ একজন প্রগল্‌ভা রমণী রঙ্গস্থলে অবতীর্ণা হইলেন। তিনি সহচরীগণকে আহ্বান করিয়া মণ্ডলীকৃত করিলেন। সংখ্যা ন্যূন হওয়ায় যাহারা গান করিতে ইচ্ছুক নহে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইল। "মাতা জীনো গরবো" ইহাতে লজ্জা কি?

এই বলিয়া তাহাদিগকে টানিয়া লইলেন। একটি হিন্দি গীত বুঝিতে পারিলাম, তাহা শ্রীকৃষ্ণ-গোপাঙ্গনা বিষয়ক। গাইবার সময় মূল গায়িকা লজ্জিত হইতে লাগিলেন। রমণীকুলের বসন ভূষণ অতি সুন্দর। যাহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়াছে, তাহারা অভ্যন্তর ভাগে স্থূল অধোংসুক দিয়াছে। নক্ষত্র মালার মত মুক্তাগুচ্ছ কণ্ঠশোভা করিতেছে। তাহার মধ্যস্থিত মণি বক্ষ উজ্জ্বল করিয়াছে। কর্ণভূষণ মণি মুক্তা জড়িত। করভূষণ জড়াও নহে। পাদ ভূষণের পরিসর অতি ভয়ানক। এক একটাতে শৃঙ্গ বাহির হইয়া রহিয়াছে। কোনটা বা ঘণ্টিকা পংক্তি দ্বারা আকীর্ণ। নিশীথ কালে পথমধ্যে গরবা উৎসব দেখিতে যাওয়া হইল। পল্লীর মধ্যে একটি সুবিধাজনক স্থানে প্রতিবেশিনী স্ত্রী মণ্ডলী মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইয়া মধ্যবর্ত্তী দীপাধার বেষ্টন করিয়া করতালি প্রদান করতঃ সঙ্গীত ধরিয়াছেন। বিচিত্র বস্ত্র, স্বর ও দীপালোক এই তিনটি একত্র মিশ্রিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে। দর্শকগণ দলে দলে আসিয়া বেরিতেছে। রাধা কৃষ্ণের যুগল ভজন উপলক্ষে গরবার সৃষ্টি. একারণ বাটীর মধ্যে যে নারী রূপ যৌবন সম্পন্না তাঁহারি উহাতে যোগ দেওয়া ব্যবস্থা। অবিবাহিত বালক বালিকাগণ রাধা কৃষ্ণের প্রতিনিধি হইয়া দীপের চারিধারে বসিয়াছে। এক-জন পুরস্ত্রী গান ধরিয়া দিতেছে, আর সকলে অনুবর্ত্তন করিতেছে। স্বর নিতান্ত মধুর। বহুক্ষণ শ্রবণ করিলেও বিরক্তি বোধ হয় না। তবে সুর একই প্রকারের। তালে তালে ঘন ঘন করতালি দেওয়া হইতেছে এবং সেই সময় একবার তনু আনত করিয়া ঘুরিয়া আসা হইতেছে।

অপরাহ্ণ কালে সওয়ারি বাহির হইল। পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র-ভূপতিরা বিজয়ার দিন যুদ্ধ যাত্রা করিতেন। তাহার পর এমন হইল যে সে দিন যাত্রা করিয়া, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বাটী আসিলেন। অতঃপর সুযোগ মত যাইয়া শত্রু আক্রমণ হইবে। এক্ষণে আর আক্রমণ নাই কিন্তু যাত্রাটি আছে। অন্য দেশের রাজাদের মধ্যে এমন প্রথা আছে, বিজয়ার দিন ছত্র বা তরবারি খানি অন্যত্র পাঠাইয়া রাখেন, তাহাতেই যাত্রা হইয়া রহিল। আমাদের গ্রামে রীতি আছে দশমীর দিন প্রাতেঃ যে বাটিতে পূজা হইয়াছে, পৌরবর্গ সেই খানে হরিদ্রা রঞ্জিত এক খণ্ড বস্ত্রে একটি টাকা বান্ধিয়া যাত্রা করিতে যায়। পুরোহিত যাত্রার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকেন, তাহারা দুর্গা প্রতিমা প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। বরদা রাজ, তারা শুদ্ধ দেখিয়া অদ্য কোন পথে বা কোন দিকে যাত্রা করিবেন, তাহা পূর্ব্বে স্থির করিয়া দিয়াছেন। প্রথমে ডঙ্কা বাহির হইল। পদাতি সৈন্য ইংরাজ নায়ক কর্ত্তৃক চালিত হইয়া দলে দলে রণবাদ্য বাজাইয়া চলিয়াছে। সোণা ও রূপার তোপ স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিত বৃষভদ্বয় বাহী রৌপ্য নির্ম্মিত শকট যোগে চলিয়াছে। রাজার অমাত্য ও কুটুম্বগণ বহু সংখ্যক হস্তি-সমারূঢ় হইয়া যাইতেছেন। একদল কচ্ছদেশীয় সৈন্য সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবে সজ্জিত হইয়া কাড়া ও সানাই বাজাইয়া

চলিয়াছে। কতকগুলি অশ্বারূঢ় অনুচরকে পশ্চাৎ রাখিয়া পর্ব্বতের মত উচ্চ হস্তি-পৃষ্ঠে স্বর্ণ সিংহাসনে মহারাজাশ্রী সয়াজীরাও গায়কয়াড় সেনাখাস খেল শমশের বাহাদুর প্রজাবর্গকে প্রত্যভিবাদন করত মন্থর গতিতে ভুবন কাঁপাইয়া চলিয়াছেন। পশ্চাৎ ভাগে বৃদ্ধ মন্ত্রী কাজি সাহেবদ্দীন সমাসীন। এই অভিযানে অশ্বারোহী সৈন্য দেখিলাম না। পতাকায় রাজ চিহ্ন অসি ও অশ্বজঙ্ঘা। মহারাষ্ট্র জাতীর অভ্যুদয়ের হেতু স্বরূপ যে ঐ দুইটি তাহা সকলেই জানেন। ঈপ্সিত স্থানে পৌঁছিয়া মহারাজ শোণ পত্র গ্রহণ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। খণ্ডেরাও গাইকয়াড় স্বহস্তে একটি মহিষ শাবক (পাড়া) হনন করিয়া তাহার রক্তে তিলক পরিয়া যাত্রার উপসংহার করিতেন। অন্যান্য স্থানে (বিরুলে) পুরদ্বারের বাহিরে দশরার দিন পাড়া মারিবার প্রথা অদ্যাপি আছে। মানুষ মরিবার কাল গিয়াছে বলিয়া পশু অনুকল্প হইয়াছে। সভ্যতার আরও উন্নতি হইলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধ উঠিয়া যাইবে। কি আশ্চর্য্য, একজন প্রজা একটি নরহত্যা করিলে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে, কিন্তু রাজা যুদ্ধের নাম করিয়া সহস্র সহস্র প্রাণি-সংহার করিলেও নিন্দনীয় হন না। বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া কেবল সওয়ারির কথা মনে উঠিতে লাগিল। তুরঙ্গমের সেই আস্কন্দিত, বলগতি ও প্লুত গতি যেন সম্মুখে বর্ত্তমান। পত্তি সংহতি যেন গায়কোয়াড়কে বন্দুক আনত করিয়া সামরিক অভিবাদন করিতেছে। এখনও হিন্দু জাতি জীবিত আছে, এই খ্যাপন করিয়া বৈজয়ন্তী মস্তক উন্নত করিয়া বাহিত হইতেছে। সেই মহাভারতীয় বলের চতুরঙ্গিনী সেনার স্মরণ চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। সিংহনাদ কাহাকে বলে, আহোপুরুষিকা, অহং পূর্ব্বিকা দেখিতে কেমন তাহা বুঝিবার ইদানীং কোনও উপায় নাই। আততায়ীর সম্মুখ নহিলে সেনা মধ্যে সে সকল ভাব কি করিয়া উদিত হইবে। এ বাহিনী রচনা যুদ্ধ নৈপুণ্য প্রকাশের জন্য নহে, সমৃদ্ধি প্রকাশের জন্য। সেই কারণ সোণা রূপার কামান দেখিতে পাইলাম। রাজগুরু গোকুলিয়া গোঁসাই রাজ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, ফিটন চড়িয়া চলিয়াছেন, আগে নকিব ফুকরাইতেছে। হস্তী যুথের হুড়াহুড়ি ও সলমার কাজ করা বহুমূল্য আস্তরণ দোদুল্যমান, তদুপরি রজত নির্ম্মিত হাওদায় দিব্য কিরীটধারী রাজ কুটুম্বগণ যাত্রা করিতেছেন—বাটীতে বসিয়া এই সকল চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এই সময় মহরম পর্ব্ব উপস্থিত হইয়াছে। রাত্রিকালে অনবরত হুসেন হু-সে-ন শব্দে বর্ণ ব্যথিত হইতে থাকে। রাজা প্রজারঞ্জক। সেইজন্য সরকারী তাজিয়া হয়। রজনী যোগে "লাগ" দেখিবার জন্য অতিশয় জনতা দৃষ্ট হইল। তিনটী শেল দণ্ডায়মান করিয়া তাহার ফলকের উপর একজন, শ্বেত পরিচ্ছদধারী স্থূলতনু যবন শয়ান রহিয়াছে। তাহার দেহ নিস্পন্দ। ব্যাঘ্র, কুম্ভীর প্রভৃতি নরভুক জীবের মূর্ত্তি, জীবন্ত মনুষ্য দন্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ইত্যাদি দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তাজিয়া

দর্শন করিতে যাইবার সময়, লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের মুসলমানেরা যে শোক সঙ্গীত গাইয়া থাকে, তাহার স্বর শুনিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। বেশ দেখিলে প্রাণ উদাস হায়। যখন দুল দুল নামক অশ্ব রক্তাক্ত কলেবরে রক্তমাখা পতাকা অগ্রে করিয়া মহজিদের উপর গিয়া উঠে, তখন তত্রত্য নরনারী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। তাহার পর বেদির উপর ইমাম বসিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে আরম্ভ করেন "এই দিনে ঠিক এমনি সময়ে তাঁহার অশ্ব শূন্য পৃষ্ঠে ফিরিয়া আসিয়াছিল" ইত্যাদি। নিকটে অশ্ব উপস্থিত, স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। অশ্বটি শ্বেত বর্ণের, লোহিত রঙ্গে আপ্লুত, তদুপরি শোণিত চিহ্নযুক্ত শ্বেত বস্ত্রের আস্তরণ। এবম্বিধ সমাবেশ হওয়ায় ভক্ত বৃন্দ কাঁদিয়া আকুল হয়। আমিও যে দিন উপস্থিত ছিলাম, অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। বরদার সুন্নিগণ বিপরীত ভাব দেখাইবার জন্য ব্যাঘ্র প্রভৃতি সাজিয়া, গীত বাদ্য করিয়া আমোদ উৎসব দেখাইয়া বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

১৭২০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র সেনানায়ক পিলাজী গায়কয়াড় গুজরাত আক্রমণ করিয়া চৌথ আদায় করিতে সমর্থ হন। তদবধি ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। অধুনা বরদা রাজ্যের আয় ১২৫০০০০০ টাকা। ভূমির পরিমাণ ফল ৪৩৯৯ মাইল। অধিবাসীর সংখ্যা ২০০০২২৫। রাজ্য চারি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগকে একটি প্রান্ত কহে। প্রতি প্রান্তে একজন সুবা আছেন। শাসন প্রণালী ইদানীং অবশ্য সুন্দর হইয়াছে। কাঠিয়াওয়াড় প্রদেশের ভূম্যাধিকারীগণ ইংরাজকে অর্দ্ধেক ও গায়কয়াড়কে অর্দ্ধেক কর দেয়। এমন এক সময় গিয়াছে যখন সাথমারিতে রাজ আজ্ঞায় অপরাধী হস্তী পদ দলিত হইত। জীবন্ত প্রোথিত করা, পর্ব্বত হইতে ফেলিয়া দেওয়া, দেওয়ালে পেরেক দিয়া বিদ্ধ করা প্রভৃতি নানা নিষ্ঠুর দণ্ডের প্রচলন ছিল।

মতিবাগে মলহররাও মহাশয়ের চিত্র দেখিলাম। অপবিত্র হোলি উৎসবের সময় রাজ ভবনে প্রকাশ্য ভাবে শত বারাঙ্গনাকে মলহর স্বয়ং পিচকারি দ্বারা রঞ্জিত করিতেন। একবার ঘুগুর বিবাহ অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। ঘুগুবৌকে বিড়ালে খায়, তাহাতে রাজা নগরের তাবৎ বিড়াল হত্যা করিয়া ক্ষান্ত হন। কদাচিৎ বিল্লিমোরা নামক জনপদে মলহর রাও গমন করেন। সে স্থানের রাজপথ খণ্ডেরাও গায়কয়াড় কর্তৃক নির্ম্মিত, এজন্য সেই পথে তিনি পদার্পণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তৎক্ষণাৎ শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি নষ্ট করিয়া নূতন রথ্যা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল এবং কয়েক ঘণ্টা মধ্যে সম্পূর্ণ হইয়া গেল। পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে বলিয়া কর্ম্মচারীগণ প্রভুকে বুঝাইয়া দিল। রেসিডেণ্টকে বিষ দেওয়ার কথা সকলেই অবিশ্বাস করে। যমুনা বাই কারামুক্ত হইয়া যে বালকের ললাটে রাজতিলক দিয়াছেন, তিনি সুশিক্ষিত হইয়া এক্ষণে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সার ত্র্যম্বক মাধবরাও

মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। কথিত আছে, মাধব রাও অশীতি লক্ষ মুদ্রা ইংরাজের নিকট গচ্ছিত রাখেন, তাহার কুশিদ বরদা রাজ্য পাইবে, কিন্তু মূল অর্থ লইতে পারিবে না এই নিয়ম হয়। ইহাতে প্রাপ্তব্যবহার ভূপতি অসন্তুষ্ট হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মাধবরাওর হাসিভরা মুখখানি দেখিলে তাঁহাকে অতিশয় চতুর বলিয়া উপলব্ধি হয়। মহারাণী যমুনাবাই এক্ষণে পৃথক বাটিতে অবস্থান করেন, রাজকীয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন না। কয়েক দিন হইল তাঁহার বাটীতে তিনটি খুন হইয়া গিয়াছে। রাণী তখন উপস্থিত ছিলেন না। পুরুষানুক্রমে আফ্রিকা নিবাসী সিদ্দিগণ বরদা রাজ্যে নিযুক্ত আছে। তাহারা রীতিমত সৈনিক কর্ম্ম করে না বা অন্য কোন রূপ উপকারে আসে না। মাদক সেবন প্রভৃতি কার্য্যে দিনাতিপাত করে। তাহারা রাজ্যের এত ঘনিষ্ট, যে উহাদের অন্য নাম "রাজ্যের সন্তান।" যদি বল অমুকের শিরশ্ছেদন করিয়া আন—তাহা অনায়াসে করিতে পারিবে, কিন্তু নিয়মিত পরিশ্রম করিতে হয় এমন কর্ম্মভার কদাচ লইবে না। বর্ত্তমান গায়কয়াড় তাহাদের তিনজনকে একটি নিয়মিত কার্য্য করিতে বলেন। তাহাতে তাহারা অপারগ হওয়ায় বেতন বন্ধ করিয়া দেন। উহারা সে জন্য হয়দরাবাদ চলিয়া যায়। সেখানে কোনও সুবিধা না দেখিয়া প্রত্যাগমন করত ভৃতি যাচ্ঞা করে এবং কহে যদি না দেন, বলপূর্ব্বক ধনাগার হইতে আমাদের প্রাপ্য আদায় করিব। সুতরাং গায়কয়াড় তাহাদের ধৃত করণার্থ পুলিশের প্রতি আজ্ঞা দিলেন। যমুনা বাই সাহেবের বাটীতে উহারা বাস করিত। সেই স্থানে পুলিশের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিন জনেই হত হইয়াছে।

বরদার সুরসাগর বা নওলাক্ষি প্রভৃতি বাপী তড়াগ গণনীয় বস্তুর মধ্যে পরিগণিত। যমুনা বাইর চিকিৎসালয় ও বিদ্যামন্দির জয়পুরের মত সুন্দরপাথরের জালি গ্রথিত। রাজা বা কোনও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী অথবা রাজকুটুম্বের গমনাগমনকালে বহু অশ্বারোহী অনুবর্ত্তন করে। রাত্রিকালে মসালচিরা গাড়ির অগ্রে দৌড়ায়। গায়কয়াড়ের আধ পায়সার মুদ্রা নাই। ঐ মূল্য আদান-প্রদান জন্য আটটা বাদাম ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে যেমন কৌড়ির ব্যবহার। পূর্ব্বকালে বাঙ্গালায় তাম্র মুদ্রা ছিল না। বিনিময়ের কার্য্য কৌড়ি দ্বারা সমাধা হইত। এই জন্য অদ্যাপি ১ এক পয়সার অঙ্ক লিখিতে হইলে ৫৲ পাঁচগণ্ডা লিখিত হয়। ইহাতে আর এক কথা পাওয়া যায়। যখন প্রথম তাম্র খণ্ড ব্যবহার হইয়াছিল, সে সময় এক পয়সায় পাঁচগণ্ডা কৌড়ি কিনিতে পাওয়া যাইত। এখন এক পয়সায় ষোলগণ্ডা কখন কখন ইহাপেক্ষা অধিকও পাওয়া যায়। গুজরাতে সিকিকে পাওলি ও পয়সাকে ঢোড়িয়া কহে। টাকা বলিলে গায়কয়াড়ের টাকা বুঝায়। ভিক্টোরিয়ার টাকা চাহিতে হইলে কলদার বলিতে হয়।

সুরত। রাত্রি ২টার সময় আড্ডায় গাড়ি থামিল। একজন পারসি দস্তুর শুভ্র শিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়া আমাদের গাড়িতে আরোহণ করিতে আসিলেন। তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিলাম, এই কি সুরত? তিনি কহিলেন এই বটে—"সুরত, দেখনে কী মুরত।" স্ত্রীলোক করগুবাহী আমাদিগকে এক বাড়িওয়ালার ঘরে পৌঁছাইয়া দিল। তাহার মাদুরের ছারপোকার যন্ত্রণায় ও গৃহের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ রজনী যাপন অতি কষ্টকর হইল। বাল্যকালে ভূগোল হস্তামলকে পড়িয়াছি সুরত নগরীতে জৈনদেব স্থাপিত পশু রক্ষাশালা আছে, সেখানে গবাদি পশুর ন্যায় ছারপোকাও প্রতিপালিত হয়। ছারপোকাকে আহার দিবার জন্য, অর্থ দিয়া মানুষকে খাটে শুয়াইয়া রাখে। আমাদিগকে কি সেই পিঁজরাপোলে রাখিয়া গেল? পর দিবস ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া ক্রমশঃ প্রকৃত সহরে প্রবেশ করিলাম। মন শান্ত হইল। মরবানজী হোমজজী ফ্রেসের স্মরণ চিহ্ন ক্লকটায়ার বা ঘড়িয়াল ছাড়াইয়া হাইস্কুল, ও হসপিটল সন্নিহিত নৈমিত্তিক পণ্যবীথী দেখিতে দেখিতে দুর্গ পার্শ্বস্থ ভিক্টোরিয়া উদ্যানে তাপী নদীর কূলে আসিয়া সমুপস্থিত হইয়া আরও কিছু দূর "ফ্রি থিঙ্করস্ করণর" দিয়া ইংরাজী পল্লী বেড়াইয়া ফিরিলাম। সন্ধ্যাকালে বহু যুবতি এই তাপী তটে তাপ অপনোদন করিতে আসিয়া থাকেন। তাপীর জল কমিয়া যাওয়ায় এবং বোম্বাই বন্দর হওয়ায় সুরত পূর্ব্ব গৌরব অনেক হারাইয়াছে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের বাণিজ্যশালা এখানে প্রথম স্থাপিত হয়। সুরত বাষ্পীয় তরি নির্ম্মাণের প্রধান স্থান ছিল। পারসীরা ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। অদ্যাপি বোম্বাইএর ডক ইয়ার্ডে পারসি মাষ্টর-বিল্ডর পদ ভোগ করিতেছেন। পারস্য হইতে তাড়িত স্বধর্ম্ম নিরত পারসিরা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সমুদ্র-তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ হইয়া এই সুরতে হিন্দু রাজার আশ্রয়ে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। কেহ কহেন সুরাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশে সুরত নাম হইয়াছে। সৌরাষ্ট্র দেশ বস্তুতঃ কাঠিয়াওয়াড় প্রদেশ। কাঠি নামক জাতির বাস ছিল বলিয়া কাঠিওয়াড় আখ্যা হইয়াছে। তেমনি গুজর নামক জাতির বাসস্থান ছিল বলিয়া গুজরাত সংজ্ঞা উৎপন্ন কহিয়া থাকেন। সুরতের জনসংখ্যা ১০৭১৪৮। সহর পনাহ অর্থাৎ নগরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর আছে কিন্তু সর্ব্বত্র নহে। বিদেশী লোক আসিলে (হীন অবস্থাপন্ন) ফৌজদার অর্থাৎ পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তত্ত্ব লইয়া তবে বাস করিতে অনুমতি দেন।

সুরত নগরের মিষ্টান্ন অতি উপাদেয়। ৩৫ তোলায় সের। সুরত ঘি ও বাঙ্গালার চিনি, গুজরাতিদের প্রিয় পদার্থ। ইদানীং বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে মরিশশ্ চিনি যোগাইতেছে। গুজরাতিতে বলে—"কাশী নো মরণ, সুরত নো ভোজন" অর্থাৎ কাশীধামের মৃত্যু যেমন প্রার্থনীয়, সুরতের খাদ্য দ্রব্য তেমনি লোভনীয়। ঘরি নামক মিঠাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বরফি জমাইয়া তাহার উপর ঘৃত ঢালিয়া দেয়, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলে, তাহার উপর স্থূল ঘৃতের স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। লুচি মিলে না। নিমকি প্রভৃতি সমস্ত গুর্জ্জরে তৈলপক্ক। শাক ও তরকারি রাত্রিকালে সমারোহের

সহিত বিক্রয় হয়। নানাবিধ ফল মিলে। চা ও কাফি পানের স্থান আছে। ইতর লোকে বিলক্ষণ মদ্যপান করে। কলু প্রভৃতি জাতির রমণীরা মদিরা-গৃহে যাইয়া অবাধে পান করিয়া থাকে।

বল্লভাচারীদের শ্রীনাথজীর দেবালয় অতি বিচিত্র স্থান। নাগরিক নর নারীর একাধারে সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বার উদ্ঘাটিত হইবামাত্র প্রবল জনস্রোত ঘূর্ণাবায়ুর মত একদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া ক্ষণমাত্র না তিষ্ঠিয়া শ্রীনাথ দর্শন হউক বা না হউক, অন্য দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়। ক্ষণ বিলম্ব হইলে, কোড়ার আঘাত সহ্য করিতে হইবে। তখনি দ্বার বন্ধ হইবে। যদি কেহ এইরূপে দর্শন করিতে অবশিষ্ট থাকে, এবং কপাট পড়িতেছে এমন সময় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে "জয় জয়" বলিয়া দৌড়িয়া আসে ও এক নিমেষের জন্য পুনঃ উদ্ঘাটিত হয়। যখন দর্শন হইবার বিলম্ব থাকে; নারী মণ্ডলী মন্দিরের ব্যবহার জন্য পর্ণ রচনায় সময়ক্ষেপ করে। তথায় আমাদের সহিত কয়েকজন হিন্দুস্থানীর পরিচয় হইল। তাহারা আমাদিগকে পাইয়া যেন স্বদেশী পাইল। এই দূর দেশে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানীর স্বদেশীয় হইল। যে বাঙ্গালী হিন্দুস্থানীদিগকে "ছাতু" ও হিন্দুস্থানী বাঙ্গালীদিগকে "ভাতু" বলিয়া অবজ্ঞা করে, তাহাদের পরস্পর সহানুভূতি উল্লেখ যোগ্য। কাশীতে বাঙ্গালীর প্রতি হিন্দুস্থানীর কদাপি এমন আত্মীয় ব্যবহার প্রত্যাশা করা যায় না।

সুরতের পাগড়ি আহম্মদাবাদের মত নহে। কচ্ছ মাণ্ডুই নিবাসী ভাটিয়াদের উষ্ণীষ অন্যরূপ। কাঠিয়াওয়াড়ের পাগড়ি ও কাপেলি বণিয়াদের শিরস্ত্রাণ ভিন্ন প্রকারের। সুতরাং পাগড়ি দেখিলে বলা যায় কোন গুজরাতির বাটী কোথায়। একজন ভ্রমণকারী যে লিখিয়াছেন, পাগড়িতে ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়—তাহা সত্য। আমরা নগ্ন শিরে বাঙ্গালীভাবে বিচরণ করায় একটা উপকার দেখিলাম। লোকে ডাকিয়া আমাদের সহিত আলাপ করে। কোথা হইতে আগমন, কেন আগমন ইত্যাদি প্রশ্ন করে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জগদীশ (পুরুষোত্তম) দর্শনার্থ বাঙ্গালা মুলুক দেখিয়া যান। এক ব্যক্তি কৌতূহল পরতন্ত্র হইয়া আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের দুইজনে বিতণ্ডা হইতেছে বাঙ্গালীরা পাগড়ি মাথায় দেয় না ও স্ত্রীলোকে কাঁচুলি ব্যবহার করে না—একথা কি সত্য?" আমার উত্তর শুনিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল কি না বলিতে পারি না। গুজরাতি রমণীরা হিন্দুস্থানী প্রণালীতে সাড়ি পরিধান করে। উহা দেখিতে ছিটের মত। কঞ্চুলিকা কিছু অদ্ভুত প্রকারের। তাহার পৃষ্ঠদেশ খোলা, সূত্র দ্বারা পরিধি রক্ষিত। ভূষার মধ্যে কাঁটা অর্থাৎ মুক্তা পঞ্চক যুক্ত ফুল সকল স্ত্রীলোকেই পরিধান করে। যে দীন, সে তথাপি কৃত্রিম মুক্তার কাঁটা পরিবে। পুরুষ অপেক্ষা রমণী বিক্রান্ত। ভারবহন প্রভৃতি দৈহিক শ্রমসাধ্য অনেক কর্ম্ম স্ত্রীলোকে করিয়া থাকে। অবগুণ্ঠন প্রথা

নাই। দন্তে স্ত্রী লাল রঙ্গ দিয়া থাকে। ছেলেগুলার মাথা কামান, অতি কদর্য্য দেখায়। টুপি মাথা ঢাকিতে সমর্থ হয় না। বেণিয়ান ভাল দেখায় না। অনেক ব্যক্তি কাণের উপর মুক্তা দেওয়া (বালী) মাকড়ি পরে। বৈষ্ণব বলিয়া সকলেই মালা ও তিলক ব্যবহার করিয়া থাকে।

সুপ্রসিদ্ধ দয়ানন্দ সরস্বতী গুজরাতি ছিলেন। তাঁহার আচার্য্য মথুরা নিবাসী এক জন্মান্ধ। তিনিও মূর্ত্তি পূজা খণ্ডন করিতেন। কাশীধামে উক্ত বিষয়ে দয়ানন্দ যে বিচার করেন, তাহাতে বামনাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য ভ্রাতৃদ্বয় বেদের নিম্ন লিখিত স্থানে প্রতিমা উল্লেখ দেখান।

স পরং দিব মন্বাবর্ত্তে তাথ যদা স্যাযুক্তানি যানানি প্রবর্ত্তন্তে,
দেবতায়তনানিকং পেন্তে (?) দৈবত প্রতিমা হসন্তি রুদন্তি গায়ন্তি,
নৃত্যন্তি স্ফুটন্তি খিদ্যন্তোন্মীলন্তি নিমীলন্তি প্রতি প্রয়ান্তিনদ্যঃ
কবন্ধ মাদিত্যো দৃশ্যতে বিজনেব পরিবিষ্যত॥

(সামবেদীয় অদ্ভূত শান্তি প্রকরণ)

শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি।

প্রকৃত সৌন্দর্য্য।

(ইংরাজি হইতে সংগৃহীত)

হো'ক সিত কি অসিত সে মুখ সুন্দর,
বিমল আত্মার যেই বিমল দর্পণ,
যে মুখ অমিয়ভাবে সদা মনোহর,
সরল সাধুতা যাহে ভাসে অনুক্ষণ।

সে আঁখি সুন্দর হয় যাহার ভিতর,
সুমধুর প্রেম দয়া করে ঢল ঢল;
বিবেক—দৃঢ়তা যাহে খেলে নিরন্তর,
বিভুর চরণে মতি—বিশ্বাস অচল।

সেই ওষ্ঠাধর হয় সুন্দর কেমন,
স্ফুরে যাহে বাণী—যেন বিহগের গীত;
প্রাণের গভীর হ'তে—প্রাণের তোষণ,
বিবেক যে বাণী সদা করে নিয়মিত।

সুধন্য সুন্দর সেই হস্ত পদ দ্বয়,
প্রভুর আদেশে খাটে—সাধু জীবিকায়;
কঠোর কর্ত্তব্য সাধে—লোকে নাহি ভয়,
পর দুঃখ দূরিবারে আগে যেই ধায়।

সে স্কন্ধ সুন্দর যাহা সংসারের ভার,
প্রতিদিন বহে—করি ঈশ্বরে নির্ভর;
প্রার্থনা হইতে যার বল অনিবার,
ধৈর্য্য অবনতি যার ভূষণ নিকর।

অতীব সুন্দর হয়—ধন্য সে জীবন,
যে জীবন বিকায়েছে দয়াময় পদে;
প্রেম নদী অন্তঃশিলা করিছে ধারণ,
সেই পদ ছাড়া নহে বিপদে সম্পদে।

শ্রীদে—

রমলা।

চঞ্চল ক্ষুদ্র হৃদয় নিমেষের ঘটনায় বিচলিত হইয়া পড়ে, এই জন্য সেখানে কোন ঘটনাই চির-মুদ্রিত থাকিবার অবসর পায় না। সামান্য সুখে দুঃখে হৃদয় অধীর হইয়া উঠে, আপনার উপর হইতে দখল চলিয়া যায়, নিন্দাভয় শোক তাপের মধ্যে তাহার অবসান হয়। কিন্তু গভীর হৃদয় নাকি তৈলবিন্দুর মত মুহূর্ত্তের তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়ায় না, তাই সেখানে যে ঘটনা একবার গিয়া পঁহুছিতে পারে তাহা আর সহজে মুছে না। সারা জীবন সে ঘটনা সেইখানে বসিয়া নীরবে কার্য্য করিতে থাকে, জীবনের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে; জীবন-বন্ধন না টুটিলে তাহার বিনাশ নাই। রমলার হৃদয় এইরূপ বড় গভীর। সাধারণ স্ত্রীলোকের মত সে লঘু প্রকৃতি নহে। দূর হইতে এই জন্য অনেক সময় তাহার জীবন যেন কেমন অস্বাভাবিক জটিল রহস্য বলিয়া ঠেকে। রহস্য নহে ত কি? যেখানে এত সৌন্দর্য্য সেখানে রহস্য নাই? রহস্যেই ত তাহার সৌন্দর্য্য। কিন্তু রমলার চরিত্রে অস্বাভাবিকতা কোথাও বোধ হয় নাই। কেবল মাত্র এক অন্ধ যন্ত্র-আদর্শ খাড়া করিয়া বিচার করিলে এইরূপই মনে হয় বটে, কিন্তু জড়পিণ্ডের অতীত প্রদেশে দাঁড়াইয়া একটু উদারভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলেই রমলার প্রশান্ত হৃদয়ের সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায়। সে সৌম্য সৌন্দর্য্য বড়ই স্থির, ধীর, গম্ভীর।

স্বামীর সহিত রমলার ইদানীং কিছু মনান্তর ঘটিয়াছিল বলিয়া যে তাহার হৃদয়ের অভাব প্রকাশ পায়, তাহা নহে। হৃদয় না থাকিলে বরঞ্চ এ মনান্তর ঘটিত না। যেখানে ভালবাসা, সেখানেই অভিমান। পরের উপর অভিমান করিয়া কে কোথায় কষ্ট পাইয়া থাকে? স্বামীর উপর নিঃস্বার্থ অভিমান করিবার স্ত্রীর অধিকার আছে। সে জন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। রমলা যখন তাহার প্রতি অল্পে অল্পে মেলেমার ভাবের পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিল, দেখিল, স্বামী পূর্ব্বের ন্যায় তাহার নিকটে সরলভাবে কথাবার্ত্তা কহেন না, সেরূপ ভাবে তাহাকে স্নেহ করিতে পারেন না, রমলার নিকটে তাঁহার কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়, রমলার সঙ্গ আর তেমন ভাল লাগে না, তখন তাহার হৃদয়ে কি নৈরাশ্য! স্বামী স্ত্রীর নির্ম্মল প্রেমের মধ্যে দিন দিন ভয় সঙ্কোচ ব্যবধান হইয়া দাঁড়াইতেছে—রমলার বুক ফাটিয়া যায়। কিন্তু গভীর-হৃদয়া রমণীর মুখ কিছুতেই ফুটে না। বুকে যে শেল বিঁধিল, সে শেল আর ঘুচিল না।

রমলা রাশিকৃত কীটদষ্ট পুঁথির মধ্যেই লালিত পালিত হইয়াছে। বার্দোর স্ত্রীর অনেকদিন কাল হইয়াছে। প্রাণপ্রিয় পুত্র পিতৃভবন ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ, সুতরাং বৃদ্ধবয়সে তাঁহার একমাত্র সহায় কন্যা রমলা। অন্ধ বার্দোর লেখাপড়া সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য তাহাকেই করিতে হয়। বার্দো নিজে পড়িতে পারেন না, রমলা তিনি যে

গ্রন্থ শুনিতে চাহেন পড়িয়া শুনায়; বার্দো আবশ্যকীয় পদগুলি বলিয়া যান, রমলা সেইগুলি চিহ্নিত করে; যেখানে যেমন টীকা টিপ্পনী করিতে হইবে বার্দো রমলাকে বুঝাইয়া দেন, রমলা নীরবে লিখিয়া যায়। পণ্ডিত পিতার জ্ঞানালোচনার সহকারিণী হইয়া রমলা শিক্ষিতা না হইবে কেন? বার্দো সংগ্রহের অনেকগুলি পুঁথিতেই তাহার বেশ দখল ছিল। আর সে সংগ্রহও ত বড় কম নয়। ফ্লোরেন্সের মধ্যে তেমন পুস্তক-সংগ্রহ বোধ করি তখন খুব অল্প লোকেরই ছিল।

এই পুঁথির রাজ্যে বার্দোর পাণ্ডিত্য-শাসনে রমলার চরিত্র যদি না গঠিত হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমরা এ গভীর গম্ভীর প্রকৃতি দেখিতে পাইতাম না। জীবনের বসন্তে বিজন পুস্তকারণ্যে বসিয়া রমলা জ্ঞানানুসন্ধিৎসু বৃদ্ধ পিতার সহায়তা করিতেছে। সংসারের সহিত তাহার কোনও সংশ্রব নাই বলিলেই চলে। সুতরাং সাধারণ বালিকাদিগের সহিত তাহার চরিত্র স্বতন্ত্র হইবারই সম্ভাবনা। রমলার চরিত্র কতকটা স্বতন্ত্র বটেও। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহার স্ত্রীভাব একেবারে লোপ পাইয়াছিল? না। স্ত্রীজাতি-সুলভ সঙ্কীর্ণতার হ্রাস হওয়া এক, আর পৌরুষিক কাঠিন্য-সঞ্চারে হৃদয়ের নম্রভাব নষ্ট হওয়া এক। রমলার অনেক বিষয়ে সঙ্কীর্ণতার হ্রাস হইয়াছিল স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু পাগড়ী মাথায় দিয়া কল্পনায় গোঁফে চাড়া দিতে রমলাকে ত কখনও দেখা যায় না।

বার্দোর সহিত পুস্তক লইয়াই রমলার দিন কাটে। একদিন নেলো নাপিতের দ্বারা মেলেমা বার্দোর নিকট পরিচিত হইলেন। যুবার মুখ রমলা কতদিন দেখে নাই। বার্দোর নিকটে যাঁহারা আসিতেন, প্রায়ই বৃদ্ধ, নয় প্রৌঢ়। অনেক দিন পরে মেলেমার যুবা-মুখ দর্শন করিয়া রমলার হৃদয় যেন কেমন চমকিয়া উঠিল। কতদিন পূর্ব্বে এই বার্দো-গৃহে একজন যুবাপুরুষ ছিলেন, এখন আর নাই। এই কি সেই? না, এ ত সে ব্যক্তি নহে। কিন্তু সে ব্যক্তি না হইলেও এ ব্যক্তি সুন্দর বটে। তিতো মেলেমা পণ্ডিত, সুপুরুষ।

রমলার হৃদয়ে মেলেমা ক্রমে ক্রমে প্রভাব বিস্তার করিলেন, রমলাও তাঁহাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিল। একদিন বার্দো রমলাকে পুস্তকমঞ্চ হইতে একখানি পুস্তক পাড়িতে বলিলেন। মেলেমা তাহার সাহায্য করিতে উঠিলেন। বিজন পুস্তকমঞ্চের পার্শ্বে তাঁহার প্রেম ব্যক্ত করিবার সুবিধা হইল। রমলার নিকট হইতে অনুকূল উত্তরও মিলিল। দুই জনের হৃদয়ে যেন তড়িৎ বহিয়া গেল। জীবনে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল।

কিন্তু রমলার প্রেমে যেমন ধীর গাম্ভীর্য্য, এমন প্রায় দেখা যায় না। ইহাতে হাব-ভাব, কটাক্ষ, শতনিশ্বাস-ফোঁস্‌ফোঁসিত অধীর চাঞ্চল্য আদবেই নাই। অথচ ভাবটী বড় সরল। না হইবেই বা কেন? আমাদের শকুন্তলার মত সমবয়স্কা সখী

তাহার কেহই ছিল না, সংসারের অনেক বিষয়ে সে বিশেষ অনভিজ্ঞা। সুতরাং তাহার প্রেমে সরল গাম্ভীর্য্য ত থাকিবারই কথা। শকুন্তলার অধীরতা এখানে শান্ত। কিন্তু মিরান্দারও ত সঙ্গিনী কেহ ছিল না। রমলা মিরান্দার মত হইল না কেন? কারণ অনেক আছে। মিরান্দা একেবারে জনহীন দ্বীপে থাকিত, পিতা ভিন্ন অপর কোনও মানবের সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল না। রমলা সহরে থাকে, মানবের মুখ দেখিতে পায়, তবে গৃহ ছাড়িয়া সে বড় বাহির হয় না। মিরান্দার পিতা ভূত প্রেত লইয়া ব্যস্ত, তাঁহার বার্দোর মত পুস্তক-সংগ্রহও নাই, মিরান্দাকে পুস্তকের মধ্যে লালন পালন করাও হয় না। রমলা পণ্ডিতের সন্তান—বিদুষী। শিক্ষায় তাহার হৃদয়ে একটা সংযম ভাব আসিয়াছে। মিরান্দার সারল্যে অনেকটা অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। রমলার সারল্যে সংযম-গাম্ভীর্য্য। এই জন্যই মিরান্দাতে অধীরতা, আর রমলা স্থির, ধীর।

শকুন্তলা আমাদের মিরান্দার মত অজ্ঞ নহে, কিন্তু রমলার মত পিতার সহিত পাঠ-গৃহের অন্ধকারে তাহার জীবন-বসন্ত অতিবাহিত হয় নাই। শকুন্তলা প্রকৃতির শোভায় গঠিত হইয়াছে। তপোবনের আলবালবদ্ধ বৃক্ষমূলে মূলে জলসেচন করিয়াই তাহার সুখ। শকুন্তলাতে মাতৃভাবটী বড় প্রস্ফুটিত। রমলার এ স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ভাব তেমন দেখা যায় না। এমন মুক্তবাতাস সে কোথায় অনুভব করিবে? যাহা হৌক, শকুন্তলা অপেক্ষা রমলার আপনার উপরে আধিপত্য আছে। দুষ্মন্তমুগ্ধা শকুন্তলা যেরূপ অধীরতা প্রকাশ করিয়াছিল, তিতো মেলেমা প্রেম ব্যক্ত করিলেও রমলা তেমন অধীরতা প্রকাশ করে নাই। অতি স্থিরভাবে মেলেমার কথার উত্তরে রমলা নিজ প্রেম ব্যক্ত করিল।

এখন মেলেমা রমলায় মিলন হয় কিরূপে? বার্দোর মত না হইলে ত বিবাহ হইবে না। সুতরাং বার্দোর মত জানিতে হইবে। কথায় কথায় মেলেমা বার্দোর নিকটে আপন অভিলাষ খুলিয়া বলিলেন। বার্দো রমলার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। রমলা সম্মতি প্রকাশ করিল। বার্দো কহিলেন, এ ঘটনা যদি ঘটে ত খুব সুখের বিষয়। রমলার ধর্ম্মপিতা বার্ণাদোর সহিত এ বিষয়ে একবার বার্দো কথাবার্ত্তা কহিয়া দেখিবেন।

কিছু দিন কাটিয়া গেল। মেলেমার সহিত রমলার বিবাহ নিশ্চিত। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে রমলার হৃদয়ে একটা কাল বিভীষিকা উঁকি মারিতেছে। নিরুদ্দেশ ভ্রাতার সংবাদ পাইয়া পিতাকে না বলিয়াই সে একদিন তাঁহাকে দেখিতে যায়। তাহার ভ্রাতা তখন মৃত্যু-শয্যায় শয়ান। মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি রমলাকে আপনার স্বপ্নের কথা বলেন—রমলার বিবাহে কি যেন বিভিষীকা ছায়ায় ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই দিন হইতে রমলার বুকের মধ্যে সেই বিভীষিকা থাকিয়া থাকিয়া

গুমরিয়া উঠে। রমলা মেলেমার নিকট সে কথা বলিল। মেলেমা উপহাস করিয়া রমলাকে আশ্বাস দিলেন। মেলেমার সহিত রমলার বিবাহ সম্পন্ন হইল।

কিন্তু রমলার সহিত বিবাহ হইলে কি হইবে, মেলেমা ইতিপূর্ব্বেই এক সরলা বালিকার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন। মেলেমা বাস্তবিক যে তাহাকে বিবাহ করিলেন তাহা নহে। তিনি কতকটা ঠাট্টার ভাবে গিয়াছেন, কিন্তু সরলা তেসা তাঁহাকে স্বামী বলিয়াই জানে। মেলেমাও তেসার মনে আঘাত দিবার ভয়ে ভুল ভাঙ্গিতে পারিলেন না। তিনি তেসাকে এ বিবাহের কথা প্রকাশ করিতে বারণ করিয়া দিলেন। বলিলেন, এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলে সে আর স্বামীর দর্শন পাইবে না। সরলা বালিকা মেলেমার কথামত এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিল না। তেসা বড় সাদাসিধা—নিতান্তই স্নেহের পুতলী বালিকা। সে শুধু সারা দিন মেলেমার জন্য প্রার্থনা করে। তেসার সারল্য শকুন্তলায় নাই, মিরান্দায় নাই, রমলায় নাই। এ এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতি—অথচ পূর্ণ-মাতৃভাবময়ী। কিন্তু এ মাতৃভাবেও তেসা বালিকা।

রমলা তেসার ব্যাপার কিছুই জানে না। জানিলে হয়ত সে মেলেমাকে বিবাহ করিত না, চিরদিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কাটাইত। মেলেমাও রমলাকে একথা বলিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, আর গোলযোগে কাজ কি? রমলার মত তাঁহার সংযম-ভাব নাই। তিনি কতকটা ঘটনা-স্রোতেই ভাসিয়া যান। আপনার মন্দিরে উদ্দেশ্যকে বলি দিতে তাঁহার বড় সঙ্কোচ হয় না, কিন্তু উদ্দেশ্যের মন্দিরে তিনি আপনাকে বলি দিতে পারেন না। সুতরাং সুবিধা-চালিত মেলেমা উভয় কূল বজায় রাখিবার জন্য নীরব হইয়া গেলেন। রমলাকেই তিনি সহধর্ম্মিণী ঠাহরাইয়াছেন, রমলার সহিতই তাঁহার দিন কাটে। রমলাও তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসে। এইরূপে পরস্পরের ভালবাসায় জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইল। এত দিন সংসার চলিয়াছে ভাল।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। এত দিন ভাল গিয়াছে বলিয়া ভবিষ্যতের কথা কে বলিতে পারে? দিন ত আর কাহারও সুখ দুঃখের মুখ চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে না। চির-হাসিমুখে পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দে সে লোকের দুয়ারের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়—কোথাও লোকে হাসিয়া সারা হয়, কোথাও ক্রন্দন আর থামে না। ফ্লোরেন্সের আকাশে কিছুদিন নীরবে কাটিয়া গেল। কিন্তু এ নীরবতা আর চলে না বুঝি। বিদেশীর আগমনে ফ্লোরেন্স উদ্বেল-হৃদয় হইয়া উঠিল। এক দল, দুই দল, তিন দল—অল্প দিন মধ্যেই ফ্লোরেন্স দলময়। দলময় ফ্লোরেন্সে তিতো মেলেমারও এক বিশেষ ভয়ের কারণ উপস্থিত হইল। সামান্য ভয় নয়—প্রাণ লইয়া টানাটানি।

মেলেমার ভয়ের কারণ ফরাসীদের একজন বৃদ্ধবন্দী। বৃদ্ধ মেলেমাকে বড় ভাল বাসিত—মেলেমার রক্ষক, পিতা। কিন্তু মেলেমা এই ভালবাসার প্রতিদানে কৃতঘ্নতা

প্রদর্শন করিয়াছেন। বৃদ্ধের শেষ চিহ্নগুলি বিক্রয় করিয়া তিনি অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, বৃদ্ধকে প্রকাশ্যস্থানে লোকের সম্মুখে পাগল বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এখন এই বন্ধন মুক্ত পলিত-কেশ লোলচর্ম্ম বন্দী বাল্‌দাসারের শাণিত ছুরিকার ভয়ে মেলেমাকে বর্ম্ম পরিধান করিতে হইয়াছে। নিদারুণ প্রতিহিংসার মত বৃদ্ধের করাল-মূর্ত্তি তাঁহাকে প্রতিক্ষণ কবর হইতে কবরান্তরে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে - রমলা হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করে বা। মেলেমার মনে মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি নাই। চলিতে ফিরিতে, উঠিতে বসিতে, এমন কি রমলার সহিত কথা কহিতেও তাঁহার মনে বালদাসার জাগিয়া উঠে। তিনি আর পূর্ব্বের মত কথা কহিতে পারেন না। রমলার সঙ্গও আর তেমন সুখ প্রদ নহে। ভয়ে, নৈরাশ্যে মানবের যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হয়, মেলে-মার জীবনে তাহা সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত।

রমলার চরিত্র এখনপর্য্যন্তও ভালরূপ অভিব্যক্ত হয় নাই। অবস্থাবিশেষে না পড়িলে চরিত্রের ত তেমন বিকাশ হয় না। এখন কেবল রমলা মেলেমার স্ত্রীমাত্র। অন্যান্য স্ত্রীর সহিত তাহার অধিক পড়াশুনা এবং স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য বৈ বিশেষ কোনও তফাৎ ত দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এইবারে ক্রমে ক্রমে তাহার স্বভাব ব্যক্ত হইতেছে। বার্দোর মৃত্যু হইয়াছে। মেলেমার আধিপত্য সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এদিকে বৃদ্ধ বাল্‌দাসারের ভয়ে ভয়ে মেলেমার ভাবের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া পড়িতেছে। সে মেলেমা আর নাই। এইরূপ দুর্দ্দিনেই ত চরিত্র স্ফূর্ত্তি পায়। সেই জন্য রমলার হৃদয়ের গঠন বুঝিতে হইলে তাহার জীবনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদই বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক। প্রথম পরিচ্ছেদে স্বভাব বিকাশের অবসর হয় নাই। এখন তিতোর সহিত যখনই রমলার কথাবার্ত্তা হয়, রমলা যেন খানিকটা করিয়া বাহির হইয়া আসে। রমলার চরিত্রে বার্দোর প্রভাবও বেশ বুঝা যায়।

বার্দোর মৃত্যুর কয়েকমাস পরে রমলা একদিন লাইব্রেরীতে বসিয়া কি লেখাপড়া করিতেছে, এমন সময়ে মেলেমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেলেমা আজ প্রথম বর্ম্ম লইয়া আসিয়াছেন। রমলা তিতোর মুখ শুষ্ক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার কি বিশেষ ক্লান্তি বোধ হইতেছে? রমলার মুখচুম্বন করিয়া মেলেমা নিকটস্থ আসনে উপবেশন করিলেন। ক্ষণকাল পরে রমলাকে এ লাইব্রেরী-গৃহ ছাড়িয়া তাঁহাদের নিজের গৃহে বসিবার কথা বলিলেন। রমলা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু স্বামী বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিল। তাহার পর বর্ম্মের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই রমলা মেলেমাকে বর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। মেলেমা ফ্লোরেন্সের বর্ত্তমান অরাজক অবস্থার উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার আত্মরক্ষার জন্য বর্ম্মের আবশ্যক। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। রমলা ফ্রাজিরলামোর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিল, সেখানে সেই বৃদ্ধ বন্দীকে দেখিতে পায়। তিতো তাহা

শুনিলেন। তাঁহার কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। মেলেমা বিশ্রাম করিতে উঠিলেন। তাঁহার দিনটা বড় ভাল গেল না।

এই ঘটনার দিন তিন চার পরে রমলা একদিন চিত্রকর পার্ঁবোর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। পায়রো বার্দোর একখানি চিত্র আঁকিতেছিলেন, কতদূর কি হইল না হইল দেখিয়া আসাই রমলার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ ছবি সে ছবি দেখিতে রমলার চক্ষে একটি পরিচিত ব্যক্তির ছবি পড়িল—তিতো মেলেমা, আর তাঁহার পার্শ্বে সেদিনকার সেই পলাতক বৃদ্ধ বন্দী। রমলা বালদাসারকে সেদিন পলাতক অবস্থায় দেখিয়াছে, তাহার পর তিতোর সহিত বৃদ্ধের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়াছে, আজ আবার মেলেমার চিত্রের পার্শ্বে তাহার চিত্র! রমলা শিহরিয়া উঠিল। পায়রোকে এ দুই ব্যক্তির চিত্র একত্রে আঁকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। পায়রো তাঁহার খেয়ালের দোহাই দিয়া কথাটা চাপা দিতে চেষ্টা করিলেন। সেদিন বালদাসার পড়িয়া যাইতে যাইতে তিতোকে ধরিয়া বাঁচিয়া যায়, তাই তিনি এরূপ ভাবে দুই জনের চিত্র আঁকিতেছেন বলিলেন। রমলার মন বড় অস্থির হইল। স্বামীকে একথা একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু না, যাহা তিনি স্বেচ্ছায় প্রকাশ করিতে চাহেন না, রমলা সে কথা জিজ্ঞাসা করিবে কেন? রমলা নীরব থাকিবে।

এই ভাবে দুই চারি দিন কাটিয়া যায়। তিতোর সহিত রমলার আর একদিন অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। তিতো কথায় কথায় রমলাকে জানাইলেন যে, বার্দোর লাইব্রেরী তিনি বিক্রয় করিয়াছেন, শীঘ্রই লোকজন আসিয়া পুস্তকাদি সরাইয়া ফেলিবে। রমলার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। বার্দো চির-জীবনের সঞ্চিত ধন লাইব্রেরীটী বিশ্বাস পূর্ব্বক মেলেমার হস্তে দিয়া গিয়াছেন, সেই মেলেমা মৃত বার্দোর নিকট বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া লাইব্রেরী পরহস্তগত করিলেন! মেলেমা রমলার স্বামী—বার্দোর জামাতা—তাঁহার এই কাজ! রমলার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সংযমীর ধ্যান ভঙ্গ হইলে যেরূপ অবস্থা হয়, বজ্রাহতা রমলার এখন ঠিক সেই অবস্থা। সে আর সে রমলা নাই। কি যেন ভীষণ নৈরাশ্যে আত্মহারা হইয়া সে তিতোকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া সম্বোধন করিল। রমলার মধ্যে যেন বার্দোর প্রেতাত্মা গুমরিয়া উঠিতেছে। রমলা বার্ণাদোর নিকটে গিয়া লাইব্রেরী রক্ষার উপায় করিবে। তিতো অনেক করিয়া বুঝাইলেন। রমলাকে বার্ণাদোর নিকটে যাওয়া হইতে নিবৃত্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত রমলার বিচ্ছেদ আরম্ভ হইল।

রমলা সকল সহিতে পারে, কিন্তু আপনার স্বামীর কলঙ্ক দেখিতে পারে না। তাহার স্বামী যে স্বার্থের দুয়ারে বিশ্বাস ভঙ্গ করিবেন ইহা তাহার অসহ্য। তিতো মেলেমা রমলার নিকটে বিশ্বাস-ভঙ্গের কথা তুলিতেই রমলা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তিতোকে সে এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছিল যে, বার্দো যদি মেলেমায় বিশ্বাস ভঙ্গের সন্দেহ করিতেন,

তাহা হইলে তাঁহার সাধের লাইব্রেরী মেলেমার ক্ষমতায় রাখিতেন না। এমন কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, জীবন্ত কাহাকেও কি তিনি প্রবঞ্চনা করিয়াছেন? সেই জন্যই কি এই বর্ম্ম পরিধান? কিন্তু এত কথাতেও মেলেমার চৈতন্য হয় নাই। নগদ মুদ্রার মায়া পরিত্যাগ করা মেলেমার পোষাইল না। বার্দো বাঁচিয়া ত নাই—তাঁহার আবার বিশ্বাস ভঙ্গ কি? মেলেমা ভাবিলেন, রমলা তাঁহারই ত স্ত্রী। সহসা এ সংবাদ শুনিয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছে, দুই দিন পরে আর কিছুই মনে হইবে না। কিন্তু রমলা সে প্রকৃতি নহে। সে গভীর হৃদয়ে যে ঘটনা পৌঁছে তাহা আর সহজে মুছেনা।

লাইব্রেরী যথা সময়ে স্থানান্তরিত হইল। রমলাও ফ্লারেন্স ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিল। তিতোকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহার ভয়ানক কষ্ট হইতেছে। জোর করিয়া কেবল সে মনকে বুঝাইতে চায় যে, তিতোর প্রতি তাহার ভালবাসা নাই। কিন্তু কল্পনা করিলে কি হইবে? তাহার প্রত্যেক কার্য্যে তিতোকেই মনে পড়িতেছে—তিতোর স্নেহ, তিতোর কথা, তিতোর স্মৃতি। তিতোকে কেন সে সেদিন রূঢ় কথা শুনাইল? কেন তাঁহার নামে প্রতারণার কলঙ্ক বলিল? তিতো-আচ্ছন্না রমলা অন্তরে অন্তরে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তবুও সে মন বাঁধিয়াছে—ফ্লোরেন্সে আর থাকিবে না। ম্যাসো চাকরের দ্বারা বলোনা হইতে স্বামীকে এবং ধর্ম্মপিতাকে দুইখানি পত্র পাঠাইয়া দিবে, সেই জন্য দুইখানি পত্র লিখিয়া লইল। তিতোকে লিখিল, তাঁহার প্রতি রমলার ভালবাসার অবসান হইয়াছে, সুতরাং যতদূর তিতোর ছিল রমলাও মরিয়াছে। আইনের বলে তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করা না হয়, কারণ মেলেমা তাহাতে সুখী হইতে পারিবেন না। যে রমলাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, সে আর ফিরে না। পরিশেষে, তাঁহাকে তাহার দানের সিন্ধুকটি বার্ণাদোর নিকট পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছে। তাহারই মধ্যে তাহার বিবাহের কাপড় চোপড়, ছবি, পিতা মাতার স্মৃতিচিহ্নগুলি আছে। ধর্ম্ম পিতাকেও রমলা ধর্ম্মকন্যার অনুসন্ধান হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিয়া লিখিল।

পত্র দুইখানি বুকে করিয়া রমলা নীরবে ছদ্মবেশে গৃহ হইতে বাহির হইল। অনেকদূর গেল, কেহ তাহাকে চিনিতে পারিল না। কিন্তু এইবারে বুঝি সে ধরা পড়ে—ফ্রাজিরলামো আসিতেছেন। জিরলামো রমলার ছদ্মবেশ বুঝিতে পারিলেন। রমলাকে গৃহে প্রতিগমন করিবার জন্য অনেক বুঝাইলেন। রমলা বুঝে না। সে বলে, স্বামীর প্রতি তাহার আর সে অকপট প্রেম নাই, ভাণ করিয়া চলা তাহার পোষাইবে না, এই জন্য সে গৃহে প্রতিগমন করিতে সম্মত নয়। জিরলামোর রমলার অবস্থা বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি তখন বুঝাইতে লাগিলেন যে, এরূপভাবে স্বামী-গৃহ হইতে চলিয়া যাওয়া কেবল স্বার্থপরতা। কর্ত্তব্যের জন্য কার্য্য করিতে হইবে, সামান্য কারণে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলা মানবের ধর্ম্ম নহে। ত্যাগ-

স্বীকারেই প্রকৃত মহত্ত্ব। আত্ম সুখের জন্য পলায়ন ত্যাগস্বীকার হইতে বহুদূর। এইরূপ উচ্চভাবের কথায় তিনি রমলাকে পলায়ন হইতে নিবৃত্ত করিলেন। রমলা বুঝিল। গৃহে আসিয়া পত্র দুইখানি ছিঁড়িয়া ফেলিল। রমলা আবার যে গৃহে সেই গৃহে।

তিতো মেলেমার জীবনে ইতিমধ্যে কেবল দুইটী উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে। তেসার আলয়ে বালদাসারের সহিত তাঁহার একবার দেখাসাক্ষাৎ হয়। বালদাসারের নিকট তিনি মার্জ্জনা ভিক্ষা করেন, কিন্তু প্রতিশোধলিপ্সু বালদাসার কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না। বালদাসারের অন্তরের একমাত্র' স্পৃহা—প্রতিশোধ। আর একবার রুসেলাই উদ্যানে সান্ধ্যভোজে বালদাসারের সহিত মেলেমার বেশ একটু বাধিয়াছিল। বালদাসার প্রকাশ্য ভোজে সর্ব্বসমক্ষে তিতোকে বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন বলিয়া প্রকাশ করে। তিতো বালদাসারকে পাগল প্রমাণ করিয়া দেন। নানা কারণে তিতোর কথাই টিঁকিয়া যায়।

কিন্তু তিতো বালদাসার সম্বন্ধে আপাততঃ আর অধিক বলা আবশ্যক করে না। তিতো এখন চাণক্য-বিদ্যায় বেশ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছেন—রাজা প্রজা, সন্ধি বিগ্রহ, ষড়যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্র লইয়াই দিন কাটে। রমলার সহিত কিন্তু তাঁহার বিচ্ছেদ বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। বিধির বিধান খণ্ডন করিতে পারে কে? ঘটনা চক্রে রাজনৈতিক বিষয়েও রমলার সহিত তাঁহার অল্প বিস্তর ঠোকাঠুকি হয়। মেলেমা যদি তেমন সত্যনিষ্ঠ সচ্চরিত্র হইতেন, তাহা হইলে এ বিচ্ছেদ হয়ত হইত না। তিনি যেখানে রমলার ভয়ে লুকাইয়া চলেন সেইখানেই রমলার নিকট ধরা পড়েন। জীবনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এইরূপ আধো-ছাড়াছাড়ি ভাবে কাটিয়া গেল। তৃতীয় পরিচ্ছেদে রমলার সহিত বিচ্ছেদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

বালদাসারকে রমলা একবার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করে। বালদাসার রমলার নিকটে মেলেমার সকল কথা প্রকাশ করিয়া দেয়—তেসার কথা পর্য্যন্তও বাদ যায় নাই। ভগবান রমলাকে তেসাকে দেখাইয়া দেন। মেলেমা যে তেসার স্বামী তাহাও রমলা জানিতে পারিল। রাজনৈতিক দু'একটী ঘটনা লইয়াও রমলার মেলেমার সহিত অল্প অল্প মনান্তর চলিয়াছে। মেলেমার সহিত রমলার দুই তিনবার কথোপকথন হইয়াছে, বালদাসারের কথাও ফাঁক যায় নাই, কিন্তু তাহাতে বিচ্ছেদ ক্রমাগতই বাড়িয়াছে। রমলা সকল সহিতে পারে—মিথ্যাচরণ সহিতে পারে না। তিতোও একবার মিথ্যাকে অবলম্বন করিয়াছেন, আর ছাড়িতে পারেন না। সুতরাং দুই জনের মিলনাশা বিরল।

কিন্তু সে যাহাই হৌক, গল্পের খুঁটিনাটি আর অধিক বলা যায় না। রমলা অল্প দিন পরে আবার ফ্লোরেন্স ত্যাগ করিয়া গেল। তিতোকেও প্রাণ লইয়া পলা-

হইতে হইল। কিন্তু তিতোর প্রাণ বাঁচিল না। বৃদ্ধ বালদাসারের তৃষিত প্রতিহিংসা তাঁহার প্রাণ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। রমলা কেবল রোগীর শুশ্রূষা করিয়া বেড়ায়—তাহার জীবনের একমাত্র কার্য্য পরোপকার। ক্রমে সে তিতোর মৃত্যু সংবাদ শুনিল। কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিল না—ফ্লোরেন্সে ফিরিয়া আসিল। ফ্লোরেন্সে আসিয়া তেসার সন্ধান করিল। তেসার সন্তানদিগকে রমলা মায়ের মতন ভাল বাসে। তাহাদিগকে লালন পালন করিয়াই তাহার এখন দিন কাটে। তিতোর প্রতি তাহার ভালবাসা এইখানেই অভিব্যক্ত। রমলার চরিত্রও ফুটিয়াছে এইখানে।

রমলা কিছু নূতন ধরণের চরিত্র। হৃদয়ের আবেগে সে কার্য্য করে, কিন্তু সে সংযত। তাহার যাহা সত্য ন্যায় বলিয়া মনে হয়, মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে তাহা হইতে সে কথনও বিচ্যুত হয় না। তিতোর চরিত্র যদি রমলাপেক্ষা উন্নত হইত, তাহা হইলে কোনও গোল ছিল না। রমলা তাহা হইলে আরও ভালরূপ ফুটিত, তাহার সৌন্দর্য্য আরও সুপরিস্ফুট হইত। স্ত্রী অপেক্ষা স্বামীর সকল বিষয়ে শিক্ষিত উন্নত হওয়া আবশ্যক। কারণ, স্বামীই স্ত্রীর পথ-প্রদর্শক, সহায়, সর্ব্বস্ব। নহিলে পথপ্রদর্শক যদি অন্ধকার কূপের মধ্যে পথ দেখাইয়া দেন, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির তাঁহার প্রতি কতক্ষণ অটল বিশ্বাস থাকে? রমলার স্বামীর পুঁথি-পাণ্ডিত্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু হৃদয়ের এতদূর মহত্ত্ব ছিল না যে, রমলাকে সুচালিত করিতে পারেন। এই জন্য রমলা ফুটিল বটে, কিন্তু সৌরভ বিস্তার করিতে পারিল না। এরণ্ড বৃক্ষকে জড়াইয়া উঠিলে মাধবীলতার কি আর তেমন শোভা ফুটে? হৃদয়ের সত্যনিষ্ঠ উদার মহত্ত্ব সম্বন্ধে তিতো মেলেমা এরণ্ড দ্রুম বটে।

শিক্ষার বিরোধী পক্ষ রমলাকে তিতো হইতে বিচ্ছিন্ন দেখিয়া তাহাকেই গালি দিবেন, এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীজাতির পুস্তক-স্পর্শ-রহিতাজ্ঞা প্রচার করিতে ত্রুটী করিবেন না। রমলা তিতো হইতে দূরে থাকিয়া কি অবস্থায় ছিল, ইহা দেখিতে তাঁহাদের অবসর হইবে না। মিথ্যাচরণের ভয়েই কেবল রমলা দূরে সরিয়া গিয়াছিল। সরিয়া না গেলেও হয়ত চলিত—হয়ত আরও ভাল হইত। কিন্তু ফ্লোরেন্স ত্যাগের জন্যই তাহাকে পতিত স্থির করা যায় না। হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণায় লোকে সময় সময় হাসিয়া থাকে, রমলার অবস্থা এইরূপ। আত্ম সংযমের প্রভাবেই কেবল সে বাঁচিয়াছিল—শুধু বাঁচিয়া থাকা নয়, সংসারের জন্য খাটিতে পারিয়াছিল।

রমলার চরিত্রে বরাবরই এই সংযম-ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বার্দো-লাইব্রেরীতে দেখ, মেলেমার সহিত প্রথমালাপে দেখ, বিবাহের পরে দেখ, এমন কি তিতোর মৃত্যুর পরেও দেখ, রমলার কি অসাধারণ আত্মসংযম! নভেল্লী ভাব রমলায় আদবে নাই। সংসারের জটিল রহস্যের মধ্য দিয়া সে কেবল অসাধারণ আত্মসংযমের বলেই দৃঢ়পদক্ষেপে চলিতে পারিয়াছে। নহিলে তাহার দশা কি হইত কে জানে!

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফুলজানি।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"মন্ত্রগুপ্তি" শিখাইবার জন্য এই বাঙ্গালাদেশে অনেকবার অনেক চেষ্টা হইয়া গিয়াছে, শাক্ত বৈষ্ণব কেহই তাহাতে কসুর করেন নাই—কেন না তাহার সাধনার উভয় সম্প্রদায় মাত্রেরই সিদ্ধি নির্ভর করিত—কিন্তু ফল কিছু হয় নাই। ঠাকুর দাদা মহাশয়দিগকে জবাবদিহি হইতে বঞ্চিত করা এ পক্ষের অভিপ্রেত নহে, কিন্তু ঠাকুরাণী দিদিরা বোধ করি ইহার জন্য বেশী পরিমাণে দায়ী। "ক্লীং" বা "হ্রীং" তাঁহারা দিব্য হজম করিয়া ফেলিতেন বটে, কিন্তু তার উপর আর দুটো কথার সংযোগ হইলেই তাঁহাদের রসনার অগ্নি পরীক্ষা উপস্থিত। এখনকার শ্রীমতীগণ রাগ করিবেন না, কিন্তু জগদ্ধাত্রী দাসীতে আর তাঁর স্বামীতে শয়নকক্ষে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল দেখিতে দেখিতে তাহা রাষ্ট্র হইয়া গেল, সেটা যে প্রথমার কল্যাণে ইহা সত্যের খাতিরে গরিব গ্রন্থকারকে বলিতেই হইতেছে।

অপরাহ্ণে নিস্তারিণী ফুলকুমারীর চুল বাঁধিয়া দিতেছিলেন, কাছে বসিয়া কালী গল্প করিতেছিল। বলিতেছিল "সইমা পুরো দাদা তার বাপের সঙ্গে যাবে শুনেচো? হা দেখ সইমা আমি ভাবি পুরো দাদাকে "সয়া" বল্‌বো, দাদা আর বল্‌বোনা, কিন্তু ভারি লজ্জা করে। তা যাবার আগে পুরো দাদা তোমার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌বে না?"

নিস্তারিণী নীরবে ঘাড় নাড়িলেন। ফুল তাহার মাথা হেঁট করিয়া মাটী খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং সইয়ের উপর রাগিতেছিল।

সইয়ের সেভাব দেখিয়া কালীর ভারি হাসি পাইতেছিল, কিন্তু সইমার সাম্‌নে সে অবস্থায় হাসি সামলাইতেই হইবে! বালিকা পলকে আত্ম দখল করিয়া আবার বলিল—"ঝকড়ার জন্যে আস্‌বে না বল্‌চো? তা তুমি ত ঝকড়া করনি বাছা! পুরো দাদা যদি বাপমার ভয়ে না আসে, তা আমি তাকে লুকিয়ে আস্‌তে বল্‌বো। কেউ জান্‌তে পার্‌বে না।"

এবার নিস্তারিণী কথা কহিলেন, "তাতে কাজ নেই বাছা, ছেলেকে বাপমার অবাধ্য হতে শেখাতে নেই। বেঁচে থাক্, চিরদিন কিছু ঝকড়া থাক্‌বে না।"

কথাটা কালীর মনের মত হয় নাই, কিন্তু সইমার বিষণ্ণ মুখছবি দেখিয়া আর কিছু বলিতে তার সাহস হইল না। বরং যাহা বলিয়াছে, তাতেই হয়ত তিনি মনোবেদনা পাইয়াছেন ভাবিয়া সরলা বালিকা কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। তখন সইমার মুখে একবার হাসি দেখিবার জন্য তার ক্ষুদ্র প্রাণটুকু ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আপনি পিতা মাতার

একটা কথা তার মনে পড়িয়া গেল। উৎসাহে বলিল "সইমা, সইকে সে দিন যেতে দাওনি শুনে বাবার মুখে তোমার সুখ্যাত ধরে না।" কাজেই সইমাকে হাসিতে হইল,—কালীও বাঁচিল।

চুল বাঁধা শেষ হইলে দুই সইয়ে কাপড় কাচিতে চলিল। চলনে ফেরনে দুজনের বরাবর পার্থক্য, তার উপর বিবাহের পর ফুল আরও মন্থন গতি হইয়াছিল,—শ্বশুর বাড়ীর কুকুরটা বিড়ালটার জন্যও তার সশঙ্ক সচকিত দৃষ্টি—কিন্তু কালী ঠাকুরাণী রণরঙ্গে ধাইতেছিলেন। কোথাও ছাগ শিশু মাতার সঙ্গে নিশ্চিন্ত মনে তৃণ ভোজনে রত, দৌড়িয়া গিয়া তাহাদিগকে তাড়া করিতেছিলেন,—কোথাও পথের ধারে ছোট ছোট পাখীরা লেজ নাচাইয়া খেলিতেছিল, তাহাদের পাছে পাছে ছুটিয়া ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে উড়াইয়া দিয়া তবে ছাড়িতেছিলেন। কাজেই ফুল পিছাইয়া পড়িতেছিল এবং সইকে মৃদু অনুযোগ করিতেছিল। সই সেটা কিন্তু একটা নূতন রকমের খেলা ছাড়া আর কিছু ভাবিতেছিলেন না এবং খেলাটাকে আরও আমোদ-জনক করিয়া তুলিবার জন্য ছুটিতে ছুটিতে এক একবার থামিয়া ফুলকে হাতছানি দিয়া ডাকিতে-ছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিতেছিলেন—"শীগ্‌গির আয় সই!" ইহাতে ফুল আরও প্রমাদ গণিতেছিল এবং মনে করিতেছিল আর কখ্‌খনই সইয়ের সঙ্গে কাপড় কাচতে আস্‌বে না।

এমনি করিয়া দুজনে ক্রমে তাল পুকুরে উপস্থিত হইল। গা ধুইবার জন্য সই দুটীর নির্দ্দিষ্ট কোন পুষ্করিণী ছিল না এবং আমরা খবর রাখি এই অনিশ্চয়তার কারণ স্বয়ং কালী ঠাকুরাণী। একটু নির্জ্জন নহিলে তাঁহার সাঁতারদিবার তেমন সুবিধা হইত না, অতএব সে ইচ্ছা যে দিন তাঁর হইত, সে দিন সইকে তিনি নানা ছলে ভুলা-ইয়া আপনার মনোমত স্থানে লইয়া যাইতেন। এসব ফুলের সহিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আজ্ যে সাঁতার ছাড়া আর একটা দুষ্টুমি সইকে আশ্রয় করিয়াছিল. তাহার ছন্দাংশও বুঝিতে তাহার ক্ষীণ মনটুকু সক্ষম হয় নাই। হইলে "ঠাকুরের দিব্বি" ফুল কোন মতে কাপড় কাচিতে আসিত না।

ঘাটে আসিয়া কালী মহা ভাল মানুষটী হইয়া দাঁড়াইল এবং দু কথায় সইকে হাসা-ইয়া তাহার রাগ ভাল করিয়া দিল। তার পর সইমার সঙ্গে প্রথমে যে কথা হইতে-ছিল, ফুলের সঙ্গে চুপি চুপি আবার সেই কথাই আরম্ভ করিয়া দিল। বলিল "সই বরের সঙ্গে একবার দেখা কর্‌বি লো!"

শুনিয়া ফুল ভাবিল, বর বুঝি সেখানে কোথাও লুকাইয়া আছে। অতএব তাহার সর্ব্বাঙ্গ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, কাপড় কাচিবার জন্য মাথার কাপড় কোমরে নামিয়া-ছিল, আবার হঠাৎ স্বস্থানে তাহার উদয় হইল। সইয়ের এইভাব এবং যুগপৎ সচকিত দৃষ্টি ও বারম্বার জিহ্বা দংশন দেখিয়া কালী উচ্চ হাসির তরঙ্গ খুলিয়া দিল।

এমন সময়ে কেহ ধীরে ধীরে বটগাছ হইতে নামিয়া তাহাদের দিকে আসিতে লাগিল। উভয়েই মুহূর্ত্তে চিনিল—পুরন্দর! প্রথমে উভয়েই সমান বিস্মিত হইয়াছিল, কেন না কালীও এভাবে এ সাক্ষাতের আশা করে নাই। দৈবাৎ যদি সে পথে পুরন্দর আসিয়া পড়ে; এইরূপ বালিকা সুলভ কৌতূহলের বশে সে সইকে তাল পুকুরের দিকে আনিয়াছিল। কাজেই উভয়ে বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। পুরন্দরও বালিকা দ্বয়কে সে অবস্থায় দেখিয়া সশঙ্কিত হইয়া—আর অগ্রসর হইল না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

"পূর্ব্ব" এবং "পরকাল" কথা দুটোকে অভিধান ছাড়া করিতে পারিলে যাঁহারা বাঁচেন, তাঁহারা যদি একবার ভাবিয়া দেখেন আমরা সকলেই বাস্তবিক পিতায় ছিলাম এবং পুত্রে আছি তাহা হইলে বোধ করি অনেক উৎপাতের শান্তি হয়। রক্তের টান বলিয়া যে একটা কথা আছে, সেটা নিতান্ত কথার কথা নহে। মনুষ্য প্রকৃতির নগ্ন ছবি আঁকিতে গিয়া যে জ্ঞানী বলিয়াছিলেন, এ সংসারে মানুষ কেবল মাত্র আত্মজকেই আপনার চেয়ে বড় হইতে দেখিলে সর্ব্বান্তঃকরণে সুখী হয়, তিনি বুঝি মহান্ সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এই যে ব্যক্তিগত সুখ, কালধর্ম্মে নির্ব্বিশেষে ইহা "মনুষ্যত্ব" গত হইবে না কে বলিতে পারে?

পুরন্দরের এখন আর সে চঞ্চল বালকতা নাই। দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে তাহার অকাল গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িয়া গেল। পিতৃ চরিতের কঠোর স্বার্থপরতা পূর্ব্বে কখন সে অনুভব করে নাই, জীবনের প্রভাতে সরল উদার হৃদয়দর্পণের সম্মুখে কেন অকস্মাৎ বিভীষিকার চিত্র প্রতিভাত হইল? তারপর সঙ্গে সঙ্গে পুরন্দর শুনিল, পিতার সঙ্গে তাহাকে যাইতে হইবে।

সেই দিন হইতে পুরন্দর আগেকার ছুটাছুটি খেলা ধূলো সব ছাড়িয়া দিল। সমবয়স্ক সখাদের সঙ্গে মিলিত মিশিত বটে কিন্তু পূর্ব্ববৎ প্রাণে প্রাণে নহে। গুরু মহাশয় রামধন ভট্টাচার্য্য বিবাহের উপলক্ষে পর্য্যন্ত বিদায় পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার "সিধা" ও "তামাকে"র বরাদ্ধ অতঃপর বেশী হইবে এরূপ ভরসাও করিতেছিলেন কাজেই পুরন্দরের বিষণ্ণ গম্ভীর মূর্ত্তি হঠাৎ একদিন তাঁহার চক্ষে পড়িয়া গেল। তিনি এক মুখ হাসিয়া হাঁকিলেন—"পুরোরে, বিয়ে করে জ্যেঠা মশায় হলি নাকি?"

পাঠশালার শত চক্ষু পুরণের হেঁট মুখ খানির উপর পড়িল। ছেলেদের ভিতর একটা অস্ফুট কাণাকাণির গোল উঠিল। হাট জমিয়া যায় দেখিয়া গুরু মহাশয় বেতাস্ফালন করিলেন।

মধো সুযোগ পাইয়া বলিল "বিয়ের জন্যে নয় মশায়, আজ কদিনই পুরন অমন

শুক্‌নো শুক্‌নো হয়েচে। বাপের সঙ্গে পরগোণায় যাবে পারসী পড়তে, তাই জন্যে। ভোলা বলিল "তাই জন্যে আজ্ ওদের বাড়ী সত্যিনারাণের সিন্নি হবে।"

গুরু মহাশয় পুরন্দরের স্থানান্তর গমনের প্রস্তাব শুনিয়া কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইলেন। কোথায় বেশী বরাদ্দের কথা, তা নয় একেবারে শূন্য ভাগের ব্যবস্থা। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন "কেনরে পুরো, এতই কি পণ্ডিত হয়ে উট্‌লি যে এখানে আর পড়া হয় না? কেজানে বাপু, তোর বাপের বুদ্ধি যেন জেলাপির পাক।" গুরু মহাশয় ভাবিলেন গরিবের উপর অত্যাচার করিয়া নায়েব যেমন পাপ করেন, তাঁহার সিধা তামাকের হন্তারক হইয়া ছেলেকে বিদ্যা শিক্ষার্থ অন্যত্র লইযা যাওয়াও তদ্রূপ বা ততোধিক পাপ। নায়েব মহাশয়কে তিনি যে যথেষ্ট ভয় করিতেন না এমত নহে, আজ ভাবিলেন আর তিনি কোন তোয়াক্কা রাখেন না॥

গুরু মহাশয়ের কথায় পুরন্দরের চক্ষে জল আসিল। পিতা যে সকলেরই হেয় হইয়াছেন, ইহা তাহার প্রাণে সহিতেছিল না।

সেই দিন জলখাবারের ছুটীতে গিয়া পুরন্দর আর পাঠশালায় আসিল না।

ক্রমশঃ।

কবিতামালা।

হতাশ।

দিবানিশি মলিন বদনে,
বসে আছি বাতায়ন পাশে।
দিন যায় রজনী পোহায়,
কই তবু সেত নাহি আসে।

যেই খানে ফুটিয়াছে ফুল
সেই খানে পুন যায় ঝরে,
বিহগের মধুমাখা স্বর,
কাননের কোলে যায় মরে।

উছলিত তটিনী হৃদয়
ধীরে ধীরে পড়েছে ঘুমিয়া,
ঘুমন্ত ফুলের মুখ পরে
সমীরণ যেতেছে চুমিয়া।

একাকিনী গভীর নিশীথে
বসে আছি বাতায়ন পাশে,
মুগ্ধ হৃদি উঠিছে কাঁদিয়া
কাঁদিতেছে বাসনা হতাশে।

ছায়া।

১

গভীরে নীরবে ধীরে,
আধার অরণ্য তীরে,
উথলি শ্রাবণ বারি না জানি চাহিছে কারে,
তিমির জড়িত কায়
কাঁপেনা নিশীথ বায়
অতল আপন মাঝে আপনি লুকায় ধীরে।
স্বর্গে নাহি তারা-আলো
মেঘ ছায়া কাল' কাল'
পিশাচের মত তার ঘুমায় হৃদয় পরে।

২

আমার প্রাণের ছায়
নিশান্তে নীহার প্রায়
ঘুরিয়া কাঁদিয়া মরে,এ কি ছায়া প্রাণহারা!
কোন সাগরের বাণী
বিলাপের কানাকানি
এ চির সন্ধ্যার মাঝে হয়ে ছে গো পথহারা!
গাওরে মরণ গান
ঘুমায়ে পড়ুক প্রাণ
হিম সিক্ত এ আঁধারে চেওনাক রবি তারা।

বাসনা।

চিরদিন অতৃপ্ত এ হৃদয়ের মাঝে,
একই বাসনা জাগে একই তিয়াস ;
পরাণের উপকূলে ধীরে ধীরে আসি,
আকুল মরম হতে উঠিছে নিঃশ্বাস।
একটি মধুর মুখ জাগিছে হৃদয়ে,
কি যেন সুখের ছায়া ভাসিছে পরাণে ;
ভুলে গিয়ে তাই হায় চাই ফিরে ফিরে,
ছুটি ফোঁটা অশ্রু ঝরে মলিন নয়ানে।
কুসুমের মোহমাখা মধুর পরশে,
আকুল হয়েছে যেন আজিকে সমীর ;
কি জানি কাহার মোহে কার পরশনে,
আজিকে পরাণ মোর হয়েছে অধীর।
গরজি উঠিছে সিন্ধু ঝটিকার সনে,
আবার হইবে শান্ত মত্ত পারাবার,
এত যে ঝটিকা কণা বহিছে হৃদয়ে
কভু কি হবেনা শান্ত হৃদয় আমার ?

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

আধুনিক মত ও চিন্তা।

মানসিক বিকাশের নিয়ম।

অধ্যাপক ক্লিফোর্ড বলেন, আজ সমস্ত দিন কি করিলাম সূক্ষ্মরূপে যদি বিবেচনা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে আমাদের সকল কাজে কেবল মনেরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সর্ব্ব প্রথমে জাগ্রত হইলাম। এই জাগরণ-ক্রিয়ায় কি প্রকাশ পায় ?

আমার মন অচেতন অবস্থা হইতে সচেতন অবস্থায় উপনীত হইল। জাগ্রত হইয়াই হয়তো মনে হইল আর খানিকটা শুইয়া থাকি—কিন্তু এ ভাব শীঘ্রই চলিয়া গেল—মনে কার্য্য বাসনা উদয় হইল—বাসনা ইচ্ছায় পরিণত হইল—আমি শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িলাম। ইহাতে করিয়া দেখা যাইতেছে মনের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইল—অনিশ্চিত ভাব হইতে স্থিরতা, বাসনা হইতে ইচ্ছা—ইচ্ছা হইতে কার্য্য। এক কথায়, যাহা কিছু কার্য্য কবিয়াছি, অনুভব করিয়াছি, চিন্তা করিয়াছি তাহা আর কিছুই নহে কেবল মনেরই পরিবর্ত্তন। মানুষের চরিত্র কি স্থির থাকে?—চরিত্রতেও পরিবর্ত্তন চলিতেছে। প্রত্যেক বাহিরের ঘটনা মনের উপর কিছু না কিছু দাগ ফেলিয়া যায়—এই দাগ-গুল মিলিয়াই চরিত্র। যদিও মঙ্গল গ্রহের গতি-চক্র ডিম্বাকৃতি কিন্তু বাস্তবিক ঠিক কি ডিম্বাকৃতি পথেই তাহার গতি? একটুও কি এদিক্ ও দিক্ হয় না?—অবশ্যই হয়। ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধেও সেইরূপ। মোটামুটি চরিত্রে সাম্য দেখা যায়—কিন্তু একটু একটু করিয়া বৈষম্যও ঘটিতে থাকে। মনের ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হইতেছে সুতরাং চরিত্রেও একটু না একটু পরিবর্ত্তন হইবেই। মনুষ্য যখন শৈশব হইতে বাল্য, বাল্য হইতে যৌবন, যৌবন হইতে বার্দ্ধক্যে উপনীত হয় তখন সেই প্রত্যেক অবস্থায় মনের ও চরিত্রের কত পরিবর্ত্তন ঘটে। জাতিগত পরিবর্ত্তনও এইরূপে ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ কালে একটা না একটা বিশেষ আদর্শ থাকে—ইহাকে চলিত কথায় "কালের ধর্ম্ম" বলে—এই কালের ধর্ম্মেতেও পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। ইতিহাস কি?—না পরিবর্ত্তনের বিবরণ। মনের ক্রমাগতই পরিবর্ত্তন হইতেছে, এই পরিবর্ত্তনেই আমাদের মনের অস্তিত্ব জানিতে পারিতেছি। মনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত চরিত্রও পরিবর্ত্তন হয়—কিন্তু একটু আস্তে আস্তে; "কাল ধর্ম্মও" পরিবর্ত্তন হয়—কিন্তু সে আরও ধীর-গতিতে।

এই সকল পরিবর্ত্তনের সহিত বাহ্য অবস্থা ও ঘটনার নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-কারণের নিয়মেই এই সকল পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। পরিবর্ত্তন ভালর দিকেও হইতেছে, মন্দের দিকেও হইতেছে। মনের কোন্ অবস্থাকে ভালর দিকে পরিবর্ত্তন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি? কোন জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের চরিত্রে কত পরিবর্ত্তন হইতেছে—কাল ধর্ম্মের কত পরিবর্ত্তন হইতেছে—জাতি-বিশেষের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হইতেছে। কোনও জাতির মধ্যে হয়তো ভালর—দিকে-উন্নতির দিকে পরিবর্ত্তন হইতেছে, কোনও জাতি হয়তো অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। এই উন্নতি ও অবনতির নিদর্শন কি? কি চিহ্ন দেখিয়া উন্নতি ও অবনতির মাত্রা আমরা নিরূপণ করিব? এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

প্রাণীদিগের দেহ-যন্ত্রের পরিবর্ত্তনের সহিত মনের পরিবর্ত্তনের কতকটা সাদৃশ্য আছে। কি জীব-জন্তু কি বৃক্ষ-লতা সকলের মধ্যেই নিয়ত পরিবর্ত্তন চলিতেছে।

ফুল রাত্রিতে মুদিত হয় আবার প্রাতে প্রস্ফুটিত হয়, বৃক্ষদিগের পত্র এক সময় ঝরিয়া পড়ে—আবার এক সময় গজাইয়া উঠে। প্রত্যেক প্রাণীর শরীরে জন্ম হইতে পরিপক্কাবস্থা পর্য্যন্ত যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, মানব মনেরও সেইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। জীবন্ত প্রাণী মাত্রেরই এই একটি বিশেষ ধর্ম্ম যে, যেমন চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থার প্রভাবে তাহাদিগের মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটে সেইরূপ আবার সেই পরিবর্ত্তন সকল স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইয়া থাকে—একেবারে নষ্ট হয় না—সেই এক একটি পরিবর্ত্তনের স্তর পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তনের পত্তন ভূমি-স্বরূপ হয়। যদি কোনও বৃক্ষকে একবার একটু বাঁকাইয়া দাও, পরে আবার তাহাকে সোজা করিবার যতই চেষ্টা কর না কেন তাহার সেই বক্রতার চিহ্ন তাহাতে একটু না একটু থাকিয়া যাইবে—একেবারে কখনই তাহা অপনীত হইবে না—উহা সেই বৃক্ষের প্রকৃতিগত অংশ হইয়া পড়িবে—এমন কি, তাহাই আবার তাহার বীজে কতক পরিমাণে সংক্রামিত হইবে। কিন্তু কোনও জড় পদার্থের পরিবর্ত্তন এরূপ ভাবে হয় না। মনে কর এক খণ্ড সোনা—উহা পীত বর্ণ ও কঠিন—এই স্বর্ণখণ্ডকে তুমি গলাইয়া ফেল ইহা দ্রবভাবাপন্ন ও সবুজ বর্ণ হইবে। অবশ্য ইহাতে সমধিক পরিবর্ত্তন ঘটিল—কিন্তু ইহাকে ঠাণ্ডা হইতে দাও, আবার যে কে সেই পীতবর্ণ ও কঠিন হইয়া উঠিবে—ঠিক পূর্ব্ববৎ হইবে—কোনও পরিবর্ত্তন-চিহ্ন লক্ষিত হইবে না। একটা স্বর্ণখণ্ড দেখিয়া কেহ বলিতে পারিবে না যে উহাকে কতবার গলান হইয়াছে কিন্তু কোন নারিকেল বৃক্ষের কাণ্ড-গত চক্র দেখিয়া বলা যাইতে পারে তাহার কত বয়ঃক্রম হইয়াছে। কোনও জীবন্ত প্রাণী-দেহে কেবল শুধু যে তাহার নিজের অস্তিত্ব ইতিহাস থাকে এরূপ নহে—কিন্তু তাহার পূর্ব্ব পুরুষদিগেরও অস্তিত্ব ইতিহাস পর্য্যন্ত নিহিত থাকে। মানব-মনের পরিবর্ত্তনও এইরূপ নিয়মে হইয়া থাকে।

যাহাকে পরিণাম-বাদ বা ক্রমাভিব্যক্তিবাদ বলে তাহারও নিয়ম এইরূপ। পরিণাম বাদ এইরূপ বলে যে জীবজন্তু ও বৃক্ষলতাদির জাতি-বিশেষ আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তন চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থার সহিত—এক কথায় আবেষ্টনের সহিত কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ। কোনও জাতি-বিশেষের উপর এই আবেষ্টনের ক্রিয়া দুই প্রকার—একটি প্রত্যক্ষ আর একটি অপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ ক্রিয়া কিরূপ তাহা সহজেই বুঝা যায়। জল-বায়ুর পরিবর্ত্তনে ত্বকের বর্ণ-পরিবর্ত্তন, কোন বিশেষ অঙ্গের সমধিক পরিচালনায় সেই অঙ্গের পরিবর্দ্ধন ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। এই সকল পরিবর্ত্তন জীব-দেহে একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে কালে উহাই পর বংশে সংক্রামিত হয়। কিন্তু আবেষ্টনের অপ্রত্যক্ষ ক্রিয়া যাহাকে প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন বলা যায় ইহা প্রত্যক্ষ-ক্রিয়া অপেক্ষা আরও বলবৎ। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ইহার ক্রিয়া-পদ্ধতি হৃদয়ঙ্গম হইবে। দক্ষিণ আমেরিকায় দুই জাতীয় প্রজাপতি আছে। তাহারা

দেখিতে প্রায় একই রকম কিন্তু উহাদের মধ্যে একজাতি বড়ই সুস্বাদু—পক্ষীদের প্রিয় আহার। আর একজাতি অত্যন্ত বিস্বাদু – পক্ষীদিগের বর্জ্জনীয়। এক্ষণে মনে কর, বিস্বাদু প্রজাপতির যে সকল চিহ্ন, সেই সকল চিহ্নবিশিষ্ট সুস্বাদু প্রজাপতি কথন কথন জন্মাইতে লাগিল। পক্ষীরা বিস্বাদু প্রজাপতি ভ্রমে ঐ সকল সুস্বাদু প্রজাপতিকে গ্রাস করিতে বিরত হইল—কাজেই এই সকল প্রজাপতিদিগের বাঁচিবার ও বংশবৃদ্ধি করিবার সমধিক সম্ভাবনা হইল। এই বিশেষ চিহ্ন যদি কুল-প্রবাহী হয় তাহা হইলে এই বিস্বাদু প্রজাপতির চিহ্ন বিশিষ্ট সুস্বাদু প্রজাপতির সংখ্যা উত্তর বংশে আরও অধিকতর হইবে সন্দেহ নাই। এই পদ্ধতিটি যদি বরাবর চলিতে থাকে, তাহা হইলে ক্রমে নিজস্ব-চিহ্ন বিশিষ্ট সুস্বাদু প্রজাপতিদিগকে পক্ষীরা খাইয়া খাইয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিবে—এবং সুস্বাদু জাতীয় প্রজাপতিরা বিস্বাদু জাতীয় প্রজাপতির চিহ্ন ধারণ করিবে। এইরূপ ব্যাপার বাস্তবিকই ঘটিয়াছে। একজাতীয় প্রজাপতি অপর জাতীয় প্রজাপতির চিহ্ন অনুকরণ করিয়াছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কার্য্য এই স্থলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কোন ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে যদি এমন কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে যাহাতে জীবনের যুঝাযুঝিতে তাহার একটু সুবিধা হয় তাহা হইলে সেই বৈলক্ষণ্যটি অন্য বৈলক্ষণ্য অপেক্ষা তাহার সন্তান সন্ততিতে প্রবর্ত্তিত হইবার অধিক সম্ভাবনা কারণ সেই বৈষম্য সেই ব্যক্তি-বিশেষের জীবন রক্ষার পক্ষে উপযোগী। এইরূপে প্রকৃতি আবেষ্টনের অনুপযোগী জীব সকলকে ক্রমশঃ নির্ম্মূল করিয়া জাতি বিশেষের সহিত আবেষ্টনের সামঞ্জস্য সম্পাদন করেন। অতএব দেখা যাইতেছে ব্যক্তি বিশেষে যে সকল সুবিধা জনক পরিবর্ত্তন ঘটে তাহাই জাতি-বিশেষে প্রবর্ত্তিত হয়।

ব্যক্তি বিশেষের দেহ মধ্যে তিন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। আয়তন-গত পরিবর্ত্তন—অর্থাৎ বৃদ্ধি; গঠনগত পরিবর্ত্তন—অর্থাৎ আকার-প্রকারের এবং অংশ-সমূহের ব্যবস্থান সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন যথা, শিশুর (Cartilaginous) উপাস্থিময় দেহ-পঞ্জর ক্রমশঃ কঠিন হইয়া অস্থিময় দেহপঞ্জরে পরিণত হয়; এবং ক্রিয়া-গত পরিবর্ত্তন অর্থাৎ দেহ-যন্ত্রের কোন অংশ যে রূপে ব্যবহার করা হয় তদ্বিষয়ক পরিবর্ত্তন।

মনেরও পরিবর্ত্তন এইরূপ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

১। বৃদ্ধি।

২। গঠন-পরিবর্ত্তন।

৩। ক্রিয়া-পরিবর্ত্তন।

প্রথম বৃদ্ধি। মনের বৃদ্ধি কি প্রকার?—না নূতন নূতন জ্ঞান অর্জ্জন। একদিকে যেমন আমরা জ্ঞান অর্জ্জন করি, অন্য দিকে আবার কতক পরিমাণে আমরা জ্ঞান বিসর্জ্জন করি—অর্থাৎ বিস্মরণ করি। এই অর্জ্জন ও বিসর্জ্জন প্রক্রিয়া আমাদের জীবনে অনবরত চলিতেছে। কোনও সময়ে অর্জ্জনের আধিক্য, কোন সময়ে বিসর্জ্জনের

আধিক্য। বাল্যকালে যৌবনকালে স্মরণ-শক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল থাকে, তখন বিসর্জ্জনের অপেক্ষা অর্জ্জনেরই প্রাধান্য। এই সময়ে ক্ষতির অপেক্ষা সঞ্চয়ের পরিমাণ অধিক হইয়া মনের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অর্থাৎ উন্নতি হইতে থাকে। * বার্দ্ধক্যে আমাদের জ্ঞানার্জ্জন-শক্তির হ্রাস হয় এবং বিস্মৃতির প্রাবল্য হয়—সুতরাং মনের আর বৃদ্ধি হয় না—বরং তাহার উত্তরোত্তর অবনতিই হয়। শারীরিক প্রক্রিয়ার সহিত এই বিষয়ে মনের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে।

দ্বিতীয়তঃ—গঠন-পরির্ত্তন। মনের গঠন-পরিবর্ত্তন কি রূপ?—অর্থাৎ মনের অংশ-বিন্যাসে পরিবর্ত্তন। মনের যে সকল সংস্কার প্রথমে শিথিলভাবে সংযুক্ত থাকে, বিশ্লিষ্টভাবে থাকে তাহা ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ হইয়া সমগ্রতা লাভ করে—ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সংস্কার, যাহার মধ্যে কোনও যোগ হয়তো পূর্ব্বে মনেও করা যাইত না, ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে একতা উপলব্ধি হয়; অবশেষে এরূপ জমাট বাঁধিয়া যায়, যে সেই সকল পরিণত সংস্কার গুলিকে আমরা তাহাদের আদিম উপাদানে আর বিভক্ত করিতে পারি না। জ্ঞানের যে সকল অংশ পূর্ব্বে বিচ্ছিন্ন ছিল বিজ্ঞান তাহার মধ্যে সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়া তাহাদিগকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া তুলে। যে সকল কল্পনা পূর্ব্বে বিশ্লিষ্টভাবে ছিল, কবি ও শিল্পী তাহাদিগকে একত্র আনিয়া তাহাদিগকে নূতন করিয়া সাজাইয়া থাকেন।

তৃতীয়তঃ ক্রিয়াপরির্ত্তন। মনের ক্রিয়া-পরিবর্ত্তন কি রূপ? সকলেই জানেন, মানসিক বৃত্তি সকল শৈশব কাল হইতে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়। সাধনা ও অভ্যাস দ্বারা আমরা মনের শক্তি সকল ক্রমশঃ অর্জ্জন করি।

অতএব দেখা যাইতেছে শরীরের ন্যায় আমাদের মনেতেও তিন প্রকার পরিবর্ত্তন হয়। আয়তন পরিবর্ত্তন, গঠন-পরিবর্ত্তন ও ক্রিয়া-পরিবর্ত্তন।

এক্ষণে দেখা যাউক, মনের কোন্ পরিবর্ত্তনকে উন্নতি বলা যায়।—পরিবর্ত্তন ভালর দিকে হইতেছে, কি মন্দর দিকে হইতেছে ইহার পরিচয় কি রূপে পাইতে পারি? ভালোর

?

আমরা জীবদিগকে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকি। পক্ষীজাতিকে আমরা মৎস্য জাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে করি এবং কুকুর জাতিকে আমরা সর্পজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে করি। এই উৎকর্ষ অপকর্ষের নিয়ম কি?

ছয় প্রকার লক্ষণ দেখিয়া আমরা উৎকর্ষের পরিচয় পাই। তাহা এই :—

(১) জীব-শরীরের অংশ-সকল অপেক্ষাকৃত ভিন্ন।

(২) জীব শরীরের অংশ সকল অপেক্ষাকৃত যুক্ত।

(৩) জীব-শরীর স্বীয় আবেষ্টন হইতে অপেক্ষাকৃত ভিন্ন।

(৪) জীব-শরীর স্বীয় অবেষ্টনের সহিত অধিকতর সংযু

{(৫) জীব-শরীর স্বজাতীয় ব্যক্তি বিশেষ হইতে অধিকতর ভিন্ন।
{(৬) জীব-শরীর স্বজাতীয় ব্যক্তি বিশেষের সহিত অধিকতর যুক্ত।

সংক্ষিপ্ত রূপে ব্যক্ত করিতে হইলে এইরূপ বলা যায়,

{(১) স্বগত ভেদ।
{(২) স্বগত যোগ।

{(৩) বিজাতি-ভেদ।
{(৪) বিজাতি-যোগ।

{(৫) স্বজাতি-ভেদ।
{(৬) স্বজাতি-যোগ।

এই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের নিয়মই উন্নতির নিয়ম। অংশ সমূহের মধ্যে সংশ্লেষণ কি?—না তাহাদের মধ্যে অবাধ যোগাযোগ—একটি অংশে কোন কিছু উপস্থিত হইলে অপরাংশেও কতকটা তাহার ফল পৌঁছায়।

আবেষ্টনের সহিত বিশ্লেষণ বা ভেদ তিন প্রকারের হইয়া থাকে। ভার-গত, উপকরণ-গত এবং শীতাতপ-গত। সমুদ্র-নিবাসী বহুপদ কীট (Polype) সমুদ্রের জল হইতে সমধিক বিভিন্ন নহে; মৎস্যের উষ্ণতা সমুদ্র জলের উষ্ণতা হইতে কিয়ৎপরিমাণ সমধিক এবং উহার উপকরণও সমুদ্র জলের উপকরণ হইতে বিভিন্ন; আবার স্তন্যপায়ী জীব সকলের উষ্ণতা আবেষ্টনের উষ্ণতা অপেক্ষা ৭০ কিম্বা ৮০ মাত্রা সমধিক; এবং তাহাদের উপকরণও আবেষ্টনের উপকরণ অপেক্ষা আরও অধিক বিভিন্ন। আবেষ্টনের সহিত যোগ কিম্বা সংশ্লেষণের অর্থ এই যে উহার সহিত উপযোগিতা; আবেষ্টনের মধ্যে যে কার্য্য হয় তাহারই উপযোগী কার্য্য জীব-শরীরেও উপস্থিত হয়। অন্য জীবের সহিত বিশ্লিষ্টতা বা ভিন্নতা কি?—না নিজত্ব। অন্য জীবের সহিত সংশ্লিষ্টতা কি?—না সামাজিকতা।

মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে উচ্চ নীচতার নিয়মও কতকটা এইরূপ—প্রায় একই প্রণালীতে হইয়া থাকে। তাহার প্রণালী এই:—

(১) অংশ সমূহের ভেদ।
(২) অংশ সমূহের যোগ।
(৩) আবেষ্টনের সহিত ভেদ।
(৪) আবেষ্টনের সহিত অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ যোগ।
(৫) অপরের সহিত ভেদ।
(৬) সামাজিকতা।

একেবারে অচেতন অবস্থা কি?—না যে অবস্থায় সবই সমান—কোনও প্রকার ভেদাভেদ নাই।

সজ্ঞান অবস্থার প্রথম লক্ষণ হচ্চে—বৈলক্ষণ্য বা বিভেদের জ্ঞান। একটা আলো দেখিলেই শিশু তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তৎক্ষণাৎ এই বর্ণহীন নির্ব্বিশেষ জগৎ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে—আলোকিত অংশ ও তিমিরাবৃত অংশ। এই প্রথম ভেদ জ্ঞান। তৎপরে নীল লাল প্রভৃতি বর্ণের পার্থক্য প্রতিভাত হয়। ইহাই প্রথম প্রক্রিয়া—চৈতন্যের অংশগত ভেদ-সাধন। ক্রমশঃ অন্যান্য পার্থক্যের রেখা প্রতিভাত হইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট আকাশ বা স্থান বেষ্টন করে; তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়; ক্রমে বিশেষ বিশেষ পার্থক্য মন একত্র ধারণা করিয়া এক একটি সমগ্র বস্তু বলিয়া অনুভব করে—ইহাই দ্বিতীয় প্রক্রিয়া। অর্থাৎ মনের যোগ-সাধন ক্রিয়া। আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে এই দুই প্রক্রিয়া ক্রমাগত কাজ করিতেছে—উভয়ই উভয়ের সহযোগী। যাহা কিছু আমরা উপলব্ধি করি তাহা আর কিছুই নহে—তাহা দুই ভিন্ন বস্তুর মধ্যে বিভেদ বা পার্থক্য এবং এই পার্থক্য সকলকে ক্রমাগত একত্র করিয়া আমাদের চৈতন্য সমগ্র বস্তুর ভাব গ্রহণ করে। এই বস্তু-কল্পনাটি কি?—এমন একটা পদার্থ যাহা আমাদিগের বাহিরে আছে—যাহা সত্য—যাহা আমাদের হইতে ভিন্ন। ইহাই তৃতীয় প্রক্রিয়া অর্থাৎ আবেষ্টনের সহিত—বাহিরের সহিত ভেদ-সাধন। পণ্ডিতবর Cuvier এই সত্যটি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি বলেন, মানব জাতির আদি-পুরুষ বাহ্য জগৎ যখন প্রথম দেখিলেন তখন তাহা আপনার অংশ বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন পরে ক্রমশ জানিতে পারিলেন যে উহা তাঁহার অংশ নহে—উহা বাহিরের বস্তু। অতএব আমরা বস্তুকে যে বাস্তবিক বলিয়া মনে করি, আমাদের বাহিরে আছে বলিয়া মনে করি—উহা মনেরই সচেষ্ট শক্তির প্রভাবে; মনই পার্থক্য-রেখা-বিশেষকে একত্র আনিয়া সমগ্র বস্তু করিয়া গড়িয়া তুলে।

মানসিক বিকাশ কিরূপে হয় তাহার কতকটা আভাস এতক্ষণে আমরা পাইলাম। মনের নিজ অংশ সমূহের মধ্যে এবং মনের সহিত বাহ্য জগতের যে এক সংযোগ বিয়োগ প্রক্রিয়া চলিতেছে তাহা এই প্রক্রিয়া। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই—মনের কিরূপ অবস্থায় এই প্রক্রিয়া সমধিক কার্য্য করে?

জীব-শরীরে দুই প্রকার পরিবর্ত্তন হয়। কতকগুলি পরিবর্ত্তন অব্যবহিত রূপে বাহিরের বস্তুর দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। জড় বস্তুতে আমরা যে রূপ পরিবর্ত্তন দেখি ইহাও কতকটা সেই ধরণের পরিবর্ত্তন। বায়ু-বেগে মনে কর কোন বৃক্ষ বাঁকিয়া গেল এবং এই বক্রতা বরাবর থাকিয়া গেল; আর আমি একটা তারকে বাঁকাইয়া দিলাম সে আর ঠিক্ সোজা হইল না—এই উভয়ের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন হইল তাহার মধ্যে বড় একটা প্রভেদ দেখা যায় না। আর এক প্রকার পরিবর্ত্তন আছে তাহা নিজের সঞ্চিত শক্তি

হইতে স্বতঃ উৎপন্ন—জীব-শরীরের বৃদ্ধি সহকারে স্বভাবত জীব-শরীরে যে শক্তি সঞ্চিত হয় সেই শক্তি হইতেই স্বতঃ-প্রসূত। যে সকল গতি বিচ্ছিন্ন ছাড়া-ছাড়া বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং যাহাতে করিয়া জীবন্ত ও মৃতের মধ্যে তফাৎ বুঝা যায়—এই গতি-সমূহ দ্বিতীয়োক্ত পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত-স্থল। এক্ষণে আমার মত এই, জীব শরীরে স্থায়ী সুবিধাজনক পরিবর্ত্তন জীব-শরীরের এই স্বতঃপ্রবৃত্ত ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয়—বহির্বস্তুর সাক্ষাৎ ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয় না। মনে কর এক জাতীয় জীব আছে যাহার স্বতঃপ্রবৃত্ত ক্রিয়া হইতে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই—এক সময় এই জাতির মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের পরিণম্যতা (Plasticity) অবশ্য থাকিবে—অর্থাৎ বাহিরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে তদুপযোগী করিবার কতকটা শক্তি তাহাতে থাকিবে। বাহির হইতে অর্থাৎ আবেষ্টন হইতে তাহাতে যে স্থায়ী পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাতে তাহার শরীরের কোন না কোন অংশ একেবারে অচল বদ্ধ হইয়া পড়িবে—যাহা পূর্ব্বে সুনম্য ছিল তাহা এক্ষণে দুর্নম্য হইয়া পড়িবে; পূর্ব্বে সেই অংশ সুনম্য না থাকিলে তাহাতে পরিবর্ত্তনের ফল কখনই হইত না—আর পরিবর্ত্তনের যে পরিমাণে স্থায়িত্ব হইবে সেই পরিমাণে সেই অংশের নম্যতা চলিয়া যাইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। এই প্রক্রিয়া যতই চলিতে থাকিবে ততই এই জাতীয় জীবের ইতিহাস ক্রমশই বাঁধাবাধি হইয়া পড়িবে—আর পূর্ব্বে তাহার যে টুকু পরিবর্ত্তনশীলতা ছিল তাহাও তিরোহিত হইবে, অবশেষে সেই জাতি একেবারে অচল-বদ্ধ ও পরিবর্ত্তনে অশক্ত হইয়া পড়িবে; কাজে কাজেই কালসহকারে এই জাতি বিলুপ্ত হইবে। কেন না, আবেষ্টনে—অর্থাৎ বাহিরের বস্তুতে এক সময়ে না এক সময়ে পরিবর্ত্তন হইবেই কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনের উপযোগী পরিবর্ত্তন যদি কোন জাতীয় ব্যক্তিগণের দেহাভ্যন্তরে না হয় তাহা হইলে সেই জাতি নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। পক্ষান্তরে জীবের স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টা হইতে জীবশরীরে যাহা কিছু যোগ হয় তাহাতে বাহিরের শক্তি কার্য্য করিতে পায় না—সুতরাং তাহার পরিণম্যতা অবিকৃত থাকে—যে রূপ ইচ্ছা তাহাকে পরিবর্ত্তন করা যায়—সুতরাং ইহাতে আভ্যন্তরিক বলের বৃদ্ধি হয়। আসল কথা, সচেষ্টতা হচ্চে বিকাশের প্রথম নিয়ম। আচার্য্য হক্‌স্‌লি এক জাতীয় টিক্‌টিকির বর্ণনা করেন, তাহার দৃষ্টান্ত এখানে খাটিতে পারে। ভূতত্ত্বের আদিম স্তর-যুগে এক জাতীয় ২০ হস্ত পরিমাণ উচ্চ টিক্‌টিকি ছিল, তাহারা পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়া চলিত। তাহাদের লম্বা লেজের দ্বারা স্বীয় গতির ঝোঁক্ রক্ষা করিত এবং পক্ষীর ন্যায় তাহাদের পায়ের তিনটি অঙ্গুলী ছিল। এই জাতি তিন বিভিন্ন দিকে প্রশাখিত হইল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি যাহারা বাহিরের উপস্থিত প্ররোচনার বশীভূত হইয়া চার পায়ে চলায় এবং মৎস্য ভক্ষণে সুবিধা বোধ করিল—তাহারা কুম্ভীরে পরিণত হইল। আর কতকগুলি যাহারা সম্মুখের পা খুব খাটাইতে লাগিল তাহাদের তিনটি করিয়া লম্বা অঙ্গুলী গজাইয়া

উঠিল। এবং ইহারাই পক্ষীজাতিতে পরিণত হইল। অবশিষ্ট অনাগুলি যাহারা হাত বেশি ব্যবহার করিবে কি পা বেশি ব্যবহার করিবে ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিল না তাহারা কাঙ্গারু জাতিতে পরিণত হইল।

এই নিয়মটি যদি মানিয়া লওয়া যায় যে বহির্বস্তুর ক্রিয়া অপেক্ষা স্বতঃচেষ্টা প্রভাবেই জীব-শরীরের বিকাশ অধিকাংশে হইয়া থাকে, তবে এই নিয়মটি এক্ষণে মনের সম্বন্ধেও খাটানো যাইতে পারে কি না দেখা যাউক। কি নিয়ম পালন করিলে মন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে?

তাহার দুই নিয়ম আছে; একটি ভাবাত্মক আর একটি অভাবাত্মক। ভাবাত্মক নিয়মটি হচ্চে এই যে, মন বাহির হইতে সার আদান করা অপেক্ষা বাহিরের উপর নিজ প্রভাব প্রদান করিতে চেষ্টা করিবে—অর্জ্জন অপেক্ষা সৃজনের দিকে তাহার গতি হওয়া আবশ্যক। যদি কোন মন বৈজ্ঞানিক হয় তবে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মত সকল শুদ্ধ চিন্তা করিলে—তথ্যগুলি কেবল মুখস্থ করিলে চলিবে না, তাহাকে কাজ করিতে হইবে—সৃজন করিতে হইবে—নূতন শক্তি ঘটন করিতে হইবে—নূতন তথ্য, নূতন নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইবে। নূতন নিয়ম সকল আপাতত কাজে না লাগিতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া নিরস্ত হওয়া উচিত নহে। কেহ কেহ বলেন অঙ্ক-শাস্ত্রের অতি সূক্ষ্ম কূট গবেষণা সকল নিষ্ফল, তাহা কোন প্রাত্যক্ষিক ব্যবহারে আইসে না। কিন্তু ইহা কে অস্বীকার করিবে যে কেবল মাত্র সত্যানুসন্ধানের জন্যই অনেক প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক বিষয়ের গবেষণা হইয়াছে, তাহাদের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়া গোড়ায় তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধান হয় নাই। অধুনাতন কালে অঙ্ক-শাস্ত্রের যে এক নূতন শাখা বাহির হইয়াছে তৎসম্বন্ধে রাজাশ্রিত জ্যোতির্ব্বেত্তা মহাশয় (Astronomer Royal) কেম্ব্রিজের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমক্ষে বলিয়াছিলেন যে, কালে উহা বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইবে যেহেতু উহা কোন প্রাত্যক্ষিক ব্যবহারে আইসে না। কিন্তু এক্ষণে ইহা প্রকাশ পাইতেছে যে অঙ্ক শাস্ত্রের এই শাখাটি সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান নাই বলিয়াই আমরা আণবিক ক্রিয়ার গবেগষণার আর অধিক অগ্রসর হইতে পারিতেছি না।

মন যদি কোনও সৌখীন শিল্পের অনুরাগী হয়, তবে প্রাচীন কালের শিল্প বিশারদদিগের অতুল কীর্ত্তি কলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া একেবারে স্তম্ভিত ও হত-চেষ্ট না হইয়া তদ্বিষয়ে উন্নতি করিবার জন্য তাহার চেষ্টা নিয়োগ করা উচিত। যুগযুগান্তর হইতে কোন আচার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে বলিয়া যে আমি তাহার ফলাফল কিছুই অনুসন্ধান করিব না; এরূপ মনের অবস্থা ভাল নহে; হয়তো আমার চেষ্টায় কালের গতি ফিরিয়া যাইতে পারে। মনের যদি বৃদ্ধি চাও তবে সৃজনের চেষ্টা কর—যতই কেন পাণ্ডিত্য অর্জ্জন কর না তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইবে না। সৃজন করিতে পারা ও না পারা মনের বিশেষ শক্তির উপর যে একান্তই নির্ভর করে তাহা নহে—সৃজন

শক্তিও অনেকটা অভ্যাস ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। বিষয় সকলের অবস্থা হইতে কার্য্যফল উৎপন্ন হয় না—প্রবণতা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব মানসিক বিকাশের প্রথম নিয়মটি এই যে মনের গতিকে অর্জ্জন অপেক্ষা সৃজনের দিকে অধিকতর উন্মুখ করিতে হইবে। এই প্রকার মানসিক আহার গ্রহণ করিবে যাহাতে মানসিক চর্ব্বি উৎপন্ন না হইয়া মানসিক পেশী উৎপন্ন হয়।

মানসিক বিকাশের অভাবাত্মক নিয়ম হচ্চে সুনম্যতা। আবেষ্টন অর্থাৎ বাহিরের প্রভাবে যাহাতে মনের মধ্যে একেবারে দানা-বাঁধিয়া না যায় তৎপ্রতি সতর্ক থাকা আবশ্যক। যদি মনকে বাড়াইতে চাও তবে যে সকল ভাব হইতে কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে তাহাকেই স্থায়িত্ব প্রদান করিবে, তদ্ব্যতীত অন্য কোন ভাবকে একেবারে স্থায়ী হইতে দিবে না। ভাব গ্রহণের জন্য সততই মনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিবে; সকল ভাবকেই মনে প্রবেশ করিতে দেও, তাহাদের দ্বারা তোমার মন কিয়ৎপরিমাণে রঞ্জিত হউক তাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু কাহারও প্রভাবে চিরকালের মত এক দিকে নীয়মান হইও না। দানা বাঁধিয়া গেলে—কোনও বিশেষ মত কিম্বা চিন্তাপ্রণালী একেবারে বদ্ধ হইয়া পড়িলে—যাহাতে জীবনের জীবনত্ব নির্ভর করে সেই জীবনের প্রধান লক্ষণটি হইতে আমরা বঞ্চিত হই। সে লক্ষণটি কি?—না বাহিরের অবস্থার সহিত আপনাকে উপযোগী করিয়া তুলিবার শক্তি।

ব্যক্তি বিশেষ অপেক্ষা জাতি-বিশেষ সম্বন্ধে এই নিয়ম আরও খাটে। প্রাচ্য মহাদেশে এমন অনেক জাতি আছে যাহারা এমনি প্রথার দাস যে পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা তাহাদের একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে—তাহাদের আছে মাত্র ধ্বংস হইবার ক্ষমতা। যদি এইরূপ সিদ্ধান্ত সত্য হয় যে, যে পরিমাণে কোন জাতি পরিণমনীয় ও পরিবর্ত্তন-ক্ষম সেই পরিমাণে সেই জাতি যৌবনান্বিত ও বলিষ্ঠ এবং যে পরিমাণে কোন জাতি অচল প্রথা-বদ্ধ ও পরিবর্ত্তনে অক্ষম, সেই পরিমাণে সেই জাতি অকর্ম্মণ্য জরা-জীর্ণ ও ধ্বংস-প্রবণ তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, কোন জাতির মধ্যে প্রথার আধিপত্য খর্ব্ব করা কত আবশ্যক।

চিরন্তন প্রথা ও চিরন্তন বদ্ধমূল কোন বিশেষ চিন্তাপ্রণালীর এমনি প্রভাব যে অনেক সময় তাহার দারুণ উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়—উন্নীত হওয়া দূরে থাকুক প্রথা-প্রধান জাতি কাল-সহকারে পৃথিবী হইতে একেবারে অপনীত হইবারই সম্ভাবনা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নগ্নতার সৌন্দর্য্য

দূর হইতে সৌন্দর্য্যের নগ্নতা দেখিয়া তাহাকে অনেক সময় সম্পূর্ণ আয়ত্ত মনে হয়, কিন্তু সান্নিকট্যে তাহার মধ্যে সহস্র এমন রহস্য বিকশিত হইয়া উঠে যে, নগ্নতার লাবণ্যে হৃদয় হারাইয়া যায়। নগ্নতার চতুর্দ্দিকে একটা দীপ্ত লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, সেই লাবণ্য-দীপ্তির মধ্যে সৌন্দর্য্যের আত্মা সন্নিবিষ্ট। নগ্ন প্রকৃতির হৃদয়ে ডুবিয়া দীর্ঘ জীবন-পথের কাতর কোলাহল আমরা যে বিস্মৃত হই, সে কেবলই এই দীপ্ত আত্মার সৌন্দর্য্যে। দূরদেশ হইতে নগ্নতার মধ্যে বিচরণ করিবার ক্ষেত্র আছে বলিয়া মনে হয় না, নয়নাতীত অতীন্দ্রিয় কিছু ঠাহরাইয়া উঠা যায় না। তাহার সৌন্দর্য্যে বিচরণ করিবার যত অবসর পাইতে থাকি, সে অনির্ব্বচনীয় রহস্য-মাধুরী-মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাই, অনন্তের মুক্ত সৌন্দর্য্য সেবনে আকুল হইয়া উঠি। জীবনের মর্ম্মে মর্ম্মে সেই শুভ্র বিমল জ্যোৎস্না-নগ্নতা তড়িৎ-কম্পনের মত স্পর্শ করিয়া যায়, চির-নবীন সৌন্দর্য্য-প্রবাহে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি লক্ষিত হয়। নগ্নতার সৌন্দর্য্যে প্রাণ সম্যক্ প্রস্ফুটিত।

নগ্নতা আর কাহাকে বলে? অলঙ্কার-শূন্যতা বৈত নয়। সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যের আবরণে অবগুণ্ঠিত সর্ব্বত্রই। যেখানে কৃত্রিমতার আড়ম্বরে সৌন্দর্য্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সেখানেই নগ্নতা প্রচ্ছন্ন। চাকচিক্যে সৌন্দর্য্য সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, ব্যক্ত হইতে পারে না। শুভ্র চন্দ্রালোকে যন্ত্রবিশেষের সাহায্যে সিন্দুরের আভা ফেলিলে কি সৌন্দর্য্য ব্যক্ত হইবার সুবিধা পায়? এই জন্য প্রকৃতিতে নগ্নতা সৌন্দর্য্যময়ী। নগ্নতায় আত্মা পরিব্যাপ্ত। আচ্ছাদনে প্রাণের রহস্য উপভোগ করা যায় না, হৃদয় সৌন্দর্য্যে উথলিয়া উঠে না, কেবল একটা আনন্দ-বিহীন জড়দেহ জাগিয়া থাকে মাত্র। ম্লান অধরে অলক্তরাগ আপনাকেই ব্যক্ত করে, অধরের স্বাভাবিক সরল ভাষা মুছিয়া যায়; সুন্দরীর শুভ্র কপোলদেশে চূর্ণ-দ্রব্য তাহার সহজ লাবণ্য ঢাকিয়া ফেলে, সে নগ্ন-শ্রী অবসিত হয়। নগ্নতায় গভীরতা আছে, আনন্দ আছে, সেখানে শ্রী কলায় কলায়। অলঙ্কার-আবরণ চক্ষু আকর্ষণ করে; নগ্নতা হৃদয় টানিয়া আনে।

কালিদাসের শকুন্তলা সুন্দরী—কালিদাস তাহার মধ্যে কেমন একটা নগ্নভাব ফুটাইয়া দিয়াছেন। শকুন্তলা অলঙ্কারবিহীনা, নগ্ন প্রকৃতির সহিত সে যেন মিশিয়া আছে, প্রকৃতির শ্যামলতার সহিত তাহার যৌবন-লাবণ্য চিরসম্বদ্ধ। বল্কলবাসে যে শকুন্তলায় নগ্নতার সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়াছে তাহা নহে—ভাবেই শকুন্তলার মধ্যে নগ্নতা। শকুন্তলার মধ্যে এই নগ্ন সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়াই কালিদাস বলিয়াছেন, "দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ।" আমাদের বঙ্কিম বাবুর কপালকুণ্ডলাও এই নগ্ন

সৌন্দর্য্যে সুন্দরী। তাহার কোন প্রকার অবগুণ্ঠনের আবশ্যক হয় নাই, নগ্নতাতেই সে রহস্যময়ী। অরণ্যপালিতা কপালকুণ্ডলার পার্শ্বে রাজা সীতারাম রায়ের অবগুণ্ঠনবতী ধর্ম্মপত্নী শ্রীকে একবার দাঁড় করাইয়া দেখ, শ্রীমতী কে? শ্রী সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতে পারে, গাছে চড়িয়া সহজে স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে পারে, স্বামীকেও যে ভাল বাসে না এমন নহে, কিন্তু এত চাকচিক্যেও শ্রী স্ত্রী কি পুরুষ সহজে ঠাহরাইয়া উঠা যায় না, হাঁ করিয়া লোকের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়, কে কি বলে।

নগ্নতার মধ্যে স্বভাবের স্ফূর্ত্তি হয়, এই জন্যই তাহার সৌন্দর্য্য ফুলে ফুলে। তাহার মধ্য হইতে নিংড়াইয়া রস বাহির করিবার চেষ্টা বিফল। নগ্ন জ্যোৎস্নাকে ছাঁকিয়া পরদার আড়ালে উপভোগ করা যায় না, পূর্ণ জ্যোৎস্নায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। নগ্নসৌন্দর্য্য স্বপ্রকাশ। উষার সৌন্দর্য্য কি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হয়? শকুন্তলা, সূর্য্যমুখী, কুন্দ, কপালকুণ্ডলা, এ সকল চরিত্রের ব্যাখ্যা অসম্ভব। আর দেখ প্রফুল্লমুখী—ব্যাখ্যা না করিলে তাহার সৌন্দর্য্য কোথায়? প্রাচীন নিষ্কাম ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া চৌধুরাণী স্বামীকে স্ত্রীর পদসেবায় নিযুক্ত করিলেন, দরবার, রাজত্ব সকলই ভাগ্যে জুটাইয়াছিল, ভাবও নিষ্কাম, তথাপি সে চরিত্র তেমন ফুটিল না—যেন জাঁতায় পেষা। এই নিষ্কাম চরিত্রের পার্শ্বে অভাগিনী শৈবলিনীকে দেখ, নগ্ন সৌন্দর্য্যে তাহার মধ্যে স্বভাব কেমন বজায় আছে। নগ্নতায় সৌন্দর্য্য ফুটে অধিক। তাহার মর্ম্মে কি যেন "লাজহীনা পবিত্রতা" জাগিয়া আছে।

অলঙ্কারে সৌন্দর্য্য সঙ্কুচিত হইয়া থাকে কেন? কারণ আর কিছুই নহে—প্রাণ চাপা পড়ে বলিয়া। দেহ-জগতে সর্ব্বত্রই প্রাণ অন্তর্নিবিষ্ট এই জন্য তাহার প্রত্যেক উত্থানপতনে হৃদয়ের উত্থানপতন অনুভব করা যায়। অলঙ্কারে দেহের মধ্যস্থ আত্মা চাপা পড়িয়া থাকে, উত্থান পতন দেখা যায় না, এই কারণে তাহাতে সৌন্দর্য্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। শেলীর skylarkএ সৌন্দর্য্যের সম্যক্ স্ফূর্ত্তির কারণ, নগ্ন আত্মার অভিব্যক্তি। শেলী দেহাবরণের প্রত্যেক তরঙ্গভঙ্গে আত্মা প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। তিনি তাহার গতির মধ্যে কেবলই তাহার আত্মার আকুল গীতি শুনিয়াছেন; পক্ষী স্বর্গের দুয়ার হইতে যতই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে, শেলী তাহার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যান, সমস্ত জীবন সৌন্দর্য্য প্লাবিত হইয়া উঠে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের skylark এ নগ্ন আত্মার এমন বিকাশ হয় নাই, সেই জন্য তাঁহার পক্ষীর কণ্ঠধ্বনিতে হৃদয় সেরূপ আকুল করে না। শেলীর বিহঙ্গ-কণ্ঠ সৌন্দর্য্য-স্নাত, সে স্বরলহরীর মধ্যে জগতের ব্যবধান নাই, সে সৌন্দর্য্য অনাবৃত, সৌন্দর্য্যাচ্ছন্ন।

অবগুণ্ঠনে যে সৌন্দর্য্য নাই আমরা এ কথা বলিতে পারি না, কিন্তু সৌন্দর্য্যের সম্যক্ অভিব্যক্তি নগ্নতায়। যে ভাব ভালরূপে ব্যক্ত করিতে হইবে, তাহাকে অলঙ্কার-আবরণে আচ্ছাদিত করিলে তাহার বিকাশ হয় না। মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার আকাশে

সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের শোভা কি কখনও ব্যক্ত হয়? নগ্ন সৌন্দর্য্য হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে প্রতি-সৌন্দর্য্য জাগাইয়া তুলে। রূপ ব্যক্ত করিতে হইলে লেপমুড়ি চলে না, গুণ ব্যক্ত করিতে হইলে জগতে বাহির হইতে হইবে। অভিব্যক্তি নহিলে সৌন্দর্য্য ব্যর্থ।

একটা কথা উঠিতে পারে, অভিব্যক্তিতে রহস্য থাকে কিরূপে? নগ্নতা যদি রহস্যময়ী হয়, তবে তাহাতে অভিব্যক্তি হইবার সুবিধা কোথা? কিন্তু প্রকৃতিতে কি দেখা যায়? কোমল কুসুমকলিকা বৃক্ষের সৌন্দর্য্যোচ্ছ্বাসে পূর্ণহৃদয় হইয়া ফুটিয়া উঠে। তাহাতে কি রহস্য নাই? রহস্য অভিব্যক্তির হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন। ক্ষুদ্র কলিকার মধ্যে পূর্ণযৌবনের সৌন্দর্য্য সন্নিবিষ্ট ছিল, ইহাতেই তাহার রহস্য। কলিকা যদি না ফুটিত, কুসুমরূপে ব্যক্ত না হইত, তাহা হইলেই সে সৌন্দর্য্য ব্যর্থ। বিকাশের মধ্যে অতীতের সহিত ভবিষ্যতের মায়া-বন্ধন। এই বন্ধন-সূত্রে ভাবের প্রলয় আবদ্ধ।

অভিব্যক্তির মধ্যে রহস্যের অবস্থিতির স্বতন্ত্র প্রমাণ আবশ্যক করে না—এই বিচিত্র বিশাল সৃষ্টিই তাহার যথেষ্ট পরিচয়। সৃষ্টির রহস্যই ত তাহার বিকাশে। দেশ-শূন্য কাল-শূন্য মহা অন্ধকারের অন্তঃপুর হইতে এত বড় সামঞ্জস্যময় রহস্য-সৌন্দর্য্যের দীপ্ত উদ্ভাসন! অভিব্যক্তিতে রহস্য ব্যক্ত হইয়া শত রহস্য খুলিয়া দেয়, যেথানে রহস্য ছিল না সেথানেও রহস্য বাহির হয়; অকূল রহস্য-পাথারে দাঁড়াইয়া সৌন্দর্য্যের নগ্ন বৈচিত্র্যে মানব-হৃদয় হারাইয়া যায়। নগ্নতা রহস্যের প্রতিবন্ধক ত নহে, তাহাতেই সৌন্দর্য্যের সম্যক্ অভিব্যক্তি। প্রকৃতিতে সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যাচ্ছন্ন, তাহার আর কোন আবরণ নাই।

সৌন্দর্য্যের কবিদিগের রচনা আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহারা নগ্নতার মধ্যেই সৌন্দর্য্যের বিকাশ অনুভব করিয়াছেন। বাহ্য প্রকৃতিই কি, আর মন প্রকৃতিই কি, সর্ব্বত্রই নগ্নতার সৌন্দর্য্য। হৃদয়ের উপর একটা কুটিল সন্দেহাবরণ টানিয়া দাও, তাহার সুকুমার সরলভাব চাপা পড়িয়া যাইবে, হৃদয় বিকশিত হইতে পারিবে না। সৌন্দর্য্য সহজভাবেই সুব্যক্ত, তাহার উপর রঙ্ ফলাইয়া উজ্জ্বল করা যায় না। নগ্ন সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে তাহাতে ডুবিতে হইবে। কবিরা সৌন্দর্য্যের হৃদয়ে প্রবেশ করেন বলিয়াই আনন্দ পাইয়া থাকেন। আপনাকে দিয়া তাঁহারা সৌন্দর্য্যকে আচ্ছন্ন করেন না, সৌন্দর্য্যের অন্তঃপুরে সৌন্দর্য্য-নিমগ্ন হইয়াই তাঁহাদের সুগভীর অতৃপ্ত তৃপ্তি।

নগ্নতায় প্রত্যেক সৌন্দর্য্য অপর সৌন্দর্য্য ব্যক্ত। রঙ-বিশেষের পর অন্য রঙ, ছায়ার পর যথাস্থানে আলোক, ছায়ালোকের তারতম্য, সমস্ত মিলিয়া একটা প্রভাব বিস্তার করে। অথচ, সকলভাব সম্পূর্ণ খেলিবার জমি পায়, সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হয় না। এই জন্যই নগ্নতায় এমন সৌম্য গাম্ভীর্য্য। সকল ভাবের সর্ব্বাঙ্গীন অভিব্যক্তির মধ্যে যথোচিত সামঞ্জস্য—কি গভীর রহস্য! নগ্নতায় সৌন্দর্য্যের কনক-মিলন। নগ্নতা পূর্ণ-সুন্দরী।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রকৃতির গান।

শ্রবণে বাজিলে সুর-সঙ্গীত তোমার,
ভুলে যাই সুখ,
ভুলে যাই দুখ,
ভুলে যাই শোক দগ্ধ নিখিল সংসার।

পাষাণ হৃদয় মোর—
তবু যেন গ'লে যায়;
আনন্দের প্রস্রবণ,
আঁখি মাঝে ছুটে ধায়।

জোনাকী উড়িয়া বসে তরু শিরোপরে,
কভু ফুটে কভু মুদে চারিদিকে ঘোরে,
তোমার সঙ্গীত সনে,
বাঁধা যেন প্রাণে প্রাণে
তালে তালে নিবে জ্বলে কত খেলা করে।

কোথা বাজে কোথা গায়,
কিছুই না বুঝা যায়,
প্রাণ যেন মুগ্ধ হ'য়ে শুনে তোর গীত;
সুধাই প্রকৃতি তোরে কিসের সঙ্গীত?

জাহ্নবীর জল চলে কুলুকুলু রবে,
স্রোত আসে স্রোত যায়,
কভু পড়ে গায় গায়,
কীর্ত্তনের ভাবাবেশে মত্ত যেন সবে;
আবার ক্ষণেক পরে
দেখি তাহে দূরে দূরে
নূতন করিয়া যেন পুন গান হবে।

বাতাস বহিলে জোরে,
পাতা গুলি তেজে নড়ে,
মেঘগুলি ছুটে যায় গগণের গায়,
কিসের সঙ্গীত হৃদি আবার সুধায়?

ঘাত প্রতিঘাত কেন হৃদয়েতে উঠে,
সরিৎ সাগর ব্যবধান;
স্নেহ প্রীতি ভালবাসা নীরবে নীরব আশা,
প্রাণে কেন বহিছে উজান।

কি এক মোহিনী শক্তি
জগৎ ঘেরিয়া আছে;
গ্রহ ছুটে গ্রহ পানে,
পৃথিবী ভানুর কাছে।

ক্ষুধিতের মুখে অন্ন,
পিপাসীর তরে জল,
বদ্ধ নিশ্বাসের কাছে,
বায়ু বহে অবিরল।

কেন এত ভালবাসা
জীব হতে জীবে ঢালা?
কেন বল অশ্রু জলে
জুড়ায় প্রাণের জ্বালা!

জননীর মুখ পানে,
কেন শিশু চেয়ে আছে;
কেন রে মায়ের প্রাণ
সদানন্দে এত নাচে?

সরল বালিকা হৃদি
প্রেমে কেন নাচে গায়;
কেনরে এমন করে
পর মুখে সদা চায়?

বিশ্বের নিয়ন্তা যিনি বুঝি সেগো শিশুছেলে
তাই সে বেঁধেছে লতা রসালের মূলে মূলে।
তাই সে করেছে ওগো জড় জীব একস্থানে,
তাই সে বেঁধেছে গান জগতের প্রাণেপ্রাণে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

বরাহনগর মহিলাশ্রম।

বোম্বাই সহরে প্রসিদ্ধ রমাবাই স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য শারদাশ্রম নামক যে আশ্রম খুলিয়াছেন তাহা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন। কিন্তু সারদাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বরাহনগরে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা ও শিল্পাদি শিক্ষার জন্য যে বোর্ডিং স্কুল হইয়াছে তাহা অদ্যাপি সাধারণে অবগত নহেন। এই বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু শশীপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বিনাআড়ম্বরে ইহা প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া প্রথমে সকলে ইহার বিষয় জানিতে পারেন নাই। ধীরে ধীরে আজ চারি বৎসর এই বোডিং বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতেছে।

বয়স্কা স্ত্রীলোকগণ যাহাতে শিক্ষালাভ করিয়া আমাদের দেশীয় বালিকা বিদ্যালয় সমূহের উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী হইতে পারেন এই বিদ্যালয়ের ইহা প্রথম উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের অন্তঃপুরিকাগণের ও বালিকাগণের শিক্ষাভার অনেক পরিমাণে খৃষ্টান মিশনারিগণের হস্তে রহিয়াছে। কখন কখন দেখা যায় যে এরূপ শিক্ষার সুফল না হইয়া কুফল উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত কলিকাতাস্থ অনেক ভদ্রলোক আপন আপন বাড়ীর পরিবারদিগকে এই খৃষ্টান মিশনারি স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা শিক্ষাদান করিতে বিরত হইয়াছেন। এই বোর্ডিং বিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকগণ শিক্ষয়িত্রী রূপে শিক্ষিতা হইলে উক্ত অভাব অনেক পরিমাণে দূর হইবে সন্দেহ নাই। ইতি মধ্যে ইহার একটী বয়স্কা ছাত্রী গয়া বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।

আজ ২৫ বৎসর হইল বরাহনগর গ্রামে শশী বাবুর যত্নে যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এই বোর্ডিংস্কুল ইহার শাখা মাত্র। এই বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সেলাই, রন্ধন ও গৃহ কর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। যাহাতে স্ত্রীলোকেরা সুশিক্ষিতা হইয়া সুশৃঙ্খলরূপে গৃহকর্ম্মাদি করিতে পারেন তাহা এই বিদ্যালয়ের অপর একটী উদ্দেশ্য। সুপ্রসিদ্ধ দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী এই বিদ্যালয়ে রন্ধনাদি শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

বোর্ডিং এ বর্ত্তমান ছাত্রীর সংখ্যা ২১ জন তন্মধ্যে ১০ জন বিধবা। দেশের মধ্যে বিধবাগণ যদি বালিকাগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবার উপযুক্তা হন তাহার তুল্য সুখের বিষয় আর নাই। এখানে বিধবাদিগকে শিক্ষয়িত্রী করিবার চেষ্টা হইতেছে। অসমর্থ বিধবাগণ এখানে বিনা ব্যয়ে অবস্থান করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন কর্ত্তৃপক্ষগণ এমন বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বোর্ডিংএর নিয়ম এই—ইহাতে তিন বৎসর কাল অবস্থান করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক ছাত্রীর শিক্ষার ও আহার প্রভৃতি

ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ১০ দশ টাকা নির্দ্ধারিত আছে। এই টাকার মধ্যে ছাত্রীগণ বস্ত্রও পাইয়া থাকেন। কেবল পীড়ার ব্যয় অভিভাবককে স্বতন্ত্র দিতে হয়।

মফস্বলে বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য অভিভাবকগণ অনেক সময় বড় কষ্ট পাইয়া থাকেন। অনেকে বালিকাদিগকে কলিকাতায় রাখিয়া শিক্ষা দিবার ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ হন না। অনেকে আবার কলিকাতাস্থ স্ত্রীবিদ্যালয় সমূহে যেরূপ বিদেশীয় ভাবে বালিকাগণ অবস্থিতি করে তাহা মনোনীত করেন না। বরাহনগর মহিলাশ্রমে দেশীয় ভাবে অল্প ব্যয়ে উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বালিকা ও মহিলাগণ শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টরগণ এই বিদ্যালয়ের বালিকাগণকে পরীক্ষা করিয়া এইরূপ মন্তব্য লিখিয়া গিয়াছেন যে বালকদিগের বিদ্যালয়ে সমশ্রেণীস্থ বালকগণের তুলনায় এখনকার বালিকাগণ লেখা পড়ায় অপেক্ষাকৃত অধিক পারদর্শী। এই বোর্ডিং বিদ্যালয় দ্বারা অভিভাবকগণের পূর্ব্বোক্ত অভাব দূর হইয়াছে সন্দেহ নাই।

বরাহনগর মহিলাশ্রমে যাহারা হিন্দু ও হিন্দু অনুযায়ী পূজা ভোজনাদি করেন এরূপ বিধবা ও অন্য ছাত্রীগণের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। যাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস মতে তাঁহারা চলিতে পারেন কর্ত্তৃপক্ষ তাহার সুবিধা করিয়াছেন এবং কোন কোন ছাত্রী এই ভাবে বোর্ডিংএ বিদ্যাভাস করিতেছেন। বোর্ডিং বলিতে কতকগুলি শুষ্ক নিয়ম ও কঠোরতা কিছু নাই। সুনিয়ম আছে, অথচ ছাত্রীগণ পারিবারিক শান্তিতে এখানে সুখে অবস্থিতি করিতে পারেন শশী বাবু ও তাঁহার পত্নী তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল। গৃহ ও পিতা মাতার প্রভৃতির স্নেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও ছাত্রীগণ এখানে মনের সুখে অবস্থিতি করেন। দেশের যে অবস্থা তাহাতে বিদ্যালয়টী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যাহাতে ইহা চিরস্থায়ী হইয়া এদেশের মহিলাবর্গের কল্যান সাধন করিতে পারে ইহা প্রার্থনীয় কিন্তু উপযুক্ত অর্থাভাবে অদ্যাপি সেরূপ কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত হইতেছে না। যদিও স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অনেক সহৃদয় মহাত্মা ও দয়াবতী মহিলা ইহার সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন তথাপি ইহাতে সাধারণের দৃষ্টি পতিত না হইলে ইহার স্থায়ী উন্নতির কম সম্ভাবনা। এক্ষণে সর্ব্বসাধারণে ইহার প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি করেন অনুষ্ঠাতৃবর্গের ইহা বিনীত নিবেদন। *

* আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বরাহগর মহিলাশ্রমের কল্যাণ প্রার্থনা করি। দেশে এরূপ যত আশ্রম হয় ততই ভাল।

ভাং সং।

রাজনৈতিক সংবাদ

খোলা ভাটীর শ্রাদ্ধ। আমাদের প্রজারঞ্জক ছোটলাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলী বাহাদুর আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে আগামী এপ্রিল মাস হইতে প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান বিভাগ হইতে খোলাভাটী উঠিয়া যাইবে। আজ কাল গবর্ণমেণ্টের অর্থের বড়ই টানাটানি তথাপি ছোটলাট বাহাদুর যে এই সৎকার্য্য করিলেন তাহাতে তাঁহার সৎ-সাহস ও মঙ্গলেচ্ছার জন্য তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই। আমরা ভরসা করি তিনি ক্রমে বঙ্গের সমস্ত জেলা হইতে খোলাভাটী তুলিয়া দিয়া, বঙ্গবাসীগণের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিবেন; রাজা অর্থের পরিবর্ত্তে প্রজাকে পশুত্ব-লাভে প্রশ্রয় দিতেছেন, ইহা অপেক্ষা বিভৎস দৃশ্য আর নাই, আমাদের দেশের শাসন কর্ত্তাগণ একথা বুঝিলে, আমাদের যে যথেষ্ট উপকার হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ষ্টেসনারী বিভাগের খরচ পত্র কমা-ইতে হাত দিয়াছেন, এখন হইতে আফিসে বেশী দামের খুব বড় ও পুরুভাল কাগজ ব্যবহার করা হইবে না, দরকারী কাগজপত্রও প্রয়োজন মতই ছাপান হইবে, খুব বেশী বেশী ছাপান হইবে না। চিঠি পত্রও সামান্য কাগজে লিখিত হইবে। বিদেশ হইতে আমদানী ছুরি, কাঁচি, কাগজ ইত্যাদি দ্রব্যের পরিবর্ত্তে, এদেশে প্রস্তুত ঐ সমস্ত জিনিষ ব্যবহার করাতে ২২ হাজার টাকা বাঁচিয়া গিয়াছে। বোম্বে গবর্ণমেণ্টও এই সৎদৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়াছেন। আমরা অন্যান্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তাদিগকে এই নীতি অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি; দেশীয় দ্রব্যাদির আদর বাড়িলে যে দেশের অনেক 'কারিগর'ই অবস্থাগত উন্নতি লাভ করিবে, ও দেশে ভাল ভাল দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইবে সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। এ সমস্ত বিষয়ে দেশের কারিকরদিগকে উৎসাহ দেওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কর্ম্মই। এতদ্ভিন্ন খরচ কমাইবার জন্য দু পাঁচ জন গরীব কেরাণীর অন্ন না মারিয়া এই প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করা অতি যুক্তি সঙ্গত।

ব্রহ্ম যুদ্ধের ব্যয়। এক ব্রহ্ম সমরে আমাদের এত দুরবস্থা! কি কুক্ষণে ব্রহ্ম যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল যে নানা কৌশলে টাকা তুলিয়া—লবনের মাশুল বৃদ্ধি করিয়া, ইনকম ট্যাক্স সৃষ্টি করিয়াও—প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে শূন্যভাণ্ডার হইতে হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছিলাম এই 'মঘের মাতৃ শ্রাদ্ধে' ২½ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইয়াছে, এখন শুনি-তেছি বিলাতে ঠিক খবর বাহির হইয়াছে যে ২½ কোটি পাউণ্ড খরচ হইয়াছে। একেই বলে 'পুকুর চুরি'।

ভারত ও আফগানিস্থান। ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে ভারতবর্ষ হইতে হিরাট পর্য্যন্ত সেনা যাতায়াতের জন্য রেলওয়ে বা সুবিধা জনক পথ করা উচিত।

লর্ড লিটনের সময় এক রুস ভীতিতে ভারত গবর্ণমেণ্ট অনেক বিশ্বস্ত বীর কর্ম্মচারী হারাইয়াছেন। দরিদ্র ভারতের অনেক কোটী টাকা জলের মত খরচ হইয়াছে, লিটন বাহাদুরের ভ্রান্ত নীতিই এই শোচনীয় ঘটনার একমাত্র কারণ, আবার যে কি হইবে তাহা বলা যায় না, কিন্তু আমাদের বড়ই ভয় হইয়াছে, কারণ ঘরপোড়া গরু চির কালই সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠে। আবদার রহমান ইংরেজের হস্তগত তাহা আমরা স্বীকার করি। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বন্ধুত্বে তিনি আপনাকে সম্মানিত বোধ করেন ইহাও যথার্থ কথা কিন্তু হিরাট পর্য্যন্ত সৈন্য যাতায়াতের জন্য পথ করিতে দিতে তিনি সম্মত হইবেন কি না এ বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। তাহা হইলেই ব্রীটিস্ সিংহ আপনার দুর্দ্দমণীয় প্রতাপের সম্মুখে প্রতিবন্ধক দেখিয়া যদি সিংহ-গতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে কে বলিতে পারে যে অনর্থক নরহত্যায় আফগানিস্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশ কলঙ্কিত হইবে না? কে বলিতে পারে ভারতবাসীর হৃদয় শোণিতের সমান—কষ্টোপার্জ্জিত অর্থে মহা অনর্থপাত না হইবে? আবদার রহমানের বন্ধুতার উপর কি বিশ্বাস করিয়া থাকা যাইতে পারে না?

আর একটি ভারতবন্ধু। দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বড়ই আহ্লাদ হয়—যে ব্রীটিস্ পার্লিয়ামেণ্টে ভারতের হইয়া দুটি কথা বলিবার জন্য আজ কাল দুই একটি লোক দেখা যাইতেছে, ইহা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। মহামতি ব্রাডলর উপকার আমরা কখনও ভুলিতে পারিব না। একজন লোক পরোপকারের জন্য যাহা করিতে পারেন ব্রাডল আমাদের জন্য তাহা করিতেছেন। আবার আমাদের হইয়া পার্লিয়ামেণ্টে আন্দোলন করিবার জন্য আর এক মহাত্মা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, ইহার নাম সেমুর কি। ইনিও যে ভারতের যথেষ্ট উপকার করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি এই পরোপকারী মহাত্মাদিগকে দীর্ঘজীবন দান করুন।

একটি রহস্য। বোম্বাই গেজেটে লণ্ডন হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ষ্টেট সেক্রেটারী মহাশয় আগামী বর্ষে ভারতীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা সমূহ সংস্কারের জন্য পার্লিয়ামেণ্টে একখানি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবেন, এই পাণ্ডুলিপিতে নিম্ন লিখিত বিষয় আছে (১) ব্যবস্থাপক সভার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। (২) সভ্যদিগের প্রতি রাজ্যশাসন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার ও আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিবার অধিকার দেওয়া উচিত। আবার এদিকে ষ্টেটসেক্রেটারী মহাশয়ের সহকারী সার জন ষষ্ট বলিতেছেন যে পার্লিয়ামেণ্টের লিবারাল ও কনজারভেটিভ সভ্যদিগের মধ্যে যেরূপ মত দ্বৈধ, তাহাতে আগামী বর্ষে ভারতবর্ষস্থ ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধে কোন আইনের কথা উল্লেখ করাও সম্ভব হইবে না। এখন কাহার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায়?

ইনকমট্যাক্স। আমাদের বিশ্বাস ছিল—ইনকমট্যাক্সটা দিন কতকের জন্য।

গবর্ণমেণ্টের বাজে খরচটা কমিলেই আমরা এ পাপের হাত হইতে উদ্ধার পাইব। কিন্তু এখন দেখিতেছি সেটা দৃঢ়মূল হইয়া বসিল। গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ইনকমট্যাক্স উঠাইবার আর প্রয়োজন নাই। গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন নাই বলিলেন ত আমাদের কথা কি ? তবে একটা কথা না বলিয়া থাকা যায় না, ইনকমট্যাক্সটা থাকে থাক কিন্তু যে গরীবদের 'ইনকম' স্বধু নামে, তাদের প্রতি এটা থাকা যুক্তি সঙ্গত নহে। ইহাতে গরীব লোকদের বড়ই কষ্ট, যাঁহারা মাসে ৫০০।৭০০ টাকা উপায় করেন, বা ব্যবসায় করিয়া অনেক টাকা লাভ করেন তাঁহারা কিছু কিছু দিলেন তাহাতে ক্ষতি নাই। যাঁহারা অল্প টাকা বেতন পান, সমস্ত পরিবারের খরচ সেই কয়টি টাকার উপর, তাঁহাদের সেই কষ্টোপার্জ্জিত সামান্য অর্থ হইতে কি কিছু না লইলেই নয় ? আর ইনকমট্যাক্সটা যখন থাকিয়া গেল, তখন লবনের উপর যে ট্যাক্সটা আছে সেটা কিছু কমাইলে ভাল হয় না কি ? দেশের গরীব লোকগুলি অর্থাভাবে একটু লবণ খাইতেও বঞ্চিত থাকে, ইহা কি কম দুঃখ। গবর্ণমেণ্ট কি এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন না ?

ভারতে ফরাসী সৈন্য। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট নিয়ম জারী করিয়াছেন যে ভারতের ফরাসী অধিকৃত স্থান সমূহের যে সমস্ত অধিকারী সাধারণতন্ত্রে প্রতিনিধি মনোনীত করিবার জন্য ভোট দিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেক পরিবার হইতে ন্যূনকল্পে একজন লোককেও সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করা হইবে, তাহারা তিন বৎসর যুদ্ধ শিক্ষা করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিবে ও তাহাদের দ্বারা ভারতবর্ষে নূতন সৈন্য দল গঠিত হইবে, প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে যুদ্ধও করিতে হইবে। ফরাসী জাতির নিকট উদার ইংরাজ জাতি কি এই গুণটির অনুকরণ করিতে পারেন না ?

ইণ্ডিয়া কৌন্সিল ও ভারতবাসী। ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে মান্দ্রাজ, বোম্বে ও বাঙ্গালা হইতে এক এক জন করিয়া তিন জন ভারতীয় সভ্য মনোনীত করিবার জন্য ষ্টেটসেক্রেটারী যাহাতে ক্ষমতা পান তদ্বিষয়ে 'হাউস অব লর্ড‌স্'এ প্রস্তাব উত্থাপন করিবার জন্য লর্ড ষ্টানলি সংকল্প করিয়াছিলেন, এবং দেশীয় দিগকে ইণ্ডিয়া কাউন্সীলে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার (ষ্টেটসেক্রেটারীর) আছে কি না—এবিষয়ও জিজ্ঞাসা করেন। লর্ড ক্রস তদুত্তরে বলিয়াছেন যে তাঁহার সভায় দেশীয় সভ্য নিয়োগে তাঁহার ক্ষমতা আছে বটে কিন্তু উপযুক্ত দেশীয় লোকের বড়ই অসদ্ভাব। যাহা হউক লর্ড ষ্টানলি লণ্ডনস্থ 'ইষ্টইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন-সভায় এই কথা উত্থাপিত করিয়াছিলেন। এবং ভারতবাসীর যে এই অধিকার আছে এ কথা তিনি শুনিয়া বড়ই আহ্লাদ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার সন্দেহ যে কোন উপযুক্ত ভারতবাসী স্বদেশ ও স্বকার্য্য ছাড়িয়া এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ভারতবাসীর যখন এ অধিকার আছে, তখন কোন দিন না কোন দিন ভারতের সুযোগ্য

সন্তান এই সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। লর্ড ষ্টানলির এই অনু-সন্ধানের জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দেই। ইষ্টইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন সভা বলিয়াছেন যে তিন প্রেসিডেন্সি হইতেই উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইবে।

কলিকাতা হাইকোর্টে নূতন জজ। আমরা প্রথমে শুনিয়াছিলাম বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন, কিন্তু শীঘ্রই শুনিলাম ইহা মিথ্যা। এখন ইহা সত্য হইয়া গিয়াছে। তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন; এই পদ সম্বন্ধে ভারত সেক্রেটারী ভারত গবর্ণমেন্টকে লিখিয়াছিলেন যে 'যদি কোন মুসলমান এই পদ প্রাপ্তির উপযুক্ত হন, তবে তিনিই এই পদে বরিত হইবেন। আমরা জানি না এ সংবাদ কত দূর সত্য, কিন্তু সত্য হইলেও ইহা অন্যায় লেখা হয় নাই, হাইকোর্টে দুই জন হিন্দু জজ মাননীয় বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ ও বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, হিন্দু না হইয়া রমেশ বাবুর স্থানে একজন মুসলমান জজ নিযুক্ত হওয়া বাস্তবিকই প্রার্থনীয়। যাহা হউক বারিষ্টার শ্রীযুক্ত আমিরআলী এইপদে নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং নববর্ষের প্রথম হইতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন; তিনি সুবিচারক হইয়া মাননীয় মিত্রের অভাব পূর্ণ করুন ইহাই আমাদের কামনা।

কোল জাতীয় বিদ্রোহিতা। ছোট নাগপুরের আরণ্য প্রদেশে কোলজাতির বসতি। জমিদারগণ নাকি ইহাদের জমির খাজানাবৃদ্ধি করিয়াছেন ও ইহাদিগকে ধরিয়া বেগার খাটাইতেছেন—তাই ইহারা বিদ্রোহিতা অবলম্বন করিয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। বিদ্রোহী কোলজাতির রক্তস্রোতে বোধ হয় শীঘ্রই বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইবে!

চীন সংগ্রাম। আমরা ইতি পূর্ব্বেই লুসাই সংগ্রামের 'উদ্যোগ পর্ব্ব' বর্ণনা করিয়াছি, এবার পাঠক বর্গ আর একটি সংগ্রামের উদ্যোগের কথা শুনিতে পাইবেন। এটি চীন সংগ্রাম, এ চীনজাতি প্রসিদ্ধ চীন দেশের অধিবাসী নহেন; চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মের মধ্যে দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহাদের বাস।

এই চীন জাতির কি অপরাধ তাহা প্রকাশ হয় নাই, বোধ হয় ব্রীটিস সিংহের অধি-কারের নিকট স্বাধীন ভাবে বাস করিবার দুরাশাই ইহাদের একমাত্র দোষ।

গত নভেম্বরের শেষে ১৫০ মান্দ্রাজী সৈন্য ব্রহ্ম দেশ হইতে চীনাভিমুখে গিয়াছে। তাহার পরও ২০০ ইংরেজ সৈন্য ১০০ মাদ্রাজী পদাতিক এবং দলবল লইয়া সেনাপতি সিমসন যাত্রা করিয়াছেন। পর্ব্বত ভেদকারী কামানও দুটি গিয়াছে, এখন আড্ডা পড়িবে কানে। কান ব্রহ্মের সীমান্ত প্রদেশ হইতে ১৬৭ মাইল, সৈন্যেরা ১৫ দিনে এই পথ পার হইবে। সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফের তার বসিতেছে, (গ্যাসের আলোর বন্দোবস্ত হইতেছে কি না সে সংবাদ আমরা পাই নাই)। কান হইতে হাকা আবার ৮৫ মাইল, গত ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রাম হইতে আবার হাকাভিমুখে সৈন্য প্রেরিত হই-

য়াছে—যাকাতেই সমস্ত সৈন্য মিলিত হইবে কিন্তু সংঘটন ক্ষেত্র কোনটি হইবে তাহা বলা যায় না।

হিউম সাহেবের পত্র। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে পাঁচবৎসর অন্তর জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের প্রস্তাব হিউম সাহেব করিয়াছেন এই রকম জনরব। একবাক্যে সকলেই এই প্রস্তাবের প্রতিকূলে মত দিয়াছিলেন। এখন শুনিতেছি হিউম সাহেব এরূপ প্রস্তাব করেন নাই। তবে হিউম সাহেব একটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে ১৮৯০ সালে তিনি এবং মহাসভার পরিচালকগণের মধ্যে অনেকেই সমিতির কার্য্যের জন্য ইংলণ্ড থাকিবেন সুতরাং সেই বৎসরের জন্য মহাসমিতির অধিবেশন বন্ধ রাখিয়া শুদ্ধ প্রাদেশিক সমিতি সমূহের অধিবেশন করিয়াই কার্য্য শেষ করিতে হইবে। এখানে আমরা হিউম সাহেবের পত্রের কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম—

"That as many of us who are most interested in congress matters, are to be next year in England, there to complete the work, that we have here done, it might perhaps be as well to have no national congress in 1890, but only Provincial Conferences in each of our twenty circles, to consolidate and develop our organisation."

আমরা গতবারেই ইণ্ডিয়ান পোলিটীক্যাল এজেন্সীর কথা উল্লেখ করিয়াছি। এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশ হইতে প্রাপ্ত চাদার ও একটি হিসাব দিয়াছি। তাহাতে সকলেই দেখিয়াছেন যে বোম্বে অতি সমৃদ্ধ নগর হইয়াও এক পয়সা চাঁদা দেন নাই। আমাদের দেশের লোকের স্বার্থ ত্যাগের প্রতি দারুণ অমনোযোগ দেখিয়া হিউম সাহেব বড় দুঃখ করিযাই একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পত্র পড়িতে পড়িতে তাঁহার প্রতি ভক্তি শতগুণে বাড়িয়া উঠে এবৃদ্ধ বয়সে জীবনের সুখ ও শান্তির চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া, দিবারাত্র সমান পরিশ্রমের সহিত, অর্থনাশ, স্বজাতীয়ের ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ হাস্য সহ্য করিয়া তিনি আমাদের জন্য যাহা করিতেছেন তাহাতে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয়, আর আমরা তখনই নিজের কথা মনে করিলে লজ্জায়, ঘৃণায় মরিয়া যাই।

তিনি লিখিয়াছেন যে "বোম্বে ও পুনা কমিটী গত বৎসরের জন্য এজেন্সীর খরচের অংশ প্রদান করেন নাই। বোম্বে ১০০ পাউণ্ড দিতে প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু যখন কমিটিকে টাকার জন্য পত্র লেখা হয়, তখন কমিটী অকুণ্ঠিত চিত্তে উত্তর দিলেন যে তাঁহারা টাকা দিবার প্রতিজ্ঞা করেন নাই, তবে বলিয়াছিলেন যে যদি টাকাটা জোটে ত দিতে পারেন!" এটি কি ঠিক স্বদেশহিতৈষীর ন্যায় কথা হইয়াছে—"টাকা জোটেত পাঠাব"—ইহা অপেক্ষা আলস্য পরতন্ত্রের কথা আর কি আছে? কমিটীর কর্ত্তব্য কি টাকা জোটেত পাঠান, না টাকা যেরকমে হউক যুটাইয়া, মাতৃভূমির

জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া টাকা পাঠান ? হিউম সাহেব কি নিজের উদর পূরণের জন্য এই টাকা চাহিয়া ছিলেন ? যাহাদের কাজ তাহাদের মনে না থাকিলে অন্য লোকে মাথা ব্যথা করিয়া কি হইবে ? আমরা একথা-সুদ্ধ বোম্বেবাসী ভাতৃগণকে বলিতেছি না সমস্ত ভারতবাসীকে বলিতেছি, বোম্বে, মান্দ্রাজ, বাঙ্গলা, উত্তরপশ্চিম, পঞ্জাব ইত্যাদি সমস্ত প্রদেশকেই বলিতেছি একটু স্বার্থত্যাগ না করিলে চলিবে কেন ? তবে গত কনগ্রেসে ভারতবাসী এ সম্বন্ধে প্রকৃত স্বার্থ ত্যাগ দেখাইয়া এই কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন ইহাতে আমাদের আহ্লাদের সীমা নাই।

জাতীয় মহা সমিতি। গত ২৬ এ ডিসেম্বর জাতীয় মহা সমিতির প্রথম অধিবেশন বসিয়াছিল, বেলা দুই ঘটিকার সময় হইতে কার্য্যারম্ভ হয়, ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে ভারতের দুই সহস্র সুযোগ্য সন্তান প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়াছিলেন—ইহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা তিন শত, মহিলাও কয়েক জন ছিলেন—ইহা ভারতের পক্ষে নূতন দৃশ্য। দর্শক সংখ্যা ছয় সহস্রের অল্প নহে।

প্রথমেই শ্রীযুক্ত ফিরোজসা মেটা এক তেজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা প্রতিনিধিবর্গকে সম্মানিত করেন। তাঁহার বক্তৃতা কৌশলে,সুন্দর কণ্ঠস্বরে ও সৎযুক্তিতে সকলই অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই বলেন যে 'আমি রিসেপ্সন কমিটীর (reception Committee) প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া—মহাসমিতির পঞ্চম অধিবেশনের প্রতিনিধিবর্গকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছি ; দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আগত এতগুলি মহাত্মাকে সসম্মানে গ্রহণ করা প্রকৃতই সুখের ও সৌভাগ্যের কথা'।

ইহার পর শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মাননীয় পণ্ডিত অযোধ্যানাথের অনুমোদনে সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই বলেন যে মহাসমিতির প্রকৃত উদ্দেশ্য জাতীয় জীবন লাভ এবং দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্পাদন করা। তিনি সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার পর বলেন যে ইংলণ্ড ও ভারতের স্বার্থ অবিচ্ছিন্ন। এই উভয় রাজ্যের স্বার্থ—যাহাতে নিরপেক্ষ ভাবে রক্ষিত হয়, সে বিষয়ের আন্দোলনে যে তিনি যোগ দিতে পারিয়াছেন এজন্য আপনাকে ধন্য বলিয়া মনে করেন। তিনি মহাসমিতির জন্মকাল হইতেই তাহার গতি বিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে যে জাতীয় মহাসমিতি ভারতে সুশিক্ষার একটি সুন্দর ফল। তিনি অনেক কথা বলেন, অল্প সময়ে বা অল্প স্থানে তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন যে এই জাতীয় মহাসমিতি ভবিষ্যতে যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিবে ইহা নিশ্চয় কথা।

দ্বিতীয় দিন ২৭এ ডিসেম্বর, সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণের পরই বলেন যে ব্যপস্থাপক সভার সংস্কার বিষয়ক পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আন্দোলন করাই সে দিনের প্রধান

কাজ। তদনুসারে শ্রীযুক্ত নর্টন সাহেব এবিষয়ে প্রস্তাব করেন, এবং মাননীয় পণ্ডিত অযোধ্যানাথ অনুমোদন করেন। আন্দোলন কিছু অধিক কাল ধরিয়াই হইয়াছিল কোন কোন মুসলমান বলেন যে ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু ও মুসলমান সভ্য সংখ্যা সমান হউক কিন্তু একথা বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে পায় নাই, জন সংখ্যার তুলনায় মেম্বর নিযুক্ত করাই ঠিক হয়।

তৃতীয় দিন ২৮এ ডিসেম্বর সমিতিতে অনেকগুলি বিষয়েরই আন্দোলন হয় তাহার ভিতর পুলিশ শাসন, দণ্ডনীতি বিচার, ভারতে ভলণ্টিয়ার শ্রেণীর বৃদ্ধি; ইন্‌কম-ট্যাক্স, শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা; লবণ কর; মাদক দ্রব্য সম্বন্ধে আলোচনা; পবলিক সার্ব্বিস, শস্ত্র আইন, ইত্যাদি বিষয়গুলিই প্রধান।

মাননীয় হিউম সাহেব জেনারেল সেক্রেটারী পদে পুনর্নিযুক্ত হন; এবং পণ্ডিত অযোধ্যানাথ জইণ্ট সেক্রেটারী পদে বরিত হন। আগামীবর্ষে ইংলণ্ডে এ সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিতে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ যাইবেন, মিঃ, ইউল, হিউম, আডামস্, নর্টন, ফিরোজসা মেটা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; এম, ঘোষ, ডব্লুউ সি বন্দ্যো, শান্তিরাম।

মহামতি ব্রডলা—এই মহাত্মার দুই একটি কথা বলিয়াই আমরা আজিকার মত নিরস্ত হইব; ব্রাডল সাহেব রোগ শয্যা হইতে না উঠিতে, আমাদের উপকারের জন্য, যদি আমাদের জন্য কিছু করিতে পাবেন, এই আশায় মহাসমিতিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একটি মাত্র বক্তৃতা দিয়াই তিনি গত ৩রা জানুয়ারী স্বদেশ প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি একটিমাত্র বক্তৃতা দিয়াছেন বটে কিন্তু তাহাতেই তাঁহার মহত্ব, সাধারণের প্রতি তাঁহার ভালবাসা, ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি অতি সরল ভাষায় উচ্ছাস পূর্ণ হৃদয়ে যে কথা গুলি বলিয়াছেন আমরা সেরূপ কথা অনেক দিন পর্য্যন্ত কোন ভারতহিতৈষী বৃটন বাসীর নিকট শ্রবণ করি নাই, ইহা ভারতের শুভাদৃষ্ট সন্দেহ নাই। তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম।

“বন্ধুগণ, অন্ধভাবে অধীনতার পূজা করিলেই প্রকৃত রাজভক্তি হয় না; প্রজা রাজাকে রাজকার্য্যে সাহায্য করিবেন তবে ত রাজভক্তি। সাধারণের জন্য আমি অনেক সময় পরিশ্রম করি বলিয়া আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে এজন্য আমি বড়ই দুঃখিত, যদি সাধারণের জন্য না খাটিব তবে কাহার জন্য খাটিব? সাধারণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, সাধারণের বিশ্বাস ভাজন হইয়া—সাধারণের জন্যই আমি জীবন দান করিব।

আপনারা একেবারে সমস্ত অভাব পূর্ণের আশা করিবেন না, কিম্বা নিরাশ হইবারও কোন কারণ নাই, বৃহৎ আশায় ক্ষুদ্র ফলও পাওয়া যায়।

হাউস অব কমন্সে আপনাদের হইয়া দুটি কথা বলেন এরূপ লোক আমি একা

নই, আমি আপনাদের জন্য যেরূপ যত্ন লই এরূপ যত্ন লইবার লোক সম্ভবতঃ আরও আছেন। আপনাদের যাহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটে এজন্য আপনাদের একথাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া যুক্তি-সংগত মনে করি যে ইংলণ্ডেও কোন বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করা সময় সাপেক্ষ।

আমি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, ভারতে জাতীয়তা নাই, জাতীয় মহা সমিতি নাই; ভারতে সহস্র সহস্র সম্প্রদায়, ভারতবাসী সহস্র প্রকার বিভিন্ন মতাবলম্বী। কিন্তু সকলে সমাজগত ও সম্প্রদায়গত বিভিন্নতা ভুলিয়া যে একবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন, অদ্য ইহা দেখিয়া আমার পূর্ব্ব সংস্কার দূর হইয়াছে।

যে দিন পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন বসিবে, আমি সেই দিনই আপনাদের প্রার্থিত বিল সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিব, তাহার পর দিনই আপনারা দেখিবেন তদনুসারে কার্য্য হইতেছে। আমি ইহা অপেক্ষা বেশি বলিতে পারি না। আমাকে কি করিতে হইবে তাহাই জানাইবেন।

আমি যাহা করিব যদি সর্ব্ব সময় তাহা আপনাদের অনুমোদনীয় না হয় তাহা হইলেও নিরাশ হইবেন না। আমার প্রতি এইটুকু বিশ্বাস রাখিবেন যে যাহাই আমি কর্ত্তব্য মনে করিব তাহা নিশ্চয়ই করিব। আমরা ইংলণ্ডে যে সমভাব যে নিরপেক্ষতা পাই, আপনারাও তাহা লাভ করুন এই ইচ্ছা লইয়াই আমি এখানে আসিয়াছি; এই মহাসমিতির কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে; যে বীজ এই মহাসমিতিতে রহিয়াছে, তাহা হইতে সুমিষ্ট ফলবান বৃক্ষই উৎপন্ন হইবে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর।

এইবারে আমরা প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের এক সমস্যা-ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি—আমাদের আলোচ্য-বিষয় বিদ্যাসুন্দর। বঙ্গীয় পাঠকের নিকট বিদ্যাসুন্দর অশ্লীল গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তাহাকে সরস কাব্য বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের কথা সকলে জানেন না, ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতেই তাহার যাহা কিছু সুনাম বা দুর্নাম রটিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের নামের সহিত সাধারণের মনে এমন একটা বিশেষ সংস্কার জন্মাইয়া গিয়াছে যে, ইহার সহিত রামপ্রসাদ সেনের কোনও প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে লোকে সহজে বিশ্বাস করিবে না। একদল লোক রামপ্রসাদের নাম শুনিয়া বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে সহস্র নিগূঢ় আধ্যাত্মিক রহস্য বাহির করিতে বসিবেন, বিদ্যার মধ্যে গৌরী এবং সুন্দরের মধ্যে মহাদেবের প্রেতাত্মা

অনুভব করিয়া সনাতন ধর্ম্মের মহিমায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবেন ; আর একদল বিদ্যাসুন্দর শুনিয়া রামপ্রসাদের ভক্তির গভীরতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে থাকিবেন, এবং সুবিধামত সঙ্গীত রচয়িতা রামপ্রসাদকে বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা রামপ্রসাদ হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবেন। বিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতাই যে বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা রামপ্রসাদ সে বিষয়ে অন্য প্রমাণের আবশ্যক নাই, বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের মধ্যে রামপ্রসাদের আত্মপরিচয় দানেই তাহা জানা যায়। তবে তাঁহার গ্রন্থের আধ্যাত্মিক-উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা কোনও প্রমাণ পাই না। যতদূর বুঝিতে পারি, বক্রগতি বুদ্ধিমানেরা স্বীয় অসাধারণ মেধার প্রভাবে রামপ্রসাদের ছদ্মবেশে জটিল তত্ত্ব সমূহ বাহির করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন বলিয়াই বোধ হয়। এরূপভাবে পার্থিবতার শক্ত আবরণ দিয়া দুরূহ কষ্টসাধ্য ব্যাখ্যার দুয়ারে একটা আধ্যাত্মিকতাকে খাড়া করিয়া রাখিবার ত কোন কারণ দেখা যায় না। তাহাতে ত ফল মন্দ বৈ ভাল হয় না।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত বিদ্যাসুন্দরেরই মত আদিরসের কাব্য ; তাহাতে চঞ্চলচিত্ততা আছে, রূপতৃষ্ণা আছে, হীরামালিনী আছে, গুপ্তপ্রণয় আছে—সে প্রণয়ও সম্পূর্ণ রূপজ, সুড়ঙ্গ, সখী, চোর, কোটাল, কিছুই বাদ যায় নাই, যদি কিছু বাদ গিয়া থাকে ত তাহা ভারতচন্দ্রেও বাদ গিয়াছে—তাহা ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা। ভাবের গভীরতা, সুগভীর সৌন্দর্য্যজ্ঞান, প্রেমের মহান্ উচ্চ আদর্শ, এ সকল রামপ্রসাদের গ্রন্থে নাই। নানা ভাষার কথায় বিবিধছন্দে বিস্তর অনুপ্রাস দিয়া তিনি বিদ্যাসুন্দরের আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রাপেক্ষা তাঁহার ভাষা স্থানে স্থানে দুরূহ হইয়াছে মাত্র। নহিলে, তাঁহার বিদ্যা ভারতের বিদ্যাপেক্ষা বিশেষ কম বিলাসিনী নহে, তাঁহার সুন্দরও সেই হাল্কা স্বভাব বিলাসী বাবু-চরিত্র, সমস্ত কাব্যের মধ্যে গম্ভীর চরিত্রের একেবারেই অভাব। আদিরসের কাব্য বলিয়াই যে বিদ্যাসুন্দর হাল্কামি-পূর্ণ তাহা নহে। প্রাচীন সংস্কৃত অনেক কাব্যই আদিরসপূর্ণ, অথচ গম্ভীর। রচয়িতার মধ্যে সমধিক গাম্ভীর্য্যের অভাবেই বিদ্যাসুন্দর অতি-হাল্কা হইয়াছে। আর রামপ্রসাদ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে সময়ে বিলাসিতাই ত সমাজের অস্থিমজ্জা। কিন্তু রামপ্রসাদের চরিত্রগুলি সম্বন্ধে একটী কথা বলা যায়, সেগুলি অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না। সহস্র সখী পরিবেষ্টিত হইয়া অন্তঃপুরের রুদ্ধ কবাটের মধ্যে নিশিদিন বসিয়া থাকিলে চরিত্রের দৃঢ়তা হয় কিরূপে ? দুই চারি খানা পুঁথির সাহায্যেও আর নিমেষের মধ্যে চরিত্রগঠন করা যায় না। বিদ্যার জীবন সহচরী বৃন্দের উপহাস-রসিকতার মধ্যেই গঠিত, ভোগবিলাসেই তাঁহার জীবনের প্রতিষ্ঠা, সুতরাং স্বভাবতই সে বিলাসিনী। সদ্দৃষ্টান্ত ও রীতিমত ধর্ম্ম-শিক্ষার তাহার যথেষ্ট অভাব ছিল, আত্মসংযম এই কারণে তাহার পক্ষে অসম্ভব।

তবে বিদ্যার ধনুক ভাঙ্গা পণের অর্থ কি ? যাহার আত্মসংযম যথেষ্ট নাই, সে

কিরূপে প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহাকে বিচারে পরাজয় করিতে না পারিলে কাহাকেও বিবাহ করিবে না? প্রতিজ্ঞাটা আসলে হইয়াছিল খেয়ালের মাথায়। সুন্দরের পাল্লায় পড়িয়া তাহা টিঁকিল না। সুন্দর মালা গাঁথায় নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া বিদ্যাকে আকর্ষণ করেন। তাহার পর হীরামালিনীর সাহায্যে বিদ্যার সুন্দর দর্শনলাভ হয়। আর কি বিদ্যা স্থির থাকিতে পারে? সুন্দরের জন্য বিদ্যা অধীরা হইয়া উঠিল। রামপ্রসাদ অধীরা বিদ্যার মুখে একটা আইন-বদ্ধ সানুপ্রাস রূপ-বর্ণনা বসাইয়া দিয়াছেন—তাহাতে ভাব যত থাক্ না থাক্ বিদ্যা প্রকাশ চেষ্টা যথেষ্ট আছে। তাহার অর্থ বোধ হইতে খানিকটা সময় যায়। তবে যাহারা ভালরূপ অক্ষর চিনে না, সারি সারি কতকগুলা এক অক্ষর দেখিযা তাহাদের কতকটা বর্ণপরিচয় হইতে পারে। কিন্তু রামপ্রসাদের সুন্দরের চৌত্রিশাক্ষরে যে কালী স্তুতি আছে, তাহাতে বর্ণপরিচয়ের আরও অধিক সুবিধা। বিদ্যার অধীরতা-ব্যঞ্জক কবিতাগুলিতে আদবেই যেন জোর নাই, বসিয়া বসিয়া শান্তমনে সে যেন অনুপ্রাসালঙ্কার বুঝাইয়াছে। ভাবের কবিতার সহিত টানাবোনা কবিতার প্রভেদ কতদূর, অনুপ্রাসাচ্ছন্ন রামপ্রসাদকে দেখিলেই বুঝা যায়।

পাঠকেরা মনে করিতে পারেন যে, অনুপ্রাসাধিক্য দেখিয়াই রামপ্রসাদকে আমরা টানাবোনা ভাবের কবি ঠাওরাইয়াছি, অনুপ্রাস হইলেই যে সরল ভাব মাটী হয় এমন ত কথা নাই। এরূপ মনে হওয়া সহজ বটে। সেই জন্য আমরা কেবল গুটিকতক পংক্তি মাত্র উঠাইয়া দি, পাঠকেরা নিজেই বিচার করিয়া দেখুন, আমাদের কথা সত্য কি না। বিদ্যা সুন্দর দর্শনে সখীকে বলিতেছে,

"তনু তনু চিন্তায় কেমনে জ্বালা সই।
জীবন জীবন মধ্যে ত্যজি মেনে সই॥"

জীবন অর্থে যে জল বুঝায়, সহসা কোন্ পাঠকের তাহা মনে আসে? এস্থলে যে রামপ্রসাদ অনুপ্রাস দিবার জন্যই কথা আমদানি করিয়াছেন তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? আর ইহা ত শুধু একটী উদাহরণ মাত্র। সুন্দর দর্শনে বিদ্যার সখী প্রতি উক্তি সমস্তটাই এইরূপ। তাহা ছাড়া বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে অন্যত্রও উদাহরণের অভাব নাই।

সুন্দরকে দেখিয়া বিদ্যা যেমন অধীরা, সুন্দরও বিদ্যাকে দেখিয়া সেইরূপ মুগ্ধ। রামপ্রসাদের সুন্দর অনেকটা স্ত্রী প্রকৃতির লোক। সুন্দর মালা গাঁথিতে, মালিনী মাসীর সহিত গল্প করিতে, আর বিদ্যার হস্তে কলের পুঁতুলের মত সারা ক্ষণ নাচিতেই পারেন। পুরুষোচিত দৃঢ়তা সুন্দরে নাই। স্ত্রী জাতির মত বেশবিন্যাস করিতেই সুন্দর পটু অধিক। বিদ্যাকে দেখিয়া অবধি সুন্দর তাহার পুনর্দর্শনের জন্য লালায়িত। সুবিধা করিয়া একদিন সুন্দর বিদ্যার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন আর সুন্দর রাজ-

পুত্র নহেন—সুন্দর চোর। বিদ্যার সহিত সুন্দরের বিচার হইল। এবারে পরাজয় বিদ্যার। এ অবস্থায় পরাজয় স্বীকার না করিলে ত সব মাটী হইয়া যায়। সুন্দরের বদনকমল দেখিয়া অবধিইত বিদ্যা হারিয়া আছে, আজ কেবল প্রতিজ্ঞারক্ষা। বিদ্যার পরাজয়ের পরেই উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল। গান্ধর্ব্ব বিধি বলাই বাহুল্য। পঙ্গপাল সহচরী উপস্থিত ছিল—হুলুধ্বনি জমিয়াছিল ভাল। কিন্তু হুলুধ্বনির মত রামপ্রসাদের কবিত্ব জমে নাই। রামপ্রসাদের এইখানকার বর্ণনাগুলি অতি পার্থিব, নিতান্তই অনাধ্যাত্মিক, যাহাকে অশ্লীল বলে তাহাই, কেবল তৎকালীন সমাজের রুচির জন্যই টিঁকিয়া গিয়াছে। সেকালের রুচি সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রথম প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

রামপ্রসাদের এসম্বন্ধীয় কবিতা নিতান্তই বস্তুগত, তাহাতে সংসারের কোন পদার্থই বাদ পড়ে নাই। সুন্দর বর্দ্ধমান প্রবেশ করিলে রামপ্রসাদ বর্দ্ধমানের প্রত্যেক দোকানের বর্ণনা করিয়া গেলেন, সেখানে কি কি পাওনা যায় না যায় সব লিখিয়া ফেলিলেন। বর্দ্ধমানে কয় জাতীয় সৈন্য আছে, কত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, দেবালয় আছে, এ সকল বিষয়ে রামপ্রসাদ যথাসম্ভব খোঁজ রাখিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা পড়িতে পড়িতে কবিকঙ্কনকে মনে পড়ে। উভয়েরই বর্ণনা এক ধরণের কি না। তবে কবিকঙ্কনের লেখায় রামপ্রসাদের অপেক্ষা প্রাণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কবিকঙ্কন শতগুণে স্বাভাবিক। রামপ্রসাদ সরোবর বর্ণনা করিয়াছেন—স্ফটিক নির্ম্মিত ঘাট, নির্ম্মল জল, তীরে নানা জাতীয় বৃক্ষ মধ্যে ভ্রমরগুঞ্জন, সারসনর্ত্তন, বাঙ্গালাদেশের যাবতীয় বিহঙ্গকূজন। কিন্তু ভাবের অভাবে তাঁহার সরোবর মন প্রাণ আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

যাহা হৌক, এখন এ সকল কথা থাক্। রাণীর সহিত বিদ্যার ঝগড়া বাধিয়াছে, সে চীৎকারে অন্য কথা শুনা যায় না। বিদ্যার সহিত সুন্দরের মিলনের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাই মায়ে ঝিয়ে কথা কাটাকাটি। উভয় তরফই গলাবাজি-বিদ্যায় দক্ষা। কেহই পশ্চাৎপদ হইবার পাত্রী নহেন। গলাবাজিতে কিন্তু বিদ্যার বিদ্যা প্রকাশ পায় নাই। সে সময়ে স্বাভাবিক সম্মার্জ্জিত তারকণ্ঠ ভাষাই তাহার সম্বল। সখীদের উপরেও রাণীর বাক্য বাণ বর্ষণ ফাঁক গেল না, তাহারাও সুবিধামত দুই চারি কথা শুনাইয়া দিল। রাজা বীরসিংহের প্রাচীরবদ্ধ-জেনানা—সখী, রাণী এবং বিদ্যার কণ্ঠধ্বনিতে উদ্বেল হইয়া উঠিল; ক্রমে মহারাজা বীরসিংহের আসন পর্য্যন্ত টলিল। কোটালের ডাক পড়িল, কোটালিনী অন্তঃপুরে রাণীর মনস্তুষ্টি সাধন করিতে বাহির হইল, প্রহরীর গুঁতায়, সিপাহীর অত্যাচারে সহরে লোক আর টিঁকে না বুঝি। রামপ্রসাদ কোটালকে সুবিধামত পাইয়া অনর্গল হিন্দী বুলি আওড়াইয়া দিলেন। একটা খুব হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বর্দ্ধমান সরগরম।

কোটাল একবার বিহু ব্রাহ্মণীর কাছে গিয়া সকল কথা বলিল। বিহু আশ্বাস

দিল অনেক, কিন্তু চোরের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না। তখন কোটাল মাধাই ভায়ার শরণাপন্ন হইল। মাধাই রাজকন্যার সমস্ত গৃহ সিন্দুর মাখাইয়া রাখিতে পরামর্শ দিল। কোটাল তাহাই করিল। সুন্দর বিদ্যার গৃহে আসিতে তাঁহার বসনভূষণ সিন্দুর-রঞ্জিত হইয়া গেল। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সুন্দর হীরার দ্বারা কাপড়গুলি রজকালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। নিকটেই কোটালের চর লুকাইয়াছিল, সে রজককে ধরিয়া ফেলিল। ক্রমে খোঁজ করিতে করিতে চোর বাহির হইয়া পড়িল—সুন্দর। চোর বাহির হইল বটে, কিন্তু কোটাল যে নাকাল হইয়াছিল তাহা বলিবার নয়। সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া, বিদ্যার গৃহে গিয়া কিছুতেই চোরকে পাওয়া যায় না। অবশেষে খন্দকলঙ্ঘনে দক্ষিণ-পদ এড়াইয়া সুন্দর ধরা পড়ে। কোটল সুন্দরকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। বিদ্যা কাঁদিয়া আকুল—সুন্দরের দশা কি হইবে। কোটালকে অনেক করিয়া বিদ্যা অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, ফল হইল না। চোরকে দেখিয়া রাণীও বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন চেহারা কি কখনও চোরের হয়? নাগরিকেরাও চোরকে দেখিয়া কান্নাকাটি জুড়িয়া দিল। কিন্তু কোটাল ছাড়িবার পাত্র নহে। এতদিন সব বেশ নির্গোল ছিল, এই ব্যক্তি আসিয়াই ত চতুর্দ্দিক তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে। ইহাকে ছাড়িয়া দিবে? সে আজ নহে—একেবারে শেষ দিনে।

কোটাল সুন্দরকে রাজসভায় হাজির করিল। চোর সেখানে ব্যঙ্গ পরিহাস আরম্ভ করিয়া দিল। রাজারও সুন্দরকে পীড়ন করিতে ইচ্ছা নাই, তিনি কেবল মুখে হুকুম দিলেন যে, সুন্দরকে মশানে লইয়া যাও। কালীর কৃপায় সুন্দর মশানে বাঁচিয়া গেলেন। তখন ভূপতি বিনয় পূর্ব্বক সুন্দরকে জামাতা বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। কিছুদিন শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া বিদ্যাসহ সুন্দর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। সুন্দর রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কিয়ৎকাল প্রজাপালন করিয়া পুত্রহস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিলেন। তাহার পর বিদ্যাসুন্দর স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের গল্পাংশ এই। গল্পটী মন্দ নহে, তেমন যদি চরিত্রবিকাশ হইত তাহা হইলে কাব্যখানি উচ্চদরের গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইত সন্দেহ নাই। রামপ্রসাদ সে দিকে বড় লক্ষ্যই করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টি প্রধানতঃ অনুপ্রাসের দিকে। গল্পের মধ্যেও মজা করিবার জন্যই তিনি ব্যস্ত। চারিদিকে সামঞ্জস্য করিয়া একটা কিছু করা তাঁহার পোষায় নাই। সে সময়ের লোকের রুচির দিকে তাকাইয়া আর সেই সঙ্গে কতকটা পাণ্ডিত্য মিশাইয়া তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছেন। এ রচনার মধ্যে প্রতিভার দুর্দ্দমনীয় বিকাশ লক্ষিত হয় না। নিতান্তই যেন কোন্ প্রাচীনা দিদিমার গল্প চলিয়া আসিতেছে। এ রচনা রক্তমাংসের দেহমাত্র, ইহার মধ্যে প্রাণ নিশ্বসিত হয় নাই।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর তেমন উচ্চ অঙ্গের কাব্য হয় নাই কেন, তাহার কতকগুলি কারণ আছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আদেশেই তিনি বিদ্যাসুন্দর লিখিতে বসেন। বিদ্যাসুন্দরের প্রেম-কাহিনীতে তাঁহার হৃদয় স্বতঃ উদ্দীপিত হয় নাই। সুতরাং ফরমাসে-কাব্যের মধ্যে যেরূপ আশা করা যায় রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে তাহাপেক্ষা অধিক কবিত্ব থাকিবে কেন? তাহা ভিন্ন রামপ্রসাদের কথার দিকে যত দৃষ্টি ভাবের দিকে তত নহে। ভাব স্বাভাবিক। তাহার ত আর ফরমাস চলে না। রামপ্রসাদের মধ্যে ভাব ছিল না, বাঁধা আইনানুসারে তিনি যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কারণে কাব্যাংশে বিদ্যাসুন্দর তেমন জমাইতে পারে নাই।

বিদ্যাসুন্দরের আধ্যাত্মিকতার দুইটী কারণ আছে—সুন্দরের দক্ষিণ কালিকামূর্ত্তি-সংস্থাপন এবং শবসাধন। এই দুইটী ঘটনা হইতে অনেকে বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কতদূর কি বলা যায় সন্দেহ। চির জীবন প্রবৃত্তির পদসেবা করিয়া অনেক ধনী-সন্তান শেষ দশায় দেব মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তাহাতে কি তাঁহাদের জীবনকে কেহ বিশেষরূপে আধ্যাত্মিক বলে? রামপ্রসাদের গ্রন্থে ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পতন ইহাও কোথাও দেখান হইয়াছে বোধ হয় না। তাহার আগাগোড়াই ভোগ বিলাসের উপাখ্যান—তাহাও যতদূর সম্ভব পার্থিব দেহবদ্ধ, কেবল দু'একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা হইতে কিরূপে বলা যায় যে, বিদ্যাসুন্দরের অন্তঃপুরে গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব সকল নিহিত আছে, বিদ্যাসুন্দরের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক? তাহা হইলে সংসারে সকলই আধ্যাত্মিক—আধ্যাত্মিকতার বিশেষ সার্থকতা থাকে না।

কষ্ট কল্পনা করিয়া বিদ্যাসুন্দরের মধ্য হইতে আমাদের আধ্যাত্মিকতা বাহির করিবার আবশ্যক নাই। আমরা বিদ্যাসুন্দর পাঠে বঙ্গদেশের সে সময়ের সমাজের অবস্থা বুঝিতে পারি তাহাই যথেষ্ট। সে সময়ের সাহিত্য হিসাবেই বিদ্যাসুন্দরের যাহা কিছু মূল্য। ইহার উপাখ্যান লইয়া বর্ত্তমান কালের কোন কবি সুন্দর কাব্য রচনা করিতে পারেন। সে সমাজে অশ্লীল রুচির জন্যই বিদ্যাসুন্দরে যাহা কিছু রুচিবিরুদ্ধ ভাব। নহিলে, তাহার মূল উপাখ্যানভাগ নিতান্তই বর্ত্তমানের রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না।

ধ্বংস-তরু।

প্রায় সার্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে প্রাচীন কলিকাতায়, এমন একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল, আজ কালকার দিনে তাহা নিতান্ত দুর্লভদর্শন ও অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়। উল্লিখিত ঘটনা বিবৃত করিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা করা হইল।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বাঙ্গলায় গবর্ণরী পাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ইহার শাসন কার্য্যে যে অতিশয় বিশৃঙ্খলা ঘটিযাছে; লর্ড নর্থ-প্রমুখ মন্ত্রীসম্প্রদায়ের মনে ইহাই ধ্রুববিশ্বাস জন্মিল। এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা শাসন সংস্কার-উদ্দেশে কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রস্তত করা নিতান্ত আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তাঁহা-দেরই যত্নে, বাঙ্গলার কোম্পানীর অধিকার মধ্যে সুশৃঙ্খলা সংসাধন জন্য সুপ্রসিদ্ধ Regulation act প্রচলন হইল। এই বিধি অনুযায়ী ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব কোম্পানীর অধিকার সমূহের গবর্ণর জেনারেল, ফ্রান্সিস্, ক্লেভারিং মন্সন, ও বারওয়েল, এই চারিজন তাঁহার মন্ত্রীসভায় সদস্য, সার ইলাইজা ইম্পি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক; চেম্বার্স, লিমেষ্টার ও হাইড তাহার সহকারী হইয়া আইসেন।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে, সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, এবং মন্ত্রী সভার সদস্যেরা চাঁদপাল ঘাটে অবতীর্ণ হইলেন। তখনকার বড় বড় সাহেবেরা এই ঘাটেই আসিয়া নামিতেন। হেষ্টিংস সাহেব পূর্ব্বাবধিই কলিকাতায় ছিলেন, বিশেষতঃ তিনি এখন নূতন ক্ষমতাপূর্ণ পদবীতে উন্নত—তাঁহার আদেশানুসারে অভ্যাগতদিগের জন্য ফোর্ট উইলিয়মের দুর্গ প্রাকার হইতে সপ্তবিংশতি তোপধ্বনি হইল। তিনি নিজে তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করিতে না গিয়া, তাঁহার অধীনস্থ জনকয়েক কর্ম্মচারীকে তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য পাঠাইলেন। তাঁহার এই গর্ব্বিত ব্যবহারে, কৌন্সিলের সদস্যগণ ভাবিলেন, হেষ্টিংস্ নিজ প্রভুত্ব ও শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার জন্য তাঁহাদের সহিত এই প্রকার ব্যবহার করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আর কেহ এই ঘটনাকে অধিকতর অপমান বলিয়া বিবেচনা করুন বা না করুন, ফ্রান্সিস্ সাহেব ত ইহাতে যথেষ্ট মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি তোপ সংখ্যা গণনা করিতে করিতে দৃঢ় পদ বিক্ষেপে ক্ষুব্ধ চিত্তে কলিকাতার মৃত্তিকায় পদার্পণ করিলেন। হেষ্টিংসের এই অক্ষত ক্ষমতা সংযত করিবার ইচ্ছা সেই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধমূল হইল. স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ন্যায় এই ইচ্ছা তাঁহার মনঃক্ষেত্রে অদম্য ভাব ধারণ করিল।

এত দিন বাঙ্গলায় হেষ্টিংসের একছত্র-ক্ষমতা ছিল। পূর্ব্বে কলিকাতার কৌন্সিল হেষ্টিংসের নিজের দলের লোক লইয়াই সংগঠিত হইত, সুতরাং তিনি যাহাই করিতেন তাহাই সর্ব্ববাদী সম্মত বলিয়া বিবেচিত হইত। এই জন্য হেষ্টিংসের কার্য্যের বিরুদ্ধে কি দেশীয়, কি ইউরোপীয় কেহই কোন কথা সাহস করিয়া বলিতে পারিতেন না। কিন্তু নূতন কৌন্সিলের সভ্যগণ কলিকাতায় উপস্থিত হওয়াতে অনেকে হেষ্টিংসকৃত অত্যাচারের প্রতিকারের আশা করিতে লাগিল। এই সময়ে রোহিল্লা যুদ্ধের ন্যায়-অন্যায় লইয়া কৌন্সিলের সদস্যগণ হেষ্টিংশকে বড়ই পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। ইহাতে সকলেই বুঝিল, গবর্ণরের দোষগুণ বিচার করিবার জন্য, সাধারণকে অত্যাচার

ও অবিচার ও নিঃসহায় অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য—গবর্ণরের সমক্ষমতাপন্ন কয়েকজন লোক ইংলণ্ডেশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছেন।

কৌন্সিলের এই ক্ষমতা সাধারণে যতদূর না হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য ফ্রান্সিস্ সাহেব ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে জানিতেন "আমরা, ইংলণ্ডেশ্বরের সম্মতিতে পার্লামেণ্ট মহাসভার অভিমতে, ডাইরেক্টারদিগের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া ভারতীর শাসন কার্য্যে হেষ্টিংসকে পরামর্শ দিতে আসিয়াছি। আমাদের পদ মর্য্যাদা সুতরাং তাহা অপেক্ষা এক তিলও ন্যূন নহে। আমরা সকল বিষয়েই তাহার সমকক্ষ—এবং তিনি সকল বিষয়েই আমাদের মন্ত্রণা দ্বারা চালিত হইতে বাধ্য। তিনি যথেচ্ছাচার করিলে আমরা তাঁহার সেই স্বেচ্ছাচার দমন করিতে ধর্ম্মমতে আদিষ্ট। তিনি অন্যায় কার্য্য করিয়া কোম্পানীর নাম কলঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিলে আমরা তাঁহাকে ন্যায় পথ দেখাইতে, প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে বাধ্য। বাঙ্গলার প্রজাকুলকে সুখ ও শান্তি প্রদান করিতে আমরা ভারতবর্ষে আসিয়াছি—এবং ন্যায় ধর্ম্মানুমোদিত পথে শাসন করাই আমাদের উদ্দেশ্য।" বস্তুত কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিতে আরম্ভ করিলেন।

গবর্ণরের বিরুদ্ধে দরখাস্ত শুনিবার লোক আসিয়াছে শুনিয়া দেশের লোক একটু আশ্বস্ত হইল। অনেকে অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছে—কিন্তু কোন কথাটী কহে নাই। তাহারা জানিত এরূপ করা কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র। তাহারা সকলেই একটুমাত্র সুযোগ অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বর্দ্ধমানের মৃত মহারাজ তিলকচাঁদের বিধবা মহিষী ও মহারাজ নন্দকুমার সর্ব্ব প্রথমে, হেষ্টিংসের নামে কৌন্সিলের সমক্ষে অভিযোগ আনয়ন করিলেন। মহারাজ নন্দকুমার কৌন্সিলের সম্মুখে যে অভিযোগ পত্র দাখিল করেন তাহা অতিশয় রহস্য বিজড়িত। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিলে স্থান সংকুলান হওয়া দুর্ঘট হইবে। এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে—নন্দকুমার হেষ্টিংসের নামে যে সমস্ত অভিযোগ আনিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য ও সমূলক প্রমাণ হইলে বিশেষ রূপে অপদস্থ হইতে হইবে ভাবিয়া হেষ্টিংস অনন্যোপায় হইয়া অনেক কৌশলে জাল বিস্তার করিয়া মহারাজ নন্দকুমারকে অসদুপায়ে ইহলোক হইতে অপসৃত করেন। ইতিহাস পাঠকের নিকট এঘটনা অপরিজ্ঞাত নহে। *

নন্দকুমারকে লইয়াই ফ্রান্সিস্ সাহেবের সহিত হেষ্টিংসের মনান্তরের প্রথম সূচনা হয়। নন্দকুমারকে হেষ্টিংস, উপযুক্ত প্রতিযোগী বিবেচনা করিতেন—তাহার লিখিত

* ১২৯২ ও ৯৩ সালের ভারতীতে নন্দকুমার ও সুপ্রিমকোর্ট শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন। ইহাতে নন্দকুমারের জাল অপরাধের মোকদ্দামার সম্পূর্ণ বিবরণ আছে।

অভিযোগ গুলিও সত্য মূলক বলিয়া জানিতেন - এবং তাহা প্রমাণ হইলে, অপমান লাঞ্ছনা ও পদচ্যুতিই তাহার ঘোরতর শোচনীয় পরিনাম ইহা বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি নন্দকুমার ও তাঁহার সহায়বর্গকে কণ্টক স্বরূপ বিবেচনা করিতেন। নন্দকুমার তাঁহার চক্ষুঃশূল এবং তাহাদের দেখিলেই তাঁহার গাত্রদাহ উপস্থিত হইত। ফ্রান্সিস্ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক এই জন্য ফ্রান্সিসের উপর প্রথম হইতেই হেষ্টিংসের মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ জন্মিল। অথচ তিনি কিছুতেই তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না কাজেই চুপ করিয়া থাকিতেন। এই সমবেত ক্ষমতাপন্ন মন্ত্রী সভা মধ্যে হেষ্টিংস সাহেব মহা সমুদ্র মধ্যে ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডবৎ ভয়ানক রূপে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন।

ফ্রান্সিস্ প্রমুখ মন্ত্রী সমাজ কি প্রকার প্রতাপশালী ছিলেন—তাহা ভারতীর নন্দকুমার নামক প্রবন্ধে পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখের আবশ্যক নহে।

যাহা হউক কিয়ংকাল পরে ঘটনা স্রোত স্বতঃই পরিবর্ত্তিত হইল। ভবিতব্য বশে হেষ্টিংসের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। তিনি স্বাধীন ভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। ফ্রান্সিসের হস্তদ্বয় স্বরূপ মন্সন ও ক্লেভারিং মৃত্যুমুখে পড়িলেন। ইহার পূর্ব্বে প্রতিপদে এই সমবেত ক্ষমতার সম্মুখে পরাজিত হইয়া হেষ্টিংস সাহেব কর্ম্মে ইস্তফা দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু ঘটনা স্রোত সহসা পরিবর্ত্তিত হওয়াতে বুদ্ধিমানের ন্যায় স্বকার্য্যেই রহিয়া গেলেন। ক্লেভারিং সাহেবের পদে স্যর আয়ার কুট নিযুক্ত হইলেন। মন্সণের পদে হোয়েলার সাহেব বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। কুট কোন কথায় কথা কহিতেন না—কিন্তু হোয়েলার হেষ্টিংসের দিকে টানিয়া চলিতেন। সুতরাং ফ্রান্সিস্ সম্পূর্ণ একক হইয়া পড়িলেন। হেষ্টিংসের ক্ষমতা এতদিনের পর পুনরায় পূর্ণ বৃদ্ধি পাইল। সুতরাং আপাততঃ ফ্রান্সিস ও হেষ্টিংসের মধ্যে একটা ক্ষণস্থায়ী সন্ধি স্থাপিত হইল। ফ্রান্সিস, হেষ্টিংসের কোন কার্য্যে আর প্রতিযোগিতা করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

এই সময়ে মারহাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। হেষ্টিংস যুদ্ধের পক্ষপাতী ফ্রান্সিস অপর পথ অবলম্বনে ইচ্ছুক কিন্তু ফ্রান্সিস তাহার কোন কার্য্যে আপত্তি করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা বাক্য জল বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হইয়া দাঁড়াইল। ফ্রান্সিসের ও হেষ্টিংসের মধ্যে সন্ধির আশা, মন্দ ভূমে বীজ বপনের ন্যায় নিষ্ফল হইল। তিনি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাসত্বেও হেষ্টিংসের প্রস্তাবের প্রতিযোগিতা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রতিযোগিতায় গবর্ণর সাহেব তাহার সহযোগার উপর—সম্পূর্ণ রূপ ক্রুদ্ধ হইলেন। সেই ক্রোধে ১৮ই জুলাইএর মিনিটে ফ্রান্সিসের চরিত্রের তীব্র মন্তব্য লিখিয়াছিলেন উহার একাংশ এই—"I do not trust to Mr Francis' promises of candour, convinced that he is incapable of

it. I judge of his public conduct by his private; which I have found to be void of truth and honor. *

চরিত্রের উপর আঘাত করিলে কে তাহা সহ্য করিতে পারে? ফ্রান্সিসের ন্যায় উগ্র প্রকৃতি ও সাহসী লোকের পক্ষে ইহা নিতান্ত অসম্ভব। বিশেষতঃ হেষ্টিংস সাহেব যদি তাহাকে মুখে দুই চারিটা গালাগালি দিতেন তাহা তাঁহার সহ্য হইত। সরকারী কাগজ পত্রে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে এপ্রকার তীব্র সমালোচনা ফ্রান্সিসের ন্যায় অভিমানীর পক্ষে নিতান্ত অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। হেষ্টিংস সাহেব সভাস্থ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন এমন সময়ে ক্রুদ্ধ প্রকৃতি ফ্রান্সিস তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাহার হস্তে একখণ্ড কাগজ দিলেন। হেষ্টিংসকে সেই কাগজখান পড়িয়া শুনান হইল। সেই পত্রে ফ্রান্সিস তাঁহাকে দ্বন্দ যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন।
শ্রাদ্ধটা যে সহজেই এতদূর গড়াইবে ইহা হেষ্টিংস সাহেবের আদৌ ধারণা ছিল না। হইলে বোধ হয় তিনি এ কঠোর মন্তব্য না লিখিতেও পারিতেন। কিন্তু তখন আর ভাবিবার সময় নাই ফ্রান্সিস্ সাহেব তাঁহাকে দ্বন্দ যুদ্ধে আহ্বান করিলেন—তিনি যদি সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন তাহা হইলে বড়ই একটা কলঙ্কের কথা। তাঁহার শরীরে ও তাহার ধমনীতেও ব্রিটনের উগ্র রক্ত প্রবহমান। হেষ্টিংস সাহেব অনন্যোপায় হইয়া এই যুদ্ধে স্বীকৃত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন ইহার দ্বারায় হয়ত ফ্রান্সিসের সহিত তাঁহার মর্ম্মান্তিক বিবাদ চিরকালের জন্য মিটিয়া যাইবে। এই প্রকার ভাবিয়া হেষ্টিংস সাহেব এই যুদ্ধের দিন স্থির করিয়া ফ্রান্সিসের নিকট প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন। এই খানেই "ধ্বংস তরুর" নাম প্রতিষ্ঠার সূচনা হইল। ধ্বংস তরু কি পরে দেখিতে পাইবেন।

আমরা নিম্নে কর্ণেল পীয়াস সাহেবের পত্র হইতে সেই দিনের ঘটনার সেই নিদারুণ দ্বন্দ যুদ্ধের মূল কথা গুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠক বর্গের গোচর করিলাম।

কর্ণেল সাহেব এ সম্বন্ধে লিখিতেছেন—১৫ই আগষ্ট তারিখে, সন্ধ্যার পর আমি হেষ্টিংস সাহেবের নিকট হইতে এক পত্র পাইলাম। সেই পত্রে দেখিলাম পরদিন প্রাতঃকালে তিনি আমাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে বলিয়াছেন। আমি নির্দ্ধারিত সময়ে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। † আমার জন্য তিনি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া

* Minute, Dated 14th July 1780.

† হেষ্টিংস সাহেবের বাটী হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে ছিল। আজকাল ঐ রাস্তায় যেখানে বরন্ কোম্পানীর কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত সেইখানে সম্ভবতঃ হেষ্টিংসের আবাস ভবন ছিল। এরূপ শুনিয়াছি হেষ্টিংস সাহেব পদব্রজে বাটী হইতে নিকটস্থ ভজনাগারে যাইতেন। বর্ত্তমান পাথুরিয়া গির্জ্জাই যে এই ভজনাগার তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা মহারাজ নবকৃষ্ণের প্রদত্ত জমীর উপর নির্ম্মিত। পূর্ব্বে ইহা কলিকাতার অন্তর্গত ছিল। মহারাজ নবকৃষ্ণ বিনামূল্যে এই জমী ভজনালয় নির্ম্মাণের জন্য প্রদান করেন।

আছেন। আমায় দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আপনাকে একটী গোপনীয় কথা বলিব, কিন্তু আমার সম্মতি ব্যতীত আপনি কাহাকেও সে কথা প্রকাশ করিতে পারিবেন না।" আমি স্বীকৃত হইলাম। তিনি প্রথমে ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে যে মন্তব্য লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন —কল্য সভাগৃহ হইতে বাহিরে আসিবার সময় ফ্রান্সিস্ সাহেব তাঁহাকে এই প্রকার অবমাননার জন্য দ্বন্দ যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন। বৃহস্পতিবার প্রাতে ৫½ ঘটিকার সময় এই শোচনীয় কার্য্যের দিনস্থির হইয়াছে। গবর্ণর সাহেব আমাকে তাঁহার সহকারী হইতে অনুরোধ করিলেন। *

বৃহস্পতিবার প্রাতে আমি গাড়ি লইয়া হেষ্টিংস সাহেবের বাটীতে গেলাম। সেখান হইতে দুইজনে একত্রিত হইয়া বেলভেডিয়ারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম ফ্রান্সিস্ সাহেব ও কর্ণেল ওয়ট্সন দুইজনে, ধীর পদ বিক্ষেপে সেইস্থানে বিচরণ করিতেছেন। আমি আমার ঘড়ি দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম "ঠিক সাড়ে পাঁচটা।" ফ্রান্সিস্ সাহেবের কর্ণে এই কথা গেল, তিনি নিজের ঘড়ি খুলিয়া বলিলেন—"ছয়টা বাজিতে দেরি নাই!"

যে প্রকার জায়গায় আমরা এই ভয়ানক কার্য্যের জন্য একত্রিত হইলাম, তাহা প্রকৃত পক্ষে ইহার উপযুক্ত স্থান নহে। আমরা যে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই রাস্তা আলিপুরের দিকে গিয়াছে। এই রাস্তার মোড় হইতে রাস্তার পার্শ্বে বরাবর দুইসারি বড় বড় গাছ ছিল। বোধ হয় পূর্ব্বে ইহা বেলভেডিয়ার বাগানের সীমাভুক্ত বেড়াইবার স্থান ছিল। কর্ণেল ওয়াটসন ফ্রান্সিস্ সাহেবের জন্য পিস্তল ভরিতে গেলেন, কিন্তু যাইবার সময় হেষ্টিংসকে অনুরোধ করিলেন "আপনারা মোড় হইতে অদূরস্থ বৃক্ষ বেষ্টিত পথে আসুন।" কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব সেই স্থান নল থাকড়ায় পূর্ণ ও অন্ধকারে আবৃত বলিয়া পছন্দ করিলেন না। রাস্তার সন্নিহিত স্থানও তাঁহাদের পসন্দ হইল না। কারণ তখন প্রভাত হইয়াছে অনেকে এইস্থানে, অশ্বারোহনে বায়ু-সেবন করিতেও আসিতে পারে। সুতরাং এই জন্য বারওয়েল সাহেবের বাটীর † দিকে যাওয়া সকলেরই মত হইল। খানিক দূর গিয়া, একটি শুষ্ক স্থল তাঁহাদের উভয় পক্ষেরই মনোনীত হইল।

স্থান নির্দ্দেশ হইবার পরক্ষণেই আমি হেষ্টিংস সাহেবের পিস্তল আনিতে গেলাম। ফ্রান্সিস্ সাহেবের পিস্তল আগেই প্রস্তুত ছিল। তাঁহাদের উভয়কেই দ্বন্দযুদ্ধের পূর্ব্ব

---

* দ্বন্দযুদ্ধে যোদ্ধা ব্যতীত তাহাদের প্রত্যেকের এক এক জন সহকারী আবশ্যক। এই সহকারীদের ইংরাজীতে "seconds" বলে। ইঁহারা স্বস্ব পক্ষীয় যোদ্ধার কার্য্যের ন্যায়-অন্যায় পর্য্যবেক্ষণ করেন। কিন্তু যুদ্ধ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকেন।

† বর্ত্তমান জওলজিকাল গার্ডনের পশ্চাদ্ভাগে যে orphanage বাটী আছে সেইস্থান অধিকার করিয়াই বারওয়েল সাহেবের বাটী ছিল ইহাই অনুমিত হয়।

কার্য্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ভাবিয়া আমি বলিলাম "আপনারা প্রথমে আপনাদের দূরত্ব ঠিক্ করিয়া লউন ও তদনুসারে দূরবর্ত্তী হইয়া দণ্ডায়মান হউন।" ওয়াটসন সাহেব বলিলেন "উঁহাদের আর দূরত্ব স্থির করিবার প্রয়োজন কি? আমিই করিয়া দিতেছি। বিলাতে ফক্স ও আডাম যখন দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করেন তখন তাঁহারা ১৪ হস্ত ব্যবধানে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। উঁহারাও সেই প্রথা অবলম্বন করুন"।

হেষ্টিংস সাহেব বলিলেন—"এতদূর হইতে পিস্তল ছোড়া বড়ই অসুবিধাকর হইবে"। কিন্তু যখন এ আপত্তি লইয়া আর পীড়াপীড়ি হইল না তখন ওয়াটসন সাহেব পা দিয়া দূরত্ব মাপিতে লাগিলেন, আমি গুনিতে লাগিলাম। হেষ্টিংস ও ফ্রান্সিস্ সাহেব স্বস্ব স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন, আমি বলিলাম—"পিস্তলের আওয়াজ না করিয়া তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিতে পারিবেন না ইহাই এই যুদ্ধের নিয়ম, সুতরাং একেবারেই স্থান ঠিক্ করিয়া লওয়া উচিত। ওয়াট্সন সাহেব বলিলেন—"আওয়াজটা একবারে হইলেই ভাল হয়। কারণ তাহাতে দুই জনেরই সমান সুবিধা।" সব ঠিক্ হইল তাঁহারা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইলেন। লক্ষ্য স্থির করিয়া ফ্রান্সিস্ সাহেব ঘোড়া টিপিলেন। কিন্তু তাঁহার বারুদ আর্দ্র থাকাতে সে আওয়াজ ব্যর্থ হইল। হেষ্টিংস সাহেব তাঁহার প্রতিযোগীকে অবসর দিলেন।

আবার দুই জনে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইলেন, দুই জনে স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইলেন। "এক" "দুই" "তিন"—অমনি দুইজনের পিস্তলের ঘোড়া পড়িল—ফ্রান্সিসের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, হেষ্টিংস সাহেবের গুলি গিয়া তাঁহাকে ভূপতিত করিল। "আমি মরিলাম" বলিয়া চীৎকার করিয়া তিনি ভূপতিত হইলেন। হেষ্টিংস সাহেব—Good God! I hope not! বলিয়া তাঁহার দিকে কম্পিত হৃদয়ে ছুটিলেন। আহত ব্যক্তি তখন ভূমে পড়িয়া যাতনায় ছটফট করিতেছে—শোনিত স্রাবে তাঁহার বস্ত্র রঞ্জিত হইয়াছে। কর্ণেল ওয়াটসন ও হেষ্টিংস, আহতের নিকটে রহিলেন—আমি বস্ত্রখণ্ড আনিতে এবং চাকরদের ডাকিতে দৌড়াইলাম। প্রায় দুই মিনিটের জন্য আমি অনুপস্থিত ছিলাম, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম—হেষ্টিংস সাহেব অনুশোচনাপূর্ণ চিত্তে ফ্রান্সিস সাহেবের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন—এবং ওয়াটসন পাল্কী আনিতে গিয়াছেন।

বস্ত্র খণ্ড আনীত হইলে, আমি ও হেষ্টিংস সাহেব তাঁহার ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলাম। আঘাতটী সাংঘাতিক হয় নাই বলিয়া আমাদের বড়ই আহ্লাদ জন্মিল।* আমি ফ্রান্সিস্ সাহেবকে বলিলাম—আপনি আমার গাড়িতে সহরে চলুন, সেইখানেই চিকিৎসা হইবে। হেষ্টিংস সাহেবও তাহাতে জেদ করিতে লাগিলেন। পাল্কী আসিল,

* আঘাত সাংঘাতিক স্থলে হইলে, পার্লামেণ্টে মহাসভার সম্মুখে Impeachment মহাযজ্ঞে, প্রধান তন্ত্রধারক কে হইত? ভবিতব্যই তাঁহাকে হেষ্টিংসের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য জীবিত রাখিয়াছিলেন।

গাড়ীখানি নদীর অপর পারে ছিল † আমরা আহত ব্যক্তিকে পাল্কীতে উঠাইলাম। কিন্তু পাল্কী শুদ্ধ নদীর অপর পারে যাওয়া বড়ই দুরূহ হইল। আমরা অনন্যোপায় হইয়া বলিলাম "আপনারা ফিরিয়া বেলভেডিয়ারে যান—সেইখানে গবর্ণরের বাগান বাটীতে ‡ অবস্থান করুন, আমার সহর হইতে শীঘ্রই সাহায্য পাঠাইয়া দিতেছি। আপাততঃ সেখানে ডাক্তার ক্যাম্বেল ও হেষ্টিংসের নিজের চিকিৎসক ডাক্তার ফ্রান্সিস সাহেব উপস্থিত আছেন। তাহারা আপনাদের বর্ত্তমানে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবেন।" সকলেই এই প্রস্তাবে এক মত হইল। আহত ব্যক্তিকে লইয়া তাঁহারা বেলভেডিয়ারে গেলেন, আমরা কলিকাতায় গেলাম। সন্ধ্যার সময় ডাঃ ফ্রান্সিস্ আসিয়া গবর্ণরকে সংবাদ দিলেন "আঘাত সাংঘাতিক নহে কোন ভয় নাই দক্ষিণ দিকের পাঁজরায় হাড়ের উপর মাংসের মধ্যে গুলি বিঁধিয়াছিল—আমি তাহা বাহির করিয়া দিয়াছি। রোগী এক্ষণে শান্তভাবে কাল কাটাইতেছেন ও নিরাপদ হইয়াছেন।

হেষ্টিংস সাহেব এই সংবাদে যথেষ্ট পুলকিত হইলেন—কেননা ইতি পূর্ব্বেই তিনি আপনাকে ফ্রান্সিসের হত্যাকারী জ্ঞানে, সরিফের (মাজিষ্ট্রেটের) হাতে আত্ম-সমর্পণ করিতে চাহিয়া ছিলেন। §

---

† বর্ত্তমান (Tulley's nullah) টালির নালা যেটী জিরাট পোলের নীচে দিয়া গিয়াছে সেটি নয়ত ?

‡ হেষ্টিংসের বাগান বাটী আলিপুরের কোন স্থানে ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। এ সম্বন্ধে একটু মত-বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, ইহা বর্ত্তমান লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের বাটীর সীমানার মধ্যভুক্ত কোন স্থলে ছিল। কিন্তু অপর পক্ষ বলেন, লাট্‌সাহেবের বাটীর ঠিক্ পশ্চাতের রাস্তার ধারে, হেষ্টিংস হাউস বলিয়া আজও একটী বাগান বর্ত্তমান আছে। ইহাই হেষ্টিংস সাহেবের বাগান বাটী। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ বেভারিজ সাহেব এই অনুমানের প্রবর্ত্তয়িতা। আমাদেরও বেভারিজ সাহেবের মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। "হেষ্টিংস হাউসের" আজও প্রাচীনতাজ্ঞাপক অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বড় বড় গাছগুলি দেখিলেই এই কথা আংশিক সত্যে পরিণত হয়। দ্বিতীয় কারণ এই, আহত ফ্রান্সিসকে লইয়া যাইবার জন্য পাল্কী ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। কাছে হইলে হাতাহাতিতে চলিত। দূরত্বের অপর নিদর্শন এই, ডাক্তার ফ্রান্সিস প্রভৃতি তখনও হেষ্টিংসের বাগান বাটীতে ছিলেন—যদি ঐ বাটিটী কাছে হইত—তাহা হইলে চাকর পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনান হইত। আরও একটী কথা বারওয়েল সাহেবের বাটীর সান্নিধ্যে এই যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। বারওয়েলের বাটী বর্ত্তমান অর্ফেনেজ অধিকৃত স্থানে ধরিলে হেষ্টিংস হাউসকেই এই দূরত্বানুযায়ী, গবর্ণর সাহেবের বাগান বাটী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

§ পীয়ার্স সাহেব বলেন—ফ্রান্সিসকে রক্তাক্ত কলেবরে চীৎকার করিয়া ভূপতিত হইতে দেখিয়া, হেষ্টিংস উত্তেজিত অন্তঃকরণে নিম্ন লিখিত মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন—

এই ভয়ানক আঘাত হইতে আরোগ্য লাভের কয়েক মাস পরে, ফ্রান্সিস সাহেব কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া বাঙ্গালার নিকট চিরবিদায় লইয়া—স্বদেশ যাত্রা করিলেন। বিজয়-লক্ষ্মী হেষ্টিংসকে অসংকুচিত ভাবে আলিঙ্গন করিলেন—তি ন প্রফুল্ল চিত্তে, অপ্রতিহত প্রভাবে—প্রশান্ত অন্তকরণে কালহরণ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার মস্‌নদ, এক্ষণে তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ সুকোমল ও সুখময়—পথ কণ্টক শূন্য, মন্ত্রণাগৃহ প্রতিদ্বন্দ্বীশূন্য, ক্ষমতা প্রতিযোগী শূন্য, কার্য্য তীক্ষ্ণ সমালোচনা শূন্য—সুতরাং তিনি ফ্রান্সিসের বিদায়ে আনন্দনীরে ভাসিতে লাগিলেন এবং বন্ধু বান্ধবকে এই সংবাদ বিজ্ঞাপন করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিলেন। (১)

আর সেই উগ্রতেজ, প্রতিহিংসা পরায়ণ অভিমানী ফ্রান্সিস ! ! চাঁদপালের ঘাটে সপ্তদশ তোপের মুখে তাঁহার হৃদয়ে যে তীব্র অগ্নি জ্বলিয়াছিল তাহা তাঁহার বক্ষ নিঃসৃত শোনিতেই নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। হেষ্টিংস নিজে অনল জ্বালাইয়াছিলেন, শোনিতপাত করিয়া নিজেই তাহা নির্ব্বাপিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিযোগীর হৃদয়ের সূক্ষ্ম-তম প্রদেশে যে আর একটী জ্বালাময়, উগ্রতেজ সূক্ষ্ম অগ্নিশিখা ধূমায়িত ভাবে জ্বলিতেছিল তাহা হেষ্টিংস লক্ষ্য করিলেন না। এই অসাবধানতায় তাঁহার পরে সর্ব্ব-নাশ ঘটিয়াছিল।

অপমানিত—পরাভূত ও হতমান হইয়া ফ্রান্সিস স্বদেশ যাত্রা করিলেন—সেখানে নূতন বিধ মহা যজ্ঞের আয়োজন হইতেছিল। ফ্রান্সিসের সহায়তাকে বহুমূল্য ভাবিয়া আয়োজনকারীরা তাহাকে করায়ত্ত করিলেন। কতিপয় বৎসর কাল, ধূমায়িত অবস্থায় থাকিয়া—এই মহাযজ্ঞের অগ্নি কূটবুদ্ধি প্রতিহিংসা পরায়ণ ফ্রান্সিসের সহায়তায় একদিন দিগন্তব্যাপী শিখা বিস্তার করিয়া হেষ্টিংশকে গ্রাস করিল। হতভাগ্য হেষ্টিংস অনেক কষ্টে তাহার সেই ভীষণ যন্ত্রণাপ্রদ জ্বালাময়, অনল স্রাব হইতে মুক্তিলাভ করি-লেন। সুপ্রসিদ্ধ "ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হলে" এই যজ্ঞ কার্য্য সমাধা হইয়াছিল।

কলিকাতার সান্নিধ্যে আলিপুরের যেস্থলে, হেষ্টিংস ও ফ্রান্সিসের মধ্যে দ্বন্দযুদ্ধ ঘটিয়া-

---

"I hope and believe that the wound is not mortal but if any unfortunate accident shall happen it is my intention immediately to surrender myself to the sheriff. Col. Pearce' letter, Dated Octr 1780.

১ ফ্রান্সিসের স্বদেশ গমনে হেষ্টিংসের কতদূর আনন্দ হইয়াছিল নিম্নস্থিত কয়েকটি পংক্তি হইতে বিশেষ প্রমাণিত হইবে। "His (Francis') departure may be considered as the close of one complete period of my political life and the beginning of a new one. After a conflict of 6 years I enjoy the triumph of a decided victory ... ... I shall have no competitor to oppose my designs—to encourage disobediance to my authority and to excite and foment public hatred and odium against me."

ছিল সেইখানে দুইটী বড় বড় গাছ ছিল। এই দুইটী গাছ এখন আর দেখা যায় না। উল্লিখিত স্মরণীয় ঘটনার শোচনীয় স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ, শীত বাতাদির প্রভাব উপেক্ষা করিয়া এই দুইটী বৃক্ষ অনেক দিন ধরিয়া সেইস্থানে দণ্ডায়মান ছিল। যাঁহারা সেই পথে যাইতেন—তাঁহারা ঐ বৃক্ষ দুটীকে দেখিয়া "ধ্বংশ তরু" বা Tree of destruction বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতেন। কেন দেখাইতেন সে কথা বলিতে লেখক সম্পূর্ণ অক্ষম।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ পরমহংস দেবের জীবন চরিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই ঘটনার দশ বার দিন পরে ক্রমে ক্রমে অনেক লোক শুনিলেন যে, শিবনারায়ণ আহার করেন না, কেবল জল পান করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছেন; যে বাবুর নিকট শিবনারায়ণ চাকর ছিলেন সেই দেবিদাস বাবু এবং কয়েকজন পণ্ডিত আসিয়া শিবনারায়ণকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, অন্ন পরিত্যাগ করিয়া এমন ঘোর তপস্যার প্রয়োজন কি? শাস্ত্রে তো এমন কিছুই লেখা নাই। অন্নত্যাগ করিয়া জলপান করিতেছ, মরিয়া যাইবে, বাঁচিবে না; তুমি আহার কর তো আমরা অন্ন আনিয়া দিই কিম্বা আমাদের বাটীতে চল। শিবনারায়ণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। এই ঘটনার কিছু দিন পরেই দেবিদাস বাবুর মৃত্যু হওয়াতে সকলে মনে করিতে লাগিল শিবনারায়ণ অভিশাপ দিয়া দেবিদাস বাবুকে মারিয়াছে। শিবনারায়ণ দেব তখন দেখিলেন এই স্থান পরিত্যাগ করাই শ্রেয় এবং আপনার মনে বিচার করিয়া দেখিলেন যে গ্রামে গ্রামে ঘুরিলে ও সামান্য ব্যক্তির কাছে গেলে রাজা প্রজাদের আধ্যাত্মিক অথবা ব্যবহার কার্য্যের বিষয় কোন উপকার হইবে না। কোন সমর্থ রাজা অথবা পণ্ডিত ব্যক্তিকে সৎউপদেশ দিলে উপকার হইতে পারে কিন্তু আজকালকার রাজা পণ্ডিত ও মূর্খ সকলের মত একই রকম হইয়াছে। সত্য কথা ও সৎপথ বলিলে উহাদের অসৎ বিবেচনা হয়। সত্যের দিকে প্রবৃত্তি যায় না। যাহা হউক যখন অন্তর্যামী আমাকে আজ্ঞা দিয়াছেন তখন প্রথমে আমি কাশীর রাজাকে উত্তমরূপে বুঝাইব। তাঁহার বংশে অনেক পণ্ডিত আছেন। তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইবেন স্থির করিয়া শিবনারায়ণ কাশির রাজার কাছে রামনগরে রাজ-বাটীর দ্বারে গেলেন তাঁহার গায়ে একটী মাত্র ছেঁড়া চাদর ছিল। তাঁহার পাগলের মতন বেশ হইয়াছিল। তিনি দ্বারবানকে বলিলেন যে রাজাকে খবর দাও এবং বলিও একজন মনুষ্য

আসিয়াছেন তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ও পরমার্থ সম্বন্ধে কিছু কথা বার্ত্তা কহিবেন। আরও বলিও রাজা যেন কোন চিন্তা না করেন তাঁহার কোন ভয় নাই আমি কিছু যাচ্ঞা করিতে আসি নাই কেবল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আমার প্রয়োজন আছে। দ্বারবান বলিল তোর মতন কাঙ্গাল কত জন আসিতেছে যাইতেছে, কতজনের খবর আমি লইয়া যাইব। যে ব্যক্তি খবর লইয়া যায় সে ব্যক্তি এখানে নাই। আমি খবর লইয়া যাই না। সে আসিলে খবর দিতে পারে।

তখন সকাল হইতে তিন প্রহর পর্য্যন্ত সেখানে শিবনারায়ণ বসিয়া রহিলেন, কেহ রাজাকে খবর দিল না ও শিবনারায়ণকেও কিছু খবর দিল না। তখন রাজার একজন খানসামা আসিল। তাহাকে শিবনারায়ণ এই সকল কথা বলিলেন ও রাজাকে সংবাদ দিতে বলিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়া দিলেন রাজা যাহা বলেন তাহা আমাকে আসিয়া বলিও। রাজার নিকট খানসামা যাইয়া সংবাদ দিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন সে ব্যক্তি গৃহস্থ, পণ্ডিত না সাধু। ভৃত্য কহিল ইহার কোন চিহ্ন তাহার দেখা যায় না, সে অতি দরিদ্রের ন্যায়, তাহার গায়ে এক ছেঁড়া চাদর আছে। রাজা বলিলেন তাহাকে জিজ্ঞাসা কর যে—তুমি কে এবং তুমি কোন্ শাস্ত্র পড়িয়াছ এবং রাজার কাছে তোমার প্রয়োজন কি ?

খানসামা আসিয়া শিবনারায়ণকে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিল। শিবনারায়ণ বলিলেন—দেখিতেছ আমি মনুষ্য, আমি শাস্ত্র পড়িয়াছি কি না পড়িয়াছি তাহা তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে। রাজার কাছে যাইলে তিনি জানিতে পারিবেন, আমার অন্য কোন প্রয়োজন নাই কেবল সৃষ্টির কল্যাণ নিমিত্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু কথা বার্ত্তা আছে।

খানসামা যাইয়া রাজাকে সমস্ত বিবরণ জানাইলে রাজা বলিলেন—আমার একজন পণ্ডিত যাইয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রালোচনা করিবেন। যদি তিনি শাস্ত্রে পারগ হন ও আমার পণ্ডিত যদি তাঁহাকে এখানে আসিতে আজ্ঞা করেন তাহা হইলে আসিতে পারিবেন নচেৎ নহে।

সেই কথা খানসামা আসিয়া শিবনারায়ণকে কহিল এবং একটু পরে পণ্ডিত আসিয়া শিবনারায়ণের কাছে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন ?

শিবনারায়ণ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ধর্ম্মের স্বরূপ কি, ধর্ম্ম কাহাকে বলে, পৃথিবীতে কয়টা ধর্ম্ম আছে ?

পণ্ডিত বলিলেন—গৃহস্থ ব্রহ্মচারী এবং বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি ধর্ম্ম আছে। এই সকল ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

শিবনারায়ণ বলিলেন—এই চারি ধর্ম্মের ক্রিয়া কি ?

পণ্ডিত এই চারি ধর্ম্মের ক্রিয়া বলিয়া শুনাইয়া দিলেন। শিবনারায়ণ

বলিলেন—এই তো চারি ধর্ম্ম তুমি মুখস্থ করিয়া বলিয়া দিলে আমি ও চারি ধর্ম্মের কথা শিখিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি। যদ্যপি আমি সেই ধর্ম্ম পালন করি আর নাই করি আপনি কিরূপে জানিবেন। যদি আমি গেরুয়া বসন পরিয়া বলি যে আমার এই ধর্ম্ম,—আমার গায়ে তো কোন ধর্ম্মের চিহ্ন লেখা নাই। আমি যদি বলি যে আমার হাড় চামড়ার নাম সন্ন্যাসী তাহা হইলে তো সকল গৃহস্থের শরীরে হাড় চামড়া আছে আর যদি ইন্দ্রিয়ের নাম সন্ন্যাসী হয় তাহা হইলে তো সকল মনুষ্যের ইন্দ্রিয় আছে আর যদি বাক্যের নাম সন্ন্যাসী হয় তাহা হইলে সকলেই তো বাক্য বলিতেছে তবে সন্ন্যাসী কাহাকে বলে?

পণ্ডিত বলিলেন—সন্ন্যাসী মহাত্মাদের লক্ষণ সকল শাস্ত্রে লেখা আছে সেই লক্ষণ দ্বারা জানা যায়।

শিবনারায়ণ বলিলেন—আপনি যে চারি ধর্ম্মের কথা বলিলেন তাহার লক্ষণ যদি কোন ব্যক্তি শাস্ত্রানুযায়ী অভ্যাস করিয়া বহির্মুখে দেখায় তাহা হইলে তাহার অন্তরের ভাব যে কিরূপ তাহা আপনি কিরূপে বুঝিবেন?

পণ্ডিত বলিলেন যে—তাহা বটে কিন্তু কোন একটা ভাব কোন না কোন প্রকারে বোধ হইতে পারে।

পণ্ডিত শিবনারায়ণকে বলিলেন—আপনি সংস্কৃত পড়িয়াছেন এবং কোন্ কোন্ শাস্ত্র আপনি অধ্যয়ন করিয়াছেন?

শিবনারায়ণ বলিলেন—আমি সংস্কৃত পড়ি নাই তবে যৎকিঞ্চিৎ পড়িয়াছি এবং নানা শাস্ত্রও ভালরূপ দেখি নাই তবে অল্প অল্প দেখিয়াছি।

পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার চক্ষেতে শীত লাগে কি না লাগে? শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন—যে মহান্ পণ্ডিত এখন আমার পরীক্ষা লইতে লাগিলেন। পরে বলিলেন যে-স্থূল ভাবে যে সকল ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান তাহাদের শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ বোধ হয় কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে সূক্ষ্ম জ্যোতি তেজরূপ থাকেন অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা তাঁহার শীত উষ্ণ দুঃখ সুখ হয় না এবং লাগে না।

পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি দেবতা দেবী কালী দুর্গা শিব বিষ্ণু ভগবান ইত্যাদিকে মানেন কি না?

শিবনারায়ণ বলিলেন—আমি মানি কি না মানি তাহা জিজ্ঞাসা করিবার কারণটা কি? আমি মানি অথবা না মানি; আমি সকলকেই মানি অথবা নাও মানি। এখানে বিচার করিয়া দেখিতে হয় যে দেবতা দেবী শিব দুর্গা কালী বিষ্ণু ভগবান কাহাকে বলে এবং তাঁহাদের স্বরূপ কি ও তাঁহারা কোথায় থাকেন তাঁহারা নিরাকার না সাকার। যদ্যপি নিরাকার হন তাহা হইলে তো নিরাকারের রূপ নাই। দেখা যাইবে না। সকলেই বলে নিরাকার পরব্রহ্ম। যদ্যপি সাকার হন তাঁহা হইলে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবেন। যেমন

সূর্য্যনারায়ণ দেখা যাইতেছেন। পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ-স্বরূপ এই তো সাকার ব্রহ্ম। ইহাঁরা ব্যতীত কেহ হয় নাই হইতেও পারিবে না। যদ্যপি ইহাঁরা ভিন্ন কালী দুর্গা শিব বিষ্ণু তোমাদের দেবতা দেবী হন তাহা হইলে তাঁহারা কোথায় আছেন তাহা আমাকে দেখাইয়া দিন ও কাহাকে বলে তাহাও আমাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আমি মানিব। আর যিনি সাকার ব্রহ্ম তাঁহাকে তো আমি মানি।

পণ্ডিত বলিলেন—বিষ্ণু ভগবান বৈকুণ্ঠে আছেন এবং ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে আছেন এবং দুর্গা শিব কৈলাসে ও কাশীতে আছেন, তোমাকে কি প্রকারে দেখাইব।

শিবনারায়ণ বলিলেন যদি তাঁহারা আপন আপন বাটিতে থাকেন তাহা হইলে এই সৃষ্টি চরাচরের কাজ কি রূপে চলিতেছে, উৎপত্তি পালন ও লয় অন্তর হইতে প্রেরণা করিয়া কে কার্য্য করাইতেছেন। যদ্যপি তোমার মধ্যে তিনি না থাকেন তাহা হইলে তুমি যে পাপ পুণ্য করিতেছ কে বুঝিবে এবং তিনি যদি তোমার মধ্যে না থাকেন তাহা হইলে তোমার দুঃখ মোচন করিয়া কে সুখ প্রদান করিবে? পণ্ডিত বলিলেন—তাহা বটে কিন্তু আমাদের কাছে গুপ্ত ভাবেতে তিনি আছেন কিন্তু কাশীর মধ্যে প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন।

শিবনারায়ণ বলিলেন—কাশী কাহাকে বলে এবং কাশী বস্তুত কি এবং স্বরূপ কি এবং কিরূপে কাশীতে শিব বিরাজমান আছেন? মনুষ্য রূপে কিম্বা মৃত্তিকা কাষ্ঠ প্রস্তর রূপে বিরাজমান আছেন? যদ্যপি মনুষ্য রূপে থাকেন তাহা হইলে আমাকে দেখাইয়া দাও নতুবা বুঝাইয়া দাও। কিম্বা যদি বল যে মৃত্তিকা কাষ্ঠ ও প্রস্তর রূপে বিরাজমান আছেন তাহা হইলে তো পৃথিবীতে নানা দেশে নানা স্থানে মৃত্তিকা কাষ্ঠ প্রস্তর পড়িয়া আছে তাহা হইলে তো সকল স্থানেই শিব বিরাজমান আছেন। যদ্যপি তোমরা মৃত্তিকা কাষ্ঠ প্রস্তর ইত্যাদি ধাতুকে শিব বল তাহা হইলে তো তাহাদিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে, তবে শিবের কি নাশ আছে তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন। শিব দেবতা দেবী কি বস্তু হইয়া বিরাজমান আছেন, জল রূপে কিম্বা অগ্নি রূপে, বায়ু রূপে কি চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ রূপে, কি রূপে বিরাজমান আছেন তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেও। যদি এইরূপে বিরাজমান থাকেন তাহা হইলে তো সকল স্থানেই তাঁহারা বিরাজমান আছেন তবে এখানে ওখানে যাইবার প্রয়োজন কি। শিবনারায়ণ আরও বলিলেন যে হে পণ্ডিত তর্ক বিতর্ক এবং মান অপমান জয় পরাজয় পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীরভাবে বিচার পূর্ব্বক আপনার ইষ্ট পরমাত্মা অন্তর্যামীকে চিন অথবা ত্রিগুণ আত্মা সাকার ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে চেন যাঁহার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নাম কল্পনা করা হইয়াছে। এই জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে জানিলে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে না। ইনি তোমাদের সকল ভ্রম এবং কষ্ট নিবারণ করিয়া আনন্দরূপ থাকিবেন। আর

ভ্রমে পতিত হইও না ও রাজা প্রজাকে ভ্রমে পাতিত করিও না। বিচার করিয়া আপনার ইষ্টকে চেন।

পণ্ডিত আপনার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে এ লোকটা কে যে সকলকে উড়াইয়া দিতেছে। যদ্যপি এ লোকটাকে রাজার কাছে লইয়া যাই তাহা হইলে এ সকল বিষয় খুলিয়া বলিবে ও তাহাতে আমরা যেরূপে রাজা প্রজাদিগকে বুঝাইয়া রাখিয়াছি তাহাতে এই সকল বিষয় প্রকাশ করিলে আমাদের অন্ন মারা যাইবে এবং মান থাকিবে না। পণ্ডিত মনে মনে এই বিচার করিলেন এ লোকটাকে কোন উপায়ে এখান হইতে তাড়াইলে ভাল হয়। পণ্ডিত এই বুঝিয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন তুমি এখন এখানে বসিয়া থাক আমি রাজাকে জানাই। তিনি হুকুম দিলে তবে তুমি সেখানে যাইতে পাইবে। শিবনারায়ণ সেইখানে বসিয়া রহিলেন। সেই সময় দ্বারের দ্বারবানেরা পরস্পর বলাবলি করিতেছিল যে মহারাজ এক দিবস বলিতেছিলেন যে আমার কাশী রাজ্য মধ্যে এমন কোন মহাত্মা সিদ্ধ পুরুষ জন্মাইলেন না যে এই সৃষ্টির রাজা প্রজার কষ্ট নিবারণ করেন। পণ্ডিত রাজার কাছে যাইয়া যাহা বলিলেন তাহা পণ্ডিত জানেন আর রাজা জানেন। কিন্তু একজন দ্বারবান আসিয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন এখানে অপর ব্যক্তির থাকিবার রাজার হুকুম নাই, তুমি উঠিয়া যাও। শিবনারায়ণ বলিলেন যে এখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রাত্রিকাল এখানে বিশ্রাম করিয়া প্রাতঃকালে চলিয়া যাইব। দ্বারবান বলিল উঠিয়া যাও নতুবা পুলিষে দিব। শিবনারায়ণ দেখিলেন যে আজ কাল রাজা প্রজা পণ্ডিতদিগের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়াছে এখান হইতে উঠিয়া যাওয়া ভাল। যদি পণ্ডিতগণের বুদ্ধি ভাল হয় তাহা হইলে রাজাদের বুদ্ধি ভাল হয় তাহা হইলে প্রজাদেরও বুদ্ধি ভাল হইতে পারে। এই বলিয়া শিবনারায়ণ সেখান হইতে উঠিয়া রামনগরে যেখানে রামলীলা হয় সেই পুষ্করিণীর ঘাটে আসিয়া বসিলেন কিন্তু দুই দিন শিবনারায়ণের আহার হয় নাই। রাজার দ্বারে দিনভোর বসিয়া রহিলেন্ কিন্তু কি রাজা কি রাজপ্রেরিত পণ্ডিত কেহই একটু জল খাইয়াছ কি না জিজ্ঞাসা করিলেন না। রাজারা কোন বিষয় যথার্থ বিচার করিয়া কার্য্য করেন না কেবল অপরের দ্বারা চালিত হয়েন এই নিমিত্ত রাজ্যের নাশ হয় এবং লোকে কষ্ট পান।

সেই পুষ্করিণীর ধারে এক জন সন্ন্যাসী কয়েক জন শিষ্য লইয়া বসিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাদের অত্যন্ত সম্মান পূর্ব্বক প্রতিদিন সেবা করিতেন শিবনারায়ণ সেই ঘাটে বসিয়া দেখিলেন যে এক জন মহাত্মা বসিয়া আছেন এবং বলিলেন যে ইহাঁর কাছে যাইয়া দেখি যে ইহাঁর ভাব কি। শিবনারায়ণ সেখানে যাইয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইবা মাত্র তাঁহার চেলা বলিল (তোম্ কোন্ হ্যায়) (হিঁয়া কেঁও আয়া) অর্থাৎ তুই কে, এখানে কেন আইলি?

শিবনারায়ণ বলিলেন—আমি মনুষ্য আপনাকে মনুষ্য জানিয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। এক জন চেলা বলিল (বেটা, দেখতা হ্যায় তোম আদমি, তু গৃহস্থ হ্যায় না তু সাধু) অর্থাৎ আমি তোকে দেখিতেছি যে তুই মনুষ্য, তবে তুই গৃহস্থ না সাধু।

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন—যে গৃহস্থ আর সাধু তো শুনিতেছি, কিন্তু কাহাকে বলে তাহা জানি না।

তখন সেই স্থানের যিনি মহাত্মা, তিনি বলিলেন যে উহাকে এখানে ধরিয়া আন, গৃহস্থ এবং সাধু কাহাকে বলে দেখাইতেছি।

শিবনারায়ণকে চেলা ধরিয়া তাঁহার গুরুর কাছে লইয়া গেল, শিবনারায়ণ সেখানে সেই মোহান্তের কাছে যাইয়া বসিলেন। মোহান্ত সন্ন্যাসী বলিলেন যে, তুই গৃহস্থ আর সাধু মহাত্মা জানিস না? এত মহাপুরুষ বসিয়া আছে দেখিতে পাইতেছিস না? আমরা দশনামী, গিরি, পুরি, ভারতী, শৃঙ্গারি মঠ; আমরা সন্ন্যাসী, দণ্ডী; আমাদের মধ্যে মাড়াই, মঠ, চুলা, চাকি আছে তুই জানিস না। শ্রীবিষ্ণু রামাওত, নিমাওত, মাধবাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী, উহাঁর মধ্যে পঞ্চ সংস্কার ধাম ছত্র ও ইষ্ট এই সব আছে তুই জানিস না?

তখন শিবনারায়ণ বলিলেন—গৃহস্থ ধর্ম্মেতেই তো লেজ ছিল, কিন্তু আপনি মহাত্মা হইয়াও এত লেজ বাহির করিয়া রাখিয়াছেন? অর্থাৎ গৃহস্থ ধর্ম্মে যখন আপনি ছিলেন তখন আপনি তো বলিতেন যে আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষেত্রি, আমার এই গোত্র, আমি এই সম্প্রদায়, আমি কান্যকুব্জ, আমার এই শাখা, আমার এই সূত্র। এই সকল উপাধি যখন আপনি ত্যাগ করিয়া সৎ পথের জন্য মাথা মুড়াইলেন তখন আবার এই নানা উপাধি জড়াইলেন কেন? যাহা গৃহস্থ ধর্ম্ম অপেক্ষাও বেশি? আপনি বলিলেন—আমি সন্ন্যাসী, শৃঙ্গারি মঠের আমি গিরি, পুরি, আমার এই মাড়াই মঠ ইত্যাদি, ইনি আমার গুরু, উনি আমার গুরু ভাই, ইহা অপেক্ষা তো গৃহস্থ ধর্ম্ম ভাল।

তখন সন্ন্যাসী রাগ করিয়া বলিলেন যে, বেটা! গৃহস্থ কেমন করিয়া ভাল হইল? গার্হস্থ্য অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য ভাল, ব্রহ্মচর্য্য হইতে বান্‌প্রস্থ, বান্‌প্রস্থ হইতে সন্ন্যাস, সন্ন্যাস হইতে পরমহংস পদ শ্রেষ্ঠ। গৃহস্থ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলাম, ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করিয়া বান্‌প্রস্থ লইলাম বান্‌প্রস্থ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম লইলাম, সন্ন্যাস ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরমহংস হইলাম, গৃহস্থ অপেক্ষা আমি শ্রেষ্ঠ। তখন শিবনারায়ণ বলিলেন যে, হে মহাত্মা! আপনি আমার কথাতে রাগ করিবেন না। গম্ভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখুন যে আপনি যখন গৃহস্থ ধর্ম্মে ছিলেন, তখনও যাহা ছিলেন—এখনো তাহাই আছেন। তখন আপনার এই স্থূল শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। তখনও এই পৃথিবীর উপর চলিতেছিলেন এখনও এই পৃথিবীর উপর চলিতেছেন। আপনি যেখানে যাইতেছেন সেইখানেই তো পঞ্চতত্ত্ব আপনার শরীরে লগ্ন আছে, তবে গৃহস্থ ধর্ম্মের কোন্ বস্তু আপনি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন এবং ব্রহ্ম-

চর্য্যের বা কোন্ বস্তু ত্যাগ করিয়া বান্‌প্রস্থ অবলম্বন করিলেন এবং বান্‌প্রস্থের বা কি বস্তু ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং সন্ন্যাস ধর্ম্মের বা কোন্ বস্তু ত্যাগ করিয়া পরমহংস হইলেন? পরমহংস কি বস্তু? আপনার পূর্ব্বে যে স্থূল শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি ছিল, এখন ও তো তাহাই আছে এবং আপনি যে বস্তু গৃহস্থ ধর্ম্মে ছিলেন সেই বস্তু আপনি এখনও আছেন। তবে কোন্ বস্তুকে আপনি ত্যাগ করিয়া কোন্ বস্তুকে আপনি গ্রহণ করিলেন? কেবল নানা নাম মাত্র আপনি গ্রহণ করিলেন। সে বস্তুটা কি কেবল মনের নানা ভ্রম মাত্র? আপনি তো গৃহস্থ ধর্ম্মে যাহা ছিলেন এখনও তাহাই আছেন। কেবল গৃহস্থ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি মার্গে ছিলেন, এখন নিবৃত্তি মার্গ গ্রহণ করিয়াছেন, যদি নিবৃত্ত হইতে পারেন। স্বরূপেতে তো গৃহস্থ সন্ন্যাসী পরমহংস নাই। স্বরূপেতে যাহা তাহাই থাকে। কিন্তু গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়া যে ব্যক্তি নিবৃত্তি প্রবৃত্তি উভয়ে সমভাবে থাকেন তিনি বীর পুরুষ। কাপুরুষ ব্যক্তি প্রবৃত্তি দেখিয়া পলায়ন করে, প্রবৃত্তি সহ্য করিতে পারে না। প্রবৃত্তি নিবৃত্তির কেবল অবস্থা গুণ ক্রিয়া পরিবর্ত্তন হয়, যেরূপ স্বপ্ন অবস্থা লয় হইয়া জাগ্রত অবস্থা হয়। পুরুষ তিন অবস্থাতে একই থাকে, তাহার স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যদ্যপি আমি আপনাকে ইহার মধ্যে কোন অন্যায় অযথা বাক্য বলিয়া থাকি তাহা আপনি অনুগ্রহ করিয়া ভাল করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিন।

সন্ন্যাসী মহাত্মা বলিলেন যে, তুই অনেক ভুল কথা বলিয়াছিস্। যদি তুই আমার চেলা হইস্ তো তোকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব। বড় বড় মহান্ পণ্ডিত ও বড় বড় রাজা আমার চেলা।

শিবনারায়ণ বলিলেন, হে মহাত্মা পুরুষ! গুরু এবং চেলা কাহাকে বলে?

তখন মহাত্মা রাগিয়া বলিলেন—বেটা তুই আমায় চিনিতে পারিতেছিস না? আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছিস? তোকে আমি ভস্ম করিয়া ফেলিব।

শিবনারায়ণ বলিলেন যে, আপনাকে তো জানিতে পারিতেছি আপনি কি না করিতে পারেন. কিন্তু আমি আমার গাত্রের লোম একটা আপনাকে উৎপাটন করিয়া দিতেছি অগ্রে তাহাকে ভস্ম করুন, তবে পশ্চাতে আমাকে ভস্ম করিবেন। আপনি এতদিন পর্য্যন্ত কি কাহাকেও ভস্ম করিয়াছেন? হে মহাত্মন্! ভস্ম হইবার পুরুষ কি কেহ আছেন? ভস্ম কি কেহ কাহাকে করিতে পারেন? তবে কেন মিছা ভ্রমে পতিত হইয়া আছেন। অগ্নি কি কখন অগ্নিকে ভস্ম করিতে পারেন। হে মহাত্মন! শাস্ত্রের পঠিত অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মার শরণাপন্ন হউন, যাহাতে অহঙ্কার নিবৃত্তি হইয়া সদা আনন্দরূপ থাকিবেন। সৎ পথে যাইলে সকল ভ্রম কষ্ট নিবারণ হয়।

তখন সেই সন্ন্যাসী মহাত্মা বলিলেন যে, মহাশয় আপনি কে? আপনি যে এত

জ্ঞানের কথা বলিলেন আপনি কে? আপনি সাধু না পরমহংস, আপনার তো কোন চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না।

শিবনারায়ণ বলিলেন যে, আমি কে এবং তুমি যে কে আমি কি বলিব, যাহা আছি তাহাই। কেবল বলিতে গেলে, আমিও মনুষ্য তুমিও মনুষ্য।

তখন সেই মহাত্মা শিবনারায়ণকে বলিলেন যে, আপনাকে চিনিতে না পারিয়া অনেক কটু কাটব্য বলিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি আপনাকে ওঁ নমঃ নারায়ণায় নমঃ নারায়ণায় নমঃ বলিয়া প্রণাম করিতেছি। তখন শিবনারায়ণ আপনার মনে মনে বলিলেন যে—যত রাজা প্রজা পণ্ডিত এবং সাধুদিগের তো এই গতি হইয়াছে। পরব্রহ্ম সম্বন্ধে কেহ কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেন না। যে যে স্থানে যাই সেই সেই স্থানেতে যদ্যপি কোন পণ্ডিতের সহিত দেখা হয় তাহা হইলে সেই পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করেন তুমি শাস্ত্র পড়িয়াছ, এই কথার শব্দ অর্থ জান? যদি বলি জানি, তাহা হইলে সেই পণ্ডিত যাহাতে আমি পরাজিত হই তাহার জন্য ও যাহাতে আপনার মান বৃদ্ধি হয় তাহার জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু যদি বলি যে পড়ি নাই, তাহা হইলে সেই পণ্ডিত বলেন যে তুই মূর্খ, এই বলিয়া তাড়াইয়া দেন। কোন সাধুর নিকট যদি যাই, তাহা হইলে সেই সাধু জিজ্ঞাসা করেন যে তুই কোন্ মঠের এবং কোন সম্প্রদায়ের সাধু? তুই কি কি জানিস, তুই কিছু ভস্ম টস্ম করিতে পারিস, সোনা, রূপা, কিমিয়া? যদ্যপি বলি আমি কিছু জানিনা, আমি কোন সম্প্রদায়ের সাধু নহি। এই কথা শুনিয়া তাহারা বলে যে এ তো আমার সম্প্রদায়ের সাধু নয়, বেটাকে তাড়াইয়া দেও। যদ্যপি রাজার নিকট সৎউপদেশ দিবার জন্য যাই তাহা হইলে কোন রাজা তো আমার সম্মুখে আসেন না, পাছে কিছু যাচ্ঞা করি। যদ্যপি কেহ আসেন তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কোন্ বিষয়ে সিদ্ধ হইয়াছ? সিদ্ধ হইয়া থাক তো আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যাহাতে আমার পুত্র হয় ও রাজ্য বৃদ্ধি হয়। (কেহ শিবনারায়ণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন আমি কি আগে অসিদ্ধ ছিলাম যে এখন সিদ্ধ হইব, যাহা আগে ছিলাম তাহা এখন ও আছি, সিদ্ধও হই নাই, অসিদ্ধও হই নাই, যাহা তাহাই আছি। সিদ্ধ অসিদ্ধ হইবারও কোন আয়োজন নাই। রাজারা ইহা শুনিয়া তাড়াইয়া দেয়, যে তুমি কিছু জাননা, যাও।) যদি প্রজার নিকট যাই তাহা হইলে প্রজারা তো দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইতে দেয় না। যদ্যপি কেহ কেহ দাঁড়াইতে দেয় তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করে তুই কি গৃহস্থ না সাধু? যদি বলি যে আমি সাধু তাহা হইলে সে গৃহস্থ বলে তুমি কোন ঔষধ জান? অথবা আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে আমার পুত্র হয় ও ধন হয়। ধন হইলে তোমাকে সেবা করিব।

শিবনারায়ণ মনে মনে বলিতেন যে সকলের বুদ্ধি একবারে অসৎ পদার্থে ভ্রষ্ট হইয়া

গিয়াছে। সকলেই ধন, রাজ্য, পুত্র ইত্যাদি সুখ আকাঙ্ক্ষা করে এবং চাহে। কিন্তু পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ গুরু আত্মা মাতা পিতাকে কেহ পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে না ও চাহে না। সুর নর মুনির এই রীতি। স্বার্থ লাভের জন্য প্রীতি। শিবনারায়ণ মনে মনে বিচার করিয়া বলিলেন যাহা হউক এখন যেখানে যাইতেছি সেই খানেই তো এইরূপ ঘটিতেছে এখন ক্ষত্রিয় কুলে যাই দেখি ইহাঁরা কি করেন। কেন না ইহাঁরাই চিরকাল সত্য ধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছেন। শিবনারায়ণ এই ভাবিয়া কাশী হইতে পূর্ব্ব মুখে ডুমম্‌রাওবঁ নিকট চৌগাঁই গ্রামের বাবুর নিকট গেলেন। চৌগাঁয়ের বাবুর কন্যার সেই দিবস বিবাহ ছিল। পশ্চিম হইতে এক বাবু অত্যন্ত ধুম্‌ধামে হাতি ঘোড়া ইত্যাদি লইয়া বিবাহ করিতে আসিয়াছিল। এক বাগান তাহারা আশ্রয় করিল। শিবনারায়ণ দ্বারে যাইয়া দেখিলেন বাবুরা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। শিবনারায়ণ বলিলেন, যে আপনারা বিবাহের জন্য এখন ব্যস্ত আছেন, তাহার জন্য সত্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা হইল না। কিন্তু আমি বাগানের অমুক স্থানে যাইয়া বসিয়াছি যখন তোমাদের সাবকাশ হয় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। দুই চারি কথা বলিয়া আমি শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাইব। আমি অধিক দিন এখানে থাকিব না। চৌগাঁয়ের বাবু বলিলেন বেটা, যাব কি না যাব জানি না, তুই যা। তোর মত পাগল এখানে অনেক আছে। শিবনারায়ণ সেই বাগানে যে সকল বরযাত্রিগণ আছে সেই সকল দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বরের পিতা যেখানে বসিয়াছেন সেইখানে দুই চারি জন মহাত্মা লোক কাশী হইতে আসিয়া বসিয়া ছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন মহাত্মা শিবনারায়ণকে এদিকে ওদিকে বেড়াইতে দেখিয়া বরকর্ত্তা বাবুকে বলিলেন— যে ও বেটা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ও বেটা চোর, কিছু সোনা রূপার দ্রব্য গহনা কিম্বা আর কিছু লইয়া পলাইয়া যাইবে। উহাকে এখান হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। তখন মহাত্মার কথা শুনিয়া বাবু দুই জন দ্বারবানকে হুকুম দিল যে ঐ ব্যক্তি ঘুরিতেছে, উহাকে ধরিয়া এখানে আন। দুইজন দ্বারবান তখন শিবনারায়ণের দুই হাত ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বাবুর নিকট লইয়া গেল। বাবু বলিলেন যে—তুই কে? শিবনারায়ণ বলিলেন আমি মনুষ্য—আদমি। বাবু বলিল—বেটা তুই সত্য সত্য বল্‌ নতুবা তোর হাড় চূর্ণ করিব। এবং দ্বারবানকে হুকুম দিলেন যে—বেটা যদি না বলে তাহা হইলে তরবাল আনিয়া ইহার হাত পা কাটিয়া লও। তখন একজন মহাত্মা বলিলেন যে বাবু চোরকে আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বেটাকে দুই চারি থাবড়া মারিয়া বাহির করিয়া দেন। সেই কথা শুনিয়া বাবু দ্বারবানদের হুকুম দিলেন। দ্বারবানরা সেই হুকুম শুনিয়া শিবনারায়ণকে গলাধাক্কা দিতে দিতে আধ ক্রোশ দূরে তাড়াইয়া দিল।

ক্রমশঃ।

মহাযজ্ঞ।

পঞ্চম বর্ষ।

উদ্বোধন। প্রথম প্রস্তাব।

বিগতবর্ষে পুণ্যভূমি ত্রিবেণী তীর্থে 'স্বর্গাদপি গরিয়সী' জন্মভূমির পূজা উপলক্ষে যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, ভারতীর সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ তাহার আদ্যন্ত বিবরণ অবগত হইয়াছেন। সংপ্রতি আরব সমুদ্রের বেলাভূমি বোম্বাইনগরে জননীর পূজার জন্য পুনরায় ষোড়শোপচারে যে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত ও সুসম্পাদিত হইয়াছে, প্রিয় পাঠক সমাজে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। চারি বৎসর পূর্ব্বে সুবিস্তৃত ভারত ভূমির বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোটি কোটি অধিবাসীর রাজনৈতিক একতা বা এক প্রাণতা সাধন ও অন্য বহুবিধ মঙ্গল বিধান উদ্দেশে কমলা ও বরদার বিহার ক্ষেত্র এই সুপ্রসিদ্ধ নগরে কতিপয় স্বদেশ প্রেমিক সুসন্তানের প্রাণগত যত্নে জননীর পূজার জন্য উক্ত মহাযজ্ঞের প্রথম আয়োজন ও অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে উহার মহত্ত্ব ও গৌরব সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে এই মহাযজ্ঞের মঙ্গলময় উদ্দেশ্য বিফল করিবার জন্য একদল ক্ষমতাশালী স্বদেশদ্রোহী সন্তান কতিপয় উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সহায়তায় কতই বিদ্রোহাচরণ ও অনর্থ সংঘটন করিয়াছিলেন। কত বাধা, কত বিঘ্ন ও কত বিপত্তি অতিক্রম করিয়া মহাতীর্থ প্রয়াগভূমির চতুর্থ মহাযজ্ঞ মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা এখনও স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই স্মৃতি পথে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

পুণ্যতোয়া ভাগীরথী, প্রসন্ন সলিলা কালিন্দী ও সুরনদী সরস্বতীর পবিত্র সঙ্গমস্থল নিষ্ঠাবান আর্য্যঋষিগণের পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থ—ত্রিবেণী সঙ্গম মহাতীর্থে গতবর্ষে এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে বোধ হয় পরলোকগত প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যঋষিগণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের অধম সন্তানগণের প্রতি শুভ বরদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পরমারাধ্য দেবতাগণ দিব্যধাম হইতে লোকচক্ষুর অগোচরে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের প্রতি পবিত্র শান্তি বারি বর্ষণ করিয়াছিলেন; অন্যথা অপর কোন্ অলৌকিক অলক্ষিত শক্তির অব্যর্থ স্ফুরণে উহা মনমুগ্ধকর উৎকর্ষসম্পন্ন ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সম্পাদিত এবং উহার অব্যবহিত পরেই উহার উদ্দেশ্য-পথ কণ্টক-পরিশূন্য ও জ্যোতিময় ভাব ধারণ করিতে সমর্থ হইল? চতুর্থ মহাযজ্ঞের অবসানে ভারত গগন মেঘ শূন্য হইয়া নয়ন রঞ্জন সুবিমল কান্তি ধারণ করিয়াছে। অন্ধকার স্বীয় কালিমাময় কুৎসিৎ অবয়ব লুকাইবার উপযুক্ত স্থান না পাইয়া উজ্জ্বল আলোকের পদচিহ্ন অনুসরণে দূরে পলায়ন করিয়াছে! বিদ্রোহী

দলের তীব্র কোলাহল ও কলঙ্কিত অপকার্য্যের ঘৃণিত কাহিনী আর শ্রুতি গোচর হয় না! আলিগড়-ভূষণ স্বনাম-ধন্য সৈয়দ আমেদের অত্যুগ্র হলাহল-বর্ষণশীল রসনা দীর্ঘকাল হইতে প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে, প্রসাদ-লোলুপ ভীঙ্গরাজের ব্যঙ্গোক্তি-পূর্ণ বাক্য নিস্তব্ধ হইয়াছে, বিপথে পরিচালিত কাশিরাজ ইহলোক পরিত্যাগ পুরঃসর কাশীনাথ বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন, এবং তাঁহার অবিদ্যমানে তাঁহার প্রসাদ-ভিখারী ক্ষাণ-প্রাণ শিবপ্রসাদের আশব কোলাহল চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়াছে, স্বার্থান্ধ বিদেশীয়গণের কূট মন্ত্রণা-মুগ্ধ বিভ্রান্ত স্বদেশ-দ্রোহিগণের সাধের 'স্বদেশভক্ত-সমিতির' (United Patriotic Association) অস্তিত্ব অকালে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং সর্ব্বোপরি ভারত গভর্ণমেণ্টের শীর্ষস্থানীয় কূট রাজনীতি বিশারদ মহামতি লর্ড ডফারিণ রোম নগরীর দৌত্যকার্য্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে পর আর কোন উচ্চপদস্থ ক্ষমতাশালী রাজকর্ম্মচারী নব ভারতের বিকাশোন্মুখ জাতীয় জীবনের উচ্ছেদ কামনায় কোন অসার বাক্যের সমর্থন করেন নাই। গতবর্ষে যজ্ঞ ভূমি সংগ্রহের জন্য জাতীয় মহাসমিতির প্রধান নেতাগণকে যেরূপ বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছিল, তাহা মনে হইলে এখনও ব্যথিত হইতে হয়। দেবতার আশীর্ব্বাদে এ বৎসর উহার জন্য তাঁহাদিগকে কোন কষ্টই ভোগ করিতে হয় নাই। এবার সমস্তই তাঁহাদের অনুকূল—আরাধ্যা জননীর যথাবিহিত পূজার আয়োজন করিতে তাঁহারা কিছুরই অভাব অনুভব করেন নাই।

বিগতবর্ষে যজ্ঞস্থলে প্রতিনিধি ও দর্শক মণ্ডলীর সংখ্যার আধিক্য প্রযুক্ত এবৎসর যজ্ঞ-গৃহ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকারে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। গতবর্ষের মণ্ডপ দৈর্ঘ্যে ১৫০ ফুট এবং প্রস্থে ১০০ ফুট; এ বৎসর উহা দৈর্ঘ্যে ২০০ ফুট ও প্রস্থে ১৩০ ফুট। গতবর্ষের ন্যায় উহা বিবিধ কারুকার্য্য শোভিত সার্দ্ধশত সুদৃশ্য স্তম্ভোপরি সুন্দররূপে নির্ম্মিত এবং বিবিধ নয়ন রঞ্জন পত্র, পুষ্প, পতাকা, চিত্রালেখ্য ও আলোক মালায় বিভূষিত এবং পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। গতবর্ষে ভারতের বিভিন্ন বিভাগ ও প্রদেশের নানা ধর্ম্মাবলম্বী কোটি কোটি লোকের প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রায় সার্দ্ধসহস্র সুশিক্ষিত ও সহৃদয় প্রতিনিধি এবং প্রায় তিন সহস্র দর্শক জননীর পূজায় যোগদান করিয়াছিলেন; এবৎসর দ্বিসহস্রাধিক প্রতিনিধি ও পঞ্চ সহস্রাধিক দর্শক জননীর কল্যাণ উদ্দেশে মহাযজ্ঞে এক প্রাণে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। শত শতবর্ষের জাতিগত কঠোর পার্থক্য ধর্ম্ম বিভিন্নতা, সাম্প্রদায়িক অনৈক্য ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় বৈলক্ষণ্য প্রভাবে বিশাল ভারতের কোটি কোটি সন্তান পরস্পরের প্রতি স্নেহ মমতা শূন্য ও সহানুভূতি বিহীন ভাবে অবস্থিতি নিবন্ধন স্বদেশের দুরবস্থার প্রতি একরূপ উদাসীন ছিলেন। আজি পাশ্চাত্য শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি প্রভাবে এবং ইংলণ্ডের সুশাসন ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে তাঁহাদের মনোনীত সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত প্রতিনিধি—জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায় ও

আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিভিন্নতা আরব সাগরের অতলজলে বিসর্জ্জন দিয়া রাজনৈতিক শৌর্য্য ও সম্পদ লাভ ও স্বস্ব সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন কামনায় একস্থানে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব মহাসাধনায় দীক্ষিত হইয়াছেন, এই দেব জন স্পৃহনীয় প্রাণ-মুগ্ধকর পবিত্র দৃশ্য দর্শনে কাহার না হৃদয় অপার বিস্ময়ে আপ্লুত হয়? ধন্য হিউম্—ধন্য নবভারতের দীক্ষা-গুরু মহাযোগী! তোমার বীরত্ব অতুলনীয়—তুমি বিশাল ভারতের নানা জাতীয় নানাধর্ম্মাক্রান্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোটি প্রাণ একসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছ। ইংলণ্ডের উদার শাসন প্রণালীর মোহিনী শক্তি ও সুশিক্ষার জলন্ত আলোকে ভারতবাসীর জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে, অনেকদিন হইতে তাহারা স্বদেশের দুর্গতি ও স্ব স্ব অবস্থাগত বৈষম্য জনিত বেদনা বোধ করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত নেতা অভাবে এতদিন তাহারা প্রকৃত স্বদেশ হিতকর বিষয় অবধারণে অক্ষম এবং জাতীয় জীবনের প্রশস্তবর্ত্মে বিচরণে অসমর্থ হইয়া জড়ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। শুভদিনে শুভক্ষণে তুমিই তাহাদের প্রকৃত উন্নতি পথ প্রদর্শক রূপে তাহাদের হৃদয়ের জড়তা মোচন করিয়াছ—তোমার মঙ্গল আহ্বানে আজি তাহাদের বিশ্বাসী প্রতিনিধিগণ অনন্ত গৌরবময় মহাতীর্থে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়াছে। একপ্রাণভূত অভিনব ভারতের ভবিষ্য ইতিহাসে তোমার সুনাম উজ্জ্বল সুবর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে—সমুন্নত ভারতের ভবিষ্য বংশধরগণ সসম্ভ্রমে অবনত মস্তকে পবিত্র প্রীতি, গভীর শ্রদ্ধা ও অনুপম ভালবাসার পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে তোমার পূজা করিবে। তোমার সুকার্য্য প্রভাবে সমস্ত সভ্য জগতে ইংলণ্ডের গৌরব পরিবর্দ্ধিত হইবে। অধঃপতিত বিগতশ্রী ভারতের হিতৈষী বন্ধু মহাত্মা হিউম্, চারি বৎসর তোমারই প্রাণগত যত্নে আরব সমুদ্রের তটবর্ত্তী বোম্বাই নগরে ভারতের জাতীয় একতার বীজ নিহিত হইয়াছিল, তখন তোমার হৃদয়ে এমন আশা স্থান পায় নাই যে এই অল্পকাল মধ্যে উহা অঙ্কুরিত ও বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়া এরূপ সহস্র সহস্র সুন্দর ফুল ফলে সুশোভিত হইবে। তোমার দীক্ষার অদ্ভুত ক্ষমতা, তোমার যোগ বলের অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব। ভারতের জাতীয় মহাযজ্ঞের প্রথম অনুষ্ঠান দিনে যেস্থলে মুষ্টিমিত কৃতবিদ্য মনুষ্য তোমার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, আজি সেই ইতিহাস বিখ্যাত স্থানে সহস্র সহস্র সুসন্তান তোমার জয় গানে আকাশ মণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছেন। আজি তোমার ন্যায় সুখী কে? এত দিনের পর তোমার কঠোর যোগসাধনা ফলবতী হইতে চলিল! এই অল্প সময়ের মধ্যে তুমি যদি অন্য কোন সাধনায় সিদ্ধ না হইয়া থাক, তবে এই এক মহাসাধনায় নিঃসন্দেহ সুসিদ্ধ হইয়াছ—সুবিস্তৃত ভারতের সুশিক্ষিত ও সহৃদয় অধিবাসীগণের রাজনৈতিক একতা সুকৌশলে সম্পাদন করিয়াছ—তাহাদের নির্ব্বাণোন্মুখ জাতীয় জীবন তোমারই কৃপায় অভিনব প্রভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। অমর ইতিহাস চির দিন অকপটে একথার সত্যতা পরিঘোষণ করিবে। এই অদ্ভুত সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবার

জন্য তোমাকে কতই ত্যাগ স্বীকার, কতই লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছে, তুমি অচল অটল হিমাদ্রি ভূধরের ন্যায় গম্ভীর ভাবে আপনার মহাযোগে নিমগ্ন হইয়া তৎসমস্ত তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছ, তুমি যথার্থই বিশ্বপ্রেমিক মহাযোগী! তাহা না হইলে বিদেশের দুর্দ্দশায় তোমার প্রাণ এত অস্থির হইবে কেন? আমরা জননীর অধম সন্তান—আমরা তাঁহার দুর্দ্দশা মোচনের জন্য কিছুই করিতে পারি নাই। যখন আমাদের প্রকৃতি ও অপকার্য্যের কথা মনে উদিত হয়, তখন অনুতাপ অশ্রু-বর্ষণে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্তি জন্মে।

ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির পঞ্চম মহাযজ্ঞের আয়োজন প্রকৃত পক্ষে প্রাণ মুগ্ধকর হইয়াছিল। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বেরার কর্ণাট গুজরাট, সরকার ও দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান স্থান, মধ্যভারত, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা, পঞ্জাব, সিন্ধু আজমির প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান প্রধান স্থান এবং বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যা ছোটনাগপুর ও আসাম প্রভৃতি স্থান হইতে নানাজাতীয় ও নানা ধর্ম্মাবলম্বী প্রতিনিধি ও পরিদর্শক আসিয়া উহার কার্য্যে মন প্রাণে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সকল সুদক্ষ ও সম্মানিত প্রতিনিধি লক্ষ লক্ষ লোকের সহানুভূতি ও অন্তরের বাসনা প্রকাশের ভার প্রাপ্ত হইয়া বিস্তর ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক সুদূরে বোম্বাই নগরে একত্র সম্মিলিত হইয়াছিলেন। একবৎসর পূর্ব্বে নব্যভারতের উন্নতি-বিরোধী যে সকল উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি উহার সংস্কার-প্রিয় সন্তানগণকে নগণ্য "Microscopical minority" এই উপহাসব্যঞ্জক সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে আমোদ অনুভব করিয়াছিলেন তাঁহারা যদি একবার ক্ষণকালের জন্য এই মহাযজ্ঞ ভূমির একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ইহাতে সম্মিলিত সহস্র সহস্র প্রতিনিধি ও দর্শক বৃন্দের প্রাণের বাসনা উপলব্ধি করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিঃসন্দেহ বিপুল বিস্ময়ে জ্ঞান হারা হইয়া স্বস্ব ভ্রম জনিত লজ্জা নিমীলিত আননে স্পন্দহীন নিশ্চল ভাব অবলম্বন করিতেন। শত শত হিন্দু, শত শত মুসলমান, শত শত জৈন, শিখ, পারসী, খৃষ্টিয়ান, ব্রহ্মবাদী ও দেবধর্ম্মা প্রভৃতি নানা ধর্ম্মাবলম্বী সুসন্তান, শত শত সভা-সমিতি ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ মহাযজ্ঞে যোগ দান করিয়াছেন ইহা দেখিয়াও কি পুনরায় কেহ ইহাঁদিগকে নগণ্য বিবেচনায় উপেক্ষা ও উপহাস করিতে সাহসী হইবে? বাতুল অথবা বালক ভিন্ন অপর কাহার তেমন মতিভ্রম হইবে জানি না।

মহাযজ্ঞে এবার একটি নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সুশিক্ষিতা মহিলাগণ ভারতীয় ললনা-সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপে উহাতে যোগদানের অধিকার পাইয়াছেন। এই নব প্রথানুসারে এ বৎসর বোম্বাই ও বঙ্গদেশ হইতে আটজন ভদ্রমহিলা উহাতে প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া উহার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

এবার প্রতিনিধি ও পরিদর্শক সকলেরই আনন্দ ও উৎসাহের সীমা নাই। ভারতহিতৈষী

বোম্বাইনগরীর ভূতপূর্ব্ব সুদক্ষ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী—যিনি ভারতীয় সিভিল্ সার্ভিশে প্রবিষ্ট হইয়া ২৫ বৎসর কাল এদেশের শাসন কার্য্য উপলক্ষে এদেশবাসিগণের ও গভর্ণমেণ্টের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া অল্পদিন হইল কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশে গমন করিয়াছেন—তিনিই মহাযজ্ঞের প্রধান আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিবেন, এবং ভারতবন্ধু জগদ্বিখ্যাত ক্ষণজন্মা ব্র্যাডল মহাযজ্ঞে নিয়মিতরূপে উপস্থিত থাকিয়া তৎপ্রণীত ভারত গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রণাসভা ও প্রদেশিক ব্যবস্থাপক সভানিচয়ের পরিবর্ত্তন ও সুসংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবের পাণ্ডুলিপির সমালোচনা ও অন্যান্য হিতকর বিষয়ের বাদানুবাদ পরিদর্শন এবং যজ্ঞাবসানে শুভ স্বস্তি বাচন করিবেন, এই উৎসাহে সকলেই গভীর আনন্দোৎসাহে নিমগ্ন। মহাত্মা ফসেট ও ব্রাইটের অবর্ত্তমানে নির্ভীক মহাক্ষমতাশালী সহৃদয় ব্র্যাডল ইংলণ্ডের মহাসভার সাধারণ বিভাগে ভারত সদস্যের পদ গ্রহণে অত্যল্প কালের মধ্যে স্বীয় সুকার্য্য ও অবিচলিত অধ্যবসায় গুণে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সুগভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অল্প দিন হইল তিনি উৎকট পীড়ার আক্রমণে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইলে ভারতের লক্ষ লক্ষ কৃতজ্ঞ নরনারী তাঁহার আরোগ্য কামনায় মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট করযোড়ে সকাতরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন. তাঁহার অনুগ্রহে তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া ভারতীয় জাতীয় মহাযজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন, এই মহাসুযোগে তাঁহাকে প্রাণগত প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার পবিত্র পুষ্পাঞ্জলিদান করিবার জন্য ভারতের সুসন্তানগণের হৃদয় পূর্ণমাত্রায় উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছে। বিশাল ভারতের নানাস্থান হইতে তাঁহার নামে রাশি রাশি অভিনন্দন পত্র আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। মহাসমিতির পক্ষ হইতে যজ্ঞবেদীতে প্রকাশ্য ভাবে তাঁহাকে আর একখানি গভীর কৃতজ্ঞতা পূর্ণ অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইল।

বিগত ৩০শে ডিসেম্বর সোমবার মহামতি ব্র্যাড্‌ল মাননীয় শ্রীযুক্ত সার্ ওয়েদারবারণের সহিত জাহাজ হইতে য়্যাপলো বন্দর-ঘাটে অবতরণ করিলে স্থানীয় ও বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত সহস্রাধিক প্রতিনিধি ও দর্শক সাগরোপকূলে দণ্ডায়মান হইয়া মহোল্লাসে তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মস্তকোপরি রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল। সেই দিন হইতে ব্র্যাড্‌ল সাহেবের নিকট রাশিকৃত অভিনন্দন পত্র উপস্থিত হইতেছে, পুঞ্জীকৃত অভিনন্দন পত্রের সংখ্যা এত অধিক যে, সকল গুলি পাঠ করিতে এক সপ্তাহেরও অধিক সময় লাগিবে।

মহোৎসাহ ও গভীর আনন্দের প্রবাহ লইয়া ২৬শে ডিসেম্বর উপস্থিত হইল। আজি পূর্ব্ব গগনে নব ভানু মনোলোভা অরুণ ছটায় উদিত হইয়া ভারতের কোটি কোটি নর নারীর হৃদয় গভীর আশ্বাসে পূর্ণ করিল। মধুর পবন সাগরনীরে অবগাহন পূর্ব্বক মৃদুমন্দ গমনে নিমেষ মধ্যে ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তরে বিচরণে চারি-

দিকে জাতীয় মহোৎসবের উদ্বোধন-বার্ত্তা ঘোষণ করিতে লাগিল। আজি মহাযজ্ঞের মঙ্গলময় উদ্বোধন। আজি অপরাহ্নে সমগ্র ভারতভূমির সুষুপ্ত শক্তির চেতনা সম্পাদনার্থে মাঙ্গলিক উদ্দীপন মন্ত্র পাঠ হইবে।

প্রাচীন ভারতের শারদীয় মহোৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, নিয়তির অগ্রনায়িকা, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামিকা, মহাশক্তির উদ্বোধন-মন্ত্রের ন্যায় এক প্রাণভূত নব ভারতের বিভিন্ন জাতীর প্রতিনিধিগণের এই অপূর্ব্ব অভিনব হৈমন্তিক মহোৎসবের উদ্বোধন-মন্ত্র আতঙ্ক জনক ও লোম হর্ষণ নহে, অথচ উহার ন্যায় গভীর অর্থ ও উদ্দেশ্য পূর্ণ বিচিত্র ভাবময়।

দূরবর্ত্তী স্থান হইতে যে সকল প্রতিনিধি ও দর্শক ইতিপূর্ব্বে উপস্থিত হইতে পারেন নাই আজি প্রাতঃকালে তাহারা অনেকে দলে দলে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এই সকল প্রতিনিধি ও দর্শকবর্গের যথাযোগ্য অবস্থিতি স্থান ও আহারাদির সুন্দর রূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় স্বস্ব আচার ব্যবহারোনুমোদিত পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বাস ও পান ভোজনের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থায় একান্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। অপরাহ্ন দুই ঘটিকা উদ্বোধনের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নিরূপিত সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, অতি অল্পকাল মধ্যে সহস্র সহস্র লোক সুবিস্তৃত মণ্ডপের চারিদিক বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

ভদ্রবংশ-সম্ভূত শিক্ষিত মহারাষ্ট্রী যুবকগণ প্রহরী বেশে মণ্ডপের দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত। নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক এক ঘণ্টা পূর্ব্বে মণ্ডপ দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, অমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে উহা জন-স্রোতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সুদৃশ্য বেদীর উপরিভাগে যজ্ঞের আচার্য্য ও প্রধান প্রধান নেতৃগণের জন্য বিস্তর আসন শ্রেণীবদ্ধ রূপে সজ্জিত রহিয়াছে। বেদীর সম্মুখে পঞ্চনদ ভূমির বীর সন্তানগণ এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও বেহারের প্রতিনিধিবর্গ স্বস্ব নির্দ্দিষ্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদের পশ্চাৎ ভাগে সিন্ধু ও বঙ্গ দেশের প্রতিনিধিগণ যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হইলেন; বেদীর দক্ষিণে বোম্বাই ও দাক্ষিণাত্য বিভাগের সুসন্তানগণ এবং বামে মান্দ্রাজ বিভাগের অধ্যবসায়শীল প্রতিনিধিগণ পৃথক্ পৃথক্ বিভাগে শ্রেণীবদ্ধরূপে উপবিষ্ট হইলেন, এবং সমবেত প্রতিনিধি বর্গের চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র দর্শক আপন আপন উপবেশন-স্থান অধিকার করিলেন। উচ্ছ্বসিত জন-স্রোত এইরূপে সংযত ও নিয়মিত হইলে পর ক্ষণকালের জন্য যজ্ঞ-গৃহ গভীর নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল।

বিবিধ বেশভূষায় সুসজ্জিত সহস্র সহস্র মাতৃভক্ত সন্তানের তৎকালীন অতুল অনুরাগ উদ্দীপ্ত দিব্যরাগ-রঞ্জিত প্রফুল্ল আনন-ভাতি এবং গভীর প্রতিভা ও স্থিরসংকল্প-উদ্ভাসিত সমুজ্জ্বল নয়ন-দ্যুতি অবলোকনে প্রকৃতি চারু বেশে সহাস্য মুখে "বন্দেমাতরং" এই মহা গীতি গান করিয়া সুপ্তোত্থিতা জননীর চিত্তবিনোদনে

নিযুক্ত হইলেন। আজি জননীর হর্ষের সীমা নাই - একবর্ষ পরে সহস্র সহস্র সন্তান আবার তাঁহার পরিচর্য্যায় প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া যথাবিধি মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছে, এই প্রাণারাম দৃশ্যে তাঁহার হৃদয়ের বিষাদ ও মুখের মলিনতা দূর হইয়াছে; তিনি পরম স্নেহে সুসন্তানগণকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার ভবিষ্যসুখ শান্তির আশ্বাস-বাণী শ্রবণের জন্য উৎকর্ণ হইলেন।

উদ্বোধনের সময় আগতপ্রায়; প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দ এই ভাবিয়া ব্যগ্র হইয়াছেন যে, কতক্ষণে নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইবে, কখন মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণের আগমনে উদ্দীপন-মন্ত্র উচ্চারিত হইবে। ২টা বাজিবার কিঞ্চিৎপূর্ব্বে দীক্ষাগুরু মহাত্মা হিউম্ যজ্ঞ-গৃহের শোভা সন্দর্শনার্থে মণ্ডপ মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সহস্র সহস্র চক্ষু নিমেষ মধ্যে তাঁহার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল, অমনি তৎক্ষণাৎ সমবেত সমস্ত প্রতিনিধি ও দর্শক মণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া মহানন্দ-কোলাহলে আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, তিনি সহাস্য মুখে মস্তক নত করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। অনন্তর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ, শ্রীযুক্ত ফেরোজসা মেটা, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নর্টন ও বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণ একে একে আগমন করিতে লাগিলেন অমনি চারিদিকে সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে গভীর আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। এই সময় মহাত্মা হিউম্, শ্রীযুক্ত ফেরোজসা মেটা ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় প্রধান নেতা ভারতবন্ধু মহাত্মা ব্র্যাড্‌ল ও মহাযজ্ঞের প্রধানাচার্য্য মাননীয় সার্ উইলিয়ম্ ওয়েডারবারণ সাহেবকে যজ্ঞ-গৃহে আনয়ন জন্য বহির্দ্দেশে আগমন করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ ঘোষাল, মাননীয় রাজারাম রাও, শ্রীযুক্ত জন য়্যাডামস্, শ্রীযুক্ত গ্যাঞ্জ, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, ক্যাপ্টেন্ বেনন্, মাননীয় নলকার, শ্রীযুক্ত ভীম জী, দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও এবং পণ্ডিতা রমাবাই প্রমুখ মহিলা প্রতিনিধিগণ মণ্ডপ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন সমবেত সপ্ত সহস্র লোক তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া মুক্তকণ্ঠে সুগভীর জয়নাদে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ কোলাহলে নিমগ্ন হইলেন। উহার গম্ভীর প্রতিধ্বনি যজ্ঞগৃহ কাঁপাইয়া গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া দেশ দেশান্তরে সুষুপ্ত ভারতের জাগরণ-সংবাদ প্রচারার্থ বিদ্যুৎ-বেগে ছুটিয়া চলিল। সেই সময়ের প্রাণারাম মন-মুগ্ধকর দৃশ্য ও মাতৃভক্ত সন্তান বৃন্দের মাতোয়ারা ভাব বর্ণনা করা দুর্ব্বল লেখনীর সম্পূর্ণ রূপে সাধ্যাতীত।

উচ্ছ্বসিত আনন্দ-কোলাহল নিস্তব্ধভাব ধারণ করিলে মহাত্মা ব্র্যাড্‌ল, আচার্য্য ওয়েডারবারণ ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ফেরোজসা মেটা বেদীর উপরিভাগে সুবর্ণাসনে উপবেশন করিলেন এবং দীক্ষা-গুরু শ্রীযুক্ত হিউম্ অন্যান্য প্রধান প্রধান অধিনায়ক ও মহিলা প্রতিনিধিগণের সহিত তাঁহাদের সন্নিকটে যথাযোগ্য

স্থানে উপবেশন করিলেন। সার উইলিয়ম্ ওয়েডারবারণ ও তাঁহার প্রধান সহযোগী মহাত্মা ব্রাড্‌ল বেদীর উপরিভাগ হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক মহাযজ্ঞের মহান্ ভাব অবলোকনে অপার আনন্দে নিমগ্ন হইলেন—তাঁহাদের প্রশান্ত মুখ মণ্ডলের জ্যোতির্ম্ময় ভাব হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছিল যে তাঁহাদের হৃদয়-নিহিত গভীর ভাব-তরঙ্গের অপ্রতিহত বেগ পূর্ণমাত্রায় উথলিয়া উঠিতেছে।

দেখিতে দেখিতে দুইটা বাজিয়া গেল; তৎক্ষণাৎ বোম্বাই নগরীর সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার অভ্যর্থনা সমিতির মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত ফেরোজসা মেটা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মহোৎসাহে মহানন্দে নানা স্থান হইতে সমাগত সহস্র সহস্র প্রতিনিধিবর্গকে এই বলিয়া প্রাণ খুলিয়া অভ্যর্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন :—

"ভারতীয় পঞ্চম জাতীয় মহাসমিতির প্রতিনিধিগণ, আমি অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে আপনাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রগাঢ় অনুরাগভরে সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। দেশের সকল বিভাগ হইতে সমাগত এত অধিক সংখ্যক ও এরূপ সম্ভ্রান্ত ভদ্র মণ্ডলীকে অভ্যর্থনা-দান সকল সময়েই পরম সুখ ও সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু যখন আমি মনে করি যে, আপনারা কোন বৈজ্ঞানিক প্রথা অনুসারে সমস্ত অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত না হইলেও বর্দ্ধনশীল বিকাশোন্মুখ নির্ব্বাচন-প্রথার বাল্যাবস্থায় যে প্রকারে নির্ব্বাচনা সম্পাদিত হইতে পারে, তদনুসারে আপনারা সকলেই কার্য্যতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবাসিগণের প্রতিনিধি, তখন সে সুখ সৌভাগ্যের আর সীমা থাকে না। এতদ্ভিন্ন আপনাদিগের অভ্যর্থনায় আর একটী বিশেষ তৃপ্তির বিষয় আছে, কারণ বোম্বাই নগরে মহাসমিতির জন্ম, সুতরাং আজি আমরা উহাকেই উহার জন্মভূমিতেই সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। চারি বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই সময় যে দিন আমরা উৎকণ্ঠিত ও আশান্বিত হৃদয়ে জাতীয় মহাসমিতি সংস্থাপনে সাহসী হই, সেই শুভদিন আমার স্মৃতি-পথে দেদীপ্যমান রহিয়াছে—দেশের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাগণকে কৌশলে স্থান ভ্রষ্ট করিবার জন্য এই সমিতির উৎপত্তি হয় নাই—স্বদেশের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে তদুপরি নির্ভর করিয়া বৃটিশরাজ-প্রদত্ত বহুমূল্য উপহার, সুশিক্ষা ও উচ্চ জ্ঞানালোক-প্রদীপ্ত গভীর কৃতজ্ঞতা প্রণোদিত হইয়া ভারত শাসন সম্বন্ধীয় বিবিধ শুভকর সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের প্রস্তাবে কর্ত্তব্য-পরায়ণ সুদক্ষ শাসন কর্ত্তাদিগের উদ্যম ও অনুষ্ঠানে সহায়তা দানের জন্যই উহার সৃষ্টি হইয়াছে। চারি বৎসর পূর্ব্বে আমরা এইরূপে যে উৎসাহশীল শিশু সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, আজি সে অঙ্গ-সৌষ্ঠব-সম্পন্ন সবল ও পরাক্রম শালী হইয়া গৌরবময় কীর্ত্তি-কলাপ সহ আমাদের সমক্ষে প্রত্যাগত হইয়াছে। উহা প্রত্যক্ষ ভাবে যে সকল রাজনৈতিক স্বত্বাধিকার লাভ করিয়াছে তাহা কোন ক্রমেই সামান্য নহে। আমাদের মধ্যে যে জাতীয় ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে, এই সত্য উহা দ্বারা সুস্পষ্ট-

ভাবে উজ্জলরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। আমেরিকার একত্রীভূত রাজ্য নিচয় যেমন জাতিগত ও সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় অশেষ পার্থক্য-ভিত্তির উপর আমেরিকা বাসিগণকে নব অভ্যুদয়ে উত্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছে, আমরাও তেমনি বহুবিধ সামাজিক ও ধর্ম্ম নৈতিক বিভিন্নতা সত্বেও সমদর্শী, নিরপেক্ষ ও সুসভ্য শাসন-তন্ত্রের সমভাবাপন্ন রাজ-নৈতিক বন্ধনে একত্র আবদ্ধ ও সংযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ জাতীয় জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছি, এ কথা আমরা সকলেই সম্যকরূপে অনুধাবন করিতে সমর্থ। যখন আমরা এই সমিতিকে "জাতীয় মহাসমিতি" এই আখ্যা প্রদান করি, তখন যে সকল জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ সাধক ভাব দ্বারা নব ভারত দিন দিন প্রবল রূপে অণুপ্রাণিত হইতেছে, আমরা কেবল সেই ভাবই প্রকাশ করি মাত্র। আমরা সময় অসময় বিবেচনা না করিয়া অবিশ্রান্ত বৃটিশ শাসনের স্তুতি গান করি না বলিয়া যাঁহারা একান্ত ক্ষুব্ধ, তাঁহাদিগের ঈর্ষা কিম্বা রোষ ভরে এই জাতীয় সমিতির প্রতি নিন্দা বর্ষণের পরিবর্ত্তে, ইহা আমাদিগের কর্ত্তব্য-জ্ঞান-প্রণোদিত প্রবল রাজভক্তির ধ্রুব চিহ্ন স্বরূপ বৃটিশ শাসনের উৎকৃষ্টতম ফল, এই কথা মুক্তকণ্ঠে সরলভাবে স্বীকার পূর্ব্বক ইহাকে অভিবাদন করা উচিত। ভদ্র মহাশয়গণ, প্রত্যেক সংস্কারের উপযোগী যাহা কিছু সম্পাদনীয় জাতীয় মহাসমিতি এ কাল পর্য্যন্ত তাহারই অনুষ্ঠান করিয়াছে--উহা ভারতীয় গভীর, রাজনৈতিক প্রশ্ন সম্বন্ধীয় কতিপয় প্রধান প্রধান বিষয়ের সম্পূর্ণ রূপে তন্ন তন্ন পূর্ব্বক আন্দোলন ও আলোচনা করিয়াছে। ক্রোধ, কুসংস্কার ও ঈর্ষাবশে যাহা কিছু বলা যাইতে পারে, উহার বিপক্ষে তৎ সমস্ত বলিবার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। আমাদের বিপক্ষগণ জাতীয় সমিতির প্রস্তাব সকল এক্ষণে সমালোচনার কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে দেখিয়া এই ছল ধরিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, যে সকল বিষয় ভারত প্রবাসী রাজনীতিজ্ঞ উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক বহুকাল পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছিল, এবং যাহাতে কিছুই নূতনত্ব নাই, আমরা সেই সমস্ত বিষয় লইয়া বৃথাড়ম্বর করিতেছি। মহাশয়গণ, এই অভিযোগ বিশেষ গুরুতর নহে; এই দণ্ডেই আমরা উহা আমাদের দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। ইংলণ্ডের সংস্কার-বিরোধী দলের পক্ষে না হইলেও ভারত প্রত্যাগত কতকগুলি ইংরেজ সম্বন্ধে ইহা সর্ব্বথা প্রযুজ্য হইতে পারে যে, ভারতবাসিগণের সম্বন্ধে তাঁহারা কখনও কোন অনুগ্রহ-বাক্য প্রয়োগ করেন না; পক্ষান্তরে তাঁহাদের সকলের সম্বন্ধে একথা স্পষ্টা-ক্ষরে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবাসীর পক্ষে যদি বা তাঁহারা সময়ে সময়ে অনুগ্রহ-বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তথাপি তাহাদিগকে যৎসামান্য রাজনৈতিক সত্বাধিকার প্রদান জন্য তাঁহারা কখনই বিন্দুমাত্র আস্থা প্রকাশ করেন না। জাতীয় মহাসমিতি একাল পর্য্যন্ত আর কিছু না করিয়া থাকিলেও যদি কেবল একমাত্র এই দীর্ঘকাল ব্যাপী ধ্যান নিমগ্ন বাহ্য জ্ঞানহীন রাজনৈতিক যোগিগণের চেতনা সম্পাদন ও কার্য্য

প্রবৃত্তির সঞ্চার করিয়া থাকে, তাহা হইলেও উহার পরিশ্রম বিফল হয় নাই। জাতীয় মহাসমিতি অনেক কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই সকল এবং অন্যান্য হিতকর বিষয় লাভ করিয়া এক্ষণে আবার আমাদের সম্মুখে উপনীত হইয়াছে।"

অনন্তর উহা স্বদেশ দ্রোহী কুসন্তান ও বিদ্বেষী বিদেশীয়গণের অপকার্য্য ও অত্যাচার জনিত বিপুল বিঘ্ন-বিপত্তি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কিরূপে কর্ত্তব্য-পথে ধাবমান হইয়াছে, কি উপায় অবলম্বনে উহা হইতে চিরস্থায়ী শুভ ফল উৎপন্ন হইতে পারে, এবং ভারত-শাসন সম্বন্ধে কি রূপ সুনীতি ও সুসংস্কৃত প্রথা পরিগৃহীত হইলে এ দেশের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত এবং ইংলণ্ডের অনন্ত গৌরব পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে, তৎসমুদায় তিনি গম্ভীর ভাবে জলন্ত উদ্দীপনার সহিত পরিব্যক্ত করিলেন। অনন্তর তিনি ভারত-হিতৈষী মহাত্মা জন ব্রাইটের মৃত্যু জনিত খেদ ও তাঁহার সুকার্য্যাবলীর মধুর স্মৃতি জনিত আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং ভারতের বর্ত্তমান প্রিয়বন্ধু মহামতি চার্লস্ ব্র্যাড্‌ল সাহেবের মহাযজ্ঞে শুভাগমন নিবন্ধন বিশেষ আনন্দ প্রকাশ এবং ভারতের কল্যাণ জন্য তাঁহার অবিচলিত যত্ন ও পরিশ্রম হেতু তাঁহাকে হৃদয়জাত গভীর কৃতজ্ঞতা উপহার দান পূর্ব্বক সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শক বর্গকে পুনরায় সর্ব্বান্তঃকরণে অভ্যর্থনা দান করিলেন। পরিশেষে তিনি মহাযজ্ঞের আচার্য্যকে স্বপদে বরণ করিবার জন্য সকলকে আহ্বান পূর্ব্বক বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার করিলেন।

তিনি উপবিষ্ট হইলে আবার ক্ষণকালের জন্য চারিদিক হইতে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথের সমর্থনে এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজারাম রাওর অনুমোদনে ভারত হিতৈষী মাননীয় শ্রীযুক্ত সার্ উইলিয়ম্ ওয়েডার্‌বারণ মহাশয় সভাপতির পদে বরিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে পুনরায় গভীর আনন্দ-ধ্বনি উথলিয়া উঠিল।

সার উইলিয়ম্ ওয়েডারবারণ সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক বিবিধ সুযুক্তিপূর্ণ তেজস্বিনী বক্তৃতায় সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকবর্গের হৃদয় গভীর উৎসাহে পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। নিম্নে উহার সারাংশ মাত্র প্রকাশিত হইলঃ—

"মহাশয়গণ, আমার প্রতি আপনারা যে মহাসম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে ধন্যবাদ দান করিতেছি। এই প্রস্তাবের প্রবর্ত্তক ও পরিপোষক মহাশয়গণ যেরূপ সানুকূল ভাবে ভারতবর্ষের সহিত আমার অতীত সম্বন্ধের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকেও আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দান করি। আমাদের দীর্ঘকাল ব্যাপী পরিচয়ের পর আপনাদিগকে আমি ভারতবাসিগণের শুভাকাঙ্ক্ষী, ইহা জ্ঞাপন করা অনাবশ্যক; কিন্তু আমি এই একটী বিষয় উল্লেখ করিব যে, আমি আপনাদের মধ্যে ২৫ বৎসর কাল অতিবাহিত

করিয়াছি এবং সেই সময় মধ্যে কোন ভারতবাসী আমার প্রতি কখনই নির্দ্দয়তার চিহ্ন মাত্রও প্রদর্শন করে নাই। আমি ভারত সন্তানগণের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, তাঁহাদের লবণ খাইয়াছি, আশা করি কার্য্যক্ষম জীবনের অবশিষ্ট অংশ তাঁহাদেরই মঙ্গলার্থে উৎসর্গ করিতে সমর্থ হইব। আজি আমি অত্যন্ত আনন্দ এবং গর্ব্বসহকারে এই আসন গ্রহণ করিতেছি। ভারতবাসিগণের নিকট হইতে বিশ্বাসের নিদর্শন স্বরূপ এই সম্মান প্রাপ্ত হওয়ায় আমার হৃদয় হর্ষে পরিপূর্ণ হইতেছে—আমি অতি আনন্দের সহিত ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের কল্যাণকর এই আন্দোলনে যোগ দান করিতেছি। যে আন্দোলন এক্ষণে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতিতে পরিণত হইয়াছে, আমি প্রথম হইতেই তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি; আমার সামান্য বিবেচনায় এই আন্দোলনের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী অপরিসীম মঙ্গলজনক। ইহার ঐতিহাসিক উৎপত্তি দেখিতে গেলে জানা যায় যে, ইহা বৃটিশ রাজনীতি-জ্ঞানের মহৎ চেষ্টার প্রত্যক্ষ পরিণাম, এবং ভারতবাসিগণকে যে উচ্চ শিক্ষা ও স্বায়ত্বশাসন প্রণালী বিনা আপত্তিতে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারই স্বাভাবিক সুমিষ্ট ফল। এই জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? জাতীয় জীবনের তেজস্বীতা বর্দ্ধন ও দেশের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি সাধন; এতদ্ব্যতীত আমাদের আর কি উৎকৃষ্টতর উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? আমাদের কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত, এবং বৃটিশ ন্যায়পরতা, অনুরাগ ও অপক্ষপাতের প্রতি ভারতবাসীর যে দৃঢ় বিশ্বাস, তদুপরি ইহার ভিত্তিমূল স্থাপিত। এই আন্দোলনের অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার বিকাশ সময়ে ইহার বড়ই এক সঙ্কটের অবস্থা গিয়াছে। যদিও তখন এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য নিশ্চয় রূপ নিরূপিত হয় নাই, তথাপি তৎকালে ইহার প্রাণ স্বরূপ ভাবটি প্রকৃত প্রস্তাবে চারি দিকে বিদ্যমান ছিল—সেই সময় বলপ্রয়োগে ইহার বিয়োগ সাধন জন্য অবিবেচনা পূর্ব্বক বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছিল। উহার পরিণাম বড়ই শোচনীয় হইত; কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে আমাদের সর্ব্ব প্রধান, উৎকৃষ্টতর গভর্ণর জেনারল্ মার্কুইস্ অব্ রিপণের আগমনে সেই ঘোর বিষাদময় দুর্দ্দিনের অবসান হইয়াছিল। লর্ড রিপণ স্বীয় অভিজ্ঞতা পূর্ণ ও সহানুভূতিময় নয়-কৌশল প্রভাবে জাতীয় আন্দোলনের উৎসাহ বর্দ্ধন এবং উহার বিস্তর উচ্চ অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ভারতবাসিগণ ইহা সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করিয়াছিলেন যে, এইরূপ সুনীতি-পরিচালিত শাসন-প্রণালী কখনই বিদেশীয় শাসন বলিয়া পরিগণিত হয় না। লর্ড রিপণের ভারতবর্ষ পরিত্যাগ কালে তৎপ্রতি যে দেশব্যাপী গভীরভাবোচ্ছ্বাস পরিপূর্ণ সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছিল, ইহাই তাহার অর্থ। সেই গভীর ভাবোচ্ছ্বাস জনসাধারণের এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিল যে লর্ড রিপণের অবলম্বিত নীতি অনুসারে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইলে, বৃটিশ শাসন, ভারতবাসিগণের জাতীয় শাসন বিবেচনায় সমাদৃত

হইতে পারে। ভদ্রমহোদয়গণ, একথা বলাতে যদি আমার কোন ভুল হইয়া থাকে তবে আপনারা তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন। কিন্তু মহাশয়গণ, এ সকল কথা আপনারা আমারই মতন, বরঞ্চ আমার অপেক্ষা আরও ভালরূপ জানেন। আমার বোধ হয় আপনাদের হিতের জন্য ভারতবর্ষে যে সকল কার্য্য হইতেছে তাহা অপেক্ষা ইংলণ্ডে আপনাদের জন্য কি হইতেছে তাহাই আপনারা আমার নিকট হইতে অধিক পরিমাণে শুনিতে ইচ্ছা করেন।

প্রায় তিন বৎসর হইল আমি আপনাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছি; এই তিন বৎসর কাল আমি ভারতের বিশেষ হিতকর বৃটিশ-রাজনীতির অনুশীলনে নিযুক্ত আছি। আপনারা ইহার ফল জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। আপনারা স্বভাবতঃই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইংলণ্ডে জাতীয় মহা সমিতির আন্দোলনের ভাবী ফল কিরূপ বোধ হয়। আমাদিগকে কি কি বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিতে হইবে? এবং কি কি উদ্দেশ্য সংসাধনে আমাদিগের কার্য্যক্ষমতা বিশেষরূপে নিয়োজিত করিতে হইবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে আমি সাধারণতঃ এই বলিতে ইচ্ছা করি যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহাদের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার জন্য ইংলণ্ডের জন সাধারণের অনুরাগ যে পরিমাণে আকৃষ্ট হইবে, তাহারই উপর আমাদের আশা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। ভারতীয় শাসন প্রণালীর প্রতি পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় ইহাই আমাদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। উহা সংসিদ্ধ হইলে সকল বিষয়েই মঙ্গল হইবে। ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন সহজ-সাধ্য। ভারত শাসন জন্য ভারতেশ্বরী এবং বৃটিশ পার্লামেণ্ট কতকগুলি উদার এবং ন্যায়ানুমোদিত নীতি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, এবং তদনুসারে কার্য্য হইবে বলিয়া গম্ভীর ভাবে অঙ্গীকার করিয়াছেন। ভারতবাসীগণ ঐ সমস্ত নীতির প্রতি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট। ঐ সকল নীতি কার্য্যে পরিণত করাই কঠিন; কারণ ভারতের গুরুতর শাসনভার আবশ্যকতা বোধে কতকগুলি সরকারী কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রধান প্রশ্ন এই যে, এরূপ অবস্থায় ইংলণ্ড হইতে কিরূপে এমন কর্তৃত্ব স্থাপিত হইতে পারে যদ্বারা এই সকল নীতি কার্য্যে পরিণত ও এই সকল অঙ্গীকার সুসম্পাদিত হইতে পারে? দুর্ভাগ্য বশতঃ একটি গুরুতর কারণে এই প্রশ্নের মীমাংসা অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে—কতকগুলি অত্যাবশ্যক বিষয়ে ভারত প্রবাসী রাজকর্ম্মচারীদিগের স্বার্থ ভারতবর্ষীয় করদাতৃ প্রজাগণের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী। বিষয়টি কিছু সঙ্কোচ জনক, অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; এজন্য তৎসম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে মনোভাব প্রকাশ করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিতেছি। হয়ত অপর অধিকাংশ ব্যক্তি অপেক্ষা আমার পক্ষে ভারতবর্ষীয় রাজকর্ম্মচারিগণের সম্বন্ধে কোন কথা মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। তৎসম্বন্ধে দুইটি কারণ বিদ্যমান আছে; প্রথম কারণ এই যে, উক্ত শ্রেণীর সম্মানের সহিত আমার স্বীয় সম্মান

সম্বন্ধ গভীর ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে ভারতীয় সিভিল্ সার্ভিশ আমাদের পরিবার মধ্যে বংশগত ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার পিতা ১৮০৭ খৃঃঅব্দে সিভিল্ সার্ভিশে প্রবিষ্ট হন; আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর সিপাহী বিদ্রোহে নিহত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরেই আমি এদেশে আগমন করি। অতএব বলিতে গেলে আমরা ভারতীয় "রাজকর্ম্মচারী জাতি" মধ্যে পরিগণিত। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমি বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর বিরোধী, যে সকল লোকের হস্তে রাজ্যশাসন ভার ন্যস্ত, আমি তাঁহাদের বিপক্ষ নহি, পক্ষান্তরে আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, ভারতবর্ষীয় সৈনিক ও অন্যান্য বিভাগীয় কর্ম্মচারীবর্গ সাধুতাপূর্ণ কঠিন শ্রম-সাধ্য কার্য্য ও নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্যানুরাগ বিষয়ে কাহারও নিকট কখনই পরাস্ত হইবার নহে। এরূপস্থলে আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ভারতীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের ও করদাতৃগণের স্বার্থ অনেক বিষয়ে পরস্পর বিরোধী। শান্তি, ব্যয় সঙ্কোচ ও সংস্কার এই সকলই করদাতার প্রধান স্বার্থ; কিন্তু এই সমস্তই স্বভাবতঃ সৈনিক ও অন্যান্য বিভাগীয় রাজকর্ম্মচারী বর্গের একান্ত অপ্রীতিকর। একদল তেজস্বী সুসজ্জিত সৈন্য স্বভাবতঃই যুদ্ধ প্রিয় তাহারা কখনই শান্তি প্রিয় হইতে পারে না; যৎকালে ব্যয় সংক্ষেপে রাজকর্ম্মচারীদিগের বেতন হ্রাস এবং সংস্কার কার্য্যে তাঁহাদের ক্ষমতার লাঘব বুঝায়, তখন তাঁহারা সকলে যে ব্যয়-সংক্ষেপ ও সংস্কার প্রিয় হইবেন, তাহা কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আশা করিতে পারেন? ইহা কখনই আশা করা যাইতে পারে না যে এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীবর্গ ভারতবর্ষের শান্তিবর্দ্ধন ব্যয় সংক্ষেপ ও সংস্কার জন্য কার্য্য করিবেন। এই জন্য ভারত শাসন কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত তত্ত্বাবধান গ্রহণার্থে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষের উপর কর্ত্তৃত্ব পরিচালনের প্রয়োজন এত অধিক। এক্ষণে দেখা যাউক উক্ত কর্ত্তৃত্বের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ। উহা কি সুদৃঢ়, সদা সতর্ক ও কার্য্যকর? আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই প্রশ্নের উত্তর অতীব অসন্তোষ জনক। আমার আশঙ্কা এই যে, এতদ্বিষয়ক সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, পার্লামেণ্টের বর্ত্তমান কর্ত্তৃত্বে দেশের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া এক্ষণে উহা নিতান্ত হীনভাবাপন্ন হইয়াছে। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এডমণ্ড বার্ক্ ভারতীয় রাজ কার্য্যের প্রতি ইংলণ্ডের সুদৃঢ় নিরপেক্ষ কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের একান্ত আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ফক্স সাহেবের "ইণ্ডিয়া বিল" সেই ক্ষমতা পরিচালন জন্য একটী সুশৃঙ্খল কার্য্য প্রণালী পরিগঠনের ব্যবস্থা করিতে পারিত, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ভারতবর্ষের সহিত সম্পর্ক বিহীন সম্প্রদায়গত বিরোধ নিবন্ধন "ম্যাগ্না চার্টার" ন্যায় শুভজনক উক্ত বিলের মঙ্গলময় উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছিল; তদবধি ভারতের হিতের জন্য সেরূপ আর কোন চেষ্টা বিহিত হয় নাই। যদিও তৎ-

কালে কোন প্রতিবিধানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তথাপি ১৮৫৮ সালে বিধিবদ্ধ 'ভারতশাসন আইন' (Government of India Act) কর্ত্তৃক দেশের শাসনভার "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির" হস্ত হইতে রাজ-হস্তে ন্যস্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের অবস্থা তাদৃশ শোচনীয় হয় নাই। উক্ত আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময় হইতেই আমাদের দুর্ভাগ্য আরম্ভ হইয়াছে। উহার পূর্ব্বে আমাদের মঙ্গলার্থে দুইটী প্রধান উপায় ছিল। প্রথমতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি" একটী বিশেষ সত্বাধিকার বিশিষ্ট সমিতি বিবেচনায় পার্লামেণ্ট তৎকালে সর্ব্বক্ষণ তাহার ত্রুটি ও দোষ অন্বেষণে রত থাকিতেন। দ্বিতীয়তঃ, তৎকালে ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইলে উক্ত কম্পানিকে ভারত-শাসন জন্য পুনরায় নূতন সনন্দ গ্রহণ করিতে হইত। প্রত্যেক নূতন সনন্দ গ্রহণ কালে কম্পানির হস্তে রাজ্যভার স্থিতির উপযোগিতা বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন করিতে হইত। তৎকালে প্রজাগণের দুঃখ ও অভাব রাশির সবিশেষ অনুসন্ধান গৃহীত হইত, এবং ভারতবর্ষের উন্নতির অবস্থার অনুকূল অত্যাবশ্যক সংস্কার কার্য্য সম্পাদন ও সাধারণ হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের অঙ্গীকার ব্যতীত নূতন সনন্দ প্রদত্ত হইত না। এক্ষণে দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দুইটী উপায়ই অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল রাজকর্ম্মচারিগণের কার্য্য পর্য্যালোচিত ও দোষোদ্ঘাটিত হইত, তাঁহারাই এক্ষণে শাসন-মন্দিরের অন্তরতম প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। ভারতীয় রাজস্ব-সচিবের (Secretary of state) মন্ত্রী-সভা ভারতবাসীর অভিযোগ শ্রবণের অপ্রকাশ্য আপীল আদালত স্বরূপ কার্য্য করেন। তাঁহারা প্রথমে ভারতবর্ষে সর্ব্ব বিষয়ের নিষ্পত্তি করেন, পরে এখান হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক ওয়েষ্টমিনিষ্টারে ভারত সভার (India Council) সভ্য রূপে স্বস্ব পূর্ব্ব মীমাংসিত বিষয়ের পুনরায় নিষ্পত্তি করিতে উপবিষ্ট হন। ভারত শাসন বিষয়ক কর্ত্তৃত্বের এ প্রকার কার্য্যপ্রণালী ঐন্দ্রজালিক প্রতারণা ভিন্ন আর কি নামে অভিহিত হইতে পারে? এই দূষিত প্রথা জনিত অনিষ্ট এক্ষণে বদ্ধমূল হইতে বসিয়াছে; কারণ, "ইণ্ডিয়া আফিসে" যখনই কোন একটী বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়, রাজস্ব সচিব স্বয়ং তজ্জন্য দায়ী থাকেন। যদি কোন স্বাধীন চেতা সভ্য তৎকালে "কমন্স সভায়" উক্ত বিষয় লইয়া আন্দোলন করেন তাহা হইলে কেবল মাত্র অপযশভাগী কম্পানি নহেন, রাজস্ববিভাগের (Treasury Bench) সমস্ত সভ্য আসিয়া তাঁহার মুখবন্ধ করিতে সাধ্যানুসারে যত্নবান হন। পূর্ব্বে অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর অন্তর এক একবার ভারতীর রাজকার্য্যের দোষগুণ পর্য্যালোচিত হইত, এখন উক্ত প্রথার অবিদ্যমানতা হেতু ঘোরতর অনিষ্ট জন্মিয়াছে। এক্ষণে কৈফিয়ৎ দানের রীতি অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ভারতবাসীর বিনা প্রার্থনা ও চেষ্টায় পার্লামেণ্ট হইতে ভারতীয় রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান গৃহীত হইত, এক্ষণে তদ্রূপ রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনার ব্যবস্থা লাভের জন্য সংস্কার প্রিয় ব্যক্তিগণের সকল যত্ন ও উদ্যম বিফল

হইতেছে। অনেক দিন্ হইতে এই অনুসন্ধানের সময় উপস্থিত হইয়াছে। ১৮৫৪ সালে পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক ভারত শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের শেষ অনুসন্ধান গৃহীত হইয়াছিল; সুতরাং প্রাচীন প্রথানুসারে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের অবস্থা পর্য্যালোচিত হওয়া উচিত ছিল। এই অনুসন্ধানের জন্য যদিও ইতিপূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করা হইয়াছে, এবং অনেকবার উহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে, কিন্তু কখনই উহা পূর্ণ হয় নাই। ইহাও স্থির যে পরিশেষে বিস্তর অধ্যবসায় ও উদ্যমের পর উহা পূর্ণ হইবে। মহাশয়গণ, এক্ষণে এই কর্ত্তৃত্বের পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা বর্ত্তমান অবস্থা যে অপেক্ষাকৃত শোচনীয় বোধ হয়, তাহা আমি প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছি। এ ক্ষণে একদিকে যেমন আমরা আমাদিগের অভাব সম্বন্ধীয় সাময়িক অনুসন্ধান হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, অপরদিকে তেমনই যে সকল কর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধে আমাদিগকে অভিযোগ করিতে হয় পরিণামে সেই সকল কর্ম্মচারীর উপর সেই অভিযোগ মীমাংসার ভার অনায়াসেই প্রদত্ত হয়। অতঃপর আমি, এই প্রণালী অনুসারে কি রূপ কার্য্য হয়, তাহা তুইটী দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিব।”

অনন্তর তিনি রেলওয়ে ও কৃষিব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় দুইটী বিশেষ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত “ইণ্ডিয়া অফিসে” নিযুক্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের অবিচার ও অপকার্য্য সুস্পষ্ট রূপে প্রদর্শন করিলেন। ইণ্ডিয়া অফিসের ঘোরতর বিপক্ষতা সৈনিক ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীবর্গের বিশেষতঃ ভারত প্রবাসী ইংরেজ সমাজের প্রতিকূলাচরণ, ইংলণ্ডের অনেক সংবাদ পত্রের বিদ্বেষভাব এবং ভারতবর্ষের অবস্থানভিজ্ঞ পার্লামেণ্টের সভ্যগণের পক্ষপাতিতার বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন যে এই সমস্ত প্রতিকূলতা সত্বেও আমাদের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই; বর্ত্তমান যুগের আভ্যন্তরীণ শক্তি আমাদের অনুকূলে কার্য্য করিতেছে,—জাতীয় উন্নতির ইচ্ছায় প্রজাতন্ত্রের বিশেষ সহানুভূতি আছে। ইংলণ্ডের শ্রমজীবী সম্প্রদায় ভারতের প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শনের একান্ত পক্ষপাতী, এবং কেবল যে উদার নৈতিক দলের মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় এমন নহে, স্থিতিশীল দলেও ভারতের অনেক বন্ধু আছেন। ভারত শাসন বিষয়ে পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করা যাইতে পারে।” জাতীয় মহাসমিতি সম্বন্ধে তিনি এই বলিলেন যে উহার প্রভাব দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে; ইংলণ্ডের প্রত্যেক পরিবারের মুখে উহার নাম শ্রুতিগোচর হইবার সময় আসিতেছে। যদি আমরা ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়শীল এবং পরিমিতাকাঙ্ক্ষী হই, তাহা হইলে উহা ভারত সাম্রাজ্য মধ্যে বিশেষ প্রভাবশালী হইবে। তৎপরে তিনি বলিলেন যে ইংলণ্ডে মহাসমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্য প্রচারার্থে একটী কার্য্যালয় (Agency) সংস্থাপন বড়ই উত্তম ও সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। জাতীয় মহাসমিতি ভারতের

বাক্ শক্তি-বিহীন প্রজাগণের বাক্-যন্ত্র স্বরূপ। ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে বহু দূরে অবস্থিত, ভারতবাসিগণের কণ্ঠ-স্বর দূরস্থিত ইংলণ্ডের অধিবাসীবর্গের কর্ণে বার্ত্তাবাহক যন্ত্রের (Telephone) ন্যায় বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য এই কার্য্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহার বিবেচনায় পরিশ্রমে অকাতর, সুদক্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডিগ্‌বী সাহেবের অবিচলিত যত্নে ও পরিশ্রমে ভারতের সহিত তাঁহার ইংলণ্ডস্থ বন্ধুগণের ঘনিষ্টতা বর্দ্ধনে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। অনন্তর তিনি ভারতবর্ষের হিতকর অন্যান্য বিবিধ সুযুক্তি পূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ পূর্ব্বক সমবেত প্রতিনিধিবর্গ সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দান করিলেন। তৎপরে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলির সংস্কারার্থ নূতন পাণ্ডুলিপির উপযোগিতা উল্লেখ পূর্ব্বক সকলকে উহাতে গভীর ভাবে মনঃসংযোগ করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং উক্ত নব প্রস্তুত পাণ্ডুলিপির সংস্রবে মহাত্মা ব্রাড্‌ল সাহেবের জাতীয় মহাসমিতিতে উপস্থিতি জনিত আনন্দোৎসাহে বলিতে লাগিলেন—"দরিদ্র ভারতের পক্ষে ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, ব্রাড্‌ল সাহেবের ন্যায় একজন সুদক্ষ পুরুষ তাঁহার সহায়তায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ত্তমান কালের দ্বিতীয় 'চার্লস্ মার্টেল্, যাঁহার মুগ্দরাঘাতে কুসংস্কার, অজ্ঞান ও অত্যাচার রূপ দুর্ভেদ্য দুর্গের ভিত্তিমূল অনেক বার বিকম্পিত হইয়াছে।"

পরিশেষে তিনি মহাসমিতির যত্ন ও পরিশ্রমের সফলতা এবং ভারতেশ্বরী ও তাঁহার সাম্রাজ্যের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও গৌরব বর্দ্ধন উদ্দেশে অন্তরের আশা জানাইয়া বক্তব্যের উপসংহার করিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে চতুর্দ্দিক হইতে আবার গভীর আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

তদনন্তর মহাসমিতির আলোচ্যবিষয়ক প্রস্তাবনিচয় নির্দ্ধারণ জন্য একটি কমিটি পরিগঠিত হইলে পর মহাযজ্ঞের উদ্বোধন পরিসমাপ্ত হইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

অনুপ্রাসিক গল্প।

পটলডাঙ্গার পঞ্চাননতলার পঞ্চুপালের পাঁচটী পুত্র। পয়লা পৌষের প্রত্যূষে পঞ্চুর পঞ্চম পুত্র পরাণপাল, পান্তা পেটে পুরে, পরিষ্কার পট্টবস্ত্র পরে, পান্তি পুকুরের পশ্চিম পাড় পারিয়ে পোড়াবাজারে পঁহুছিলেন। পোড়াবাজারে প্রসিদ্ধ পণ্যবীথী। পোড়া-

বাজারে পরিপক্ক পিয়ারা, পান, পটোল, পটোলিকা, পালংসাক্, পদ্মপুষ্প প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্তব্য। পরাণপালের পিছনে পদ্মমুখী পটলউলি।

পরাণের পরিচয় পাইয়া পদ্মমুখী পরিণয়প্রার্থী। পরাণের প্রতিজ্ঞা প্রথমে পিতা, পিতৃব্য প্রতিবাসীদের পরামর্শ—পরে পরিণয়। পরাণের পলায়ন -পদ্মমুখীর পরিধাবন—পদতলে পতন।

পাকে প্রকারে পদ্মমুখী পরিগৃহীতা। পরাণ পালের পটলডাঙ্গায় প্রত্যাগমন—পশ্চাতে পত্নী পদ্মমুখী। পণ্যবীথীতে প্রাপ্তপত্নী; প্রতিবাসীদের পদ্মমুখীকে পণ্যাঙ্গনা পরিগণন; পঞ্চুপালের পুত্রকে পদাঘাত—পরে পরিত্যাগ। প্রথমে পরাণের পরিবেদন পরে পবন-বেগে পলায়ন। পতি-প্রাণা পদ্মমুখীর পুনরায় পতিকে পরিধাবন, পদস্খলন, পরাণের পদতলে পতন। পরাণ পালের পুনরায় পরিবেদন—পরিশেষে পুনর্মিলন। পরাণের পরিতোষ—পদ্মমুখীর পরিত্রাণ। পরানপালেরই পরাভব।

পরাণ পদ্মমুখীর পর্য্যায়ক্রমে পনেরটি পুত্র ও পাঁচটি পুত্রী। পশুপতি, পরেশ, পতিতপাবন, পঞ্চানন, পদ্মলোচন, প্রিয়নাথ, পরাশর, প্রমোদ, প্রকাশ, প্রভাস, প্রহ্লাদ, প্রভাকর, প্রদ্যোত, প্রদ্যুম্ন, প্রভাকর, পুঁটি পাঁচি, পদি, পরী, পিমি।

পঁয়ষট্টিতে পক্ষাঘাতে পরাণের প্রাণত্যাগ। পঁচাশীতে পদ্মমুখীর পত্যনুগমন।

বিটকেল্।

প্লেটো—টিমীয়স।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমার চিন্তার ফল সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলাম; এবং আমার মত এই যে আকাশ ও সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে চিন্তনীয় বস্তু, স্থান, সম্ভূতি এই তিন প্রকার বিষয় ছিল। সম্ভূতির পাত্রে অর্থাৎ স্থানে জল, অগ্নি, মৃত্তিকা, ও বায়ু এই চারি প্রকার ভৌতিক বস্তুর আকৃতি বিদ্যমান ছিল; কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সকল এক অতি বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল, কোথায়ও কোন প্রকার নিয়ম ছিল না। যাহা হউক, শস্য হইতে ধান্যাদি সংগ্রহকালে কুলা দ্বারা বাতাস করিলে যেমন লঘু বস্তুগুলি একদিকে আর গুরু বস্তুগুলি অপরদিকে যাইয়া পড়ে; এ বিশ্বেও সেইরূপ ঘটিল। স্থানের মধ্যে জলবায়ু প্রভৃতির আকৃতি প্রবেশ করিলে উহা আলোড়িত হইতে থাকিল; তাহাতে কঠিন বস্তুর কণাগুলি হাল্কা বস্তুর কণা হইতে তফাৎ হইয়া পড়িল। পরমেশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে অগ্নি প্রভৃতির আকৃতি

স্থানে বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু তাহা এরূপ অস্ফুট ভাবে ছিল যে এক প্রকার না থাকারই মত। বিশ্বকার উহাদিগকে পরিস্ফুটিত করেন ও ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রদান করেন। এই বিষয় আলোচনা করিবার সময় আমরা সর্ব্বদাই ইহা স্বীকার্য্য বলিয়া গ্রাহ্য করিব যে ঈশ্বর উক্ত বস্তু চারিটী গঠন করিয়া উহাদিগকে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট ও সুন্দর আকৃতি প্রদান করিয়াছেন; অবশ্য ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে তিনি যে উপাদান দ্বারা উঁহাদিগের নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা উত্তম ও সুন্দর নহে। [ইহার অর্থ এই যে পরমেশ্বর অবশ্য যত দূর সম্ভব সুগঠন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তবে সামগ্রীর দোষে যদি কোন অঙ্গ অসৌষ্ঠব হইয়া থাকে তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন।] পরমেশ্বর কি রূপে অগ্নি প্রভৃতির আকার নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা আমি এক প্রকার নূতন পদ্ধতিতে (অর্থাৎ গণিতের সাহায্য দ্বারা) বুঝাইয়া দিতেছি।

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে অগ্নি, মৃত্তিকা, জল ও বায়ু ইঁহারা চারিটীই পদার্থশ্রেণী বাচ্য; অতএব ইহারা কঠিন বস্তু অর্থাৎ ইহারা সমতল ক্ষেত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। সমতল ক্ষেত্রকে ত্রিভুজে বিভক্ত করা যাইতে পারে, আর ত্রিভুজ দুই প্রকারের। এক প্রকার ত্রিভুজের একটী কোণ সমকোণ আর অপর দুইটী কোণ প্রত্যেকে ৪৫ ডিগ্রী; অপর প্রকার ত্রিভুজেরও একটী কোণ সমকোণ কিন্তু অপর দুইটী কোণ ৯০ ডিক্রীর অর্দ্ধেক নহে, অসমান ভাগ। প্রথমোক্ত ত্রিভুজ সমদ্বিবাহু আর শেষোক্তটী অসম বাহু। অসমবাহু ত্রিভুজ ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির হইতে পারে, কিন্তু উহাদিগের মধ্যে সমত্রিবাহু ত্রিভুজের অর্দ্ধেক যে ত্রিভুজ তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এক্ষণে আমরা দুই প্রকার ত্রিভুজ পসন্দ করিয়া লইতেছি। একটী সমদ্বিবাহু আর অপরটী অসমবাহু কিন্তু এরূপ প্রকৃতির যে উহার এক বাহুর বর্গ অপর এক বাহুর বর্গ অপেক্ষা তিনগুণ অধিক।

অতঃপর প্লেটো এই দুইটী ত্রিভুজের সাহায্যে অগ্নি প্রভৃতির আকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাঁহার মতে উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রকার ত্রিভুজ হইতে তিনটী আকৃতি উৎপন্ন হয় আর অগ্নি, জল, ও বায়ু ঐ তিনটী আকৃতি প্রাপ্ত হয় আর প্রথমোক্ত ত্রিভুজ হইতে যে একটী আকৃতি জন্মিয়াছে তাহা মৃত্তিকার আকৃতি। মৃত্তিকার আকৃতি কিউব, অগ্নির আকৃতি পিরামিড, বায়ুর আকৃতি অকটাহেড্রন, আর জলের আকৃতি আইকসাহেড্রন। মৃত্তিকার কণার ছয়টী পৃষ্ঠ আর ইহার প্রত্যেকে একটী সম চতুষ্কোণ ক্ষেত্র; অগ্নির কণার চারিটী পৃষ্ঠ আর ইহাদিগের প্রত্যেকে একটী সমবাহু ত্রিভুজ; জলের কণা আবার এইরূপ ২০টী পৃষ্ঠ বিশিষ্ট। এই চারিটী আকৃতি ব্যতীত আর একটী আকৃতি আছে যাহাকে ডডেকাহেড্রন কহে, ইহার ১২টী পৃষ্ঠ, ইহা কোন ভৌতিক পদার্থের আকৃতি নহে। পরমেশ্বর বিশ্বের আকৃতি প্রদান কালে এই আকৃতি ব্যবহার করেন। উপরে বলা হইয়াছে যে অগ্নি, জল, ও বায়ু এক প্রকার ত্রিভুজ হইতে উৎপন্ন আর মৃত্তিকা অপর এক প্রকার হইতে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে কেবল

মাত্র অগ্নি, জল ও বায়ু পরস্পরে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, মৃত্তিকা ঐ তিনটীকে পরিবর্ত্তিত কিম্বা ঐ তিনটী হইতে উৎপাদিত হইতে পারে না। প্লেটোও এই নিমিত্ত এই স্থলে বলিয়াছেন যে আমি পূর্ব্বে যে বলিয়াছি যে ভৌতিক পদার্থগুলি পরস্পরে পরিবর্ত্তনীয় এ কথাটী সম্পূর্ণ ঠিক নহে। এক্ষণে দেখা যাউক, প্লেটো কিরূপে ভৌতিক পদার্থদিগের উল্লিখিত আকৃতি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন; তিনি বলেন যে মৃত্তিকা সর্ব্বাপেক্ষা স্থিতিশীল ও গতিবিহীন আবার উল্লিখিত কয়টী আকৃতির মধ্যে কিউব সর্ব্বাপেক্ষা স্থিতিশীল, অতএব মৃত্তিকার আকৃতি কিউব। মৃত্তিকার পরই জল সর্ব্বাপেক্ষা স্থিতিশীল, আর অগ্নি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গতিশীল, এবং বায়ু উভয়ের মধ্যবর্ত্তী; ইহাদিগেব আকৃতিও তদনুযায়ী হইবে। আবার অগ্নির আকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং জলের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আর বায়ুর মধ্যবর্ত্তী হইবে; এতদ্ভিন্ন অগ্নি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তীক্ষ্ণাগ্র আর জল সর্ব্বাপেক্ষা কম হইবে। যে বস্তুর পৃষ্ঠ সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম হইবে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গতিশীল (স্থিতিবিহীন,) সূক্ষ্ম ও লঘু হইবে; সেইরূপে আবার যে বস্তুর পৃষ্ঠ সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম তাহার ঐ সকল গুণও সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। এই নিমিত্ত দেখা যাইতেছে যে অগ্নির আকৃতি পিরামিড (যাহার কেবল মাত্র চারিটী পৃষ্ঠ) আর জলের আকৃতি আইকসা হেড্রন (যাহার কুড়িটী পৃষ্ঠ) এবং বায়ুর আকৃতি অকটা হেড্রন (আটটী পৃষ্ঠ।) এই সকল অণু এত ক্ষুদ্র যে আমরা ইহার এক একটী দেখিতে পাই না, কিন্তু যখন অনেকগুলি অণু একত্র হয় তখন সমষ্টিটী আমরা দৃষ্টিগোচর করিতে পারি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মৃত্তিকা হইতে অন্য কোন ভৌতিক পদার্থ কিম্বা অন্য কোন ভৌতিক পদার্থ হইতে মৃত্তিকা জন্মিতে পারে না; কিন্তু অগ্নি, বায়ু ও জল ইহারা পরস্পর পরস্পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এক ভাগ জল হইতে দুই ভাগ বায়ু ও এক ভাগ অগ্নি জন্মে [২০ = (২ × ৮) + ৪] সেই রূপ দুই ভাগ অগ্নি হইতে এক ভাগ বায়ু, আড়াই ভাগ বায়ু হইতে এক ভাগ জল জন্মে। [ইহার অর্থ এই যে জলের ২০টী পৃষ্ঠ, বায়ুর ৮টী আর অগ্নির ৪টী; অতএব এক কণা জল হইতে অর্থাৎ উহার ২০টী পৃষ্ঠ লইয়া দুই কণা বায়ু (প্রত্যেকের ৮ পৃষ্ঠ) আর এক কণা অগ্নি (৪ পৃষ্ঠ) গঠিত হইতে পারে। এখানে একটী কণাকে এক একটী শূন্য বাক্স মনে করিতে হইবে।] যখন এই সকল ভৌতিক পদার্থদিগের মধ্যে সংঘর্ষণ ঘটে, তখন তাহাদিগের মধ্যে একটী অপরে পরিবর্ত্তিত হয় কিম্বা একটী অপরটী দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে বিশ্লিষ্ট হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হয় আর তখন তাহার-সদৃশ বস্তুর সহিত যাইয়া সংযুক্ত হয়। এই রূপে বস্তু সমূহ ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতেছে। কিরূপে মৌলিক পদার্থগুলি (অগ্নি, বায়ু, জল ও মৃত্তিকা) গঠিত হইয়াছে তাহা বর্ণিত হইল; এই সকল পদার্থের যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারান্তর দেখা যায় সে সমুদয় উল্লিখিত

ত্রিভুজদ্বয়ের আকৃতির (ক্ষুদ্র কিম্বা বৃহৎ) উপর নির্ভর করে। [অর্থাৎ কোন প্রকার জল অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকার ত্রিভুজ হইতে গঠিত, আর কোন প্রকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার হইবে।]

এক্ষণে দেখা যাউক যে এই বিশ্বে কোন বস্তুই স্থির নহে কেন, সকল বস্তুই ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে কেন? যেস্থলে সমুদয় অণুগুলি একই প্রকৃতির সেখানে কোন প্রকার গতি ঘটিতে পারে না; গতির নিমিত্ত দুইটী বস্তুর প্রয়োজন এক যাহা নড়িতেছে আর এক যাহা নড়াইতেছে, আর এই দুইটী বস্তু ভিন্ন-প্রকৃতির হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ যখন অগ্নি প্রভৃতির অণুগুলি পরস্পরের সহিত মিশ্রিত ছিল, তখন অবশ্য তাহাদিগের মধ্যে গতির সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু যখন ঐ সকল অণু পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক প্রকার কতকগুলি অগ্নি, আর এক প্রকার কতকগুলি বায়ু, ইত্যাদি জন্মিল তখনও কেন গতি রহিল? ইহার উত্তর এই যে ভৌতিক পদার্থ সমূহ একটী গোলাকার বিশ্বের মধ্যে অবস্থিত আছে, আর এই বিশ্বের প্রকৃতি এই যে উহা মধ্যস্থিত সমুদয় বস্তুকে ক্রমাগত চাপিতেছে এবং কোথায়ও শূন্য স্থান থাকিতে দেয় না। যে সকল বস্তুর অণু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃহদাকার, সে সকল বস্তুর অণুদিগের পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শূন্য স্থান ব্যবধান থাকে, আর ক্ষুদ্রাকার অণুদিগের পরস্পরের মধ্যে ক্ষুদ্রাকার ব্যবধান। উল্লিখিত চাপের বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষুদ্রাকার অণুগুলি ক্রমাগত বৃহদাকার অণুদিগের মধ্যে যাইয়া পড়িতেছে; এইরূপে দেখা যায় যে অগ্নি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপ্তিশীল, তাহার পর বায়ু, ইত্যাদি। অতএব জগতে সর্ব্বস্থলেই ভিন্ন প্রকৃতির বস্তু (যেমন জল ও অগ্নি) পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইতেছে, সুতরাং সর্ব্বস্থলেই গতির সম্ভাবনা রহিয়াছে (কারণ যেখানেই ভিন্ন প্রকৃতির দুই বস্তু আছে, সেখানেই গতি ঘটিবে।)

অতঃপর আমাদিগের দেখিতে হইতেছে অগ্নি কয়প্রকারের। প্রথমতঃ একপ্রকার অগ্নি আছে যাহাকে শিখা কহে, দ্বিতীয়তঃ একপ্রকার অগ্নি আছে যাহা শিখা হইতে বাহির হয়, কিন্তু যদ্দ্বারা কোন বস্তু দগ্ধ হয় না—এই অগ্নি চক্ষুকে আলোক প্রদান করে। তৃতীয়তঃ আর একপ্রকার অগ্নি লাল-উত্তপ্ত বস্তুতে দেখা যায়, ইহা অগ্নি শিখা নির্ব্বাপিত হওয়ার পরে দৃষ্টিগোচর হয়। সেইরূপ আবার বায়ুরও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারান্তর আছে, সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল বায়ুকে ঈথর কহে (যাহা পরিষ্কার আকাশে দেখা যায়) আর সর্ব্বাপেক্ষা অপরিষ্কার বায়ুকে কুয়াশা ও অন্ধকার কহে। ইহা ব্যতীত আরও অনেক রকম বায়ু আছে, যাহাদিগের কোন বিশেষ নাম নাই; উল্লিখিত ত্রিভুজের অসমতাবশতঃ এই সকল বিভিন্ন বায়ু জন্মিয়া থাকে। জল, আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়—এক তরল জল, আর এক গলনশীল জল। তরল জলের অণুগুলি ক্ষুদ্র ও অসম, সুতরাং উহা সহজেই স্বতঃ কিম্বা পরতঃ আলোড়িত হয় (পূর্ব্বেই বলা

হইয়াছে যে যেখানে বিভিন্ন প্রকারের অণু থাকে, সেখানেই গতি ঘটিয়া থাকে।) গলনশীল জলের অণু গুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ও পরস্পরের সমান, সুতরাং এই জল স্থিতিশীল, সহজে আলোড়িত হয় না (কারণ ইহার অণুদিগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে।) কিন্তু যখন এই জলে অগ্নি প্রবেশ করে, তখন উহার অণুগুলির সামঞ্জস্য নষ্ট হয় ও তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং গতিশীল হয়, আর তখন নিকটস্থ বায়ুর অণুদ্বারা ঐ জলের অণুগুলি ভূভাগের উপর বিস্তারিত হইয়া পড়ে। জল উক্ত প্রকারে বিচ্ছিন্ন হইলে আমরা বলি যে উহা গলিতেছে, আর উক্ত প্রকারে বিস্তারিত হইলে বলি যে উহা প্রবাহিত হইতেছে। পুনরায় যখন অগ্নি জল হইতে বহির্গত হইয়া যায়। তখন উহা শূন্যে চলিয়া যায় না—নিকটবর্ত্তী বায়ুতে প্রবেশ করে। অগ্নি দ্বারা বায়ুর অণুগুলি বিচালিত হইলে ইহারা আসিয়া ঐ জলের অণুর উপর চাপ দেয় আর তখন জলের অণুগুলি নিকটবর্ত্তী হইয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হয় (কারণ এক্ষণে অগ্নির অণুগুলি বাহির হইয়া গিয়াছে আর তাহাদিগের পরিত্যক্ত স্থানে জলের অণু আসিতে পারে।) অগ্নির প্রভাবেই জলের অণুগুলির সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছিল; এক্ষণে অগ্নি নির্গত হওয়ায় উক্ত সামঞ্জস্য পুনরায় সংস্থাপিত হইয়া জল জমিয়া পড়ে। ইহাকেই জল শীতল হওয়া ও জমিয়া যাওয়া কহে। যতপ্রকার গলনশীল জল আছে তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যময় অণু যে বস্তুর তাহাকে সুবর্ণ কহে। ইহার অণুগুলি নিতান্ত ঘনীভূত, ইহা দেখিতে উজ্জ্বল ও হরিদ্রা বর্ণ, ইহা অন্য সমুদয় ধনের অপেক্ষা মূল্যবান্। সুবর্ণ একপ্রকার জল, উহা পাহাড়ের মধ্য দিয়া নির্গত হইবার কালে ঘনাকৃত হইয়াছে। স্বর্ণ একপ্রকার কঠিন, কৃষ্ণবর্ণ বস্তুর গর্ভে থাকে, তাহাকে আডামাস কহে। (এই আডামাস কি পদার্থ তাহা নিশ্চয় বলা যায় না; এক ব্যক্তি বলেন ইহা সম্ভবতঃ ইস্পাত, কিন্তু হীরা হইলেও পারে।) আর এক প্রকার গলনশীল জল আছে, ইহার অণুগুলি প্রায় সুবর্ণেরই ন্যায় ক্ষুদ্র; ইহা স্বর্ণের অপেক্ষা অধিক ঘন এবং ইহার কয়েকটী প্রকার ভেদ আছে। ইহাতে অল্প পরিমাণ সূক্ষ্ম মৃত্তিকা আছে—সুতরাং ইহা অধিকতর কঠিন কিন্তু ইহার মধ্যে বড় বড় ব্যবধান থাকায় ইহা অপেক্ষাকৃত হাল্কা। এইরূপ একপ্রকার উজ্জ্বল গাঢ় গলনশীল জলকে পিত্তল কহে। যখন কালক্রমে এই মৃত্তিকা বাহির হইয়া পড়ে তখন উহাকে মরিচা কহে। এইরূপে অন্যান্য পদার্থেরও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা কঠিন নহে; এই কার্য্যে আমাদিগের কোন্ বিষয়টী সম্ভবনীয় আর কোন্‌টী নহে ইহাই কেবল দৃষ্টি রাখা উচিত। কেহ যদি চিরস্থায়ী ভাব সমূহের (যাহাদিগের আদর্শে দৃষ্টিগোচর বস্তু সমূহ গঠিত হইয়াছে) আলোচনা ক্ষণকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়া নিরীহ আমোদ উপভোগ করিতে চাহেন তাহা হইলে এইরূপ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। [ইহার

অর্থ এই যে প্লেটো এরূপ আলোচনাকে দার্শনিক আলোচনার মধ্যে গণনা করেন না ; ইহা কেবল একপ্রকার খেলা মাত্র। ইহা দ্বারা নিশ্চয় সত্য জানিবার যো নাই ; ইহাতে কেবল কোন্‌টী কোন্‌টী সম্ভব ও অসম্ভব ইহাই জানা যায়। দার্শনিকের প্রকৃত আলোচনার বিষয় উল্লিখিত চিরস্থায়ী চিন্তনীয় ভাব সমূহ, কেবল তাহাদিগের সম্বন্ধেই নিশ্চয় সত্য জানা যাইতে পারে।]

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সে।

সে ত আর নাই—তবে এ দীর্ঘ নিশ্বাস কেন? সে যখন হৃদয় পূর্ণ করিয়া ছিল, তখন একদিন এ দীর্ঘ নিশ্বাস দেখা দিলে জীবনের বন্ধন হয়ত আরও দৃঢ় হইত—হৃদয়ের কত না তৃপ্তি হইত, অশ্রু-রেখায় চুম্বন-সৌন্দর্য্য-স্পর্শে হৃদয়ের স্নেহ-উপবন কুসুমিত হইয়া উঠিত। কিন্তু আজ সে নাই—তবু এ দীর্ঘ নিশ্বাস কেন? এ নিশ্বাসে তাহার হৃদয়ের উত্থান পতন অনুভব হয়, তাহার মালা গাঁথার সৌরভ-স্মৃতিতে হৃদয় আকুল হইয়া উঠে, চক্ষের সম্মুখে একে একে তাহার প্রণয়-যাতনার অস্ফুট ছবিগুলি ফুটিতে থাকে ; এ যেন তাহারই হৃদয়ের ভাষা—তাহারই মর্ম্মের কাতর ক্রন্দনধ্বনি। তাহার জীবনে একদিনের জন্যও সুখ হয় নাই—তাহার জীবন দুঃখের তীর্থক্ষেত্র। সুখ স্পর্শ করিলে সে হৃদয় বুঝি ভাঙ্গিয়া যায়, সুখ সকলের কপালে সহে না। তাহাই বুঝি হইয়াছিল। শেষ দিনে তাহার অদৃষ্টে বিধাতা বুঝি কি সুখের স্পর্শ দিয়াছিলে, সে তাহা সহিতে পারে নাই--হাসি অশ্রুর মিলন ক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া সুখী হইয়াছে। কিন্তু তবে তাহার পশ্চাতে এ নিশ্বাস-আকুলতা কেন? যবনিকা ফেলিলে ত একেবারেই ফেলিলে না কেন? এ চির-বিরহের মধ্যেও যে স্মৃতির মিলন ঘুচে না—বিরহ-যন্ত্রণার মধ্যেও যেন মিলনের অভিশাপ। সে যখন ম্লান-মুখে ছলছল-নেত্রে নদী-তীরে বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া থাকিত—ঐ সুনীল অনন্ত ক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত তারকাপুঞ্জের ম্লান হাস্যময়ী শোভা দেখিতে দেখিতে আপনাকে কোথায় হারাইয়া ফেলিত, তখন কেন এ দীর্ঘ নিশ্বাস দেখা দিল না? জন্মের মত একবার—শুধু একবার—কেন সে এ গভীর বেদনা-উচ্ছ্বাস অনুভব করিতে পারিল না? তাহা হইলে ঐখানে—ঐ পুণ্য লোকে বসিয়া আজ সে সেই ব্যাকুল স্মৃতির আকুলি ব্যাকুলি অনুভব করিতে পারিত। সেই দীর্ঘ নিশ্বাসের মধ্যে এই দীর্ঘ নিশ্বাস সুখ-স্বপ্নের মত ফুটিয়া উঠিত।

মৃত্যু যন্ত্রণায় সে একবার শুধু কাহার আলিঙ্গনপাশে মরিতে চাহিয়াছিল—সেই আলিঙ্গনে তাহার সুখ, শান্তি, প্রেম, আনন্দ, সকলই;—অদৃষ্টের বশে সে বাসনা তৃপ্ত হয় নাই। মৃত্যুর করাল মূর্ত্তির শিরায় শিরায় সেই অতৃপ্ত বাসনা জাগিয়া আছে। প্রেতাত্মার মত মৃত্যুর গৃহে সে বাসনা চিরদিন ঘুরিয়া বেড়াইবে। তাহার আর প্রলয় নাই, বিনাশ নাই, অবসান নাই। এই দীর্ঘ নিশ্বাসে সেই মৃত্যুর ছায়া যেন শিহরিয়া উঠে, সেই অতৃপ্ত বাসনা অতীত দুঃস্বপ্নের মত আরও জড়াইয়া ধরে, হৃদয়ের কোন্ শ্যামলক্ষেত্রের উপর দিয়া নিরাশার হায়-হায়ের মত অন্ধকার আঁধারে কাঁদিয়া যায়। পশ্চাতে কালরাত্রির রহস্যময় পদচিহ্নমাত্র পড়িয়া থাকে; পদচিহ্ন ধরিয়া বিভীষিকা হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করে। আহা! সেই আলিঙ্গনে সকল কষ্টের পর কি পবিত্র শান্তি জাগিয়াছিল, জীবন মরণ সন্ধ্যায় একবার সে স্বর্গ-সুখ তাহার কপালে ঘটিল না। হৃদয় মন্থন করিয়া যে দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিল, দুই দিন পূর্ব্বে তাহা যদি উঠিত! কিন্তু তাহা উঠিবে কেন? তাহার অভাবেই না এ সমুদ্রমন্থন। তাহার আলিঙ্গন-কাতরতার স্মৃতিই—হৃদয়ের সুগভীর বেদনা-উচ্ছ্বাস। সে আজ নাই—কিন্তু তাহার স্মৃতি যেন ঘনাইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে সে গৃহে আবদ্ধ ছিল, এখন সে জগতে বিস্তৃত। আকাশে সে, চন্দ্রালোকে সে, কুসুম-সৌরভে সে ফুটিয়া উঠিতেছে। আগে ত সে এমন ছিল না—এখন যেন সর্ব্বত্রই সে। কিন্তু সে আজ নাই—সে কোথায় কে জানে!

ও গো, সে কোথায় কাহারও জানিয়া কাজ নাই; সে গিয়াছে, বাঁচিয়াছে, তাহাকে লইয়া আর আলোচনা কেন? পরলোকেও কি তাহার একটু সুখ শান্তি নাই? জীবনে সে সহস্র জ্বালায় জ্বলিয়াছে, এখন জ্বালা অবসান হৌক। জীবনের মরুভূমির উপর তাহার স্মৃতি-পদচিহ্ন মুছিয়া যাক্—হাহাকার উঠিয়া পরলোকে তাহার মর্ম্মের কাছে ঘুরিয়া না বেড়ায়। হৃদয়ে তবে এ দীর্ঘ নিশ্বাস শিহরিয়া উঠে কেন? তবে সে কি এই নিশ্বাস-উচ্ছ্বাস শুনিতে পায়? কে জানে কি, কিন্তু দুই দিন পূর্ব্বে যদি এই দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিত!—শুধু দুই দিন পূর্ব্বে।

তাহা হইলে কি হইত? কি হইত কেহ জানে না, কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহা বুঝি হইত না। জগৎ তাহা হইলে আর এক ভাবে চলিত বুঝি, এ জগৎ ছাড়া তাহাতে আর কিছু থাকিত। কে জানে গো, সে যেন আর একটা সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার, কিন্তু সেখানে সকলই পুরাতন। শুধু যদি এই দীর্ঘ নিশ্বাস আজ না উঠিয়া আর একদিন উঠিত! আজ এ শেলবিদ্ধ হৃদয়ের শান্তি নিকেতনে এ বিরহোচ্ছ্বসিত নিশ্বাস কাঁদিয়া বেড়ায় কাহার জন্য? সে কি আর আছে! ওগো তোমরা কাহার মুখের পানে চাহিয়া চলিয়াছ, তাহাকে কেহ দেখিয়াছ কি, বল ত। সে কি আর আছে?

সে আর নাই। যে যায় সে কি আর থাকে? সে আর ফিরিবে না। যে লতাকুঞ্জে বসিয়া প্রতিদিন সে আনমনে মালা গাঁথিত, কিন্তু তাহার মালাগাঁথা কখনও

শেষ হইল না, উষা আসিয়া সেখানে এখন চঞ্চলনেত্রে চাহিয়া থাকে, শ্যামল নবীন কিসলয়গুলির মধ্যে কোন্ নিশ্বাস-রুদ্ধ হৃদয়ের ভাষা শুনিতে গিয়া যেন চমকিয়া উঠে। বকুল ফুল ঝরিয়া ঝরিয়া লতাকুঞ্জের সম্মুখে স্তূপাকার হইয়াছে, উষা সেই ঝরা-ফুলের উপর দিয়া নীরবে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিয়া যায়; উষার মস্তকে, কেশ গুচ্ছে, বাহুপরি আরও বকুল ঝরিয়া পড়ে। সেখানে যে বসিত, সে আর এখন বসে না। সন্ধ্যা একবার আকুল হৃদয়ে লতাকুঞ্জে আসিয়া বসে, ঝরা ফুলগুলি মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখে; কিন্তু সন্ধ্যা আর থাকিতে পারে না, তাহার প্রাণ বুঝি কেমন করিয়া উঠে, সে ধীরে ধীরে উঠিয়া যায়। সারাদিন সারানিশি উন্মত্ত পবন শুধু সেখানে হাহাকার করিয়া বেড়ায়; লতাকুঞ্জ শিহরিয়া উঠে, বকুল ঝরিতে থাকে, আর জন-প্রাণীর সেখানে সাড়া শব্দ নাই।

এক দিন গিয়াছে, তখন ঐ লতাকুঞ্জে বিরলে বসিয়া মধ্যাহ্নের পাখী হৃদয় ঢালিয়া দিত। সে উদাস স্বরে সে কি গান গাহিত কেহ জানে না, কিন্তু সে যাহা গাহিত মধ্যাহ্নের হৃদয় হইতে। তখন ঐ লতাকুঞ্জে প্রতিদিন সেই কে একজন আসিয়া বসিত, সেখানে উষা আসিত, সন্ধ্যা আসিত, কুঞ্জ যেন পূর্ণ ছিল। আজ সেই একজন বুঝি আর নাই, তাই এ শ্মশান নিস্তব্ধতা।

সুখের সংসারে আসিয়া অবধি তাহার কপালে সুখ আর মিলিল না। কিন্তু তাহার দুঃখ কিসের জন্য? চিরদিন স্বামীর সাদর-সম্ভাষণ সেত পাইয়াছে; স্বামীর মুখ হইতে কখনও একটী তিরস্কার বাক্য বাহির হয় নাই, সে কখনও একটী রূঢ় কথা শুনে নাই। তবে তাহার যন্ত্রণা কিসের? কোন্ একটী সামান্য ঘটনায় মানবের হৃদয় চির-দিনের মত ছারখার হইয়া যায়—একটী কথা, একটী হাসি, একফোঁটা অশ্রু—তাহা কে বলিতে পারে? সহস্র সুখের মধ্যে সেই এক মুহূর্ত্তের ঘটনা হয়ত জাগিয়া থাকে, তাহাতেই জীবন জ্বলিয়া সারা হয়। চিরদিন স্বামীর অত্যাচারের মধ্যে সে অনায়াসে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিত, সে জন্য তাহার কোনও কষ্ট হইত না; কিন্তু স্বামীর সুধাময় বাক্যে তাহার জীবন শেলবিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি কথায় তাহার কোন শুভদিনের কথা মনে পড়িত—বিবাহের বাঁশীর কথা মনে পড়িত—সে দিন-কার দীপোজ্জ্বল্যে সে যেন বিভীষিকার ঈষৎ ম্লান ছায়া দেখিয়াছিল তাহাই মনে পড়িত।

বিবাহ রজনীর আনন্দ কোলাহলে বিভীষিকার ছায়া কি? সে দিন ত চারিদিকে আলোকমালা, মঙ্গল শঙ্খধ্বনি, আনন্দের লহরী। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, একবিন্দু রক্তপাতে কত অমঙ্গলাশঙ্কা, একফোঁটা অশ্রুজলে কত হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। আত্মীয় স্বজনের আনন্দপূর্ণ হুলুধ্বনিতেও হৃদয় হয়ত শিহরিয়া উঠিতে পারে। কিসে কি হয় বুঝা বড় সহজ নহে। সমস্ত দিন অনাহারে উপবাসে ক্ষুদ্র বালিকা স্বামীর প্রসন্ন মুখ

দেখিবার আশা করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু শুভ দৃষ্টির জন্য দুই জনের মাথার উপর দিয়া যখন রক্তবর্ণ আচ্ছাদন টানিয়া দেওয়া হইল, তখন—বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—বালিকার সমস্ত আশা ভরসা যেন নিমেষে ভাঙ্গিয়া গেল। স্বামীর অবনত মুখ একবার উঠিল না, বালিকার হৃদয় শিহরিয়া উঠিল।

সেই দিন অবধি তাহার জীবনে আর সুখলাভ ঘটে নাই। প্রতিদিন সে স্বামীর সাদর সম্ভাষণ শুনিত, কিন্তু তাহার তাহাতে আশ মিটিত না। সে যেন দেখিত, তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত অন্ধকারে কি গভীর হাহাকার কাঁদিয়া বেড়াইতেছে—কৃপাপাত্রীর পানে না চাহিলে অন্যায় হয়, তাই তিনি কথা বলিতেন মাত্র। সে দেখিত, সে যেন তাঁহার সহধর্ম্মিণী নহে, তাঁহার দয়াবৃত্তি পূরাইবার একটা যন্ত্র বিশেষ। সে চাহিত, স্বামীর সাদর-সম্ভাষণ একটু কমিয়া আসে, তাঁহার হৃদয়ে সে যেন মিশাইয়া যাইতে পারে।

স্বামী কি তবে তাহাকে ভাল বাসিতেন না? তবে আজ এ দীর্ঘ নিশ্বাস কেন? তাঁহার বুকে এত দিন বুঝি এই দীর্ঘনিশ্বাস বিঁধিয়াছিল, তাই তাঁহার হৃদয় উঠিতে পারিত না। তিনি হাসিতেন—ম্লান, ক্ষীণ, অন্ধকারে বিজলী। তিনি কথা বলিতেন—তাহাতে হৃদয় নিশ্বসিত হইত না, সে কথা যেন কোন দূরদেশ হইতে তাঁহার মুখে আসিয়া বসিয়া যাইত। আজ বহুদিন পরে সেই রুদ্ধ নিশ্বাস বুঝি বাহির হইতে পারিয়াছে। কিন্তু সে ত আজ নাই—এ দীর্ঘনিশ্বাসে যাহার হৃদয়ের সুখ শান্তি ছিল, সে ত আজ নাই।

এখন সে কোন্ মহারহস্যে মিশিয়াছে। অন্তিম শয্যায় বিবর্ণ বিম্বাধরে একটী ম্লান হাসি ফুটিয়াছিল। সে বিবাহের বাঁশী অনেকদিন থামিয়া গিয়াছে, সে বাসরঘরের আনন্দ কোলাহল অনেকদিন নিভিয়াছে, পুরাতন সকল স্মৃতির পশ্চাতে আজ সেও চলিয়া গিয়াছে। গঙ্গাতীরে বিজন শ্মশান-ক্ষেত্রে তাহার চিতাভস্মের উপর বসিয়া এক জন সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধমুখে ধ্যান করিতেছেন। সন্ন্যাসীর বিশাল ললাটে রজনার অন্ধকার ছায়া পড়িয়াছে, রুক্ষকেশ মধ্যে বাতাস নিরাশার গান গাহিতেছে, হৃদয়ে চিতাভস্ম। ধ্যানরত সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ করিয়া হৃদয়ের মধ্য হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উথলিয়া উঠিল। সেই শ্মশান-ক্ষেত্রে, ভাগীরথী-হিল্লোলে, মলয়পবনে শুধু হাহাকার মাত্র অবশেষ রহিয়াছে। আর সকলই একে একে অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহিলা-শিল্পমেলা।

এই মেলার উদ্দেশ্যাদি সাধারণের নিকট অবিদিত নাই, সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

গত বারের মেলায় সহৃদয় স্ত্রী পুরুষগণ যেরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া ইহার আনুকূল্য করিয়াছেন—তাহাতে সমিতি নিতান্তই আশ্বস্তহৃদয়। তাঁহাদের অনুগ্রহেই সখিসমিতি এই বৎসরে নূতন দুইটি অনাথাকে আশ্রয় প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছে—এবং তাঁহাদের উদারতার উপর নির্ভর করিয়াই এ বৎসর পুনরায় সমিতি এই মেলার অনুষ্ঠান কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে মানস করিয়াছে।

আগামী মার্চ্চ মাসে এই মেলা হইবে। আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে জানাইতেছি মাননীয়া লেডি ল্যান্স ডাউন মহোদয়া মেলায় উপস্থিত থাকিয়া মেলা খুলিবেন। যাঁহারা ইহার আনুকূল্য অভিপ্রায়ে শিল্পাদি বা অর্থ সাহায্য করিতে চাহেন, তাঁহারা ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে তাহা "ভারতী" সম্পাদিকার নিকট প্রেরণ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন—ইহাই সমিতির নিবেদন।

ইহার মধ্যেই লক্ষ্ণৌ হইতে শ্রীমতী গিরিবালা দেবী কতকগুলি খেলানা এবং সোলাপুর হইতে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কতকগুলি সাড়ি মেলার জন্য উপহার পাঠাইয়া তাঁহাদিগের সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য সমিতি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রেরণ করিতেছে। অন্যান্য সহৃদয়গণ ইঁহাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করুন ইহাই প্রার্থনা।

বাণী।

ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলিছে কমল,
কমল চরণখানি ;
আননে ভাতিছে পবিত্র আলোক
নয়নে ঝরিছে প্রাণের পুলক
মোহিত ত্রিলোক ভূলোক দ্যুলোক
গাহিছে ভারতী রাণী।
শোভে স্বর্ণবীণা সুকর-কমলে,
গুণ গুণ গুণ সঙ্গীত উথলে,
কুঞ্চিত কুন্তল-রাশি ধীরে দোলে,
সমীরে চঞ্চল অঞ্চলখানি।
মরি কি শোভিছে ভারতী রাণী!
আকাশ পাতাল হতে ধীরে ধীরে
ঐ শোন স্তুতি উঠিছে গম্ভীরে—
জয় মা জননী জয় বীণাপাণি!
করি যুক্তকর কবীশ মণ্ডলী
চরণে সঁপিছে প্রেম পুষ্পাঞ্জলি
রাগ রাগ-বধূ অনুরাগে গলি
গাহিছে সপ্তমে জয় জয় বাণী।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

ছায়াময়ী-পরিণয়। শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত।

গ্রন্থখানি রূপক কাব্য। ছায়াময়ী বিষয় রাজের দুহিতা—অতি যত্নে স্নেহে, ধন সমৃদ্ধির মধ্যে প্রতিপালিতা হইয়াও যৌবনে তাহার মনের সুখ অবসান হইল, সে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের স্বপ্ন দেখিয়া তাহাকে লাভের নিমিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আনন্দপুরের অধীশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রেম। পিতা কন্যাকে সুখী করিবার প্রয়াসে নানা প্রকার আমোদজনক অনুষ্ঠানের প্রায়োজন করিয়া অবশেষে তাহার বিবাহের উদ্যোগ

করিলেন—বিবাহের সমস্ত স্থির—কন্যা পলায়ন করিল, এবং কামনা ও সাধনা এই দুই সখীর সহিত নানা বিপদ অতিক্রম করিয়া অবশেষে সেই আনন্দ-অধীশ্বরকে লাভ করিল।

ছায়াময়ী-পরিণয়ের সার গল্প আমরা উপরে উল্লেখ করিলাম। রূপকচ্ছলে ইহার উপদেশ অতি সুস্পষ্ট হইয়াছে।

বনফুল। (মাঘোৎসব উপহার) শ্রীহেমেন্দ্র সিংহ প্রণীত। ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গাবলীর সমষ্টি। যদিও এই চিন্তার মধ্যে নূতন কথা অল্পই আছে তথাপি ইহার অধিকাংশ প্রসঙ্গ পড়িতে বেশ লাগে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা। প্রথম ভাগ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—এল্ এম্ এস্। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতে যে কিরূপ ফল পাওয়া যায় আজকাল তাহা আর সাধারণকে বার বার করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। হোমিওপ্যাথিতে অবিশ্বাসের দিন গিয়াছে। সুতরাং হোমিওপ্যাথিক উৎকৃষ্ট চিকিৎসা পুস্তক প্রকাশিত হওয়া বিশেষ প্রার্থনীয়। ব্রজেন্দ্র বাবু এক জন প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক সুচিকিৎসক, সুতরাং তাঁহার রচিত এই পুস্তক যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

গণিত প্রবেশিকা (প্রথম ভাগ) শ্রীসিদ্ধেশ্বর দাস সঙ্কলিত। অল্প বয়স্ক বালকদিগের অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষার পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী। ধারাপাত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম প্রাইমারি পরীক্ষার নিমিত্ত যে সকল বিষয় আবশ্যক সে সমস্তগুলিই উল্লিখিত পুস্তকে অতি সহজ ভাষায় ও সরল প্রণালীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বইখানির সাহায্যে অল্প কালের মধ্যেই অতি সহজে বালকবালিকারা দেশীয় মতে অঙ্কশিক্ষা করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। আজকালকার দিনে ধারাপাতের দুই এক পাতা উল্টাইয়াই বালকেরা যেরূপ ইংরাজি অঙ্কপুস্তক পড়িতে ধরে তাহাতে দেশীয় অঙ্কবিদ্যার প্রণালী কিছুই প্রায় শিক্ষা হয় না। এই বইখানি পড়িলে বালকেরা আমাদের দেশের হিসাবের সহজপ্রণালীগুলি ভাল করিয়া শিখিতে পারিবে। পুস্তকখানির দামও অতি অল্প; ।/১০ আনা মাত্র—অতএব যদি গণিত-প্রবেশিকা সাধারণে চলিত হয় তবে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইব।

প্রকৃতির পরিচায়ক লক্ষণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[ঔদ্ভিদ প্রকৃতি কিরূপ তাহা দেখা গেল; এখন জৈবিক প্রকৃতি কিরূপ তাহার প্রতি প্রণিধান করা যা'ক্।

অচেতন প্রাণরাজ্য হইতে আমরা সচেতন প্রাণ-রাজ্যের (অর্থাৎ মনোরাজ্যের) চৌকাটে পদার্পন করিবামাত্রই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব কতকগুলি নূতন ব্যাপার আমাদের দৃষ্টি-পথে নিপতিত হয়; তাহা আর-কিছু নয়—অনুভব, স্মরণ, বাসনা, সংস্কার, ইন্দ্রিয়-বৃত্তি, এইরূপ কতকগুলি আন্তরিক ব্যাপার। অন্তর বাহিরের মধ্যে, মন এবং দেহের মধ্যে, আশয় (subject) এবং বিষয়ের (object) মধ্যে, ভেদাভেদ এবং ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়ার যে-একটি ব্যাপার—জীব-রাজ্যেই তাহার প্রথম সূত্রপাত। বৃক্ষও জল পান করে—জীবও জল পান করে; কিন্তু পিপাসা অনুভব করিতে জীবই করে—বৃক্ষ পিপাসা'র কোনো ধার ধারে না; পরিপাক শক্তি (অর্থাৎ বহির্বস্তু আত্মসাৎ করিবার শক্তি) বৃক্ষেরও আছে—জীবেরও আছে, কিন্তু ক্ষুধা অনুভব করিতে জীবই করে—বৃক্ষ সে রসে বঞ্চিত; বৃক্ষেরও প্রাণ আছে—জীবেরও প্রাণ আছে, কিন্তু প্রাণের প্রতি আসক্তি (অর্থাৎ প্রাণের প্রতি মনের টান) জীবেরই আছে—বৃক্ষের নাই। শুধু কেবল প্রাণ থাকিলেই জীব হয় না—বৃক্ষেরও প্রাণ আছে; জীব হইতে গেলে—প্রাণ এবং প্রাণের প্রতি টান—দুইই পরস্পরের সহিত মাথামাথি ভাবে বর্ত্তমান থাকা চাই; কেননা, জীবের জীবত্ব = প্রাণ × প্রাণের প্রতি টান। দৃশ্যমান বিষয়ের সহিত দর্শন ক্রিয়া—ভোজ্যমান অন্নের সহিত ক্ষুন্নিবৃত্তির পরিতোষ—ক্রিয়মান কার্য্যের সহিত স্ফূর্ত্তির সুখ অথবা শ্রমের কষ্ট, এক কথায়—বৈষয়িক (objective) ব্যাপারের সহিত আশয়িক (subjective) ব্যাপার, যাহা যখন লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়, তাহা কেবল জীবরাজ্যেই দেখা যায়—উদ্ভিদ্-রাজ্যে নহে। আশয়িক ব্যাপার গুলি কোনো প্রকার ভৌতিক ব্যাপার নহে—কোনো প্রকার গতি নহে, স্পন্দন বা কম্পন বা নড়ন চড়ন নহে; নড়ন-চড়ন বা কম্পন বৃক্ষের পরমাণুগণের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে—কিন্তু ক্ষুৎপিপাসা-প্রভৃতি আশয়িক ব্যাপার-গুলি জীব-রাজ্য ভিন্ন আর কোনো রাজ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় না। কোনো ব্যক্তি যখন আনন্দে নৃত্য করে, তখন শুদ্ধ কেবল নৃত্যের সম্বন্ধেই বলিতে পার যে, তাহা এক প্রকার গতি-ব্যাপার—তাহা দৈহিক অঙ্গ চালনা; কিন্তু আনন্দটির সম্বন্ধে ওরূপ কথা বলিতে পার না;—এমন বলিতে পার না যে, আনন্দ এক প্রকার শারীরিক অঙ্গ-চালনা। আনন্দ যদি নৃত্যের ন্যায় অঙ্গ-চালনা হইত, তবে নৃত্যের যেমন তাল আছে আনন্দেরও তেমনি তাল

থাকিত; তাহা হইলে—আমরা যেমন বলি "অমুক তালের নৃত্য," তেমনি আমরা বলিতাম "অমুক তালের আনন্দ!" কাব্যের অলঙ্কার প্রসঙ্গে কেহ যদি বলে যে, "চৌতাল আনন্দ" বা আড়াঠেকা আনন্দ" তবে সে কথা স্বতন্ত্র; লোকে বলে "কি মিষ্ট কণ্ঠস্বর" কিন্তু তাহা বলিয়া কণ্ঠ-স্বর সত্য সত্যই কিছু আর চিনি বা গুড় বা মধু ইত্যাকার সামগ্রী সকলের দল-ভুক্ত নহে। নৃত্যকেও আনন্দ বলিতে পারা যায় না, চাক্ষুষ-স্নায়ুর নৃত্যকেও দর্শন ক্রিয়া বলিতে পারা যায় না। আনন্দ এক ব্যাপার,—আনন্দের নৃত্য আর-এক ব্যাপার; দর্শন এক ব্যাপার—দর্শন-কালীন স্নায়ু-নৃত্য আর-এক ব্যাপার; একটি-মানসিক ব্যাপার, আর-একটি—ভৌতিক ব্যাপার। উপরি-উক্ত স্থলে এরূপ কথা বলিতে পার যে, ভৌতিক ব্যাপার এবং মানসিক ব্যাপার দোঁহে দোঁহার সহিত মাখামাখি ভাবে অবস্থিতি করিতেছে; কিন্তু এরূপ কথা বলিতে পার না যে, ও-দুই ব্যাপার একই ব্যাপার। ফলে, ও দুয়ের—মাখামাখি ভাবে অবস্থিতি করিবারই কথা; কেন না, প্রকৃতি সর্ব্বত্রই নীচের সোপান মাড়াইয়া—নীচের সোপানের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া—উপরের সোপানে পদ নিক্ষেপ করে; পর্ব্বতের উপত্যকা হইতে এক লম্ফে পর্ব্বতের চূড়ায় উত্থান করে না;—গায়ক গম্ভীর খাদের সুর হইতে এক লম্ফে তীব্র জিলের সুরে উত্থান করে না। প্রকৃতির সমস্ত ব্যাপারই যোগের ব্যাপার। আমরা যদি কিঞ্চিন্মাত্র প্রণিধান করিয়া দেখি, তবে ভৌতিক রাজ্য হইতে মানসিক রাজ্য পর্য্যন্ত স্পষ্ট একটি উন্নতির সোপন ধারাবাহিক ক্রম-পরম্পরায় প্রসারিত দেখিতে পাই।

প্রথম সোপান-পংক্তি;—ভৌতিক রাজ্যে শুধু কেবল বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ এই দুই শক্তির কার্য্যই আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয়; আকর্ষণ-বিকর্ষণের একটির অভাবে আর একটি চলে না—অথচ দুয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা বর্ত্তমান রহিয়াছে; কাজেই বলিতে হয় যে, সে প্রতিদ্বন্দিতা প্রকৃত-পক্ষে প্রতিদ্বন্দিতা নহে—তাহা এক প্রকার প্রেমের কলহ; কেন না, আকর্ষণও বিকর্ষণকে চায় এবং বিকর্ষণও আকর্ষণকে চায়। যদি একটি জড় পিণ্ড হইতে বিকর্ষণ সমূলে উন্মূলিত হয়, তবে সে জড়-পিণ্ড নিতান্তই একটি নিরবয়ব জ্যামিতিক বিন্দুতে পর্য্যবসিত হয়—কাজেই বিকর্ষণ উন্মূলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণও উন্মূলিত হইয়া যায়; আবার যদি কোন একটি জড় পিণ্ড হইতে আকর্ষণ সমূলে উন্মূলিত হয়—তবে তাহার পরমাণু-সকল বহুধা—অসংখ্যধা—বিচ্ছিন্ন হইয়া শূন্য আকাশ মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, কাজেই, আকর্ষণ উন্মূলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিকর্ষণও উন্মূলিত হইয়া যায়—কেননা শূন্যকে শূন্য বিকর্ষণ করিতে পারে না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ উভয়ই পরস্পরকে চায়—একটির বিহনে আর-একটি বাঁচে না, এইজন্য রূপকচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, দুয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা যাহা দৃষ্টি-গোচর হয় তাহা এক প্রকার প্রেমের

কলহ-প্রাণ-শূন্য ভৌতিক বস্তু, যাহা শুদ্ধ কেবল আকর্ষণ-বিকর্ষণ-শক্তির ক্রীড়া ক্ষেত্র, তাহা প্রকৃতির কার্য্য-সোপানের সবে-মাত্র প্রথম পংক্তি; এই প্রথম পংক্তিটিকে অনেকে মূল প্রকৃতির—সমগ্র প্রকৃতির—স্থলাভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করেন; তাহাতেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া কেহ বা সেই প্রথম পংক্তিটিকে স্বয়ং ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। ইহাঁরা জগতের মূল-কারণকে ভৌতিক করিয়া গড়িয়া তুলিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হ'ন না অথচ ইহাঁরাই আবার এই বলিয়া শ্লাঘা করেন যে, "আমরা ঈশ্বরকে মনুষ্যের মতো করিয়া গড়িয়া তুলিতে লজ্জা-বোধ করি!" ঈশ্বরকে ইহাঁরা মনুষ্যের মতো করিয়া গড়িয়া তুলিতেই লজ্জা বোধ করেন কিন্তু মৃত্তিকার মতো করিয়া অন্ধশক্তির মতো করিয়া গড়িয়া তুলিতে ঘুণাক্ষরেও লজ্জা বোধ করেন না! এ কথাটি ইহাঁরা একেবারেই বিস্মৃত যে, ভৌতিক বস্তু প্রকৃতির প্রথম সোপান—মনুষ্য প্রকৃতির চতুর্থ সোপান; এই চতুর্থ-সোপানে এমন অনেক-গুলি ব্যাপার আছে যাহা প্রথম সোপানের ধ্যানেরও অগোচর। আকর্ষণ-বিকর্ষণের উপর সন্ততি-বাহিনী এবং সঙ্গতিপন্থিনী শক্তি—তাহার উপর সংস্কার-শক্তি এবং বিষয়-গ্রহণী শক্তি—তাহার উপর সংযম শক্তি এবং প্রবৃত্তি-অনুশীলনী শক্তি—এতগুলি শক্তিকে চতুর্থ-সোপানে কার্য্য করিতে দেখা যায়; কাজেই প্রথম সোপান অপেক্ষা চতুর্থ-সোপান সত্তা-ধনে চতুর্গুণ ধনী। এই জন্য যদিচ আমরা বলি যে, জড়ীকরণ এবং মানবীকরণ দুইই দূষণীয় তথাপি জড়ীকরণ অপেক্ষা মানবীকরণকে আমরা সমগ্র সত্যের চতুর্গুণ নিকটবর্ত্তী মনে করি—জড়ত্ব অপেক্ষা মনুষ্যত্বকে আমরা চতুর্গুণ সারবান্ বস্তু মনে করি। কিন্তু হাজার হো'ক্—মনুষ্যও খণ্ড সত্য, পরব্রহ্ম অনন্ত সত্য,—কাজেই দুয়ের মধ্যে ছায়াতপের প্রভেদ। "ছায়াতপের প্রভেদ"—এই কথাটির সহজ অর্থ উল্টাইয়া দিয়া অনেকে তাহার পরিবর্ত্তে একটা কিম্ভূত কিমাকার সৃষ্টিছাড়া অর্থের অবতারণা করেন;—ইহাঁরা বলেন যে মনুষ্যে সর্ব্বসাধারণ রূপেও যাহা কিছু আছে ঈশ্বরে তাহাও থাকিতে পারে না; মনুষ্যে অস্তিত্ব আছে—অতএব—ঈশ্বরে অস্তিত্ব নাই, মনুষ্যে জ্ঞান আছে—অতএব—ঈশ্বরে জ্ঞান নাই; ইত্যাদি। ইহাঁরা যদি বলিতেন যে, ঈশ্বরেতে মনুষ্যের অস্তিত্বের মতো অপূর্ণ অস্তিত্ব নাই বা মনুষ্যের জ্ঞানের মতো অপূর্ণ-জ্ঞান নাই—তবে আমরা তাহাতে মুক্তকণ্ঠে সায় দিতে পারিতাম—কিন্তু তাহা নহে; ইহাঁদের যুক্তি এই;—

(১) ঈশ্বরেতে মনুষ্যেতে ছায়াতপের প্রভেদ।

(২) মনুষ্যের অস্তিত্ব আছে।

(৩) অতএব প্রমাণ হইল যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই; কেন না, যাহা কিছু মনুষ্যেতে আছে তাহা ঈশ্বরেতে থাকিতে পারে না।

ইহার বিরুদ্ধে আমরা এই বলি যে অস্তিত্ব সৃষ্ট জীবের বিশেষ ধর্ম্ম নহে—অপূর্ণ বা আপেক্ষিক অস্তিত্বই সৃষ্ট জীবের বিশেষ ধর্ম্ম; ঈশ্বরেতে অপূর্ণ-অস্তিত্ব আরোপ

করিলেই তাঁহাতে জীবের ধর্ম্ম আরোপ করা হয়—ঈশ্বরেতে অস্তিত্ব আরোপ করিলে তাঁহাতে জীবের ধর্ম্ম আরোপ করা হয় না। তেমনি, ঈশ্বরেতে জ্ঞান আরোপ করিলে তাঁহাতে মনুষ্যত্ব আরোপ করা হয় না, তবে কি? না—তাঁহাতে অপূর্ণ জ্ঞান আরোপ করিলেই তাঁহাতে মনুষ্যত্ব আরোপ করা হয়।

প্রকৃতির অভিব্যক্তি সোপানের প্রথম পংক্তিস্থিত ভৌতিক বস্তুকে শুধু যে কেবল ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করা দুষণীয় তাহা নহে—ঐ প্রথম পংক্তিটি মূল প্রকৃতির স্থলাভিষিক্ত হইবারও যোগ্য নহে। কিসে তাহা মূল-প্রকৃতি-পদের অযোগ্য নিম্নে আমরা তাহা ভাঙিয়া বলিতেছি।

অপ্রাণ ভৌতিক বস্তু তিন-রূপ দৃষ্টিতে তিনরূপে প্রকাশ পায়, লৌকিক দৃষ্টিতে স্থূলরূপে প্রকাশ পায়; ভৌতিক বিজ্ঞানের (Physics) দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম বল-কেন্দ্ররূপে প্রকাশ পায়; আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে জ্ঞানের অধীনস্থ শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। যথা,—লৌকিক দৃষ্টিতে ইঁট্ কাট পাথর যাহা চক্ষে দেখা যায় তাহাই জড় বস্তু; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে, "সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে" ইহার অর্থ—সূর্য্যের ভার কেন্দ্র পৃথিবীর ভার কেন্দ্রকে আকর্ষণ করিতেছে এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর ভার কেন্দ্র সমস্ত পার্থিব পরমাণুকে আকর্ষণে বাঁধিয়া রাখিতেছে; অতএব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পৃথিবী—কিনা পৃথিবীর ভার কেন্দ্র; সূর্য্য—কিনা সূর্য্যের ভার কেন্দ্র; সৌর জগৎ—কিনা সৌর জগতের ভার কেন্দ্র—ইহা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। ভার—বলেরই প্রকার-ভেদ, এই জন্য সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে, ভৌতিক বিজ্ঞানের চক্ষে বল-কেন্দ্রই জড় বস্তু, আর আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ বলের ডা'ন হাত বাঁ হাত।

এখন বক্তব্য এই যে, কোনো বলকেন্দ্রই একাকী কোনো কার্য্য করিতে পারে না; তা শুধু নয় একাকী তাহা কিছুই নহে; কেননা (১) বল-কেন্দ্র হইতে যদি কোনও প্রকার বল স্ফূর্ত্তি না হয় তবে তাহা জ্যামিতিক বিন্দুর ন্যায় "কিছুই না" হইয়া দাঁড়ায়; (২) এক হাতে তালি বাজে না—এক বল-কেন্দ্র আর এক বল-কেন্দ্রকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করিলে তবেই তাহার ক্রিয়া অভিব্যক্ত হয়; কোনো বল কেন্দ্রই আপনাকে আপনি আকর্ষণ বিকর্ষণ করে না—অন্যান্য বল-কেন্দ্রকেই আকর্ষণ-বিকর্ষণ করে; অতএব যে কোন বল-কেন্দ্র হউক্ না কেন—তাহার বল-স্ফূর্ত্তি অন্যান্য বলকেন্দ্রের প্রতিযোগিতা-সাপেক্ষ। (৩) প্রথমে দেখা গেল যে, বল-স্ফূর্ত্তি ব্যতিরেকে বল-কেন্দ্র জ্যামিতিক বিন্দুর ন্যায় অপদার্থ; পরে দেখা গেল যে, প্রত্যেক বল-কেন্দ্রের বল-স্ফূর্ত্তি অন্যান্য বল-কেন্দ্রের প্রতিযোগিতা সাপেক্ষ; অতএব প্রমাণ হইল যে—আপনা হইতে ভিন্ন অন্যান্য বল-কেন্দ্রের প্রতিযোগিতা ব্যতিরেকে বল-কেন্দ্র কিছুই নহে। বল-কেন্দ্র এইরূপ আপেক্ষিক পদার্থ—অর্থাৎ তাহা আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত নহে—তাহা বাহিরের অন্যান্য বল-কেন্দ্রের প্রতিযোগিতাকে অপেক্ষা

করে। এখন, এইটি বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক যে, (১) যে কোন বস্তু বাহিরের অন্যান্য বস্তুর উপরে নির্ভর করে, তাহা কথনই সর্ব্ব-জগতের মূলস্থিত হইতে পারে না; কেন না, যাহা সমস্ত জগতের মূলস্থিত—সমস্ত জগৎই তাহার অন্তর্ভূত; তাহার বাহিরে কোন বস্তুই থাকিতে পারে না; সুতরাং তাহা বাহিরের কোন বস্তুরই প্রতি-যোগিতা-সাপেক্ষ হইতে পারে না; (২) কিন্তু বল-কেন্দ্র মাত্রই বাহিরের আর আর বল-কেন্দ্রের প্রতিযোগিতা সাপেক্ষ; (৩) অতএব প্রমাণ হইল যে, কোন বল-কেন্দ্রই সর্ব্বজগতের মূলস্থিত নহে। এই গেল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি; আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে—আপেক্ষিক যাহা, তাহা ছোট হইলেও আপেক্ষিক, বড় হইলেও আপেক্ষিক; পরমাণুর ভার কেন্দ্রও যেমন-আপেক্ষিক—সৌর জগতের ভারকেন্দ্র ও তেমনি-আপেক্ষিক। আপেক্ষিক পদার্থ সকলের মধ্যে মূল-গত ঐক্য রহিয়াছে বলিয়াই তাহারা পরস্পর পরস্পরকে মান্য করে; যদি আপেক্ষিক পদার্থ-সকলের মূলে কোন প্রকার ঐক্য না থাকিত, তবে কেহ কাহারো তক্কা রাখিত না; সূর্য্য যদি পৃথিবীর নিতান্তই পর হয়—তবে পৃথিবীর কি-এত দায় পড়িয়াছে যে, সূর্য্যের অদৃশ্য আকর্ষণে নিরন্তর তাহাকে বাঁধা থাকিতে হইবে? অতএব ইহা স্পষ্ট যে, সমস্ত আপেক্ষিক সত্য একই অদ্বিতীয় সত্যের মূল বন্ধনে আবদ্ধ। যে এক অদ্বিতীয় মূল বন্ধন সমস্ত বল-কেন্দ্রের আশ্রয় স্থান সে মূল বন্ধন আবার কোন্ বল-কেন্দ্রকে আশ্রয় করিবে? ইহা তো হইতেই পারে না! এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কোনো বল-কেন্দ্রই—কোনো ভৌতিক বস্তুই—মূল প্রকৃতির স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না।

আকর্ষণ-বিকর্ষণ প্রকৃতির প্রথম সোপান; সন্ততি এবং সঙ্গতির নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রকৃতির দ্বিতীয় সোপান। বল রাজ্যে যেমন আকর্ষণ বিকর্ষণ, প্রাণ রাজ্যে সেইরূপ সঙ্গতি-প্রবণতা এবং সন্ততি-প্রবণতা; সঙ্গতি এবং সন্ততির এই যে দুইটি ব্যাপার, ইহার অভ্যন্তরে দুই-জাতীয় আকর্ষণ-বিকর্ষণ একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করে—ভৌতিক (physical)) আকর্ষণ-বিকর্ষণ এবং রাসায়নিক (chemical) আকর্ষণ-বিকর্ষণ। ঔদ্ভিদ প্রাণীরা রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা দাহ্য-প্রধান পদার্থ সকল (carbon প্রভৃতি) আত্মসাৎ করে এবং রাসায়নিক বিকর্ষণ দ্বারা দাহক-প্রধান বাষ্প (oxygen) বিসর্জ্জন করে। কিন্তু এইরূপ আকর্ষণ বিকর্ষণের ক্রীড়া উদ্ভিদের বহিরঙ্গ মাত্র;—অন্তরঙ্গ কি? না সেই সমস্ত আকর্ষণ বিকর্ষণের ব্যাপারকে জীবন রক্ষায় নিয়মিত করা। জীবন্ত উদ্ভিদ্ পদার্থ রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা বহি-

বস্তু সকলকে ভিতরে লইয়া গিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, কিন্তু বিশেষ-বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য বিশেষ বিশেষ পরিমাণে বণ্টন করিয়া দেয়; তা শুধু নয়—যে অঙ্গ যে দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, সে অঙ্গ সে দ্রব্যকে আপনার মতো করিয়া গড়িয়া লয়—সে দ্রব্যের আকার-পরিবর্ত্তন করিয়া বা গুণ-পরিবর্ত্তন করিয়া বা বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া

আপনার প্রকৃতির উপযোগী করিয়া গড়িয়া লয়। এই ব্যাপারটি শুদ্ধ কেবল রাসায়নিক ব্যাপার নহে—কেননা রাসায়নিক ব্যাপার-সকল ক্রমাগতই বাঁধা নিয়মে চলে; বিশুদ্ধ রাসায়নিক ব্যাপার এক প্রদেশে একরূপ -অন্য প্রদেশে অন্যরূপ—হইতে পারে না। দাহকতা-গুণ ইংলণ্ডের অম্লজন বায়ুতেও যেমন—এদেশের অম্লজন বায়ুতে ও তেমনি—কোথাও তাহার ইতর-বিশেষ হয় না; কিন্তু জীবরাজ্যে শরীর-ভেদে একই বস্তুর গুণ-ভেদ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্যাদির শোণিত শীতল--পশ্বাদির শোণিত উষ্ণ, অথচ উভয়ই শোণিত; এমন কি—ভৌতিক হিসাবে মনুষ্যের এবং নিকৃষ্ট জীবের রেতের মধ্যে তিল-মাত্রও প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু জৈবিক হিসাবে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জৈবিক ব্যাপার যদি শুদ্ধ কেবল রাসায়নিক ব্যাপার হইত, তবে সকল জীবেরই রেত সর্ব্বত্রই একই প্রকার জীব উৎপাদন করিত—কেননা রেতের ভৌতিক উপাদান সর্ব্বত্রই একই প্রকার। পুনশ্চ, রাসায়নিক রাজ্যে অম্লজন সর্ব্বকালেই অম্লজান; কিন্তু জীব-রাজ্যে বিষ সর্ব্বকালেই বিষ নহে; অভ্যাস-গুণে বিষও অনেক সময়ে নির্ব্বিষ হইয়া পড়ে। অতএব কি উদ্ভিদ্‌রাজ্য—কি জীব রাজ্য—যাহারই মধ্যে যতকিছু প্রাণের ব্যাপার দেখা যায় তাহা শুদ্ধ কেবল রাসায়নিক আকর্ষণ বিকর্ষণের ব্যাপার নহে; জীবরাজ্যে এবং উদ্ভিদ রাজ্যে—রাসায়নিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তি আর এক উচ্চতর শক্তির অধীনে নিয়মিত হয়, কি? না জীবনী শক্তি; আর সন্ততি-প্রবর্ত্তিনী শক্তি এবং সঙ্গতিপন্থিনী শক্তি যাহা কৈন্দ্রিক এবং পারিধ শক্তি বলিয়া ইতিপূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি তাহা জীবনী-শক্তিরই দুইটি অবিচ্ছেদ্য অবয়ব।

প্রসঙ্গাধীন আমরা এই একটি কথা বলিতে চাই যে, বিজ্ঞানের আলোচনা কালে মন-হইতে দুইরূপ পক্ষপাতের ভাব উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক;—(১) "কিছুই মানিব না" এই একরূপ পক্ষপাত; (২) "সবই মানিব" এই আর একরূপ পক্ষপাত। এ উপলক্ষে আমরা অধিক বাক্যবাহুল্য শ্রেয় বোধ করি না—সাঁটে সোঁটে দুই একটি কথা বলিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব--কেননা আমাদের গন্তব্য পথ এখনো ঢের বাকি।

নেই-মান্‌তা'র উদাহরণ;—জীবনী শক্তি মূলেই নাই—জীবের সমস্ত ব্যাপারই আকর্ষণ-বিকর্ষণ দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে।

সব্‌-মান্‌তা'র উদাহরণ,—পরিপাক শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি—দক্ষিণ চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য—বাম চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, ইত্যাদি।

এই দুই ভাব—নেই মান্‌তা ভাব এবং সব্‌মান্‌তা ভাব—দুইই সমান পরিবর্জ্জনীয়। সব্‌-মান্‌তা-ভাবের দোষের প্রতি নব্য সম্প্রদায়ের চক্ষু যে পরিমাণে বিস্ফারিত—নেই-মান্‌তা ভাবের দোষের প্রতি তাহা সেই পরিমাণে অন্ধ; সব্‌মান্‌তা দোষের প্রতি

তাঁহাদের চক্ষু ফুটাইতে যাওয়া তেলা মাথায় তেল দেওয়া মাত্র; এই জন্য এখানে আমরা শুদ্ধ কেবল নেই মান্‌তা ভাবের দুই একটি দোষ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব।

ক। বিজ্ঞান যদি জীবনী-শক্তি না মানে, তবে তাহাতে বিজ্ঞানের কি ক্ষতি হয়?

খ। বিজ্ঞান যদি আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তি না মানে তবে তাহাতে তাহার কি ক্ষতি হয়?

ক। তাহা হইলে গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিবিধি কোনো প্রকারে জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারা যায় না।

খ। জীবনী-শক্তি না মানিলে উদ্ভিদ্‌ এবং জীবের জৈবনিক প্রক্রিয়া-সকল জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারা যায় না। তুমি কি শুদ্ধ কেবল ভৌতিক বা রাসায়নিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের উপর ভর করিয়া জৈবনিক প্রক্রিয়া সকল আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার? কখনই পার না। কাজেই জৈবনিক প্রক্রিয়া-সকলের মূলে অন্যকোনো বিধ শক্তির কার্য্য-কারিতা না মানিলে কোনো প্রকারেই চলিতে পারে না; না মানিলে চলিতে পারে না—অথচ আমি মানিব না—ইহারই নাম নেই মান্‌তা দোষ।

এ সম্বন্ধে কাণ্ট বলিয়াছেন "we may in a seuse say without temerity : Give me matter and I will build a world out of it, I will show how a world comes to be evolved. But can we truly claim such a vantage ground in speaking of the least plant or insect? are we in a position to say: give me matter, and I will show you how a caterpillar can be generated. কি ভৌতিক—কি রাসায়নিক—কোনো আকর্ষণ-বিকর্ষণই এখানে হালে পানি পায় না। কাজেই জৈবনিক প্রক্রিয়ার মূলে আকর্ষণ বিকর্ষণ ছাড়া অতিরিক্ত আর-এক প্রকার শক্তি না মানিলে কোন প্রকারেই চলিতে পারে না। কেন যে আমরা জীবনী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করি তাহা আমরা বলিলাম,—ভৌতিক তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যে কারণে আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন আমরা সেই কারণে জীবনী-শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করি—স্বীকার না করিলেই নয় বলিয়া স্বীকার করি। যদি বিনা-কারণে শুধু শুধু আমরা শক্তি-বাহুল্যের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইলাম—তবে আমরা সব্‌মান্‌তাদিগের প্রথানুযায়ী (এবং বিজ্ঞানের প্রথা-বহির্ভূত) কার্য্য করিতাম, বিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্রে এরূপ আচরণ একটি মহৎ দোষ; কিন্তু তাহা যখন আমরা করি নাই, তখন তাহার দোষও আমাদের স্কন্ধে অর্শিতে পারে না। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক্।

উদ্ভিদ্‌রাজ্যে দুইরূপ শক্তি একযোগে কার্য্য করে; সন্ততি-রক্ষিণী শক্তি এবং সঙ্গতি-রক্ষিণী শক্তি; আপনার সাজাত্য অব্যাহত রাখিয়া তাহা সন্তান-সন্ততি ক্রমে প্রবাহিত করিবার শক্তিই সন্ততি-রক্ষিণী শক্তি; এবং চতুর্দ্দিকস্থ বিজাতীয় সংসর্গের

উপযুক্ত করিয়া আপনাকে বিনয়ন করিবার শক্তিই সঙ্গতি রক্ষিণী শক্তি; এই দুই শক্তি একই জীবনী-শক্তির দুইটি পৃষ্ঠ; তাই আকর্ষণ বিকর্ষণের ন্যায়, ও-দুইটি শক্তির মধ্যে এ-পিট ও-পিট সম্বন্ধ। ঐ দুই শক্তি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী অথচ একটিকে ছাড়িয়া আর-একটি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারে না। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা'র অভ্যন্তরে তলাইয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার এক-পক্ষে জীবনী-শক্তি এবং আর এক পক্ষে ভৌতিক এবং রাসায়নিক শক্তি—এই দুই শক্তিই এখানকার যোদ্ধৃপক্ষ। যেখানকার ভৌতিক এবং রাসায়নিক ভাব গতি যেরূপ সেখানকার উদ্ভিদের জীবনী-শক্তি সেই-রূপ দেশ কাল অবস্থোচিত নিয়মে নিয়মিত হয়। একদেশের উদ্ভিদ্ যদি ঘটনা-ক্রমে নিতান্তই ভিন্ন দেশে নিপতিত হয়, তবে কাল-ক্রমে সেই উদ্ভিদ্‌টির কিয়ৎ পরিমাণে জাত্যন্তর ঘটনা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। জীবনী-শক্তি পারৎ-পক্ষে উদ্ভিদের বা জীবের সাজাত্য রক্ষা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে না; কিন্তু হইলে হইবে কি—জগৎ ক্রমাগতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে; সাজাত্যকে অপরিবর্ত্তিত এবং অবিচলিত ভাবে একই স্থানে বাঁধিয়া রাখা জীবের সাধ্যায়ত্তও নহে প্রার্থনীয়ও নহে; বদ্ধ-বায়ু, বদ্ধ-জল, এবং নবোদ্যমশূন্যতা জীবনের নিতান্তই শত্রুপক্ষ। প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপরেই সমস্ত জগৎ দণ্ডায়মান—প্রতিদ্বন্দ্বিতাই জগতের প্রাণ। প্রতিদ্বন্দ্বিতাই জীবনের উৎস। শৈত্য উত্তাপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিলে বায়ুর চলাচলি বন্ধ হইয়া গিয়া জীবের শ্বাসরোধ হইত;—রাত্রি-দিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিলে পৃথিবীতে শৈত্য ঔষ্ণ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক পরিমাণে লোপ পাইত;—সৌর আকর্ষণ বিকর্ষণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিলে রাত্রি দিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিতে পারিত না;—এইরূপ, গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার তরঙ্গ নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছে—এবং তাহারই উপরে সমস্ত জগতের জীবন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব যদি জিজ্ঞাসা কর যে, জীবন কি? তবে তাহার উত্তর এই যে, ভৌতিক শক্তির সহিত নিরন্তর দ্বন্দযুদ্ধে জীবনী শক্তির নিরন্তর জয় প্রাপ্তিই জীবন শব্দের বাচ্য—এবং ঐ সংগ্রামে জীবনী-শক্তির পরাজয় প্রাপ্তিই মরণ শব্দের বাচ্য। অপ্রাণ ভৌতিক জগতে আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা—সপ্রাণ ঔদ্ভিদ্-জগতে সন্ততি-রক্ষিণী এবং সঙ্গতি-রক্ষিণী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা—আগা গোড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা; অতঃপর, প্রকৃতি—চেতন-জগতে কিরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা লইয়া বর্ত্তিয়া রহিয়াছে তাহার প্রতি প্রণিধান করা যাইবে।—শ্রীদ্বি]

ক্রমশঃ।

আবুজী।

অর্ব্বুদাচল আর্ব্বলি পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। ইহার অপর নাম গুরুশিখর। ইহা সমুদ্রতল হইতে ৫০০০ ফিট উচ্চ। ঝাঁপানে করিয়া শৈলে উঠিতে আরম্ভ করা গেল। প্রাকৃতিক শোভা মন্দ নহে। চেনার বৃক্ষের ন্যায় কডু নামে একরূপ শ্বেত বৃক্ষ দেখিলাম। হিংস্র জন্তু এ পর্ব্বতে অনেক। অসভ্য ভীল জাতির ভয়ে পূর্ব্বে এস্থানে আসা বড় সহজ সাধ্য ছিল না, কিন্তু এক্ষণে দুর্দ্দান্ত ইংরাজ শাসনে সেই ভীলজাতি ধনুর্ব্বাণ লইয়া আড্ডায় আড্ডায় শান্তি রক্ষা কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছে। ক্রমশঃ ইংরাজ-সমাশ্রয় আবু অতিক্রম করিয়া দিলওয়াড়ায় উত্তীর্ণ হওয়া গেল। ভিত্তি বেষ্টিত এক-স্থানে কয়েকটি মলিন দেবায়তন রহিয়াছে দেখা যাইতে লাগিল। উহার কিছুমাত্র সমৃদ্ধি নাই। হৃদয় স্তম্ভিত হইল। মুখে বাক্য সরে না। কি ছবি হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিয়াছি, আর এখন কি দেখিতেছি। আমার সহচরকে কিছু বলিতে পারিলাম না। তিনিও সে বিষয়ে কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। নীরবে দুইজনে চেয়ার হইতে অবতরণ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি শ্রাবক! আমরা কহিলাম, না বৈষ্ণব। শাক্ত বলিলে বুঝিবে না, এজন্য বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে হইল। সে আমাদিগকে কোন মহাজন অর্থাৎ বণিক ভাবিয়া বাসের জন্য এক গৃহ খুলিয়া দিল। মন্দির মধ্যে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে পর দুইজন দ্বারবান আর এক প্রাচীরের মধ্যে লইয়া চলিল। সে-খানে গিয়া আরও নিরাশ হইলাম। একটি ঘর খুলিল, তাহার মধ্যে মন্দির নির্ম্মাতা বিমলসাহ ও তদীয় শেঠানীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। দশটা শ্বেত হস্তী ও আরোহীর মূর্ত্তি গৃহের মধ্যস্থলে বিরাজমান। ভাবিলাম খুব দেখা হইল—এই দেখিতে এত পরিশ্রম করিয়া খিরওয়াড়ি হইতে আসিয়াছি কি?

এমন সময় একজন কুঞ্জি লইয়া আসিল। অপর দিকে আর এক দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। উহা আর একটি মহল। অহো! যেন বৈকুণ্ঠের দ্বার খোলা হইল। সম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠ শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত। স্তরে স্তরে যেন পুষ্পরাশি রহিয়াছে। চিত্তমলা দূর হইল—নয়ন ও মন জুড়াইল। ধর্ম্ম মন্দির বাহির হইতে আড়ম্বর শূন্য দেখান ভাল, অথবা দস্যুর যাহাতে লোভনীয় না হয়, এই উদ্দেশেই বোধ হয় এই অতুল সৌন্দর্য্য প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। আমাদের সহিত দ্বাদশ জন বাহক ছিল—তাহারাও এই সুযোগে দেখিয়া লইবে বলিয়া প্রবেশ করিতে চাহিল। প্রহরী তাহাদের জাতি জিজ্ঞাসা করিয়া ভিতরে আসিতে দিল। চৌর্য্য যাহাদের কুলাচার, সেই জাতি না হয় এই অভিপ্রায়েই বোধ হয় প্রহরীগণ জাতি জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। স্থানটি ১২৮ হস্ত

দীর্ঘ ও ৭২ হস্ত প্রস্থ হইবে। ভিত্তির ভিতর অংশে দৈর্ঘ্যের দিকে ১৭ ও প্রস্থের দিকে ১০টি করিয়া কুঠরি। কুঠরির সম্মুখে যুগ্ম স্তম্ভশ্রেণী-সজ্জিত দালান চলিয়াছে। প্রতি কুঠরিতে এক ক্ষুদ্র বেদি, তাহাতে উত্তান পাণিপাদ ধ্যানাবলম্বিত তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি। প্রতি চতুঃস্তম্ভ অন্তরালে সমতল বা খিলানের মত ছাদ। এতৎসমস্তই উৎকৃষ্ট মারবল-নির্ম্মিত। প্রত্যেক স্তম্ভ, ছাদের খিলান এবং বেদির প্রকার বিভিন্ন ও শিল্পের অলঙ্কারও ভিন্ন প্রকারের। উহার কারু কার্য্যের প্রাচুর্য্য ও নির্ম্মাণের সৌন্দর্য্য বর্ণনার আয়ত্ত নহে। এ সকল ছাড়াইয়া মন্দির সম্মুখে মণ্ডপ। ইহাতে যে স্তম্ভ শ্রেণী আছে তাহার কারু-কার্য্য অতি বিস্ময়কর। যেন হস্তিদন্ত খুদিয়া ফুল, পাতা ও কাণ্ড বাহির করিয়াছে। স্তম্ভ গাত্রে উপরে একটা স্তর রাখিয়া মধ্যে আর একটা কারুকার্য্যের স্তর নির্ম্মাণ নিতান্ত অদ্ভুত ব্যাপার ; ছাদের ভিতর দিক ফুলের আকার-গহ্বরে সম্পূর্ণ খোদিত বা জৈন পৌরাণিক মূর্ত্তি পূর্ণ। 'নকাশীর' কর্ম্ম-বিহীন এক অঙ্গুল পরিমিত স্থান পাওয়া দুষ্কর। এরূপ অতিসূক্ষ্ম খোদকারীর কর্ম্মে ভারতবর্ষে ইহার প্রতিযোগী নাই। তাজমহল 'পচ্চিকারী' কর্ম্মের জন্য অতুল, খোদকারীর জন্য নহে। যে তাজমহল দেখিয়াছে তাহার একবার বিমলসা দেখা কর্ত্তব্য। সম্রাট জাঁহাঙ্গিরের পূর্ব্বে প্রস্তরের উপব "পচ্চিকাবী" কর্ম্ম কোথাও দেখা যায় না। ইংরাজ পুরাণকার কহেন সাজাহানের কর্ম্মে কয়েকজন ইউরোপীয় শিল্পি ছিল তাহাদের শিক্ষা অনুসারে "নগোঁকা কাম" করা হয়। এই কথায় আমাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই।

উল্লিখিত শিল্পে দুইটি অভাব দেখিলাম, রঙ্গিন পুষ্প ও পত্র নির্ম্মাণে আলোক ছায়ার ভেদ নাই। আর স্বাভাবিক পুষ্পের অনুকরণ না করিয়া কাল্পনিক আদর্শের পুষ্প বিনির্ম্মিত হইয়াছে। প্রথমটির কথা ছাড়িয়া দ্বিতীয় বিষয়ে এই বলা যাইতে পারে, যে এ দেশ অদ্ভুত প্রিয়। সুতরাং শিল্পির রুচি কি করিয়া স্বভাবের দিকে যাইবে ? কিন্তু সুন্দর কল্পিত বিষয় প্রদর্শন করাই শিল্পের উদ্দেশ্য। আপনাকে আপনি প্রকাশ করাই তাহার কাজ। শিল্পের নিজের একটা জীবন আছে। প্রাণি জগৎ বা নৈসর্গিক সামগ্রীর যে অনুকরণ করিতেই হইবে, এমন কোন কথা নহে।

বিমলশার মারবল চন্দ্রবতি নামক স্থান হইতে আনীত। কথিত আছে পূর্ব্বে এই স্থানে শিব ও বিষ্ণুর মন্দির ছিল। পূজককে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভূমির মূল্য এত রজত মুদ্রা দিতে হইয়াছে, যে সেই টাকা এক একটী করিয়া রাখিলে, ক্রীত ভূমি সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হয়। ১০৩২ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জর দেশান্তর্গত পাটন নিবাসী বণিকশ্রেষ্ঠ বিমলসাহ অষ্টাদশ কোটী মুদ্রা ব্যয়ে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করেন। ইহা প্রস্তুত হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর লাগিয়াছিল। ইদানীং সিরোহি ও অহম্মদাবাদ নগরস্থ পঞ্চায়েত কর্ত্তৃক মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া থাকে। যে সকল শ্রাবক তীর্থ যাত্রা করিতে আগমন করে, তাঁহারা সঙ্গতি অনুসারে দশ টাকা

হইতে সহস্র টাকা পর্য্যন্ত ভাণ্ডারে জমা দেয়। তদ্দ্বারা মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। পূজারি ও সশস্ত্র দ্বাররক্ষক সংখ্যায় ষোল জন। মন্দিরে কোনও যতি নাই। পূজারি ও যতি ব্রাহ্মণ বর্ণ হইতে গৃহীত হয়। এই মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া তেজপাল ও বস্তুপাল ভ্রাতৃদ্বয় নির্ম্মিত মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করা গেল। ১১৯৭ হইতে ১২৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই দেবালয় প্রস্তুত হইয়াছে। চতুঃশালী অলিন্দ, মণ্ডপ প্রভৃতি সমস্তই বিমলসার ন্যায়। কিন্তু কারু কার্য্যের পারিপাট্য তদপেক্ষা অধিক। মন্দিরের মুখে উভয় পার্শ্বে জেঠানী ও দেবরাণীর দুইটী তাখ। তাহার নক্কাশী এমন সূক্ষ্ম যে এক একটা প্রস্তুত করিতে কথিত আছে সওয়া লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তেজপাল, বস্তুপাল নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করিলে তাঁহাদের পত্নীদ্বয় কহিল;—"ইহাত তোমাদের হইল, আমাদিগের জন্য কি করিলে?" তাহাতেই এই তাখ দুইটী বিনির্ম্মিত হয় ও সেই জন্যই ইহার নাম জেঠানী ও দেবরাণীর তাখ হইয়াছে। প্রবাদ আছে, স্থপতিগণ নকশা খুদিতে যে পাথরের গুঁড়া বাহির করিত, তাহা ওজন করিয়া যতটুকু হইত ততখানি ওজনের রৌপ্য ঐ কার্য্যের বেতন পাইত। ফলতঃ খোদকারীর গভীরতা অতিশয় দেখা গেল। এপ্রকার ভাস্কর্য্য যাহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাদের স্থাপত্য বিদ্যায় অসাধারণ জ্ঞান ছিল সন্দেহ নাই।

সায়ংকালে আরতি দেখিবার জন্য বিমল সাহের মন্দিরে প্রবেশ করা গেল। প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের অতি প্রকাণ্ড অরুণ বর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি দীপালোকে মণিময় কণ্ঠভূষা উদ্ভাষিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। চক্ষু দুইটী হীরার, কর ভূষণ তদুপযুক্ত স্বর্ণ-নির্ম্মিত। এখান হইতে তেজপালের মন্দিরে যাওয়া হইল। তখন আরতি আরম্ভ হইয়াছে। এখানে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত শেষ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের নাতিদীর্ঘ মূর্ত্তি নানা সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। আরতির দীপ নামাইবার জন্য আমাকে সওয়া মন ঘৃত মানসিক করিতে কহিল। সেই দীপ লইয়া মন্দিরস্থ অন্যান্য মূর্ত্তির আরতি করিয়া বহির্দ্দেশের তাবৎ মন্দিরে আরতি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমরা দুই জনে ভক্ত শ্রাবকের মত অনুবর্ত্তন করিতে লাগিলাম। তাহাতে সমস্ত দেবালয় দেখা হইল। বিমলশা তেজপাল ও বস্তুপালের মন্দির ভিন্ন অপরগুলি শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত নহে। জৈন যাত্রীদের সহিত বিবিধপ্রসঙ্গে বহুক্ষণ যাপন করিয়া শয়ন করিলাম। ঋষভদেবের বক্ষঃবিলম্বিত বড় বড় মরকত গুলার দীপ্তি বার বার মনে হইতে লাগিল। জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামে দুই শ্রেণী আছে। শ্বেতাম্বরী শ্রেণী বোধ হয় লোপ হইয়াছে। দিগম্বরীরা মহাপুরুষের মূর্ত্তিকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিবে কিন্তু বস্ত্র পরাইবে না। কারণ তাহা হইলে নির্গ্রন্থ অর্থাৎ বন্ধন রহিত হওয়া যায় না। যেমন অন্তরে সঙ্গরহিত, তেমন বাহ্য শরীরেও বস্ত্রাদি সঙ্গরহিত না হইলে কি চলে? বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মিশ্রণে

জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি। মাধবাচার্য্য উপহাস করিয়া বলিয়াছেন—এ ধর্ম্মে কেবল বিশেষের মধ্যে পিচ্ছিকাগ্রহণ, কেশোল্লুঞ্চন, ও মুখবন্ধন আছে। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের নাম মহাবীর। জগৎকে “জন্য” কহে না, অথচ কোনও সর্ব্বজ্ঞ আত্মা আছেন এমন বিবেচনা করিয়া থাকে। যে সকল মহাপুরুষ যোগবলে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তীর্থঙ্কর নামে অভিহিত হন ও তাঁহারাই জিন। জিয়তি রাগদ্বেষ মোহানিতি জিনঃ। পূজা পদ্ধতি;—ওঁম্ হ্রীং ঋষভেয় স্বস্তি। ওঁম্ হ্রীংহম্, ওঁম্ হ্রীং শ্রীসুধর্ম্মাচার্য্য আদি গুরুভ্যো নমঃ। ওঁম্ হ্রীং হ্রীংম্ সমজিন চৈত্যালেভ্যঃ শ্রীজিনেন্দ্রেভ্যোনমঃ।*

কাশী অঞ্চলে বণিয়াদের মধ্যে একজাতিতে জৈন ও হিন্দু উভয় মতাবলম্বী আছে। এক্ষণে অনেক জৈন হিন্দু হইতেছে। জৈনরা যে হিন্দু নহে এমন বলিতেছি না। উহাদিগের শাস্ত্র পৃথক এই জন্য উক্ত প্রকার বলিতে হয়। জিনের উপাসনা ত্যাগ করিয়া যাহারা বিষ্ণুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছে তাহাদের সম্বন্ধে জৈন হইতে হিন্দু হওয়া বলা হইল। কাশীতে আগরওয়ালারা প্রায় অর্দ্ধেক জৈন। অনেক স্থানে জৈন ও বৈষ্ণব আগরওয়ালার বিবাহ হয়। বৈষ্ণব স্বামী যদি জৈন স্ত্রী গ্রহণ করেন, সে স্ত্রী বৈষ্ণব হইবে। জৈন স্বামী যদি বৈষ্ণব স্ত্রী গ্রহণ করেন সে জৈন হইবে না—এবং সমর্থ পক্ষে আপনি স্বহস্তে রাঁধিয়া খাইবে। মৈনপুরী হইতে আগত কাশীতে বৌদ্ধমতি নামে জৈন আছে। ধর্ম্ম স্বভাবতঃই খিচুড়ি হইবার জিনিস। মোরাদাবাদ ও বিজনোরে বিঞ্চুই বলিয়া এক সম্প্রদায় আছে, তাহারা কোরাণ পাঠ করিয়া থাকে এবং একাদশীর ব্রত করে। উভয় কার্য্য এক ধর্ম্মের অঙ্গ করিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন জিনধর্ম্ম বুদ্ধধর্ম্ম হইতে সংজাত নহে। বহুকাল ধরিয়া স্বতন্ত্র ভাবে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু জৈন আখ্যায়িকাগুলি আলোচনা করিলে তাহার মূল বৌদ্ধধর্ম্মে ও আমাদিগের পুরাণে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনেরা বেদ মানে না বলিয়া হিন্দুর শত সহস্র সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান পায় নাই।

হিন্দু শাস্ত্রে বিরুদ্ধ মত আছে। থাকিবারই কথা। হিন্দু জাতি একজন বিশেষ ব্যক্তিকে কখনও চির-নিয়ন্তা ভাবে নাই। তাহাদের শাস্ত্র একজনে লিখে নাই। এক সময়ের লেখাও নহে। দেশ কাল পাত্র ভেদে যখন যাহা শ্রেয়ঃ বলিয়া সমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, তাহাই তখনকার হিন্দুধর্ম্ম। নানা ঋষি (পণ্ডিত) গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বাধীন মত ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু সমাজ তাহার সকলগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় নাই। এখানে সমাজ ও ধর্ম্ম এক কথা। সমাজ না মানিলে ধর্ম্ম যায়। তোমার পরলোক বা ইহলোক সম্বন্ধে চলিত মত ভিন্ন যদি অন্য মত থাকে এবং হিন্দু সমাজের আচার ত্যাগ না কর, তবে তুমিও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। হিন্দুধর্ম্ম ঈশ্বর-নাস্তিককে

* বঙ্গদর্শন। জৈন ধর্ম্ম।

গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু কর্ম্ম নাস্তিককে গ্রহণ করিবে না। হিন্দুধর্ম্ম যাহা মানিয়াছে, তাহা এখন মানে না। যাহা এখন মানিতেছে, তাহা অতঃপর মানিবে না। সমাজ এক, এই জন্য শাস্ত্র এক বলিতে হয়। সমাজের লোকের প্রকৃতি বিভিন্ন, এজন্য শাস্ত্রের মত এক নহে। সকলের জ্ঞান সমান নহে, তবে ভিন্ন ভিন্ন লোকের লেখা কি করিয়া এক হইবে? উপনিষদে লিখিত আছে, যিনি বলেন ঈশ্বরকে জানা যায় তিনি ঈশ্বরকে জানেন না। যিনি বলেন ঈশ্বরকে জানা যায় না, তিনি ঈশ্বরকে জানেন। যিনি বলেন ঈশ্বর জানা যায়, তিনি ঈশ্বরকে জানেন না, এ বাক্যের ভক্তি শাস্ত্র সম্মত অর্থ হইলে হইতে পারে। কিন্তু যিনি বলেন ঈশ্বরকে জানা যায় না, তিনিই ঈশ্বরকে জানেন; এ কথার অর্থ কি? যাহা জানা যায় না, তাহার আবার জানা কি? অবশ্য "নাই" এই কথাকে জানা বুঝাইতেছে। পূর্ব্ব মীমাংসা প্রণেতা মহামুনি বলেন, যজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ফল দেবতা দেন না, আপনা হইতেই হয়। দেবতা নাই। যাহা নাই তাহার জন্য কিন্তু কার্য্য চাই। সাংখ্য ঈশ্বর মানেন না। তিনি সংখ্যা করিয়া দেখিয়াছেন, সৃষ্টির মূল পদার্থগুলি গণনা করিয়া যতগুলি সংখ্যক হয়, তাহার মধ্যে ঈশ্বর ধরিতে হয় না। কিন্তু বেদ মানেন। বেদ তখনকার সমাজ শাস্ত্র। ঈশ্বর না মানিলে চলে, কিন্তু সমাজ না মানিলে চলে না। সমাজ মানিতে হইলে সুতরাং বেদ মানিতে হয়। নহিলে জৈন বৌদ্ধবৎ পৃথক সম্প্রদায় হইয়া পড়িতে হয়।

আমরা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বিমলশা মন্দিরের মণ্ডপে গিয়া বসিলাম। কোনও স্থানের মাধুর্য্য সম্যক উপভোগ করিতে হইলে বসিয়া দেখা আমার অভ্যাস। মন্দিরের চিত্রখানি কথঞ্চিৎ হৃদয়ে আঁকিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম। অতিশয় সভ্য অবস্থাতেও পুরাতন অসভ্য রীতির চিহ্ন বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য জাতির আদিম অবস্থায় বলপূর্ব্বক স্ত্রী হরণ করিয়া ভার্য্যা করা হইত; সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ ভিন্ন কার্য্য সমাধা হইত না। অধুনা সেই প্রথার অনুকরণে রহস্য ভাবে বরকে লঘু প্রহার সহ্য করিতে হয়। সেইরূপ স্থপতি কার্য্যেও আদিম প্রথার চিহ্ন ঘুচে নাই। এই যে বিমলশার মন্দির, যেখানে স্থপতি বিদ্যা উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সেখানেও বৃক্ষকাণ্ড ও শাখার আদর্শ হইতে যে স্তম্ভের উৎপত্তি, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হয়। বৃক্ষ কাণ্ড সকল সমোচ্চ না হওয়ায় পাড় সংস্থাপনের যে অসুবিধা ঘটিত, তাহা নিবারণার্থে খর্ব্বতরগুলির অগ্রভাগে প্রস্তর ফলক প্রভৃতি স্থাপন করিয়া তাহা রজ্জু দ্বারা বন্ধন করা হইত। এইরূপ আদর্শ হইতেই স্তম্ভাগ্র বা বোধিকার সৃষ্টি হইয়াছে। অধিষ্ঠান অর্থাৎ থামের গোড়াবন্দির নির্ম্মাণ রীতিও প্রায় উক্ত প্রকারে উদ্ভূত হইয়াছিল। আরব জাতির গৃহ নির্ম্মাণ তাম্বুর অনুকরণে। তাহারা পূর্ব্বে বস্ত্রাবাস প্রস্তুত করিয়া বাস করিত। কারণ উহারা বহুদিন এক স্থানে স্থায়ী হইত না। সেই জন্য ইদানীং তাহাদের হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ প্রণালীতে কঙ্গুরা

এত অধিক দেখা যায়। বঙ্গদেশীয় শিবালয় দেখিলে ঠিক যেন খড়ুয়া ঘরের আকার প্রতিভাত হয়। যেন শাঁখার অনুকরণে বাউটী প্রস্তুত হইয়াছে। যেটি মূল গঠন, তাহা অবিকৃত আছে। আনুসঙ্গিক বিষয়ে বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আদিম কালের বৃক্ষ কাণ্ডের রীতিতে সেই স্তম্ভাগ্র বসান প্রথা আছে, কিন্তু পুষ্পবোধিকা, তরঙ্গবোধিকা প্রভৃতির শিল্প, অধিস্থান উপপীঠ প্রভৃতির সমৃদ্ধি, স্তম্ভবপু ও প্রস্তরাগ্রের কারুকার্য্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে অন্য জগতে আসিয়া পড়িতে হয়। ভারতীয় মন্দির নির্ম্মাণ প্রণালী পাঁচ প্রকার; বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, তামিল ও কাশ্মিরী। উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত ও নেপালের বৌদ্ধ-স্থাপত্য পরস্পর বিভিন্ন। উড়িষ্যা, মধ্য ভারতীয়, বাঙ্গালা এবং কাশী অঞ্চলের মন্দির এক প্রকার নহে। এতদ্ভিন্ন মিশ্র বা হিন্দু সারাসেনিক মন্দির আছে।

অদ্যই আহম্মদাবাদ যাত্রা করিব। স্নান, ভোজন আবুরোড ষ্টেশনে হইবে। ভৃত্য একাকী আমাদের প্রতীক্ষায় খিরওয়াড়ির বাসায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া আছে। এই সকল চিন্তা করিয়া মণ্ডপ হইতে উঠিতে হইল। নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত চলিলাম। পশ্চাৎ ফিরিয়া বার বার শেষ দেখা দেখিয়া লইতে লাগিলাম। আমার চরণ যুগলে কে যেন নিগড়বদ্ধ করিয়া গতি নিবারণ করিতে লাগিল। এমন সময় প্রহরী সেই সৌন্দর্য্যের ললামভূত প্রাসাদের দ্বার বন্ধ করিল। ধর্ম্মশালায় আসিয়া বস্ত্রাদি লইয়া যাত্রা করিলাম। আবুজী হইতে আবুরোড ৭ ক্রোশ। পৌছিয়া শুনিলাম অদ্য আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না। আমার গাইড পুস্তকে যে সময় লিখিত আছে তাহা প্রকৃত নহে। অপরাহ্ন কালটা বারান্দায় বসিয়া রাজপুতানার প্রকৃতিপুঞ্জ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। এদেশে বুঝি সকলেই অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করে। উষ্ট্রপালক কয়েকটা উষ্ট্র লইয়া যাইতেছে, তাহারও হাতে বন্দুক। সাদৃশ্য ও সম্প্রসারণে চিন্তা ফিরে। আমার এখানে কলিকাতা ইন্‌টার ন্যাশনেল এক্‌জিবিসন মনে পড়িল। রাজপুতানা প্রকোষ্ঠে অস্ত্র শস্ত্র ভিন্ন আর বড় কিছু ছিল না। ইহাই বোধ হয় এখানকার প্রধান বস্তু। দুই চারিটার নামোল্লেখ করা যাক্। তরবার—লহের দরিয়া, দোহেরি, কষ্টিদোদরি, ধুপ, তেগদলিলখানি, শমশের অরাদম, খণ্ডাঅলৈমণি, নাগফনা। তরফনা কটার—ইশ্‌পাতের কমান অর্থাৎ ধনুর্ব্বাণ, ভালা, নাগপাশ, ফুলহরি, তবল, তমাচা, বন্দুক—পথরদার ও টোপিদার, খঞ্জর প্রভৃতি।

শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি।

স্বভাব ও সাহিত্য।

চির বিচিত্রতাময়ী রহস্যাবগুণ্ঠিতা প্রকৃতির সুগভীর হৃদয়ের মধ্যে ডুবিয়া মানব যখন তাহার প্রবহমান আনন্দস্রোত আপন অন্তরে অনুভব করিতে পায়, তখন প্রকৃতির ভাষা ব্যক্ত করিবার জন্য সহজেই সে ব্যগ্র হইয়া উঠে। তাহার হৃদয়ের শিরায় উপশিরায় সেই সৌম্য সৌন্দর্য্য যতই মুদ্রিত হইতে থাকে, সে তাহা না ব্যক্ত করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতিদীপ্ত-হৃদয়কে জগতে বিকশিত করিয়া তুলাই তখন তাহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—মানব শিশুর নিকট সেই দীপ্ত রহস্যশ্রী ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এই রহস্যানন্দের প্রকাশেই সাহিত্য রচিত হয়। এই জন্যই সাহিত্যের আদি অন্ত মধ্য কেবলই আনন্দ। যে সাহিত্যে আনন্দের যত স্ফূর্ত্তি সেই সাহিত্যই তত উন্নত, গভীর।

প্রকৃতির আনন্দ তাহার গভীর জীবনে। প্রকৃতি প্রাণে ওত প্রোত। এই প্রাণ আমরা যতই উপভোগ করিতে থাকিব, আমাদের হৃদয়ে আনন্দ ততই বদ্ধমূল হইবে। প্রকৃতির জ্যোৎস্নায়, রৌদ্রে, শ্যামলতায়, সর্ব্বত্রই প্রাণ প্রস্ফুটিত। ছায়াময় শারদীয় নিশীথে শুভ্র-নীল গগনপ্রান্ত হইতে পূর্ণহৃদয়া চন্দ্রমা যখন শ্রান্ত সুপ্ত জগৎকে জ্যোৎস্নাবরণে ছাইয়া ফেলেন, তখন আমাদের হৃদয় পুলকে শিহরিয়া উঠে কেন? ধীরে ধীরে আমাদের অন্তরে কত ভাবের সঞ্চার হয়, কত স্মৃতি বিস্মৃতির নীরব আকুলি ব্যাকুলিতে হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। শত শুভ্র তাড়িতালোকে ত কৈ হৃদয় সেরূপ উঠে না। কারণ আর কিছুই নহে, প্রাণ। নীল আকাশের দিকে তাকাইয়া, দূর অস্পষ্ট তরঙ্গায়িত ছায়া-বৃক্ষাবলীর শ্যামলতার পানে চাহিয়া যুগ যুগ কাটান যায়, কিন্তু সযতনে সজ্জিত কড়ি এবং জানালাবর্গের শুভ্র ও সবুজ রঙের উপরে দুই দণ্ড দৃষ্টি স্থির রাখা যায় কি না সন্দেহ। কারণ কি আর বলিতে হইবে? কেবলই এই প্রাণ। প্রাণের যেখানে যেরূপ অভিব্যক্তি, সেখানেই সেইরূপ আনন্দ।

সাহিত্যের ক্ষেত্র কি তবে জ্যোৎস্না, আকাশ, নদী, সমুদ্র, নিবিড় বনানী, এবং রৌদ্রতপ্ত ধরণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ? না। প্রকৃতির প্রাণ যেখানে অভিব্যক্ত, সেখানেই সাহিত্যের সাম্রাজ্য। মানবের হৃদয়ও সাহিত্যের অধিকারের মধ্যে! মানব-জীবনের মত জীবন্ত জটিল রহস্য সংসারে বিরল। সুতরাং সাহিত্যের এক প্রশস্ত ক্ষেত্র মানবজীবন। এই রহস্য-জীবনের সৌন্দর্য্য, ক্রমাভিব্যক্তি, ইহার প্রত্যেক খুঁটিনাটি মিলন বিরহ, সুখ দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা অক্ষমতা, হাসি অশ্রুর মধ্যে কল্পনা হারাইয়া যায়।

ইহা ত গেল সাহিত্যের ক্ষেত্রের প্রসরের কথা। স্বভাবের সর্ব্বত্রই সাহিত্যের গতিবিধি। কিন্তু সাহিত্যে স্বভাব কিরূপ ভাবে ব্যক্ত হয়? সংক্ষেপে বলিতে গেলে

সমালোচনায়। তবে সমালোচনার মধ্যে প্রকারভেদ আছে যেমন কবিতা, উপন্যাস, বিবিধ প্রবন্ধ। ইহাদের মধ্যেও আবার নানা বিভাগ আছে, তাহার উল্লেখ এখানে বোধ করি অনাবশ্যক। তবে সকল সমালোচনের মধ্যে বিশ্লেষণ সাধারণ নিয়ম বলা যাইতে পারে। একজন সমালোচক পাঠককে খুঁটিনাটি আচ্ছন্ন না করিয়া, কিছু না বলিয়া কহিয়া অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে প্রকৃতির হৃদয়ের মধ্যে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেন, পাঠক ভাব অনুভব করিয়া আকুল হইয়া উঠেন। আর এক ব্যক্তি তন্ন তন্ন খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ দ্বারা ভাব পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পান। কেহ লাইন টানিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কেহ প্রতিভার প্রভাবে ছায়া ধরিয়া আনেন, ছায়া দেখিয়া মূল বুঝ।

পাশ্চাত্য গ্রন্থকার ম্যাথু আর্ণল্ড সাহিত্যকে জীবনের সমালোচনা বলিয়া গণ্য করেন। বাস্তবিকই সাহিত্য জীবনের সমালোচনা। বিশেষরূপে প্রকৃতির প্রাণ আলোচনা করাই তাহার উদ্দেশ্য। সম্যক্ আলোচনা দ্বারা সেই প্রাণ যত প্রস্ফুটিত করিতে পারিবে, ততই সাহিত্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। সাহিত্যে হৃদয়ে হৃদয়ে আদান প্রদান চলে, প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন হয়। জড় দেহের উপর একটা শুভ্র আচ্ছাদন টানিয়া দিয়া কাঠামকে লোকে অনেক সময় সাহিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়, কিন্তু প্রাণহীন দেহবৎ সে সাহিত্যের যথার্থ কোনও মূল্য নাই। আচ্ছাদনতলে কেবলই কুঞ্চিত গলিত শবদেহ।

সুকবির রচনা পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হই কেন? কারণ বিশেষ দূর নহে, আমরা প্রাণের সাড়া পাই বলিয়া, প্রাণ অনুভব করি বলিয়া। প্রাণ অনুভব করিয়া আমরা খেলাইবার খানিকটা জমি পাই, পিঞ্জর বদ্ধ সঙ্কীর্ণতা ভুলিয়া মুক্ত বায়ু সেবনে পরিতৃপ্ত হইয়া উঠি। জ্যোৎস্নায় ডুবিতে ডুবিতে কবি গাইলেন,

"ডুবে যাই, ডুবে যাই—
আরো আরো ডুবে যাই।"

আমরাও এই সঙ্গে ডুবিবার অবসর পাইলাম। যত ডুবি ততই জ্যোৎস্না, ততই আনন্দ। ডুবিয়া ডুবিয়া কূল আর পাই না, আরও ডুবিতে চাহি, আরও ডুবিতে থাকি, অগাধ জ্যোৎস্না আর অগাধ আনন্দ। প্রাণ কতখানি মুক্ত হইল! তাহার রাজ্য কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিল!

অনেক বিষয়ে যে আমরা আনন্দ পাই, তাহার মূলে প্রাণ। কিন্তু অভ্যাসবশতঃ কিম্বা কি কারণে জানি না, সেই প্রাণ অনেক সময় ধরিতে পারি না। চুম্বনের মধ্যে, আলিঙ্গনের মধ্যে, মিষ্ট কথার মধ্যে প্রাণের অন্তস্থই আনন্দ বিকশিত করিতেছে। চুম্বন যদি শুধু দু'টী অধরের ক্ষণিক মিলন মাত্র হইত, তাহার হৃদয়ের মধ্য হইতে দুইটী আত্মহারা প্রাণ ব্যাকুল বাসনা ঢালিয়া দিয়া প্রেমের মন্দির প্রতিষ্ঠা না

করিত, তাহা হইলে কি তাহার মধ্যে আনন্দের স্ফূর্ত্তি হইত? দেহের ব্যবধান ভাঙ্গিয়া প্রাণে প্রাণে মিলিতে চায় বলিয়াই না আলিঙ্গনের সুগভীর তৃপ্ত? মিষ্ট কথার অন্তরে প্রাণের আহ্বানধ্বনি শুনা যায় বলিয়াই তাহাতে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। শব্দ শাস্ত্রমথিত বহুযত্নে সংগৃহীত সুবিন্যস্ত বাক্যাবলীও প্রাণকে আকর্ষণ করিতে পারে না। প্রাণ চাহে প্রাণ, প্রাণ জাগে প্রাণে। এই জন্যই সাহিত্যে প্রাণের আবশ্যকতা। যেখানে প্রাণের অভাব সেখানেই নিরানন্দ।

হৃদয়কে জড় নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিলে ক্রমে ক্রমে তাহার মধ্যে প্রাণ শুকাইয়া আসে। ইহাই বিকারের অবস্থা। জড়তা অস্বাভাবিক। স্বভাবে সৌন্দর্য্যের চির-প্রবাহ। আমাদের হৃদয়েও প্রবাহ যাহাতে রুদ্ধ না হয় দেখা উচিত। মুক্তপ্রাণ কবি স্বভাবের মধ্যে যে আনন্দ অনুভব করেন, সে কেবল তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবলবেগে সৌন্দর্য্যপ্রবাহ বহিতেছে বলিয়া। প্রভাতে সুশীতল সমীরণান্দোলিত বৃক্ষ দেখিয়া তিনি গাহিয়া উঠিলেন, "পুলক নাচিছে গাছে গাছে।" বিদ্রূপ পরায়ণ সঙ্কীর্ণ হৃদয়—যে কখনও প্রকৃতির মধ্যে এমন আনন্দ উপভোগ করে নাই, যে ব্যক্তি প্রকৃতির প্রাণে নিমগ্ন হয় নাই—চস্‌মার মধ্য হইতে অবিশ্বাসনেত্রে মিটিমিটি চাহিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবে না। তাহার নিকটে প্রাণ উপহাসের সামগ্রী। প্রকৃতিকে উপভোগ করিতে হইলে তাহাতে ডুবা চাই। আত্মদৃপ্তের নিকট স্বভাব জড়, নিশ্চেষ্ট।

স্বভাবের সহিত সাহিত্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। সাহিত্য স্বভাব ছাড়িয়া একপদ অগ্রসর হইতে পারে না। স্বভাবের অন্তর্গত কি না? চুম্বন বল, আলিঙ্গন বল, স্নেহ বল, প্রেম বল, বাহিরে অন্তরে সর্ব্বত্রই ত স্বভাবের রাজ্য। নহিলে সাহিত্যের মধ্যে এ সকল কি ঠাঁই পাইত? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বভাবের সর্ব্বত্রই সাহিত্যের গতিবিধি।

এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধহেতু স্বভাবের ন্যায় সাহিত্যেও ছায়া আলোকের সামঞ্জস্য বিশেষ আবশ্যক। বড় বড় কবির রচনা অনেক সময় এই ছায়া আলোকের যথোচিত সন্নিবেশেই সুন্দর। ঔজ্জ্বল্যের প্রতি সমধিক অনুরাগবশতঃ আলোকের আত্যন্তিক প্রাচুর্য্যে অপরিপক্ক হস্ত প্রাণ পরিস্ফুট করিতে প্রায় পারে না। স্বভাবে অন্ধকারই আলোককে উজ্জ্বলতররূপে ব্যক্ত করে। উন্নত সাহিত্যেও আলোকের দীপ্তি প্রকাশ করিতে হইলে পার্শ্বে স্থান বুঝিয়া খানিকটা অন্ধকার জড় করিয়া রাখা হয়। অন্ধকারের সান্নিকট্যে আলোকের সম্যক্ অভিব্যক্তি।

যে দিক দিয়াই দেখ, সাহিত্য, স্বভাবজাত—স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের সহিত তাহার প্রভেদ প্রাণ লইয়া। বিজ্ঞান জড়দেহ বিশেষণ করিয়া করিয়া তাহার মূল উপাদান সংগ্রহ করে; সাহিত্য ভাব বিশ্লেষণ করে—জড়দেহের মধ্যস্থ প্রাণ ধরিতে চায়। বিজ্ঞান মলয়-পবনের মধ্যে অম্লজানের অংশ অন্বেষণ করে; সাহিত্য মুক্ত মলয়পবন অনুভব করিয়া তৃপ্ত হয়। সে মলয়ানিলের স্নিগ্ধ ভাবে, মৃদু মধুর সৌরভে, ছায়া-

ময়ী জ্যোৎস্নাময়ী কাহিনীতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সাহিত্য প্রাণব্যাপ্ত, আনন্দ-পূর্ণ। জড়-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি তাহার বিশ্লেষণ হইতে বিশেষ স্বতন্ত্র।

কিন্তু এখন বিশ্লেষণের কথা থাক্। সাহিত্যে যে ছায়া আলোকের কথা উল্লেখ করিলাম, ঘরের নিকট হইতেই তাহার দু'একটী উদাহরণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করি। কুন্দনন্দিনীর চরিত্র আলোচনা করিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? কুন্দ একজন বালিকা, সে নগেন্দ্রকে প্রাণ ঢালিয়া ভাল বাসে মাত্র। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের আর বিশেষ কোনও জ্ঞান নাই। কিন্তু তবু কুন্দকে আমাদের এত ভাল লাগে কেন? উপন্যাসে ভালবাসার কথার অভাব নাই, নায়িকাকুলের দীর্ঘ নিশ্বাস অশ্রুজল ইহা ত বারো আনা উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায়। কুন্দ অপেক্ষা গুণবতী ত সহজেই মিলিতে পারে। কিন্তু বিষবৃক্ষের গ্রন্থকার কুন্দকে যেরূপভাবে ফুটাইয়াছেন, এমন অন্যান্য অনেক উপন্যাস-রচয়িতা পারেন না। কুন্দকে তিনি প্রায় ছায়ায় ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু দু'এক জায়গায় তহোর মুখে চোখে এমনি ভাবে আলোক ফেলিয়াছেন যে, তাহাতেই কুন্দ ব্যক্ত হইয়াছে। কুন্দের পার্শ্বে আবার সূর্য্যমুখী থাকিতে দুইটী চরিত্রই পরস্পরের ছায়ালোকে ফুটিতে পারিয়াছে। চোখে আঙ্গুল দিয়া অবশ্য এ ছায়া আলোক দেখান যায় না, কিন্তু চোখ বুজিয়া ভাবিয়া দেখিলে বুঝা অসম্ভব নহে।

শেষ কথা, সাহিত্যের স্বাভাবিকতা। ভাবের পূর্ণতাই বোধ করি স্বাভাবিকতার লক্ষণ। পূর্ণতার মধ্যে সামঞ্জস্য অবশ্যই আছে। ভাব বিশেষকে যেমন তেমনি ফুটাইতে পারিলেই সাহিত্যে স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়। দুরূহ দুর্ব্বোধ্য শব্দাম্বুধিমথিত কথা সমূহে ভাব চাপা পড়িয়া না যায়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রত্যেক পদে, প্রত্যেক কথায় বক্তব্য ভাব যেমন ফুটিয়া উঠিবে, সাহিত্য স্বাভাবিক এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। ভাবে ভাব উথলিয়া উঠে—রহস্য-বিশেষ ব্যক্ত হইয়া রহস্য-রাজ্যের শত দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। সাহিত্য এই বিস্তৃত স্বভাব রহস্য রাজ্যের চাবী স্বরূপ।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্নেহলতা।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গানান্তে সকলে পুনরুপবিষ্ট হইলে নূতন সভ্যগণ চারিদিক ভাল করিয়া দেখিবার অবকাশ পাইল। চক্ষু বন্ধ অবস্থায় তাহারা যতখানি শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল দেখিল তাহার কোনই কারণ নাই।

গৃহে একখানি চতুষ্কোণ্ টেবিল, টেবিলের দুই প্রান্তে দুইটি মৃণ্ময় ধুনাপাত্রে ধূপ-ধুনা জ্বলিতেছে। মধ্যস্থলে পদ্মবিদ্ধ কতকগুলি খড়্গ। কাছে একটি দোয়াতদানির উপর কতকগুলি ফুলিস্কেপ কাগজ। ইহা ছাড়া টেবিলের উপর, সভাপতির চৌকির ঠিক সম্মুখে ধূনাচুর্ণে পরিপূর্ণ একটি কাচপাত্র রহিয়াছে; সভাপতি মাঝে মাঝে তাহা হইতে ধূনা লইয়া প্রান্তের প্রজ্জ্বলিত ধূনাপাত্রে নিক্ষেপ করিতেছেন। সভাপতির আশে পাশে অনেকগুলি চৌকি, সমস্ত গুলিতে লোক নাই, নবাগত দুইজন ছাড়া গৃহে ১৬ জন লোক মাত্র সমবেত। তাহারা হিন্দুস্থানী পালোয়ান কিম্বা শিক বিদ্রোহীও নহে—সমস্তই বাঙ্গালী ছাত্র। তাহাদের পরিধান পরিচ্ছদেও কিছু অসামান্যতা নাই—সেই ধুতি চাদর পিরাণ। কিছু পূর্ব্বে তাহাদের হাতে এক একখানা যে খড়্গ উঠিয়াছিল—তাহাও এখন টেবিলের উপর পড়িয়াছে। দেখিয়া নবাগতদিগের প্রাণটা যখন আশ্বস্ত হইল—তখন তাহারা নৈরাশ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে করিল, "দেশের অদৃষ্ট বড়ই মন্দ, তাহার কিছু মাত্র আশা ভরসা নাই।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জীবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, বলিলেন—

"ভ্রাতৃগণ, আমরা এই পবিত্র ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যে মহৎব্রত গ্রহণ করিয়াছি, হিতকর অনুষ্ঠানে জাতিগত মাহাত্ম্য বৃদ্ধিই ইহার মূল সঙ্কল্প, দেশোন্নতিই ইহার চরম উদ্দেশ্য। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃত উপায় কি? দেশে ধন বৃদ্ধি ও শিক্ষা বিস্তার!

প্রবাদ আছে লক্ষ্মী সরস্বতী দুই ভগিনী সপত্নী—ইহাদের একজনকে আরাধনা করিলে অন্যজন অপ্রসন্ন হন। কিন্তু আধুনিক অভিজ্ঞতা ইহার বিপরীত। যেখানে সরস্বতী সুপ্রসন্ন সেইখানেই লক্ষ্মীর শ্রী। যেখানে লক্ষ্মীর কৃপা সেখানে সরস্বতীরও শুভদৃষ্টি। এত স্কুল কলেজের আড়ম্বরে, ভারতী দেবীর এত বন্দনাতেও যে তিনি আমাদের প্রতি পূর্ণ প্রসন্ন নহেন তাহার কারণ এখানে লক্ষ্মী দেবীর কৃপা দৃষ্টি নাই। এই দারিদ্র্যপীড়িত হতভাগ্য জাতির বিদ্যা চর্চ্চায় জীবন দানের অবসর কোথা? প্রকৃতপক্ষে আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য বিদ্যালাভ নহে, ধনলাভ। কিন্তু এইরূপ অর্দ্ধ শিক্ষায় এই উদ্দেশ্যই বা আমাদের কতদূর সাধিত হয়? দেশের দিকে চাহিয়া দেখ—

জীবন সংগ্রাম কি ভীষণ, কৃষকদিগের অবস্থা মন্দ, শিল্পীদের অবস্থা মন্দ, বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটগণ অর্দ্ধ জীবন দানে সঞ্চিত উপাধির বিনিময়ে ৩০।৫০ টাকার চাকরীর জন্য লালায়িত ; কিন্তু ইহাও তাহাদের অনেকের অদৃষ্টে দুর্ল্লভ, এই সহস্র সহস্র গ্র্যাজুয়েটকে স্থানদান করিতে গভর্ণমেণ্ট অক্ষম। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মধ্যেই হাহাকার। অথচ ইহার প্রতিবিধানের উপায় যাহা সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। শিল্পের উন্নতিই দেশে বাণিজ্য বৃদ্ধি, ধন বৃদ্ধির প্রকৃত উপায়। ইংলণ্ড প্রভৃতি যে দেশে শিল্পের যত উন্নতি সেই দেশই অধিক পরিমাণে ধনী। এককালে আমরাও শিল্পাগ্রগণ্য জাতি ছিলাম, ব্রিটিস রাজ্যের প্রারম্ভ পর্য্যন্তও ভারতবর্ষ নানাদেশে শিল্প রপ্তানি করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে ভারতের শিল্প লুপ্তপ্রায়। দেশের শিল্প বিদেশে পাঠান দূরে থাক—আমরাই অধিকাংশ বিদেশীয় শিল্প ব্যবহার করি। আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে বস্ত্রাদি হইতে সামান্য দেশলাইটি পর্য্যন্ত বিদেশীয়। পাশ্চাত্য প্রদেশে বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে যতই কলকৌশলের বৃদ্ধি হইতেছে ততই হস্ত নির্ম্মিত প্রাচীন শিল্পের অনাদর হইতেছে। কেননা কলে অল্প সময়ের মধ্যে অল্প পরিশ্রমে বহু পরিমাণ দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাই কলের জিনিষ সস্তা। সুতরাং আমরা যদি শিল্পের উন্নতি চাই ত কল কৌশলের দিকে লক্ষ্য দিতে হইবে। যেরূপ শিক্ষায় যেরূপ বিজ্ঞান চর্চ্চায় কলকৌশলের উন্নতি সম্ভাবনা সেইরূপ শিক্ষা সেইরূপ বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের আধুনিক শিক্ষা—যে শিক্ষায় সমস্ত বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ হয়—যে শিক্ষায় আমাদের মনোবৃত্তি বহিঃ প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে তৎপর তাহা পুঁথিগত শিক্ষা হইতে অনেক প্রভেদ। তাই বলিতেছি প্রাকৃতিক নিয়মের দুএকখানি পুস্তকে আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষা শেষ করিয়া না ফেলিয়া ইয়োরপের ন্যায় হাতে কলমে বিজ্ঞান চর্চ্চা এই সভার উদ্দেশ্য হউক।

আমাদের এই স্বর্ণ শস্যশালিনী ভারতভূমি—কোন রত্নের এখানে অভাব? এখানে খনির অভাব নাই বাণিজ্য দ্রব্যাদির অভাব নাই, এখানকার লৌহাদি খনি হইতে ইয়োরপীয়গণ ধাতু বাহির করিতেছেন; এদেশের কার্পাস প্রভৃতি বিদেশ গিয়া সেখান হইতে বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ হইয়া আসিতেছে—আমাদের দেশের ধন রত্ন বুদ্ধির প্রভাবে অন্যের কবলজাত হইতেছে, আর আমরা নির্বুদ্ধি ক্ষুধিতগণ কাতর দৃষ্টিতে তাহাদের মুখ-পতিত উচ্ছিষ্ট রেণু-কণার জন্য হাত পাতিয়া রহিয়াছি।

গবর্ণমেণ্ট আমাদের এ সকল কাজে উদ্যোগী হইতে বারণ করেন না, তাঁহারা আমাদের শিল্পোন্নতি চাহেন এইরূপই বলিয়া থাকেন, সুতরাং এস্থলে আমাদের অযোগ্যতাই এই নৈরাশ্যের কারণ। এই অযোগ্যতা দূর করিতে যদি আমরা একনিষ্ঠ হই—ত আজ না হউক কাল অবশ্যই আমরা কৃতকার্য্য হইব। একতা, দৃঢ়তা, সমবেত-চেষ্টার অসাধ্য কি আছে।

একতার দৃঢ় বন্ধন সম্বন্ধনের জন্যই আমাদের এই গুপ্ত ভাব। বল যত অন্তর্বদ্ধ হয় কার্য্য করিবার ক্ষমতা তাহার তত অধিক। তাহা ছাড়া আরম্ভেই যাহাতে আমাদের এই উদ্দেশের উপর অবিশ্বাসী-বিজ্ঞের হাস্যাস্ত্র প্রয়োগে ইহার অকাল বিনাশ প্রাপ্তি না হয়—সেই জন্যও আমাদের এই সাবধানতা। ইহা ব্যতীত এই সাবধানতার অন্য কোন গূঢ়তর কারণ নাই। অর্থাৎ আমরা বিদ্রোহী নহি—আমরা ইংরাজের প্রতিদ্বন্দী নহি, তাহাদের অনুসরণকারী। ইংরাজ আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাহারা আমাদের অন্ধনয়ন ফুটাইতে আরম্ভ করিয়াছে আমাদের নবজীবন বীজ অর্পণ করিয়াছে, তাহারা আমাদের নূতন সভ্যতা দেখাইয়াছে। আমরা সভ্য ছিলাম, কিন্তু আমরা উন্নতির প্রকৃত পথ অবলম্বন করি নাই, তাই উন্নতির অর্দ্ধ পথে আমরা নামিয়া পড়িয়াছিলাম। বাহ্য প্রকৃতির সহিত অন্তর প্রকৃতির সংগ্রামেই যথার্থ উন্নতি। ভারতবর্ষ এদিকে লক্ষ্য না দিয়া চিরকাল কেবলমাত্র মনোজগতের চিন্তাকেই প্রাধান্য দিয়াছে, আমাদের সেই জন্য পূর্ণ উন্নতি হইতে পারে নাই—যেমন শরীর ছাড়া মন নহে—সুতরাং শরীরের অবহেলায় মনের বিকাশ সম্ভব নহে, তেমনি বহির্জগত আমাদের অস্তিত্বের সহিত এমনি জড়িত যে ইহার সংঘর্ষণ আমাদের জীবনের পক্ষে অনিবার্য্য, সেইজন্য কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া ইহার ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিতে প্রস্তুত না হইলে আমাদের প্রকৃত উন্নতির উপায় নাই—ইংরাজ আমাদের ইহা শিখাইয়াছে। সুতরাং এজন্য তাহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র, বিদ্বেষের নহে। তাহাদের কাছে আমরা অনেক সময় অন্যায় ব্যবহার পাইয়া থাকি সত্য, কিন্তু আমরা যদি মানুষ হইতে চাই তাহা হইলে ইহাতে তাহাদের দোষ না দেখিয়া আমাদের নিজের যে দোষ আছে তাহাই দেখা উচিত, দেখিয়া তাহা নিরাকরণ করিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। Might is right ইহার অন্যথা কোথা! অযোগ্য হইলে কে তাচ্ছিল্য না করে?

যেখানে জুতা মারিলে জুতা খাইবার সম্ভাবনা নাই সেখানে কেনই বা তাহারা মারিবার সুখভোগ না করিবে? যোগ্যের জয় সর্ব্বত্র, যদি তাহাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে চাও নিজে যোগ্য হও, কেবল গালিবর্ষণে যোগ্যতা জন্মে না। একতা! দৃঢ়তা! কার্য্যতৎপরতা! আমাদের এই লক্ষ্য যেন অভঙ্গ থাকে।”

চারিদিকের হাততালি ও বাহবার মধ্যে জীবন বসিল, নবীন উঠিয়া দাঁড়াইল, সকলে থামিলে আরম্ভ করিল—

“সভাপতি ভ্রাতা যাহা বলিলেন তাহাতে বোঝায় এই, জোর যার মুলুক তার, এই বাক্যার্থের ভিত্তিমূলে যে সভ্যতা স্থাপিত তাহাই প্রকৃত সভ্যতা। পাশ্চাত্য সভ্যতার যে ইহা মূল মন্ত্র তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, যথার্থ উচ্চতর মহত্তর সভ্যতা এই বাক্যের অনেক উর্দ্ধে। ন্যায়নীতি সূর্য্যকিরণের

ন্যায় সবল দুর্ব্বল ভেদে যে সভ্যতায় স্বতঃপ্রকাশিত, যে সভ্যতায় আত্ম প্রাধান্যের উপর নহে—আত্মদানের উপর যোগ্যতা অযোগ্যতার পরিমাণ—তাহাই চরম আদর্শ সভ্যতা; অর্থাৎ বাহুবল নহে—আধ্যাত্মিক বলই প্রকৃত সভ্যতার বল।

ইংরাজ মহৎজাতি আমি অস্বীকার করি না—কিন্তু কেন! তাহারা অসমর্থ অক্ষম ভারতবাসীদিগের প্রতি নির্যাতনে পারক বলিয়া? না বিদ্যা বুদ্ধিতে সমকক্ষ উপযুক্ত দেশীয়কেও নেটিভ বর্ব্বর বলিয়া ভ্রুকুঞ্চিত দৃষ্টিতে দেখে বলিয়া? ইহা তাহাদের মহত্ত্ব নহে—এইখানেই তাহাদের অনুদার্য্য—কলঙ্ক। তাহারা মহৎ জাতি—তাহাদের আত্মদানে, তাহাদের উদার বিশ্বজনীন হৃদয় বিস্তারে। তাহাদের মধ্যে কত মহাত্মা পরের জন্য জীবন ত্যাগ করিতেছেন, কত মহৎ কার্য্য সমাধা করিতেছেন সর্ব্বব্যাপী উদার নীতির পক্ষ গ্রহণ করিয়া অনুদার দেশের লোকের বিষময় ভ্রুকুটি অসঙ্কোচে সহ্য করিতেছেন. 'জোর যার মুলুক তার' ইহা যে প্রকৃত সভ্যতার মূল নহে—নিজের কার্য্যে দৃষ্টান্তে তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন।

যোগ্যের জয় ইহা সত্য। কিন্তু পাশব যোগ্যতা ও মানবিক যোগ্যতা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তির উপর স্থাপিত। পাশব যোগ্যতার পরিচয় কোথা—না পরের উচ্ছেদ-সাধনে, আর মানবিক যোগ্যতার পরিচয় কোথা—না আত্মদানে ত্যাগ স্বীকারে। শেষের যোগ্যতা লাভ করাই যে যথার্থ উন্নতি যথার্থ সভ্যতার লক্ষ্য ইহা কাহারো অস্বীকার করিবার যো নাই। পৃথিবীর সকল পদার্থের ন্যায় সভ্যতারও উত্থান পতন আছে। রোম ইজিপ্ট ইহারা ত পদার্থগত সভ্যতার উচ্চ সোপানে উঠিয়াছিল—কিন্তু সে সভ্যজাতি এখন কোথা? সুতরাং আমাদের সেই মহান সভ্যতারও যে আজ এই অধোগতি, ইহার আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সভাপতি ভ্রাতা এই পতনের যে কারণ উল্লেখ করিলেন—তাহা প্রকৃত কারণ নহে। বহিঃপ্রকৃতি হইতে অন্তর প্রকৃতির উন্নতিকে তাঁহারা প্রাধান্য দিয়াছেন বলিয়া আমাদের সভ্যতা সম্পূর্ণ হইতে পায় নাই তাহা নহে। আধ্যাত্মিকতার উপর স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই সেই পুরাতন সভ্যতার মাহাত্ম্য, এবং আধ্যাত্মিকতার অবনতিতেই সে সভ্যতার পতন, তাহার পরাজয়। 'জোর যার মুলুক তার' এই নীতি যখনি উল্লিখিত উদার ন্যায়-নীতির স্থল গ্রহণ করিয়াছে তখন হইতেই ভারতবর্ষের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। যখন ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতার অপব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহাদের আত্মদান নিঃস্বার্থতার স্থলে স্বার্থ সাধনই গূঢ় উদ্দেশ্য দাঁড়াইয়াছে তখনই আমাদের সভ্যতার মূল শিথিল হইয়াছে। তথাপি আমাদের সেই ভগ্ন সভ্যতা এখনো যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম—তাহা কিসের প্রভাবে? সেই আধ্যাত্মিক ভিত্তির দৃঢ়তার প্রভাবে। যে যত সারবান তাহা কোনরূপে আপনাকে বর্ত্তমান রাখে। আমাদের পতন সত্ত্বেও যে আমরা বাঁচিয়া আছি, আমরা অঙ্কুর রূপে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছি—

ইহাই আমাদের পূর্ব্ব সভ্যতার দৃঢ় ভিত্তির প্রমাণ। ইহাতে আমাদের লোপ নিবারণ করিয়া আমাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। সুতরাং আমাদিগের জাতিনিহিত সেই পুরাতন অবশিষ্ট আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ লাভে প্রয়াসী হইলেই আমরা যথার্থ লক্ষ্যে উপস্থিত হইতে পারিব। কেন না তাহা আমাদের নিজস্ব ধন, তাহাতে আমাদের পিতৃ পুরুষ গত অধিকার, সে অধিকার আয়ত্ত করিবার আমাদের ক্ষমতা আছে। কিন্তু তাহা লাভ করিবার পরিশ্রম না করিয়া আমরা পরান্ন ভিক্ষায় ধনী হইব মনে করা ভ্রম। প্রকৃত পক্ষে বিদেশীয় ভাবের অনুকরণ আমাদের রক্তের পোষণকারী নহে। ইংরাজি শিক্ষায় কতক বিষয়ে আমাদের যেমন উপকার হইতেছে—তেমনি অনেক বিষয়ে অপকারও হইতেছে। ইংরাজ অনুকরণে বাঙ্গালীর কিছু মাত্র কসুর নাই, বাঙ্গালী কথা বার্ত্তায় ইংরাজ, মতে বিশ্বাসে ইংরাজ, পরিধান পরিচ্ছদে ইংরাজ—খেলা ধূলায় আমোদ প্রমোদে ইংরাজ—কিন্তু তবু বাঙ্গালী চরিত্রের সারবত্তায় কতদূর ইংরাজ হইতে পারিয়াছে? কি করিয়া পারিবে? ইচোড় পাকিতে পারে তবু কাঁটাল হয় না। আমরা ইংরাজ হইব—কিরূপে? তাহাদের সেই অটল কার্য্যদক্ষতা, বাধা বিঘ্নের সহিত অবিশ্রাম যুদ্ধ করিবার শরীর মনের সেই তেজস্বী পাষাণ বল আমাদের কোথায়? এই আলস্য সঞ্চারী নিস্তেজ জল বায়ুতে আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সেই প্রবল উদ্যম কোথায় পাইব? সুতরাং অনুকরণ করিতে গিয়া তাহাদের মহত্ত্ব, সারত্ব, আমরা আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না, তাহার ভান মাত্র অনুকরণ করিতেছি এবং এই ভানের মধ্যে আমাদের নিজের খাঁটি জিনিষও অনেক হারাইয়া ফেলিতেছি।

তাহাদের মত বিশাল ন্যায়প্রেম সংগ্রামে আমরা প্রাণ দিতে অক্ষম—কিন্তু তাহার আড়ম্বরে আমাদের স্বাভাবিক আদর্শ প্রতিবাসি-স্নেহ, পারিবারিকবন্ধন, সহজ করুণা-ভাব আমাদের মন হইতে চলিয়া যাইতেছে।

অবিশ্রাম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে জ্ঞান বিশ্বাসকে নিয়মিত করিবার আমাদের ক্ষমতা নাই—কিন্তু তাহার ভানে আমাদের সহজ ধর্ম্ম বিশ্বাস কেবল শিথিল হইয়া পড়িতেছে।

আমাদের অন্তর নিহিত জাতীয় সদ্‌গুণ, জাতীয় মহৎ ভাব—যেমন সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, বিনয় ভদ্রতা প্রভৃতি যাহাতে আমরা ইয়োরোপ জাতিদিগেরও আদর্শ তাহার প্রতি পর্য্যন্ত আমাদের অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে, কেন না ইংরাজের নিকট আমাদের এ সকল গুণের মান্য নাই।

খৃষ্টের যদিও উপদেশ এক গালে চড় মারিলে অন্য গাল ফিরাইয়া দিবে। কিন্তু বিপুল শরীর, প্রবল পশুতেজ ইংরাজের ইহা মনের ভাব নহে—মুখের কথা মাত্র, সুতরাং প্রকৃত পক্ষে বিনীতভাব ও সহিষ্ণুতার মর্য্যাদা তাহারা ধারণা করিতে পারে

না, ইহা তাহারা কাপুরুষের ধর্ম্ম মনে করে—তাই অপমানিত হইয়া অপমান ফিরাইতে না পারিলে তাহাদের 'অনার' যায়। আমরাও নিজের 'অনার' হারাইয়া পরের মিথ্যা অনারের ধূয়া ধরিয়াছি। পশু বল প্রয়োগ হীন কর্ম্ম জ্ঞান না করিয়া,—আত্ম সংযমে মনুষ্যত্ব জ্ঞান না করিয়া জুতার বদলে 'জুতা' বলিয়া চীৎকার করিতেছি। ইহাতে আমাদের মারিবার শক্তি জন্মিতেছে না—কেবল দাম্ভিকতা জন্মিতেছে—আর কাপুরুষতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

সুতরাং আমি বলি—কেবল বিজ্ঞান চর্চ্চা নহে—আধ্যাত্মিক উন্নতি ও জাতীয়তা রক্ষা এ সভার আর এক উদ্দেশ্য হউক!

এবার দ্বিগুণ জোরে হাততালি পড়িল—বাহবা উঠিল। কিশোরী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তেজিত হইয়া উঠিল—সকলে শান্ত হইলেও তাহার উচ্ছাস শমিত হইল না, সে বলিল—"Bravo! জাতীয়তা, জাতীয়তা! আমরা ধুতি পরিব, আসনে বসিব—বিজাতীয় স্পর্শ করিব না—আমরা strict হিন্দুভাবে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিব।"

জীবন বলিল—"কিশোরি একটু শান্ত হও। তুমি যাহা বলিতেছ তাহাতে জাত রক্ষা হইতে পারে—কিন্তু জাতি রক্ষা হইবে না। বাস্তবিক জাতির কুসংস্কার রক্ষা করা জাতীয়তা রক্ষা নহে—কেননা তাহাতে জাতির উন্নতি হয় না—জাতিগত চরিত্র মাহাত্ম্য রক্ষাই যথার্থ জাতিরক্ষা। আমার বিশ্বাস নবীন ভ্রাতা সেই অর্থেই জাতীয়তা ব্যবহার করিয়াছেন! সুতরাং আমাদের আধ্যাত্মিকতা—ধর্ম্ম ভাব যাহা আছে তাহার চর্চ্চা করা আমাদের কর্ত্তব্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহাকে যদি আবার বাহ্যিক আচারের আটে ঘাটে বাঁধিতে চাও তাহা হইলে সুফল হইবে না। আচারবন্ধন, জাতিবন্ধন, আমাদের দেশে কি ভয়ানক বিষময় ফল প্রসব করিয়াছে! যে বিভৎস প্রথায় মানুষকে মানুষের ঘৃণ্য অস্পৃশ্য করিয়া তুলিয়াছে সেই দারুণ অনুদার্য্য ঘৃণ্য প্রথার উপেক্ষাতেই—তাহাকে ছিন্ন করিতে পারিলেই জাতির উন্নতি—সুতরাং যে নিয়মে এই হীন জাতীয়তা বর্দ্ধিত করে তাহা এ সভার পালনায় হইতে পারে না।"

জীবন আরো কতক্ষণ বলিত জানি না—কিন্তু হঠাৎ পাঁচটা ঠংঠং করিয়া উঠিল—সভ্যবর্গের মনোযোগ সেইদিকে আকৃষ্ট হইল, জীবনও এইখানে থামিয়া পড়িল। কিশোরী বলিল—"সময় চলিয়া যায় আমাদের এখনি যাইতে হইবে, কিন্তু নূতন সভ্যগণের সহিত ত কিছু বন্দবস্ত হইল না।"

নবাগত দুইজন কিশোরী কর্ত্তৃক এখানে আনীত হইয়াছে। ইহারা নাকি কিছুদিন ধরিয়া পরীক্ষা দ্বারা গ্যাস প্রস্তুত সাবান প্রস্তুত কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে, অর্থাভাবে কেবল প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে নাই। এই সভাও হাতে কলমে বিজ্ঞান চর্চ্চা চাহে—কল কারখানায় ভারতের ধন বৃদ্ধি করিতে চাহে, সুতরাং ইহাদের পাইয়া তাহাদের মহা আনন্দ।

নবীন বলিল—"মহাশয় আপনারা যে সাবান প্রস্তুত করিয়াছেন—তাহা কি দেখিতে পাওয়া যায় ?"

গ্রাস প্রস্তুত সাবান হইতে অধিক অর্থ সাপেক্ষ সুতরাং সভা আগে সাবানে হাত দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত ভাবিয়াছে।

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—"আমরা একবারে সাবান প্রস্তুত করি নাই, সমস্তই আয়োজন হইয়া শেষে টাকার জন্য বাধিয়া গেল।"

জীবন বলিল—"small scale এ আরম্ভ করিতে কত খরচ হইবে।"

সে বলিল—"৫০০ টাকার কম একটা কারখানা আরম্ভ হয় না।" সভ্যগণ সকলে সকলের মুখের দিকে চাহিল—এইখানেই গোলযোগ, সকলেই প্রায় স্কুলের ছাত্র এবং গৃহস্থ ঘরের ছেলে। পুঁজির মধ্যে দুইচার পয়সা করিয়া নিয়মিত দৈনিক জল খাবারের পয়সা। যদি মূলধন ২০ টাকা হইলে চলিত ত না হয় প্রত্যেকে ২।৩ টাকা করিয়া দিতে পারিত; মাস খানেক না হয় জলখাবার নাই খাইত! দেশের জন্য ততখানি তাহারা করিতে পারে—কিন্তু পাঁচ পাঁচ শ টাকা কে দিবে ? তবে যদি জীবন বাবু চারু আর কিশোরী দেন ? জীবন বাবু চাকুরে মানুষ—কিশোরী ও চারু বড় মানুষের ছেলে। সকলে আগ্রহ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিল।

নবীন ফুটিয়া বলিল—"জীবন বাবু—পাঁচশ টাকা! তোমরাই তবে দাও।

কিশোরী আছে,—চারু আছে,—তুমি চাকরী করিতেছ,—আমরা কাপড়খানা চোপড়খানা যাহা আছে বিক্রি করিতে রাজি আছি—আর জলখাবারের পয়সা গুলাও হাতে হাতে দিয়া ফেলিব।"

জীবন একটু হাসিল। তাহার পৈত্রিক ঘড়ি চেনটা এস্থলেও ভরসা; কিন্তু মা তাহাতে কিরূপ 'গণগণ' করিবেন তাহাই তাহার মনে পড়িল।

কিশোরী বলিল—"দাদা তুমি কত দিবে"।

জীবন বলিল—আচ্ছা ১০০।

চারু বলিল "আমিও ১০০ দিব। কিশোরী দা কত দেবে ?"

কিশোরীর যে টাকার বিশেষ সুবিধা তাহা নহে; খরচ অনেক, আয় অতি সামান্য। কুঞ্জ বাবু ছেলেকে মাসে মাসে পাঁচ টাকা দিয়া নিশ্চিন্ত, তাহার অধিক এক পয়সা তিনি দিবার নন; চাহিতেও কিশোরী সাহস করে না—মাঝে মাঝে জ্যেঠাইমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া যা দুদশ টাকা অতিরিক্ত আদায় করে মাত্র। অথচ চারু, জীবন যখন ১০০ টাকা করিয়া দিতে চাহিল কোন লজ্জায় সে তাহার কম বলে! তাহা হইলে তাহাদের কাছে তাহাকে ছোট হইতে হয়। সুতরাং এ বিবেচনার সময় নহে। সে বলিল—"আমিও ১০০ দিব—কিন্তু আর দুই শ" ?

নবীন বলিল—"আমরা সকলে মিলিয়া আর ৫০ দিতে পারি এইত ৩৫০। ভ্রাতৃবর্গ

কার্ত্তিকচন্দ্র আর একবার হিসাব করিয়া দেখ দেখি এই টাকায় কি কাজটা আরম্ভ হয় না? কতক তৈরি হইলে তখন বিক্রি চলিবে—টাকাও হাতে আসিবে, কারখানাও চলিবে, আরম্ভটা বইত নয়?”

নূতন সভ্য কার্ত্তিক চন্দ্র তাঁহার ভ্রাতা গণেশচন্দ্রের সহিত আবার হিসাব করিতে আরম্ভ করিলেন, শেষ হইলে বলিলেন—“আর টাকা ৫০ হইলে এক রকম হইতে পারে—তা সেটা না হয় আমরা দেব, ইহাতেই আরম্ভ করা যাক।”

সকলের মুখে আহ্লাদ প্রকাশ পাইল। স্থির হইল গত রবিবারে সকলে চাঁদার টাকা লইয়া আসিবেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

ট্রেন চলিতেছিল, নবীন ও কিশোরী সেকেণ্ডক্লাশের এক কামরায় বসিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়াছিল। সভ্যদলের সংখ্যা বিস্তর, সুতরাং এক কামরায় সকলের বসিবার সুবিধা হয় নাই।

৬টা বাজিয়া গিয়াছে। ম্লান গোধূলি বর্ণে চারিদিক আচ্ছন্ন। কিন্তু পশ্চিম আকাশ হইতে এখনো এমনতর একটা উজ্জ্বল আভা সেই গোধূলিকে চাকচিক্যময় করিয়া তুলিয়াছে যে বাহিরের দৃশ্য এখনো অন্ধকার হইয়া পড়ে নাই। পরিষ্কার মাঠ, শ্যামলক্ষেত, কলার বন, আম কাঁটালের ঝোপ, পদ্ম পুকুর, পুকুর পাড়ে ভাঙ্গা বাড়ী, তাহার পাশে নূতন বাগান, নূতন ইমারৎ—এ সকলের প্রভেদ এখনো লক্ষিত হইতেছে। নবীন ও কিশোরী উভয়ের মুখই জানালায়, নবীন গাহিতেছে—

দিনের আলো নিভে এলো,
তবু—মনের আলো চোখে জাগে।
নাইক হেথায়, দিবারাতি,
সদাই—জ্বলছে ভাতি অনুরাগে।

কিশোরী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিল—“নবীন দা ঐ যে পুকুর-ধারে ভাঙ্গা বাড়ী দেখছ—কাল আমি ঠিক ঐ রকম বাড়ী স্বপ্নে দেখেছি।”

নবীন গান ছাড়িয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—“সত্যি?”

কিশোরী। ঠিক বলছি ভাই, হুবহু ঐ বাড়ী, মানেটা কি বলদেখি?

নবীন। তুই আগের রবিবারে ঐ বাড়ীটা দেখে থাকবি।

কিশোরী। না ভাই আমি বেশ বলতে পারি আমি আগে ঐ ভাঙ্গা বাড়ী নোটিসই করিনি।

নবীন। নোটিস না করতে পারিস—কিন্তু দেখেছিলি তার সন্দেহ নেই। ওটা

কচ্ছে unconscious cerebration।

কিশোরী কথাটা ভাল করিয়া বুঝিল না—সেই জন্যই বিপক্ষে কিছু বলিতে সাহস করিল না—তাহা হইলে তাহার অনভিজ্ঞতা প্রকাশ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। বলিল "তা যেন হইল—কিন্তু আমি যে স্বপ্ন দেখলুম—ঐ বাড়ীতে বসে খুব টাকা কুড়াচ্ছি সেটা কেন হোল ?

নবীন। টাকার ভাবনা ভেবে শুতে গিয়েছিলি আর কি। তাত আর কারো পক্ষে আশ্চর্য্য নয়।"

কিশোরী। গা ছুঁয়ে বলছি—তা ভাবিনি। মনটায় তখন কি আমোদই হয়েছিল, ঘুমটা ভাঙ্গতে বড়ই দুঃখ হোল।

নবীন। আচ্ছা বল দেখি—একজন রোজ রাত্রে ঘুমিয়ে স্বপ্নে খুব সুখী কিন্তু দিনে অসুখী, আর একজন দিনে সুখী কিন্তু স্বপ্নে অসুখী তাহলে তাদের দুই জনকে সমান সুখী বলা যায় কি না ? এটা একটা Philosophyর সমস্যা।

কিশোরী। তা কি করে হবে ? তাহলে অবশ্য স্বপ্নটাকে real বলে ধরে নিতে হয়—কিন্তু তাহলে স্বপ্ন বলছ কেন ? এইখানেই কথার fallacy।

কথাটা বলিয়া কিশোরী মনে মনে গর্ব্ববোধ করিল।

নবীন। তা যদি বল তাহলে আমাদের জীবনটাই স্বপ্ন।

ঐ যে দেখছ বাড়ী ঘর গাছ পালা, তুমি ভাবছ কি সত্য, কিন্তু আসলে ওরা কি—? কিছুই নয়। আমাদের কতকগুলা sensationএর সমষ্টি মাত্র। সাদা কথায় আমাদের মনের ভাব মাত্র।

কিশোরী। কিন্তু জিনিস সত্য না হলে আমাদের মনের ভাব জন্মাবে কোথা থেকে ?

নবীন। Bravo! ডেকার্টেও উল্টারকমে ঐরূপ ভাবের কথা বলেছেন। তিনি বলেন—আমি ভাবিতেছি আমি আছি আমার অস্তিত্বের ইহাই প্রমাণ।

কিশোরী। আর যখন আমি আছি তখন সকলেই আছে—

নবীন। "হাঁ, হাঁ, এইখানে objective subjective উভয়ই প্রমাণ হইল।"

কিছু আগে ট্রেন থামিয়াছিল—এই সময় একজন ইংরাজ এই কামরার দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। নবীন ও কিশোরী তাহাকে দেখিয়া দুই জনেই 'হ্যালো' করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, মিশনারী জন সাহেবও আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক How do you do করিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন। ইহার পর সকলে উপবিষ্ট হইলে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। দু এক কথার পর সাহেব কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি সে বইটি পড়িয়াছ !"

সাহেব অনেক বৎসর বাঙ্গালায় আছেন, বাঙ্গালী বালকদিগের সহিত তিনি বাঙ্গালাতেই কথা কহেন, বাঙ্গালীর মত বাঙ্গালা কহেন বলিয়াই তাঁর বিশ্বাস।

কিশোরী বলিল—"না সাহেব একজামিনের পড়া পড়িতে ... সময় কখন ?

সাহেব তখন নবীনের দিকে চাহিলেন—

নবীন বলিল—"পড়িয়াছি—ক্রাইষ্টের উপদেশ অতি সুন্দর।" সাহেবের হৃদয় বড় আশা পূর্ণ হইয়া উঠিল, বলিলেন "ঈশ্বরের পুট্র ভিন্ন কে ওইরূপ কটা বলিটে পারে? আশা করি প্রভু টোমাকে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস দিয়াছেন।

নবীন। ঈশ্বরের পুত্র তিনি ইহাতে আমার অবিশ্বাস নাই—কেন না ঈশ্বরের পুত্র সকলেই।

জন। টেমন পুট্র নাই, প্রভু যীশু ও পরমেশ্বর একই—টিনি পিটার অবটার আছেন।

নবীন। তাহা হইতে পারে। ঈশ্বরের ত অনেক অবতার জন্মিয়াছে।

কিশোরী। হ্যাঁ আমাদের শাস্ত্রে ও তাহা পাওয়া যায়।

জন। টোমাদের শাস্ত্র কিছু সট্য হয় না, মিট্যা বলিয়াছে—প্রভু যীশু একমাট্র অবটার আছেন।

কিশোরী। কেন সাহেব, আপনারি সত্য আর আমাদের মিথ্যা কেন?

জন। আমাদের বাইবেল ঈশ্বরের মুখের কটা আছে। ঈশ্বরের বাক্য মিঠ্যা না আছে।

নবীন। এ কথা তোমরা বলিয়া থাক—কিন্তু আমরা মানিব কেন—প্রমাণ কি?

জন। ভিন্ন ভিন্ন শিষ্য একবাক্যে এইরূপ বলিয়াছে কেমন করিয়া তাহা মিঠ্যা হয়। ইহা ঐটিহাসিক প্রমাণ আছে।

নবীন। ঐতিহাসিক প্রমাণ যাহাই হউক বৈজ্ঞানিক প্রমাণে বাইবেলের সত্য মিথ্যা হইয়া যায়। evolution theory মানিতে হইলে আপনার বাইবেল মানা চলে না, কিন্তু আমাদের হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত। আপনাদের বৈজ্ঞানিকেরা বলেন মানুষ যে যে অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে গর্ভাবস্থায় ভ্রূণ সেই সেই অবস্থা অতিক্রম করে—তাহার প্রথমকার প্রধান তিন অবস্থা মৎস্য কচ্ছপ ও বরাহ। হিন্দু শাস্ত্র মতেও ভগবান মৎস্যরূপ হইতে কচ্ছপ রূপ তাহা হইতে বরাহ রূপ—এবং ক্রমে অন্যান্য রূপ অতিক্রম করিয়া মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়াছেন।

জন। Nonsense!

নবীন। ইহাকে যদি Nonsense বলেন ত সাহেব এরূপ ননসেন্স আপনাদের শাস্ত্রেই বা অভাব কি? তবে আমাদের ননসেন্স হইতে নন টুক ছাঁটিয়া সেন্স বাহির করিলেও আমাদের ধর্ম্ম বজায় থাকে, হিন্দু ধর্ম্মের অসারতা বাদ দিয়া যিনি সার বিশ্বাস করেন তিনিই প্রকৃত হিন্দু, কিন্তু আপনাদের ধর্ম্মের ননসেন্স বিশ্বাস না করিতে পারিলে ধর্ম্মই মানা হয় না। কেহ যদি ক্রাইষ্টের মিরাক্ল্ অবিশ্বাস করে—তাহা হইলে কি আর তিনি খৃষ্টান?

জন। Oh! God save them! আমি সর্ব্বদাই টোমাদিগের জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

নবীন। সে জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

কিশোরী। মুক্তিলাভের আশা না রাখিয়াও সাহেব।

জন। Oh! you of little faith, বিশ্বাস কর, যীশু বলিয়াছেন বিশ্বাসে পর্ব্বত উঠান.যায়।

নবীন। সাহেব একটি কথা বলি কৃশ্চানদের উপদেশ এক, ব্যবহার আর, আমরা কি শিখিব বলুন দেখি? আপনাদের ধর্ম্মে বলে গায়ের পিরান কাড়িয়া লইলে কোটটা পর্য্যন্ত দিয়া দিবে, কিন্তু আপনারা চ'খের বদলে চোখ দাঁতের বদলে দাঁত না নিয়া ছাড়েন না, আর আমরা বেচারারা এক গালে চড় খাইয়া আর এক গাল পাতি বলিয়া আপনারা আমাদের ঘৃণা করেন! এই ত আপনাদের উদারতা—আর brotherly feeling! আর এই জন্যই ত আমাদের নাম নিগার?"

জন সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যাহা বলিটেছ খৃষ্টান লোকের উহা কর্ম্ম না আছে।

কিশোরী। তবে সাহেব আঙ্গুলে গুণিয়া খৃষ্টান বাছিতে হয়।

তর্কটা আর চলিল না, ট্রেন থামিয়া পড়িল, ষ্টেসনের দৌড়াদৌড়ি গোলযোগে আকৃষ্ট হইয়া কিশোরী নবীন দুই জনে গাড়ীর জানালায় মুখ বাড়াইল, কিশোরী বলিল—"নবীন দা ঐ দেখ জীবন দা মুখ বাড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কচ্ছে।"

জন সাহেব বলিলেন—"জীবন আসিয়াছে?

কিশোরী। হঁ্যা সাহেব ঐ পাশের গাড়ীতে।"

সাহেব তাহার সঙ্গে দেখা করিতে নামিয়া গেলেন। দুই জন ইংরাজ স্ত্রীপুরুষ, পিঠপিঠ এই গাড়ীর নিকটে আগমন করিল; নবীনদের দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া দাঁড়াইল। স্ত্রী বিষময় কটাক্ষে একবার জীবন ও কিশোরীর দিকে চাহিয়া পুরুষকে আস্তে আস্তে কি বলিল, পুরুষ বলিল "অন্য গাড়ী সব পূর্ণ এ গাড়ীতে না গেলে তোমাকে মহিলাদের গাড়ীতে যাইতে হয়।" (অবশ্য তাহাদের কথাবার্ত্তা ইংরাজিতেই চলিতেছিল।) বোধ হয় তাহাতেই সম্মত হইয়া উভয়ে চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে নবীন বলিল—"জীবন কোথায় গেল, ইংরাজদের বিশ্বজনীন উদারতা দেখিত।"

কিশোরী। ভাই মেয়েটা কি ঘৃণাদৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইলে? আমরা ঠিক যেন সাপ ব্যাং? তবু ত নিজের ঐ চেহারা!

নবীন। আমার বিশ্বাস ইংরাজ মেয়েরা যদি এদেশে না আসত—তাহলে পুরুষদের সঙ্গে আমাদের ঢের বেশী বনে যেতো। অনেকে স্ত্রীদের ভয়ে কেবল আমাদের সঙ্গে মিশতে পারে না। অনেক ইংরাজ এদেশকে যথার্থ নিজের দেশ করেছে, এ দেশের

মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ করেছে, দেশী লোককে ভাইয়ের মত ভাল বেসেছে, কিন্তু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের ত এ দেশের জন্য প্রাণ ঢেলে একটা কাজ করতে দেখিনি, আপনার ভাবে মিশিতে দেখিনি, তাঁহাদের সূক্ষ্ম রুচি জ্ঞান, আর মান অপমান এত প্রখর যে নেটিভ দেখলে তাঁহারা শিউরে উঠেন।

কিশোরী। কিন্তু ইয়োরপের মেয়েরা শুনেছি আমাদের বড়ই পছন্দ করে, তাদের চোখে আমাদের এ তামা রংও রূপার চেয়ে নাকি সুন্দর দেখায়। একজন ফ্রেঞ্চম্যান ও বাড়ীর ছোড়দাদাকে নাকি বলেছিল—তোমার মত যদি আমার রং হোত তাহলে আমি মেয়ে মহলের একচেটে প্রশংসা নিয়ে ফেলতুম।

নবীন। তবে দেখছি একবার যেতে হোল। এ দেশের মেয়েরা ত নিদেন সে রূপ কোন ভাবের পরিচয় দেয় না, তবু এত করে পিয়ার্সসোপ মাখছি!

ট্রেণের শেষ ঘণ্টা পড়িল, দ্রুতগতিতে দ্বার ঠেলিয়া একজন ইংরাজ এই কামরায় উঠিয়া পড়িল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে তিনি একবেঞ্চে বসিয়া একখান খবরের কাগজ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পড়িতে পড়িতে ক্রমে নবীনের বেঞ্চে পা তুলিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ নিতান্তই নির্দোষ ভাবে। কিন্তু নবীন ভুল বুঝিল, ইহাতে অপমানের অভিপ্রায় অর্পণ করিয়া নিজেও প্রতিশোধ স্বরূপ তাহার বেঞ্চে পা তুলিয়া দিল। এতক্ষণ সাহেবের দৃষ্টি কাগজে ছিল এইবার তাহার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন "Will you go to the other bench—there is Plenty of room there.

নবীন বলিল—"you can do it yourself if you like"

সাহেব গোসা হইয়া উঠিলেন; বলিলেন" —"You must"

নবীন। "Why must ?"

সাহেব দাঁড়াইয়া বলিলেন—How dare you insult! বলিয়াই হাতের কামিজ গুটাইতে আরম্ভ করিলেন।

নবীন কিছু ভ্রূক্ষেপ করিল না, সাহেব উঠিয়া পাঞ্জা কষিয়া দাঁড়াইতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিশোরী ভয় পাইয়া বলিল "নবীন দাদা আর না, এদিকে এস, একটা গোল বাধাবে। এখানে আমাদের মারলে কোন উপায় নাই।

কিন্তু নবীনের সাহস দেখিয়া সাহেব একটু থমকিয়া গেল—মারিবে কি না ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

কিশোরী বলিল "Beg your pardon sir, do'nt mind him."

সাহেবেরও তখন হাত শিথিল হইয়াছে, গাড়ীও হাবড়ায় থামিয়াছে, পাদ্রি সাহেব কামরায় পুনঃ প্রবেশ করিলেন। নবীন কিশোরীর সহিত তিনি বিদায় লইতে আসিলেন। এখানে সকলের অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া বলিলেন "কি হইয়াছে ?"

নবীন হাসিয়া বলিল—"আপনাদের সভ্যতা আমাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল—নহিলে বোঝে না সাহেব" বলিয়া সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল।

পাদ্রি সেই সাহেবকে বলিলেন "Its shameful! You ought to apologise to this young gentleman."

সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"I would rather apologise to a piece of stone than to a nigger" বলিয়া সে ক্রোধভরে ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়িল।

মত্ততাসুখ।

সংসারে কাজ অনেকেই করে, কিন্তু কাজ যথেষ্ট করিলেও প্রকৃত মহত্ত্ব অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। কাজ করিবার জন্য এখানে অনেক প্রলোভন আছে, প্রলোভনের প্ররোচনায় বড় বড় কাজ সমাধা করিতেও বিশেষ কষ্ট হয় না। তাই বলিয়া প্রলোভন-প্রসূত কার্য্য কি আর মহত্ত্ব-প্রসূত অনুষ্ঠানের মত স্থায়ী হয়? মহত্ত্ব স্থির ধীর গম্ভীর ভাবে সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া নীরবে কাজ করিয়া যায়, মত্ততাসুখে গা ভাসাইয়া দিয়া সারাক্ষণ প্রবল আত্ম-আবর্ত্তের মধ্যে ঘূর্ণ্যমান হওয়া তাহার উদ্দেশ্য নহে। মত্ততাসুখ আপনাকে অনেক সময় মহৎ কল্পনা করিয়া থাকে, এবং এই কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া আপনার নিকট হইতে আপনাকে বঞ্চিত করে। কিন্তু তাহার চাঞ্চল্যেই সে ধরা পড়ে। মহত্ত্বের মধ্যে যে সংযত শিক্ষার ভাব নিহিত আছে, মত্ততাসুখ তাহা না বুঝিয়া মত্ত হস্তীর মত দাপাদাপি করিয়া বেড়ায়, সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া এক প্রকার উচ্ছৃঙ্খল দাসত্বের মোহে মগ্ন হইয়া থাকে, এবং যথেচ্ছচারিতার আত্মসুখ পরিতৃপ্তি লক্ষ্য ক্ষণস্থায়ী নিয়মাবলীর মধ্যে স্ফীত হইয়া নিয়ম-লঙ্ঘনী-বিদ্যাকেই স্বাধীনতা মনে করিয়া সেবা করে। মত্ততাসুখ অল্পেতেই নাচিয়া উঠে, হৈ চৈ করিয়া কর্ম্মশীলতা অনুভব করিতে চায়। উচ্চ কণ্ঠ কোলাহলে পলকের মধ্যেই লোক জমিয়া যায়, লোকারণ্য ও মত্ততাসুখে উদ্বেল হৃদয় হইয়া উঠে। কাজের দিকে তখন লক্ষ্য থাকে না, অথচ মত্ততা শ্রান্তিতে পরিশেষে কাজ করিলাম বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। স্থির সমুদ্রে যেমন জাহাজ অগ্রসর হইবার সুবিধা পায়, ঝঞ্ঝা ঝটিকায় কেবল গতির বিঘ্ন সম্পাদন করে, স্থিরভাবে সেই রূপ হৃদয় সেই ধ্রুব পথ পানে অগ্রসর হইতে থাকে, মত্ততা শ্রান্তিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে মাত্র।

মত্ততার ক্রিয়ায় একটা ভয়ানক লম্ফঝম্প হয়, জয়ঢাক বাজে, ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি

পড়িয়া যায়। তাহার পর যখন প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন কেবলই অবসাদ—তখন হাই উঠিতে থাকে, পা টলিতে থাকে, মাথা ঘুরিতে থাকে, অতিরিক্ত ব্যায়াম চালনা হেতু কতকটা যেন জ্বর ভাব উপস্থিত হয়। মত্ততাসুখ পদে পদে নৈরাশ্য-কাতর। মাতিবার জন্যই তাহার কাজ কি না, মাতামাতির ত্রুটী হইলেই নৈরাশ্য। সে কেবল ছাতা ঘাড়ে করিয়া, খাতা পকেটে পূরিয়া, পথে পথে, গলিতে গলিতে ত্বরিৎ গতিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। হৃদয়ের আবেগে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সুসম্পন্ন হইলেও হাঁকডাক বড় শুনা যায় না। আর মত্ততাবেগে যে কার্য্য আরম্ভ হয়, তাহা সম্পন্ন হৌক্ না হৌক্ একটা কোলাহল উঠে। অলস হৃদয় সমাগমে ধীরে ধীরে যে নিন্দা চর্চ্চা ফেনাইয়া উঠে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, এই মত্ততাসুখ। বলবতী সংশোধন স্পৃহা তাহার মূল নহে, কেবলই আত্ম-অগাধ-আলস্য পরিতৃপ্তি জন্য রসনার ব্যায়ামানুষ্ঠান। স্বদেশহিতৈষিতাও অনেক সময় মত্ততাসুখোদ্ভূত—তখন সে কেবল ছট্‌ফট্ করিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করে, বিদেশের নাম শুনিলেই জ্বলিয়া উঠে; ঘন ঘন করতালির নিকট আপনাকে বিক্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে। সমাজ সংস্কার, ধর্ম্ম চর্চ্চা সকলেরই মধ্যে মত্ততাসুখ বিরাজমান। সংযমই কেবল ইহার একমাত্র ঔষধ। যেখানে সংযম সুখ গভীর, সেইখানেই মত্ততাসুখ জোর করিতে পারে না। সংযমেই মহত্ত্ব, সংযমেই স্বাধীনতা, সংযমেই আনন্দ।

মত্ততা আর কাহাকে বলে? কেবলই সংযমাভাব বৈত নয়। আপনার উপরে আর দখল নাই, নৃত্যই জীবনের একমাত্র অধীশ্বর। সত্যানুসন্ধানে লক্ষ্য নাই, তর্ক উঁচাইয়া রহিয়াছে; যোগানন্দ নৃত্যানন্দাচ্ছন্ন; কর্ত্তাব কর্ম্মত্ব প্রাপ্তি। মত্ততাসুখেও কাজ হয় বটে, কিন্তু সে কার্য্যের মধ্যে জাগ্রত জীবন্ত আনন্দ নাই, সে কেবল মৃত দেহকে তড়িৎ সাহায্যে নৃত্য করান। অসংযত মত্ততাসুখ শুনিল ধর্ম্ম, অমনি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। স্থির সংযত হৃদয় ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধানে ফিরিবে। মত্ততা-সুখ ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারে, কিন্তু দৃঢ়ভিত্তি গাঁথিয়া তুলিতে পারে না। তাহার সকল কার্য্যই সাময়িক ক্ষণিক আন্দোলন। সংযম কার্য্যের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া কাজ করে, মত্ততাসুখ একটা কিছু হৈ চৈ আবশ্যক ভাবিয়া কাজ করে। আসল কথা, মত্ততাসুখ চিন্তা করিতে চাহে না।

২

তবে চিন্তা করাই কি মত্ততা-সুখের প্রতিবন্ধক? না, তবে গভীর চিন্তাশীলতা বটে। চিন্তার মধ্যেও মত্ততাসুখ আছে। লাগামছাড়া কল্পনার অস্তিত্বই তাহার প্রমাণ। যোগী যেমন সংযত হৃদয়ে সেই ভূমা অজর অমরের ধ্যানে নিযুক্ত থাকেন, তাহার মধ্যে মত্ততা নাই। তাঁহার বিমল মুখ জ্যোতিতে, অধর প্রান্তের রজত-রেখায় মত্ততাসুখাভাব অভিব্যক্ত। মত্ততাসুখের হাস্য সংযত নহে। সে গড়াইয়া পড়ে,

লুটাইয়া যায়, তাহার মাতালগতি। তাহার উৎসব দেহের উৎসব, আত্মার উৎসব নহে। তাহাতে আত্মার ভূমানন্দ পরিব্যাপ্ত হয় না, সাময়িক উচ্ছ্বাসে ব্যয়াস সুখ লাভ হয় মাত্র।

অনেকে হয়ত আমাদিগকে ভুল বুঝিয়া মনে করিতেছেন যে, মত্ততা সুখকে দ্বীপান্তরিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মত্ততাসুখের মন্দিরে মন্দিরে সংযমের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে অবশ্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। কিন্তু তাহা যখন সম্ভব নহে; তখন মত্ততা সুখকে একেবারে দ্বীপান্তরিত করিয়া মন্দির শূন্য রাখিবার প্রয়োজন দেখি না। মত্ততাসুখ অনেকস্থলে মন্দের প্রতিবন্ধক। সংসারে একেবারে বৃথা কিছুই নাই, মত্ততা সুখেরও কাজ আছে।

কিন্তু কাজ আছে বলিয়া তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া অকর্ত্তব্য। কারণ, প্রশ্রয় পাইলে সে তোমাকে এমনি আঁকড়িয়া ধরিবে যে, তাহার নাগপাশ হইতে কিছুতেই উদ্ধার পাইবে না। বহুরূপীর মত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সে তোমার নিকট ধর্ম্মরূপে, জ্ঞানরূপে, প্রেমরূপে, কর্ম্মরূপে আবির্ভূত হইবে, এবং মোহের আবরণ টানিয়া দিয়া তোমাকে কলুর বলদের মত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কর্ম্মশীলতায় সান্ত্বনা দিবে। মত্ততা সুখের দাসত্বে তুমি অনেক সৎকার্য্য করিতে পার স্বীকার করি, কিন্তু আবার নিমেষের মধ্যে তোমার সত্যনিষ্ঠা অন্যায়ের তরফে দাঁড়াইতে পারে। মত্ততাসুখের উপর ত আর নির্ভর করা যায় না—সে আজ খেয়ালবশতঃ সর্ব্বস্বান্ত হইতে পারে, কাল আবার হয়ত অপরকে সর্ব্বস্বান্ত দেখিবার জন্য লালায়িত হইবে। মানব জীবনের অসংলগ্নতার কারণ অনেক সময় মত্ততাসুখ।

মত্ততাসুখ আপনার স্বাধীনতা অনুভব করিবার জন্য যষ্টিহস্তে নিরীহের পৃষ্ঠ অনুসন্ধান করে; সংযম আপনার প্রভু হইয়া স্বাধীনতা উপভোগ করিতে থাকে। সংযমের আস্ফালন নাই, অহঙ্কার নাই; মত্ততাসুখ আস্ফালনী বিদ্যার উপরেই বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়াস পায়। যেমন করিয়াই হৌক্‌, মত্ততা সুখে যে স্বাধীনতা নাই তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। উদাহরণ দিয়া একটু পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করি। পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

মনস্থিরার্থে মাদকব্যবহারকারী উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন কু-অভ্যাস বশতঃ প্রমত্তাবস্থা ভিন্ন ধর্ম্মভাব সম্যক প্রস্ফুটিত হয় না, মত্ততাসুখগ্রস্ত ব্যক্তির অন্তরেও সেইরূপ মত্ততা বিহীন কোন ভাবই ঠাঁই পায় না। প্রকৃতপক্ষে মত্ততার দাসেরা যন্ত্রবৎ জড় পদার্থ—তাহাদিগকে উপায় স্বরূপ করিয়া মত্ততাই কার্য্য করে। বড় মানুষের চাকরেরা যেমন বড়মানুষীদৃপ্ত হয়, মত্ততার দাসেরাও সেইরূপ মদদৃপ্ত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, বড়মানুষের চাকরের মনে যে অহঙ্কার দেখা যায় তাহা মত্ততাপ্রসূত। পানীয় মদ ভিন্ন সংসারে বিষয়-মদ ধর্ম্ম-মদ প্রভৃতি নানা প্রকার মদ আছে, তাহাও

পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আর একটী কথা পাঠকেরা স্মরণ রাখিবেন যে, তন্ময়ভাব ও প্রমত্তভাব এক নহে। তন্ময়ত্ব মত্ততার অতীত।

মত্ততাসুখকে ধরিতে হইলে আত্মবিশ্লেষণই বোধ করি সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। আত্ম-বিশ্লেষণে আপনার কার্য্যপ্রবর্ত্তক ভাবটীকে সহজেই বুঝা যায়, সুতরাং মত্ততাতিশয্য হইতে বিরত হইতে কষ্ট পাইতে হয় না। আমরা যে সত্যপ্রিয় হইয়াও অনেক সময় স্খলিতাচরণ হই, তাহার এক প্রধান কারণ মত্ততা সুখমোহে আমাদের আত্মবিশ্লেষণা-ভাব। সহসা লাফাইয়া না উঠিয়া ধীরে সুস্থে আপনাকে বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে। কর্ত্তা যেন দাসত্বের বন্ধনে পড়িয়া কর্ম্মে আসিয়া না পরিণত হয়েন।

কিন্তু আত্মবিশ্লেষণ হয় কিরূপে? বাস্তবিক, ইহা শুনিতে যত সহজ, কার্য্যে তেমন নহে। আপনাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে আমাদের সহজে প্রবৃত্তিই হয় না। আমরা আপন আপন কুটিল হৃদয় দর্পণে জগৎ সংসারকে কুটিল দেখি, এবং আত্মছিদ্রের প্রভাবে সংসার ছিদ্রময় ঠাহরাইয়া থাকি। পরছিদ্রানুমান-তৎপরতা হেতু আত্মবিশ্লেষণের অব-সর প্রায় হয় না। কিন্তু মানবের চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? দুইদিন অভ্যাস করিলেই আত্মবিশ্লেষণ সহজ হইয়া উঠে। আত্মবিশ্লেষণ ক্ষমতা জন্মিলেই যে মানুষ সকল প্রকার মত্ততা হইতে মুক্ত হয় তাহা অবশ্য নহে, কারণ, আত্মছিদ্র বুঝিতে পারিলেও প্রবৃত্তিকে বশীভূত করা সময় সাপেক্ষ। আত্মবিশ্লেষণ চক্ষু খুলিয়া দেয়, এবং এই কারণে সংযমের যথেষ্ট সহায়তা করে।

পদে পদে আমরা যখন আপনার দোষ অনুভব করি, তখন সাধারণতঃ সাধু ব্যক্তির নিন্দা করিয়া তৃপ্ত হইতে চাই। নিন্দাপ্রিয়দিগের নিকট সাধুতার খুঁৎ যেমন তৃপ্তিকর এমন আর কিছুই নহে। রীতিমত আত্মবিশ্লেষণ অভ্যাস করিলে এ ভাব কতকটা কমিয়া আসার সম্ভাবনা। বলা বাহুল্য, আত্মবিশ্লেষণের মূল আত্মসংশোধনস্পৃহা বৈ আর কিছুই নহে। বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া যখন আমরা নিজের খুঁৎগুলি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিব, তখন ক্রমে ক্রমে তাহা ঘুচিবেই। কারণ, মানবসন্তানে সৎপথাবলম্বনেচ্ছা চিরকালই বলবতী। সে পঙ্কের মধ্যে থাকিতে পারে না; তাহার আনন্দ চাই, প্রাণ চাই, শান্তি চাই। আর আনন্দ সংযম ব্যতীত মিলে না। পরশ্রীকাতরতা নিজশ্রীর আনন্দ উপভোগ করিতে দেয় না, পরনিন্দা আত্মসাধু-অনুষ্ঠানের আনন্দ উপভোগ করিতে দেয় না, কুটিলতা সরলতার আনন্দ হইতে বঞ্চিত করে। যেখানেই সংযমাভাব, সেইখানেই অন্ধকার নিরানন্দ। মত্ততাসুখে নৃত্য-কোলাহল, শ্রান্তি, অবসাদ, অশান্তি, এবং অব-শেষে শূন্য।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজনৈতিক সংবাদ

হায়দরাবাদের ঋণ। আমরা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, দ্বিতীয় স্যর সেলার জঙ্গ যখন কর্ম্ম পারত্যাগ করেন, সেই সময় নিজাম বৃদ্ধ সেলার জঙ্গের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু এখন শুনিতেছি যে নিজাম নিজে কোন প্রকার অঙ্গীকার করেন নাই বরং এবিষয়ের জন্য বিরক্তই হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রধান শেক্রেটারী কর্ণেল মার্সেলের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া এই ঋণ শোধ করিতে স্বীকার পাইয়াছিলেন। রেডিডেণ্ট কর্ডেবী সাহেবও নাকি এজন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন; যাহা হউক হায়দারাবাদের কোন পত্রিকা বলিয়াছেন যে এই ঘটনার কিছু দিন পরেই সমস্ত ঋণের ফর্দ্দ বাহির হয়, এই ঋণের পরিমাণ ৩০ লক্ষ টাকা। এই সময় কিস্তিবন্দী হয় যে বৎসরে ৩ লক্ষ টাকা করিয়া ঋণ শোধ করিতে হইবে। ঋণদাতাদিগের সহিত কর্ণেল বাহাদুরের নাকি 'বন্দোবস্ত' হইয়াছিল, তাই কর্ণেল বাহাদুর নিজামের নিকট হইতে ঋণ স্বীকার করাইয়া লন। তাহার পর কত-দূর কি গড়াইয়া ছিল তাহা বলা যায় না—তবে ঋণ দাতাগণ দোষ স্বীকার করিয়া বলিতেছে যে এত টাকা তাহাদের প্রাপ্য নয়। এই সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য নিজামের বর্ত্তমান মন্ত্রী এক কমিসন গঠন করিয়াছেন, হায়দরাবাদের অনেক পদস্থ ব্যক্তি এই কমিসনের মেম্বর, কিন্তু ইহাতে আশানুরূপ ফল হইবে বলিয়া বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্টের এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়। অনেক সময় 'চুনা পুঁটী' সামান্য লোভ করিতে যাইয়া মারা পড়ে কিন্তু বড় বড় 'রাঘব বোয়াল' পরের অপারিমিত অর্থ উদরসাৎ করিয়া বিজ্ঞের ন্যায় গম্ভীর ভাবে ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। যাহাতে এই সমস্ত 'রাঘব বোয়ালের' দল ধরা পড়ে তাহার চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

লুসাই সংগ্রাম। লুসাই সংগ্রামের 'উদ্যোগ পর্ব্বের' আজিও শেষ হয় নাই। পঞ্জাব হইতে ৫০০ কুলি যাইবে, কলিকাতা হইতেও জাহাজে ৪২০টি অশ্বতর পাঠান হইয়াছে, ইহার পরে হস্তী ও রসদ প্রেরিত হইবে। এদিকের ত এই অবস্থা। আবার ওদিকে চট্টগ্রাম সীমান্তে সেণ্ডাস জাতি দলে দলে যুটিতেছে। সম্ভবতঃ লেঙ্-লীর দুর্গ আক্রান্ত হইবে। তাই সেখানে কর্ণেল টেগিয়ারের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব হইতেছে। কোথায় যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, কবে আরম্ভ হইবে, তাহা আজও ঠিক হয় নাই; এ উদ্যোগ আর কত দিন চলিবে?

কুলি-ইনেস্‌পেকটার। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, যে সমস্ত কুলি বঙ্গ-দেশের নানা স্থান হইতে আসামের চা বাগিচায় প্রেরিত হয় তাহাদের স্বাস্থ্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য জনকয়েক এগ্রিমেণ্ট-ইন্স্‌পেক্টার নিযুক্ত হইবে। কুলি আইনের পুনঃসংস্করণ না হইলে কুলিদিগের দুর্দ্দশা দূর হইবে না সত্য বটে, কিন্তু ইহাতেও অন্ততঃ

কিছুফলও পাওয়া যাইবে, এজন্য আমরা ছোট লাট বাহাদুরকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই। কিন্তু যাহাতে এই কার্য্যে উপযুক্ত ও বহুদর্শী দেশীয় লোক নিযুক্ত হন, আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। তাহাতে ফল এই হইবে যে এ জন্য গবর্ণমেণ্টকে খুব মোটা মাহিনা দিতে হইবে না সুতরাং খরচ কম পড়িবে; পক্ষান্তরে দেশীয় লোক দেশীয় লোকের অবস্থা ইংরেজ কর্ম্মচারী অপেক্ষা ভাল বুঝিতে পারিবেন, ইহাতে কুলিদিগের অধিকতর সুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব। আজ কাল পল্লীগ্রাম সমূহের স্বাস্থ্যের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। শুধু স্বাস্থ্য কেন শিক্ষার অভাবও যথেষ্ট। পল্লীগ্রামের অতি অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যেই শিক্ষার জ্যোতি প্রবেশ করিয়াছে। এই দুইটি অভাব গবর্ণমেণ্ট বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, তাই লোকাল বোর্ডের অধীনে গ্রাম্য সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। লোকাল বোর্ডের এত ক্ষমতা হইবে না যে গ্রাম্য সমিতির হস্তে উপযুক্ত অর্থ দান করিয়া পল্লীগ্রামের এই দুইটি প্রধান অভাব নিরাকরণ করেন। শিক্ষা কমিসনের পরামর্শানুসারে পল্লীগ্রাম সমূহে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে ১৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের আট লক্ষের অধিক টাকা দিবার সাধ্য নাই, সুতরাং ৬ লক্ষ টাকা তুলিতে অন্য উপায় অবলম্বন না করিলে চলে না। তা ছাড়া গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত করিতেও অনেক টাকার প্রয়োজন; বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী কটন সাহেব বলেন যে যদি ভূমির খাজানার উপর আর একটি কর স্থাপন করা যায় তবে এই টাকা উঠিতে পারে। গ্রাম্য সমিতির অধানস্থ স্থান সমূহে যে টাকা উঠিবে, তাহা সেই স্থান সমূহের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে ব্যয়িত হইবে। যদি প্রত্যেক জেলায় এক পয়সা হিসাবে প্রতি টাকার উপর ট্যাক্স লওয়া যায় তবে কটন সাহেবের হিসাব অনুসারে উনিশ লক্ষ টাকা আদায় হইতে পারে। এবং একপাই হিসাবে আদায় করিলে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা আদায় হইবে। এক পাই হিসাবে আদায় করিলে শুদ্ধ শিক্ষা কার্য্যের খরচটিই উঠে মাত্র, কিন্তু শিক্ষা অপেক্ষাও স্বাস্থ্যরক্ষা বেশি প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের বিবেচনায় এক পাই হিসাবে আদায় না করিয়া এক পয়সা হিসাবে আদায় করাই যুক্তি সঙ্গত, কারণ তাহাতে ৬ লক্ষ টাকা বাদ দিয়াও ১৩ লক্ষ টাকা থাকিবে ও ইহাতে গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে হইতে পারিবে। আমরা স্বীকার করি ইহাতে দরিদ্র লোকের কিছু কষ্ট বাড়িবে, কিন্তু যখন এত সহ্য হইতেছে, তখন ভবিষ্যৎ উন্নতির অনুরোধে এটুকু সহ্য করাও অন্যায় নহে। সমুদ্রে যাহার শয্যা শিশির পাতে তাহার ভয় করিয়া কি হইবে, বিশেষ শিশিরপাত যখন উপকারের জন্য।

ভারতসভার অধিবেশন। বিগত অক্টোবর মাসের শেষে ভারত সভাগৃহে ভারত সভার ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয়

সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গতবর্ষের কার্য্য বিবরণী শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা পঠিত হয়। গত বর্ষ যে সমস্ত সৎবিষয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহা বর্ণিত হয়। তাহার মধ্যে আবকার-প্রথাব সংস্কার, কুলিদিগের অবস্থাগত উন্নতি ও ব্যবস্থাপক সভার সংস্কারের প্রার্থনা করিয়া পার্লেমেণ্টে সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট আবেদন, প্রাদেশিক সমিতির গঠন, কংগ্রেস স্থাপনের উদ্যোগ, দুর্ভিক্ষে প্রজাদিগের অবস্থা অনুসন্ধান প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রধান। বর্ত্তমান বর্ষের জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সংগঠন ও কার্য্য নির্ব্বাহক কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের পর এই অধিবেশন শেষ হয়।

জাতীয় মহাসমিতি। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের দিন নিকটে আসিয়াছে। এই মাসের (ডিসেম্বরের) শেষ সপ্তাহেই অধিবেশন বসিবে। সার উইলিয়াম ওয়েথারবারর্ণ সাহেব এই পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন, ভারত মহাসাগর পার হইয়া অনেক দূরে বৈদেশিক রাজ্য সমূহে জাতীয় মহাসমিতির নাম পৌঁছিয়াছে। ইহার উপকারিতা বুঝিয়া অন্যান্য জাতি এইরূপ সমিতি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। তথাপি আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক ইহার অনিষ্ট চেষ্টায় সর্ব্বদা তৎপর। আমরা শুনিলাম হিউম সাহেব জাতীয় মহাসমিতিতে দুইটি গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত করিবেন। একটি এই যে, কতকগুলি বিষয় একেবারে না লইয়া এক একটি স্বতন্ত্র ভাবে লইয়া তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন করা,—অন্যটি, প্রতিবৎসর মহাসমিতির অধিবেশন না হইয়া প্রতি পাঁচ বৎসরে একবার হওয়া। এ বিষয় দুইটি অতি গুরুতর। উপস্থিত প্রতিনিধি বর্গ এ সম্বন্ধে বিচার করিবেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় প্রথমোক্তটি সম্বন্ধে যাহাই হউক শেষোক্তটি বড়ই আপত্তিকর; কারণ বৎসর বৎসর কোন বিষয়ের আন্দোলন চলিলে তাহার যেরূপ ফল হইবে বলিয়া বোধ হয়, চার বৎসর পরে কোন বিষয়ের আন্দোলন হইলে তাহার সেরূপ ফল লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ তাহাতে এতই কাজ জমিয়া যাইবে যে প্রথম প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইবে। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে বোধ হয় যথেষ্ট অর্থের অসচ্ছলতাই এরূপ পরিবর্ত্তন সংকল্পের কারণ। আমরা আশ্চর্য্য হই যে, এই বৃহৎ ব্যাপারের জন্য যথেষ্ট অর্থ ভারতবর্ষ হইতে উঠিতে পারে না! আমরা স্বীকার করি ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র দেশ, কিন্তু নিজের উপকারের জন্য, ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগের উপকারের জন্য, আপনার কর্ত্তব্য মনে করিয়া কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারেন না এমন লোক ভারতবর্ষে কয়জন আছেন? আমাদের বিশ্বাস অর্থে অনাটন পড়িবে না। এই ত বোম্বে ও পুণা হইতে ভারতবর্ষের এক অংশ হইতেই ৩০ হাজার টাকা উঠিয়াছে; কংগ্রেসের অধিবেশনের খরচের জন্য ভাবনা নহে, ভাবনা পোলিটিক্যাল এজেন্সির জন্য। এই পোলিটিক্যাল এজেন্সি কংগ্রেসের দক্ষিণ হস্ত; ইহাকে জীবিত রাখিতে হইলে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন; সেই অর্থ আজও যথেষ্ট উঠিতেছে না। এই কথা লইয়া আজ

কাগ কংগ্রেসের শত্রু মহলে খুব ধুম লাগিয়া গিয়াছে। কেহ বলিতেছেন 'কংগ্রেসের পতন অনিবার্য্য" কেহ বলিতেছেন, 'বড় বড় রাজাদের কাছে কংগ্রেসের পাণ্ডারা ভিক্ষা আরম্ভ না করিলে আর উপায় নাই। আমরা এ সমস্ত কথা গ্রাহ্য করিব কেন, ব্যক্তি বিশেষের অনুগ্রহের উপর কংগ্রেসের জীবন, ইহা দেখিবার আগে কংগ্রেসের মৃত্যু কামনা করিব, কংগ্রেস সমস্ত ভারতবাসীর জিনিষ, সমস্ত ভারতবাসী নিজের কথা মনে করিয়া যে অর্থ সাহায্য দিবেন তাহাতেই 'কংগ্রেস' ও 'পোলিটিক্যাল এজেন্সির' কার্য্য সুচারু সম্পন্ন হইবে।

এখন যজ্ঞভূমির কথা কিছু বলা যাউক, সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে, ইহা ১৮০ ফুট দীর্ঘ ও ১২০ ফুট প্রশস্ত অর্থাৎ গতবারের সভামণ্ডপ অপেক্ষা বৃহৎ করা হইয়াছে। বোম্বের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত মুকুন্দরামচন্দ্র এই সভানির্ম্মাণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, আমরা আশা করি তাঁহার পরিশ্রম সফল হইয়াছে। ১২ শত প্রতিনিধি যাইবেন এইরূপ কথা, কিছু বেশী হইলেও হইতে পারে, ইহাঁদের ৮শতের জন্য বাড়ী ঠিক করা হইয়াছে, বাকি চারিশত তাম্বুতে বাস করিবেন। এতদ্ভিন্ন বোম্বের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে যে সমস্ত প্রতিনিধি যাইবেন তাঁহাদের অধিকাংশ বন্ধুবান্ধবদিগের বাড়ীতেই অবস্থিতি করিবেন। কংগ্রেস কমিটি অতি উৎসাহের সহিত সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহাদের এ জলন্ত তেজ, এ অদম্য উৎসাহ দেখিয়া মনে হয়, কোন কর্ম্মই অসম্পন্ন রহিবে না; এলাহাবাদের কংগ্রেস অপেক্ষা বোম্বের কংগ্রেস অল্প দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হইবে না। জাতীয় মহাসমিতির মাননীয় সম্পাদক হিউম সাহেব, কর্ণেল বেনন প্রভৃতি অনেকে বোম্বে পৌছিয়াছেন। আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি বর্ত্তমান অধিবেশন সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পন্ন হউক।

পোলিটিক্যাল এজেন্সি। আমরা ইতিপূর্ব্বে এই এজেন্সির নাম উল্লেখ করিয়াছি, এখানে আমরা এ সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলিব। কিছু দিন হইল ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিষয় আন্দোলন করিবার জন্য 'ইণ্ডিয়ান পোলিটিক্যাল এজেন্সি' নামক একটি সভা গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী অনেক বড় বড় লোক এই সভার সভ্য। মিষ্টার ডব্লিউ, এস,কেইন,সি, এস; মিঃ ডবলিউ, এস,বি, ম্যাক লেরেন; মিঃ জে,ই,এলিস; মিঃ দাদা ভাই নৌরোজি প্রভৃতি। সার ইউলিয়াম ওয়েডারবারণ কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য ও মিঃ উইলিয়াম ডিগ্‌বি সি, আই, ই সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহারা চেষ্টা যত্ন করিলে আমাদের অভাব অনেক পরিমাণে দূর হইবে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সভাই কংগ্রেসের দক্ষিণ হস্ত, কারণ কংগ্রেসের আলোচিত সমস্ত বিষয় এই সভার সাহায্যেই রাজসদনে নীত হইবে। কিন্তু এই 'এজেন্সি'র কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। আমাদের কাজ, সুতরাং অর্থও আমাদের দিতে হইবে। এই এজেন্সির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থ সংগ্রহ করা কনি

হইয়াছে। তাই কংগ্রেসের শত্রুর মুখে হাসি, আর মিত্রের মুখে বিপদের ও নিরাশার ছায়া; কিন্তু চেষ্টা ও যত্নে যে টাকা উঠিবে না একথা অবিশ্বাস্য। আমরা প্রয়োজন বোধে ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত অর্থের একটি হিসাব উদ্ধৃত করিতেছি।

হিউম সাহেবের প্রদত্ত অর্থ (চারিবারে)		৬৪৪ পাউণ্ড	১৭ সিলিং	২½ পেন্স
শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		২০০ পাউণ্ড	০	০
মান্দ্রাজ	৩ বারে	৩০০ "	৩ শিসিং	৯ পেন্স
বেহার	৬ বারে	৩৯ "	৪ শিলিং	১১½ পেন্স
গুজরাট	৪ বারে	২৯ "	০	৬ পেন্স
বেরার	২ বারে	২০ "	০	০
পঞ্জাব	১ বারে	৩ "	০	০
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ		৪০ "	০	০
সিন্ধু	২ বারে	১৯ "	১৯ শিলিং	২ পেন্স
অযোধ্যা ও মধ্য প্রদেশ	(৩ বারে)	৩০ "	৯ সিলিং	১১ পেন্স
বাঙ্গালা	১ বারে	১০২ "	১৮ শিলিং	৭ পেন্স
কাশী	"	২৫ "	০	০
শিমলা	"	১১ "	৩ শিলিং	
কাশ্মীর	"	১০ "	৬ শিলিং	৩ পেন্স
		১৫৩৮ পাউণ্ড	৩ শিলিং	৪ পেন্স

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম মান্দ্রাজ অতি দরিদ্র প্রদেশ হইয়াও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছে; আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বোম্বে এত বৃহৎ ও সমৃদ্ধপ্রদেশ কিন্তু সেখান হইতে ১ পয়সাও সাহায্য উঠে নাই! ইহা বোম্বেবাসীগণের গভীর কলঙ্কের কথা; আরও এক কথা—যেখান হইতে যাহা উঠিয়াছে তাহাই কি যথেষ্ট? সেই সেই প্রদেশের কি তাহা অপেক্ষা অধিক সাহায্য প্রদানের ক্ষমতা নাই? আমাদের কাহারও কিছু ক্ষমতা নাই, পরোপকারী বৃদ্ধ হিউম আমাদেরই জন্য নিজ হইতে প্রায় সাড়ে ছয় শত পাউণ্ড খরচ করিলেন, আর আমরা কাপুরুষের মত চাহিয়া আছি? কেন শত্রুরা আমাদের উপহাস না করিবে? যাহাতে দেশের সম্মান রক্ষা হয়, হিউম সাহেব আমাদের উপকারী, যাহাতে তাঁহার কোন প্রকার ক্ষতি না হয় তাহার দিকে লক্ষ্য করা প্রত্যেক ভারতবাসীর বিশেষ প্রয়োজনীয় ও কর্ত্তব্য।

ব্যবস্থাপক সভা। ভারতবর্ষস্থ ব্যবস্থাপক সভা সমূহের পুনর্গঠনের নিমিত্ত ব্রাড্‌ল' সাহেব পার্লিয়ামেণ্টে একখানি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, এবং এই জন্য কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অনুমতিও প্রার্থনা করিয়াছেন। মহা-

সভার আগামী অধিবেশনের পূর্ব্বে ভারতবাসীরা এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে যথেষ্ট বিবেচনা করেন, ও জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাত করেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। সংস্করণ সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, ব্যবস্থাপক সভা সমূহে আংশিক নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত; মধ্য ভারতবর্ষে একটি নূতন ব্যবস্থাপক সভা স্থাপন করা যাউক; প্রাদেশিক সভা সমূহের হাতে ট্যাক্স গ্রহণ প্রথার পরিবর্ত্তন, আয় ব্যয় ও রাজস্বের হিসাবাদি, নূতন আইন কানুন প্রণয়নাদি সমস্ত কার্য্য থাকিবে। সভ্যগণ রাজ্যশাসন সংক্রান্ত সমস্ত কথা গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী সেই সেই প্রশ্নের উত্তর দিবেন; এবং সভ্যগণ এ সম্বন্ধে আন্দোলনও করিতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্টের স্বতন্ত্র কার্য্য নির্ব্বাহক সভা থাকিবে, এই সভার নাম হইবে 'একজিকিউটিভ কাউন্সিল'। এই সভা যদি ব্যবস্থাপক সভার কোন প্রস্তাব অযৌক্তিক বলিয়া মনে করেন তবে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহাকে ইহার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভা সমূহের আপিল শুনিবার জন্য এক কমিটি স্থাপিত হইবে। ব্যবস্থাপক সভা সমূহের চতুর্থাংশ সভ্য রাজকর্ম্মচারী হইবেন। এক চতুর্থাংশ সরকারী ও বেসরকারী কর্ম্মচারী হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা সমূহ হইতে অপরার্দ্ধ সভ্য মনোনীত হইবেন। এই নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্যে সরকারী কর্ম্মচারী থাকিবে না। সকলে তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন, তবে এই কালের পর পুনর্নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। এই সভার অধিবেশন কলিকাতায় হইবে; প্রয়োজন-বোধে, অগ্রে বিজ্ঞাপন দিবা গবর্ণর জেনারেল অন্য কোন স্থানেও বিশেষ অধিবেশন করিতে পারিবেন, কিন্তু যে প্রয়োজনে এই বিশেষ অধিবেশন তাহা ভিন্ন অন্য কোন বিষয় ইহাতে আন্দোলিত হইবে না। কোন সভ্যই বেতন পাইবেন না; তবে পাথেয় পাইবেন। প্রাদেশিক সভা সমূহও এই ভাবে গঠিত হইবে, তবে প্রধান ক্ষমতা প্রাদেশিক লেফটেনাণ্ট গবর্ণর বা গবর্ণরের হস্তে নিয়োজিত হইবে। প্রাদেশিক সভার সভ্য, লোকালবোর্ড, মিউনিসিপালিটীর করদাতৃ সভা, বণিক সভা, এবং যে সকল সভায় গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচনাধিকার দিবেন, সেই সমস্ত সভা হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল সভার কোন সভ্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধিধারীও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইতে পারিবেন।

পবলিক সার্ব্বিশ কমিশন। আমাদের দেশের অধিবাসীবর্গকে অধিক পরিমাণে উচ্চতর রাজকার্য্যে নিয়োগ করিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে পারা যায় তাহাই নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ১৮৮৬ সালের অক্টোবর মাসে এক কমিসন বসে। এই কমিসনের নাম 'পবলিক সার্ব্বিস কমিসন'। ১৮৮৮ সালের জানুয়ারীতে এই কমিসনের রিপোর্ট ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট প্রেরিত হয়। গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সচীব এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন।

(১) শিভিলসার্ব্বিশ পরীক্ষার্থীদিগের বয়স এখন ১৭ হইতে ১৯ বৎসর আছে ভবিষ্যতে ২১ হইতে ২৩ বৎসর করা হইবে। (২) বর্ত্তমান প্রণালীতে আর দেশীয় সিভিলিয়ান নিযুক্ত করা হইবে না। এই প্রণালীতে নিযুক্ত চিহ্নিত কর্ম্মচারীগণ যেমন আছেন তেমনই থাকিবেন, কিম্বা প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সার্ব্বিশ বিভাগে কার্য্য করিতে পাইবেন। (৩) বর্ত্তমান চিহ্নিত কর্ম্মচারীগণ ভারতবর্ষীয় সিবিলিয়ন বলিয়া পরিগণিত হইবেন। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য প্রাদেশিক সিভিলসার্ব্বিস গঠিত হইবে। উচ্চ পদের অচিহ্নিত কর্ম্মচারী ও নিম্ন পদের ষষ্ঠাংশ চিহ্নিত কর্ম্মচারী লইয়া নূতন শ্রেণী খোলা হইবে, মান্দ্রাজে যাঁহারা কাজ করিবেন তাঁহারা মান্দ্রাজ সিবিলসার্বেণ্ট ও বাঙ্গালায় যাঁহারা থাকিবেন তাহারা বেঙ্গল সিভিল সার্ভেণ্ট হইবেন। (৪) নূতন অভিধা প্রাপ্ত পুরাতন কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যাঁহারা নিম্ন শ্রেণীতে কাজ করিবেন, তাঁহাদিগের 'নিম্নতর সিভিল সার্ব্বিস' নাম দেওয়া হইবে, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা 'আবকারী কর্ম্মচারী শ্রেণী' গঠিত হইবে।

(৫) নিম্নতর সিভিল সার্ভিসে দক্ষতা দেখাইতে পারিলে, কর্ম্মচারীদিগকে উচ্চতর সার্ব্বিসে উন্নতি দেওয়া হইবে। প্রাদেশিক সিবিলসার্ভিস পরীক্ষকগণ পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত ও বিদ্বানদিগকে উচ্চতর বিভাগে উন্নীত করিতে পারিবেন। পরীক্ষা সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বড়লাট বাহাদুরের মত লইয়া নির্দ্ধারণ করিবেন।

(৬) ইংলণ্ড ভিন্ন অন্য কোথাও সিভিলসার্ব্বিস পরীক্ষা গৃহীত হইবে না। প্রাদেশিক বা ভারতীয় কোন সিবিলসার্ব্বিসেই দেশীয় বা বিদেশীয় কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বেতন বা পেনসন সম্বন্ধে কোনও প্রভেদ থাকিবে না, ইত্যাদি।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদিগের বয়সের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইলে, কোন বৎসর হইতে এই প্রবর্ত্তিত নিয়মে পরীক্ষা গৃহীত হইবে তাহা প্রথমে প্রকাশ হয় নাই। সম্প্রতি লর্ড ক্রশ প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৮৯২ সালের এপ্রিল হইতে এই নিয়ম অনুসারে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। পবলিক সার্ব্বিস কমিসনের ইহাই প্রধান ফল। কিন্তু অনেকে বলিতেছেন ইহাতে সুফল ফলিবে না, কারণ আমাদের দেশের লোক অল্প বয়সেই পাশ করিবার উপযোগী থাকে, অধিক বয়স হইলে তাহারা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারে না; দেখা যাউক ফলে কি দাঁড়ায়?

ষ্টেট্‌সেক্রেটারী বাহাদুর অন্যান্য যে সমস্ত নিয়মের প্রবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তন করিলেন তাহাতে আমাদের বিশেষ কোন লাভ নাই। ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট যদি ক্ষমতা কি বেতনে ডেপুটি ম্যাজিষ্টেটই থাকেন, তবে তাঁহাকে বেঙ্গল সিভিল সার্ভেণ্ট বলিলেও যে লাভ, ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভেণ্ট বলিলেও তাই। আমরা চাই প্রকৃত উন্নতি এ ফাঁকা পদ বৃদ্ধিতে কি লাভ হইবে?

গান শিক্ষা।

(১২৯৫ শকের ভারতী ১২ ভাগ নবম সংখ্যায় ৪৮৪ পৃষ্ঠায় যে স্বর-লিপি আছে তাহা দেখ।)

রাগিণী খট্—তাল ঝাঁপতাল।

কি দোষ করেছি তোমার
কেন গো হানিলে বাণ,
একই বাণে বধিলে যে
দুটী অভাগার প্রাণ।
শিশু বনচারী আমি
কিছুই নাহিক জানি
ফল মূল তুলে আনি
করি সামবেদ গান।
জন্মান্ধ জনক মম
তৃষায় কাতর হয়ে,
রয়েছেন পথ চেয়ে,
কখন যাব বারি লয়ে।
মরণান্তে নিয়ে যেও,
এ দেহ তাঁর কোলে দিও,
দেখ দেখ ভুল নাক
করো তাঁরে বারি দান;
মার্জ্জনা করিবেন পিতা
তাঁর যে দয়ার প্রাণ।

স১ রো১ ম১ গমপ১ ম১। প১ প১ প১ প১ ধোপ১। ম১ প১ ধো১ স১ স১।
কি দো — ষ ক — রে ছি তো মা — র কে ন গো হা—

ন১ স১ নসন১ ধো১ প১। প১ ধো১ ধো১ ধো১ নোধো১। প১ ধো১ প১ প১ধোপ১।
নি—লে বা — — ণ এ — কই বা — ণে ব—ধি—লে যে

ম১ প১ মপ১ ধোনো১ ধোপ১। মপ১ মগ১ রো২ সা১ ॥
দু — টি অ — — — ভা — — গা — র প্রা — ণ।

প১ ধো১ ধো১ ন১ ন১। স১ স১ সন১ স১ স১। স১ রো১ রো১ সরোগে।১ রো১।
শি শু ব — — ন চা — রি আ — — মি কি — ছু — ই না—

সˈ সˈ নসনˈ ধোˈ পˈ । পˈ ধোˈ ধো২ নোধোˈ । পˈ ধোˈ প২ পধোˈ ।
হি-ক জা — — নি ফ-ল মূ—ল তু-লে আ-নি

মˈ পˈ মপˈ ধোনোˈ ধোপˈ । মˈ গˈ রো২ সˈ ॥
ক-রি সা— — — —ম বে-দ গা-ন।

সˈ সˈ সনˈ সˈ সঃ । সˈ রোˈ রো২ রোˈ । সˈ রোˈ ম২ মমˈ ।
জ ন্মা—ন্ধ জ—ন—ক ম—ম তৃ—ষা—য় কাত—

মগˈ পমˈ মপমˈ গ২ । পˈ ধোˈ পধোˈ নোˈ ধোˈ । পধোˈ পˈ ম২ পমˈ ।
র হ—য়ে র—য়ে —ছে — — ন প —থ চে—য়ে

গˈ সˈ রোˈ সপˈ মˈ । গˈ গˈ রো২ সˈ ॥
ক-থন্ যা— — ব বা-রি ল-য়ে।

পˈ পˈ পধোˈ মˈ পধোˈ । সˈ নসরোˈ সˈ স২ । সˈ সˈ সনˈ সˈ সসˈ ।
ম—র—ণা — — স্তে নি—য়ে যে যো এ দে-হ তাঁর কো—

বোˈ সরোগোˈ রোˈ সˈ সˈ । নসˈ রোসˈ নˈ ধোˈ পˈ । পˈ ধোˈ ধোˈ
লে দি — ও দেখো দে

সˈ সˈ । নসˈ নˈ ধো২ পˈ । মˈ গˈ মˈ নোˈ ধোˈ । পধোˈ পˈ ম২ গˈ ।
— খো ভু-লো না—কো কোর তাঁ— — রে বা— রি দা— ন

পˈ ধোˈ ধোসˈ সˈ সˈ । নসˈ নˈ ধোˈ প২ । সˈ সˈ রোˈ সপˈ মˈ ।
মার্জ্জ — না ক রি বে-ন পি-তা তাঁ-র যে দ—

গমˈ গˈ রো২ সˈ ॥
য়া—র প্রা-ণ।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

ফুলজানি।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

দুঃখীরাম বাটীর মধ্যে মাথা হেঁট করিয়া মা ঠাকুরাণীর কথা শুনিয়া আসিল বটে কিন্তু বহির্ব্বাটীতে আসিয়া তাহার সে ভাব আর রহিল না। দুই খানা পালকীই শূন্য ফেরৎ যাইবে শুনিয়া বাহকদের কেহ কেহ হাসিল, ফনু সেখ কাছে দাঁড়াইয়া, সেও দন্ত পংক্তি ঈষৎ বিকশিত না করিয়া থাকিতে পারিল না। ইহাতে দুঃখীরামের ভারি অপমান বোধ হইল। সে গর্জ্জন করিয়া মহা আস্ফালন সহকারে ফনুর প্রতি ধাবিত হইল, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা বাধা দেওয়াতে তাহার হাতের লাঠি হাতেই রহিয়া গেল। তখন ফনুর দাড়ি ও খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অনেক কুকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে নায়েব মহাশয়ের প্রিয় ভৃত্য দ্রুত পদে মনিব গৃহে ফিরিয়া চলিল। পথে রাগের মাথায় সে নাকি বলিয়াছিল "বাড়ীতে ডাকাত পড়ুয়ে ছাড়বো তবে সিন্ আগুরির ছেলে," সে কথা তখনই নিস্তারিণীর কানে উঠিল।

ডাকাত পড়ানর ভয় প্রদর্শন সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু দুঃখীরাম যে পথে যাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল তাহাকেই বলিয়াছিল যে "পরগোণা হলে একবার দেখতুম" তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এদিকে পুরন্দর অপথে লুকাইয়া লুকাইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং অন্যের অলক্ষ্যে দিদির ঘরে গিয়া তাহার বিছানায় মুখ লুকাইয়া শয়ন করিল। মোক্ষদা মাছ ধুইয়া আসিয়া স্নানের উদ্যোগ করিতেছিল। চুল খুলিবার উদ্দেশে গৃহে প্রবেশ করিয়াই ভ্রাতাকে সে ভাবে দেখিয়া সে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তখন "কি হয়েচে পুরু, কি হয়েছে ভাই" বলিতে বলিতে বোন বিছানায় গিয়া বসিল এবং ভাইয়ের মাথা কোলে তুলিয়া লইল।

মোক্ষদা দেখিল পুরন কাঁদিতেছে। তখন আঁচল দিয়া চোক মুছাইয়া দিল। দেখিল ভাইয়ের কাপড়ে কর্দ্দমের ছিটা এবং চোরকাঁটকি, পায়ে তিন চার জায়গায় কাঁটার ছড়। নয়নের মাসীর সঙ্গে মার যে ভাবে কথা বার্ত্তা হইয়াছিল তাহাতেই মোক্ষদা বুঝিয়া ছিল আজ একটা কিছু ঘটিবে। অতএব মহা উদ্বিগ্ন হইয়া পুরনকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল।

পুরন্দর অনেকক্ষণ উত্তর দিতে পারিল না। শেষে বলিল—"কেন তুই জানিসনে, দুখে দাদা পাল্‌কী বেহারা নিয়ে আন্‌তে গিয়েছিলো!"

মো। পালকী বেহারা নিয়ে এরি ভেতর আন্‌তে গিয়েছিলো! কাকেরে? তোকে না বউকে?

পু। দুজনকেই ! আমার ভারি লজ্জা হলো, তাই পালিয়ে এয়েচি।

বড় দুঃখেও দিদি হাসিল—"তা পালিয়ে এলি কেন—ছি দেখ্ তো কত কাঁটার ছড় লেগেচে। লোকে নিন্দে করবে যে!" বলিয়া দিদি ভাইয়ের পায় হাত বুলাইয়া দিল।

পুরন বিজ্ঞ মানুষের মত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—কত নিন্দে করচে দিদি দুধারে রাস্তার লোকে! আমার ইচ্ছে করে কোথাও পালিয়ে যাই, এখানে আর থাক্‌ব না।"

তখন দিদির জিজ্ঞাসা মতে পুরন তাহাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া প্রাতে পিতা শাশুড়ীকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, একটী একটী করিয়া সকলই বলিল। ভাই বোন উভয়েরই মতি গতি অনেকটা পিতৃবংশ ছাড়া এবং মাতৃবংশানুগত। তুচ্ছ অর্থের জন্য ছল ধরিয়া যে পিতা নূতন কুটুম্বের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া উভয়েই হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইল। মোক্ষদা ছল ছল নেত্রে ভ্রাতার ম্রিয়মাণ মুখচ্ছবি দেখিতেছিল। এমন সময়ে মা আসিলেন।

ভারতচন্দ্রের রাজা বীর সিংহের রাণীঠাকুরাণীর মত তখন জগদ্ধাত্রীর মূর্ত্তিখানি, তার উপর এই মাত্র স্নান করিয়া আসিয়া তিনি চূড়ার আকারে কেশ রাশি মাথার উপর বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন; এইমাত্র নয়নের মাসীর নয়ন মাতৃস্বসার কাছ হইতে সন্দেশ বহন করিয়া আনিয়াছেন যে দুঃখীরামকে প্রহার ও অপমান করিয়া বোসেদের বউমা পালকী বেহারা ফিরাইয়া দিয়াছে। তাহার পর বহির্ব্বাটী হইতে কে একজন আসিয়া বলিয়া গেল শূন্য পালকী লইয়া দুঃখীরাম ফিরিয়া আসিল, তারা বউ পাঠায়নি, ছেলে হাঁটিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। মা বাড়ীর সকল ঘর খুঁজিয়া হয়রাণ হইলেন, কোথাও পুরনের দেখা পাইলেন না। বাকী এক মোক্ষদার ঘর, কিন্তু সে স্নানে গিয়াছে জানিতেন। অতএব তাহার দ্বার খোলা দেখিয়া ক্রোধ ও উদ্বেগের উপর কর্ত্রী ঠাকুরাণী একটু একটু কৌতূহল পরবশ হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। পুরন্দরকে দেখিয়া তিনি বাম হস্তে বামগণ্ড রাখিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইলেন।

মার সে মূর্ত্তি দেখিয়া কষ্টে মোক্ষ হাস্য সম্বরণ করিল! সেও নীরবে নিতান্ত ভাল মানুষের মত মার আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিল।

বিস্ময় বিহ্বলতার প্রথম বেগ প্রশমিত হইলে মাতা প্রায় সেইভাবে দক্ষিণে হেলিলেন। পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"হাঁরা, সেই মন্তরি তন্তরি শতেক খুয়ারীই না হয় ক্ষেপেচে, তুইও কি আবাগীর বেটীকে বিয়ে করে"—

মোক্ষদা দেখিল মা বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে। কাজেই কথা শেষ হইতে না হইতে বলিল—"ছি মা গাল দিয়ে অলক্ষণ করো না। আসল কথাটা কি তা হয়ত তুমি জান না। দোষ সব বাবার, মাহুইমার নয়।"

যত ভয় পুরনের পিতাকে, মাতাকে তাহার কিছুই নহে। যাকে বাক্যবাণ উদ্গীর্ণ করিতে দেখিয়া পুরন উঠিয়া বসিয়াছিল। কন্যার নরম কথা এবং পুত্রের বিষণ্ণ-ভাব দেখিয়া জগদ্ধাত্রী থামিয়া গেলেন। দিদি বলিল—"বলত পুরু সব কথা মাকে।"

পুরু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উপেক্ষার ভাবে বলিল—"তুইই বল, সব ত শুনে-চিস্।"

তখন মোক্ষদা খুঁটিয়া খুঁটিয়া সব কথাগুলি ভাইয়ের কাছে যেমন শুনিয়াছিল, মাকে শুনাইল। কিন্তু মা দমিবার পাত্র নহেন। মনে মনে স্বামীর অন্যায় স্বীকার করিলেও তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে বেহাইনের পালকী বেহারা ফেরৎ পাঠাইবার কি অধিকার। "যে মেয়ে দিয়েচে, তার আবার তেজ কি?" তাঁহার মনে হইল না তাঁহারও কন্যা আছে।

মোক্ষদা স্থির ভাবে বলিল "মা মেয়ে সবারই আছে। আমার শ্বশুর বাড়ীর সামান্যি একথা ওকথা শুনে তুমি জ্বলে ওঠ কেন? তাও দেখেচি বাছা! তোমার বড় মানুষ বাবা ঠাক্‌মার কত খোয়ার করতেন তা তোমার নয়নের মাসীর কাছেই শুনেচি, আমার কথা শোন। মাহুইমার সঙ্গে ঝকড়া করোনা। বাবাকে বলে এই বেলা মিটিয়ে ফেল। বল ত আমি ওবেলা বউকে দেখ্‌বার ছল করে মাহুইমার হাতে পায়ে ধরে আসি।"

কন্যার এতটা গৃহিণীপনা মাতার অসহ্য হইল। তাঁহার জানা ছিল, কথায় তিনি মেয়েকে পারিয়া উঠিবেন না। অতএব তিনি মুখ বাঁকাইয়া উঠিলেন। তখন আর ভৈরবী মূর্ত্তি ছিল না। পুত্র কন্যা উভয়েই বুঝিল, মার মন নরম হইয়াছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শাখা পল্লবিত হইয়া নূতন কুটুম্বদের নূতনতর কলহের বৃত্তান্ত অর্দ্ধ প্রহর মধ্যে হরিশপুরের ঘরে ঘরে প্রচার হইয়া গেল। তাহার ফলে সে দিনকার মত সেই ক্ষুদ্র পল্লীখানিতে একটা জীবন্তভাব জাগিয়া উঠিল। তোমরা সব পাড়াগাঁয়ের অনেক নিন্দা করিয়া থাক, কিন্তু কুৎসা দলাদলি, কলহ কচ্‌কচি আছে বলিয়াই যে গরিব অসাড় পল্লীগ্রামের নাড়ী কখন কখন পাওয়া যায় এখবর বোধ করি রাখ না!

কন্যা পুত্রের কাছে কলহের বিবরণ যেরূপ শুনিলেন, তাহাতে জগদ্ধাত্রীর মন একটু নরম হইল বটে কিন্তু বেহাইন যে বড় অহঙ্কারী, মেয়ে দিয়েও যে তাঁহার কাছে মাথা হেঁট করে না, এটা অসহ্য। কাজেই স্বামীর স্বাভাবিক ধনলোভের প্রতি তাঁহার বরাবর যে বিতৃষ্ণা ছিল, এ ঘটনায় তাহার তীব্রতা কিছু বাড়িল না। বরং যে কোন ওছিলায় হউক, "ভজুনি পূজোনি" বেহাইনকে যে জব্দ করিবার সুযোগ হইয়াছে ইহাতে তিনি ঈর্ষাসুলভ একটা আনন্দ লাভ করিলেন। সাক্ষাৎ হইলে

স্বামীকে বড় কিছু বলিলেন না, কিন্তু পুরন যে প্রাতের ঘটনায় দুঃখিত হইয়াছে সে কথাটা বলিতে ভুলিলেন না। শুনিয়া নায়েব মহাশয় একটু কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মতলব তাঁহার উর্ব্বর মস্তিস্কে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। বলিলেন "বটে এরি ভেতর শ্বশুর বাড়ীর উপর এত টান! তুমি যে বল মন্তরি তন্তরি মাগীটে, তা সত্যি। ছেলেটা এখানে থাক্‌লে যাদু করে ফেল্‌বে দেখ্‌চি। তা হলেই আমাদের সুখ সোয়াস্তির দফা রফা আর কি? বুঝেছ?"

অর্দ্ধভাগিনী হইলেও জগদ্ধাত্রী স্বামীর মতলব এবং "সলায়" সকল ভাগ আয়ত্ত করিতে পারিতেন না, এখনও ভাল পারিলেন না। কর্ত্তা গৃহিণীর নথ-ভূষিত বিস্মিত বদন চন্দ্রের শোভা দেখিতে দেখিতে বলিয়া চলিলেন—"বুঝ্‌চো না? এর পরে যাদু করে ঐ ছেলেকে পাগল করে দেবে, তখন বউই হবে সর্ব্বস্ব। আমাদিকে আর গেরাহ্যিই কর্‌বে না। এখন থেকে তারও উপায় কর্‌তে হবে।"

এতক্ষণে কথাটা পরিষ্কার হইল। জগদ্ধাত্রী উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন—"ঠিক্ কথাই তুমি বলেচো। কি উপায় কর্‌বো বল? তখুনি বলেছিলাম বলি ভজুনি পুজোনি বেয়ান করো না। হায় হায় আমার অনেক দুঃখের ছেলে, আমার একটী ছেলে! সেই ছেলে আমার পাগল করে দেবে? এখুনি গিয়ে আমি মাগীর পায়ে মাথা কুটে আস্‌বো!"

এ সব বিষয়ে জগদ্ধাত্রীর যে কথা সেই কাজ স্বামী তাহা জানিতেন, সুতরাং সময় মত রথ রশ্মি সংযত করিতে আর দেরি মাত্র করিলেন না।—"পাগল আর কি! সত্যিই কি ছেলেকে পাগল করে দেবে গা? তারও ত সেই সবে একটী মেয়ে! পাগল করে দেবে না, তবে মন্তর তন্তর করে ছেলেটাকে বশ করে নেবে সেই আমার ভাবনা। তাই বল্‌চি এখন থেকে একটা উপায় করতে হবে।"

গৃহিণী কিন্তু তত সহজে বাগ মানিলেন না।—"হাঁ ডাইনীর আবার মেয়ে জামাইয়ের উপর মায়া! পাগল করেই দেবে—হায় হায় কি শত্রুতা তোমার সঙ্গে ছিলো, এমন বিয়ে কেন দিয়ে দিলে? পাগলও করবে, বশও কর্‌বে, তোমায় টাকা দিলেই ত সব চুকে গেল গো! যেতে আমার দুঃখিনীর ধনই যাবে! বাবা গো এই জন্যেই কি আমার বিয়ে দিয়েছিলে—

এই বলিয়া জগদ্ধাত্রী অঞ্চলে মুখ ঢাকিলেন এবং স্বামীর পায়ে ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া তিনবার মাথা কুটিলেন। মহেশ্বর মানিলেন, এ ক্ষেত্রে তাঁহার সারথ্য নিষ্ফল হইয়াছে।

সংক্ষেপ শোক এবং অভিমানাধ্যায় সমাপ্ত করিয়া গৃহিণী প্রস্তাব করিলেন, পুরনের কল্যাণার্থ "দৈবজ্ঞি" ডাকান হউক, একটা যাগ করিতে হবে! নায়েব মহাশয় নীরবে "তথাস্তু" করিলেন,—ব্যয়াধিক্যের ওজর করিলে হিতে বিপরীত ঘটিবে জানিয়াই তাহা করিলেন না। তবে আসল কথাটা এই সুযোগে আবার তুলিলেন।—"তা তোমার

যা ভাল বোধ হয় তাই হোক্, কিন্তু আরও একটা উপায় না করলে চল্‌বে না। পুরোকে এখানে রাখা হবে না, আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই—কি বল?"

"আমি কি নিয়ে থাক্‌বো?" বলিয়া গৃহিণী রোদনোন্মুখী হইলেন।

ঘোষ মহাশয় অতি দীনভাবে আর্‌জী পেস্ করিলেন। "তা সত্যি বটে কিন্তু ছেলে বড় হতে চল্‌লো, কায়েতের ছেলে চাকরী বাকরী না করলে কি চল্‌বে? দিন কতক মৌলবীর কাছে ত পড়া চাই, নইলে তালিম হবে কেমন করে?"

গৃ। তা বেশ আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল। মেয়ে শ্বশুর বাড়ী থাক্।

নায়েব মহাশয় নীরবে উঠিলেন। গৃহিণীর প্রস্তাবটা মনের মত হয় নাই—"পথে নারী বিবর্জ্জিতা" তখনকার দিনের বেদবাক্য ছিল।

দুইটি কবিতা।

শকুন্তলা।

কুসুমিত তপোবন সৌরভে আকুল,
ফুটিয়া কানন মাঝে কুসুমের রাণী;
মৃগবধূ সহচরী, হরিণ-নয়ানী,
লতিকার প্রিয়সখী, ফুল্ল বনফুল;
ফুলের সৌরভ অঙ্গে ফুলমধু প্রাণে,
গুঞ্জরি ভ্রমর বুলে বদন কমলে,
বারিলে মৃণাল-করে বারণ না মানে;
লুটায় কুসুমরাশি রাঙ্গা পদতলে।
সরল পীরিতি রীতি, বিরহে উদাস,
বিধাতার বিড়ম্বনে আজন্ম দুঃখিনী;
সভামাঝে ত্যজে পতি, শৈশবে জননী,
রাজরাণী রাজমাতা তপোবনে বাস;
যশের সৌরভ আজি ছায় মহীতলে,
পদ্মমুখী শুদ্ধ সতী, অয়ি শকুন্তলে!

তোমার।

সীমা হতে সীমান্তরে বেড়িয়া বেড়িয়া
জীবন-আবর্ত্ত চক্র আসিতেছে ফিরে
শুধু সে তোমার মুখ ঘিরে ঘিরে ঘিরে,
তোমার চরণ-সীমা ধুইয়া ধুইয়া;
তরল জীবন স্রোত পুলকে বহিয়া
মিশিবারে চায় তব প্রেমসিন্দুনীরে,
কলকলে তব নাম বিলায়ে সমীরে,
তীরে তীরে শত প্রতিধ্বনি জাগাইয়া;
অনন্ত বাহিনী নদী অনন্তের আশে
অনন্ত কালের তরে কেন শুধু ধায়,
কেন এ জীবন জলে হেসে হেসে ভাসে
ওরূপ মাধুরী ছায়া কৌমুদীর প্রায়!
সুধাময়ী চন্দ্রাননে দাঁড়াও আকাশে,
উছলিবে উর্ম্মিরাশি নেহারি তোমায়!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বঙ্গ সাহিত্য।

রামপ্রসাদের গান।

পুণ্যভূমি বঙ্গের স্নেহে প্রতিপালিত হইয়া কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের প্রেম-রাগিণী শুনে নাই সংসারে এরূপ লোক বিরল। রামপ্রসাদ সেন গানের দ্বারাই বিখ্যাত। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আর কোনও কবি বোধ করি সঙ্গীতে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা তানলয়ে গাহিবার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা, তাহার সুর আছে, তাল আছে, বৈষ্ণবেরা আজও সে গান কতক কতক গাহিয়া থাকে, কিন্তু তথাপি আজকালের অনেক লোক তাহাদিগকে সঙ্গীত-রচয়িতা বলিয়া জানেন কিনা সন্দেহ, বাঙ্গালা সাহিত্যে কবির স্থান লাভ করিয়াই তাঁহারা বাঁচিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ সেন কি তবে কবি নহেন? সে কথা পরে বিবেচ্য। কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি তাহার সুরে অনেকটা বাঁচিয়া গিয়াছেন, কবি বলিয়া লোকে তাঁহাকে যত না জানে, সাধক-ভক্তি সঙ্গীত রচয়িতা ভক্ত বলিয়া অধিক জানে। রাম-প্রসাদী সুর তাঁহার এক প্রধান কীর্ত্তি। বাস্তবিক, তাঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের নাম কয়জন শুনিয়াছে। অথচ এই বিদ্যাসুন্দরই রামপ্রসাদের কবিরঞ্জন উপাধির মূল কারণ।

কিন্তু বিদ্যাসুন্দর তাঁহার উপাধির কারণ হইলেও সঙ্গীতেই তিনি বাঁচিবার যোগ্য। নবাবী বিলাসপ্লাবিত সে সময়ের বঙ্গদেশে প্রেমের সুরে গান গাহিবার লোকের বিশেষ অভাব হইয়াছিল, রামপ্রসাদ সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমের সুরও কিছু নূতন ধরণের। আর তাঁহার ভাষারও এমন কিছু নাই যে, ব্যাখ্যাকারের কুহে-লিকাচ্ছন্ন টীকা টিপ্পনীর অন্ধকারের মধ্য হইতে অন্ধ হইয়া অতিপ্রচ্ছন্ন সুগভীর জটিল আধ্যাত্মিক রহস্য সমূহ বাহির করিতে হয়। সরল ভাবে সোজা কথায়, হৃদয়ের সুরে তিনি মাকে আপনার সুখ দুঃখ জানাইয়াছেন—মায়ের উপর কখনও অভিমান করিয়া-ছেন, কখনও তাঁহার চিরপ্রসারিত বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াছেন, মাতৃস্নেহে পূর্ণ-হৃদয় হইয়া মরণের বিভীষিকাকে অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছেন। সেই জগতজননী চির-স্নেহময়ীর চরণেই রামপ্রসাদের সকল আশা ভরসা। এ বিপুল সংসারে করুণাময়ীর অপার করুণা ব্যতীত মানবের আর আছে কি? ধনমান যশ সকলই ত মায়ার খেলা—কিছুতেই শান্তি নাই, সোয়াস্তি নাই, লালসা তিলে তিলে বর্দ্ধিত হইয়া মানবসন্তানকে গ্রাস করে।

রামপ্রসাদ গান রচনা করিতেন মায়ের পূজার জন্য। ফুল চন্দন নৈবেদ্যের মত সঙ্গীতই তাঁহার পূজার প্রধান উপকরণ ছিল। যশোলিপ্সা তাঁহার সঙ্গীত রচনার

মূল কারণ হইলে প্রসাদের অনেকগুলি সঙ্গীত লোপ পাইত না। ভাবাবেশে তিনি মায়ের চরণে বসিয়া গাহিতেন। সকল গান লিখিয়া রাখিবার তাঁহার অবসর হয় নাই; বস্তুতঃ তিনি সে চেষ্টাও করেন নাই। প্রভুর হিসাবের খাতার পার্শ্বে, ভক্তি রস পিপাসু ব্যক্তি বিশেষের ভক্তি সংগীত সংগ্রহে এখানে সেখানে, তাঁহার দুই দশটা গান কোনও প্রকারে ছটকাইয়া পড়িয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। রামপ্রসাদ সেন কি তবে গান লিখিতেন না? না লিখিলে তাঁহার এত গান আমরা পাইলাম কিরূপে? তবে অলেখা গানও তাঁহার যথেষ্ট ছিল শুনা যায়। সে সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার সুবিধা নাই। লেখা গানই সকল পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। সেকালে ত আর এ অধমতারণ মুদ্রাযন্ত্র ছিল না।

অনেকে বলেন রামপ্রসাদের প্রথম গান,

"আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী॥" ইত্যাদি।

ইহা তাঁহার প্রথম রচনা কিনা নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্তু এই রচনাই রামপ্রসাদকে প্রকাশ করিয়া দেয়। রামপ্রসাদ একজন ধনীর গৃহে কর্ম্ম করিতেন। হিসাবের খাতার ধারে ধারে কালীনাম ও গান লেখা তাঁহার অভ্যাস ছিল। ঘটনা ক্রমে তাঁহার প্রভু একদিন খাতা দেখিতে চাহিলেন। দেখিলেন, হিসাবের শেষে "আমায় দেও মা তবিলদারী গান লেখা রহিয়াছে। রামপ্রসাদের কপাল ফিরিল—প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া গীত-রচয়িতাকে মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিলেন।

রামপ্রসাদ সেনের প্রধান গুণ এই যে, তাঁহার রচনায় কাপট্য নাই। ভাব বন্ধক দিয়া, হৃদয় বিক্রয় করিয়া সঙ্গীতের মধ্যে আভিধানিক জ্ঞান এবং দুরূহগুণ-খ্যাত তালাভিজ্ঞতা প্রকাশ করিবার চেষ্টা রামপ্রসাদে দেখা যায় না। ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পায় তাঁহার কিছু যায় আসে না—ভাব তাঁহার সুর গড়িয়া লয়। পাঠকেরা আমাদিগকে ধ্রুপদ খেয়ালের বিরোধী ঠাহরাইবেন না। ধ্রুপদের গাম্ভীর্য্য, খেয়ালের মাধুর্য্য পাষাণকেও মুগ্ধ করে; কিন্তু মূলে ভাব চাহি। রাগ রাগিণী আলাপ যন্ত্রে হইতে পারে—সেখানে কেবল সুরের ভাবের প্রতি লক্ষ্য। কিন্তু কথা যেখানে স্থান পাইয়াছে, সেখানে কথানুযায়ী সুরের ভাব হওয়া আবশ্যক। বিজ্ঞ ওস্তাদির দন্তে চাপিয়া ভাবকে হত্যা করা হৃদয়হীনতার পরিচয় বৈ আর কি? রামপ্রসাদ এ দোষে লিপ্ত নহেন। নিজের প্রাণের গানগুলিকে তিনি প্রাণের সুরে বসাইয়াছেন। ভাবের মত সুরও তাঁহার হৃদয় হইতে স্বতঃ উৎসারিত।

রামপ্রসাদী সুর যে টিঁকিয়া গিয়াছে সে কেবলই তাহা হৃদয়োত্থিত বলিয়া। বড় বড় বিখ্যাত ওস্তাদি সুরের পার্শ্বে সে অবশ্য দাঁড়াইতে পারে না, কিন্তু ভাব বিশেষের গানের সহিত সে চমৎকার বসিয়া যায়। অনেক হিন্দী গানের যেমন কথার বিশেষ

মূল্য নাই, কতকগুলা বিবর্ণ স্বর ব্যঞ্জনের উপর দিয়া একটা সুর বহিয়া গিয়াছে, সেই সুরেই সকল মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত, রামপ্রসাদের সুর সেরূপ নহে। তাঁহার সুর গাহিতে গেলেই সেই সঙ্গে এক বিশেষ ধরণের ভাবসংযুক্ত কথা আসিয়া হাজির হয়। আমাদের হৃদয়ে রামপ্রসাদের একটা অস্পষ্ট ক্ষীণ ছায়া পড়ে—মায়ের চরণে বসিয়া ভক্তি বিগলিত হৃদয়ে প্রেম পুলকিতান্তঃকরণে তিনি যেমন গান গাহিতেন, যেরূপ ভাবে কাঁদিতেন, হাসিতেন, অজ্ঞাতসারে অতি ধীরে ধীরে দূর বিস্মৃত অতীতের আকুলি ব্যাকুলির মত সেই ভাবগুলি ঈষৎ যেন জাগিয়া উঠে। সুরের সহিত, গানের সহিত রামপ্রসাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

নিজের গানগুলি রামপ্রসাদ খুব ভাবের সহিত গাহিতেনও। শুনা যায়, রামপ্রসাদের কণ্ঠস্বর বিশেষ সুমিষ্ট ছিল না, কিন্তু তাঁহার ভাবে লোকে মুগ্ধ হইত। এমন কি, নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাকে নাকি তিনি স্বরচিত সঙ্গীতে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সিরাজ-উদ্দৌলা একদিন নৌকাবিহারে বাহির হইয়াছেন, রামপ্রসাদ সেন তখন হৃদয় খুলিয়া ভাগীরথীবক্ষে কালীকীর্ত্তন করিতেছেন। কালীকীর্ত্তন শুনিয়া সিরাজের মনে কি ভাবের উদয় হইল কে জানে—তিনি প্রসাদকে আপনার নৌকায় আনাইয়া গাহিতে বলিলেন। রামপ্রসাদ গাহিলেন ধ্রুপদ; সিরাজের তৃপ্তি হইল না। রামপ্রসাদ গাহিলেন খেয়াল গজল; নবাবের ভাল লাগিল না। তখন নবাব তাঁহাকে সেই কালীর গান গাহিতে আদেশ করিলেন। রামপ্রসাদ প্রাণের ভিতর হইতে গাহিলেন। মুসলমান নবাবের পাষাণ হৃদয় গলিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

রামপ্রসাদের গানের আর একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়, তাহার ছন্দ। তাঁহার ছন্দ অবশ্য একেবারে নূতন ধরণের নহে, নূতনত্ব তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু তথাপি বঙ্গীয় পাঠক-সাধারণের নিকট তাহাকে একবার হাজির করা আবশ্যক বিবেচনা করি। বাঙ্গলা ভাষায় অক্ষরগণনার উপর যাঁহারা একান্ত নির্ভর করেন, রামপ্রসাদী গানের ছন্দ আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, স্বরান্ত এবং হসন্ত উচ্চারণের উপর ছন্দ অনেক সময় যথেষ্ট নির্ভর করে। রামপ্রসাদের বড়ই জোর কপাল যে, বড় বড় অমরকোষবিদ্ ব্যাকরণগ্রস্ত সশস্ত্র সংশোধক পণ্ডিতবর্গ তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবার অবসর পান নাই। ক্ষীণজীবি রামপ্রসাদ সেন তাহা হইলে কি আর দুই দণ্ড কাল শান্তিতে থাকিতে পারিতেন? পণ্ডিতবর্গের কৃপায় তাঁহার গানগুলি শিখাশোভিত মুণ্ডিত মস্তক হইয়া মুখস্থদক্ষ অনুর্বর হৃদয়ের আনন্দ বিধান করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু গুরুতর সংশোধনভারাচ্ছন্ন হইয়া রামপ্রসাদের মস্তক উত্তোলন করিবার সামর্থ্য থাকিত না।

ভাব ভাষা ছন্দ ছাড়িয়া এইবারে আমরা ক্রমে ক্রমে রামপ্রসাদের মতামতের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবার চেষ্টা দেখি। ভাব বর্জ্জন করা অবশ্য চলে না—বরঞ্চ সম্যক্

রূপে আলোচনা করিতে হইবে। রামপ্রসাদকে কেহ কেহ বাহ্য অনুষ্ঠানপ্রিয় বলিয়া থাকেন। এ কথা সত্য কি না দেবতা জানেন, কিন্তু গান দেখিয়া আমাদের ত তাহা মনে হয় না। রামপ্রসাদ বেশ বুঝিতেন, লোলরসনা নরমুণ্ডমালা শোভিতা জড় পাষাণ প্রতিমার সম্মুখে সহস্র নিরীহ মহিষ এবং ছাগশিশু বলি দিয়া মায়ের পূজা হয় না। তিনি জানিতেন, এই স্নেহময়ী বিশ্বজননী শোণিতপাতে পরিতৃপ্ত হয়েন না, স্তূপাকার ফুল চন্দন নৈবেদ্যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, যিনি বাক্যের অতীত, মনের অতীত, তিনি ফুল, চন্দন, নৈবেদ্য, নর-মহিষ-ছাগ বলিরও অতীত। রামপ্রসাদ মন্দির বিশেষ-বদ্ধা প্রতিমাকে কালী বলিতেন না। গানের মধ্যেই তিনি বলিয়াছেন, "ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তাই জান না।" শুধু ইহা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই। নৈবেদ্য এবং বলির উপরেও তাঁহার মন্তব্য আছে। যথা,

"জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে, কোন্ লাজে খাওয়াইতে চাস্ তাঁয় আলোচাল আর বুট ভিজানা।
জগৎকে পালিছেন যে মা সাদরে তাই কি জান না।
ওরে, কেমনে দিতে চাস্ বলি তাঁয় মেষ মহিষ আর ছাগলছানা।"

রামপ্রসাদ কালীর উপাসক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কালী-উপাসক বলিলে বঙ্গদেশে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় তাহা তিনি ছিলেন না। তাঁহার কালীও স্বতন্ত্র, পূজা-পদ্ধতিও বিভিন্ন। তাঁহার পূজায় লালে লাল ব্যাপার নাই।

চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে এইখানে রামপ্রসাদের সাকারবাদ নিরাকারবাদ লইয়া কথা উঠিতে পারে। রামপ্রসাদ সাকার-উপাসক ছিলেন কি নিরাকার উপাসক ছিলেন বলা বড় কঠিন। গান দেখিয়া মনে হয়, তিনি প্রথমে যাহাই থাকুন ইদানীং নিরাকার-উপাসক হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না—তাঁহার হৃদয়ে প্রেম ছিল, ভক্তি ছিল, প্রাণহীন কথা সমষ্টির মধ্যে তিনি নিমগ্ন ছিলেন না। আমরা রামপ্রসাদের নিকট হইতে এই প্রেম ভক্তি শিক্ষা করিতে পারি। রামপ্রসাদ সাকারবাদীই হৌন্ বা নিরাকারবাদীই হৌন্ ফাজিল ছিলেন না, ইহাই তাঁহার এক প্রধান গুণ। পরবর্ত্তী নকল-নবিশেরা অনেকে বিনা ভাবে গলা জাহির করিতে চেষ্টা করিয়া বরঞ্চ ফাজিলামি দোষে দোষী হইয়াছেন। ব্যাখ্যার জোরে সটীক সমালোচকবর্গ রামপ্রসাদকে নানারূপে প্রতিপন্ন করিতে পারেন, কিন্তু রামপ্রসাদ যে অকপট সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রেমময়ীর চরণে তাঁহার অটল নির্ভর ছিল, এই জন্যই কেবল সাহস করিয়া তিনি অনেক কথা বলিতে পারিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার অহঙ্কার প্রকাশ পায় না—প্রাণের টান প্রমাণ হয় মাত্র।

নির্ব্বাণ সম্বন্ধে রামপ্রসাদের মত বর্ত্তমানকালের অনেকে একেশ্বরবাদীদিগের সহিত মিলে। আত্মার নির্ব্বাণ অথবা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি তিনি বিশ্বাস করিতে নারাজ—

মায়ের পদপ্রান্তে বসিয়া চিরদিন সেই বিমল প্রেমানন্দ উপভোগ করিতে পারিলেই রামপ্রসাদ পরিতৃপ্ত। তাঁহার গানেই আছে,

"নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভাল বাসি।"

উপহাস রসিক প্রচ্ছন্নার্থাবিষ্কার দক্ষ অতি দার্শনিক পণ্ডিতেরা ইহার কিরূপ ব্যাখ্যা করেন জানি না, কিন্তু সাধারণের সহজ বুদ্ধিতে বোধ করি ইহার অন্য বিশেষ নিগূঢ় অর্থ বাহির হইবে না। নিতান্তই যদি বাহির হয়, নাচার।

রামপ্রসাদের মতামত সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলা শোভা পায় না। সম্ভবতঃ এ বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে লেখনী যুদ্ধে অনেক কথা ব্যক্ত হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমানে আমরা তাঁহার দু'একটী গানের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াই, পাঠকেরা স্ব স্ব যুক্তি অনুসারে বিচার করিয়া লইবেন।

"আর কাজ কি আমার কাশী।
ওরে, কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।
ওরে, হৃদ্‌কমলে ধ্যানকালে আনন্দসাগরে ভাসি।
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই মাথা ব্যথা,
অনলে দহন যথা করে তুলা রাশি।
গয়ায় করে পিণ্ডদান, পিতৃঋণে পায় ত্রাণ,
যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাঁসি।
কাশীতে মলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।"

আর একটা গানের অংশ,

"কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে ব'সে মায়ের নাম গাহিব।
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব।"

রামপ্রসাদের তীর্থাদি দর্শন সম্বন্ধে মতামত পাঠকেরা ইহাতে যথেষ্ট বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু তথাপি আমরা দু'এক কথা বলিলে বোধ করি নিতান্ত অন্যায় হইবে না। সাধারণ লোকের ন্যায় তীর্থ বিশেষে মরিলে মুক্তি, তীর্থ দর্শন করিলে সর্ব্বপাপক্ষয়, এসকল রামপ্রসাদ বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু তীর্থাদি দর্শনের উপকারিতা বা অপকারিতা সম্বন্ধে তিনি কোনও মত ব্যক্ত করেন নাই। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার অপূর্ব্ব রচনা কৌশল দেখিলে হৃদয় প্রসারিত হয়। ইহাতে শরীর মনের বিশেষ স্বাস্থ্য সম্পাদন করে। এই জন্যই বোধ করি, প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা তীর্থাদি প্রতিষ্ঠার বিশেষ পক্ষপাতী। রামপ্রসাদ এ বিষয়ে কিছুই বলেন নাই—কেবল দেশের

কুসংস্কারের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই উপরি উদ্ধৃত গান গাহিয়াছেন। এত করিয়া এ কথা আমাদিগের বুঝাইবার আবশ্যক ছিল না, কিন্তু রামপ্রসাদের গানের সহিত দলে দলে অন্ধ গোঁড়ামির আবির্ভাব হয়, সেই ভয়ে অনাবশ্যক হইলেও অনেক কথা বকিতে হইল। ভরসা করি, অধীর পাঠকেরা অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

সঙ্গীত রচনার জন্য কেহ কেহ রামপ্রসাদকে সুবিধামত রামমোহন রায়ের পার্শ্বে আনিয়া খাড়া করিয়া থাকেন। রামপ্রসাদের ইহাতে বিশেষ সুবিধা হয় কিনা জানি না, কিন্তু পাঠক সাধারণের তাহাতে বিশেষ জ্ঞান বৃদ্ধি হয় বলিয়া ত মনে হয় না। শিক্ষা, দীক্ষা, সমাজ, অবস্থা, বিদ্যা, বুদ্ধি, কোনও বিষয়েই ত উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায় না। কেবল এক মাত্র ঐক্য—উভয়েই ধর্ম্মসঙ্গীত রচয়িতা। কিন্তু উভয়ের সঙ্গীতও সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। রামমোহন রায়ের স্বর বরাবরই গম্ভীর। তিনি একভাবে লিখিয়াছেন, রামপ্রসাদের সে ভাব নহে। রামমোহন রায়ের উপরে এই বিচিত্র বিশাল সৃষ্টির এমন একটী গম্ভীর প্রভাব পড়িয়াছে, যে, তিনি তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন; সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া মানবকে সেই পরমপদে মনোনিবেশ করিতে বলিয়াছেন, আর এই অচিন্ত্য বিশ্বরচয়িতার মহিমা দর্শনে আকুল হৃদয়ে গাহিয়া উঠিয়াছেন। রামপ্রসাদের মত তাঁহার সঙ্গীতে গয়া কাশী প্রভৃতির উল্লেখ নাই, তাহা বিশেষরূপে সাধারণভাবে সর্ব্বদেশের উপযোগী হইবার মত রচিত। রামপ্রসাদ মায়ের কাছে অনেক আব্দার করিয়াছেন, মায়ের উপর অভিমান করিয়াছেন, কত কি বলিয়াছেন কহিয়াছেন; রামমোহন রায় তাহা করেন নাই, জননীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি নীরব। আমরা কাহাকেও কমাইতে বাড়াইতে পারি না—কেবল বলিতে পারি, উভয় বিভিন্ন প্রকৃতির লোক। ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি সমালোচনার এ স্থান নহে, সুতরাং তাহা হইতে আমরা বিরত থাকি। বিশেষ কারণবশতঃ এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে, গান দেখিয়া পাঠকেরা ঈশ্বর প্রেম সম্বন্ধে কাহাকেও হীন ঠাহরাইবেন না।

রামপ্রসাদের গান সম্বন্ধে আর একটী পুরাতন কথার পুনরুল্লেখ করিতে হইবে। রামপ্রসাদের গান বৈঠকে গাহিবার মত নহে—দশ বিশ জনে মিলিয়া গাহিবার গানও নহে। তাহাতে সে গানের প্রভাব অনুভব করা যায় না। বিজন নদীতীরে, প্রান্তরে, পথে একাকী পথিক যখন আপন মনে গাহিয়া চলে, তখনই রামপ্রসাদকে বুঝা যায়। বলিতে কি, নগরে ভিক্ষুকদিগের মুখে সে গানের যে মিষ্টতা থাকে, গলদঘর্ম্ম বিপুলস্ফীতি ওস্তাদি কণ্ঠে অনেক সময় তাহা নষ্ট হইয়া যায়। প্রাণে না অনুভব করিয়া কেবল মাত্র সা রে গা মার ব্যায়াম করিলে রামপ্রসাদী গান মাটী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কথা ছাঁটিয়া ফেলিয়া কেবল সুরের জমাট্ করিতে হইলে রামপ্রসাদ পরিত্যজ্য।

শেষ কথা, রামপ্রসাদের গান যথার্থ নিঃস্বার্থ ভক্তির পরিচয়। রামপ্রসাদের ভক্তি

সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে যাওয়া বাহুল্যমাত্র। বাঙ্গালার কীট পতঙ্গ অবধি তাহা জানে। রামপ্রসাদের কথা হইতে তাঁহার ভক্তির গাঢ়তা দেখাইয়াই আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করি।

"মায়ের নাম লইতে অলস হইও না রসনা, যা হবার তাই হবে।
দুঃখ পেয়েছ (আমার মনরে), না হয় আরো পাবে।
ঐহিকের সুখ হলো না ব'লে কি ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে।
রেখো রেখো সে নাম সদা সযতনে,
নিওরে নিওরে নাম শয়নে স্বপনে।
সচেতনে থেক (মনরে আমার), কালী ব'লে ডেক এ দেহ ত্যজিবে যবে।"

শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ পরমহংস দেবের জীবন চরিত্র।

মাতা পিতা বলিলেন যে, হে পুত্র, তুমি আমাদের মারিয়া ফেলিয়া যাইতে পার; তুমি এখন ক্ষুদ্র একটা বালক, তোমা হইতে কি প্রকারে এই সৃষ্টির ভার উদ্ধার হইবে? তখন শিবনায়ণ মাতা পিতাকে বলিলেন যে, "আপনারা যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য বটে। আমার কি ক্ষমতা যে আমি পৃথিবীর ভার উদ্ধার করিতে পারি। আমি কেবল নিমিত্ত মাত্র। প্রমাণ; ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে যে ব্যক্তির চক্ষু আছে সেও দেখিতে পায় না, এবং অন্ধ ব্যক্তিকে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিও পথ দেখাইতে সমর্থ নহে। যখন সূর্য্যদেব প্রকাশ হন তখন নেত্রবান্ ব্যক্তির দৃষ্টি খোলে এবং তখন তাহার ক্ষমতা জন্মে ও তিনি অন্ধ ব্যক্তিকে হাত ধরিয়া ভাল পথে লইয়া যান কিম্বা কোন উত্তম স্থানে বসাইয়া দেন। অন্ধ ব্যক্তি শব্দে অজ্ঞান এবং চক্ষুষ্মান ব্যক্তি শব্দে জ্ঞান এবং সূর্য্যদেবের প্রকাশ শব্দে আত্মবোধ। অর্থাৎ স্বরূপ-নিষ্ঠা আমাকে নিমিত্ত মাত্র দাঁড় করাইয়া তিনি অন্তর হইতে প্রেরণা করিয়া সকল সৃষ্টির ভার উদ্ধার করিয়া দিবেন। হে মাতা পিতা আমার প্রতি আপনারা আর স্নেহ করিবেন না। আমাকে পরিত্যাগ করুন। তাহাতে মাতা পিতা স্নেহ প্রযুক্ত বলিতে লাগিলেন যে, "হে পুত্র। মাতা পিতা কত কষ্টে কত যত্নে পুত্রকে লালন পালন করিয়াছে—সে পুত্রকে তাহারা কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিবে? আরো বলিলেন যে, তুমি তো ভাল করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিলে না—তুমি মূর্খ রহিলে তবে কি প্রকারে তোমার কার্য্য-নির্ব্বাহ হইবে।" তাহাতে শিবনারায়ণ বলিলেন যে, অন্তর্যামীরূপ বিদ্যা আমার অন্তরে বাস করিতেছেন—সেই বিদ্যাতেই আমার প্রয়োজন, আমার বাহিরের বিদ্যার প্রয়োজন নাই।" শিব-

নারায়ণ মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, "এ মাতাপিতা ত আমাকে বনে যাইতে আজ্ঞা দিবেন না কিন্তু ইহাতে অন্তর্যামী মাতাপিতা পূর্ণ পরব্রহ্মের আজ্ঞা আছে, তাঁহার আজ্ঞায় বাহির হইয়া যাইব তাহা হইলে উভয়েরই আজ্ঞা পালন হইবে।" তখন মাতা পিতাকে নমস্কার করিয়া শিবনারায়ণ নিজের অভিপ্রায় মনে মনে রাখিলেন এবং দুই চারি দিবস পরে গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিলেন। তখন ইহাঁর বয়স দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বৎসর হইবে।

দ্বাদশ বৎসরের বালক গৃহত্যাগ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, প্রথমে কোন্ দিকে যাইব। কোন্ কোন্ দেশে কোন্ দ্বীপ, কাহার রাজ্যে কোন্ অভাবে প্রজা কষ্ট পাইতেছে এবং কি করিলে তাহার অভাব নিবারণ হইবে ও কষ্ট যাইবে। কি করিলে দেশের রাজা পণ্ডিত জ্ঞানী সমদৃষ্টিতে সকলের উপর দয়া করেন এবং কোন্ দেশের পণ্ডিত ও রাজা এরূপ মূর্খ যে আপনার কষ্ট বুঝেন—অপরের কষ্ট বুঝেন না। কি করিলে পণ্ডিত রাজা প্রজা সকলে ব্যবহার কার্য্য এবং পরমার্থ বিষয় বুঝিয়া আনন্দে থাকিতে পারেন। যাহা করিলে এই সকল বিষয় সম্পন্ন হয় তাহাই আমার করা কর্ত্তব্য। যাহাতে সকলের উপকার হয় তাহাই জ্ঞানবান পুরুষের কর্ত্তব্য। শিবনারায়ণ এই ভাবিতে ভাবিতে দেশে দেশে দ্বীপে দ্বীপে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতার কাছে সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, হে অন্তর্যামি গুরু! এই মূর্খ অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের অজ্ঞানতা লয় করিয়া ইহাদিগকে জ্ঞান প্রদান করুন যাহাতে ইহারা বুঝিয়া সকল বিষয়ে সর্ব্বদা আনন্দরূপ থাকিতে পারে, যাহাতে কাহারও সহিত ইহাদের দ্বেষ এবং বৈরভাব না থাকে।

শিবনারায়ণের সহিত কাহারো দেখা-সাক্ষাৎ হইলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিত যে, "তুমি গৃহস্থ না সাধু, তুমি কি জাতি, তুমি কিছু লেখা পড়া জান, তুমি বেদ পড়িয়াছ?" শিবনারায়ণ বলিতেন লেখা পড়া জানি না, বেদও পড়ি নাই; আমি গৃহস্থ এবং সাধু কাহাকে বলে তাহাও আমি জানি না; এই মাত্র জানি যে তোমরাও মনুষ্য; আমিও মনুষ্য, তোমাদেরও হাত পা আছে আমারও হাত পা আছে। আমি যে কি জাতি তাহা জানি না; আমি শরীরের মধ্যে অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু হাড় চামড়ার মধ্যে তো কোন জাতির ঠিকানা পাইতেছি না; আমি অন্বেষণ করিতেছি—যদি হাড় চামড়া মাসের মধ্যে জাতি পাই তাহা হইলে বলিব।" একজন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি বলিল, "তোমার গলায় তো যজ্ঞোপবীত আছে তবে যে তুমি জাতি বলিতেছ না?" তাহা শুনিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, বটে ভাই তুমিও ত স্থতার কাপড় পরিয়া আছ, আমি না হয় একটা সূতা গলায় দিয়াছি, তাহাতে কি হইল? সূতাই কি জাতি?" পরে শিবনারায়ণ যখন আপনার অন্তরে

স্নেহলতা।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কিশোরী বিকালে বেড়াইতে গিয়াছিল, সন্ধ্যা না হইতে হইতে বাড়ী ফিরিয়া তাহার পাঠ গৃহের কৌচের উপর ভুম করিয়া শুইয়া পড়িয়া ডাকিল "হ'রে।" কিন্তু কলিযুগ কিছু উলটায় নাই যে, বাঙ্গালীঘরের চাকর একডাকে উত্তর দিবে, যতক্ষণ ডাকের উপর ডাক না পড়িল হাঁকের উপর হাঁক না চড়িল ততক্ষণ ভৃত্য বাবু উত্তর দেওয়াটা আবশ্যকই বিবেচনা করিলেন না, অবশেষে নিতান্তই বাড়াবাড়ি দেখিয়া মোটা গলায় পূর্ব্ব বাঙ্গলা সুরে গলা হাঁকিলেন, "এজ্ঞে"—এবং সঙ্গে সঙ্গে নারিকেল তেলের এক সেজ বাতি হস্তে স্বয়ং গৃহে প্রবেশ করিয়া আর একবার বলিলেন "এজ্ঞে ডাহিলেন?"

কিশোরীর মেজাজ তখন অত্যন্ত চড়িয়া উঠিয়াছে, মুখ ভঙ্গি করিয়া সে ভৃত্যের অনুকরণে ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—"এজ্ঞে ডাহিলেন? এতক্ষণ কোথায় ছিলি? বাবুর সাড়াই নেই!"

ভৃত্য নিষ্পরোয়া ভাবে সেজটা টেবিলে রাখিয়া বলিল "এই বাতিটা আনতেছিলাম।"

কিশোরী। যা বাড়ীভিতর থেকে আমার খাবার আন। আজ আর সেখানে খেতে যাব না।"

"এজ্ঞে তা আনছি" বলিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল, কিশোরী ডেস্ক খুলিল, যাহা খুঁজিতেছিল না পাইয়া ডেস্কের ডালাটা ভুম করিয়া ফেলিয়া বিরক্ত হইয়া চৌকিতে বসিয়া পড়িল। ভৃত্য লুচির থালা ও জলের গেলাস লইয়া ঘরে ঢুকিতেই উচ্চস্বরে বলিল—"কই আমার সেণ্টটা কোথা?"

ভৃত্য হাতের জিনিস টেবিলে রাখিয়া প্রশান্তভাবে বলিল—"দোকানদার আর 'দারে' দিল না—বল্লে ৬৫ টাকা।/ আনা পাঁচ পয়সা দেনা হয়েচে—আর সে দার দিচ্ছে না—আর এ টাকা দু একদিনের মধ্যে না পালেই বাবুকে জানাবে।"

কিশোরী। ৬৫ টাকা ধার! কিসে?

ভৃত্য। রেসমের রুমলই কত আনেছি—হরেক রকম শিশিই বা কত আনেছি—অডিকলমের ত নিকাশ নাই—হিসাবটা দেখুন না বাবু"

ভৃত্য ট্যাঁক হইতে একখানা কাগজ খুলিয়া কিশোরীর হাতে দিতে গেল, কিশোরী বলিল "ও থাক পরে দেখব—৬৫ টাকা! আচ্ছা দু তিন মাসের মধ্যে আমি দিয়ে ফেলব, দোকানদারকে একটু বুঝিয়ে বলিস বুঝলি?

ভৃত্য। "তা বলব, কিন্তু আপনকার দু মাসের ত আবার খরচ চলা চাই—"

কিশোরী। সে "তোর ভাবতে হবে না, আপাততঃ এই ছয় আনা নিয়ে একটা সেণ্ট কিনে আন, বুঝলি; আমার বাইরে যেতে হবে।"

ভৃত্য পয়সা লইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু অল্পদূর গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"দাদাবাবু, জীবনবাবু আসছেন!"

কিশোরী। জীবন দা! তা তুই অডিকলমটা এনে আস্তে আস্তে ডেস্কের মধ্যে রাখিস—বুঝলি?

কিশোরী গৃহের বাহিরের বারান্দায় আসিতেই জীবনকে দেখিতে পাইল, তাহাকে আসিতে দেখিয়া সে সত্যই বড় আশ্চর্য্য হইল, তাহার পিতা তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত জীবন আর কখনো এবাড়ীতে আসে নাই।

কিশোরী বলিল—"এস জাবনদা ঘরে এস, সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ যে?"

জীবন বলিল—"একটা কাজের কথা আছে।"

কিশোরী আরো আশ্চর্য্য হইল। দুজনে গৃহে প্রবেশ করিলে—জীবন বলিল—"আমার আজই নয়টার ট্রেনে পশ্চিম যাইতে হইবে, যে ১০০ টাকা এই রবিবারে সভায় দিবার কথা আছে তোমাকে দিয়া যাইতেছি তুমি দিও, ইহার জন্যই আমার আসা।"

কিশোরী বলিল—'হঠাৎ পশ্চিম যাইতেছ যে?'

জীবন বলিল—'বেশী কথার সময় নাই, আমার এখনি যাইতে হইতেছে, আসিয়া সে সব বলিব'।

বলিয়া জীবন ১০০ টাকার নোট কিশোরীকে দিয়া চটপট চলিয়া গেল।

আসল কথা মোহন রুড়কিতে পীড়িত তাই জীবন সেখানে যাইতেছে। জগৎ বাবুর নিকটই টেলিগ্রাফে এ খবর আসে। কিন্তু কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া তাঁহার সেখানে যাইবার সুবিধা না হওয়ায় জীবনের নিকট তাঁহার এ কথা প্রকাশ করিতে হইয়াছে। এবার প্রথম আশ্বিনেই পূজা গিয়াছে, সুতরাং এখনো স্কুল কলেজ বন্ধ, এ সময় পশ্চিম যাইতে জীবনের কিছু মাত্র অসুবিধা নাই। জীবনকে ব্যতীত আর একজনকে মাত্র জগৎ বাবু এ কথা বলিয়াছেন। কুঞ্জবাবু মোহনের পীড়ার কথা শুনিয়া প্রথমটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন—তাহার পর বেহাইকে বলিলেন—"তোমরা তার আপনার লোক, তোমাদের কাছে খবর এসেছে—তোমরা তদ্বির কর, আমি আর কি করব।" কিন্তু জগৎ বাবু চলিয়া গেলে কুঞ্জ বাবু বুড় সরকারকে ডাকিয়া সেই দিনই তাহাকে পশ্চিমে পাঠাইবার বন্দবস্ত করিলেন, এবং যে কয়দিন পর্য্যন্ত তাঁহার আরোগ্য সংবাদ না পাইলেন সে কয়দিন ঘর হইতে বাহির হইলেন না। কিন্তু এখবর কিছু আর জীবন জানিত না—তিনি যে জগৎ বাবুকে কড়া কথা বলিয়া বিদায় করিয়াছেন তাহাই

সূক্ষ্ম শরীরে ত্রিগুণময়ী আত্মা বিষ্ণু মহেশ ব্রহ্মা জ্যোতিঃস্বরূপ যজ্ঞোপবীত পাইলেন; নাসিকা দ্বারে প্রাণ স্বরূপ, নেত্রদ্বারে তেজঃস্বরূপ, কর্ণদ্বারে আকাশ স্বরূপ, এবং পঞ্চতন্ত্ররূপী পঞ্চগ্রন্থি শরীরের মধ্যে পাইলেন, তখন সূতার যজ্ঞোপবীতকে গলা হইতে খুলিয়া গাছে টাঙ্গাইয়া দিলেন। শিবনারায়ণ গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া দেশের অবস্থা সকল দেখিতে লাগিলেন। এইরূপ ভ্রমণক্রমে শিবনারায়ণ একদিন বঙ্গদেশে আসিয়া কোন ভদ্র বঙ্গ বাবুর নিকট প্রাণ ধারণার্থ কিঞ্চিৎ আহার যাচ্ঞা করায় বাবু বলিলেন, "তোমার শরীর ত হৃষ্ট পুষ্ট দেখিতেছি, চাকুরি করিয়া খাইতে পার না; যাচ্ঞা করিয়া বেড়াও—তোমার লজ্জা হয় না?" তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক বটে—শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া খাওয়া জ্ঞানবান লোকের কাজ কিন্তু আমি এক জনের চাকরী করিতেছি—যাঁহার এই জগৎ। তবুও যদি আপনি চাকরী দেন তাহা আমি করিতে স্বীকার আছি, কিছু দিন আপনাদেরও চাকুরি করিয়া লই।

তাহাতে বাবু বলিলেন, "যদি তুই ঈশ্বরের চাকরী করিতেছিস্ তবে বাটী বাটী ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিস্ কেন? তিনি কি আহার দিতে পারেন না"?

শিবনারায়ণ উত্তর করিলেন—আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক বটে, তাঁহার উপর নিষ্ঠা হইলে অপরের নিকট যাইবার আর প্রয়োজন কি?

তখন বাবু বলিলেন, "তুই খোরাক পোসাক পাইবি আর মাসে দুই টাকা মাহিয়ানা পাইবি দেউড়িতে পড়িয়া থাক্। না থাকিস্ চলিয়া যা।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, আমাকে টাকা দিতে হবে না কেবল খোরাক পোসাক দিলেই হবে, আমি থাকিব"।

বাবু হরনাথ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, 'তুই টাকা লইবি না—তোর কি বাড়িতে বাপ মা নাই?"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "থাকুক না থাকুক—যাইবার সময় যাহা আপনার বিচারে হয় করিবেন, এখন তো থাকি।"

বাবু হরনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয় শিবনারায়ণকে রাখিলেন এবং তাঁহার দ্বারা কার্য্য করাইতে লাগিলেন। শিবনারায়ণকে কি উৎকৃষ্ট এবং কি নিকৃষ্ট যে কার্য্য করিতে বলিতেন শিবনারায়ণ বিনা ওজরে সেই কার্য্যই করিতেন। বাবু কোন কার্য্য করিতে ইঙ্গিত করিবা-মাত্র শিবনারায়ণ সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, পুরাতন চাকরেরা সেরূপ করিতে পারিত না। বাবু মনে-মনে করিতেন যে, বিনা বেতনে উত্তম চাকর পাইয়াছি—যে কার্য্য করিতে হুকুম করিতেছি সেই কার্য্য উত্তম রূপে করিতেছে। শিবনারায়ণ ২।৩ মাস ঐ বাবুর বাটিতে থাকিয়া চুপ করিয়া সেখান হইতে রামপুর বোয়ালিয়াতে চলিয়া গেলেন। রামপুরে যাইয়া কোনো এক মহাজনের বাটীতে পূর্ব্বের মত যাচ্ঞা করাতে তিনিও হরনাথ বাবুর মত শিবনারায়ণকে চাকর রাখিলেন। শিবনারায়ণের দ্বারা মহাজ-

নেরও উত্তমরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। মহাজন সকল চাকরকেই শালা বলিয়া সম্বোধন করিতেন—কাজে কাজে শিবনারায়ণকেও শালা বলিতেন। কোনো স্থানে কোনো মাল রওনা করিতে হইলে মহাজন চাকর দ্বারা করাইতেন, তাহাতে পুরাতন চাকরেরা টাকা অধিক খরচ করিত এবং ইহাতে উহাতে খরচ হইয়াছে বলিয়া মহাজনকে হিসাব দিত। কিন্তু যখন তিনি শিবনারায়ণকে ঐ কার্য্যে নির্দ্দেশ করিতেন তখন খরচ কম লাগিত এবং তিনি কোন মিথ্যা হিসাব দিতেন না, এবং যথাযোগ্য ন্যায্য খরচ করিতেন। শিবনারায়ণ কাহারও সহিত অধিক কথাবার্ত্তা কহিতেন না; তাহাতে মহাজন বলিতেন, "এ বেটা বোকা, কিছু জানে না কিন্তু ইহার মধ্যে এই গুণ দেখা যাইতেছে যে, যেখানে বৈসে সেইখানেই একলা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কাহারো সহিত কথাবার্ত্তা কহে না এবং যাহা আমি বলি তাহাই শুনে; যে কার্য্যে আমি পাঠাই সেই কার্য্য করে—কোনো ওজর করে না। বোধ হয় কোনো ভাল লোকের ছেলে কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কাহারও সহিত কথা বলে না তাহাতে বোকার মতন বোধ হয়।" এই মহাজনের নাম দেবিদাস ছিল। এক দিন দেবিদাস বাবু একজন চাকরকে কটু কাটব্য গালি দিতেছিলেন তাহাতে শিবনারায়ণ তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রীতি পূর্ব্বক বুঝাইতে লাগিলেন যে, আপনি মনিব, মাতা পিতার তুল্য; আমার কথায় রাগ করিবেন না—ক্ষমা করিবেন। কৃপা করিয়া গম্ভীর ভাবে আমার দুই চারিটি কথা শুনুন, আপনি হলেন মনিব ও হোলো আপনার চাকর; ওর বিপদ হইয়াছে—সেই বিপদের দরুণ আপনার আশ্রয়ে চাকরি করিতেছে; ওরাও তো ভদ্র সন্তান; উহাদিগকে মিষ্ট বাক্য দ্বারা কার্য্য করাইতে হয়। তুচ্ছ তুচ্ছ কথা লইয়া উহাদিগকে গালাগালি দিলে উহাদের মনে বড় কষ্ট হয়; বিচার করিয়া দেখুন যদি উহারা ধনী হইত আর আপনি দরিদ্র হইতেন ও উহাদের কাছে চাকর থাকিতেন এবং উহারা যদি আপনাকে গালি দিত তাহা হইলে আপনার মনে কত কষ্ট হইত। সর্ব্বদা সকলে ধনী থাকে না—সকলেরইত কোন না কোন সময়ে বিপদ পড়ে। বিচার করিয়া দেখুন আপনার জন্মের পূর্ব্বে কি আপনি ধনী ছিলেন এবং ধন কি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন এবং ধন কি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন?" এই কথা শুনিয়াও দেবিদাস বাবুর জ্ঞান না হইয়া অহংকার প্রযুক্ত শিবনারায়ণকে গালি দিয়া বলিলেন, "বেটা—তুমি আমার চাকর হইয়া আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছ—বেটা দূর হ আমার সম্মুখ হইতে!" শিবনারায়ণ মনে মনে বলিলেন, ইহাঁর কোন দোষ নাই—ইনি আপনার বশে নাই; যেরূপে মাতালেরা মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া প্রমাদ বশতঃ সকলকে গালাগালি দেয় এবং নর্দ্দামায় পড়িয়া থাকে সেইরূপ অবোধ লোকের বিদ্যা, ধন, রাজ্য, হইলে তাহারা তাহার নেশাতে উন্মত্ত হইয়া জ্ঞানহারা হইয়া থাকে—তাহাদের কোন বাধা বোধ থাকে না, কেবল এই বোধ থাকে যে, আমি রাজা ধনী এবং বড় লোক, আমার

মত কেহই নাই; কাহারো উপর দয়া দৃষ্টি করে না, অন্ধ হইয়া থাকে; এ বিচার থাকে না যে, আমি কে, আমার স্বরূপ কি, এবং পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুর স্বরূপ কি? এই জগতে আমি যে আসিয়াছি আমার কি করা কর্ত্তব্য—ফলতঃ কোন বোধই থাকে না; সর্ব্বদা চঞ্চল ভাবে থাকে, কখন মনে সুখ পায় না। কিন্তু যদ্যপি জ্ঞানবান ব্যক্তির বিদ্যা, ধন, রাজ্য, হয় তবে তিনি সর্ব্বদা গম্ভীর, শান্ত, ধীর ও সন্তুষ্ট ভাবে থাকেন এবং পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরু আত্মাতে অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্বদা পরোপকারে রত থাকেন; চরাচর রাজা প্রজা যাহাতে সকলে সুখে থাকে তাহারি চেষ্টা করেন এবং সকলকে মিষ্টালাপে সন্তুষ্ট রাখেন। শিবনারায়ণ এইরূপ মনে মনে ভাবিয়া কিছু দিন কালক্ষেপ করিয়া সেখান হইতে পদ্মা নদীর ধারে আসিয়া বসিলেন ও অন্ন পরিত্যাগ করিয়া কেবল জল মাত্র পান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ।

বিদেশের ঝরা ফুল।

কোমল মধুর কণ্ঠ থেমে যায় যবে,
ধ্বনি তার স্মৃতিমাঝে বাজে মধুরবে;
ঝরে ফুল, গন্ধ তার, শিরায় শিরায়
যে সুখ জাগায়ে তোলে, জেগে থাকে তায়;

গোলাপ শুকায়ে যায়, পাতাগুলি তার,
প্রিয়ের শয্যার তরে হয় স্তূপাকার;
তেমনি তোমার চিন্তা, তুমি গত যবে,
প্রেম নিজে তদুপরি ঘুমাইয়া রবে।

সেলি

আমি ডরি হে কুমারী তোমার চুম্বনে;
　আমার চুম্বনে তব নাহি কোন ভয়,—
অবসন্ন হিয়া মোর যে ভার-বহনে,
　অবশ করিবে নাগো তোমার হৃদয়।

আমি ডরি ওই স্বর, লাবণ্য-ভঙ্গিমা,
　আমারে তোমার বালা নাহি কোন ডর;
এ যে প্রেম, যাহে পূজি ও দেবী-প্রতিমা,
　পূজার ফুলের মত বিমল সুন্দর।

সেলি

কুসুমের তরে আছে শিশিরের কণা,
　ফুলমধু মধুপের মিটায় তিয়াষা,
বনের পাখীর আছে নিকুঞ্জ নিলয়,
　তোমার আমার শুধু আছে ভালবাসা।

অশ্রু জল আছে হেথা অনেকের তরে,
　ভাগ্যবান্ তরে আছে সুখের প্রসাদ;
জগৎ চলিয়া যাক্ যেমন সে যায়,
　তোমার আমার, প্রিয়ে,পিরীতি অগাধ।

ভাবনা রয়েছে শত, ছাড়িবে না তারা,
　দুঃখ ক্লেশ কোন কালে পাবেনা বিনাশ;
তবু চিরকাল আছে গৃহে আমাদের,
　তোমার আমার মাঝে প্রেমের আবাস।

এ প্রেমের পরিমাণ কেহ নাহি জানে,
　শুধু জানি সত্য ইহা গভীর উদার—
এ আমার সংসারের আধখানা, প্রিয়ে,
　তোমার নিকটে ইহা সমস্ত সংসার।

হুড

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বসন্তের বিকশিত গোলাপের প্রায়,
এ প্রেম আমার
কোমল বীণার তারে সুর রেখা প্রায়,
এ প্রেম আমার।
মধুর সৌন্দর্য্যময়ী বিভুল বালিকা,
কত ভালবাসি আমি তায়
চিরটি জীবন ধরে বাসিব রে ভাল
সমুদ্র শুকায়ে যদি যায়।

যদি প্রিয়ে! সমুদ্রের তরঙ্গ শুকায়,
শৈল শৃঙ্গ গলে রবিকরে।
জীবনের বালুকণা বহে যতদিন
আমি ভালবাসিবরে তোরে।
বিদায় বিদায় দাও জীবন আমার
শুধু হায় নিমেষের তরে।
আসিবরে পুন ফিরে দেখিতে তোমায়,
থাকি যদি অতি দূরে দূরে।

বার্ণস্
শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

অনেক দিন হইতে ভারতী ও বালকে বাবু প্রভাতচন্দ্র সেনের "মানবীকরণ" শীর্ষক প্রবন্ধ ও বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক তাহার প্রতিবাদ প্রকাশিত হইতেছিল। সম্প্রতি প্রভাত বাবু ঐ প্রবন্ধের আরও কতক অংশ প্রকাশ জন্য আমাদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐ এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা—এই জন্য আমরা তাহা প্রকাশ না করিয়া ফেরৎ দিতে বাধ্য হইয়াছি।

"ভারতী ও বালক" কার্য্যাধ্যক্ষ।

ভারতচন্দ্র রায়।

ভারতচন্দ্র রায় প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের শেষ কবি। তাঁহার পরে যে বাঙ্গলা ভাষায় কেহ কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই এমন নহে, কিন্তু পরবর্ত্তী প্রাচীন লেখকদিগের কাহারও কপালে সেরূপ খ্যাতি লাভ ঘটে নাই। খ্যাতি লাভের মূলে ক্ষমতা আবশ্যক। তাঁহাদের সকলের বোধ করি তেমন ক্ষমতা ছিল না, সুতরাং ভারতচন্দ্রকে ছাড়াইয়া উঠা সম্ভব হয় কিরূপে? ভারত অশ্লীলই হৌন্ বা যাহাই হৌন, তাঁহার রচনাচাতুর্য্য সম্বন্ধে বড় মতভেদ দৃষ্ট হয় না; এবং সম্ভবতঃ এই রচনাকৌশলেই তিনি বঙ্গ সন্তানের নিকট অল্প দিন মধ্যে বিশেষ পরিচিত হইয়াছেন। ভারতচন্দ্র রায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন—সে সময়ের বঙ্গদেশে তিনি রাজকবি। সমসাময়িকদিগের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় অনেক বড় বড় পণ্ডিত থাকিতেন—স্মার্ত্ত, নৈয়ায়িক, দার্শনিক—কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত কবির সে সভায় একেবারেই অভাব। সে সময়ের সাহিত্যে এক নাম দেখিতে পাওয়া যায় রামপ্রসাদের, কিন্তু রামপ্রসাদও কাব্যে তেমন জমাইতে পারেন নাই, তাঁহার আশা ভরসা সঙ্গীতে। ভারতচন্দ্রের ছন্দের পারিপাট্য, পরিহাস-রসিকতা, গল্প সাজাইবার ক্ষমতা, এই সকলে সহজেই মন আকৃষ্ট হয়। এমন কি, সাজসজ্জার প্রভাবে সময় সময় দোষগুলিকে সৌন্দর্য্য হইতে পৃথক্ করা দায় হইয়া উঠে। বাস্তবিক, কথার কারিগরিতে ভারতচন্দ্রকে আঁটিয়া উঠিতে পারে কয়-জন?

ভারতচন্দ্রের সময়ে কথার উপর অনেক কবিরই দৃষ্টি ছিল। তাঁহার সমসাময়িক রামপ্রসাদ সেন বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যেথান হইতে পারিয়াছেন কথা সংগ্রহ করিয়া আনিতে ভুলেন নাই। কথার জন্য কত স্থলে অর্থবোধ দুঃসাধ্য, তথাপি কথা চাই। ভারতচন্দ্রেরও কথার প্রতি একটু বিশেষ টান দেখা যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার কথা সাজাইবার ক্ষমতা ছিল। তাঁহার মধ্যে যে ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা তিনি ভাষায় সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে পারেন। তবে ভাবের অপেক্ষা কথার ভাণ্ডার তাঁহার পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতির অন্তরে ডুবিয়া তাহার আনন্দ উপভোগ করিবার কবি ভারতচন্দ্র নহেন। তিনি ঘরকন্নার বর্ণনা করিতে পারেন, তাকিয়া তামাকের রসাস্বাদন করিতে পারেন, প্রাণ অপেক্ষা দেহকেই বুঝেন ভাল। মুকুন্দরামকে দারিদ্র্যের কবি বলিলে ভারতচন্দ্রকে বড়মানুষীর কবি বলা যায়। মুকুন্দরাম কি রাজা সদাগর লইয়া কারবার করেন নাই? তবে তাঁহাকে দারিদ্র্যের কবি বলা যায় কি রূপে? তাঁহার সুর দেখিয়া। দারিদ্র্য বর্ণনা করিলে কিম্বা বিলাসের চিত্র আঁকিলেই যে কবি ধরা পড়েন তাহা নহে, সেই বর্ণনার মধ্যে অন্তর্লীন সুরেই কবির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের সুরে

বিলাসের মন্দিরের ছায়া—তিনি যাহাই বর্ণনা করুন না কেন তাঁহার প্রাণ ধরা পড়িবে।

ভারতচন্দ্রের প্রধান গ্রন্থ অন্নদামঙ্গল। তাঁহার বিদ্যাসুন্দর স্বতন্ত্র কাব্য নহে—অন্নদামঙ্গলের মধ্যে একটী দীর্ঘ উপাখ্যান মাত্র। অন্নদামঙ্গলে হরগৌরীর কথা আছে, ভবানন্দ, মানসিংহ, প্রতাপাদিত্য, জাহাঙ্গীর অনেকেই আছেন, আর গ্রন্থারম্ভে কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনে রাজবাটীর টিক্‌টিকিটী অবধি বাদ পড়ে নাই। আর শ্লেষ, অনুপ্রাস, রসিকতা ভারতচন্দ্রের হাড়ে হাড়ে—অন্নদামঙ্গলে তাহা যথেষ্ট। প্রাচীন রীতি অনুসারে ভারতচন্দ্র গণেশ, শিব, বিষ্ণু, কৌষিকী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেব দেবীগণকে বন্দনা করিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার পর গ্রন্থ সূচনায় কৃষ্ণচন্দ্রের কথা পড়িয়া তাঁহার সভা বর্ণনা করিতে বসিয়াছেন। সভা বর্ণনার আরম্ভেই শ্লেষ প্রয়োগ। তাহাতে ভারতচন্দ্রের কথার চাতুরী বেশ বুঝা যায়। আকাশের চন্দ্রের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের তুলনা করিয়া তিনি উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখাইয়াছেন। এই তুলনার মধ্যে ভারতের রসিকতা-প্রয়াসও লক্ষিত হয়। রাজসভায় হাস্যরসাবতরণার জন্য তিনি যতটুকু পারিয়াছেন রঙ্গরস করিয়া লইতে ছাড়েন নাই। ভারতের প্রকৃতিই রঙ্গরস। আমরা সভা বর্ণন হইতে শ্লেষাংশটুকু উঠাইয়া দি, পাঠকেরা তাহার মধ্যে ভারতের কারিগরি দেখিয়া লউন্ :

"চন্দ্রে সবে ষোলকলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল॥
দুইপক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুইপক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥"

শ্লোক গুলির শ্লেষ কোথায় ব্যাখ্যা করিতে হইবে না, কেবল পাঠকগণের সুবিধার জন্য এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখিলেই যথেষ্ট যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দুই গৃহিণী। তাই তাঁহার দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়।

সভা বর্ণনের শেষে ভারতচন্দ্র নিজের স্বপ্ন বিবরণ কহিয়াছেন—অন্নপূর্ণা মাতৃবেশে ভারতকে অন্নদামঙ্গল রচনা করিতে আদেশ দিলেন। সত্যই যে ভারত এরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। সেকালে গ্রন্থারম্ভে স্বপ্নবিবরণ একটা ফেসান ছিল। দেবানুগ্রহ-প্রসূত শুনিলে সাধারণ লোকে সে গ্রন্থকে সহজেই সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিত, সেই জন্যই বোধ করি কবিরা স্বপ্ন আবশ্যক ঠাহরাইয়াছিলেন। ক্রমে

ক্রমে স্বপ্নাদেশ ফেসান হইয়া দাঁড়ায়। ভারতচন্দ্র তাই নিজে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, এবং রায়-গুণাকর উপাধির জন্য কৃষ্ণচন্দ্রকেও স্বপ্ন দেখাইয়াছেন। এত স্বপ্নকাণ্ডের পরে গুণা-করের গীতারম্ভ।

দক্ষমুনি শিবের শ্বশুর খুব ঘটা করিয়া এক যজ্ঞ করিয়াছেন—নরলোকে দেবলোকে নিমন্ত্রণ করিতে আর কাহাকেও বাকি রাখেন নাই। কিন্তু এই মহাযজ্ঞে স্বীয় জামা-তাকে তিনি আহ্বান করিলেন না।' জামাতা সুতরাং অনিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞস্থলে যাইতে পারেন না। এদিকে দক্ষকন্যা সতী পিত্রালয়ে যাইবার জন্য স্বামীকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। মহাদেব সতীকে সাধ্যমত বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, বিনা নিমন্ত্রণে গিয়া অপমানিত হইবার প্রয়োজন নাই। স্ত্রীবুদ্ধি কিছুতেই বুঝে না। সতী বলেন, কন্যা পিত্রালয়ে যাইবে তাহার আবার নিমন্ত্রণ কি? মহাদেব তথাপি অনুমতি দিলেন না। তখন সতী নানা মূর্ত্তি ধরিয়া মায়াপ্রভাবে মহাদেবকে বশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে মহাদেবের অনুমতি বাহির হইল। সতী পিত্রালয়ে গমন করিলেন। সেখানে দক্ষ শিবনিন্দা করিতেছেন। পতিনিন্দা সহিতে না পারিয়া সতী পিতাকে অভিশাপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ভারতচন্দ্র রায় দক্ষমুখে শিবনিন্দাছলে শিবের স্তুতি করিয়া লইলেন।

সতীর তনুত্যাগে নন্দী মহা ক্রুদ্ধ হইল। কালবিলম্ব না করিয়া কৈলাসে গিয়া কৃত্তি-বাসের নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিল। মহাদেব ভূত প্রেত দলবলসহ দক্ষালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দক্ষালয়ে ভয়ানক গোলমাল পড়িয়া গেল—কেবলই ভূতের নৃত্য, পিশাচের কোলাহল, ডাকিনী যোগিনী শাখিনী পেতিনীর ভীষণ হুহুঙ্কার, আর "সতী দে সতী দে সতী দে।" ভারতচন্দ্র এই এক লাইনে সে সময়ে মহাদেবের মনের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। সমস্ত ভূত প্রেত পিশাচের কণ্ঠ হইতে কেবল এক "সতী দে সতী দে" ধ্বনি—আর কেহ কিছু চাহে না, আর কেহ কিছু বুঝে না, কেহ কিছু শুনিতে চাহেও না, কেবলই দে সতী দে সতী। দক্ষের মুখে কথা সরে না, দেবতা ব্রাহ্মণেরা সকলেই অবাক্, কোথায় পূণ্য গম্ভীর যজ্ঞ-ভূমি আর কোথায় পৈশাচিক শ্মশান দৃশ্য! শিবের অনুচরেরা দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া ক্ষান্ত হইল। প্রসূতিস্তবে প্রসন্ন হইয়া শিব দক্ষকে বাঁচাইয়া দিলেন, কিন্তু নরমুণ্ডের পরিবর্ত্তে দক্ষের স্কন্ধে ছাগ-মুণ্ড বসিল। শিব তখন সতীদেহ-স্কন্ধে দেশে দেশে তাঁহার গুণ গান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। চক্রধর বিপদ বুঝিয়া চক্রধারে সতীদেহ খান খান কাটিয়া দিলেন। যেখানে যেখানে সে অঙ্গ পড়িল সেই সেই স্থানেই এক একটী মহাপীঠ।

অনেক পাঠক হয়ত এই সকল অমানুষিক ঘটনা দেখিয়া ভারতচন্দ্রকে কবি-জগৎ হইতে দূর করিয়া দিতে চাহিবেন, কিন্তু এ সকল পৌরাণিক ব্যাপারের জন্য ভারতচন্দ্র দোষী নহেন। প্রাচীন বিশ্বাসের উপর দাঁড়াইয়া ভারতচন্দ্র যাহা বর্ণনা করিয়াছেন

তাহার মধ্যে তাঁহার কবিত্ব কিরূপ খুলিয়াছে তাহাই আমাদের দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান কালের কবিদিগের মত ভাবের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ভারতের ছিল না। বড় বড় আদর্শ সৃষ্টি করিতেও তিনি অক্ষম। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহার কোন গুণই ছিল না? তাঁহার কাব্যে তিনি সাময়িক সমাজের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা হইতে সে সময়ের সামাজিক অবস্থা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ভারতচন্দ্র সেই সমাজেরই কবি—সাধারণের ভাবের অধিক উর্দ্ধে তিনি উঠেন নাই, তাই সাধারণের নিকট বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলেন। সে সমাজের উর্দ্ধে উঠিলে সমাদরের জন্য হয়ত কতকদিন অপেক্ষা করিতে হইত। ভারত মুকুন্দরামের মত যাহা দেখিয়াছেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কালিদাসের মত দুই চরণে সমগ্র ভাব ব্যক্ত করা তাঁহার সাধ্যাতীত। কিন্তু এইখানে বলিয়া রাখি, মুকুন্দরামকে যেমন বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয় ভারতকে তেমন হয় না। মুকুন্দরামে মধ্যে মধ্যে কুঁকুড়া জবাই শুনা যায়, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে মুসলমানী পরিচ্ছদে দেখা যায় না। ভারত যেন কতকটা সেকালের বড়লোকের মত—তাঁহার উপরে মুসলমানত্বের ক্ষীণ প্রভাব অনুভব হয়।

এখন একবার শিবের অবস্থা কিরূপ দেখিতে হইবে। শিবের আবার বিবাহ। নারদ ঘটক জুটিয়াছেন, কন্যার অভাব কি? কন্যা নগেন্দ্র-নন্দিনী উমা। মহামায়া শিবের জন্য হিমালয়ের আলয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নারদ দুই জনকে মিলাইয়া দিবেন। বীণা কাঁধে ফেলিয়া নারদ একদিন হিমালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে উমা সহচরীদিগের সহিত খেলা করিতেছেন—হরগৌরীর বিবাহ। সারি সারি মাটীর পুঁতুল দাঁড়াইয়াছে—খেলার খুব ধূম। নারদ ত এই সকল ব্যাপার দেখিয়া উমাকে এক প্রণাম ঠুকিয়া বসিলেন। উমা বলিলেন, ব্রাহ্মণ হইয়া প্রণাম কেমন ধারা! নারদ গৌরীকে একটু ঠাট্টা করিয়া বুড়া বর জুটাইবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। গৌরী বিবাহের কথায় ছলে লজ্জা পাইয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া পলাইলেন, এবং নারদের নামে নালিস রুজু করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মেনকা তাড়াতাড়ি আসিয়া মুনির পাদবন্দনা করিয়া বসাইলেন। হিমালয়ও হাজির। বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

ভারতের এইখানকার বর্ণনাগুলি বেশ স্বাভাবিক। হরগৌরীকে অলৌকিক ঘটনা সমূহ দ্বারা ঘিরিয়া রাখিলেও ভারতচন্দ্র তাঁহাদিগকে মানবধর্ম্মের অতীত মনে করেন না। বঙ্গ সন্তানের নিকট সে জন্য অন্নদামঙ্গল বোধ করি কতকটা সুখপাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র মজা করিতে গিয়া শিবকে নিতান্তই অশিব করিয়া তুলিয়াছেন। শিব ধ্যানে মগ্ন। দেবতারা তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিবার জন্য ব্যস্ত। যথা-রীতি অনুষ্ঠানাদির পর শিবের ধ্যান ভঙ্গ হইল। ভারত তখন তাঁহার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা দেখিলে দুঃখ হয়! প্রাচীন কালে দেব দেবীদিগকে পাশবধর্ম্মে রত করিয়া

মাটী করা ফেসান না হইলেও বিরল নহে। ভারত আঁকিয়াছেন, শিব অপ্সরী কিন্নরী-বর্গের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান। এমন সময়ে নারদ আসিয়া উপস্থিত, শিবের একটু লজ্জা বোধ হইল। ক্রমে নারদ বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। শিবের আর বিলম্ব সহে না—বিবাহের জন্য তিনি ক্ষেপিয়া উঠিলেন। সাজসজ্জা হইল। বলদে চড়িয়া বিয়ে-পাগ্‌লা শিব চলিলেন। হুলু-লু-লু-লু!

শিবের রকম দেখিয়া স্ত্রীগণ সকলেই অবাক্। এমন ৩ব বাঘছালপবা ক্ষেপা বর ত কেহ কখনও দেখে নাই। নারদ ইহাকে কোথায় পাইলেন? সুন্দরবন হইতে ধরিয়া আনেন নাই ত? এমন কথাও মুখে আনে—রাম বল। স্ত্রীজাতির রসনা নারদের বিপক্ষে ধীরে ধীরে অনেক প্রকার গুজব তুলিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে তারকণ্ঠ সরস বাক্যাবলী সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতেও ক্রটী করিল না। নারদের বহু পুণ্যফল, তাই গালিগালাজের উপর দিয়াই গিয়াছে। নাহলে সম্মার্জ্জনী যদি গাঝাড়া দিতেন, নারদের অবস্থা কিরূপ হইয়া দাঁড়াইত নিশ্চিত বলা যায় না।

মহিলাদিগের মধ্যে ক্রমে ক্রমে শিবনিন্দা এবং কোন্দল আরম্ভ হইল। ভারতচন্দ্র নারদের মুখে কোন্দলের মন্ত্র আওড়াইয়া দিয়াছেন। মন্ত্রটী মন্দ হয় নাই। কোন্দলে চেতনধর্ম্ম আরোপ করিয়া ভারতচন্দ্র বেশ একটু কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠক-দের দেখিবার জন্য আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আয়রে কোন্দল তোরে ডাকে সদাশিব।
মেয়েগুলা মাথা কোড়ে তোরে রক্ত দিব॥
বেনা-ঝোড়ে ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া।
এয়ো সুয়া এক ঠাঁই দেখরে আসিয়া॥
ঘুরুলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরুলে।
সেহাকুল কাঁটা হাতে ঝাট্ এস চলে॥
এক ঠাঁই এত মেয়ে দেখা নাহি যায়।
দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয়॥"

শিবনিন্দা শুনিতে উমার বড় ভাল লাগিল না। শুধু কোন্দল ঝগড়া হইলে তত হানি ছিল না। উমা বিপদ্ বুঝিয়া মেনকাকে দিব্যজ্ঞান দিলেন। বর দেখিয়া তখন মেনকার বড়ই আহ্লাদ। শিবের বিবাহ সম্পন্ন হইল। সিদ্ধিঘোটনের মহা ঘটা পড়িয়া গেল। ভারতচন্দ্র রায় কবিকঙ্কণের মত যাবতীয় মসলার নাম করিয়া গিয়াছেন। মহাদেব সিদ্ধিপান করিয়া বিহ্বল। তাঁহার আঁখি ঢুলু ঢুলু, কথা কেমন জড়াইয়া যায়, নেশা করিলে সাধারণ লোকের যেরূপ অবস্থা হয় শিবেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। তাহার পর গৌরীর সহিত মহাদেবের কথোপকথন। কথাবার্ত্তাগুলি পড়িতে নিতান্ত মন্দ নয়—তাহাতে সোহাগ আছে, কথা কাটাকাটিও আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে

শিবের একেবারে চরিত্রহীনতা প্রকাশ পায়। ভারতচন্দ্র রঙ্গরসের অভিপ্রায়ে শিবের সহিত কুচ্‌নীর নামের সংযোগ করিয়া শিবকে তৃণ অপেক্ষা লঘু প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাস্তবিক, ভারতচন্দ্র যে পরিমাণে রঙ্গরসপ্রিয় তেমন কবি নহেন। তাঁহার কাব্যে যেখানে যেখানে কবিত্ব ফুটিয়াছে সেখানে প্রায়ই মূলে রঙ্গরসপ্রয়াস। এক শরীরে হরগৌরী রূপ আঁকিতে গিয়া তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি পড়িল,

"আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরাভক্ষণ আধই তাম্বূল পূরিরে।
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু এক লোচন কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন।"

রঙ্গরসের সুবিধা পাইলে ভারতের গাম্ভীর্য্য সৌন্দর্য্য বড় মনে থাকে না। স্বাভাবিক মুখশ্রী, স্বভাব-গাম্ভীর্য্য, এসকল অপেক্ষা কজ্জল, ভাঙ্গ ধুতুরার দিকে তাঁহার সহজে নজর পড়ে।

ভারতচন্দ্র হরগৌরীর আরও অনেক কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কোন্দল ঝগড়া, ভিক্ষা, উপদেশ কিছুই ফাঁক যায় নাই। তাঁহার গৌরীটী আনুনাসিক স্বরে চীৎকার করিতে মন্দ পারেন না। কিন্তু এখন সে কথা থাক্। অন্নদামঙ্গলে ভবানন্দ মজুন্দারই প্রধান চরিত্র। আমরা ধীরে ধীরে ভবানন্দের বিবরণের দিকে অগ্রসর হই। ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে—শিবব্যাসে কথোপকথন, অন্নদার জরতী-বেশে ছলনা, বসুন্ধরের জন্ম, হরিহোড়ে বরদান, নলকূবরে অভিশাপ ইত্যাদি ইত্যাদি। সে সকলের বিস্তারিত উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখিলেই চলিবে যে, নলকূবরই বাঙ্গালীর গৃহে ভবানন্দরূপে অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহার দুই পত্নী—চন্দ্রমুখী এবং পদ্মমুখী। ভবানন্দ তাঁহাদের জন্য দুই দাসী সংগ্রহ করিয়াছেন—সাধী আর মাধী। দাসী নহিলে বঙ্গগৃহ অন্ধকার—সকল শ্রীর মূলে বাঙ্গলার দাসী। স্বয়ং অন্নদাও ভবানন্দের গৃহে আশ্রয় লইলেন। আর ভয় কারে? মজুন্দারের গৃহে লক্ষ্মী অচলা।

এদিকে প্রতাপাদিত্যকে শাসন করিতে মানসিংহ আসিয়াছেন। ভবানন্দের উপর কানগোইভার হইয়াছে। বাঙ্গলার যাহা কিছু সমাচার জানিতে হয় মানসিংহ ভবানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন। ভবানন্দ কথায় কথায় তাঁহাকে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী বলেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলেরই অংশ—ভবানন্দের মুখে বর্ণিত। আমরা আপাততঃ মূল উপাখ্যান শেষ করি। বিদ্যাসুন্দর স্বতন্ত্র আলোচনা করাই সুবিধা। মূল গল্পের সহিত ত ইহার বিশেষ যোগ নাই। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসুন্দর একটী স্বতন্ত্র কাব্য। ভারতচন্দ্র কৌশলক্রমে তাহাকে অন্নদামঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়াছেন মাত্র।

মানসিংহ রায় বর্দ্ধমান হইতে যশোহরে চলিলেন—যশোহরই প্রতাপাদিত্যের রাজধানী কিনা। পথে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি। বিপুল সেনা লইয়া মানসিংহ ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি ভবানন্দকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বিপদে উপায় কি?

ভবানন্দ অন্নপূর্ণা-পূজার কথা বলিলেন। পূজা হইল। ঝড় বৃষ্টি থামিল। ভারতচন্দ্র রায়ের কিন্তু এ ঝড় বৃষ্টিতে বড় সুবিধা হইয়াছে। তিনি ঝড় জলের মধ্যে ঘেসেড়ানীর ক্রন্দন উপভোগ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেছেন। রঙ্গরসের অবসর ভারত কি ছাড়িতে পারেন? তিনি আরম্ভ করিলেন,

"ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হা ভাসে॥
কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায়রে গোসাঁই।
এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই॥" ইত্যাদি।

যশোহরে গিয়া মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বহু কষ্টে হারাইয়া দিলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া দিল্লীতে লইয়া চলিলেন। পথে অনাহারে মৃত্যু হওয়ায় নিষ্ঠুর মানসিংহ বাঙ্গলার আদিত্যকে ভাজিয়া লইলেন। রাজসভায় প্রতাপাদিত্যের সেই ভর্জ্জিত দেহ প্রদর্শিত হইল। জাহাঙ্গীর বিশেষ আহ্লাদিত। ভবানন্দকে মানসিংহ পাতশাহের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। জাহাঙ্গীর স্ফূর্ত্তির মুখে ভবানন্দের সম্মুখে হিন্দু জাতির ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া অনেক কটুকাটব্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ভবানন্দের অসহ্য হইল। তিনি জাহাঙ্গীরের কথার প্রতিবাদ করিয়া স্বধর্ম্মের তরফে অনেক কথা বলিলেন, তাহাতে মুসলমানের উপর অল্পবিস্তর আক্রমণও আছে। এইখানেই ভবানন্দের সাহসের পরিচয়। দিল্লীর দরবারে দাঁড়াইয়া সম্রাটের মুখের উপরে কথা বলিতে পারে কয়জন? জাহাঙ্গীর ক্রুদ্ধ হইয়া ভবানন্দকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন। দিল্লীতে ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হইল। অবশেষে জাহাঙ্গীর বিনয়পূর্ব্বক ভবানন্দকে ঠাণ্ডা করিলেন। দিল্লীতে অন্নপূর্ণ পূজা হইল। ভূতের অত্যাচার থামিয়া গেল। ভবানন্দ বিশেষ সম্মানিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গৃহে আসিয়া ভবানন্দের মহা ভাবনা, দুই রাণীর কাহার নিকট প্রথমে যাইবেন। সাধী মাধী আপন আপন কর্ত্রীকে ভজাইতেছে, প্রথমে যেন ভবানন্দকে নিজ ঘরে লইয়া আসা হয়। এজন্য তাহাদের উপদেশের অন্ত নাই। সাধী বড় রাণীকে বুঝাইল যে, তুমি পুত্রবতী গুণবতী বটে, কিন্তু তোমার সপত্নী এখন যুবতী সুতরাং রূপবতী, তাহারই গৃহে রাজধানী হইবে। উদাহরণ সমেত সাধী বলিল,

"রূপবতী লক্ষ্মী গুণবতী বাণী গো।
রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপাণি গো॥
আগে যদি ঠাকুরেরে ডেকে আনি গো।
ছোট পাছে পথে করে টানাটানি গো॥
টেনেটুনে বাঁধ ছাঁদ খোঁপাখানি গো।
শাড়ী পর চিকণ শ্রীরাম থানি গো॥

দেহুড়ীর কাছে থাক হয়ে দানী গো।
ঘরে আন ধরে করে টানাটানি গো॥"

মাধী ও ছোটরাণীকে বড়রাণীর নিন্দা করিয়া অনেক বুঝাইল। সে বলিল,

"দরবারে জয় লয়ে, প্রভু আইলা রাজা হয়ে
আগে যদি তার ঘরে যান।
মহারাণী হবে সেই মোর মনে লয় এই
তুমি হবে দাসীর সমান॥
একে তার তিন বেটা তাহারে আঁটিবে কেটা
আরো যদি রাণী হয় সেই।
রাজপাট সব লবে তোমার কি দশা হবে
আমার ভাবনা বড় এই॥
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাক আঁখিঠার দিয়া ডাক
আমি গিয়া ঠাকুরেরে ডাকি।
আগে তাঁরে ঘরে আনি তোমারে ত করি রাণী
তবে সে সতিনী পায় ফাঁকি॥"

ভবানন্দ অন্তঃপুরে আসিলে সপত্নীদিগের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। ভবানন্দ কথার চাতুরীতে উভয় পক্ষের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া প্রথমে চন্দ্রমুখীর এবং পরে পদ্মমুখীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর কিছু দিন রাজ্যভোগ করিয়া পুত্র হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া ভবানন্দ চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী সমভিব্যাহারে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। স্বর্গেও সপত্নী দ্বন্দ্ব তাঁহাকে ছাড়িতে চাহে না। এই খানেই অন্নদামঙ্গল সমাপ্ত।

অন্নদামঙ্গলের শেষ ভাগ দেখিলে মনে হয় যেন ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের অনুকরণ করিযাছেন। ভারতচন্দ্রের যে মৌলিকতা নাই এমন কথা আমরা বলি না, কিন্তু তাঁহার চরিত্রচিত্রণে রন্ধনাদি-বর্ণনে সহজেই কবিকঙ্কণকে মনে পড়ে। কবিকঙ্কণের শ্রীমন্তোপাখ্যান যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, অন্নদামঙ্গলে অল্পবিস্তর অনুচিকীর্ষা উপলব্ধি করা যায় কিনা। কবিকঙ্কণের মধ্যে ভারত অপেক্ষা গাম্ভীর্য্য আছে। মুকুন্দরাম উন্নত চরিত্র চিত্রণে ভারত অপেক্ষা সমধিক দক্ষ। কিন্তু ভারত রঙ্গরসের প্রভাবে বঙ্গ সন্তানকে সহজেই আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার অনেকগুলি শ্লোক বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রবাদ বাক্যের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতচন্দ্র নিজের ভাব বেশ প্রকাশ করিতে পারেন।

অন্নদামঙ্গল শেষ হইল বটে, কিন্তু তাহার মধ্যস্থ বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সম্বন্ধে এখনও কিছু বলা হয় নাই। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রামপ্রসাদ সেনের অপেক্ষা সরস। তাঁহার ভাষা সহজ, ভাব স্পষ্ট, গল্পেরও কারিগরি আছে। তবে গল্পটী

আসলে উভয়েরই এক। বীরসিংহ নরপতির কন্যা বিদুষী বিদ্যা পণ করিয়াছেন যে, বিচারে তাঁহাকে হারাইতে না পারিলে কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। সুন্দর কাঞ্চীদেশের রাজপুত্র। বিদ্যার কথা শুনিয়া তিনি বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন। হীরা মালিনীর কৌশলে বিদ্যার সহিত সুন্দরের দেখাসাক্ষাৎ হয়। তাহার পর উভয়ের মধ্যে অনুরাগ জন্মায়। সুন্দর সুড়ঙ্গপথ দিয়া বিদ্যার গৃহে যান আসেন। ক্রমে ক্রমে সে কথা প্রচার হইল। সুন্দর কোটালের নিকট ধরা পড়েন। অবশেষে বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ হয়।

এই গল্প অবলম্বন করিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাহাতে প্রধান ঘটনা যাহা উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র স্বীয় গল্প রচনা ক্ষমতায় ইহার উপর অনেক সাজসজ্জা দিয়াছেন। আর দেশ বিদেশের বর্ণনা, নারীগণের খেদ, পতি-নিন্দা, এ সকল ত আছেই। নহিলে কাব্যের আদর হইবে কেন? ভাটের মুখে বিদ্যার সমাচার শুনিয়া অবধি সুন্দর অধীর। বিদ্যাকে না পাইলে তাঁহার আর কিছুতেই মন স্থির হয় না। এক দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া তিনি বর্দ্ধমান উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে কেহই নাই—কেবল একটী শুকপক্ষী। সপ্তাহ পরে সুন্দর বর্দ্ধমানে পঁহুছিলেন। ভারতচন্দ্র রায় প্রাচীন প্রথানুসারে বর্দ্ধমানের দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। সেখানে পঁহুছিয়া এক বকুলতলে সুন্দর একেলা বসিয়া রহিলেন। বকুল-বৃক্ষের নিকটেই সরোবর। বর্দ্ধমানের নাগরীরা কলসীকক্ষে স্নান করিতে আসিতেছেন। কিন্তু সুন্দরকে দেখিয়া নারীসমাজে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। নিজ গৃহপানে কাহারও বড় পা চলে না। স্নান সারিয়া রামাগণ গৃহে চলিলেন—আঁখি থাকিয়া থাকিয়া ফিরিয়া দেখে। ভারতচন্দ্র যেরূপভাবে এখানে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে তৎকালীন সমাজ সম্বন্ধে কাহারও বোধ করি বিশেষ ভাল অবস্থা মনে আসে না। স্ত্রীজাতিকে তিনি একেবারে রূপের ক্রীতদাসী করিয়া আঁকিয়াছেন—রূপের নিকটে পাতিব্রত্য নাই, শান্ত ভাব নাই, রূপ দেখিলেই তাহারা অধীর। সুন্দরকে দেখিয়া বর্দ্ধমানের স্ত্রীবর্গ অকাতরে স্বামী আত্মীয় পরিজনদিগের নিন্দা করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের চরিত্রে উন্নত ভাব আদবেই নাই।

হীরা মালিনীর সহিত বকুলতলাতেই সুন্দরের আলাপ পরিচয় হয়। মালিনী সুন্দরকে আপন আলয়ে আশ্রয় দেয়। সুন্দর মালিনী মাসীকে বলিলেন, দাস দাসী ত কেহ নাই, কে তাঁহার হাট বাজার করিবে? মালিনী নিজ অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়া সুন্দরকে আশ্বস্ত করিল। মালিনীর এইখানকার কথাবার্ত্তাতেই তাহার চরিত্র অভিব্যক্ত। মালিনী যে উন্নত চরিত্রের লোক নহে তাহা বলাই বাহুল্য। বাজার করিয়া আনিয়া মালিনী তাহার এক দীর্ঘ হিসাব দেয়। সে হিসাব না দিলেও চলে—তাহা নিতান্তই অনুগ্রহ। সুন্দর হিসাবের জন্য বড় ব্যস্ত নহেন—তাঁহার কার্য্য উদ্ধার

হইলেই হয়। তিনি বিদ্যার জন্য মালিনীর হস্তে মালা গাঁথিয়া দেন। তাহাতে শ্লোক লেখা। বিদ্যা মালা দেখিয়া অধীর। মালিনীকে অনেক বিনয় করিয়া সুন্দর দর্শনের কথা বলিল। মালিনী কৌশল করিয়া একদিন পরস্পরকে দেখাইয়া দিল। ফল হইল,

"দুঁহার নয়ন ফাঁদে ঠেকিয়া দুজনে।
দুজনে পড়িল বান্ধা দুজনের মনে॥"

ইতিমধ্যে ভারতচন্দ্র একবার বিদ্যার রূপবর্ণনা করিয়া লইয়াছেন। তাহাতে তরঙ্গে তরঙ্গে অনুপ্রাস। কিন্তু অনুপ্রাস হইলেও এ বর্ণনা রামপ্রসাদের মত নির্জীব নহে; ভারত আগাগোড়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সমষ্টিভাবে বর্ণনা করা সেকালের কবিদিগের অজ্ঞাত। ভারতচন্দ্র বিদ্যার বেণীর শোভা হইতে আরম্ভ করিয়া পদনখ পর্য্যন্ত বাদ দেন নাই। আর এই বর্ণনার জন্য যেখান হইতে পারিয়াছেন উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন। বোধ করি, ভবিষ্যৎ কবিদিগের কি দশা হইবে ভাবিলে ভারতচন্দ্র কিছু রাখিয়া দিতেন।

এখন বিদ্যার সহিত সুন্দরের মিলন হয় কিরূপে? রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে ত আর যে সে ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারে না। বিদ্যার ইচ্ছা যে, চুপি চাপি বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। মালিনী বিদ্যাকে বুঝাইল যে, গোপনে বিবাহ ন্যায়সঙ্গত নহে, পরে বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু মালিনীর কথা শুনে কে? কালীর অনুগ্রহে সুন্দরের বাসস্থান হইতে বিদ্যার গৃহ অবধি সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইল। এই সুড়ঙ্গপথ দিয়া সুন্দর গোপনে বিদ্যার গৃহে যাতায়াত করেন। সুন্দর আবার সন্ন্যাসী-বেশে রাজসভায় গিয়া বিদ্যা-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহেন। যাহা হৌক্, গুপ্তপ্রণয় অল্প দিন মধ্যেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। রাণী বিদ্যাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিলেন। তবুও কি বিদ্যা স্বীকার করে? কিন্তু রামপ্রসাদের বিদ্যার মত ভারতের বিদ্যার গলার জোর নাই। সে বিদ্যাপেক্ষা এ বিদ্যার প্রকৃতি কোমল। বীরসিংহ রায় কোটালকে চোর ধরিতে আদেশ দিলেন। স্ত্রীবেশে কোটাল সুন্দরকে বঞ্চনা করিল। সুন্দর ধরা পড়িলেন। নারীগণের পতিনিন্দা আরম্ভ হইল। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কল্যাণে ইহাকেও পাতিব্রত্যের আত্যন্তিকতা না বলিলে নয়। কারণ, বঙ্গদেশের ধমনীতে ধমনীতে তীব্রবেগে আধ্যাত্মিক তড়িৎস্রোত প্রবাহিত। আমরা কিছুই না বলিয়া এক আধটী শ্লোক উঠাইয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াই। পাঠকেরা ধর্ম্মপ্রধান ইংরাজ-শাসনের পূর্ব্ব-কালের অধ্যাত্মযোগ উপভোগ করিতে থাকুন।

"বিদ্যাকে করিয়া চুরি এ হইল চোরা।
ইহারে যদ্যাপ পাই চুরি করি মোরা॥"

শুধু এইখানেই শেষ নয়। ক্রমে ক্রমে পতিবর্গের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহার আবশ্যক হয় দেখিয়া লইবেন।

সুন্দর রাজসভায় আনীত হইলেন। ভারতচন্দ্র রাজসভা বর্ণনা করিয়াছেন—আল-

স্যের আধার। সেখানে তাকিয়া আছে, বালিশ আছে, সুতরাং ছারপোকাও আছে। কিন্তু এ ছারপোকাগুলাও আলস্যের সন্তান সন্ততি। সভা মধ্যে রাজা সুন্দরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। সুন্দর বলেন, তিনি বিদ্যাকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছেন—বিদ্যা তাঁহারই, সভামধ্যে আত্মপরিচয় দিতে তিনি বাধ্য নহেন। সুন্দরকে মশানে লইয়া যাওয়া হইল। ইতি মধ্যে শুকসারীর কথায় গঙ্গাভাটকে আনাইয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে রাজা সুন্দরের পরিচয় জানিতে পারিলেন। তখন সুন্দরকে জামাতা বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহার আর কোন আপত্তিই রহিল না। কিছুদিন পরে বিদ্যাসহ সুন্দর স্বদেশ চলিয়া গেলেন।

রামপ্রসাদের মত ভারতচন্দ্রও সুন্দরের স্বদেশ গমনের পূর্ব্বে একবার বারমাস বর্ণনা করিয়া লইয়াছেন। মুকুন্দরাম হইতে বারমাসবর্ণন এক ফেসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে ফুল্লরার বারমাস বর্ণন আর বিদ্যার বারমাস বর্ণনে তফাৎ বিস্তর। ফুল্লরার বারমাস দুঃখের; আর বিদ্যার বারমাস বিলাসের। ফুল্লরার উদরচিন্তা, গৃহাভাব; বিদ্যার কোকিল-মলয়-সম্মিলন। রামপ্রসাদ অপেক্ষা ভারতচন্দ্র কিন্তু ভাল বর্ণনা করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের কতকগুলি ছোট ছোট নানাবিষয়িণী কবিতা আছে—নায়ক নায়িকা, বসন্ত বর্ষা, সত্যপীরের কথা, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেগুলির বিশেষ উল্লেখ অনাবশ্যক। কিন্তু ভারতের সকল লেখা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার মধ্যে নাট্যরস কতকটা ছিল। প্রহসন লিখিলে ভারত বোধ করি তাহাতে বেশ সফল হইতেন। তাঁহার হাড়ে হাড়ে যে রঙ্গরস প্রচ্ছন্ন, তাহা প্রহসনে খুব জমিতে পারিত মনে হয়। তবে গম্ভীর রসে নাটক রচনা করিতে গেলে ভারত কতদূর সফল হইতেন সন্দেহ। তাঁহার ভাবের তেমন গভীরতা নাই, সেই জন্য গাম্ভীর্য্যের তাঁহার বিশেষ অভাব আছে।

ভারতচন্দ্রই প্রাচীন বঙ্গের শেষ কবি। বঙ্গসাহিত্যকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া তিনি আজ সরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু সে জন্য তাঁহার সকল গুণ আমরা বিস্মৃত না হই। কালের অবস্থা বুঝিয়া প্রাচীন কবিদিগের দোষ অনেকটা মার্জ্জনীয়। ভারতচন্দ্রে একালের মত সৌন্দর্য্যজ্ঞান নাই, অসাধারণ কবিত্বও হয়ত নাই, আমাদের রুচিবিরুদ্ধ—বর্ত্তমান সমাজে অপাঠ্য অনেক জিনিষ আছে, কিন্তু তথাপি ভারত বঙ্গসাহিত্যের একজন প্রধান লেখক। বঙ্গসাহিত্য তাঁহাকে অনেকদিন বাঁচাইয়া রাখিবে।

স্নেহলতা।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

কিশোরী মহা অশান্তি হৃদয়ে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। এখন যেন সে কোন রকমে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইল, কিন্তু জীবন আসিলে ত আসল কথা প্রকাশ পাইবে, তাহার জুয়াচুরি ধরা পড়িবে। প্রথমতঃ এই এক মহাভাবনা,—দ্বিতীয়তঃ, কিশোরী যতই স্বার্থপর হউক না, যৌবনের নিস্বার্থতা, দেশহিতেচ্ছা তাহার মনে এখনো জাগরূক, স্বার্থপর প্রবৃত্তিস্রোতে এখনো তাহার হৃদয়ের মঙ্গলভাব একেবারে ডুবিয়া যায় নাই, সুতরাং যে সভার উপর তাহারা এত আশা ভরষা স্থাপন করিয়াছিল তাহার কুবুদ্ধিতে তাহা মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া গেল, এই নিমিত্ত এক অকৃত্রিম অনুতাপ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে যেন পুরাতন সুখের জীবন হারাইয়া ফেলিল; আপনাকে তাহার শত বর্ষের বৃদ্ধের মত উদ্দেশ্য শূন্য ভারাক্রান্ত মনে হইতে লাগিল। বাড়ী আসিয়াই সে কৌচে শুইয়া পড়িয়াছিল, কিছু পরে একবার উঠিল, ডেক্স খুলিল, সম্মুখেই সেই খড়্গ, উঠাইয়া বারকতক নাড়াচাড়া করিল, তাহার পর সেখানা রাখিয়া দিয়া অডি-কলমের শিশিটা হাতে উঠাইল, কিন্তু সহসা আবার তাহা সেইখানেই রাখিয়া ডেস্কের ডালাটা বিরক্ত ভাবে বন্ধ করিয়া কৌচে আসিয়া শুইয়া পড়িল, কিছু পরে হরি গৃহে বাতি দিতে প্রবেশ করিয়া কিশোরীকে দেখিয়া বলিল—"এই যে দাদা বাবু আজ ডাহেন নি কেন? খাবার আনি?

কিশোরী বলিল—"না বকতে হবে না—যা,"

ভৃত্য ভাবিল—বাবু কোন বন্ধুর বাড়ী হইতে খাইয়া আসিয়াছেন, যেরূপ মেজাজ কড়া—বেশী রকম কিছু খাইয়া আসিয়া থাকিবেন,—ভাবিয়া আর উচ্চ বাচ্য না করিয়া চলিয়া গেল। কিশোরী দীপশিখার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। কিশোরী একবার কালীঘাটে গিয়াছিল দীপ শিখাটাকে তাহার কালীর জিহ্বার মত মনে হইতে লাগিল। সেই শিখা হইতে চারিদিকে যে কিরণ কণা বাহির হইতেছে তাহা যেন রক্ত স্রোত, সে যেন সেই রক্তের মধ্যে ডুবিয়া আছে। কিশোরী দীপশিখা হইতে নয়ন অন্যদিকে ফিরাইল, তখন চারিদিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইল না। এই সময় জুতার শব্দ শোনা গেল, চারু তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। চারুও দারুণ বিষণ্ণ—সভার গণ্ডগোল ব্যাপারে তাহারো মনে আজ সুখ নাই। তাহাকে দেখিয়া কিশোরীর আনন্দ হইল, একাকী অনুতাপ কষ্ট বহন করা বড়ই অসহ্য। চারু কিশোরীর নিকটে চৌকিতে বসিয়া বলিল—"কিশোরী বাবু, আপনার কি রাগ করা ভাল হইয়াছিল যখন জীবন বাবু যথার্থই দোষী?"

কিশোরীর ইচ্ছা হইল, তাহাকে সমস্তই মনের কথা খুলিয়া বলিয়া মনের ভার লাঘব করে, কিন্তু সেই সঙ্কোচ! যখন একবার অন্যরূপ বলিয়াছে তখন ঠিক কথা বলিতে সাহস নাই, কিশোরী বলিল—"তুমি কি মনে কর—বন্ধুর নিন্দা শোনা বন্ধুর কাজ? আমি তাহাকে Defend করিব না?"

চারু। কিন্তু সত্য সকল অপেক্ষা অধিক মাননীয়। যখন তিনি সত্যই দোষী—

কিশোরী। দোষী কেন? আমাকে ত তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন—

চারু। কিন্তু টাকা—

কিশোরী। টাকার জন্য কি আটকাইত? আমি কি তা দিতে পারিতাম না?

সে থাক এই মনে কর না কেন তোমার নামে কেহ যদি নিন্দা করে আমি কি চুপ করিয়া থাকিব?"

তাহার নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের ভাব দেখিয়া চারুর হৃদয় প্রশংসাপূর্ণ হইল। বলিল—"তা সত্য। কিন্তু আপনি resign দিলেন কেন?"

কিশোরী। সেজন্য কি ভাবছিস আমার কষ্ট কম হচ্ছে কিন্তু যেরূপ অবস্থা ঘটলো তাতে resign করা ছাড়া কি উপায় ছিল?"

কিশোরী নিজের নিকট যেরূপ করিয়া ভাবিয়া দোষ মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছিল চারুকে তাহাই বলিল, সত্যই যে সমস্তই জ্ঞাতভাবে তাহাকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিল তাহা নহে।

চারু বলিল—"আচ্ছা যা হবার হয়েছে নবীন দাকে বুঝিয়ে বলে যাতে সব চুকে যায় তাই করুন"

কিশোরী। Apology করতে বল, কান মলতে বল, যা করতে বল এখনি করছি—কিন্তু নবীন ত তেমন পাত্র নয়"

চারু। আচ্ছা জীবন দা আসুন—তিনি বুঝিয়ে বল্লে নবীন বাবু বুঝবেন।

কিশোরী। My deer boy—one can give reason—but not understanding—

চারু। কিন্তু নবীনদাকে ত ওরূপ অবুঝ বলে মনে হয় না?

কিশোরী। তোরা কবি লোক, লোকের ভাল দিকটাই কেবল দেখিস।

চারু হাসিয়া বলিল—"ভাল কথা কিশোরী দা, আমার কতকগুলো নতুন কবিতা হয়েছে"

কিশোরী। এনেছিস?

চারু। পকেটে আছে বোধ হচ্ছে? চারু পকেট হইতে কতকগুলা কাগজ বাহির করিল। কিশোরী বলিল—"আচ্ছা আমি কাল পড়িব"। চারুর ইচ্ছা তখনি কিশোরী পড়ে কিন্তু তাহা বলিতে লজ্জা বোধ হইল সুতরাং রাত হইয়াছে বলিয়া

ইহার কিছু পরে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। চারুর সহিত কথায় বার্ত্তায় কিশোরীর এখন প্রথম তীব্র কষ্টের ভাব উপশম হইয়া আসিয়াছিল সুতরাং ক্ষুধারও উদ্রেক হইল। চারু চলিয়া গেলে হরির ডাক পড়িল, আজ হরি কৃপা করিয়া দু এক ডাকেই নিকটে হাজির হইলেন, এবং আহার আনিতে আদিষ্ট হইয়া আবার চলিয়া গেলেন। কিশোরী উঠিয়া আবার ডেক্স খুলিল, খুলিয়া অডিকলমের শিশি মুখে তুলিল, এই সময় চারু আবার গৃহে প্রবেশ করিল। অনেক দিন মোহনের কাছ হইতে স্নেহলতা কোন পত্রাদি পায় নাই। মোহনের খবর জিজ্ঞাসা করিতে আবার সে ফিরিয়া আসিল।

গৃহে আসিয়া কিশোরীর মুখে অডিকলমের শিশি দেখিয়া চারু অবাক হইয়া দাঁড়াইল, কিশোরীও ত্রস্তে শিশি নামাইয়া লইল। কিন্তু সহসা এরূপ লজ্জিত হইয়া পড়িল—যে কোন কথা কহিতে পারিল না, চারুরও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হইল না, বলিল এই বইখান' লইতে আসিয়াছি—বলিয়া টেবিল হইতে একখানা বই লইয়া চলিয়া গেল। কিছু পরে কিশোরী আত্মস্থ হইয়া ডাকিল—"চারু চারু ?" কিন্তু তখন চারু চলিয়া গিয়াছে।

কিশোরীর মনটা আবার বিগড়িয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

"কি ভয়ানক! কিশোরী মদখায়! যেমন তেমন মদ না, অডিকলম—খাঁটি স্পিরিট! তবে ত সে একজন 'বওয়াটে' ছোকরা! তাহার সঙ্গে ত আর তাহা হইলে ভাব রাখা উচিত নয় ?"

চারু চিরকাল মদকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে কিশোরীকে মদ খাইতে দেখিয়া তাহার মন বড়ই চটিয়া গেল, এবং উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে সঙ্কল্প করিয়া বসিল কিশোরীর সাহত আর ভাব রাখিবে না। কিন্তু কিশোরীকে সে সত্যই ভাল বাসিত, কিশোরী বড় সে ছোট—স্ত্রীলোকেরা যেমন পুরুষের উপর নির্ভর করে তাহার ভালবাসার মধ্যে সেইরূপ একটা নির্ভরের ভাব ছিল। সুতরাং সেই সঙ্কল্পের ফলে তাহার সে রাতে ঘুম হইল না, এবং ইহার ফলে একটা কবিতা লেখা হইয়া গেল। কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিবার সময় ভাবিল লিখিবে একরূপ—কিন্তু লিখিয়া বসিল অন্যরূপ। সে ভাবিয়াছিল মদের উপর এমন আক্রমণ করিয়া লিখিবে যে অন্ধমদ্যপায়ী যুবকদিগের তাহাতে সদ্য সদ্য চক্ষু ফুটিবে। কিন্তু বিছানা হইতে উঠিয়া ঘরের একটা জানালা খুলিয়া দিবা মাত্র যখন আশ্বিনের হিমাচ্ছন্ন জ্যোৎস্নালোক তাহার চোখে পড়িল—তখন তাহার মনে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের কবিতার ভাব উদয় হইল। সে লিখিল

শরতের হিমজোছনায়
নিশীথিনী আকুল নয়নে চায়!

বহুদিন পরে যেন, পেয়েছে প্রণয়ী জনে,
অশ্রুর লহরী মাখা সুখের আলোক ভায়!
　　বসন্তের প্রথম বাতাস,
　　সুখের মাঝারে যথা জাগায় হুতাশ!
প্রাণ কেঁদে ওঠে হেরি নিশার ও ম্লান হাসি;
হারান স্মৃতির ছায়া বেড়ায় সমুখে ভাসি।
ও ছায়া কাহার ছায়া? ও মূরতি কার মায়া?
চিনিতে পারিনে যেন চিনি চিনি যত করি?
আকুল ব্যাকুল প্রাণ ধরিবারে আগুয়ান;
যতই ধরিতে যাই ধীরে ধীরে যায় সরি!
বড় যেন আপনার—ছিলরে সে এ জনার,
আজ কি ভাবিছে হেথা পাবে না আশ্রয়?
　　　কাছে এসে তাই কি রে
　　　পর ভেবে যায় ফিরে
ফুটন্ত জোছনা হাসি করি অশ্রুময়?
তাই প্রাণ কেঁদে ওঠে বুঝি এ সময়!

কবিতা লেখা হইয়া গেলে তাহার মনে বড়ই আনন্দ হইল, কিন্তু কাহাকেও ইহা না শুনাইলে এ আনন্দ ত সম্পূর্ণ হইবার নহে! অন্য সময় হইলে কিশোরীর কাছে সে প্রাতঃকালেই ছুটিয়া যাইত—আহা সেদিন এখন ফুরাইল। অন্য লোকাভাবে পরদিন চারু স্নেহলতাকে এই কবিতাটি পড়িয়া শুনাইল।

স্নেহলতা যদিও দ্বাদশ বৎসরের মাত্র কিন্তু সে বাঙ্গলা কবিতা, উপন্যাস যাহা পায় তাহাই পড়ে। বুঝুক না বুঝুক নিজের মনের মত সকলেরি একটা অর্থ করিয়া লয়, ইহারো সে সেইরূপ একটা সাদাসিধা অর্থ ভাবিয়া লইল। কিন্তু পড়া শেষ হইলে চারু যখন জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন হয়েছে। কি বুঝলি!" তখন এই কবিতাটি তাহার এতই গভীর ভাবযুক্ত বলিয়া মনে হইল—যে তাহার বোধ হইল সে কিছুই বুঝে নাই,সে কেবল বিস্ময় ও প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে নিরুত্তর হইয়া তাহার দিকে চাহিল। প্রশংসা নহিলে কবিদের চলে না, চারু ভাবিল বেনা বনে মুক্তা ছড়ান হইয়াছে—সে ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল, কিশোরীর অভাব বড়ই অনুভব করিতে লাগিল।

এইরূপে একদিন গেল, দুই দিন গেল, তিন দিন গেল—কিশোরীর অভাব তাহার উত্তরোত্তর অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল, চতুর্থ দিনে তাহার মনে কিশোরীর নিকট যাওয়ার ঔচিত্য সম্বন্ধে এরূপ অকাট্য যুক্তির উদয় হইল, যে তাহাতে আর ইতস্ততঃ করা তাহার অন্যায় মনে হইতে লাগিল। প্রথম যুক্তি—বন্ধু যদি কোন বন্ধুর দুর্ব্বুদ্ধি

দেখিলে তাহাকে সৎবুদ্ধি প্রদান না করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে তাহা হইলে তাহা কি বন্ধুতার কার্য্য ?

দ্বিতীয়—কিশোরী মদ খাইতেছিল কি অন্য ঔষধ তাহাও চারু জানে না।

তৃতীয়—এ সম্বন্ধে কিশোরীর কি বলার আছে তাহাও ত চারুর আগে জানা উচিত। ইত্যাদি নানা যুক্তি দ্বারা চারু কিশোরীর কাছে যাইবে স্থির—এমন সময় কিশোরী স্বয়ং চারুর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

চারু বাহির বাটিতে তাহার ঘরে একখানি চৌকিতে বসিয়াছিল টেবিলে তাহার সমুখে বই—কিন্তু তাহার দৃষ্টি তাহাতে নাই, সে অন্য মনে দেয়ালের দিকে চাহিয়াছিল কিশোরী আস্তে আস্তে তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া দুই হাত দুই কাঁধে রাখিয়া আদর করিয়া ডাকিল—"কি রে চারু -আর যে যাস নে ?"

চারু আনন্দে উঠিয়া দাঁড়াইল—কিশোরী স্বয়ং এখানে তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছেন ! সমস্ত ভুলিয়া সে বলিল—"আমি এই যাইতেছিলাম।"

"তবে আয়" বলিয়া কিশোরী তাহার হাত ধরিল। সন্ধ্যার সময় কিশোরীর পাঠ গৃহে দুই বন্ধুব আবির্ভাব হইল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

চারুকে দেখিতে অনেকটা জগৎ বাবুর মত। গৌরবর্ণ, নরম নরম ঢল ঢল ভাব। উন্নত কপালে ঘন ঘন চুল এলোথেলো রকমে লতাইয়া পড়িয়াছে। চুলের যেমন পারিপাট্য নাই—কাপড়েরও সেইরূপ। পরিধানে সামান্য ধুতীচাদর আর একটা পিরান মাত্র—সব রকমে সে দেখিতে নিতান্ত সাদাসিদে বালক—গোঁপের রেখা পর্য্যন্ত এখনো তাহার সুস্পষ্ট ঘন হইয়া উঠে নাই। চেহারায়, সাজে সজ্জায় কিশোরী তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কিশোরী ফিট বাবু, গায়ে কোট, কোটের উপর কোঁচান চাদর বাঁধা, পরণে চওড়া পেড়ে বাবুধুতী—কোটে ঘড়িচেন,—পাতলা চুল এমন ফিট করিয়া আঁচড়ান যে একজন মস্তকতত্ত্ববিৎ তাহার মাথা দেখিয়া সহজেই তাহার স্বভাব বর্ণনা করিতে পারেন। তবে শিরোবিজ্ঞানবিদের সূক্ষ্ম দর্শন আমাদের নাই ; পাঠককে আমরা কিশোরীর স্বভাবের সূক্ষ্ম সমালোচনা দিতে পারিলাম না ; কেবল এইমাত্র বলিতে পারি, যে কিশোরীর মাথায় মুখে বুদ্ধির অভাব নাই কিন্তু সে বুদ্ধিতে যেন উদারতার অভাব, তাহা যেন করুণ কোমল ভাবে সিঞ্চিত নহে।

কিশোরীর বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, মুখাবয়ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হউক তথাপি কিশোরী সুশ্রী। তাহার নবীন শ্মশ্রুজাল শোভিত ওষ্ঠাধরে—শ্বেত সুন্দর দন্তে ও মনোহর হাসিতে কিশোরী সুশ্রী। কিশোরীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও এই হাসির মাধুর্য্যে কোমল বলিয়া মনে হয়।

কিশোরী চারুর কবিতা শুনিয়া বলিল "কি সুন্দর ! শুনে আশ মেটেনা—অনেকটা সেলির মতন, অনেকটা কেন আমি ঠিক যেন সেলির একটি কবিতা শুনছিলুম।"

কিশোরী যে সেলির কবিতা বেশী পড়িয়াছে তাহা নহে, তবে জীবন ও নবীনের কাছে তাহার সমালোচনা অনেক শুনিয়াছে। চারুর আহ্লাদ আর ধরিল না, কিশোরী আবার বলিল—"সেলির নাইটিংগেল পড়েছ ? কি Ideal—আমাদের ভাষাতে যে ওরূপ Ideal কবিতা বার হতে পারে তা আগে আমার মনে হোত না!

"ও ছায়া কাহার ছায়া ? ও মূরতি কার মায়া--

চিনিতে পারিনে কেন চিনি চিনি যত করি ?" excellent !

চারু বলিল "কিশোরী দা—আমার অনেক সময় ঠিক ঐ রকম feeling হয়, যেন কাকে জানি, কে যেন আমার অতি কাছে অথচ তাকে ধরতে পারছিনে —"

কিশোরী। Uncommon celebration আর কি ?"

নবীনের নিকট কিছু দিন পূর্ব্বে unconscious cerebration কথাটি শুনিয়া পর্য্যন্ত সে উহা ব্যবহারের সুবিধা খুঁজিতেছিল—কিন্তু দুঃখের বিষয় আপাততঃ তাহার ঠিক কথা দুইটি মাথায় আসিল না। যাহা হউক তাহাতে কোন ক্ষতি হইল না, চারুর নিকট সে ইহাতে ধরা পড়িবে না। চারু বলিল— 'কিশোরী দা কেন বলদেখি আমার ওরূপ হয় ?"

কিশোরী। কবিদের ত এই রকমই হয়, সেলির সঙ্গে দেখছি তোমার আশ্চর্য্য মিল, চেহারাও কি অনেকটা তোমার সেলিরি মতন —যেন প্রকৃতির বালক !"

কিশোরী যে নিতান্তই খোসামোদ করিয়া এরূপ কহিল তাহা নহে, চারুর কবিত্ব সে এতটা প্রশংসা দৃষ্টিতে দেখিত যে ক্রমে তাহা হইতে তাহার চক্ষে চারু সত্যই সেলি হইয়া পড়িয়াছিল। নিকটে আয়না ছিল না—চারু নিজের মুখ পরীক্ষা করিতে পারিল না, কেবল নীরব হাসিতে আনন্দ প্রকাশ করিল।

কিশোরী বলিল—"চারু তোর সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে—এত দিন আসিস নি কেন ?

চারু স্পষ্ট উত্তর করিতে পারিল না—বলিল "হয়ে ওঠেনি—কিশোরী দা!

কি। হয়ে ওঠেনি! আমার কাছে ঢাকছিস্ ? তুই আসল আমাকে মাতাল ভেবেছিলি কেমন ?

চা। তা ঠিক নয়—কিন্তু ও সব খাও কেন কিশোরী দা!

কি। তুই-ত আচ্ছা—আমি বুঝি রোজ খাই। এক দিন একটু খেলে কি রোজ খাওয়া হোল! ঔষধার্থে সুরাপান এত শাস্ত্র কথা।

চা। তোমার ত ব্যাম হয়নি ?

কি। এই ত অন্যায়। কি করে জানলি ব্যাম হয়নি, আমি তখন মাথার কষ্টে মরে যাচ্ছিলুম।

চা। কিন্তু ঐরূপ করে অভ্যাস হয়ে যেতে পারে—

আচ্ছা for argument's sake ধরে নে—আমি নিয়মিত একটু খাই—আমার অভ্যাস হয়েছে তাতেই বা দোষ কি? এই ত ইংরাজেরা রোজ নিয়মিত খায়, তারা কি কাজের বার হয়? এ কেবল prejudice বইত নয়!

চারু। ক্রমে নিয়মের মাত্রা বাড়বে। আমাদের দেশে ঐ রূপে কত লোক উচ্ছন্ন গেছে।

কি। সে ত আমার হাত, আমার উপর তাহলে তোর অতটুক বিশ্বাস নেই। বোঝা গেছে। আমাকে তুই নিতান্ত বওয়াটে ভাবিস।

চারু মুস্কিলে পড়িল—বলিল "না না কিশোরী দা তা নয়—"

কি। আর না না বোঝা গেছে। তাহলে আমি নিতান্তই মাতাল, ঘৃণ্য, দুশ্চরিত্র এই ভাবিস?

চা। না কিশোরী দা—"

কিশোরী উঠিল, উঠিয়া ডেক্স খুলিয়া শিশি বাহির করিয়া বলিল—

"তোকে লুকাইব না এই দেখ আমার রহিয়াছে—যখন বড় অসুখ বোধ হয় কখনো কখনো খাই, তাহলে আমি মাতাল?

চারু। মাতাল না—কিন্তু না খেলেই ভাল"—

কি। মন্দ কি আগে আমাকে বোঝা—তাহলে আমি কখনো স্পর্শ করব না,—আচ্ছা আমি এই তৈরি করলুম—তুই খেয়ে দেখ—যদি বুঝিস মন্দ ফল হয়—তা হলে আমাকে বলিস"—

চারু ভীত হইল, বলিল—"না কিশোরী দা মাপ কর"

কি। তবে আমি নিতান্তই drunkard, blaggard কেন না মদ ছুঁতে আমার prejudice নেই।

চা। না না—তা নয়।

কি। তা না ত কি—আমি পাজি—আমি নচ্ছার।

চা। তা কে বলে?

কি। তার মানেই তাই।

চারু বলিল—না দাদা আচ্ছা আমি চেকে দেখছি।

চারু জিহ্বাগ্রে পানীয় স্পর্শ করিয়া গ্লাশ রাখিলে কিশোরী বলিল—

"এ কি হোমিওপ্যাথি ওষুধ! My dear friend সবটা খা, আমি assure করছি তুই অধঃপাতে যাবিনে। অন্ততঃ আমি কিরূপ অধঃপাতে গেছি সেটা পরীক্ষার জন্যও একদিন খেয়ে দেখ।"

চারু অগত্যা সমস্তটা পান করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু কিশোরী অতি অল্প মাত্রাতেই পানীয় প্রস্তুত করিয়াছিল সুতরাং চারু ইহার মন্দ ফল কিছুই বুঝিতে

পারিল না। কেবল একটু পরে তাহার মনে অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি বোধ হইল। তাহার মনে হইল আজ সে অনেক কবিতা লিখিয়া ফেলিতে পারে। সে বলিল "কিশোরী দা আচ্ছা তুমি কি feel কর যে তোমার মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যেন জ্যোস্না হয়ে যায়? আমি—

কি। তা আর করিনে? কিন্তু একলা জ্যোৎস্না ভোগ করতেও আরাম নেই, তাই তোকে চাই।

জাতি সমূহের অভ্যুদয়।

এ বিশ্বসংসার এক বিশাল সংগ্রাম ক্ষেত্র—এখানে প্রত্যেকেই আপন আপন আত্মীয় স্বজনের বিনাশ সাধনে সর্ব্বদা তৎপর রহিয়াছে। পর্ব্বতশিখরে সাগরগর্ভে আকাশ মার্গে—জলে স্থলে সর্ব্বস্থানেই এই সংগ্রাম ক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। পিতা সন্তানের প্রতিদ্বন্দী, ভ্রাতা ভগিনীর প্রতিদ্বন্দী; সকলেই জিঘীসা পরবশ হইয়া এই অনন্ত সংগ্রাম সাগরে সন্তরণ দিতেছে। চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রতি মুহূর্ত্তে, উচ্চে, নীচে চতুস্পার্শ্বে এক হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিতেছেন। এই জীব কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া যুগপৎ তাঁহার হৃদয় আতঙ্ক ও বিস্ময়ে আন্দোলিত হইতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ভয়ানক ব্যাপারের ফল অতিশয় কমনীয় অতিশয় মনোহারী। যে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য দর্শনে কবি প্রাণের আবেগে নীরব হইয়াছেন—যাহা দেখিয়া তাঁহার অসীম প্রাণ অসীমের অসীমত্বে ডুবিয়া গিয়াছে তাহা এই হৃদয় বিদারক অনন্ত জীবন সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র। এ সকল বিষয় আমরা গত দুইবারে বিশদ রূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন দেখা যাউক জাতি সমূহের উৎপত্তি বিষয়ক তত্ত্বানুসন্ধানে ইহা আমাদিগকে কোন রূপ সাহায্য করিতে পারে কি না।

হাম্‌বোল্ট (Humboldt) ও কারপেণ্টার সাহেবের হিসাবানুসারে দেখা যায় যে প্রায় বিংশতি লক্ষ প্রাণী জগতে বিচরণ করিতেছে এবং তাহারা লক্ষাধিক জাতিতে বিভক্ত। এই জাতি সমূহ যে কি রূপে সৃষ্ট হইল তাহা কেহ কখন দেখেন নাই। প্রাচীন ইতিহাসের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত কেহ কোন একটি জাতিকে সৃষ্ট হইতে দেখিয়াছেন বলিয়া তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়েও প্রায় প্রতি বৎসরই এক একটি নূতন জাতির আবিষ্কার হইতেছে, অথচ তাহারা কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিতেছে, তাহা কেহই প্রত্যক্ষ করিতেছেন না। আবার সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল জাতির বিষয় ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এক্ষণে জগৎ সংসার হইতে অপসৃত হইয়াছে। কত অগণিত জীব শ্রেণী যে দুদিনের জন্য

এ পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া আবার অন্তর্হিত হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? তাহারা আসিলই বা কেন আবার চলিয়াই বা গেল কেন? বহু দিন ধরিয়া এ প্রশ্ন অজ্ঞেয় বলিয়া স্থিরীকৃত ছিল। যাহারা এ প্রশ্নের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ভয়ানক লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে; এবং অনেক স্থলেই তাঁহারা আপনাদিগের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে জাতীয় অভ্যুদয় সম্বন্ধে আমরা দুইটি বিরোধিমত প্রচলিত দেখিতে পাই। একটি ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্ম পুস্তক সকলের কুসংস্কার হইতে উদ্ভূত; অপরটি বিজ্ঞানের বহু আয়াস সাধ্য উন্নত অবস্থার আনুসঙ্গিক ফল মাত্র। মানব মণ্ডলির অধিকাংশই প্রথমোক্ত মতাবলম্বী। তাহাদের মধ্যে কেহ বা সৃষ্টির আদি হইতেই বিভিন্ন জাতীয় প্রাণী সকল সৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, অপর কেহ বা অভাবানুযায়ী বিশেষ বিশেষ সময়ে তাহারা সৃষ্ট হইয়াছে এই বিশ্বাস করেন। দ্বিতীয় মতটি কেবল বিজ্ঞানবিদ্দিগের মধ্যেই প্রচলিত। বাস্তবিকই বিষয়টি এত দূব বিজ্ঞান সাপেক্ষ যে, জনসাধারণের পক্ষে তাহাতে আস্থা স্থাপন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকের ইহাতে জাতক্রোধ দেখিতে পাওয়া যায়। যে মনুষ্য জাতি আজি সমুদয় জীব জগতের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, যাহার বুদ্ধি বলে তাড়িৎ প্রভৃতি মহা শক্তি সকল ক্রিড়া কন্দুক রূপে পরিণত হইয়াছে, তাহারাই আবার নিকৃষ্ট জাতি সকল হইতে উদ্ভূত ইহা কি কখন সম্ভবপর? কিন্তু একটু বিবেচনা সহকারে দেখিলেই বুঝা যায় ইহাতে আমাদের জাত্যাভিমান বিন্দুমাত্রও খর্ব্ব হইতেছে না। কানাকে কানা বলিলে যে রূপ রাগ হয় ইহাও সেইরূপ। কৃষ্ণদাস পাল তেলির ঘরে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া কি তাঁহার মান্যের কিছু তারতম্য ঘটিয়াছিল? মহাকবি কালিদাসের কবিত্বের প্রশংসা করিবার জন্য কে কবে তাঁহার বংশলিপির অনুসন্ধান করিয়া থাকেন? উনবিংশশত বৎসর পূর্ব্বে যে সূত্রধর-সন্তান সমুদয় ধর্ম্মজগতের মধ্যে মহা হুলস্থুল বাধাইয়াছিলেন—যাহার চরণতলে আজিও জগতের এক তৃতীয়াংশ নরনারী লুণ্ঠিত—যাহার নাম একবার উচ্চারিত হইলে আজিও লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ একত্রে নিনাদিত হইয়া উঠে, তাহার বংশ-মর্য্যাদা কোথায় ছিল? যাহা হউক বর্ত্তমান শতাব্দির প্রায় সমুদয় বিজ্ঞানবিদই একমত হইয়া বলিয়াছেন যে সামান্য সামান্য জীব সকলের ক্রমাভিব্যক্তি হইতেই উন্নত জীব সকলের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ইহাই বিবর্ত্তনবাদ বা ক্রমাভিব্যক্তি বাদ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে।

সমুদয় জীব জগত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে*। আমরা যখন

*Protozoa, Porifera, Coebuterata, Echinodermata, vermis, Arthropoda, Moluscoidea, Mollusca and Vertebrata are the sub-kingdoms that constitute the animal world.

এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে পদার্পণ করি, তখন দেখিতে পাই যে প্রথম রাজ্যে যে সকল জৈবনিক কার্য্য অপরিস্ফুট ছিল দ্বিতীয়টিতে তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে এবং তৃতীয় রাজ্যের কার্য্য সকলেরও তাহাতে এক একটু আভাস পাওয়া গিয়াছে। এইরূপে আমরা যতই অগ্রসর হই ততই দেখিতে পাই যে এক আশ্চর্য্য শৃঙ্খলে সমুদয় জীব জগত বাঁধা রহিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে যাইবার কালীন কতকগুলি মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী (Intermediate orders) বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা উভয় রাজ্যেরই বিভিন্নতা কতক পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া উভয়ের মধ্যে এক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। তাহারা পূর্ণতাপ্রয়াসী জীব সকলের গন্তব্য পথে সোপানাবলীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে;—এই সোপানাবলী পার হইলেই তাহারা এক নূতন এবং উন্নত রাজ্যে প্রবেশ করিবে। মৎস্য ও উভচর (amphibions) দিগের মধ্যে যে কত পার্থক্য তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু (Dipnoi) নামক এক প্রকার মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগকে মৎস্য বলা যাইবে কি উভচর বলা হইবে তাহা লইয়া প্রাণীতত্ত্ববিদ্দিগের মধ্যে এক মহা আন্দোলন চলিতেছে। মৎস্যের ন্যায় ইহাদের ডানা আছে, আঁইশ আছে ফুলকা (gills) আবার ভেকের ন্যায় ফুস্‌ফুসি (lungs) আছে, এবং তাহাদের হৃৎপিণ্ড ত্রিফোটক (three-chambered)। * এইরূপে দেখা যায় যে প্রত্যেক দুইটি শ্রেণীর মধ্যেই প্রায় এক একটি মধ্যবর্ত্তী জাতি বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহারাই উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জাতি সকলের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে। তবে সকল সময়েই যে ব্যবহিত জাতি সকলের নির্দ্দেশ পাওয়া গিয়াছে তাহা নহে। জীব রাজ্যের সোপানাবলী, জীবন সংগ্রামের প্রকোপে স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, যে শৃঙ্খলে সমুদয় প্রাণিরাজ্য বাঁধা রহিয়াছে তাহা স্থানে স্থানে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠে যাহা পাইলাম না ভূগর্ভে ও কি তাহার আশা নাই? আজিও অনেকানেক মধ্যবর্ত্তী জাতির কঙ্কাল রাশি রাশি ভূগর্ভে স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও তাহাদের অস্থি সকল ভূগর্ভে প্রোথিত থাকিয়া যুগ যুগান্তর ধরিয়া যে জীবন সংগ্রাম চলিতেছে তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সকলের মধ্যেও কি আমরা আমাদের লুপ্ত শৃঙ্খলার পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইব না? বিবর্ত্তনবাদীরা বিশ্বাস করেন যে উরগ জাতি সকলের ক্রমোন্নতি ও ক্রমাভিব্যক্তি হইতেই পক্ষীকুলের উৎপত্তি হইয়াছে একটি অপরটির রূপান্তর মাত্র। কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত ইহাদের মধ্যবর্ত্তী জাতি সকলের কোন বিশেষ তত্ত্ব নিরূপিত হয় নাই, ভূপৃষ্ঠ হইতে ইহাদের স্মৃতি চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত

* সাধারনতঃ সকল মৎস্যের হৃৎপিণ্ড দ্বিফোটক (two-chambered) এবং তাহাদের মধ্যে ফুস্‌ফুস্ অবর্ত্তমান থাকে; ফুল্‌কা দ্বারাই তাহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস সম্পন্ন হইয়া থাকে।

হইয়া গিয়াছে। বিবর্ত্তন বাদের বিরোধিগণ ইহাতে কিছু স্ফীত হইয়া উঠেন, এমন কি তাঁহাদের প্রধান যুক্তি স্বরূপ তাহারা এইটিরই আবৃত্তি করিতেন। প্রতিপক্ষগণের মধ্যেও কেহ কেহ কিছু নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু সত্যই চির-কাল জয়যুক্ত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ভূতত্ত্ববিদ্‌দিগের বহু আয়াসে কয়েকটি লুপ্তশ্রেণী-জীব-কঙ্কাল রাশির পুনরুদ্ধার সাধিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে টেরো-ড্যাকটাইল (Pterodactyl) নামক এক প্রকার জীব এক সময়ে এই পৃথিবীতে বিচরণ করিত। ইহাদের আকৃতি বাদুড়ের ন্যায়। সরোরি (saurori) নামক এক প্রকার জীবের অবশিষ্টাংশ পাওয়া গিয়াছে ইহাদের লাঙ্গুল সরীসৃপের ন্যায় কিন্তু পক্ষীর ন্যায় তাহা পালকে শোভিত। ইহারাই যে সরীসৃপ ও পক্ষীর মধ্যবর্ত্তী জাতি তাহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। ভূগর্ভ মধ্যেই যে, সমুদয় ব্যবহিত জাতি সকলের নির্দ্দেশ পাওয়া গিয়াছে তাহা নহে। কিন্তু তাই বলিয়া হতাশ হইবারও কারণ নাই। এই অনন্ত প্রসারিত ধরণীর মধ্যে অতি তিলার্দ্ধ মাত্র স্থানেই ভূতত্ত্ববিদের অনুসন্ধান পরিবদ্ধ রহিয়াছে। কত অগণিত সাগর উপসাগর, কত দেশ মহাদেশ, কত উপত্যকা, কত পর্ব্বত আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে যেথানে ভূতত্ত্ববিদ্ কখন পদার্পণও করেন নাই। অতি অল্প দিন ও অতি অল্প স্থানব্যাপী অনুসন্ধানে যেরূপ ফল লাভ হইয়াছে তাহাতে এরূপ আশা করা যাইতে পারে যে ভবিষ্যতে অতি মহান সত্য সকল উদ্ভাষিত হইয়া আমাদের ভ্রম ও কুসংস্কার সকল উৎপাটিত হইয়া যাইবে। যুগ যুগান্তর ধরিয়া ভূপৃষ্ঠে যে সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহার ইতিহাস পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে সমুদয় জীব রাজ্য একই সময়ে সৃষ্ট হয় নাই। এই সকল পরি-বর্ত্তনকে ভূতত্ত্ববিদেরা ৪টি প্রধান যুগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই সকল যুগের প্রত্যেক-টিতেই কতকগুলি স্তর বিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম যুগের অতি নিম্নতম স্তর সকলে (Devonian, Parthian, Cambrian) কেবল প্রস্তর ও প্রবালাদি অতি নিকৃষ্টতম প্রাণী সকলের অবশিষ্টাংশ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সিলিউরিয়ান (Silurian) নামক স্তরে মৎস্য জাতীয় কঙ্কাল পাওয়া যায়। ২য় যুগে ট্রসিক (Transic) নামক সর্ব্বোচ্চ স্তরে উরগ জাতির ন্যায় উন্নত জীব সকলের কঙ্কাল রাশি দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। ৩য় যুগে পক্ষী ও স্তন্যপায়ীদিগের স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে দেখা যায়; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত মনুষ্য জাতির কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় না। অবশেষে যথন আমরা ৪র্থ অথবা বর্ত্তমান যুগে আসিয়া উপনীত হই তথনই কেবল মনুষ্য জাতির পৃথিবীতে অব-তীর্ণ হইবার চিহ্ন সকল দৃষ্টি পথে পতিত হইতে থাকে। এই সকল দেখিয়া কি স্পষ্ট বুঝা যায় না যে আমরা অতি অল্প দিনই পৃথিবীর রাজা হইয়াছি? এবং আমরাই যে চিরকাল এই রাজত্ব উপভোগ করিব তাহারই বা প্রমাণ কি? হয়ত সহস্র শতাব্দি পরে এমন এক জাতির জীবের আবির্ভাব হইবে যাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি আমা-

দিগের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, যাহাদের সমাজ আমাদের অপেক্ষা স্বতন্ত্র এবং চিন্তা-শক্তি অনেকাংশে পরিমার্জ্জিত হইবে। ইহা দ্বারা এরূপ বলা হইতেছে না এক নূতন জাতি সৃষ্ট হইয়া আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবে। আমাদিগের মধ্য হইতেই তাহার উৎপত্তির সম্ভাবনা— আজিকার তুমি আমিই ভবিষ্যতের নূতন জীব।

ক্রমশঃ।

ক্ষণিক শূন্যতা।

জীবনের এক একটা দীর্ঘ পরিচ্ছেদের উপসংহারে আসিয়া আমরা খানিকক্ষণ শূন্য-দৃষ্টিতে আকাশের পানে তাকাইয়া থাকি—অতীত খুঁজিয়া পাই না, ভবিষ্যৎ প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়—হৃদয়ের গভীর অন্তঃপুর হইতে অজ্ঞাত অতৃপ্তির মত একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস উঠিয়া মিলাইয়া যায়। কি যেন অনির্দ্দেশ্য রহস্য-ভাবের মধ্যে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে—তাহার রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, কেমন অবশ ঔদাস্য আচ্ছন্ন করিয়া থাকে; আমরা কিছুই ঠাহরাইয়া উঠিতে পারি না। ক্রমে সে নিস্তব্ধ শূন্যতা শান্ত হইয়া আসে, ধীরে ধীরে ভবিষ্যতের কুজ্ঝটিকার মধ্যে নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হয়। তখন দূর অতীতের পানে চাহিয়া দেখি, যৌবনের বন্যায় সেখানে নৈরাশ্য নিরুদ্যম মুহূর্ত্তের অধিক টিঁকিতে পারে নাই, প্রবলবেগে কোন্ উত্তুঙ্গ গিরিশিখর হইতে আশার স্রোত বহিয়া আসিয়া জীবনের মরুভূমি প্লাবিত করিয়াছে; সেখানে কেবলই স্বাধীন বিহঙ্গের আনন্দ-গীতি, কনক-কান্তি কুসুমের তরঙ্গায়িত সৌরভ, বিকশায়মান জীবনের দুর্দ্দম্য স্ফূর্ত্তি। সে কল্পনাময় ছায়া-দৃশ্য আমাদের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বসে; সম্মুখে চাহিয়া আমরা তেমন আনন্দ উপভোগ করিতে পারি না। যে সকল পরি-চ্ছেদের মধ্য দিয়া জীবন চলিয়া গিয়াছে সেইগুলিই চক্ষের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইতে থাকে—ভবিষ্যৎ পরিচ্ছেদে যথেষ্ট আলোকাভাবে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না।

কিন্তু জীবনের এই অতীত এবং ভবিষ্যৎ পরিচ্ছেদের সন্ধিস্থলে আমাদের জন্য গোটাকতক শূন্য মুহূর্ত্ত হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে কেন? কয় মুহূর্ত্ত আমরা আপ-নাকে আপনার মধ্যে অনুভব করি না, জীবনের উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যে ভুলিয়া থাকি। বোধ হয়, সেই কয় মুহূর্ত্তে অজ্ঞাতসারে সমস্ত অতীত আসিয়া আমাদের নিকট জড় হয়—সমস্ত পরিচ্ছেদের ঘটনা-বৈচিত্র্য ছায়ালোকের সামঞ্জস্যে ফুটিয়া উঠে। যতক্ষণ আমরা কোন বিশেষ পরিচ্ছেদে ব্যস্ত থাকি, তাহার মর্ম্ম সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। পরিচ্ছেদ-শেষে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একবার তাহার প্রত্যেক তরঙ্গ-ভঙ্গ অনুভব করা

আবশ্যক। এই অবস্থায় কয় মুহূর্ত্ত যেন ঘুমঘোরে কাটিয়া যায়। তাই কেমন শূন্য শূন্য ঠেকিতে থাকে।

এই ক্ষণিক শূন্যতা নহিলে কিন্তু চলে না। ইহার মধ্যে জীবনের ধারাবাহিকতা প্রচ্ছন্ন। সমগ্র জীবনের ঘটনার শৃঙ্খলা অনুভব করিতে হইলে কয়েক মুহূর্ত্ত ত অবসর চাই। নহিলে গুছাইয়া লওয়া বড় দুরূহ। আমরা উপসংহারে পঁহুছিয়া পরিচ্ছেদ বুঝিয়া দেখি—আমাদের সকল কল্পনা, আশা, উদ্যম, নৈরাশ্য পরে পরে সাজাইয়া লই। কিন্তু ইহা এমনি নীরবে সম্পন্ন হয় যে, কয মুহূর্ত্তের মধ্যে সমগ্র পরিচ্ছেদ বিশ্লেষণ ঠাহরাইয়া উঠা যায় না। সহস্র ঘটনার মিলন বিরহে আচ্ছন্ন হইয়া খানিকক্ষণ আমরা অকূল পাথারে ধ্রুবতারাহীনের ন্যায় চারিদিকে চাহিয়া দেখি, ক্রমে সকল ঘটনা থিতাইয়া আসিলে আমাদেরও শূন্যভাব ঘুচে।

মানব-জীবনের মধ্যে মধ্যে এইরূপ ক্ষণিক শূন্যতায় তাহার অতৃপ্তির ভাবের বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের জীবনে তৃপ্তি কোথায়? তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া অতীতের সান্ত্বনা, পদতলে ভবিষ্যতের কি জানি-কি। পশ্চাতে কেবল একটা দূর—অতিদূর দূর মাত্র; সম্মুখেও তাই—শুধু কেবলই একটা সীমাহীন মহাদূর। চতুর্দ্দিকের এই অসীম বিস্তৃতির মধ্যে আপনার ক্ষণভঙ্গুরত্ব লইয়া কে পরিতৃপ্ত হইবে? আমরা সমস্ত জগতের সহিত জীবনের প্রবাহ অনুভব করিয়া আকুল হইয়া উঠি, স্তম্ভিত হইয়া থাকি; কখনও আশায়, কখনও নৈরাশ্যে আমাদের অতৃপ্তি।

শূন্যতায় জীবনের দুই পরিচ্ছেদের মধ্যে মিলন সঙ্ঘটিত হয়। শূন্যতা ত আর কিছুই নহে—পরিচ্ছেদান্তে বিরাম মাত্র। সময় সময় পরিচ্ছেদ বিশেষের মধ্যে কমা সেমিকোলনে আসিয়াও সব কেমন শূন্য শূন্য ঠেকে। এক একটা পদ সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না, কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে থাকে, সেই পদগুলি আয়ত্ত হইতে একটু সময় যায়। কমা সেমিকোলনের পর সেই সময়টুকুই শূন্য। এইরূপ শূন্যতায় পদের অথবা পরিচ্ছেদের অর্থ বোধ বেশ পরিষ্কার হয়। অনেক সময় আমাদের অন্যমনস্কতার ফলেও শূন্যতার আবির্ভাব। হয়ত পদবিশেষে সম্পূর্ণ মনোযোগ করা হইল না; সে পদটী সুতরাং পূর্ব্বের সহিত পরপদের সম্বন্ধ ব্যক্ত করিতে পারে না। আমরা পূর্ব্বের সহিত পরের যোগ দেখিতে পাই না। তখন একটু চোখ বুজিয়া ভাবিয়া লইতে হয়। স্থির হইতে না পারায় এই কয় মুহূর্ত্ত শূন্যের মত চলিয়া যায়। কিন্তু এই শূন্যতার মধ্যে ভাব আয়ত্ত হইয়া আসে। সেই জন্যই ত শূন্যতা পূর্ব্বের সহিত পরের যোগ রক্ষা করে।

ভাব আয়ত্ত হইলেই আমাদের শূন্যতা ঘুচিয়া যায়। আয়ত্ত হইবার অবস্থাতেই হৃদয়ের মধ্যে কেমন একটা অন্তর্লীন চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহাতেই শূন্যতা। এই অবস্থায় হৃদয় যেন অবশ হইয়া আসে, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা চেষ্টাভাব আছে। তাহা ঠিক ধরা যায় না। শূন্যতায় তীব্র আকুলতার ভাব।

কিন্তু এই শূন্যতার পশ্চাতে যেরূপ আনন্দ সম্মুখে সে রূপ নহে কেন? শূন্যতা শান্ত হইয়া আসিলে আমরা অতীতের পানে চাহিয়াই সুখ লাভ করি। কারণ বোধ হয়, সেখানে জীবনের সহস্র বিপ্লবের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাই। সেখানে কত ঘটনা ঘটিয়াছে, কত উদ্যম, কত কাতরতা জাগিয়া আছে, তাহার উপরে কল্পনার বিচরণ করিবার ক্ষেত্র প্রশস্ত। ক্ষণিক শূন্যতায় সেখানকার ঘটনাগুলি বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। ভবিষ্যতের রাজ্যে সকলই অস্থির—কল্পনার সঙ্গে আশা নয় নৈরাশ্য। পশ্চাতে কেবল মাত্র স্মৃতির আনন্দ।

ক্ষণিক শূন্যতায় জীবন-কাব্যের মধ্যে উপসংহারের প্রধান ভাব সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। বাস্তবিক, দীর্ঘ জীবনে মধ্যে মধ্যে শূন্যতাই তাহার ভাবের একতা বজায় রাখিয়াছে। শূন্যতার জন্য আমরা জীবনের বৈচিত্র্য উপভোগ করিতে সমর্থ হই। নহিলে সমগ্র জীবন হয়ত আমাদের নিকট জড়বৎ অনুপভোগ্য হইয়া থাকিত। অন্ততঃ আমরা এমন ভাবে তাহার সামঞ্জস্যময় বৈচিত্র্য উপলব্ধি করিতাম না। মাঝে মাঝে দাঁড়ি পাইয়া আমাদের অনেক সুবিধা হইয়াছে। শূন্যতায় এক একটা ছেদ।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কোথা মা ?

কোথা মা, কোথা মা, শান্তি রাণি!
অনন্ত তৃষ্ণায় প্রাণ　　হয় বুঝি অবসান,
ঢেলে দে মা শান্তি-সুধা আনি।

দুর্গম পর্ব্বতে এ যে অরণ্যে হারানু পথ,
সম্মুখে অনন্ত গুহা অন্ধকার ভবিষ্যৎ,
জ্যোতিশূন্য তাপরাশি যেন মা গ্রাসিতে আসি
আপনার দিকে লয় টানি।

কি ঘোর নেশায় মেতে কি এক স্বপন ভরে,
অসুখের মাঝে যেন হটেছি সুখের তরে,
পদে পদে দুঃখ সহি,　　তবুও নিবৃত্ত নহি,
কি রহস্য কিছু ত না জানি।

যে দিকে নিরখি মা গো চারিদিকে কোলাহল,
অমৃত লভিতে গিয়ে তুলে আনি হলাহল,
এত লোক কয় কথা, বুঝিতে না পারি কোথা,
দেখিতে না পাই জনপ্রাণী।

ভাঙ্গি পড়ে গিরি-চূড়া যেন শত বজ্রাঘাতে,
মাঝে মাঝে শুনি ধ্বনি কাঁপে মা হৃদয় তাতে,
ভয়ে সারা হই প্রাণে, শুনিতে না পাই কানে
আশার অমৃতময় বাণী।

পেলে মা করুণা-বিন্দু দুখ-সিন্ধু যাব ভুলে,
বারেক বিপন্ন দেখে চাহ গো মা মুখ তুলে,
আমি ও চরণে ধ'রে　দেখি মা হৃদয় ভ'রে
স্নেহমাখা তোর ও মুখানি।

তা হ'লে ছাড়িব মা গো কর্ম্ম কর্ম্মময় ভবে,
জীবনের লীলা মোর যেথা শেষ হয় হবে,
পূজে মা প্রতিমা তোর জীবন করিব ভোর
না ছাড়িব চরণ দুখানি।

স্ত্রীলোক ও পুরুষ

এই পরিবর্ত্তনশীল উনবিংশ শতাব্দীতে পুরাতন প্রথা ও আচার ব্যবহার সকল যেমন দ্রুতবেগে এক দিক দিয়া বিলোপ পাইতেছে, সেইরূপ নানা প্রকার নূতন রীতি নীতি অন্য দিক দিয়া সকল সভ্য দেশেরই সমাজ ও কাজকর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতেছে। কিন্তু শিক্ষিত ও মার্জ্জিত লোকদের মধ্যে সংসারে স্ত্রীলোকের পদ ও স্ত্রীপুরুষ জাতির পরস্পর সম্বন্ধ লইয়া যে মহা আন্দোলন, তাহাতে মানব সমাজের মূলে যেরূপ ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে এরূপ অন্য কিছুতে নহে। ঐ উভয়জাতির সম্বন্ধ স্বভাবের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, এই ভাবিয়া বহুদিন ধরিয়া লোকে নিশ্চিন্ত রহিয়াছিল, ও ঐ সব গুরু বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বা উহা লইয়া তর্কবিতর্ক করিতেও সাহস পাইত না। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল, অন্যান্য পুরাতন রীতিনীতির ন্যায় উক্ত বিষয় লইয়াও এখন সকলেই নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে তর্ক করিতে প্রস্তুত। সংসারে নারী-জাতির পদ ও অধিকার লইয়া সমস্ত সভ্য জগতে এক মহা আলোড়ন উঠিয়াছে; আর ঐ আলোড়ন প্রভাবেই সর্ব্বত্র স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির নানা উপায় খোলা হইয়াছে; অনেক দেশে নারীরা ডাক্তার, কেরাণী ইত্যাদি পদে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইয়াছে, এবং বিবাহ ও স্ত্রী সম্বন্ধীয় আইনেরও সংশোধন ঘটিয়াছে। আর আমাদের ভারতবর্ষেও যে নূতন স্ত্রীজীবনের সঞ্চার, তাহাও ঐ মহা আন্দোলনেরই ফল। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে সমগ্র জগতে নারীজাতির অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক উন্নত হইয়াছে।

কিন্তু রমণীকুল ও তাঁহাদের হিতৈষীগণ ঐ সকল শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতকার্য্য হইলেও গুরুতর অনিষ্টকারী বিপক্ষ মত সকল এখনও আমাদের উচ্চগতির পথ আটক করিয়া রহিয়াছে। ঐ বেড়া ডিঙ্গাইয়া নারীজাতিকে পুরুষজাতির সঙ্গে এক পদে বসাইতে যে কত তর্ক, কত বিবাদ, কত পরিশ্রম, ও কত সময়ের আবশ্যক হইবে তার ঠিক নাই। আজকাল স্ত্রীজাতির সাধারণ শিক্ষা ও উন্নতির প্রতি পুরুষদের ঘৃণা বা উপহাসের ভাব চলিয়া গিয়াছে কিম্বা যাইতেছে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে এক ভয়ঙ্কর শত্রুভাবের উদয় হইয়াছে। তবে ঐ বৈরভাব যে চিরস্থায়ী হইবেনা তাহা নিশ্চয়। কেন না স্বভাবের দ্বারা স্ত্রীপুরুষ যেরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ ও পরস্পরের প্রতি যেরূপ আকর্ষণে আকৃষ্ট তাহাতে এ অস্বাভাবিক শত্রুভাব চলিয়া গিয়া শেষকালে উভয় জাতির মধ্যে যে প্রকৃত সম্বন্ধ ও বন্ধুভাবের স্থিতি হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এই প্রস্তাবের আলোচনা কালে তিনটী প্রশ্ন একে একে আমাদের মনে আসিয়া

উপস্থিত হয়। ১ম,—অতীতকাল হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত সকল দেশীয় ও সকল জাতির সমাজে স্ত্রীলোকেরা কিরূপ পদ পাইয়াছে? ২য়,—কি কি স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কারণ বশতঃ তাহারা ঐরূপ পদ পাইয়াছিল ও পাইয়া থাকে? ৩য়, সমাজের গতি ও সুখ সচ্ছন্দতা কি এখনও তাহাদিগকে ঐ পুরাতন রীতিনীতি অনুসারে রাখিতে চায় ও রাখা ভাল বিবেচনা করে, না উহা সংসারে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সমান অধিকার ও সমান সম্বন্ধ আনিতে চাহে?

আমরা সমস্ত নারীজাতির অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস খুঁজিলে এই দেখিতে পাই যে, সকল সময়ে সকল জাতীয় পরিবারের মধ্যেই স্ত্রীলোক পুরুষের অধীন ছিল ও আছে। দুএকজনের বিষয় বাদ যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ সমস্ত স্ত্রীজাতি সকল কালে ও সকল দেশেই অপেক্ষাকৃত বলবান পুরুষ জাতির সম্পূর্ণরূপে হস্তগত ও বশীভূত। সভ্যতার দ্রুতগতি ও মার্জ্জিত-ধর্ম্ম স্ত্রীজাতির উপকার ও উন্নতির অনেক চেষ্টা পাইলেও সর্ব্বসাধারণের, এমন কি স্ত্রীজাতির নিজেদেরই এই মত বিশ্বাস যে, পরাধীনতাই তাহাদের উপযুক্ত পদ, তাহারা পরিবারে নিজ নিজ আত্মীয় পুরুষদের সম্পত্তি স্বরূপ, সুতরং পুরুষজাতির ইচ্ছা রুচি বিচার ও সুবিধা অনুসারে স্ত্রীজাতির জীবন কার্য্য নির্ব্বাহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্রতা অবলম্বনের ইচ্ছা ও স্বাধীনভাবে স্ব স্ব জীবনের কর্ম্ম সমাধার বাসনা দেখিলেই, উহা রমণী স্বভাব সূচক কোমলতা ও নম্রতার বিরুদ্ধাচরণ ভাবিয়া লোকে সর্ব্বত্রই উপহাস বা তিরস্কার দ্বারা উহা দমনে রাখিবার প্রায়াস পায়।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন—ইহার কারণ কি? কি কারণে সমস্ত বিশ্বব্যাপী নারীজাতির ইতিহাসে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধীন ছিল ও আছে? ভদ্রতা, সদাচার ও এমন কি আদর, মান্য বা পূজা, যে নামেই উহাকে আচ্ছাদন করা যাক্ না, এ পরাধীনতা কে অস্বীকার করিবে? স্ত্রীলোক পুরুষের অপেক্ষা যথার্থই নীচ, এরূপ স্বীকার ভিন্ন সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় এ প্রকার বিশ্বব্যাপী ও চিরস্থায়ী পরবশতার কারণ নির্দ্দেশ করা অসাধ্য বোধ হয়। কেননা, ইহা বোধ যোগ্য নয় যে, উভয় জাতিই সমান বলবান হইলে একদল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অপরদলের বশীভূত হইয়া থাকিত; তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাদের মধ্যে ক্রমাগত বিদ্রোহ ও দীর্ঘকালব্যাপী কলহ চলিত। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে, দুই দলের পরিশ্রম ও কার্য্যক্ষমতায় বিঘ্নদায়ী নারীপুরুষের ঐ মহা যুদ্ধ নিবারণের জন্য উহাদের মধ্যে একজাতি অন্যের অপেক্ষা এরূপ স্বল্প পরিমাণে দুর্ব্বল হওয়া উচিত যে, তাহাতে কলহ বিবাদও বন্ধ থাকিবে ও দুই দলে অবাধে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধনে সক্ষম হইবে; ইহাই সমাজের গতি ও উন্নতির পক্ষে যথার্থ উপকারী। কিন্তু স্ত্রীজাতি যে বাস্তবিকই পুরুষজাতি হইতে নিকৃষ্ট ও পুরুষোচিত গুণে একেবারে বঞ্চিত, এ জগতে তাহার কোন প্রমাণ নাই।

উহাদের বিভিন্নতা আছে কিন্তু তাহা ডান হাত ও বাঁ হাতের প্রভেদের মত। অভ্যাস করিলে ডান হাতের সকল কাজই বাঁ হাত দিয়া সমান রূপে সম্পন্ন করা যায়, আর ন্যাটা লোকেরা স্বভাবত বাঁহাত দিয়া সকল কাজ আরো ভালরূপে করিতে পারে, তবে ইহা সত্ত্বেও দক্ষিণ হস্তের যে অল্প শ্রেষ্ঠতা আছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। এবং এই অতি অল্প বিভিন্নতাব জন্য কার্য্যক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের হাত আরো অধিক ভারী শিকলের দ্বারা বাঁধা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, ঐ সামান্য অভেদ না থাকিলেও স্বভাবের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যকাজের ব্যবস্থায়—অর্থাৎ স্ত্রীলোকের উপর সন্তানধারণ ও বহুদিন ধরিয়া অক্ষম শিশুদের লালনের ভারার্পণ হওয়াতে নারীজাতি কেন সর্ব্বদা পুরুষের অধীন থাকে আহার ও আশ্রয়ের জন্য ঐ জাতির উপর একান্ত নির্ভর করে, তাহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দেয়। এখন আমাদের এই দেখা উচিত, যে, পুরুষের ঐ স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠতা ও অধিকার কতদূর পর্য্যন্ত চালান যাইতে পারে—নারীজাতিকে কেবল 'স্ত্রীলোক' বলিয়া, মানব সমাজের সুখস্বচ্ছন্দতা তাহাদিগকে সংসারের ও সাধারণ সমস্ত অধিকার হইতে কতদূর পর্য্যন্ত বঞ্চিত করিয়া রাখিতে চায়। দেখা যাক্, আমাদের এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর কিরূপ সুবিচার পূর্ব্বক দেওয়া হইতে পারে।

ইহা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয় যে, জগতেব বংশ রক্ষা ও বৃদ্ধি করা মানব-জীবনের প্রথম উদ্দেশ্য। এই কারণে সমাজের অসভ্য ও অমার্জিত অবস্থায়, নারীজাতি শারীরিক দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতাবশতঃ নিজেদের ও সন্তানদের রক্ষার জন্য পুরুষের একান্ত অধীন,—এই যুক্তিই শেষ যুক্তি। কেননা, ঐরূপ অবস্থায় সংসারক্ষেত্রে জীবনযুদ্ধ করিবার সময় মানুষ কেবল হস্তপদের বলের দ্বারাই শ্রেষ্ঠতা ও হীনতার বিচার করিয়া থাকে। কিন্তু সভ্যতা ও শিক্ষার গতির সঙ্গে মানুষ যত মার্জিত হইতে থাকে, ততই তাহারা শারীরিক বল উপেক্ষা করিয়া সবল, দুর্ব্বল সকলেরই জীবন, সম্পত্তি ও স্বত্ব সমানভাবে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তদনুসারে আইন প্রস্তুত করে; আর যে সমাজ যত সুসম্পন্নরূপে সভ্য, তাহা তত অপক্ষপাতীরূপে সবল দুর্ব্বলকে সমান চক্ষে দেখে। অন্ততঃ, যদিও জাতি বৃদ্ধি ও রক্ষা করা অন্যান্য ইতর জন্তুর ন্যায় মানব জীবনেরও প্রথম উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহাদের মত মানুষের জীবনের উহাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; বরঞ্চ যে সকল উন্নত ও স্বর্গীয় মানস পূরণের জন্য পরমেশ্বর মানুষকে পশুদিগের ন্যায় কেবল জড়শরীর দিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই ও যে উন্নত জীবনের সুখতৃপ্তি আশায় মানুষ শারীরিক সুখভোগকেও তুচ্ছ বোধ করে, সেই পবিত্র উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্ত মানুষের মনের সঙ্গে শরীরেরও আবশ্যক।

আর ইহাও আমাদের মনে রাখা উচিত, যে এ পর্য্যন্ত কোন জাতিই কেবল শারীরিক বলের দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করে নাই বা প্রধান বলিয়া পরিচিত হয় নাই। মানসিক বুদ্ধিজ্ঞান ও নীতিধর্ম্মের দ্বারাই এক জাতি অপর এক জাতির উপরে উঠিতে

পারে। যদি শারীরিক বলই জগৎ শাসনের প্রধান শক্তি হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মানুষ অনেক নীচে পড়িয়া থাকিত। কেননা, জন্তুদিগের মধ্যে মানুষই স্বভাবত অধিক অসহায় ও দীর্ঘ শিশুকাল বশতঃ কিছু দিন তাহারা নিতান্তই নিরুপায়। অথচ জ্ঞান ও মস্তিষ্ক দ্বারাই মানবজাতি জগতের প্রভুত্ব পাইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী পশু-দিগকেও নিজেদের বাধ্য ও দাসস্বরূপ করিয়াছে। সমস্ত মানব জীবনের ইতিহাসেও ক্রমাগত ঐরূপ দেখা যায়। সর্ব্বপেক্ষা নীতিবান ও বুদ্ধিমান জাতিরাই অন্যান্য মানব জাতি অপেক্ষা অধিক পরাক্রমশালী হইয়াছে। আবার দেখ, ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি মানব জীবনের যত উন্নত বিষয় ও কর্ম্ম সকলের সঙ্গে জীবন যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নাই। যে ব্যক্তিদের নীতিজ্ঞান দৃঢ় ও বুদ্ধিশক্তি দ্রুত, তাঁহারাই কেবল ঐ সব কর্ম্মক্ষেত্রের যোদ্ধা স্বরূপ; উহাতে শারীরিক বিভিন্নতা বা অক্ষমতা কিছুই করিতে পারে না।

ঐ উপরি উক্ত যুক্তি অনুসরণ করিলে, শারীরিক দুর্ব্বলতাবশতই যে নারীজাতি সংসারের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত নহে, মানসিক হীনতা তাহাদিগকে পুরুষের নীচে রাখিয়াছে—এই বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করে। এখন আমাদের এই পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত, যে, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা কতদূর সত্য?

আমরা যদি এই বিষয়ে এক অতিবাদ সীমায় যাই, (কেননা, সচরাচর লোকদিগের মনে উহা ঐরূপ ভাবেই ধরিয়া থাকে,) আর বলি, যে, প্রতি স্ত্রীলোক স্বভাবত প্রতি পুরুষ হইতে নিকৃষ্ট, তাহা হইলে ঐ স্বাভাবিক অক্ষমতা নিতান্তই ভয়ানক বোধ হয়। কিন্তু একটু চাহিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, স্ত্রীপুরুষ জাতির প্রতি ব্যক্তির মধ্যে ওরূপ বিশ্বব্যাপী কোন হীনতার প্রভেদ নাই। উভয় জাতির দোষগুণ কেবল গড়ে ধরিলেই সমস্ত স্ত্রীজাতির উপর গড়ে পুরুষদের শ্রেষ্ঠতা দেখা যায়। আমরা যদি কেবল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তির উদাহরণ লই তাহা হইলে দেখিতে পাই অনেক স্ত্রীলোক সাধারণ পুরুষ অপেক্ষা নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ; আর কতক নারী কেবল কতিপয় মহাপুরুষ ব্যতীত অন্যান্য পুরুষদিগের অপেক্ষা অনেক প্রধান। লোকে ক্রমাগত বলিয়া থাকে, স্ত্রীজাতি বিবেচনা, গভীর চিন্তা ও ধ্যান, দীর্ঘকাল ব্যাপী মানসিক পরিশ্রম ইত্যাদিতে স্বভাবত অপারগ, আর তাহাদের কোন নূতন বিষয় কল্পনার ক্ষমতা বা রহস্যজ্ঞান নাই। কিন্তু ঐ সকল দোষারোপ যে অমূলক, অনেক বিখ্যাত নারীদের জীবন ও কাজের দ্বারা যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা শারীরিক ও সামাজিক নানা অসু-বিধা সত্বেও মানবজীবনের সমস্ত কাজে ও কঠিন পরীক্ষায় পুরুষের সঙ্গে সমানে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তবে দুই একটী বিষয়ে যে এখনও তাহারা পুরুষের সমান হইতে পারে নাই তাহার কারণ যে কেবল মাত্র বুদ্ধির হীনতা নহে কোন বিচক্ষণ ও অপক্ষপাতী ব্যক্তিই তাহা অস্বীকার করিবেন না। আমরা যখন সর্ব্বত্র দেখিতে

পাই যে স্ত্রীলোক জীবন যুদ্ধে পুরুষের সঙ্গে সমানে যুঝিবার সময় কত বাধা ও ক্লেশ, অসুবিধা ও গঞ্জনা, উপহাস ও যন্ত্রনা সহিতে বাধ্য হয়, তখন ঐ সকল সামাজিক ও শারীরিক বাধা অতিক্রম করিয়া তাহারা যে অধিকাংশ বিষয়ে পুরুষের সমানে উঠিয়াছে, ইহাতেই তাহাদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির দৌড় স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতেছে।

স্ত্রীপুরুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমানতা সম্বন্ধেও ভয়ানক মতবিরোধ দেখা যায়। কেন না, অনেকে ঐ দুই বিষয়ে নারীজাতির শ্রেষ্ঠতা বা সমানতা স্বীকার করিলেও সাধারণ কর্ম্মে তাহাদের অক্ষমতার পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন। এক দিকে লোকে বলে, যে রমণীর চরিত্র পুরুষের অপেক্ষা অনেক অধিক বিশুদ্ধ ও পবিত্র, সে কারণে সাধারণ জীবনের কর্ম্মভূমিতে তাহারা প্রবেশ করিলে পুরুষের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের ঐ বিশুদ্ধ ও পবিত্র স্বভাব সমল ও নীচ হইয়া যাইবে। অন্যদিকে আবার ইহা বলা হইয়া থাকে, যে, নারীজাতি উন্নত ও নৈতিক গুণে বঞ্চিত, সেই হেতু বলবান, ধর্ম্মশীল ও সদাশয় পুরুষের শাসনাধীনে থাকিয়া তাহাদের সমাজ ও ধর্ম্ম রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। এখন এই দুইটি ধারণার কোনটী সত্য তাহা আমাদের খুঁজিয়া দেখা উচিত। রমণীরা ধর্ম্মগুণে বঞ্চিত, এই শেষ ধারণা লইয়া আমরা প্রথম আরম্ভ করিব।

ঐ উক্তি মতে স্ত্রীজাতি সাহস, সত্যবাদিতা, সততা, সদাশয়তা ও মহানুভাবতা প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ সকলে স্বভাবত বঞ্চিত, আর তাহাদের হৃদয় প্রবঞ্চনা, নীচাশয়তা, অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা, হিংসা, প্রতিহিংসা, ভাণ প্রভৃতি যত নীচগুণে আসক্ত। কিন্তু যদিও অতীত ইতিহাস ও প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় এই সব আরোপ যে ভুল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখায়, ও স্ত্রীলোকেরা যে কঠিন মানসিক পরিশ্রমে স্বাভাবিক অপারগ সে ধারণারও মূলচ্ছেদ করে, তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সমস্ত স্ত্রীজাতির বিশ্বব্যাপী ও চিরস্থায়ী পরাধীন-জীবন পুরুষজাতির বিশ্বব্যাপী ও চিরস্থায়ী স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জীবনের সহিত তুলনা করিলে পুরুষের অপেক্ষা গড়ে স্ত্রীলোদিগকে ঐ সব দোষে অধিক প্রবণ দেখা যায়। কিন্তু যেরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আমরা দুই জাতির তুলনা করি, উভয়ের মধ্যে যদি সে অবস্থার বিপরীত পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে নারীজাতি যে ঐ সব মন্দগুণে অধিক আসক্ত, তাহা কেবল অবস্থার দোষে, সমস্ত স্ত্রীজাতির দোষে নয়। স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষের হৃদয়ও ঐ সব নীচগুণে প্রবণ, কিন্তু স্বাধীনতার পবিত্র বাতাসে উহা সর্ব্বদা উড়াইয়া দেয়। আর যে দেশে উভয় জাতির জীবন, সম্পত্তি, সুখসচ্ছন্দতা ও মান্য সমানরূপে ধর্ত্তব্য হইয়া থাকে, সেই দেশেই আত্ম মর্য্যাদার সঙ্গে নারীদিগকে সাধারণ পুরুষদিগের তুলনায় উক্ত শ্রেষ্ঠতর গুণে অধিক আসক্ত দেখা যায়। ইহাতে কি প্রমাণ করে?

আবার অহঙ্কার ও নীচাশয়তা, হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা ও মনের অপ্রশস্ততা কেবল স্ত্রীজাতির প্রতিই আরোপিত হইয়া থাকে। কিন্তু দুই জাতিই এক অবস্থায় জীবন যাপন করিলে

উভয়ের মধ্যেই সমানভাবে ঐ সব মন্দগুণ দেখা যায়। যে কোন সময়ে ও যে কোন দেশে যথেচ্ছাচারিতা বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অত্যাচার পুরুষদিগকে জীবনের সমস্ত সাধারণ কাজ ও স্বাধীনভাবে জ্ঞানালোচনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে, সেই সেই কালে ও সেই সেই দেশে আমরা দেখিতে পাই যে অকর্ম্মণ্য বা অলস পুরুষেরা নিজ নিজ শ্রেণীর স্ত্রীদিগের সঙ্গে ঠিক সমানভাবে ঐ সব মন্দগুণে পূর্ণ হইয়া থাকে। শুধু তাহা নয়, অনেক সভ্য ও স্বাধীন দেশেও সমান শিক্ষিত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরুষদিগকে অনেক সময় অধিক পরিমাণে নীচ কর্ম্মাসক্ত হইতে দেখা যায়।

এখন, যে মত নারীজাতির প্রতি বিশেষ বিশেষ দোষের পরিবর্ত্তে বিশেষ বিশেষ গুণ আরোপণ করিয়া থাকে, আমরা সেই মত দেখিব। ঐ সব গুণের মধ্যে নম্রতা সর্ব্ব প্রধান; উহার সঙ্গে অবশ্য কোমলতা, লজ্জা, আত্মবিসর্জ্জন, দ্রুত বিবেচনা ও কল্পনা শক্তি ও ধর্ম্মভাব ধরা যাইতে পারে। কিন্তু আমবা যদি পূর্ব্বের মত সমস্ত পরীক্ষা করিয়া মিলাইয়া দেখি, তাহলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীলোকেরা সচরাচর ঐ সব ধর্ম্মগুণে ভূষিত হইলেও উহা তাহাদের বিশেষ রূপে স্বভাবজাত নয়। ইহা অনেকে নজর করিয়া থাকিবেন যে তরুণকালে ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়েই এক রূপ নম্র ও লজ্জাশীল থাকে, কিন্তু ভগিনী উহার জন্য সর্ব্বদা প্রশংসা পায় আর ভ্রাতা হাস্যাস্পদ হয়। সে জন্য বয়স প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই যুবক উহা ঝাড়িয়া ফেলে, আর যুবতী যত্নে উহাকে পুষিয়া রাখে। কাজেই বয়সকালে কেবল স্ত্রীলোকদের মধ্যেই নম্রতা ও লজ্জা দেখিয়া, উহা তাহাদের বিশেষ গুণ, আমরা এইরূপ ভাবিয়া থাকি। তা ছাড়া, যে সকল অসভ্য জাতিদের মধ্যে পুরুষেরা স্ত্রীজাতির লজ্জা ইত্যাদির বিষয়ে কিছুই গ্রাহ্য করে না, সেখানে নারীরা ঐ সব গুণে একেবারে বঞ্চিত; উহা যে স্ত্রীদের জাতিসিদ্ধ গুণ নয়, এই ঘটনা, তার প্রমাণ দিতেছে। অন্য দিকে, যে পরিবারের পুরুষেরা রমণীদের লজ্জা ধর্ম্ম বিষয়ে অত্যন্ত অভিমানী, সেইখানেই উহা স্ত্রীলোকের প্রধান গুণ বলিয়া ধর্ত্তব্য হইয়া থাকে।

আবার কোমলতা ও তাহার সঙ্গী দয়া প্রকৃত নারীজীবনের ন্যায় প্রকৃত পুরুষ জীবনেরও এক অংশ স্বরূপ। আর স্ত্রীলোকেরা সংসারের অপ্রশস্ত ক্ষেত্রে সর্ব্বদা নানা ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি ও তাহাদের আলোচনাবশতঃ দ্রুত বিবেচনা ও সুরুচিতে অধিক অভ্যস্ত। তবে, ইহা অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে যদি কোন পুরুষ গৃহে স্ত্রী অভাবে বা কৃপণতার দরুণ সর্ব্বদা ঐ সব ছোটখাট বস্তুর প্রতি নজর রাখিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অবিলম্বে দ্রুত বিবেচনা ও বোধ শক্তিতে স্ত্রীজাতির ন্যায় অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। আত্ম সমর্পণ সদাশয়তার অন্য এক নাম মাত্র; যে কোন মহানুভব ব্যক্তি নিজের প্রাণ ব্যতীত অন্য কিছু বা উহা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান দ্রব্য দ্বারা পরের উপকার করিতে পারেন না, তিনি আত্মসমর্পণ করিয়া সদাশয়তা করিয়া

থাকেন। উহা দুই জাতিরই মহচ্চরিত্র লোকদিগের মধ্যে দেখা যায়। আর ধর্ম্মভাব যে কেবল স্ত্রীলোকদেরই বিশেষ গুণ তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কেন না, এ পর্য্যন্ত কেবল পুরুষেরাই যত ধর্ম্মের স্থাপক ও প্রচারক হইয়াছেন। আর যেখানে যে কোন ধর্ম্ম -শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে পূজিত হইরা থাকে, সেই খানেই পুরুষেরা উহার একচেটিয়া করিয়া থাকেন, নারীদের হাতে কখন উহার ভারার্পণ করেন না। তবে অনেক সময়ে, কোন ধর্ম্ম ভ্রম ও কুসংস্কারময় হইলেও, স্ত্রীরা যে পুরুষের অপেক্ষা উহার প্রতি অধিক বিশ্বাসী ও অনুরক্ত দেখা যায়, তাহার কারণ, তাহারা সমস্ত সভ্য জগতের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের গতি হইতে একেবারে বহিষ্কৃত আছে। জ্ঞান ও বিদ্যার গীতির সঙ্গে মানব জাতির মন এরূপ প্রশস্ত হয় যে উহা দ্বারা পূর্ব্ব ধর্ম্ম বিশ্বাস মানসিক কল্পনা বা ধারণার পক্ষে অপ্রশস্ত বোধ হইলে মানুষ স্বভাবতঃ উহা ত্যাগ করিয়া মনের নূতন অভাব অনুসারে কোন এক নূতন ও অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ধর্ম্ম গ্রহণ করে বা স্থাপন করে। সে কারণে ইহা বলা যাইতে পারে যে স্ত্রীজাতির সচরাচর বিমর্ষজনক, সীমাবদ্ধ ও অপরিবর্ত্তনীয় জীবনে ধর্ম্মই কেবল অসীম, উজ্জ্বল জগতের আলো প্রবেশের একমাত্র দ্বার স্বরূপ। ঐ একমাত্র জানালা দ্বারা তাহাদের আত্মা বর্হির্জগতের আলো দেখিতে পায়, ও যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন শুধু আহার নিদ্রা, স্বর্ণালঙ্কারে তৃপ্ত হয় না, সেই প্রকৃত জীবনের পবিত্র বায়ু সেবিতে পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্ত্রীজাতির যে শোচনীয় অবস্থা তাহাদের জীবনে ঐ একমাত্র জানালাকে এত আবশ্যকীয় করে, তাহাই আবার সদা সর্ব্বদা উহাকে কুসংস্কার ও ভ্রমজালে এরূপ আচ্ছন্ন ও অপরিষ্কার করিয়া রাখে যে বিশুদ্ধ আলো বা নির্ম্মল বাতাস কিছুই উহার ভিতর দিয়া তাহাদের আত্মায় প্রবেশ করিতে পারে না।

স্ত্রী ও পুরুষ জাতির এই বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও নীতিক্ষমতার তুলনা দ্বারা আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে উভয়ের মধ্যেই মানবচরিত্র ও স্বভাব এক প্রকার। তবে জগতের সৃষ্টি হইতে দুই জাতি বরাবর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় জীবন যাপন করিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন অভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়াছে; ভিন্ন প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছে ও ভিন্ন ভিন্ন কাজে উৎসাহ পাইয়াছে, প্রতিজাতি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে বিশেষরূপে শিক্ষিত ও পারদর্শী হইয়াছে, সেই কারণে উহাদের মানসিক ভাবের এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আর সেই জন্যই ‘এটা পুরুষের কাজ’ ‘ওটা স্ত্রীলোকের কাজ’ ‘ওটা পুরুষের গুণ’ ‘ওটা স্ত্রীর গুণ’—এই সব কথা ও ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

যাহাহৌক, এখন উভয়জাতির মধ্যে এক চিরস্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয় প্রভেদ—অর্থাৎ প্রকৃতি নিয়মানুসারে যে শারীরিক ব্যবস্থার দ্বারা সন্তান ধারণ ও জননীর কর্ম্মভার স্ত্রীলোকের উপর অর্পিত হইয়াছে—সেই প্রভেদ বিবেচনা করিয়া দেখা আমাদের কাজ। প্রকৃতির বিধানানুসারে নারীজাতি সন্তান ধারণ ও লালন করিবে, আর পুরুষ-

জাতি স্ত্রী ও তাহার শিশুদের রক্ষা ও ভরণপোষণ করিবে। মাতার কর্ত্তব্য নারীকে গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখে, সেজন্য বাহিরের সমস্ত কাজ পুরুষের উপরেই পড়ে।

অতএব আমরা দেখিতে পাই যে, যেখানে মানবের আদিম সমাজ ও পরিবার-ব্যবস্থামতে স্ত্রীজাতির অধীনতা ও পরবশতা ক্রমাগত এক ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, আর যেখানে নারীজাতি, কেবল "মেয়েমানুষ" বলিয়া অবহেলিত ও ঘৃণাস্পদ হইয়াছে ও যেখানে উহাদের মানসিক ও নৈতিক ইচ্ছা অনিচ্ছা অগ্রাহ্য পূর্ব্বক, যেরূপে হৌক তাহাদের বিবাহ দিয়া তাহাদের দায় হইতে মুক্ত হইলেই হইল—পুরুষেরা এইরূপ ভাবিয়া তাহাদের প্রতি যথেচ্ছাচার আচরণ করিয়াছে, সেখানে ঐ দুই জাতির পরস্পর সম্বন্ধ, কর্ত্তব্য ও সংসারে অধিকার লইয়া কখন কোন তর্ক উঠে নাই।

আর প্রায় সব সভ্য দেশেই কুমারী নারীদের উপর বিবাহিতাদের প্রাধান্য স্বীকার ও যেরূপে হৌক পুরুষের আবশ্যকের অতিরিক্ত স্ত্রালোকদিগকে সমাজ হইতে দূর করা —ঐ আদিম ও অমার্জ্জিত ব্যবস্থারই অন্য নাম মাত্র। আমাদের দেশে ও আসিয়া এবং আফ্রিকার অন্যান্য স্থানে বহুবিবাহ, শিশু কন্যাদের হত্যা ইত্যাদি দুষ্কর্ম্ম ও—পুরুষের ব্যবহার ব্যতীত স্ত্রীলোকের অন্য আবশ্যক নাই—ইহাও সেই আদিম ধারণার ফল। আর ঐ ধারণা বশতঃই অল্প দিন হইলে, ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত-কন্যাগণ ধর্ম্মাশ্রমে বা 'কন্‌ভেন্টে' গিয়া চিরকুমারী ব্রত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত।

আমরা উভয় জাতির তুলনা দ্বারা ইহা উত্তমরূপে দেখিতেছি যে স্ত্রীলোকের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক নীচতা সম্বন্ধে যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে উহারা সামাজিক ও অন্যান্য সাধারণ অধিকার হইতে কখন বহিষ্কৃত হইতে পারে না। এখন এই পুরাতন ও দীর্ঘস্থায়ী প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষে, রীতিনীতি, আইন ও মানুষের মতানুসারে যত যুক্তি আছে সে সব পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক।

প্রথম, রাজনীতি ও আইনের যুক্তি;—অন্যান্য বিষয়ে মতভিন্নতা থাকিলেও এ যুক্তিতে সকলেরই এক মত। স্ত্রীজাতি সর্ব্বদাই পরাধীন ও পরদাসী স্বরূপ থাকিয়া আসিয়াছে সে জন্য তাহাদিগকে পুরুষের সঙ্গে স্বাধীনতা ও সমান অধিকার দিলে স্বভাবের বিপরীত দিকে যাওয়া হয়, ও সংসারে মহা বিপ্লব আনা হয়। এই যুক্তির মাথায় আমরা নির্ভয়ে এই উত্তর দিতে পারি, যে, প্রকৃতিকে নিজেই নিজের রক্ষার নিমিত্ত স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। আর সমাজের গতি, ক্রমাগত পুরাতন অনিষ্টকারী প্রথা ত্যাগ করিয়া উহার নূতন অভাবানুসারে নূতন রীতিনীতির গ্রহণ হইতেই চলিয়া থাকে। তবে আজকাল যখন যত কঠিন আইন ও নিয়মের সংশোধন বা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মহা আন্দোলন ও তর্ক উঠিতেছে, ও জগতের গতির সঙ্গে সঙ্গে একে একে উহারা অন্তর্হিত হইতেছে, তখন কেবল নারীজাতির সম্বন্ধে আইন ও আচার ব্যবহারই যে অসংশোধিত বা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, ইহা বড় কঠিন আচরণ বলিয়া বোধ হয়।

এই যুক্তির পরে নারীজাতির কর্ম্মক্ষেত্রে সমান অধিকার বিষয়ে বিপক্ষবাদীদের তর্ক আমাদের সম্মুখে আসে। তাঁরা বলেন যে, সুমিষ্ট, সুকোমল ও সুপবিত্র রমণীকে জীবন যুদ্ধে পুরুষের সঙ্গে কঠিন কর্ম্ম করিতে দিলে, তাহার মিষ্টতা, কোমলতা ও পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যাইবে, স্ত্রীপুরুষজাতির মধ্যে পরস্পর আলাপের মধুরতা ও কবিতার বিনাশ পাইবে, আর দুর্ব্বলের প্রতি বলবানের যত সৌজন্য ও আদরের পরিবর্ত্তে উহাদের মধ্যে এক কর্কশ প্রতিদ্বন্দিতার সৃষ্টি হইবে। আর ঐ বিষম আড়াআড়িতে স্ত্রীজাতি নিশ্চয়ই পদভ্রষ্ট হইয়া আরো নীচে পড়িয়া যাইবে।

কিন্তু বোধ হয়, যে ব্যক্তিরা ঐরূপ প্রমাণ দেখান, তাঁরা সাধারণ স্ত্রীজাতিকে না লইয়া তাদের পরিচিত গুটিকতক মাহলাদের কথা ভাবিয়া থাকেন। যে রমণীরা দাস দাসীতে বেষ্টিত হইয়া মনের শান্তিতে নিজ নিজ অট্টালিকায় বসিয়া থাকেন ও সতত এরূপ আদর ও যত্নে রাক্ষত হন যে বাতাস পর্য্যন্ত তাঁদের কোমল আননের উপর জোরে বহিতে ভয় পায়, সেই অল্প সংখ্যক মহিলাদিগকে তাঁহারা জগতের সমস্ত নারীজাতির প্রাতকৃতি স্বরূপ ভাবেন। সে কারণে, জীবন যুদ্ধে অপারগ ঐরূপ কল্পনা-সৃষ্ট নারীজাতিকে মন হইতে দূর করিয়া—তাহাদের স্ত্রীসুলভ নম্রতা, পবিত্রতা ও মিষ্টতা যে এরূপ অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর রূপে গঠিত নয় যে, কাঁচের আল্‌মারীতে পোরা না থাকিলে অক্ষুণ্ণ থাকে না-- ইহা স্বীকার পূর্ব্বক ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া কি অধিক শ্রেয় নয়? আর সব দিক দেখিয়া ইহাও বোধ হয়, স্ত্রীলোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপদের আশঙ্কা— স্বাধীন জীবনের সরল ও মার্জ্জিত পথে ও গভীর পরিশ্রমের মধ্যে নহে, পরাধীন জীবনের কুটিল পথে ও অলসতা অকর্ম্মণ্যতাই উহার আকর।

এখন স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সাধারণ লোকেরা কি রূপ ভাবে, আমরা সে বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিব। ঐ মতে স্ত্রীলোকেরা একেবারে নীচ জাতি, ও কেবল পুরুষের ব্যবহার ও সুবিধার জন্যই তাদের সৃষ্টি; সে কারণে নারীদিগকে পুরুষের সঙ্গে সমান পদে বসাইবার প্রয়াস পাইলে, সকলে উহাকে যেন উচ্চজাতির প্রাধান্য ভাঙ্গিতে উদ্যত ভাবিয়া খড়্গাহস্তে ঐ প্রয়াসের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। আদিম কাল হইতে স্ত্রীজাতির চিরস্থায়ী ও বংশপরম্পরা পরাধীনতাই ঐরূপ সাধারণ বৈরভাবের কারণ। ঐ ভাব সকল শ্রেণীর ও সকল সমাজের লোকদের মধ্যেই দেখা যায়; সর্ব্ব জাতির উন্নত সাহিত্যে ও নিম্নশ্রেণীদের সঙ্গীতেও ঐ ভাব সমান রূপে রাজত্ব করে; আর ঐ উঁচু নীচু ভাব লোকের মনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে উহা শুনিলে কিছুই আশ্চর্য্য বা অসাধারণ বোধ হয় না।

যত কবি, দার্শনিক, উপন্যাস লেখক ও ধর্ম্মবিদ পণ্ডিতেরাও অন্যান্য সাংসারিক লোকদিগের সঙ্গে স্ত্রীলোকদের অক্ষমতা ও অধীনতা বিষয়ে এক ভাবে গাহিয়া থাকেন। তাঁহাদের সঙ্গে আবার নারীরা নিজেও অভ্যাসসিদ্ধ বোধ অনুসারে আপনা-

দের নীচতার গানে যোগ দেন। রোমান কবি লিওপার্ডি এই বলিয়া স্ত্রীদের নামে দোষারোপ করেন যে, "কোন প্রসিদ্ধ কবি বা পণ্ডিত যদি কুৎসিত কিম্বা অঙ্গহীন হন, তাহা হইলে নারীগণ তাঁহাকে ঘৃণা করে।" আর এক জন বিখ্যাত জর্ম্মণ দার্শনিক স্ত্রীদের বিষয়ে বলিয়া গিয়াছেন, "স্ত্রীলোকদের হইতে আমরা কি আশা করিতে পারি? তাহাদের চুল বড় আর মন ছোট।' তা ছাড়া আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও নারীজাতির অক্ষমতা ও দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে গান ও কবিতার অভাব নাই। কবি ও পণ্ডিতদের ঐ সব উক্তি পড়িলে আমাদের লজ্জা করে অথচ হাসি পায়। কেন না ইহা সকলেই জানেন যে স্ত্রীদের অপেক্ষা পুরুষেরা নির্গুণ সৌন্দর্য্যের অধিক আদর করিয়া থাকেন। আর রূপবান অথচ নির্গুণ পুরুষকে অতি অল্প নারীই দয়ার চক্ষে দেখে। তবে ইহা সত্য, যে স্ত্রীলোকেরা বহুদিন পরাধীনা থাকিয়া অনেক উচ্চ গুণ হারাইয়াছে, তথাচ দুই একজন নারীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া সমস্ত স্ত্রীজাতিকে ক্ষুদ্রমতি ইত্যাদি নাম দেওয়া কবি ও দার্শনিকদের উচিত নয়। বিশেষ, ইহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে পুরুষেরাই প্রথম হইতে স্ত্রীদের উপর নানা কৃত্রিম দোষারোপ করাতে তাহারা এখন ক্রমে অতি হীনাবস্থায় আসিয়াছে; আর তাহাদিগকে ঐ রূপ নীচ ভাবার অভ্যাস হইতেই তাদের প্রতি সকলের ঘৃণা ক্রমে বাড়িয়াছে।

কিন্তু স্ত্রীজাতি কেবল পুরুষের জন্যই সৃজিত হইয়াছে, ও ঐ উদ্দেশ্য ব্যতীত উহাদের জীবনের অন্য কোন অভিপ্রায় থাকিতে পারে না, এই অসভ্য ও ঘৃণিত ধারণা স্ত্রীদের সংসারে সাম্য জ্ঞান ও সম অধিকার লাভের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বিপদজনক ও সাংঘাতিক বাধা। আমরা দেখিতে পাই যে এই ধারণা বর্ব্বর ও অমার্জ্জিত জাতি-দের মধ্যে এরূপ দৃঢ় রূপে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, নারীরা যে কেবল পুরুষের সাংসারিক সুবিধার জন্য এ জগতে জন্মায় না, এ উন্নত ভাব তাহারা মনে ধরিতেও অক্ষম। এমন কি, ইউরোপের যে জাতিরা সভ্য ও মার্জ্জিত বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত, তাহা-দের মধ্যেও ঐ পুরাতন বিশ্বাসের অনেক চিহ্ন দেখা যায়। বিশেষ, স্ত্রীজাতির উপর পুরুষের ঐ প্রভুত্ব হইতে যে কত আঁধার ও দুঃখময় ঘটনা এ জগতে নিরন্তর ঘটিয়া থাকে, এই একটী প্রবন্ধে সেই সব ভয়ঙ্কর শোচনীয় বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ লেখা আমাদের সাধ্য নয়। কিন্তু আমরা ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে শীত গ্রীষ্ম-প্রধান প্রায় সমস্ত দেশে ও সভ্য অসভ্য প্রায় সকল জাতির সমাজেই স্ত্রীজাতির প্রতি ঐ পশুভাব এত অনিষ্টের মূল হইয়াছে যে, লোকে নারীদিগকে সচরাচর নিকৃষ্ট পদার্থ ভাবিয়া সংসারে তাহাদিগকে মানুষের যত স্বত্ব ও অধিকার হইতে বঞ্চিত করে; পরে কেবল স্বেচ্ছাচারী পুরুষের ইন্দ্রিয় তুষ্টির জন্য, তাহাদের শরীর, মন ও আত্মা পর্য্যন্ত জন্মের মত বিসর্জ্জিত হইয়া থাকে। সে কারণে, যত দিন না স্ত্রীজাতিও জগতে মানবজাতি ও পুরুষের সমান, বরং উঁচু বই নীচু নয়, এই জ্ঞান ও বিশ্বাস মানুষের মনে দৃঢ়বদ্ধ হইবে, ও বাল্য ও তরুণ

অবস্থা হইতে পুরুষের মনে নারী সম্বন্ধে যেরূপ নীচ ভাবের দ্বারা বিপ্লব ঘটে যতদিন না সেই সেই ভাবের বিনষ্ট সহকারে তাহাদের হৃদয় নীতিধর্ম্ম বলে মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হইয়া রমণী-কুলের প্রতি উপযুক্ত মান্য ও ভক্তি প্রবণ হইবে, আর যত দিন না, পুরুষ যেমন কেবল স্ত্রীদের ব্যবহারের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, নারীও সেইরূপ শুধু পুরুষের নিমিত্ত জন্মায় নাই—এই বিশ্বাস মানুষের শিরায় শিরায় বসিয়া যাইবে, ততদিন মানবসমাজকে ঐ বিপদজনক ও সাংঘাতিক পীড়ার ফল হইতে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।

ঐ সব উপরিউক্ত তুলনা ও দুই জাতির দোষ গুণের আলোচনা দ্বারা আমরা এই ঐক সিদ্ধান্ততে আসি, যে, স্ত্রীজাতির অতি অল্প স্বাভাবিক হীনতা ও জননীর কর্ত্তব্য একত্র হওয়াতে পুরুষজাতির প্রতিই উভয়ের কর্তৃত্ব ও শাসনভার অর্পিত হইয়াছে। তথাচ তাহাদের ঐ অক্ষমতা এরূপ নহে যে তাহার জন্য নারীজাতি সামাজিক ও সাধারণ সমস্ত কাজ হইতে একেবারে বহিস্কৃত থাকিতে পারে, কিম্বা মানবজাতির যে সব অধিকারে পুরুষের দখল আছে, সেই সব স্বত্ব হইতে তাহারা বঞ্চিত ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে ইহাও অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে, "আচ্ছা, যদি সচরাচর ঐ সিদ্ধান্তই ঠিক বলিয়া ধরা যায়, ও স্ত্রীজাতির কেবল সামান্য স্বাভাবিক অক্ষমতা ভিন্ন, তাহাদের প্রতি আইন ও রীতিনীতি দ্বারা আরোপিত যত কৃত্রিম বাধা ও অপারগতাকে তাড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমাজ ও নারীগণ ঐ নূতন ব্যবস্থা হইতে কি উপকার পাইতে পারে ?" এই প্রশ্নের উত্তর দান কালে সদ্য প্রাপ্ত ও ভবিষ্যৎপ্রাপ্ত ফলের প্রভেদের প্রতি দৃষ্টি রাখা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ রূপ গার্হস্থ্য, সমাজিক ও সাধারণ জীবনের সমস্ত বিষয়ে স্ত্রীজাতির অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে অনেক বংশ লাগিবে। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ভাবিতেও পারেন নাই যে মানব সমাজ ক্রীতদাস বিনা কখন গঠিত ও স্থিত হইতে পারে। সেইরূপ আমরা এখনও—যে সমাজে স্ত্রীলোকেরা সকল বিষয়ে পুরুষের সমানে দাঁড়াইবে, ও সংসারের রীতিনীতি আচার ব্যবহার সম্বন্ধে পুরুষের সঙ্গে সমান স্বত্বভোগ করিবে—এরূপ সুন্দর ও উন্নত মানব সমাজের গঠন পরিষ্কাররূপে মনে করিতে পারি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় বোধ হয়, যে স্বাভাবিক নিয়ম সকলের স্বাধীন ও অবাধ ব্যবহার ও চালনা দ্বারা সময়ে ঐ নূতন ব্যবস্থা ও সম্বন্ধ দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইবে, আর সমাজের ঐ নূতন বাঁধুনী এখনকার অপেক্ষা আরো অধিক শক্ত ও নিরাপদ হইবে, কেননা স্বেচ্ছাচারী ও কৃত্রিম প্রভেদের পরিবর্ত্তে দুই জাতির মধ্যে কেবল স্বাভাবিক বিভিন্নতার উপর উহার ভিত্তি নির্ভর করিবে।

যাহাহৌক উহা হইতে কতক সদ্য প্রাপ্ত ফলও পাওয়া যাইতে পারে। সকল প্রকার শিক্ষা ও সাধারণ কাজে স্ত্রীজাতিকে প্রবেশ করিতে দিলে, উহা তাহাদের বুদ্ধিও

কর্ম্ম শক্তিতে নিদ্রিত অবস্থা হইতে জাগাইয়া তুলিবে। আর অনেক ভদ্র পরিবারের মহিলারা যখন পতি বা পিতার অবর্ত্তমানে অনাথিনী হইয়া পড়েন, তখন তাঁরা নিজের ও সন্তানদের ভরণ পোষণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে জীবিকা উপার্জ্জনে সক্ষম হইবেন। আর ঐরূপে ভদ্র ও স্বতন্ত্রভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে জানিলে হাজার হাজার দরিদ্র বিধবা অর্থের জন্য লোভাকৃষ্ট হইয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হইবে না। তাহা ছাড়া, অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই, পরিবারের কর্ত্তা পীড়িত বা কর্ম্মে অপরাগ হইলে তিনি তাঁর অসহায়া স্ত্রী ও শিশুদের দুরবস্থা দেখিয়া যারপর নাই ক্লেশ পান, কিন্তু তাঁর পত্নী যদি ডাক্তার, শিক্ষয়িত্রী, কেরাণী বা ধাত্রী ইত্যাদি কোন কর্ম্মের দ্বারা ভদ্রভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিতে শিক্ষিত হন, তাহা হইলে ঐ পীড়িত ব্যক্তির হৃদয় শেষকালে ঐরূপ ভবিষ্যৎ ভাবনাতে অত আকুল হইবে না, আর তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর পরিবারও দুঃখক্লেশ ও অভাবে চিরজীবনের মত কষ্টে পতিত রহিবে না। আর স্ত্রী-লোকেরা বাল্যাবস্থা হইতে সকল কাজ নিয়মমত করিতে শিক্ষিত হওয়ায় তাঁদের সংসার আরো অধিক সুশৃঙ্খলাময় ও ধর্ম্মের আশ্রয় হইবে।

আর ইহাতে ও কোন সন্দেহ নাই যে উভয়জাতির কার্য্যক্ষমতা ও কর্ম্মশক্তি একত্র হইলে মানব সমাজ আরো অধিক বল পাইয়া অধিক কর্ম্ম সাধন করিতে পারিবে। আর সকল কাজে স্বাধীনভাবে সমান ও অনাটক প্রতিদ্বন্দিতা হওয়াতে কেবল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাই যত প্রধান কাজ পাইবেন, সুতরাং সকল কর্ম্ম অধিক সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। আবার অন্যদিকে ইহাও আমাদের দেখা উচিত যে, ঐ মহা লাভের জন্য সমাজ অতিরিক্ত মুল্য দিতে বাধ্য হইবে কি না। কেননা, অনেকে এ রকম ভয় করিয়া থাকেন যে উভয় জাতিতে জীবন যুদ্ধে সকল কাজে সমান ভাবে আড়াআড়ি করিলে উহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তাহা বিনাশ পাইবে। আর তাহা হইলে লোকে বিবাহ বন্ধনকে তত মান্য করিবে না বা পরিণয়ে ইচ্ছুক হইবে না। তাহা ছাড়া, নারীগণ বিবাহ ব্যতিরেকেও স্বতন্ত্রতা ও সামাজিক পদ পাওয়াতে উদ্বাহের ভার ও বন্ধন বহিতে অস্বীকার করিবে। কিন্তু এ সকল ভয় একেবারে অমূলক ভাবিয়া সহজেই মন হইতে দূর করা যাইতে পারে। যতদিন মানব-স্বভাব এখনকার ন্যায় একরূপ থাকিবে, ততদিন উহার শারীরিক ও নৈতিক বাসনা স্ত্রী পুরুষকে একত্র আকৃষ্ট করিবে ও বরাবর উহাদের মধ্যে কোন দীর্ঘস্থায়ী বিপক্ষতা বা প্রতিদ্বন্দিতা থাকিতে পারিবে না। বিশেষ, এই সকল স্ত্রী সম্বন্ধীয় তর্কেতে আমরা দেখিতে পাই যে স্ত্রীদের প্রায় সমসংখ্যক পুরুষ নারীজাতির পক্ষ লইয়া থাকেন, আর সমসংখ্যক বা অধিকাংশ রমণী পুরুষদের দিকে, অর্থাৎ নিজেদের বিপক্ষে প্রতিবাদ করেন। আর যে সব লোক "আমরা স্ত্রীদের পুরুষ বানাইতে চাই," এই বলিয়া নারীজাতির প্রকৃত উন্নতির বিপক্ষতা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত

হইবেন, যে প্রকৃতি দেবীকে স্বাধীনতা দিলে উহা অন্যান্য দেবীর ন্যায় নিজেই নিজের পথ দেখিয়া এরূপ সতর্কভাবে চলিবে যে, তাহাতে স্ত্রীপুরুষ জাতির মধ্যে কখন কোন অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন বা শত্রুভাব ঘটিতে পারিবে না; আর স্ত্রীজাতি ও কখন পুরুষজাতিতে পরিবর্ত্তিত হইবে না।

আবার, যেমন পরিবার-বন্ধন সভ্য সমাজের ভিত্তি স্বরূপ, সেইরূপ সামাজিক আইনের বিশেষ নিয়মানুসারে স্ত্রীপুরুষের যাবজ্জীবন বন্ধন অর্থাৎ বিবাহ পরিবারের মূলস্বরূপ। সে কারণে মানুষের কথা কহিবার শক্তির ন্যায় উহাও একেবারে মানবীয়; সুতরাং যতদিন মানবসমাজ প্রচলিত থাকিবে, ততদিন বিবাহও নির্ব্বিঘ্নে চলিবে। মানবজাতির সভ্যতা যত প্রকৃত ও উন্নত হইবে, ঐ পরিবার-বন্ধন ও উহার মূল তত দৃঢ় ও পবিত্র হইবে। আর উভয় জাতির মধ্যে যে সব পাপ সম্বন্ধ ও পশুভাব হইতে সমাজে ও সংসারে মহা অনিষ্ট ও বিশৃঙ্খলা ঘটে, সমাজ তখন নিজেই সে সকলকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিবে।

অবশ্য স্ত্রীজাতিকে ঐ নূতন ও প্রকৃত স্বাধীনতা দিলে প্রথম প্রথম কিছু দিন তাহার অপব্যবহার ঘটিতে পারে; কেন না শত শত বৎসরের কৃত্রিম ও অনুচিত বন্ধনে বদ্ধ থাকাতে নারীজাতি যে সব দোষ ও দুর্ব্বলতাতে অভ্যস্ত হইয়াছে তাহা অবিলম্বে দূর হইবে না। কিন্তু স্বাভাবিক-গতি-সিদ্ধ যন্ত্রনা ও দণ্ড দ্বারা উহার শিকড় উপাড়িতে হইবে; আর আমরা শিশুকাল হইতে মাতৃ দুগ্ধের সঙ্গে যে সব অভ্যাস, রুচি ও ইচ্ছাতে আসক্ত হইয়াছি, যে সকল চিন্তা ও ভাব আমাদের হাড়ে হাড়ে বসিয়া গিয়াছে, সেই সব প্রাণাপেক্ষা প্রিয় অভিলাষ ও ভাবকে অনেক কষ্টে মন হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। কারণ, মানবজাতির উন্নতগতির প্রতি সোপানই ঐরূপ আন্তরিক অভ্যাস ও চিন্তার পরিবর্ত্তন দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু উহাতে ক্ষণেকের জন্য ক্লেশ পাইলেও উহা হইতে চিরস্থায়ী সুখ পাওয়া যাইবে।

আর ইহাও আমাদের একান্ত বিশ্বাস, যে যখন স্ত্রীলোক ও পুরুষ জীবনের সকল কর্ম্মে ঐরূপ সমানভাবে পরস্পরের সাহায্য করিবে ও সকল অধিকার ও কর্ত্তব্যের সমান ভাগ লইবে; যখন ধর্ম্মনীতিভাব উভয়জাতির উঁচুনীচু জ্ঞানের উপর নির্ভরের পরিবর্ত্তে মানবজাতির যথার্থ স্বাভাবিক নীতিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিবে; ও যখন পবিত্র ধর্ম্ম ও মানের অর্থ স্ত্রীপুরুষে সমানভাবে প্রকৃতরূপে বুঝিবে, তখনই কেবল আমরা মানব সমাজকে যত আবর্জনা হইতে পরিষ্কৃত ও ধৌত দেখিবার আশা করিতে পারি; তখনই কেবল মানব পরিবার স্থিরভাবে ও উঁচুমুখে অসভ্যতার উপর সভ্যতার ও পশুভাবের উপর মানবীয় ভাবের জয় সাধনে অগ্রসর হইবে; আর তখনই কেবল মানুষ, জীবনের নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী সুখের পরিবর্ত্তে অবিনাশী ও স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিতে পারিবে।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

("ইংলণ্ডে বঙ্গ মহিলার" লেখিকা।)

প্লেটো—টিমীয়স্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতে পর।)

অতঃপর প্লেটো ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জল উল্লেখ করিয়াছেন; যেমন সাধারণ জল, হিমশিলা, বরফ, তুষার। তাঁহার মতে সমুদয় তরল কিম্বা গলনশীল বস্তুই জল বলিয়া গণ্য; উপরে দেখা গিয়াছে যে তিনি স্বর্ণকে একপ্রকার জল বলিয়াছেন, ইহার অর্থ এই যে উহা গলিলে জলের ন্যায় তরল হয়! এক্ষণে আবার তিনি উদ্ভিদ্‌জাত তরল পদার্থগুলিকেও জল বলিয়াছেন; সুরা, তৈল, মধু, ও অহিফেন এ সকল কয়েক প্রকার জল মাত্র। জলের বৃত্তান্ত শেষ করিয়া তিনি মৃত্তিকার বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন এবং বলিতেছেন যে মৃত্তিকা জলের মধ্য দিয়া নির্গত হইলে প্রস্তরে পরিণত হয়; ইহার কারণ এই যে জল মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইলে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় আর তখন বায়ুতে পরিণত হইয়া উপরে উঠে। উপরে শূন্যস্থান না থাকায় নূতন বায়ু তথাকার বায়ুকে নিম্নে নিক্ষেপ করে আর এই নিক্ষিপ্ত বায়ু মৃত্তিকার অণুগুলির চারিপার্শ্বে চাপ প্রদান করে। তাহাতে অণুগুলি ঘনীভূত হয় ও জলের সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংযুক্ত হয়—এইরূপ জল ও মৃত্তিকার যৌগিককে প্রস্তর কহে। কতকগুলি প্রস্তর স্বচ্ছ ও দেখিতে অপেক্ষাকৃত সুন্দর আর কতকগুলি প্রস্তর অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। প্রথম প্রকারের প্রস্তরের অণুগুলি পরস্পরের সমান ও সদৃশ, দ্বিতীয় প্রকারে তাহার বিপরীত। যখন প্রস্তর হইতে সমুদয় জল বাহির করিয়া লওয়া হয়, তখন একপ্রকার ভঙ্গপ্রবণ বস্তু জন্মে যাহা হইতে কুম্ভকার নির্ম্মিত সামগ্রী গঠিত হয়। কখনও কখনও মৃত্তিকা অগ্নি-দ্বারা গালিত হইলেও উহাতে কতকপরিমাণ জল থাকিয়া যায় তখন উহা শীতল হইলে একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ পাথর উৎপন্ন হয়। কয়েক প্রকার মৃত্তিকা লবণাক্ত; তাহাদিগের অণুগুলি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম। ইহাদিগের হইতে জল নিষ্ক্রান্ত হইলে একপ্রকার অর্দ্ধ কঠিন বস্তু জন্মে যাহা সহজেই জলের সহিত মিশ্রিত হয়; যেমন নাইটার (সোড়া) যাহা তৈল ও মৃত্তিকা পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিম্বা লবণ যাহা ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিবার পক্ষে নিতান্ত উপযোগী ও দেবতাদিগের প্রিয়বস্তু। মৃত্তিকা ও জলের যৌগিকগুলির অণুসমূহ জল দ্বারা পরস্পর হইতে বিশ্লিষ্ট করা যাইতে পারে না, কেবল অগ্নি দ্বারা পারে; এবং তাহার কারণ এইরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। মৃত্তিকার পিণ্ড অগ্নি কিম্বা বায়ু দ্বারা গলান যাইতে পারে না, যেহেতু এই দুই বস্তুর অণুগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি ও সেই নিমিত্ত তাহারা মৃত্তিকার অণুদিগের মধ্যস্থিত শূন্যস্থানে যাইয়া সহজেই অবস্থান করিতে

পারে। কিন্তু জলের অণুগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার, অতএব তাহারা যখন মৃত্তিকার অণুদিগের মধ্যে প্রবেশ করে তখন মৃত্তিকার আয়তন বৃদ্ধি হয় ও উহার অণুগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে মৃত্তিকা (যখন জলের সহিত যুক্ত হইয়া) শক্ত না হয় তখন উহা শুদ্ধ জলের দ্বারা বিশ্লিষ্ট হইতে পারে; কিন্তু যখন উক্ত প্রকারে শক্ত হয়, তখন উহা অগ্নি ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দ্বারা বিযুক্ত হইতে পারে না কারণ অগ্নিই কেবল সে অবস্থায় উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। জলের অণুগুলি যখন পরস্পরের সহিত অতি কঠিন ভাবে যুক্ত থাকে, তখন কেবল অগ্নিই তাহাদিগের বিশ্লেষণ সাধন করিতে পারে; আর যখন তত কঠিন নয়, তখন বায়ু কিম্বা অগ্নি উভয়েই পারে—বায়ু জলের অণুদিগের মধ্যস্থিত ব্যবধানগুলি অধিকার করে, আর অগ্নি (জলের অণুর অবয়ব) ত্রিভুজগুলির মধ্যে পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। বায়ু যখন কঠিন অবস্থায় থাকে তখন উহার বিশ্লেষণ করিতে এমন কোন বস্তুর প্রয়োজন যাহা উহার অণুর ত্রিভুজগুলির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে; আর বায়ুর অণুগুলি যখন পরস্পরের সহিত তত কঠিন ভাবে যুক্ত না থাকে, তখনও উহা কেবল অগ্নি দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে জল ও মৃত্তিকার যৌগিকে জলের অণুগুলি মৃত্তিকার অণুদিগের মধ্যস্থিত ব্যবধানে অবস্থিত থাকে; অতএব জল এইরূপ যৌগিকের সংস্পর্শে আসিলে উহা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু অগ্নি পারে অর্থাৎ অগ্নি ঐ যৌগিকের জলীয় অণুগুলির মধ্যস্থিত ব্যবধানে প্রবেশ করে আর তখন উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া তরল আকৃতি ধারণ করে। মৃত্তিকা ও জলের যৌগিক দুই প্রকার দেখা যায়, এক প্রকার যাহাতে জলের ভাগ মৃত্তিকার অপেক্ষা কম যেমন কাচ ও গলনশীল প্রস্তর সমূহ; আর এক প্রকার যেমন মম ও ধূপ ধুনা প্রভৃতি যাহাতে জলের ভাগ অধিক।

পদার্থ সমূহ পরস্পরের সহিত যুক্ত হইলে এবং এক অপরে পরিবর্ত্তিত হইলে তাহাদিগের যে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও শ্রেণী উৎপন্ন হয় তাহা আমি বর্ণনা করিয়াছি; এবং উহাদিগের হইতে আমাদিগের মনে কি প্রকারে নানা প্রকার অনুভূতি জন্মে তাহা এক্ষণে আমার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে আমি যে সমুদয় বস্তু বর্ণনা করিয়াছি তাহারা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য; কিন্তু আমরা মাংস ও তাহার অন্তর্গত পদার্থ সমূহের উৎপত্তি এবং আত্মার নশ্বর অংশের প্রকৃতি এক্ষণ পর্য্যন্ত বিবেচনা করি নাই; এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রকৃতির কথা উত্থাপন না করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না, আবার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের তত্ত্ব বিবৃত করিতে হইলে উল্লিখিত মাংস প্রভৃতির তত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ একটীর বৃত্তান্ত অপরটীর বৃত্তান্তের সাহায্য ব্যতীত সমাধা হইতে পারে না। অথচ দুইটী বিষয় এক সঙ্গে বর্ণনা করা কঠিন। এই নিমিত্ত আমাদিগের প্রথমে একটীর ব্যাখ্যা করিতে হইবে, পরে অপরটীর;

অতএব আমরা শরীর ও আত্মা উভয়েরই কার্য্য যে সকল বিষয়ে বিদ্যমান থাকে তাহাদিগের (অর্থাৎ অনুভূতি সমূহের) বৃত্তান্ত আরম্ভ করিতেছি।

প্রথমতঃ দেখা যাউক অগ্নিকে আমরা উষ্ণ বলি কেন; আমরা জানি যে অগ্নি আমাদিগের শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভক্ত করিয়া ফেলে। আমরা সকলেই অনুভব করিয়া থাকি যে অগ্নি তীক্ষ্ণ; এবং আমরা ইহাও উল্লেখ করিতে পারি যে ইহার পার্শ্ব সমূহ অতি মসৃন ইহার কোণগুলি তীক্ষ্ণ, ইহার অণুগুলি ক্ষুদ্র, এবং ইহার গতি তীব্র। এবং এই কারণেই অগ্নির কার্য্য উগ্র ও তীক্ষ্ণ ও উহা যাহা সম্মুখে পায় তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া থাকে। এবং আমাদিগের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে অগ্নির অণুর আকৃতি যেরূপ (অগ্নির অণু পিরামিড অর্থাৎ মন্দিরাকৃতি ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে) তাহাতে উহার খণ্ডীকরণ শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়ার কথা; এই নিমিত্ত অগ্নি স্বভাবতঃ যে (উষ্ণত্বের) অনুভূতি জন্মাইয়া থাকে গ্রীকভাষায় তাহার যে নাম (থার্ম্মন) দেওয়া হয় তাহাতে খণ্ডীকরণ বুঝায়। এক্ষণে বুঝা গেল অগ্নি হইতে শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি জন্মে কেন। ইহার বিপরীত যাহাকে শীত বলা যায় সহজেই বোধগম্য তথাপি বর্ণনা সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। আমাদিগের শরীরের উপর যে সমস্ত আর্দ্র বস্তুর কার্য্য হইয়া থাকে তাহাদিগের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অণুগুলি শরীরের মধ্যস্থিত জলীয় বস্তুর ক্ষুদ্র অণুগুলি বহির্গত করিয়া দেয় কিন্তু তাহার বৃহত্ত্ব বলিয়া এই সকল অণুর স্থান অধিকার করিতে পারে না। অতএব ঐ সকল বৃহৎ অণুগুলি শরীরের জলীয় অংশের উপর চাপ দিতে থাকে; এইরূপে শরীরের মধ্যে যে সংগ্রাম উপস্থিত হয় তাহাকে আমরা কম্পন কহি এবং এই অনুভূতি ও তাহার কারণ উভয়কেই আমরা শীত বলিয়া থাকি। অতঃপর দেখা যাউক কঠিন ও নম্র বলিতে কি বুঝায়; যাহা আমাদিগের শরীরের মাংস চাপিতে পারে ও উহাকে আকুঞ্চিত করিতে পারে তাহা কঠিন আর যাহা উহা দ্বারা আকুঞ্চিত হইতে পারে তাহা নম্র। এক্ষণে দেখা যাউক উচ্চ ও নিম্ন এবং লঘু ও গুরু বলিতে কি বুঝায়। প্লেটোর মতে জগতে উচ্চ বলিতে এক নির্দ্দিষ্ট দিক এবং নিম্ন বলিতে তাহার বিপরীত এক নির্দ্দিষ্ট দিক নাই; অর্থাৎ যাহা উচ্চ তাহা সকল অবস্থাতেই উচ্চ আর যাহা নিম্ন তাহা সকল অবস্থাতেই নিম্ন এমত নহে। তিনি বলেন বিশ্ব একটী গোলকবৎ, উহার কেন্দ্র পরিধির সমুদয় বিন্দু হইতে সমান দূরে অবস্থিত সুতরাং উহা উচ্চও নহে নিম্নও নহে উহা কেন্দ্র ভিন্ন অপর কিছু নহে। তাহার পর পরিধির বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে উহার বিশেষ কোন এক অংশকে উচ্চ আর অপর কোন বিশেষ অংশকে নিম্ন বলা যাইতে পারে না, কারণ উহার কেন্দ্রের সহিত উহার সমুদয় বিন্দুরই একই সম্বন্ধ; সম্বন্ধের বিভিন্নতা না হইলে নামের বিভেদ হইতে পারে না। বিশ্বের মধ্যস্থলে যদি

কোন একটী কঠিন বস্তু থাকিত আর সেই বস্তুর গঠন চারিদিকেই সমান হইত তাহা হইলে কোন ব্যক্তি এই বস্তু বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিলে এক্ষণে যে পার্শ্বে যে দিককে উচ্চ বলিবে তাহার বিপরীত পার্শ্বে সেই দিককেই আবার নিম্ন বলিবে, অর্থাৎ যে দিককে এক অবস্থায় উচ্চ বলিল তাহাকে যে সকল অবস্থাতেই উচ্চ বলিবে এরূপ নহে। এক্ষণে দেখা যাউক গুরু ও লঘু বলিতে কি বুঝায়; মনে কর কোন ব্যক্তি জগতের যে ভাগে অগ্নি থাকে সে খানে উঠিল ও তথা হইতে দুই অংশ অগ্নি লইয়া তোলন যন্ত্রের দুই পেয়ালায় রাখিল। অতঃপর সে অগ্নিখণ্ডদ্বয় ও তোলন যন্ত্র লইয়া জগতের অপর কোনস্থলে যাইতে চেষ্টা পাইল; তখন সে দেখিবে যে দুই খণ্ড অগ্নিই এই গতির বিরোধী হইবে অর্থাৎ তাহারা তাহাদিগের পূর্ব্বের অধিকৃত স্থানে থাকিতে চেষ্টা পাইবে। তাহাদিগকে নড়াইতে হইলে উল্লিখিত ব্যক্তির শারীরিক শক্তি প্রয়োগের আবশ্যক। তবে অগ্নিখণ্ডদ্বয়ের মধ্যে বৃহত্তরটী উঠাইতে অধিকতর শক্তি লাগিবে আর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রটীর পক্ষে অল্প, প্রথমোক্ত অগ্নিকে গুরু ও উহা যে দিকে থাকিতে চাহে তাহাকে নিম্ন কহে আর দ্বিতীয়োক্তকে লঘু ও উহা যে দিকে শক্তি দ্বারা চালিত হয় তাহাকে উর্দ্ধ কহে। উপরে কাল্পনিক উদাহরণ দ্বারা যাহা বুঝান হইয়াছে সাধারণতঃ পৃথিবীর উপর তাহাই ঘটিয়া থাকে; পৃথিবীস্থ মৃত্তিকাময় বস্তু আমরা অনেক সময় বায়ুমণ্ডলে লইয়া যাইতে চেষ্টা পাই, এই সকল বস্তু স্বভাবতঃ পৃথিবীতেই অন্যান্য মৃত্তিকা যেথানে আছে সেথানে থাকিতে চাহে। সুতরাং উহাদিগকে বায়ুমণ্ডলে লইতে হইলে শক্তি প্রয়োগের আবশ্যক; যে সকল বস্তু সহজেই লইয়া যাওয়া যাইতে পারে তাহাদিগকে লঘু ও যে দিকে লইয়া যাওয়া হয় তাহাকে উর্দ্ধ কহে আর উহাদিগের বিপরীতকে গুরু ও নিম্ন কহে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে প্লেটোর মতে উচ্চ ও নিম্নের বিভেদ লঘু ও গুরুর উপর নির্ভর করে। বস্তু সমূহ তাহাদিগের স্বস্ব অধিকৃত স্থানে থাকিতে চাহে—যেথানে মৃত্তিকা সমূহ থাকে সেথানে প্রত্যেক মৃত্তিকা কণা থাকিতে চাহে আর যেথানে বায়ু সমূহ থাকে সেথানে প্রত্যেক বায়ু কণা থাকিতে চেষ্টা পাইবে। এইরূপে প্রত্যেক বস্তুর স্বজাতীয় বস্তুর সহিত একত্র থাকিবার যেগুণ আছে তাহাকে উহার গুরুত্ব কহে আর এই গুণের বশবর্ত্তী হইয়া উহা যে দিকে ধাবমান হয় তাহাকে নিম্ন কহে; এই দুয়ের বিপরীতকে লঘু ও উচ্চ কহে। অতএব যদি দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির বস্তু (যেমন মৃত্তিকা ও বায়ু) লও যাহা জগতের ভিন্ন ভিন্ন অংশে অবস্থিত তাহা হইলে উহাদিগের একটীর পক্ষে যে দিক নিম্ন অপরটীর পক্ষে তাহা নহে, কারণ উহার একটী গুরুত্ব বশে যে দিকে যাইবে অপরটী সে দিকে যাইবে না। মসৃণ ও বন্ধুর এই দুয়ের কি কারণ তাহা সকলেই জানে। কাঠিন্যের সহিত অসমতা যুক্ত হইলে (অর্থাৎ কঠিন বস্তুর অণুগুলি যদি পরস্পরের অসমান হয়) বন্ধুরতা জন্মে; আর যাহাকে মসৃণ বলা যার তাহা সমতাও ঘনত্বের ফল মাত্র।

এক্ষণে দেখা যাউক আনন্দ ও কষ্টের কারণ কি; আমরা পূর্ব্বেই বস্তু সমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। এক শ্রেণীর বস্তু গতিশীল, তাহাদিগের কোন অংশে গতি সংঘটিত হইলে উহা ক্রমশঃ বৃহত্তর ও তাহা হইতে বৃহত্তর বৃত্তাকারে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে আর অবশেষে এই গতি আসিয়া মনের উপর কার্য্য করে; চক্ষু ও কর্ণ এই শ্রেণীর বস্তু তাহাদিগের মধ্যে অগ্নি ও বায়ু বিদ্যমান আছে। অপর এক শ্রেণীর বস্তু আছে যাহারা গতিবিহীন, তাহাদিগের এক অংশে গতি ঘটিলে তাহা অপরাপর অংশে ছড়াইয়া পড়ে না এবং মনের উপরও কোন কার্য্য করিতে পারে না। হাড়, মাংস ইত্যাদি শরীরের যে সকল অংশে মৃত্তিকার ভাগ অধিক সে সকল এই দ্বিতীয় শ্রেণীব বস্তু। আমাদিগের শরীরে যদি কোন অংশে হঠাৎ কোন প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন ঘটে আর তাহা যদি আমাদিগের প্রকৃতির বিপক্ষে হয় তবে তাহাতে আমাদিগের বেদনা হয়; এক্ষণে যদি আবার এই অবস্থাব হঠাৎ বিপরীত ঘটিয়া প্রকৃতির স্বপক্ষে পরিবর্ত্তন ঘটে তবে তাহাতে আমাদিগের আনন্দ হয়। যে পরিবর্ত্তন মৃদু ও অল্পে অল্পে সংঘটিত তাহা আমরা অনুভব কবি না আর যাহা প্রচণ্ড ও হঠাৎ সংঘটিত তাহা অনুভব করি। আবার যে পরিবর্ত্তন সহজে ঘটে তাহাতে কেবল জ্ঞান লাভ হয় মাত্র। চক্ষুতে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে তাহাতে আমোদও নাই কষ্টও নাই, তাহাতে কেবল জ্ঞান লাভ ঘটে কারণ এই সকল পরিবর্ত্তন সহজে ঘটিয়া থাকে; কিন্তু যখন শরীরের কোন অংশ হঠাৎ পরিপুষ্টি লাভ করে, তখন আমোদ হয় আর যখন হঠাৎ অস্বাভাবিক রূপে পরিবর্ত্তিত হয়, যেমন যখন কোন অংশ দগ্ধ হয় কিম্বা কাটিয়া যায়, তখন কষ্ট হয়।

এক্ষণে বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ করা হইতেছে। জিহ্বার পক্ষে দেখা যায় যে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায় ইহার পরিবর্ত্তনগুলি অণু সমূহের সংযোজন ও বিভাজন মাত্র, তবে জিহ্বার পরিবর্ত্তন সমূহে যেরূপ কর্কশতা কিম্বা কমনীয়তা লক্ষিত হয় তত আর কোন ইন্দ্রিয়ে নহে। মৃণ্ময় অণু জিহ্বার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরাতে প্রবেশ করিয়া যদি কঠোর ভাবে কার্য্য না করিয়া জিহ্বার উপর বিবেচকের কার্য্য করে অর্থাৎ কতক অংশ ক্ষয় করিয়া ধুইয়া ফেলে তবে তিক্ত রস অনুভূত হয় যেমন পটাশ ও সোডা। ইহার অপেক্ষা মৃদু বিবেচক রসকে লবণ কহে ইহার আস্বাদন এক রূপ আমোদকর বলিতে হইবে। লঘু বস্তু যাহা সহজেই ফাঁপিয়া উঠে যখন মুখের রসে মিশ্রিত হইয়া শিরোদেশে উত্থিত হয় তখন আমরা ঝাল অনুভব করি। এই সকল অণু আবার যখন পচিয়া সূক্ষ্ম হয় ও শিরার মধ্যে প্রবেশ করে ও তথায় মৃত্তিকা কিম্বা বায়ুর অণুর সহিত মিলিত হয়, তখন দুই প্রকার জলবুদ্বুদ উৎপন্ন হয়; এক প্রকার পরিষ্কার বুদ্বুদ স্বচ্ছ জলের আর এক প্রকার অপরিষ্কার মৃত্তিকামিশ্রিত জলের, দ্বিতীয় প্রকার জল ফুটিবে ও পচিতে থাকে—এই সকল পরিবর্ত্তনের কারণকে অম্লরস কহে। এই সকল রসের কার্য্য দ্বারা জিহ্বার অণুগুলি অস্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যে রসের কার্য্য জিহ্বার পক্ষে

সুখকর এবং উহার অণুগুলিকে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনে তাহাকে মিষ্ট বলা যায়।

গন্ধ সমূহ দুই প্রকারের—সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ; তাহাদিগের অপর কোন নাম নাই। যখন এক ভৌতিক বস্তু অপরে পরিবর্ত্তিত হয় তখনই আঘ্রাণ পাওয়া যায়, সামান্য বায়ু কিম্বা জলের কোন গন্ধ নাই। কিন্তু বায়ু যখন জলে পরিবর্ত্তিত হয় (কুয়াশা) কিম্বা জল বায়ুতে (ধূম) তখন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে অনুভূতি জন্মে; ঘ্রাণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু সমূহ জল অপেক্ষা সূক্ষ্ম আর বায়ু অপেক্ষা স্থূল।

শ্রবণ এক প্রকার ধাক্কার কার্য্য মাত্র; এই ধাক্কা কর্ণদ্বয় মধ্যে বায়ু, মস্তিষ্ক ও রক্তের সাহায্যে আত্মার পৌঁছে। ইহার ফল মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া, যকৃৎ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। যে শব্দ শীঘ্র চালিত হয় তাহাকে উদাত্ত বা চড়া আর যাহা ধীরে তাহাকে গম্ভীর বা নিম্ন কহে। যাহাকে উচ্চৈঃ শব্দ বলা যায়, তাহা শব্দের মাত্রার উপর নির্ভর করে; শব্দের সামঞ্জস্য অর্থাৎ তান লয় সম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে তাহা আমি পরে বলিব।

বর্ণ এক প্রকার অগ্নি শিখা মাত্র, ইহা সমুদয় বস্তু হইতেই নির্গত হয় আর ইহার অণুগুলি দর্শনেন্দ্রিয়ের নির্গত আলোকের উপযোগী। এই অণুদিগের মধ্যে কতকগুলি চক্ষু হইতে নির্গত অণুর সহিত সমান আয়তন কতকগুলি তাহা অপেক্ষা বড়, আর কতক গুলি ছোট। যে অণুগুলি চক্ষু হইতে নির্গত অণুর সহিত সমান আয়তন সেগুলি ইন্দ্রিয়ের অগোচর আর এই নিমিত্ত যে বস্তু হইতে তাহারা আইসে তাহাকে আমরা স্বচ্ছ কহি। যে অণুগুলি বৃহত্তর তাহারা চক্ষুর আলোককে কুঞ্চিত করে আর যেগুলি ক্ষুদ্রতর তাহারা উহাকে বিস্তারিত করে (যেরূপ উষ্ণ ও শীতল বস্তু মাংসকে আর যেরূপ কষায ও তীক্ষ্ণোগ্র বা ঝাল বস্তু জিহ্বাকে করিয়া থাকে) চক্ষুর আলোকের উক্ত দুই প্রকার পরিবর্ত্তনকে শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণ কহে; বিস্তারককে শ্বেত আর আকুঞ্চককে কৃষ্ণ বলা যায়। যখন বাহিরের আলোক চক্ষু হইতে নির্গত আলোককে শুদ্ধ ইহার বাহিরের অংশে নহে কিন্তু চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তারিত করে এবং চক্ষুর নালীগুলিতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে সজোরে খুলিয়া ফেলে তখন এই নালীগুলি গলিয়া যায় এবং তাহাদিগের হইতে যে জল ও অগ্নির মিশ্রন বহির্গত হয় তাহাকে অশ্রুজল কহে। যখন চক্ষুর আলোক বাহিরের আলোকের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত সবেগে বিদ্যুৎবৎ বাহির হইয়া আইসে এবং বাহিরের আলোক চক্ষু হইতে নির্গত অশ্রুজলে মিশিয়া নির্ব্বাপিত হয় আর তখন নানা প্রকার বর্ণ লক্ষিত হয়—এরূপ অবস্থাকে চক্ষু প্রতিহত হওয়া বা ঝল্সাইয়া যাওয়া কহে; আর যে বস্তু দ্বারা এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহাকে উজ্জ্বল চাক্‌চিক্যশালী এই নাম দেওয়া হয়। আর এক প্রকার আলোক আসিয়া চক্ষু জলে মিশ্রিত হয় যাহা দ্বারা উল্লিখিত বিদ্যুৎস্ফুরণ মনে হয় না। কিন্তু যাহাতে রক্ত

বর্ণ লক্ষিত হয় তাহাকে লাল রঙ্গ বলে। লাল ও শ্বেতের মিশ্রণে হরিদ্রা বর্ণ জন্মে, কিন্তু কি পরিমাণে এই মিশ্রণ ঘটিয়া থাকে তাহা নিশ্চয় বলা যায় না এমন কি অনুমান করিয়া বলিবারও উপায় নাই। লাল যখন কৃষ্ণ ও শ্বেতের সহিত মিশ্রিত হয় তখন পর্‌পল বা লালাভ বেগুনিয়া রঙ্গ জন্মে ইহাতে যখন আবার কৃষ্ণবর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় আর রঙ্গটী দগ্ধ করা হয় তখন যে বর্ণ জন্মে তাহাকে কাপিয় বা পিঙ্গল কহে। অরেঞ্জ অর্থাৎ নারাঙ্গীবর্ণ হরিদ্রা ও পিঙ্গলের মিশ্রণ, ধূসর শ্বেত ও কৃষ্ণের, পাণ্ডু শ্বেত ও হরিদ্রার শ্বেতবর্ণ ও চাক্‌চিক্যময় আলোক এই দুই যখন ঘন কৃষ্ণের উপর পতিত হয় তখন গাঢ় নীল বর্ণ জন্মে; গাঢ় নীল ও শ্বেতের মিশ্রণে পাত্‌লা নীল উৎপন্ন হয়; আর অরেঞ্জ ও কৃষ্ণের মিশ্রণকে কৃষ্ণাভ হরিৎ কহে। অন্যান্য বর্ণ সমূহ সম্ভবতঃ কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা এইরূপে বলা যাইতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি এবিষয়ে সত্য নিরূপণ করিতে চাহে সে ইহা ভুলিয়া যায় যে মানুষের বুদ্ধি ঈশ্বরের ন্যায় নহে। কারণ পরমেশ্বরই কেবল পদার্থ সমূহ পরস্পরের সহিত যুক্ত ও পরস্পরের হইতে বিযুক্ত করিতে পারেন; এরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা মানুষের সাধ্যাতীত।

কেতকা-ক্ষেমানন্দ।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডী রচনার কিছুকাল পরেই কেতকাদাস এবং ক্ষেমানন্দ দাস নামে দুইজন কবি এক গ্রন্থ রচনা করেন—মনসার ভাসান। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের মত তাঁহাদের ভাষার জোর নাই, কল্পনাও খেলে না। বর্ণনা বিষয়ে তাঁহারা মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস অপেক্ষা শতগুণে হীন। মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস যে প্রকৃতির অন্তঃপুরে গিয়া তাহার প্রাণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে—সেকালের কোন কবিই তাহা করেন নাই—কিন্তু যাহা দেখিয়াছেন তাহার যতটুকু বস্তুগত তাহা তাঁহারা কেতকা এবং ক্ষেমানন্দ অপেক্ষা ভালরূপে বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন। মনসার ভাসান রচয়িতারা স্থানে স্থানে মুকুন্দরামকে অনুকরণ করিয়াছেন—শুধু ভাবে নহে, ভাষায় পর্য্যন্ত কবি-কঙ্কণের সহিত অনেক ঐক্য দেখা যায়। কবিকঙ্কণের মত লেখার ধরণটা কিন্তু তাঁহাদের পাকা নহে। তাঁহারা যে উপাখ্যান লিখিয়াছেন তাহাতে কবিত্বরস বা ঘটনাবৈচিত্র্য বড় নাই, কেবল দুই চারিটা বাঁধা উপমা এবং অলৌকিক ঘটনায় যতদূর হয়। ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহারা গ্রন্থ লিখিতে বসেন নাই—লিখিতে হইবে বলিয়া দুই জনে ভাগাভাগি কাজ সারিয়াছেন। কেতকাদাস খানিক লিখিয়া বিশ্রাম করিয়াছেন,

ক্ষেমানন্দ লেখনী চালাইয়াছেন; আবার ক্ষেমানন্দ থামিতে কেতকা কলম ধরিয়াছেন। উভয় কবিই নিজ নিজ রচনার শেষে ভণিতায় স্বনাম উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। তাহাতে আমাদের কতকটা সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের কালনিরূপণপক্ষে তাহাতে কোন সাহায্য হইবে না। কারণ, সে সম্বন্ধে তাঁহারা একেবারেই নীরব। ভাষাই তাহার একমাত্র উপায়। ভাষা দেখিয়া তাঁহাদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র রায়ের বহুপূর্ব্বে যে তাঁহাদের অভ্যুদয়, তাহা স্থির।

মনসার ভাসানে গ্রাম্য কথার কিছু প্রাদুর্ভাব। অর্থবোধ সে জন্য অনেক স্থলে কষ্টসাধ্য। সকল কথা অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়াও দায়। অন্যান্য প্রাচীন কাব্যে সে সকল কথা প্রায় দেখা যায় না। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় ভাসানের ভাষা বাঙ্গলাদেশের কোনও বিশেষ অঞ্চল-ঘেঁসা। সে কোন্ অঞ্চল, আমরা বলিতে অক্ষম। তবে গ্রন্থের মধ্যে যে সকল নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকে ভাসান-রচয়িতাদের নিবাস বর্দ্ধমান জেলায় ঠাহরাইয়া থাকেন। আমরাও তাহার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাই না। সুতরাং মনসার ভাসানের গ্রাম্য কথাগুলি বর্দ্ধমান অঞ্চলেরই বিশেষ সম্পত্তি বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বাঞ্চলের কথার উপর কেতকাদাসের একটু তীব্র কটাক্ষ আছে। ঝড়ের সময় বাঙ্গালদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি মুচকিয়া মুচকিয়া হাসিয়াছেন। মনসার ভাসানের গ্রাম্য শব্দগুলি যে পূর্ব্বাঞ্চলের নহে তাহার প্রমাণ এইখানেই একরূপ হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এখন সে কথা লইয়া বিশেষ আন্দোলনের আবশ্যক নাই। চম্পকনগরের চাঁদ সওদাগরের সহিত মনসার বাদ ছিল। চাঁদ হেতাল লইয়া মনসাকে মারিবার জন্য ব্যস্ত। মনসাও যে উপায়ে পারিয়াছেন, চাঁদকে জব্দ করিতে ছাড়েন নাই। তিনি চাঁদের সাতখানি ডিঙ্গা ডুবাইয়া দেন, সাতটী পুত্রের প্রাণ হরণ করেন, চাঁদকে প্রত্যেক কার্য্যে বাধা দিয়া দিয়া জ্বালাতন করিয়া মারেন। তবুও কি হয়? চাঁদ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ - মনসার মাথা পাইলে হেতাল নিশ্চিন্ত রহিবে না, যেমন করিয়াই হোক মাথার সহিত দেহের বিচ্ছেদ ঘটাইবেই। পুত্রবধু বেহুলা কিন্তু হাতে হাতে মনসা পূজার ফল দেখাইয়া চাঁদকে মনসার দিকে লওয়ায়। বাসরে সর্পদংশনে নখীন্দরের মৃত্যু হইলে বেহুলা মৃতদেহ ক্রোড়ে ভেলায় করিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত ভাসিয়া যায়, এবং নেত ধোপানীর সাহায্যে সুরপুরে গিয়া নৃত্য গীতাদি দ্বারা দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিয় মনসার কৃপায় স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া পায়। মনসার বরে বেহুলার ভাসুরেরাও বাঁচিয়া উঠেন, চাঁদের সাতখানি ডিঙ্গার স্থলে চৌদ্দখানি ডিঙ্গা লাভ হয়। সুতরাং চাঁদ আর মনসাকে অবজ্ঞা করিতে পারেন না। খুব ধুমধাম করিয়া সাধু দেবীর পূজা করিলেন। কিছু দিন সুখে ঘরকন্না করিয়া নখীন্দর বেহুলা স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

কেতকা-ক্ষেমানন্দের মনসা কতকটা কবিকঙ্কণের চণ্ডীর অনুকরণ করিতে ভাল

বাসেন। চণ্ডী যেরূপ ব্যবহার করিয়া ধনপতির গৃহে প্রতিষ্ঠালাভ করেন, মনসাও সেইরূপ ব্যবহার করিয়া চাঁদবেণের গৃহে পূজিত হয়েন। ধনপতি চণ্ডীকে কিছুতে সহিতে পারিতেন না, সেই জন্য চণ্ডী মগরার নিকটে তাঁহার অনেকগুলি নৌকা ডুবাইয়া দেন; মনসাও দুর্ব্বিনীত চাঁদের ডিঙ্গাগুলি ডুবাইয়া দিলেন কালীদহে। চণ্ডী অনেক কষ্ট দিয়া পরিশেষে ধনপতির মঙ্গল করেন; মনসাও নাস্তানাবুদ্ করিয়া চাঁদের প্রতি সদয় হয়েন। তফাতের মধ্যে ধনপতির জীবনের সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদের ছায়া, আর চাঁদের কপালে কাঠুরিয়া, ব্যাধ, ধোপানী। মনসা যেন চণ্ডীর চেলা। চণ্ডী অপেক্ষা তাঁহার সাহস কিছু কম। কিন্তু স্ব-পূজা প্রচারার্থে উপায় অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি লক্ষিত হয় না। চাঁদ সদাগরও ধনপতির দ্বিতীয় সংস্করণ—কবিকঙ্কনের চণ্ডী কাব্য শেষ হইলে বুঝি কেতকা-ক্ষমানন্দের আহ্বানে মনসার ভাসানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। চণ্ডীর সহিত বিবাদে ধনপতির অস্ত্র শস্ত্র আবশ্যক হয় নাই, কিন্তু মনসার সহিত বাদে চাঁদ হেতাল লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। চণ্ডী ও মনসার আর পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। পাঠকেরা যাঁহার সহিত ইচ্ছা বাদ সাধিতে পাবেন। আমরা যথেষ্ট দূরে রহিলাম।

এই দূর হইতে একবার ভাসান-রচয়িতাদিগের বর্ণনা-সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক্। চাঁদবেণের পুত্র নখীন্দরের জন্মের কিছুকাল পরেই সায়বেণের গৃহে নখীন্দরের ভাবী অর্দ্ধাঙ্গ বেহুলার জন্ম হইল। কবি সুতরাং লেখনী হস্তে বেহুলাকে দর্শন করিতে বাহির হইলেন। দর্শনানন্তর সাধারণের সম্মুখে তাহার বর্ণনা করিতে বসিলেন,

"চন্দ্রমুখী খঞ্জননয়নী কলাবতী।
অধর অরুণ জিনি বিদ্যুতের দ্যুতি ॥
শ্রবণে কুণ্ডল তার খোঁপায় বকুল।
বেহুলার রূপেতে মোহিত অলিকুল ॥
দশন নিন্দিয়া কুন্দ কোরক সমান।
কোদণ্ড জিনিয়া যেন ভ্রূযুগ সন্ধান ॥" ইত্যাদি।

এখন কথা এই যে, এ বর্ণনা কিরূপ হইয়াছে? চন্দ্রবদন এবং খঞ্জন নয়ন প্রাচীন কাল হইতে এ দেশে রূপসীর লক্ষণ বটে। কেতকা-ক্ষমানন্দের বেহুলা সুন্দরীর সুতরাং এ দুই সৌন্দর্য্য না থাকিলে চলিবে কেন? কিন্তু এই খানেই শেষ নয়। বেহুলা আবার কলাবতী। সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এ কথাটা না বলিলে বোধ হয় হইত ভাল। কারণ, খানিক পরেই আবার আমাদের শুনিতে হইবে যে, বেহুলা এখনও বড় হয় নাই—পিতৃ গৃহেই নৃত্যগীত বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে।

ভাসান বচয়িতা যে তাড়াতাড়ি খোঁপা এবং দন্তপংক্তির বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন, শুনিলে বোধ হয় যেন বেহুলা জন্মাইতে না জন্মাইতেই যুবতী হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা মনে করিয়াছিল যে বেহুলার দাঁত উঠে নাই শুনিবে, তাহারা বড়ই নিরাশ হইয়া পাড়িবে সন্দেহ নাই।

বেহুলা নখীন্দর ত দিনে দিনে বাড়িতেছেন। এদিকে চাঁদ সদাগর নিজের গৃহ-দ্বারে আ মনসা পদাঘাতে জর্জ্জর। মনসা গণকবেশে সনকার নিকটে গিয়া বলিয়া আসিয়াছেন, তাহার গৃহে আজ রাত্রিকালে চুরী হইবে। চাঁদ কলাবনে খুস্থুর খুস্থুর নড়িতেছিলেন। সুতরাং চোরের দণ্ড ভোগ তাহাকেই করিতে হয়। চাঁদ ত দণ্ডভোগ করিলেন, কিন্তু মিথ্যাবাদিনী মনসা দেবীর কি কোনও দণ্ড নাই? বাঙ্গলাদেশে মিথ্যা কথার জন্য কেহ দণ্ডিত হয় না। আর মনসা ত স্বয়ং দেবী—তিনি যখন অকারণে অনর্গল মিথ্যা বলিয়া যাইতেছেন, তখন দুর্ব্বল মানব ভক্ত ত মিথ্যাচরণ শিখিবেই। দেবীর দণ্ড নাই দেখিয়া ভক্তেরা আশ্বস্ত। মিথ্যাচরণের এমন দণ্ডহীন সুবিধা আর কোথায়? প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অপাত্রে অন্ধভক্তি সংস্থাপনের যতটা চেষ্টা করা হইয়াছে, দেব চরিত্র গঠনের দিকে তাহার আংশিক মনোনিবেশ করিলে দেশের অনেক উপকার হইত। মিথ্যা দেবতার ভূষণ হইলে মানবে কি করিবে?

চাঁদ অম্লানবদনে লাথিগুলি হজম করিয়া ত গৃহে প্রবেশ করিলেন। আঃ! ভাবনা চিন্তা অনেক দূর হইল। এইবারে নখীন্দরের বিবাহ। একটী কন্যা মিলিলেই হয়। বেহুলার সন্ধান মিলিল। সব স্থির। বেহুলাকে কেবল পাতিব্রত্যের পরিচয় স্বরূপ লোহার কলাই রন্ধন করিতে হইবে। মনসা সহায়। নিমেষে রন্ধন হইয়া গেল। মনসার ভয়ে সাধু সাতালি পর্ব্বতোপরি এক লৌহের বাসরঘর নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। মনসা এদিকে গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া সেই লৌহবাসরে একটী ছিদ্র করাইয়া লইয়াছেন। বিবাহের পর নখীন্দর বেহুলা সেই ঘরে শয়ন করিয়া আছেন, দুই তিনটী সর্পের উদ্যম বেহুলার কৌশলে ব্যর্থ হইল, অবশেষে একটী সর্প গিয়া নখীন্দরকে দংশন করিল। নখীন্দর মরিলেন। ক্রন্দনের রোল উঠিল। বেহুলা স্বামীকে বাঁচাইবেই। সে এক কলার মান্দাসে চড়িয়া মৃত স্বামীক্রোড়ে ভাসিয়া চলিল।

পথে বেহুলাকে পরীক্ষা করিতে অনেক প্রলোভন। সে সকল প্রলোভন কাটাইয়া বেহুলা ত নেত ধোপানীর নিকট উপস্থিত হইল। বেহুলা এক দিন ধোপানীর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া একটী কাপড় কাচিয়া দিল। দেবতারা সে কাপড়ের বর্ণ দেখিয়া অবাক্। তখন ধীরে ধীরে নেত ধোপানীর দ্বারা বেহুলা দেবসভায় পরিচিত হইল। নৃত্যে সে দেবতাদিগকে মুগ্ধ করিল। ক্রমে কথায় কথায় সকল প্রকাশ হইলে দেবতারা বেহুলার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। মনসা আসিলেন। বেহুলা তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কার্য্য উদ্ধার করিল। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া

শ্বশুরকে মনসার ক্ষমতা বুঝাইয়া বেহুলা তাঁহাকে মনসার পূজা করাইল। বাঁধা নিয়মানুসারে দম্পতীর যথা সময়ে স্বর্গগমনও হইল।

এইবারে আমরা বেহুলার চরিত্র আলোচনা করিতে পারি। বেহুলা যে রীতিমত পতিব্রতা ছিল সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। পতিব্রতা না হইলে এত কষ্ট করিয়া সেই স্ফীত গলিত শবদেহ লইয়া একাকিনী অসহায় অবস্থায় সে কি আর অমন করিয়া বেড়াইত? বেহুলার ঐকান্তিক পতিভক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তবে ছিল না কি? লোহার কলাই পর্য্যন্ত যখন সে রন্ধন করিতে পারে, তখন রন্ধন-বিদ্যায়ও বেহুলা পারদর্শিনী বলিয়া বোধ হয়। কলাবিদ্যায়ও তাহার নৈপুণ্য। কিন্তু কেবল মাত্র গ্রন্থকারগণের মুখে বেহুলার গুণের ফর্দ্দ শুনিয়া তাহার সমস্ত চরিত্র বুঝা যায় না। তাহার প্রত্যেক কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গী বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে। নহিলে, সীতা সাবিত্রীর সহিত তুলনা করা অসম্ভব।

সীতার সহিত বেহুলার তুলনা করিতে যাওয়া নিতান্তই বাড়াবাড়ি। সে কোমল গম্ভীর সমুন্নত মাতৃ-প্রকৃতির সহিত বেহুলার কি তুলনা সম্ভব? পাতিব্রত্য এবং অলৌকিক ঘটনার সংযোগ হইলেই যদি সকল চরিত্রকে সীতার পার্শ্বে লইয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে সীতার আর মর্য্যাদা থাকে না। মনসার ভাসানের গ্রন্থকারগণ বেহুলার চরিত্রে সেরূপ সমুন্নত গাম্ভীর্য্য আদবেই ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, কেবল পুরাণের অনুকরণ করিয়া একটা অসম্ভব কাহিনী লিখিয়াছেন মাত্র। সে জন্য বেহুলাকে পতিব্রতাদিগের অগ্রগণ্য ঠাহরান যায় না। খুল্লনা তাহা হইলে কি দোষ করিল? সেও ত মৃত স্বামী ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছিল, চণ্ডী ধনপতিকে বাঁচাইয়া দিলেন। এইরূপ মৃত স্বামী ক্রোড়ে ক্রন্দন আর দেবতা বিশেষের সাহায্যে মৃতদেহের পুনর্জীবন লাভ প্রাচীন সাহিত্যে একরূপ দৈনন্দিন ব্যাপার। তাহা দিয়া সীতাকে ঘিরিলে সীতা অদৃশ্য হইয়া যাইবেন।

বেহুলা স্বামীর জন্য যাহা করিয়াছে সাবিত্রী অপেক্ষা কম নহে। কিন্তু সাবিত্রী উপাখ্যান-রচয়িতা সেই ভীষণা রজনীর অন্ধকার দিয়া যে কবিত্ব প্রস্ফুটিত করিয়াছেন, কলার মান্দাসের সাহায্যে কেতকা-ক্ষেমানন্দ তাহা পারেন নাই। মহাভারতের চিত্রটী যথোচিত ছায়ালোকে বড়ই গম্ভীর। কেবলই উপাখ্যান হিসাবে তাহা দেখিলে চলিবে না, চিত্র হিসাবে, কাব্য হিসাবে, সৌন্দর্য্যহিসাবে তাহা দ্রষ্টব্য। ভাসানের গ্রন্থকারকের এরূপ সৌন্দর্য্যরসজ্ঞান একেবারেই নাই। প্রাণে কবিত্ব থাকিলে ভাগীরথী বক্ষে ভাসিয়া যাইতে যাইতে কতকগুলি গ্রামের নাম সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হয় কে? চক্ষে পড়িয়াছে এতদেশ থাকিতে কেবল গোদ আর গোদা—যাহাতে রঙ্গরসের সুবিধা হয়।

বেহুলা ভিন্ন মনসার ভাসানে আর চরিত্র নাই। নখীন্দরই বল, চাঁদই বল, আর

সনকাই বল, একটী চরিত্রও ভালরূপ ফুটে নাই। বেহুলা কেবল যাহা অল্প বিস্তর দেখা দিয়াছে—তাহাও কেবল এক বিশেষ অবস্থায়। দেব চরিত্রের মধ্যে আছেন মনসা—যথেচ্ছাচারিণী, চাটুতৃপ্তা, সদসদুপায়ে কার্য্য-উদ্ধার-দক্ষা।

মনসার ভাসান হইতে সামাজিক কতকগুলি প্রশ্ন উঠিতে পারে। সেকালে ভদ্র পরিবার মধ্যে নৃত্য গীত শিক্ষা কি প্রচলিত ছিল? বেহুলা ত নৃত্যে খুব নিপুণা। সতীদাহ প্রথা তখন ছিল কি না? চাঁদসদাগরের পুত্রবধূদিগের একটীও ত সহমরণে যায় নাই। সে জন্য কোন নিন্দাও ত কৈ শুনা যায় না। ভাসানের কবিরা বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সহমরণকে দূরে রাখিতেও পারেন। কিন্তু বেহুলার নৃত্য নৈপুণ্যে তাঁহারা যেরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সে সময়ে কুলস্ত্রীর নৃত্যাদি শিক্ষা দোষের বলিয়া গণ্য হইত বোধ হয় না। তবে বেহুলার দেবসভায় নৃত্য অবশ্য দায়ে পড়িয়া। নাহলে, কুলস্ত্রীরা যে সভা মধ্যে নৃত্য করিতেন তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে।

ভাসান সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু বলিবার নাই। প্রাচীন সাহিত্যেও ভাসান বিশেষ উচ্চশ্রেণীর কাব্য নহে। ক্ষেমানন্দ কেতকা মনসার পূজা প্রচার করিতে কতদূর সফল হইয়াছেন বলিতে পারি না। বেহুলা নখীন্দর সুরপুরে মনের আনন্দে কাল যাপন করিতেছেন—দেবলোকে পার্থিব সুখের চূড়ান্ত উপভোগ। মনসাও চম্পকনগরের পূজা পাইয়া অবধি আছেন ভাল। কেবল আমরাই রোষদীপ্ত পাঠকের তীব্র কটাক্ষের সম্মুখে পড়িয়া ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া আছি। ভরসা করি, তাহাতে কাহারও হৃদয় দুঃখে প্লাবিত হইয়া উঠিবে না।

ফুলজানি।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মধ্যাহ্নে স্নানাহারান্তে পুরন্দর ধীরে ধীরে তালপুকুরের দিকে চলিল। সে পথ তাহার চির পরিচিত—দৈনিক ক্রীড়ার রঙ্গভূমি—কত মধুময় বাল্যস্মৃতি-হার তাহার সঙ্গে জড়িত। সে সব ছাড়িয়া কোন্ অপরিচিত দূরদেশে যাইতে হইবে ভাবিয়া পুরণের হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল। তাহার মনে হইতে লাগিল পথ পার্শ্বস্থ বৃক্ষ-রাজি তাহার সেই ধীর মন্দ গতি দেখিয়া বিস্ময়ে চাহিয়া আছে। অদূরে শাবক লইয়া তৃণ-ক্ষেত্রে শুকদম্পতি আহারান্বেষণে রত,—অন্য সময়ে সেই শাবক হরণের চেষ্টায় পুরন্দরের কত আনন্দ, কিন্তু এখন আর সে প্রবৃত্তি ছিল না। বরং আজ্ এই প্রথম

জীবনে তাহার অনুশোচনা হইল, কেন মিছা খেলার অনুরোধে এতদিন নিরীহ পক্ষী শাবকদের পিতা মাতার স্নেহ নীড় হইতে কাড়িয়া লইয়াছি! মনে হইল এক দিন ফুল কালীকে দিয়া নিষেধ করিয়াছিল কাকের ছানা মেরো না! অমনি বালিকা স্ত্রীর সরল সুন্দর মুখচ্ছবি মনে পড়িয়া গেল—পিতার দুর্ব্যবহারে সে কি ভাবিতেছে ভাবিয়া পুরন্দরের হৃদয়ে মহা যাতনা উপস্থিত হইল। সংসার তাহার যন্ত্রণা-আক্রান্তক মনে হইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে পুরন্দর তালপুকুরের বটতলায় গিয়া পৌঁছিল। তাহার ঘন ছায়ার নীচে সুশীতল শান্তি বিরাজ করিতেছিল—দূরে অদূরে সর্ব্বত্র মৃগ তৃষ্ণিকার ছলনা। পুকুরের কালো জলে দীর্ঘ তালগাছের দীর্ঘতর ছায়া সকল হিল্লোলে ঈষৎ কাঁপিতেছিল, কচিৎ ঘুঘুর সকরুণ গান, কখনও বা চীলের তীক্ষ্ণধ্বনি সেই বিজন মধ্যাহ্নের নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল।

অন্য সময়ে এই প্রচণ্ড রৌদ্রে ছুটিয়া পুরন্দর কখন ক্লান্তি বোধ করিত না, কিন্তু আজ্ ধীরে ধীরে আসিয়াও পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, স্বেদে সর্ব্ব শরীর ভিজিয়া গিয়াছিল। বটতলায় আসিয়া মৃদু শীতল বায়ু স্পর্শে তাহার শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল, পুরন ভাবিল পাঠশালার সময়টা এইখানেই কাটাইবে।

কিন্তু নির্জ্জন হইলেও এ স্থান তেমন নিরাপদ বলিয়া আজ্ পুরন্দরের মনে হইতেছিল না। গুরু মহাশয়ের প্ররোচনায় পাঠশালার ছেলেরা এখানে পর্য্যন্ত হল্লা করিতে পারে। রাখালেরা দেখিতে পাইলে ছুটিয়া আসিবে এবং ছোট বাবুকে বিচারাসনে বসাইয়া আপনাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ নালিশ সকল তাঁহার কাছে রুজু করিবে। কেহ মিষ্টান্ন খাইতে চাহিবে কেহবা বৃক্ষ জটায় ছোট বাবুকে উঠাইয়া দিয়া দোল দিতে ব্যস্ত হইবে। এ সকল রাখাল রাজ্যের কল্পনায় অন্য সময়ে পুরন্দরের বড় আনন্দ কিন্তু আজ্ এপ্রকৃতির চিন্তাও তাহার বিষবৎ বোধ হইতেছিল। কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছুক্ষণ পরে বটগাছের ঘন পত্রান্তরালে আত্মগোপন করাই তাহার কর্ত্তব্য বোধ হইল। গাছে উঠিয়া যে ডালটা পুষ্করিণীর দিকে হেলিয়া আছে পুরন্দর তাহাই আশ্রয় করিয়া বসিল।

আপনাকে এইরূপে "লোক লোচনের" বাহির সুতরাং নিরাপদ জানিয়া পঞ্চদশ বর্ষের বালক আত্ম চিন্তায় নিমগ্ন হইল। মনের আঁধারে কোথাও সে আলোক দেখিতে পাইতেছিল না। শাশুড়ীর সহিত পিতার অনর্থক বিবাদ কোন কালে ভঞ্জন হইতে পারে এখন তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না। তার পর পিতা তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে যান কেন? দেশেও ত পারসী পড়ার ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহার কোন উপায় না করিয়া, অতদূরে লইয়া যাওয়ার অভিপ্রায় কেবল তাহাকে কষ্ট দেওয়া। পিতার ব্যবহারে স্নেহ ও কোমলতা থাকিলে এ দুর্ভাবনা ছেলের মনে উঠিত

না, কিন্তু মহেশ্বর ঘোষ মহাশয় পুত্রকে "পঞ্চবর্ষানি" লালন পালন করিয়া ষষ্ঠ বর্ষ হইতে সেই যে "তাড়না" সুরু করিয়াছিলেন, "ষোড়শ প্রাপ্তি" পর্য্যন্ত তাহা অব্যাহত রাখাই তিনি প্রকৃত শাস্ত্রদর্শীর লক্ষণ মনে করিতেন। কলিকালের যেরূপ প্রাবল্য প্রজাদের ব্যবহারে তাঁহার শিক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে অনেক সময় চানক্য পণ্ডিতের "পুত্রমিত্র বদাচরেৎ" অনুশাসনাংশের উপর নায়ের মহাশয়ের বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হয়। অতএব অন্তরে বাৎসল্য রসের অভাব না থাকিলেও ষোষজা পুত্রের পঞ্চদশ বর্ষের শেষাশেষি তাহার প্রতি মৌখিক বা লৌকিক ব্যবহারটা আরও কিঞ্চিৎ কঠোরতর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সুতরাং পুরন্দর বিচার করিল বিদেশে কঠোরতর শাসনাধীনে রাখিবার জন্যই পিতা তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চান। স্থির করিল মাতাকে বলিয়া একবার চেষ্টা করিবে যাহাতে যাওয়া বন্ধ হয়। সে চেষ্টা নিষ্ফল হইলে পিতা মাতার নিকট হইতে পলাইয়া যাইবে সেও শ্রেয়। তার পর কি হইবে ভাবিতে ভাবিতে পুরন্দর অন্যমনস্ক হইতেছিল। এমন সময়ে কালীর হাসির শব্দে তাহার চমক ভাঙ্গিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঘন পত্রান্তরালে থাকিয়াও পুরন্দর ভাবিল, দুষ্টু বোন্‌টী তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। নহিলে প্রথম নম্বর এ অপথে তাহারা কাপড় কাচিতে আসিবে কেন? দ্বিতীয় তাহার আশ্রয় স্থানের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বোন্‌টী অত জোরে হাসিবে কেন? আর তৃতীয় এক নিঃসন্দেহ প্রমাণ, কনে অমন করিয়া ঘোমটা টানিবে কেন? কাজেই পুরন্দর মহা মুস্কিলেই পড়িয়া গেল। এবং আর গাছে থাকিয়া বোনটীর উচ্চতর হাস্যের কারণ হওয়ার চেয়ে অবতরণ করাই বিহিত জ্ঞান করিল।

অপ্রতিভ্ হইয়া পুরন্দর ঘাটের দিকে আসিতেছিল। ইচ্ছা বোনটীকে বুঝাইয়া দেয় যে সে যা মনে করেচে সেটা মিথ্যা কথা,—কনেকে দেখিবার জন্যে কিছু এখানে আসেনি। কিন্তু বালিকাদ্বয়কে হঠাৎ বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সেও সশঙ্কিত হইয়া দাঁড়াইল—আর অগ্রসর হইল না।

এ ভাবটা কিন্তু কাহারও বেশীক্ষণ রহিল না। ফুল ছুটিয়া গিয়া তাল গাছের অন্তরালে দাঁড়াইল এবং কাঁদ কাঁদ হইয়া সইয়ের উপর মৃদুমন্দ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে করিতে শপথ করিল—ঠাকুরের দিব্যি তোর সঙ্গে আর কোন দিনই কাপড় কাচতে যাব না।" মা যে বলিয়াছিলেন, "ছেলেকে বাপের অবাধ্য হতে শেখাতে নেই" সে কথা ফুলের মনে জাগিতেছিল। সই মার উপদেশ তুচ্ছ করিয়া ভারি অন্যায় করিয়াছে ভাবিয়াও তাহার ক্ষোভের সীমা রহিল না।

কালী মহা অপ্রস্তুতে পড়িল। সইয়ের শপথ ও রোদনে তাহার হাসি খুসি সব

উড়িয়া গিয়াছিল—ওদিকে পুরো দাদার সে ভাব দেখিয়াও সশঙ্কিত হইল। এমন সঙ্কটে আর সে কখন পড়ে নাই।

ধীরে ধীরে কালী সইয়ের কাছে গেল। ফুল তাহার হাসি তামাসা ভরা মুখ দেখিয়া জ্বলিয়া যাইতে প্রস্তুত ছিল তাহার বদলে বিষণ্ণ মলিন মূর্ত্তি দেখিয়া সেও নূতন করিয়া বিস্মিত হইল। কাজেই কালী যখন বলিল, সত্যি সত্যি সে জানিত না যে পুরোদাদা এখানে এসেছে তখন আর অবিশ্বাসের স্থান রহিল না।

তাহাতে সইয়ের উপর গোসা দূর হইল বটে, কিন্তু উদ্বেগ কমিল না। বলিল, "সই এখুনি কে দেখ্‌বে, বল্‌বে বেহায়া মেয়ে দেখ, বরকে এয়েচে লুকিয়ে দেখ্‌তে!"

কালীরও সেই ভাবনা—কিন্তু সইকে আশা ভরসা না দিয়া সেও যদি অবসন্ন হয়, তা হলে ফুলের কি দশা হবে! স্বাভাবিক প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে কালী উপেক্ষার হাসি হাসিল, বলিল "সবতাতেই তোর ভয়—কে আস্‌বে এখানে?"

ফুল আবার বলিল—"কিন্তু মা যে বলেছিলো, মা বাপের অবাধ্য হতে শেখাতে নেই!"

ঠিক এই কথাটা একই মুহূর্ত্তে কালীরও মনে উদয় হইয়াছিল, কিন্তু ঠাকুরাণীটী তাহাও অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিলেন। সইকে বুঝাইলেন একটু অপেক্ষা করুক, পুরো দাদাকে দুটো কথা সে বলে আস্‌বে।

ফুল এ প্রস্তাবে সম্মত হইল কিন্তু এই সর্ত্তে যে সই বেশী কথা কবে না, আর বেশী দেরি কর্‌বে না। বিয়ের পর থেকে পুরো দাদাকে কালী একটু একটু "সমিহ" করিতে আরম্ভ করিয়াছিল,—সাক্ষাতে তেমন ছুটাছুটি করিতে তাহার কেমন বাধ বাধ ঠেকিত। অতএব ধীরে ধীরে গেল।

পুরন্দরের মূর্ত্তি বিষাদভরা, কিন্তু কালীকে কাছে আসিতে দেখিয়া সে ভাবটা লুকাইতে চেষ্টা করিয়া অপ্রতিভের হাসি হাসিল। বলিল—"বোনটী তুই যা ভেবে হাস্‌ছিলি সত্যি সত্যি কিন্তু তা নয়। তোরা যে এখানে আস্‌বি, আমি তার কিছুই জানিনে—সত্যি!

এখন বিদ্রূপের সুযোগ কালী অনায়াসে উপেক্ষা করিল। আগেকার মত প্রশস্ত দৃষ্টিতে পুরন্দরের দিকে চাহিতেও পারিল না। মুখনত করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"আমরাও জান্‌তাম না দাদা, তুমি এখানে আস্‌বে। তা হলে আস্‌তাম না। সইমা বলে যে, মা বাপের অবাধ্য হতে শেখাতে নেই। সইয়ের তাই ভাবনা হয়েচে, আমরা তোমায় বাপের অবাধ্য হতে শেখালাম।"

কথাটা পুরন্দরের হৃদয়ে গিয়া লাগিল। একটু আগে সে স্থির করিয়াছিল, পিতার কথা শুনিবে না। হটাৎ মনে একটা অভাবনীয় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ

পরে কালীর মুখের দিকে কোমল করুণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া পুরন বলিল—"আচ্ছা বোন্‌টী বলিস্ আমি আর বাবার অবাধ্য হব না।"

বেগে পুরন্দর তালপুকুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কালী ধীরে ধীরে সইয়ের কাছে ফিরিয়া আসিল। তখন দুই সইয়ে ভয়ে ভয়ে কাপড় কাচিল এবং ভয়ে ভয়ে ঘরে ফিরিয়া চলিল।

প্রায় বিংশতি বৎসর গত হইল আমি এবং আমার একজন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু একত্রে বোল্‌পুরে যাইতেছিলাম; তখন হাওড়ার সাঁকো হয় নাই—এই জন্য ষ্টীমারে পার হইতে হইত। আমরা দুই জন ষ্টীমারে পায়চালি করিতেছি ইতিমধ্যে একটি অপরিচিত ভদ্রলোক আমার বন্ধুর গোঁপের পক্ক দশা নিরীক্ষণ করিয়া তাহার প্রতি-বিধান মানসে অচিরাৎ কলপ লাগাইবার জন্য আমার ঐ শ্রদ্ধেয় বন্ধুটিকে নেহাত পেড়াপিড়ি করিয়া ধরিয়াছিলেন; তাহাই অবলম্বন করিয়া প্রথম সর্গ লিখিত হইয়াছিল।

পরে আমার ঐ বন্ধুর শ্রীমুখাৎ শুনিলাম যে, ঐ ঘটনাটি তাঁহার পক্ষে নূতন নহে; উহারই জুড়ি ঘটনা আর একবার তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল—তাহাতেই দ্বিতীয় সর্গের উদর-পূর্ত্তি হইয়া গেল।

গুম্ফ-আক্রমণ কাব্য।

প্রথম সর্গ।

প্রবীণ সাধুর সঙ্গে, বিপ্র-যুবা বিনা ভঙ্গে,
বহুকাল সখ্য-ডোরে বাঁধা।
বয়সের যে অনৈক্য, তার প্রতি নাহি লক্ষ্য,
সে অনৈক্যে প্রীতির কি বাধা॥
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে, উদয় হইল মনে,
বোলপুরে করিব গমন।
সুরম্য প্রত্যুষ কাল, নিবেদয়ে দ্বার-পাল,
"অশ্ব রথ প্রস্তুত রাজন্॥"
আনন্দ উল্লাসে দোঁহে, চলে মহা সমারোহে
নিমেষে পাইল গঙ্গাকূল।
মুহূর্ত্ত না বিলম্বিতে, নিরখিল আচম্বিতে,
ভাগীরথী মহা হুলস্থূল॥

ব্যোমে উড়াইয়া ধূম, শব্দে কাঁপাইয়া ভূম,
হন্ হন্ আসে বাষ্পযান।
ঝাঁকিল লোকের পাল, ক্ষুদ্র গাড়ি লয়ে মাল,
বেগে ধায় ব্যথিয়া পরাণ॥
রবিতাপে পেয়ে ব্যথা, ছায়াতরু-তলে যথা,
পথিক জনের ঘুচে খেদ।
তরণীর বাতায়নে, পদ মাত্র পরশনে,
সব দুঃখ হইল বিচ্ছেদ॥
আসন গ্রহণ প্রতি, দোঁহার না হ'ল মতি,
ইতস্ততঃ করে সংক্রমণ।
দৈবের কি দেখ লীলা, জামা গায় স্বল্প ঢিলা,
উত্তরিলা এক মহাজন॥
শুভ্রকেশ শিরে ছাঁটা, যেন সজারুর কাঁটা,
অধিকাংশ নয়ন গোচর।
অবশিষ্ট অংশোপরি, টুপি শোভে আহা মরি,
তেলোমাত্রে করিয়া নির্ভর॥
দেহখানি শুষ্ক শীর্ণ কে বলিবে জরাকীর্ণ,
অস্থিগুলি আছে মজবুত।
বয়স সোত্তোর ষাটি, খাড়া তবু যেন লাটি,
পরাজয় মানে রবিসুত॥
মানুষটি নির্ব্বিবাদী, ভদ্রতা বিনয় আদি
জিহ্বামূলে অনাহূত আসে।
নাহি বাধা নাহি দ্বন্দ্ব, নাহি কোন ভাল মন্দ,
মনে যাহা বাক্যে পরকাশে।
মৃদু মন্দ ধীর গতি, আইলেন তিনি তথি
যাত্রী দোঁহে দাঁড়াইয়া যথা।
সহজ মিষ্ট ভাষায়, পরিচয় জিজ্ঞাসায়,
ক্রমে ক্রমে বিস্তারিল কথা॥
মোকর্দ্দমা ছিল তাঁর, সম্ভাবনা জিতিবার,
করিলেন তাহার বাখান।
এই বলিলেন শেষে, "সে কালে ছেলে বয়েসে,
ইংরাজে আছিল ভাল জ্ঞান॥

আছিল প্রত্যয় দড়, ওরা সত্যবাদী বড়,
ভুলেও না কহে মিথ্যা-লেশ।
এবে একি চমৎকার, দেখি ভিন্ন ব্যবহার,
বঞ্চক শঠের এক শেষ॥
যোগাড় করিনু কত, ছ মাস অনবরত,
কত ক'ব সে সব তোমায়।
এখন ভরসা হয়, মোকর্দ্দমা হবে জয়,
বড় কষ্ট দিয়াছে আমায়॥"
নিজের কার্য্যের কথা,অন্যের কি মাথা ব্যথা,
সে বোধ নাহিক তাঁর মনে।
ভদ্রতার অনুরোধে, তাঁর বাক্য অবিরোধে,
শিরোধার্য্য করিল দুজনে॥
এতেক যত প্রসঙ্গ, মুহূর্ত্তে হইল ভঙ্গ,
প্রাচীন যাত্রীর পরমাদ।
গোঁপ তার অমায়িক, ছাপিয়াছে দুই দিক,
শ্বেতবর্ণ এই অপরাধ!
মহাজন গোঁপ নিষ্ঠ, হইলেন গোঁফাক্লিষ্ট,
মন্ত্র-বলে যেন সর্প ধরা।
সভ্যতার বাঁধ টুটি, কহিলেন মুখ ফুটি,
কথা গুলি উপদেশ ভরা॥
"অমন সুন্দর গোঁপ, ওতে না দিলে কলোপ,
ভবে আসি কি তবে করিলে।
তোমার ও-গোঁপখানি,সামান্য ত নাহি মানি,
তপস্যায় কারো ভাগ্যে মিলে!
ব্যয়মাত্র পাঁচ টাকা, একটী না রবে পাকা,
ইথে কেন করিছ কার্পণ্য।
নেড়া-গির্জ্জে যা'বা মাত্র,মিলিবে অতি সুপাত্র,
গুণী মাঝে যিনি অগ্রগণ্য॥
তাঁর হস্তে তব মোচ, পেয়ে কলপের পোঁচ,
অমনি হইবে কালো মিষ॥
অনায়াসে হবে ধন্য, যুবা মধ্যে হবে গণ্য,
বয়ঃক্রম উনিশ কি বিষ॥

পাঁচটি টাকার তরে, গোঁপ থাকে অনাদরে,
ইহা ত পরাণে নাহি সয়।
টাকায় কি আসে যায়, টাকা কি গো সঙ্গে যায়!
সৎকাজে করিয়া লও ব্যয়॥
আমার এ গোঁফখানি, এ তো অতি ক্ষুদ্র-প্রাণী,
তোমার উহার তুলনায়।
কটাক্ষেতে কলপের, চেহারা ফিরেছে এর,
ব্যাপারটি ভেলকীর প্রায়॥
হেন উপদেশ, করি শেষ,
নিজ গোঁফের কেশ, গরবে হেরে।
নেত্র লভি তৃপ্তি, পায় দীপ্তি,
নিখিল গোঁফময়, আদরে ফেরে॥
(আহা) আপন গোঁফময়
নয়ন ফেরে!
(মরি) নিখিল গোঁফময়
নয়ন ফেরে!
দুজনা অবাক্! লাগে তাক্!
ফুলিছে মুখ নাক, হাস্যের লাগি।
চাপি রাখে তায়, ভদ্রতায়,
চাপিয়া রাখা দায়, উঠিলে চাগি॥

ইতি শ্রীগুম্ফ-আক্রমণকাব্যে গু-ম্ফোৎকর্ষবিধান নামকোঽয়ং প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ।

আরম্ভে নূতন সর্গ, শুন গো পাঠক বর্গ,
সবিনয়ে এই ভিক্ষা চাই।
হও আসি মম সঙ্গী, চতুর্দ্দশ বর্ষ লঙ্ঘি,
উজান বাহিয়া লয়ে যাই॥
প্রাচীন যাত্রীটি যিনি, বহু পূর্ব্বে তাঁরে চিনি,
দক্ষিণ প্রদেশে যবে বাস।

গোঁপের গোড়ার কাছে,সবে পাক ধরিয়াছে,
রাহুকে বা শশী করে গ্রাস!
একটুকু ক্ষান্ত হও, অর্দ্ধ গ্রাস হ'তে দেও,
তাহা নহে, একি বিপরীত!
পাকের সবে শৈশব, এ সময়ে উপদ্রব
তার প্রতি হয় কি উচিত?
কিন্তু অদৃষ্টের লেখা, খণ্ডে না-ক এক রেখা,
সেই কালে বাবু একজন
মাথায় জরির তাজ, শরীরে জম্‌কালো সাজ,
করিলেন কাছে আগমন॥
বৃদ্ধ তিনি বিচক্ষণ, কিন্তু সব বিলক্ষণ!
দেখিলে তাঁহার ভাব গতি
মনে হয় অনুমান, আছে জুড়াবার স্থান –
দ্বিতীয় পক্ষের রূপবতী॥
আপনি সুভোক্তা বড়, অন্যে খাওয়াইতে দড়,
দিন রাত্রি জ্বলিতেছে চুলী।
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, অতিমাত্র উপাদেয়,
ভুঞ্জে লোক দুঃখ-শোক ভুলি॥
মসলা কোটার চোটে, হামান দিস্তায় ওঠে,
ঠুং ঠুং শব্দ অবিরল।
সৌরভ তথায় কিবা, বিচরিছে রাত্রি দিবা,
মনোভৃঙ্গে করয়ে পাগল॥
এক প্রস্ত ভাজাভুজি, সম্মুখে হইলে পুঁজি,
আর তাহা ফিরিয়া না যায়।
তার পরে উপনীত, লুচি মোণ্ডা মনোনীত,
ফল মূল পরের দফায়॥
বৃহৎ ব্যাপার পরে, শোভে কিবা থরে থরে,
কালিয়া পোলাও গাদা গাদা।
কি গুণ পাঁঠার হাড়ে অম্বলের তার বাড়ে;
কে বুঝিবে ইহার মর্য্যাদা॥*

* পাঁটার হাড়ের (মাংসের নহে—হাড়ের) অম্বলের ইনি সবিশেষ মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন।

কেবল আহার দানে, কভু না সন্তোষ মানে,
বলবৎ হিতৈষণা তাঁর।
এবাড়ী ওবাড়ী ফিরি,সব-তাতে কর্ত্তাগিরি!
নাহি তায় বিষয়-বিচার ॥
ভকতির বেগ তাঁর, সামলায় সাধ্য কা'র,
সাধুটিরে বলিতেন "মুনি"।
(শ্বেত হৈলে গোঁফ ভুরু, তবে মুনিত্বের সুরু,
ইহা তাঁর কাজ নাই শুনি!)
কি মনে করিয়া এবে, সাধু নাহি পায় ভেবে,
এত প্রাতে কেন আগমন!
আস্তে ব্যস্তে ত্বরান্বিত, করি তাঁরে সম্মানিত,
বসিবারে দিলেন আসন ॥
বাবুজি ক্ষণেক পরে, কহেন আগ্রহ-ভরে,
"প্রস্তাব আমার এক আছে—
ভাবিতেছি পূর্ব্বাবধি! শুনেন আপনি যদি,
বলি তবে আপনার কাছে ॥
কত আর মৌন র'ব—আসন্ন বিপদ্ তব—
এই বেলা হোন সাবধান।
দেখেন না আরসীতে, কি হতেছে গোঁপটিতে!
প্রতীকার উচিত বিধান ॥
হেন গোঁপ মনোলোভা,নিভ-নিভ তার শোভা!
আর কি উচিত অবহেলা?
যদি পরামর্শ চান, কলপ শীঘ্র লাগা'ন
লাগা'ন কলপ এই বেলা ॥
মস্ত গুণী—শিল্পী ভারি—অদ্যই পাঠা'তে পারি—
কি আজ্ঞা করেন গুরুদেব?
শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি, বিলম্বে কার্য্যের হানি
শুভস্য শীঘ্রং অতএব!"
সাধুটি এতেক শুনি, অন্তরে প্রমাদ গুণি,
সাত পাঁচ ভাবিয়া কহেন।
"করিলাম শিরোধার্য্য! কিন্তু প্রকৃতির কার্য্য
অনিবার্য্য—মাপ করিবেন!"

বাবুজী সদয় মতি, না বুঝিয়া ভাল গতি,
আপাততঃ হইলেন ক্ষান্ত।
সাধু প্রবোধিল মনে, "বাঁচিলাম এতক্ষণে,
একি ঘোর বিপদে আক্রান্ত॥"
সাধু বিবেচক বটে, তবু না আইল ঘটে—
হিতৈষণা কত বেগ ধরে।
যার যবে চাপে ঘাড়ে,স্বপ্নে না তাহারে ছাড়ে,
অনুরাগ বাড়ে পরে পরে॥
রবি না হইতে অস্ত বাবু হন সমীপস্থ,
ভবি কভু ভুলিবার নয়।
সাধু ভাবে মনে মনে, "পুনর্ব্বার কি কারণে,
গতিক বেয়াড়া অতিশয়!"
পূর্ব্ববৎ আক্রমণ, কি কহিব বিবরণ,
বিজ্ঞ বোঝে অত্যল্প বচনে।
গোঁপ লয়ে টানাটানি,দিনরাত্রি নাহি মানি
লাগিলেন সাধুর পিছনে॥
বিনয়েতে সাধু কহে, (বুঝি চক্ষে অশ্রু বহে,
এইরূপ মুখের আকৃতি!)
"ছাড়ুন ছাড়ুন মোরে, নিবেদি চরণ ধরে্য,
জানেন ত আমার প্রকৃতি!"
বাবুর দয়ার্দ্র চিত্ত, সাধুরে করি নিবৃত্ত,
বলে "সে কি কথা মুনিবর!
এতই অনিচ্ছা যদি, ক্ষান্ত হৈনু অদ্যাবধি
হবেন না আপনি কাতর॥"
এইরূপে দুই পক্ষ, বিস্তারিয়া নিজ পক্ষ
নিঃশব্দে হইল তিরোহিত।
এক দিন বাঙ্গালায়, সাধু বসি নিরালায়
ভাবেতে আছেন বিমোহিত॥
দেখেন ইত্যবসরে, (হরে হরে হরে হরে!)
একে নেড়ে তাহে গুপ্তচর!
কিসের কিপাত্র হাতে—কিবস্তু যে আছে তাতে
সাধুর জ্ঞানের অগোচর॥

সেলামিয়া বারে বারে, আইল সে গৃহ-দ্বারে,
সাধু ভাবে "এ কি পাপ-দৃশ্য !"
বলে সে দুয়ারে থামি "কলপ-ওয়ালা আমি
পাঠালেন আপনার শিষ্য ॥"
সাধু বলে"একি জ্বালা,এইবেলা শীঘ্র পালা,
নতুবা উচিত শিক্ষা পাবি।"
যবন ঢুকিয়া ঘরে কলোপ বাহির করে !
কোথায় গড়ায় তাই ভাবি !
সাধু আর নাই সাধু (কে যেন করিল জাদু)
ফোঁস্ ফোঁস্ করে নাসা-ফণী।
রক্তবর্ণ চক্ষু দুটি, ধরেন ধরেন টুঁটি,
শ্মশ্রুধারী হটিল অমনি ॥
চউকাট ঠিকরিয়া, পড়িল সে হাঁ করিয়া,
পাড়া-শুদ্ধ পড়িল ঝুঁকিয়া।
যবন ঝাড়িয়া দাড়ি, চলি গেল তাড়াতাড়ি,
দুই হাতে সেলাম ঠুকিয়া ॥
জ্ঞান করি লব্ধ, হয়ে স্তব্ধ,
মুখে নাহিক শব্দ, ভাবেন মুনি।
হইত অগত্যা, নরহত্যা
ক্রোধের বলবত্তা, বিষম গুণি ॥
বেচারা গরিব, ক্ষুদ্র জীব,
দোষ করিল মনিব, ওর কি দোষ !
করিলি সম্পূর্ণ, দর্পচূর্ণ,
রে হলাহল পূর্ণ, দুরন্ত রোষ !

ইতি শ্রীগুম্ফ-আক্রমণকাব্যে পূর্ব্বাক্রমণনামকোঽয়ং দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ।

চড়িয়া মনের তরি, কালের তটিনী তরি'
ফিরে চল যাই সেই ক্ষণে।

বাষ্প-যানে যাত্রী তিন, মনোসুখে যেই দিন
কাল হরে মিষ্ট আলাপনে ॥
তরণী তীরের প্রায়, চকিতে ওপারে যায়,
যাত্রী সবে দ্রব্যাদি গুছায়।
পশ্চাতে রাখিয়া পোত, চলিল লোকের স্রোত
পিপীলিকা হারি মানে তায় ॥
উগরি ধূমের ধ্বজ, ফুঁসিছে আয়স গজ,
অগ্নিময় অঙ্কুশের তাপে।
গমনের অনিচ্ছায়, বারেক আগু-পিছায়,
তক্ তক্ ধক্ ধক্ দাপে ॥
প্রথম ঘণ্টার রোল, লোকের বিষম গোল,
দ্বিতীয় ঘণ্টায় সব চুপ।
গজরাজ অগ্রসরে, ক্রমে নিজ মূর্ত্তি ধরে,
দুরন্তের সংহার-লোলুপ ॥
পশ্চাতে শকট-যূথ, দেখিবারে অদভুত,
টানি লয়ে চলিল গৌরবে।
পদ বিমর্দ্দন চোটে, মেদিনী কাঁপিয়া ওঠে,
বিদরে আকাশ ভীম রবে ॥
সর্ব্বজন হিত-কাম, ভদ্রতার এক ধাম,
কলপ-বল্লভ মহাজন।
অল্প উপলক্ষ পেলে, কিবা বৃদ্ধ কিবা ছেলে,
সবা প্রতি করেন যতন ॥
লঙ্ঘিয়া নগর গ্রামে, আড্ডায় যখন থামে,
করিবর হাঁপ ছাড়িবারে।
মহাজন গুম্ফধারী, পাত্রে করি ল'য়ে বারি
চৌদিকে তাকা'ন বারে বারে ॥
সহসা করিতে পান, না করেন ভাল জ্ঞান;
দিতে যা'ন তাহা সাধুবরে।
মনে উপজিতে তর্ক, হইয়া কিছু সতর্ক,
কোন্ জাতি জিজ্ঞাসেন পরে ॥
সাধু টানি লয়ে হস্ত, "বলেন আমি কায়স্থ,"
কহিলেন তবে মহাজন

"সেবি আমি অহিফেন, যদি অনুমতি দেন,
আমি আগে সাধি প্রয়োজন॥
দুধ সহে বিনা ক্লেশে, আমাদের এ বয়েসে
অহিফেন বড় অনুকূল।
অহিফেনে আয়ু বাড়ে, মজ্‌বুতি হয় হাড়ে,
শীঘ্র নাহি পাকে গোঁপ চুল॥"
হেন কথা হৈতে সাঙ্গ, মাতঙ্গ সে আয়সাঙ্গ,
মেমারির আড্ডায় থামিল।
গুছাইয়া দ্রব্য আদি, মহাজন নির্ব্বিবাদী,
শিষ্টাচার করিয়া নামিল॥
হেতায় নিরালা পেয়ে, পরস্পর মুখ চেয়ে,
মনোসাধে হাঁসিল দুজনা।
থামিলে হাস্যের কোপ, সাধু বলে "পাপ গোঁপ
কামাইলে যায় যে যন্ত্রণা!"
বিপ্র কহে হাস্য ভরে, এমনো কি কাজ করে,
গোঁপ তুল্য আছে কি রতন।
কালো গোঁপ মনোলোভা, বাড়ায় মুখের শোভা
পাকিলেই বিজ্ঞের লক্ষণ॥
গোঁপের অবহেলায়, বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায়,
তা দিলে যোগায় আসি তূর্ণ।
মহা মহা গুম্ফী যাঁরা, দিক্‌পাল-সমান তাঁরা,
অবনী তাঁদের যশে পূর্ণ॥
একি মোর পাগ্‌লামি! গোঁপের মাহাত্ম্য আমি
বচনে কি ফুরাইতে পারি?
পঞ্চমুখে পঞ্চানন, চেষ্টা পেয়ে ক্ষান্ত হন,
বাণী হন বাণীর ভিখারী॥
শুনিলে সুশ্রাব্য, এই কাব্য, কবি-কুল-অভাব্য
মধুর ছটা।
লভে ইষ্ট সিদ্ধি, গোঁপ বৃদ্ধি, যে চায় যে সমৃদ্ধি,
কালো কি কটা॥
পড়ে যেইলোক, এই শ্লোক, পায় সে গুম্ফলোক
ইহার পরে।

যথা গুম্ফধারী, ভারি ভারি, গোঁফের সেবা করি,
সুখে বিচরে ॥

ইতি শ্রীগুম্ফাক্রমণ কাব্যে গুম্ফ-
মাহাত্ম্য নামকোঽয়ং তৃতীয়ঃ
সর্গঃ।
সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ পরমহংস দেবের জীবন চরিত্র।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

শিবনারায়ণ নেপাল রাজ্যে চলিয়া গেলেন। নেপালে যাইতে নেপালের লোকেরা শিবনারায়ণকে বলিল যে বিনা পাশে তোমাকে নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিব না। এই কথা শুনিয়া শিবনারায়ণ শেমুরা বলা হইতে পাশ লইয়া অন্তর্যামির কৃপা দ্বারা নেপালে গেলেন। সেইখানে রাজধানীতে গিয়া রাজবাটির দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে একজন রাজা বাটি হইতে বাহির হইলেন। রাজা শিবনারায়ণকে দেখিলেন এবং বুঝিলেন যে কোন দরিদ্র এখানে দাঁড়াইয়া আছে। শিবনারায়ণ বলিলেন যে হে রাজন্ আমার একটি প্রার্থনা আছে যদি আপনি গম্ভীর ভাবে শুনেন তাহা হইলে বলিব। রাজা তখন একজন চাকরকে বলিলেন যে এই দরিদ্রকে দুই চারিটি পয়সা দিয়া তাড়াইয়া দাও, এই বলিয়া রাজা চলিয়া গেলেন। শিব-নারায়ণের কথা শুনিলেন না। শিবনারায়ণ ভাবিয়া দেখিলেন যে সকল রাজার তো এইরূপ ভ্রান্তি হইয়াছে। এই ভাবিয়া পুনরায় সেখান হইতে পশ্চিমমুখে একদণ্ডা, শিসাগড়ি হইয়া পাহাড়ে পাহাড়ে হরিদ্বারে গিয়া পৌছিলেন এবং জলামুখি হইয়া জম্বু রাজ্যেতে চলিয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া শুনিলেন যে রাজা সেখানে নাই, কাশ্মীরে গিয়াছেন। শিবনারায়ণ শুনিয়া অমনি পাহাড়ে পাহাড়ে চলিয়া মটনগ্রাম হইয়া কাশ্মীর রাজ্যে গেলেন। যাইয়া রাজার বাটিতে যেস্থানে কাঙ্গালি এবং সাধুদিগকে অম্বরনাথে যাইবার জন্য খরচা দেওয়া হয় সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে

ছোট দেওয়ান সাধুদিগকে অম্বরনাথে যাইবার খরচা দিয়া বিদায় করিতেছিলেন। যখন দেওয়ান সাধুদিগকে বিদায় করিয়া অবসর পাইলেন তখন শিবনারায়ণ দেওয়ানকে বলিলেন যে, হে দেওয়ানজি মহাশয়, আপনি রাজার সহিত কি একবার অল্প সময়ের জন্য দেখা করাইয়া দিতে পারিবেন? দেওয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য তোমাকে দেখা করাইয়া দিব। তুমি কে, সাধু সন্ন্যাসী না পণ্ডিত যে তোমার সহিত দেখা করা ইয়া দিব। যদ্যপি তুমি সাধু সন্ন্যাসী হইতে তাহা হইলে তোমার গেরুয়া কাপড় কিম্বা রুদ্রাক্ষের মালা থাকিত, তোমার তো কোন লক্ষণ নাই। যদ্যপি তুমি পণ্ডিত হও, কোন শাস্ত্র পড়িয়া থাক তো কোন শাস্ত্রের দুই একটা শ্লোক বল তাহা হইলে রাজার সহিত দেখা করাইয়া দিব। সংস্কৃত না পড়িলে কি রাজার সহিত দেখা হইতে পারে? যদ্যপি কিছু শাস্ত্র না পড়িয়া থাক তাহা হইলে রাজার সহিত দেখা হইবে না। তোমার মতন অনেক দরিদ্র কাঙ্গালি সাধু আসিতেছে যাইতেছে। যদ্যপি অম্বরনাথ তীর্থ দর্শন করিতে তোমার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে যেরূপ সাধুদিগকে বিদায় করিয়াছি সেই-রূপে তোমাকেও দুই টাকা ও চাউল ডাউল দিয়া বিদায় করিব। যদ্যপি না লও তো এখানে রাজার সহিত দেখা হইবে না"।

শিবনারায়ণ বলিলেন যে, হে দেওয়ানজি আমি সাধু কি আর কেহ, বিদ্যা পড়িয়াছি অথবা না, এখন পরিচয় দিবার প্রয়োজন কি? রাজার কাছে আমার দেখা করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু কেবল সৃষ্টিচরাচরের কষ্ট জানাইতে এবং পরমেশ্বর সম্বন্ধে সৎউপদেশ দিবার ইচ্ছা ছিল। যদ্যপি রাজা ও পণ্ডিতগণ আমার সহিত না দেখা করেন তাহা হইলে তাহাতে আমার কোন হানি বা লাভ নাই, তাহাদেরই হানি লাভ।"

দেওয়ান বলিলেন যে,—"তুমি এখন যাও, দুই চারি দিবস পরে পুনর্বার কোন সময় আসিও আমি দেখা করাইয়া দিব।"

শিবনারায়ণ বলিলেন—"আমি দুই চারি দিবস থাকিব না, শীঘ্র চলিয়া যাইব।" তাহা শুনিয়া দেওয়ান বলিলেন যে, "চলিয়া যাবে যাও তোমার খুসি।"

শিবনারায়ণ সেখান হইতে গ্রামের বাহিরে আসিয়া বসিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে অম্বরনাথে ইহারা যায়,—যাইয়া কি দর্শন করে। অম্বরনাথ নাম জ্যোতিঃ-স্বরূপ ঈশ্বরের। তাঁহার কখন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। তিনি সর্ব্বজ্ঞ পরিপূর্ণ আছেন। সেই অম্বরনাথ জ্যোতিঃস্বরূপকে দর্শন করিলে জীব অমর হয়, মৃত্যু ভয় থাকে না। আপনি সদা আনন্দরূপ থাকে। সেই সার অম্বরনাথ তীর্থ। তাঁহাকেই দর্শন করা জীবের সার্থক। শিবনারায়ণ এই রূপ ভাবিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, যখন এই সকল সাধু এবং গৃহস্থ অম্বরনাথ দর্শন করিতে যাইতেছে, আমিও যখন এখানে আসিয়াছি,

উহাদের সঙ্গে যাইয়া দেখি উহারা কি দর্শন করে ও কি অবস্থা ঘটে। এবং ইহাও পরব্রহ্ম মাতা পিতার লীলা, দেখিয়া যাওয়া চাই। সকলে যখন চলিল শিবনারায়ণও তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। মটন গ্রামে আসিয়া যাত্রীরা বাসা করিয়া সেইখান হইতে ছয় সাত দিনের জন্য খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইল এবং সকলে অম্বরনাথের রাস্তা ধরিয়া চলিল। যেখানে রাত্রি হইত সেইখানে বিশ্রামের জন্য জঙ্গলের মধ্যে আড্ডা করিত। পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে দর্শন করাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে থাকিত এবং অগ্রে যাইয়া স্থানে স্থানে জলের ঝরনার নিকট একটী কুণ্ড খুলিয়া পুষ্প দিয়া সাজাইয়া রাখিত এবং যাত্রীদিগকে বলিত যে এই কুণ্ডে যে ব্যক্তি আড়াই আনা হইতে পাঁচ সিকা পর্য্যন্ত দিবেন তাঁহার ফলের কোন সীমা নাই। তাহার কৈলাস বৈকুণ্ঠ শীঘ্র প্রাপ্তি হইবে। এইরূপ অনেক অনেক স্থানে যাত্রীদিগকে পশু বানাইয়া পাণ্ডারা পয়সা উপায় করিত। এবং একস্থানে পাহাড়ে যাইয়া পাণ্ডারা একটা প্রস্তর তুলিয়া অন্য একটী প্রস্তরের উপর চাপাইয়া বলিল যে, যে ব্যক্তি এইরূপ প্রস্তর খণ্ডের উপর প্রস্তর খণ্ড তুলিয়া এইস্থানে ইহাতে পয়সা টাকা দিবে তাহার কৈলাস বৈকুণ্ঠ লাভ হইবে। এমন দানের ফল আর কোন স্থানে নাই। এই ফলের কথা শুনিয়া দুই আড়াই হাজার গৃহস্থ এবং সাধু যাত্রীরা পাথরের উপর পাথর তুলিয়া এবং টাকা পয়সা দিয়া যাহার যেরূপ শক্তি পাণ্ডা দিগকে সেইরূপ দান করিতে লাগিল। দান করিয়া সেখান হইতে অগ্রসর হইল। পাণ্ডারা মনে মনে এই বলিয়া খুসি হইল যে যাত্রীদিগকে বেশ পশু পাইয়াছি। কাশ্মীর হইতে দুই চারি জন ইংরাজ ঘোড়া চড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল। যাত্রীরা গিয়া কি দেখে ইংরাজদের ইহাই দেখিবার ইচ্ছা। অম্বরনাথে কতকগুলি মুসলমানও যাত্রীদের সঙ্গে ছিল। তাহারা দেখিয়া দেখিয়া হাসিত ও পরস্পর বলাবলি করিত যে হিন্দুর ন্যায় অবোধ আর কোন দেশেতে নাই। কেন না পাণ্ডারা ইহাদিগকে ফাঁকি দিয়া ঠকাইয়া টাকা পয়সা লইতেছে—ইহারা বুঝিতেছে না, ইহারা সরল লোক, ইহাদের ছল কপট নাই। পরে যাত্রীরা এক পাহাড়ের উপর আসিল। সেই খানে চারিদিকে পাহাড়, মধ্যে জল। জঙ্গলেতে ঢোঁড়া ঢেম্‌না সাপ অনেক; দুই একটা নজরেও পড়ে। ঐ পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে বলে যে এখানে শিব আছেন। শীঘ্র টাকা পয়সা এখানে দিয়া দর্শন কর। এখানকার তুল্য ফল কোন খানে নাই। শিব সাপের রূপ ধরিয়া মাথা তুলিয়া আছেন, শীঘ্র দর্শন কর, নতুবা জলে মাথা ডুবাইয়া লইবেন। সাধু গৃহস্থ যাত্রীরা তৎকালে সেই কথা শুনিয়া সাপ দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল, যে, হে সাপ শিব ভগবান, আমাদিগকে রক্ষা করুন। এবং পাণ্ডাদিগকে টাকা পয়সা দান করিতে লাগিল। দান করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গিয়া অম্বরনাথ হইতে

তিন ক্রোশ দূরে পাহাড়ের নিকটে ভৈরোঁগড্ডির নীচে যাইয়া আড্ডা করিল। সেখানে সকল দ্রব্যাদি রাখিয়া যাত্রীদিগের অম্বরনাথ দর্শন করিতে যাইতে হয়। রাত্রিতে ভৈরোঁগড্ডি পাহাড়ে যাত্রীদিগকে উঠিতে হয়। 'প্রাতঃকাল হইলে সূর্য্য-নারায়ণ না প্রকাশ হইতে হইতে অম্বরলিঙ্গকে দর্শন করিতে হয়'। নতুবা সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ হইলে বরফের লিঙ্গ সূর্য্যনারায়ণের তেজে গলিয়া জল হইয়া যায় এই জন্য পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে প্রাতে দর্শন করায়। রাত্রিতে ভৈরোঁগড্ডি পাহাড়ে যাত্রীরা উঠিতে লাগিল। উঠিতে উঠিতে দুই চারি জন বরফের ভিতরে ডুবিয়া গেল এবং দুই চারি জনকে মরা পাওয়া গেল। প্রাতঃকাল হইলে ভৈরোঁগড্ডি পাহাড়ে উঠিয়া পড়া গেল। ঐ পাহাড়ের উপর একটা পাথরের টুক্‌রা দাঁড় করান আছে, আন্দাজ ৯।৫ হাত হইবে। সেই পাথরকে দেখাইয়া পাণ্ডারা বলে যে এই ভৈরোঁজি দাঁড়াইয়া আছেন। তোমরা ইহাঁকে দর্শন কর এবং টাকা পয়সা দান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় কর। এই দানের বড় মাহাত্ম্য ও ফল আছে। যাত্রীরা এই কথা শুনিয়া দান করিয়া পাহাড় হইতে চলিল। যাইবার সময় পাণ্ডারা যাত্রিদিগকে দেখাইয়া দিল যে দেখ ঐ অম্বর নাথ গুহার মধ্য হইতে দুইটা কপোত (পায়রা) উড়িয়া যাইতেছে। যে পুণ্যবান হইবে সেই ব্যক্তিই উহা দর্শন করিবে। যে ব্যক্তি পাপী হইবে সে দর্শন পাইবে না। এই কথা শুনিয়া গৃহস্থ এবং সাধু সকলে বলিতে লাগিল যে আমি দর্শন পাইয়াছি। মনে ইচ্ছা যে কেহ পাপী না বলে। আর কেহ বলিল যে উহা সাদা এবং কেহ বলিল উহা কাল। পাণ্ডারা তখন যাত্রীদিগকে বলিল যে দর্শন করাইবার পয়সা দাও। যাত্রীরা দর্শন করাইবার পয়সা দিয়া পাহাড় হইতে নীচে নামিতে লাগিল। অম্বরনাথ গুহার মধ্য হইতে যে দুইটা পায়রা উড়িতেছে ইহার সার অর্থ এই যে অম্বরনাথ শুদ্ধ চেতন কারণ পরব্রহ্ম। তাহা হইতে দুইটা পায়রা অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ জ্যোতির্মূর্ত্তি এই আকাশ গুহা হইতে উদয় অস্ত হইতেছেন অর্থাৎ দিন রাত্রি প্রকাশমান আছেন। চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরকে পায়রা শব্দে জানিবেন। পায়রাকে পুণ্য-বান্ ব্যক্তি যে দেখিতে পায় আর পাপী ব্যক্তি যে দেখিতে পায় না, ইহার সার অর্থ এই যে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের প্রিয় ভক্তজন অর্থাৎ পুণ্যবান্ অর্থাৎ জ্ঞানবান পুরুষ এই পায়রা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ ঈশ্বরকে চিনিতে পারেন এবং জানেন যে তিনি সকল পাপ ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া সদা আনন্দরূপ থাকেন। আর পাপী শব্দে অজ্ঞানী ব্যক্তি। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু হইতে যে বিমুখ সেই ব্যক্তি। ইহারা জ্যোতিঃস্বরূপকে দেখিতে পায় না অর্থাৎ চিনিতে পারে না।

অম্বরনাথ দর্শন করিবার পথের মধ্যে পাহাড়ের পাথর ফাটিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্য দিয়া একজন মনুষ্য আসিতে যাইতে পারে এরূপ পথ আছে। তাহার নাম পাণ্ডারা কল্পনা করিয়াছে গর্ভযোনি। যে এই গর্ভযোনিতে দান পুণ্য করিয়া পার হইয়া অম্বরনাথ

যাইবে তাহার আর জন্ম মৃত্যু হইবে না। সেই কথা শুনিয়া যাত্রীরা এই গর্ত্তযোনি মধ্যে দান পুণ্য করিতে লাগিল এবং করিয়া সেই গর্ত্তযোনির পথ দিয়া বাহির হইয়া গেল। একটা মুসলমান গর্ত্তযোনির দ্বারের আগে থাকে ও আর একজন পিছনে থাকে। আগে পয়সা দান লইয়া তবে গর্ত্তযোনি হইতে বাহির হইতে দেয় এবং এক এক মুষ্টি বিভূতি দেয়। যাত্রীরা—স্ত্রী পুরুষ এবং সাধু মহাত্মা লোক সেই বিভূতি গায়ে মাখিয়া অম্বরনাথকে দর্শন করে। কিন্তু যে ব্যক্তির কাছে পয়সা না থাকে তাহাকে গর্ত্তযোনির পথ হইতে বাহির হইতে দেয় না, তাড়াইয়া দেয়। এক পয়সা মাত্র দিলে গর্ত্তযোনি হইতে মনুষ্য মুক্তি পায় কিন্তু শিবনারায়ণের কাছে পয়সা ছিল না সেই কারণে মুসলমান এবং পাণ্ডারা শিবনারায়ণকে গর্ভযোনির পথ দিয়া যাইতে দিল না। শিবনারায়ণ অন্য রাস্তা দিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার গর্ত্ত-যোনি দিয়া যাইবার কোন আবশ্যক ছিল না। তিনি কেবল পরমাত্মার লীলা এবং সৃষ্টির কষ্ট দেখিয়া বেড়াইতেন।

গর্ত্তযোনি কাহাকে বলে? ইহার সার অর্থ এই যে এই মায়াপ্রপঞ্চ অহংকার আশা, তৃষ্ণা, লোভ, মোহ রূপই গর্ত্তযোনি। এবং এই গর্ত্তযোনি হইতে যিনি উর্ত্তীর্ণ হন তিনি গর্ত্তযোনি পার হইয়া যান অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মাতে যাঁহার নিষ্ঠা শ্রদ্ধা ভক্তি আছে এবং অসৎ পদার্থে যাঁহার চিত্তের আসক্তি জন্মে না তিনিই লোভ মোহরূপ গর্ত্তযোনি হইতে মুক্ত হইয়া সদা অনাদিকাল আনন্দরূপ থাকেন এবং যে ব্যক্তি অহংকার ইত্যাদি অজ্ঞানেতে অন্ধ হইয়া আত্মা পরমাত্মাকে না চিনে তিনি অন্ধকাররূপ অজ্ঞান গর্ত্তযোনিতে পতিত হইয়া থাকেন, এইরূপ বুঝিয়া লইবে।

পরে সেখান হইতে সকল যাত্রী অম্বরনাথ গুহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গুহার নিকটে পাহাড়ের উপর হইতে বরফ গলিয়া জল পতিত হইতেছে। তাহাকে পাণ্ডারা অমরগঙ্গা নামে কল্পনা করিয়াছে। উহারা যাত্রীদিগকে বলিল যে তোমরা স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি সকলে উলঙ্গ হইয়া এই অমরগঙ্গাতে স্নান করিয়া মুসলমান যে বিভূতি দিয়াছে তাহা অঙ্গে লেপন করিয়া এখানে টাকা পয়সা দান কর। ইহার বড় মাহাত্ম্য আছে এবং এখানে শিবের আজ্ঞা আছে যে এখানে উলঙ্গ হইয়া গুহাতে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে হয়। এই কথা শুনিয়া যাত্রীরা স্ত্রী পুরুষ সাধু মহাত্মা উলঙ্গ হইয়া অমরগঙ্গাতে স্নান করিয়া বিভূতি মাখিয়া দান পুণ্য করিয়া অম্বরনাথ গুহাতে যাইয়া অম্বরনাথকে দর্শন করিতে লাগিল এবং পাণ্ডারা দান পুণ্য করাইতে লাগিল। সেই গুহার চারিদিকে মুসলমানগণ বসিবার জন্য গর্ত্ত করিয়া গুহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া থাকে এবং পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে বলিয়া দেয় যে এই মুসলমানদের নিকট হইতে পয়সা দিয়া বিভূতি কিনিয়া লও। ইহার

বড় মাহাত্ম্য আছে। কিন্তু সেই বিভূতি ব্যবসায়ের পয়সার মধ্যে হইতে পাণ্ডারা অংশ পায়। পাণ্ডাদের মুসলমানদের সহিত এই সর্ত্ত আছে যে, যত টাকা পয়সা অম্বরনাথে যাত্রীরা দিবে তাহা চারি অংশ করিয়া দুই অংশ মুসলমানেরা লইবে, এবং এক অংশ হইতে যাইবার পথ পরিষ্কার করাইয়া দিবে—আর এক অংশ পাণ্ডাদের প্রাপ্য। এইরূপ সিন্ধু দেশে হিংলাজ নামে এক তীর্থ আছে। সেখানেও মুসলমানেরা এইরূপ পয়সা লয়। এবং এক এক জন স্ত্রীলোক যাহারা বুদ্ধিমতী, যাহারা উলঙ্গ হইতে পারে না, তাহারা লজ্জা নিবারণার্থ এক একটা ভূর্জপত্র কোমরে জড়াইয়া লইয়া থাকে। কিম্বা যদি কোন স্ত্রীলোক লজ্জাবশতঃ কাপড় ছাড়িতে না পারে তাহাকে সকলে সাধু গৃহস্থ ইত্যাদি যাত্রিরা পাপী বলে। অম্বরনাথে যে মুসলমানরা থাকিত তাহারা এবং যে দুই জন ইংরাজ কাশ্মীর হইতে দেখিতে আসিয়াছিল তাহারা পরস্পর গল্প করিয়া তালি দিয়া হাসিত। বলিত ইহারা কি করিতেছে।

এইরূপ তীর্থযাত্রা দেখিয়া শিবনারায়ণ যাহা বলিয়াছেন শুন। অম্বরনাথ গুহার মধ্যে যাইয়া কি দর্শন পাওয়া যায়? ঐ সকল পাহাড়ের উপর কেবল বার মাস বরফ জমিয়া থাকে। অম্বরনাথ গুহার সম্মুখে পাহাড়ের ভিতর কয়েক স্থান ফাটিয়া গিয়াছে। সেই ফাটা পাথরের উপর হইতে বরফ গলিয়া গলিয়া ঐগুহার মধ্যেও কয়েক স্থানে বরফ জমিয়া যায়। কোন স্থানে ছোট কোন স্থানে বড় কোন স্থানে নীচু কোন স্থানে উঁচু। পাণ্ডারা ইহার মধ্যে দুইটি চূড়াকার বরফকে সেই দিবস উত্তমরূপে পালিস করিয়া অম্বরনাথ এবং পার্ব্বতী কল্পনা করিয়া রাখে এবং যাত্রীদিগকে বলিয়া দেয় যে, তোমরা ইহাঁদের দর্শন কর। যাত্রীরা সেই কথা শুনিয়া সেই বরফের পার্ব্বতী এবং শিবলিঙ্গের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে এবং ভক্তি পূর্ব্বক স্পর্শ করিয়া চরণ ধূলি লইতেছে এইরূপ জ্ঞান করে। পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে বলে যে, আমি কেমন তোমাদের ইষ্টগুরু শিব ও পার্ব্বতী ঈশ্বরকে তোমাদিগকে প্রত্যক্ষ দর্শন করাইলাম। যাত্রীরাও প্রসন্ন হইয়া ধন্যবাদ এবং টাকা পয়সা দেয়।

ক্রমশঃ।

মহাযজ্ঞ—আহুতি।

শুক্রবার, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

মহাযজ্ঞের মঙ্গলময় উদ্বোধন অবসানে স্বদেশ-ভক্ত সন্তানগণের হৃদয় বিপুল তেজ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। আজি তাঁহারা প্রাতঃকাল হইতে দলে দলে পরস্পরের গভীর প্রীতি ও অনুরাগ আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বদেশের কল্যাণকর বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্ব দিন যে সকল প্রতিনিধি ও দর্শক দূরবর্ত্তী স্থান হইতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, আজি তাঁহারা প্রত্যূষকাল হইতে দলে দলে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। অপরাহ্ন একটার সময় জননীর পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রতিনিধি ও দর্শকবর্গ একান্ত উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে নিরূপিত সময়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব দিন উদ্বোধন শেষ হইলে কলিকাতা, ঢাকা, রাজসাহী, ভাগলপুর, ছোটনাগপুর, বেহার, বেনারস, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা, লাহোর ও দিল্লী, সিন্ধু, গুজরাট, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য, কানাড়া ও খান্দেশ, বেরার, মধ্য প্রদেশ, এবং মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানের সর্ব্বশুদ্ধ ১০৯ জন সভ্য প্রস্তাব নির্দ্ধারক সমিতির জন্য নির্ব্বাচিত ও নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলে এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বেলা ১০টার সময় মহাযজ্ঞের আলোচ্য অবশিষ্ট প্রস্তাব নির্দ্ধারণ জন্য একত্র সমবেত হইলে প্রস্তাব নির্দ্ধারক সমিতির পুনরায় অধিবেশন হইল। সমস্ত প্রস্তাবগুলি নির্দ্দিষ্ট হইলে পরে জাতীয় মহাসমিতির ভবিষ্যৎ আকার নিরূপণ ও কার্য্য পরিচালন উদ্দেশে ত্রয়োদশ প্রস্তাব পরিগঠনের জন্য একটি বিশেষ সব্-কমিটি নিয়োগ পূর্ব্বক ১টার পূর্ব্বে উক্ত সমিতির কার্য্য শেষ হইল।

১টা বাজিবার বহুক্ষণ পূর্ব্বেই সুবিশাল যজ্ঞ-গৃহ জনস্রোতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। বহু সংখ্যক নূতন প্রতিনিধির সমাগমে যজ্ঞভূমির নির্দ্দিষ্ট আসনে সঙ্কুলান হইল না, যে স্থানে অল্প পরিমাণে শূন্য স্থান ছিল সেই খানেই নূতন নূতন আসন সংস্থাপিত হইল। দর্শকের সংখ্যা পূর্ব্ব দিনের সংখ্যা অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে অধিক; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উপবেশনের উপযোগী স্থান অভাবে দণ্ডায়মান হইয়া গভীর উৎসাহের সহিত নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আজি ব্যবস্থাপক সভা সমূহের সংশোধন ও পরিবর্ত্তন বিষয়ক শ্রীযুক্ত ব্র্যাডল সাহেব প্রণীত পাণ্ডুলিপির সমালোচন ও তৎসম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের মত গ্রহণ পূর্ব্বক উহার সংস্করণ ও

পরিবর্দ্ধন সাধিত হইবে, এই উৎসাহে প্রতিনিধিবর্গের হৃদয় পরিপূর্ণ। কি প্রতিনিধি, কি দর্শক সকলেরই স্থির সঙ্কল্প-উদ্দীপ্ত, গম্ভীর ও চিন্তামগ্ন মুখমণ্ডল এবং উৎসাহ পরিপূর্ণ চক্ষুর জ্যোতির্ম্ময় ভাব দর্শনে মৃতবৎ অসাড় প্রাণ নবজীবনে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। পৃথিবীতে এমন হৃদয়বান অসাধারণ প্রতিভা-শালী চিত্রকর কোথায় যিনি অপূর্ব্ব মহাসাধনায় দীক্ষিত এই বিরাট মণ্ডলীর তদানীন্তন অনির্ব্বচনীয় উদ্দীপনা-পূর্ণ জীবন্তভাব যথাযথ পর্য্যাঙ্কনে স্বকীয় অদ্ভুত চিত্র-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে সক্ষম? শত শত বর্ষের কঠোর অধীনতার তীব্র কশাঘাতে যাহাদের হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যুগযুগান্তরের নিদারুণ অবনতির দুর্ব্বহ লৌহ-শৃঙ্খল-ভার গলদেশে বহন করিয়া যে জাতির বিকশিত মনোবৃত্তি নিচয় একান্ত হীন প্রভ ও লৌহের ন্যায় ঘোর মসীবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই জ্বলন্ত এক প্রাণতা-উদ্দীপ্ত মহাসাধনার ভাব কেমন গভীর আশ্বাস ব্যঞ্জক। এই সুদুর্লভ একাগ্রতা তাহাদের ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের পথে সমুজ্জ্বল আলোকবর্ত্তিকার ন্যায় কার্য্য করিবে।

একটা বাজিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই প্রাধানাচার্য্য মহাশয় উপস্থিত হইলেন: অমনি প্রতিনিধি ও দর্শকবর্গ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া গগন-ভেদী আনন্দ-কোলাহলে তাঁহাকে অন্তরের সহিত অভিবাদন দান করিলেন। ক্ষণকালের জন্য এই গভীর আনন্দ-ধ্বনি নিস্তব্ধ হইতে না হইতেই ভারতবন্ধু ব্র্যাডলর আগমনে উহা পুনরায় উচ্ছ্বসিত হইয়া গভীরতর ভাব ধারণ করিল—দুঃখিনী জননীর পরিচর্য্যায় নিয়োজিত সহস্র সহস্র সুসন্তানগণ তাঁহাকে যথোচিত অভিবাদন দান ও তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ জন্য নূতন তেজ ও নূতন উৎসাহ সহকারে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-কোলাহলে নিমগ্ন হইলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে বিশাল যজ্ঞ-মন্দির ক্রমশঃ প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল।

প্রায় দেড় ঘটিকার সময় সভাপতি মহাশয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলে পর মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আর্ড্লে নর্টন্ শ্রীযুক্ত সমাসুন্দরমের (?) সমভিব্যহারে বেদীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মহাসমিতির নিয়মানুসারে মান্দ্রাজ কেন্দ্রের নির্দ্দিষ্ট সমিতির (Standing Committee) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ সভাপতি মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলেন।

অনন্তর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ফেরোজ সা মেটা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে শ্রীযুক্ত চার্লস্ ব্র্যাড্লর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিক হইতে রাশি রাশি টেলিগ্রাম ও অভিনন্দন পত্র আসিতেছে। উহার সংখ্যা এত অধিক যে তৎসমস্ত তাঁহার হস্তে অর্পণ করা একান্ত অসম্ভব। তৎসমস্ত পাঠ করিতে এক পক্ষ সময়ের আবশ্যক না হইলেও নিঃসন্দেহ এক সপ্তাহ কাল

অতিবাহিত হইবে। এই সহস্র সহস্র টেলিগ্রাম ও অভিনন্দন পত্র পৃথক পৃথক ভাবে তাঁহার হস্তে অর্পণের পরিবর্ত্তে সকলের সুবিধার জন্য সমস্তগুলি একটি বৃহৎ টেবিলের উপর স্থাপিত হউক এবং তৎসমস্ত পঠিত স্বরূপে গৃহীত হউক। যখন এই সমস্ত টেলিগ্রাম ও অভিনন্দন পত্র সমষ্টি শ্রীযুক্ত ব্র্যাড্‌ল সাহেবের সম্মুখে স্থাপিত হইবে, তৎকালে সমস্ত দেশের প্রতিনিধি স্বরূপ এই মহাসমিতির পক্ষ হইতে একখানি পৃথক অভিনন্দন পত্র পঠিত ও তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হওয়া উচিত।

মাননীয় পণ্ডিত অযোধ্যানাথ এই প্রস্তাবের অনুমোদন এবং মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত জন্ য়্যাডাম্ উহার সমর্থন করিলেন। অনন্তর সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল :—অত্র সমবেত এই মহাসমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত চার্লস্ ব্র্যাড্‌ল, এম, পি, সাহেবকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হউক, উল্লিখিত অভিনন্দন পত্র পঠনের জন্য শ্রীযুক্ত য়্যাডাম্, শ্রীযুক্ত ফেরোজ সা মেটা ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এই তিন জন একটি কমিটি স্বরূপে নিয়োজিত হউন।

অনন্তর সভাপতি মহাশয় বলিলেন –"ভদ্র মহোদয়গণ, প্রথম এবং অত্যাবশ্যক বিষয় যাহা আজ আপনাদিগের আলোচনার জন্য উপস্থিত হইবে তাহা ব্যবস্থাপক সভা নিচয়ের সংস্কার প্রণালী বিষয়ক প্রস্তাব। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে উক্ত সভাগুলির সংস্কার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ব্র্যাডল সাহেব পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন, উহা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে। আমরা সকলেই উহা দেখিয়াছি এবং আমি বিবেচনা করি যে আমাদের মধ্যে সকলেই উহা পাঠ করিয়াছেন, উক্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার সম্বন্ধে জাতীয় মহাসমিতি যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তৎসমস্তই আইনের ভাষায় উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কতকগুলি অত্যাবশ্যক বিষয়ে ভারতবাসিগণের স্থিরতর মত সংগ্রহ করাই ব্র্যাডল সাহেবের অভিপ্রায়। আমি তাঁহার পক্ষ হইয়া বলিতে সমর্থ যে উক্ত পাণ্ডুলিপিতে যে সকল বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একটিও তাঁহার ইচ্ছানুসারে উহাতে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। সাধারণতঃ ভারতবাসিগণের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট ও বিশদ রূপে লিপিবদ্ধ করিবার জন্যই উহা লিখিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে আইনের ভাষায় যে সকল প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে তাহাদের অবতারণা বর্ত্তমান অভিপ্রেত নহে কারণ উহা একান্ত অনাবশ্যক, উহাতে কোন্ কোন্ বিষয় সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত, তাহার মূল নীতি সাধারণতঃ বিশেষরূপে উল্লেখ করাই বর্ত্তমান উদ্দেশ্য। অতএব বিশেষ বিবেচনা ও যুক্তি পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে যে সকল প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে তৎসমুদায় আপনাদের বিবেচনার জন্য এক্ষণে উপস্থাপিত হইবে। উহার অবতারণার জন্য আমি শ্রীযুক্ত আর্ডলে নর্টন্ সাহেবকে প্রথম প্রস্তাব উল্লেখ করিতে অনুরোধ করি।

অনন্তর শ্রীযুক্ত নর্টন্ দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবের অবতারণা

করিলেন এবং উহার উপযোগিতা ও আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য একটি সুদীর্ঘ, তেজী সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় সমবেত-প্রতিনিধি ও দর্শকবর্গের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

গবর্ণর জেনারলের আইন ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিধান-প্রণয়নের সভা এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য নিম্নলিখিত স্থূল মন্তব্য গুলি গৃহীত হউক এবং এই মহাসমিতির সভাপতি উহা শ্রীযুক্ত চার্লস্ ব্রাড্‌ল, এম, পি মহাশয়কে অর্পণ পূর্ব্বক মহাসমিতির পক্ষ হইতে সম্মান পুরঃসর এই প্রার্থনা করেন যে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত মন্তব্য নিচয়ের মর্ম্মানুসারে একখানি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া উহা বৃটিশ হাউস্ অব্ কমন্স সভায় উপস্থাপিত করেন।

মন্তব্য।

(১) গবর্ণর জেনারলের সভা ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে এরূপ ভাবে সভ্য নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক যে উহার অন্যূন অর্দ্ধেক সভ্য নির্ব্বাচিত, অনধিক এক চতুর্থাংশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারী (To sit ex-officio) এবং অবশিষ্ট গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(২) প্রত্যেক জেলাই নির্ব্বাচন বিষয়ে সাধারণতঃ রাজ্যের এক একটি অংশরূপে পরিগণিত হইবে।

(৩) ভোট দানের উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা (যাহা পরে নিরূপিত হইবে) বিবেচনা পূর্ব্বক ২১ বৎসরের অধিক বয়স্ক ভারতীয় সমস্ত পুরুষ-জাতীয় প্রজাগণ ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচন জন্য ভোট দানে সক্ষম হইবেন।

(৪) প্রত্যেক জেলার ভোট দাতৃগণ স্থানীয় অবস্থানুসারে একটি বা তদধিক নির্ব্বাচন সমিতির (Electoral bodies) প্রতিনিধি নির্ব্বাচন জন্য প্রতি দশলক্ষ অধিবাসীর মধ্য হইতে ১২ জন লোক নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইবেন। এই সকল প্রতিনিধিগণের (ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইবার পক্ষে) উপযোগিতা পরে নিরূপিত হইবে।

(৫) নির্ব্বাচন-সমিতির অন্তর্গত জেলা সমূহ কর্তৃক এইরূপে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ গবর্ণর জেনারলের ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচন স্থানের অধিবাসীগণের প্রতি ৫০ লক্ষে একজন ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় প্রতি ১০ লক্ষে একজন, এই নিয়মে সভ্য নির্ব্বাচনে সক্ষম হইবেন; এবং যখনই দেখা যাইবে যে পার্সি, খৃষ্টিয়ান, মুসলমান অথবা হিন্দুর সংখ্যা অল্প, তখনই এইরূপ নিয়মে নির্ব্বাচন অবশ্য কর্ত্তব্য যে, নির্ব্বাচন

স্থানের পার্সি, খৃষ্টিয়ান, মুসলমান অথবা হিন্দুর সংখ্যার তত্রত্য সমস্ত অধিবাসীগণের সহিত যে অনুপাত, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত পার্সি, খৃষ্টিয়ান, হিন্দু অথবা মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা সমস্ত সভ্য সংখ্যার সহিত সেই অনুপাতের অনল্প না হয়, উভয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পরে নিরূপিত হইবে।

(৬) সমস্ত নির্ব্বাচন 'ব্যালট্' (Ballot) দ্বারা (গুর্ত্তি খেলার প্রণালী অনুসারে অপ্রকাশ্য ভাবে) সম্পাদিত হইবে।

মাননীয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অযোধ্যানাথ তেজপূর্ণ বক্তৃতায় উল্লিখিত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন, এবং অযোধ্যার প্রতিনিধি পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ধর, লক্ষ্ণৌর প্রতিনিধি রেভরেণ্ড রামচন্দ্র বসু, মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত জি, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, শ্রীহট্টের প্রতিনিধি বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, পঞ্জাবের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লালা লজিপৎ রায়, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি পণ্ডিত মদনমোহন মালবিয় এবং বাঙ্গালার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ একে একে বহুবিধ সুযুক্তি পূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতায় উহার সমর্থন করিলেন।

অনন্তর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "ভদ্র মহাশয়গণ, আপনারা সকলেই এই প্রস্তাবের অবতারণা, অনুমোদন ও সমর্থন শ্রবণ করিলেন। অতঃপর আমি উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ পাঠ করিতে ইচ্ছা করি, আপনাদের মধ্যে কেহ কোন সংশোধন প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করিলে প্রস্তাবটির যে অংশের সংশোধন তাঁহার অভিপ্রেত তিনি তাহারই উল্লেখ করিতে পারিবেন। প্রথম প্রস্তাবাংশ সম্বন্ধে কাহারও কোন সংশোধন প্রস্তাব করিবার আছে কি ?

চতুর্দ্দিক হইতে সকলে বলিতে লাগিলেন 'নাই' 'নাই'।

অনন্তর প্রস্তাবের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

তৃতীয় অংশ সম্বন্ধে বঙ্গদেশের প্রতিনিধি বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলিলেন, "এই প্রস্তাবাংশে "বৃটিশ প্রজার" পূর্ব্ববর্ত্তী "পুরুষ" এই শব্দটি পরিত্যক্ত হউক। আমি সম্পূর্ণ রূপে জানি আমার প্রস্তাব ইংলণ্ডবাসিগণের নিকট গ্রাহ্য হইবে না, কিন্তু আমি এই প্রকৃত বিষয়টিতে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি যে আমরা কোন কোন বিষয়ে ইংরেজ জাতির অপেক্ষা কিছু অগ্রগামী। আপনারা অবগত আছেন আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকগণের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছি, কিন্তু লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত ইংলণ্ডের অপর কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃত প্রস্তাবে তত্রত্য স্ত্রীলোকদিগের জন্য উন্মুক্ত নহে। আর একটি বিষয় আমি আপনাদের নিকট জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করি ; আপনারা এই বৃহৎ সমিতিতে এ দেশীয় কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ স্ত্রীলোককে প্রতিনিধি রূপে প্রবেশাধিকার দান করিয়াছেন। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে আপনারা যদি আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য

করেন তাহা হইলে আপনাদের কার্য্যে সামঞ্জস্য থাকিবে না। ইংরেজ জাতি আজিও তাঁহাদের ললনাগণকে ভোট দানের অধিকার দান করেন নাই, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যে একত্ব প্রদর্শন করাই যদি আমাদের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে আমি আপনাদিগকে আমার সংশোধন-প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। যৎকালে আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প যোগ্য পুরুষগণকে ভোট দানের অধিকারী করিতে প্রস্তুত তখন যদি আমরা সুযোগ্য স্ত্রীলোকদিগকে উক্ত অধিকার দানে সঙ্কুচিত হই তাহা হইলে আমাদের কার্য্যে সামঞ্জস্য থাকিবে না।

মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য আয়ার এই সংশোধন প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। তাঁহার বিবেচনায় লিখন পঠনে ক্ষমতা, সম্পত্তির অধিকার, গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে কর দান, এই গুলিই সাধারণতঃ নির্ব্বাচকগণের থাকা আবশ্যক। পুরুষগণের এই সকল ক্ষমতা থাকিলে যদি তাঁহাদের ভোটদানের অধিকার জন্মে, তবে এই সকল ক্ষমতাশালিনী রমণীগণ কি জন্য ভোটদানের অধিকারিণী না হইবেন, তাহা তিনি বুঝিতে অক্ষম।

অনন্তর উক্ত সংশোধন প্রস্তাব সমবেত প্রতিনিধিগণের অনুমোদন অভাবে অগ্রাহ্য এবং মূল প্রস্তাবাংশ সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল। তৎপরে চতুর্থ প্রস্তাবাংশ উত্থাপিত হইলে বিনা আপত্তিতে গৃহীত হইল। তৎপরে পঞ্চম প্রস্তাবাংশ পঠিত হইল পণ্ডিত অযোধ্যানাথ হিন্দী ভাষায় উহার অনুবাদ পূর্ব্বক সকলকে বুঝাইয়া দিলেন।

দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বি, জি, তিলক এই বলিয়া উহার সংশোধন প্রস্তাব করিলেন যে গভর্ণর জেনারলের ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্ব্বাচন বিভিন্ন স্থানীয় নির্ব্বাচন সমিতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবার পরিবর্ত্তে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যগণ দ্বারা সংসাধিত হউক।

দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত গোখেল এই সংশোধন প্রস্তাবের অনুমোদন এবং মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রাজা রামরাও উহার প্রতিবাদ করিলেন; অনন্তর সর্ব্বসাধারণের অনভিমতে উহা অগ্রাহ্য হইল।

অনন্তর অযোধ্যার প্রতিনিধি মুন্সি হিদায়ৎ রসুল, গভর্ণর জেনারলের ব্যবস্থাপক সভা ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার হিন্দু ও মুসলমান সভ্যের সংখ্যা তুল্যাংশে থাকা উচিত, এই সংশোধন প্রস্তাবের অবতারণা উপলক্ষে উর্দ্দু ভাষায় একটি বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতা কালে তাঁহার মুখ হইতে অনেক অসার বাক্য নির্গত হইয়াছিল, এজন্য তৎসময়ে চারিদিক হইতে বক্তার মতের প্রতিবাদ সূচক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য শ্রুতি গোচর হইয়াছিল।

বোম্বাইর প্রতিনিধি সুপ্রসিদ্ধ আলি মহম্মদ ভীমজী উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন এবং সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা কোন বিদ্বেষভাব

প্রণোদিত হইয়া উক্ত প্রস্তাবের অবতারণা করেন নাই—হিন্দু ও মুসলমান সকল বিষয়ে তুল্যাংশে অধিকার লাভে সমর্থ হন, ইহাই তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায়। অনন্তর অযোধ্যার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হামিদ আলি দণ্ডায়মান হইয়া উল্লিখিত সংশোধন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। তিনি স্বয়ং মুসলমান এবং মুসলমান ও হিন্দু উভয়ের প্রতিনিধি রূপে মহাসমিতিতে যোগদান করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে ভারতবর্ষে মুসলমানের সংখ্যা অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা অনেক অধিক, অতএব ব্যবস্থাপক সভায় উভয়জাতীয় প্রতিনিধির সংখ্যা কখনই সমান হইতে পারে না। এরূপ প্রস্তাব একান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ—উহার অভ্যন্তরে অনৈক্য ও জাতি-বিদ্বেষের বীজ নিহিত রহিয়াছে, কারণ, উহা হইতে হিন্দু ভ্রাতৃগণের প্রতি মুসলমান ভ্রাতৃগণের অনাস্থা ও অবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এরূপ প্রস্তাব জাতীয় সমিতির মঙ্গলময় উদ্দেশ্যের নিতান্ত বহির্ভূত। উক্ত মহা সমিতি হিন্দু, মুসলমান এবং অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি সমানভাবে দৃষ্টি রাখিয়া এই বিশাল ভারত ভূমিকে সংযুক্ত একপ্রাণভূত সাম্রাজ্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু বক্তা ওরূপ অসার প্রস্তাবের অবতারণায় যাহা একান্ত অসম্ভব ও অসাধ্য তৎসাধনাভিপ্রায় প্রকাশে অন্যায় করিয়াছেন, অতএব তাঁহার বিবেচনায় উহা সর্ব্ব সম্মতিক্রমে অগ্রাহ্য ও পরিত্যক্ত হওয়া উচিত।

অনন্তর রহিল খণ্ডের অন্তর্গত মুরদাবাদের প্রতিনিধি সৈয়দ ওয়াহিদ আলি রিজউই দণ্ডায়মান হইয়া উর্দ্দু ভাষায় বলিলেন—"সভাপতি মহাশয় এবং প্রতিনিধি ভ্রাতৃগণ, আমি মুন্সি হিদায়ৎ রসুলের সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদন অথবা সমর্থন করিবার জন্য দণ্ডায়মান হই নাই। উক্ত প্রস্তাবে ব্যবস্থাপক সভা সমূহে হিন্দু ও মুসলমান সভ্য সংখ্যা তুল্যাংশে নিয়োগের ব্যবস্থা উল্লেখিত হইয়াছে, আমি উহার দুই একপদ বাহিরে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করি। ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান সভ্য সংখ্যা হিন্দু সভ্য সংখ্যার সমান হওয়া উচিত তাঁহার এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব আমার বিবেচনায় সন্তোষজনক নহে। উহাতে মুসলমানগণের স্বার্থের প্রতি আশানুরূপ উপযুক্ত পরিমাণে অনুরাগ প্রদর্শিত হয় নাই। বর্ত্তমান সমিতিকে আমি কখনই 'জাতীয় সমিতি' এই আখ্যা প্রদান করিতে পারি না। উহাতে হিন্দুর প্রাধান্য অধিক—অনেক বিষয়ে উহাকে মুসলমানের পরিবর্ত্তে হিন্দুর সমিতি জ্ঞান করাই উচিত। পক্ষান্তরে যদি উহাকে যথার্থই জাতীয় সমিতি জ্ঞান করা হয়, এবং যদি সমস্ত জাতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি উপযুক্ত পরিমাণে আস্থা প্রদর্শনই উহার উদ্দেশ্য, তাহা হইলে উহাতে হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের প্রাধান্য রক্ষা করা বিধেয়।" বক্তা আর অধিক অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই চতুর্দ্দিক হইতে গম্ভীর প্রতিবাদ সূচক বাক্য উত্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার অসার বাক্যে হিন্দু প্রতিনিধিগণ একান্ত ব্যথিত এবং সন্দি-

বেচক মুসলমান প্রতিনিধিগণ নিতান্ত বিরক্ত হইলেন। চারিদিকে অসন্তোষ ও বিরক্তি জনক মহা গোলমাল উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল। এমন সময় সভাপতি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "ভদ্র মহাশয়গণ, আপনারা সকলে স্থির হউন; আমরা জগৎকে ইহা দেখাইতে চাহি যে, আমাদের প্রতিকূলে অপ্রিয় বিষয় শুনিতেও আমরা প্রস্তুত আছি। বিষয়টি যতই অপ্রীতিকর হউক, আমরা ততই অধিক সহিষ্ণুতার সহিত উহা শুনিব। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে এই ভদ্রলোকটির কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে; অপরাপর ব্যক্তিবর্গের অন্তরে উহা আঘাত করিতে পারে তদ্বিষয় বিবেচনা না করিয়াও যদি তিনি উহা বলিতে ইচ্ছা করেন, আমার স্থির বিশ্বাস এই যে আপনারা তাঁহাকে তাহা অবাধে বলিতে দিবেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে সৈয়দ ওয়াহিদ আলি পুনবায় বলিতে লাগিলেন,—"আমি বলিতেছিলাম যে উহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় সমিতিতে পরিণত করিতে হইলে উহাতে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের প্রাধান্য রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। বস্তুতঃ হিন্দুদিগের ন্যায় মুসলমান সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক যদি এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক হইতেন তাহা হইলে হিন্দুর অপেক্ষা অধিক সংখ্যক মুসলমান আজি এই সভাস্থলে উপস্থিত হইতেন। মুসলমানগণ হিন্দুদিগের অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতাপ্রিয়, তেজস্বী ও স্বাবলম্বী, কুড়ি কোটি হিন্দু যে পরিমাণে এই সমিতির প্রতি আস্থা ও সহায়তা প্রদর্শন করেন, পাঁচকোটি মুসলমান যদি ইহাতে সেই পরিমাণে আস্থা ও অনুরাগ প্রদশন করিতেন, তাহা হইলে আপনারা আজি এই স্থানে হিন্দু অপেক্ষা অনেক অধিক মুসলমান দেখিতে পাইতেন। আমার এমন বিশ্বাস হয় না যে সমবেত প্রতিনিধিগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর পঞ্চমাংশের একাংশ হইবে। এই সমিতির উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহ উত্তম। ইহার মূলনীতির সহিত আমার কোন বিবাদ নাই, কারণ উহাতে ভারতবর্ষের সমগ্রজাতির উদ্দেশ্য, অভাব ও অভিপ্রায সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইবার জন্যই উহার অস্তিত্ব। কিন্তু আমি ইহাই বলিতে ইচ্ছা করি যে হিন্দুগণ উহাকে সমুন্নত, সমলঙ্কৃত ও গৌরবান্বিত করিবার জন্য যতই কেন যত্নবান হউন না, উহা আজিও প্রাণ শূন্য দেহের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে এবং যতদিন মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে উহার পৃষ্ঠপোষক না হইবেন ততদিন উহা মৃতবৎ অবস্থিতি করিবে। এই মৃত দেহে জীবন সঞ্চার করা মুসলমানগণের কার্য্য হইবে, এবং যদি কখনও উহার কার্য্যগতি সফলতা লাভ করে, তাহা হইলে মুসলমানগণ নিঃসন্দেহে উহাতে প্রধান যন্ত্রের ন্যায় কার্য্যকর হইবে।" তিনি এইরূপে স্বজাতির গৌরব ও প্রাধান্যের বিষয় উল্লেখ ও হিন্দুর অযোগ্যতা প্রদর্শন পূর্ব্বক উপসংহারে এই যুক্তি বিরুদ্ধ হাস্য জনক মত প্রকাশ করিলেন যে, যদি ভারতবর্ষের জন্য ব্যবস্থাপক সভার প্রয়োজন থাকে, তবে অপেক্ষাকৃত অযোগ্য জাতির পরিবর্ত্তে উৎকৃষ্টতম জাতির দ্বারা উক্ত সভার উদ্দেশ্য সাধিত হউক। তদনুসারে এবং মহৎ ও প্রাচীন মুসল-

মান জাতির পূর্ব্বগৌরব ও মহত্ত্বের প্রতি তদীয় অনুরাগবশতঃ তিনি মহাসমিতিকে এই নিয়ম অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন যে, ব্যবস্থাপক সভায় সর্ব্বদা হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা সমান হইবার পরিবর্ত্তে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা সতত তিনগুণ অধিক থাকিবে। এই বিরুদ্ধবাদী মুসলমান প্রতিনিধির জাতি-বিদ্বেষ ভাবাপন্ন অসার গর্ব্বোক্তি শ্রবণে জাতীয় মহাতীর্থে সমবেত সহৃদয় হিন্দুসন্তানগণ মহা ব্যাকুলতায় আক্রান্ত হইলেন। হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য জাতীয় প্রতিনিধিগণ এক মনে একপ্রাণে জননী জন্মভূমির মহাযজ্ঞে সম্মিলিত হইয়া বিধি মতে তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন, আজ অশুভক্ষণে সহসা কোথা হইতে এই অমঙ্গল বাক্য উত্থিত হইল এবং উহার পরিণাম কিরূপ শোচনীয় ভাব ধারণ করিবে, এই চিন্তায় তাঁহাদের হৃদয় বিবিধ সন্দেহে আন্দোলিত ও উদ্বেলিত হইয়া স্তম্ভিতভাব ধারণ করিল। দেবতার আশীর্ব্বাদে এই বিষাদময় ভাব অচিরে তিরোহিত হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা উপবিষ্ট হইবামাত্র বেহারের প্রতিনিধি সৈয়দমীর উদ্দীন্ আমেদ বল্থি দণ্ডায়মান হইয়া জ্বলন্ত উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার যুক্তিবহির্ভূত প্রস্তাবের অসারতা প্রতিপন্ন করিলেন এবং সকলকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে বৃথা গর্ব্ব মূলক অসার জাত্যাভিমান প্রদর্শনে মহাসমিতির অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট সাধিত হইবে না। অনন্তর তিনি হিন্দু মুসলমান, পার্সী, খৃষ্টিয়ান এবং অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন যে, ধর্ম্মান্ধতা বা স্বার্থপরতা প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিলে কেহ কখনই অভিলষিত রাজনৈতিক অধিকার লাভে সমর্থ হইবেন না। উপসংহার কালে তিনি মঙ্গলময় বিধাতাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, তাঁহার করুণা প্রভাবে এদেশে এমন সৌভাগ্যের দিন আসিয়াছে যে আজি বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সহৃদয় সন্তানগণ পরস্পরের সহানুভূতি ও অনুরাগ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তাঁহার অতুল কৃপার অভাবে এতগুলি হিন্দু, মুসলমান, পার্সী ও খৃষ্টিয়ান কখনই একত্রে এরূপ অনুরাগ ও প্রীতির সহিত সম্মিলিত হইতে পারিতেন না। পরিশেষে তিনি শ্রীযুক্ত আর্ডলে নর্টন্ সাহেব প্রস্তাবিত মূল প্রস্তাব গ্রহণ জন্য সকলকে অনুরোধ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর বারাণসীর প্রতিনিধি মুন্সি নসিরুদ্দীন আমেদ সুযুক্তি পূর্ণ বক্তৃতায় পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা সৈয়দ মীর উদ্দীন আমেদের অনুমোদন ও সৈয়দ ওয়াহিদ আলি রিজউইর অসার বাক্যের প্রতিবাদ করিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে বোম্বাইর প্রতিনিধি সেথ কুমারুদ্দীন ফেরথি, দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধি মুন্সি সেথ হোসেন, এবং ঢাকার প্রতিনিধি মুন্সি হিদায়ৎ বক্স একে একে দণ্ডায়মান হইয়া অযোধ্যার প্রতিনিধি মুন্সি হিদায়ৎ রসুলের সংশোধন প্রস্তাবের প্রতিবাদ এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি সৈয়দ

ওয়াহিদ আলি রিজউইর তেজ গর্ব্ব-পূর্ণ অসার যুক্তি খণ্ডন পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত নর্টন সাহেব কৃত মূল প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

তদনন্তর সভাপতি মহাশয় উল্লিখিত সংশোধন প্রস্তাব আর অধিক বাদানুবাদ বিনা মহাসমিতির অনুমোদনীয় হইতে পারে কি না তদ্বিষয়ে সকলের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন। মূল প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবার জন্য অনেকেই আগ্রহ সহকারে মত প্রকাশ করিলেন। সংশোধন প্রস্তাবের মর্ম্ম পুনরায় উর্দ্দু ভাষায় সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইল। সভাপতি মহাশয় মুসলমান প্রতিনিধিগণকে হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে স্বস্ব মতামত প্রকাশ করিতে বলিলেন। ১৬ জন মুসলমান উহার অনুকূলে এবং ২৩ জন উহার প্রতিকূলে মত প্রদান করিলেন। বহু সংখ্যক মুসলমান প্রতিনিধি সংশোধন প্রস্তাবের অসারতা উপলব্ধি করিয়া যে সকল সমধর্ম্মাবলম্বী প্রতিনিধি স্বজাতীয় স্বার্থের জন্য নিতান্ত উৎসাহের সহিত মত প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের বিরাগ ভাজন হইবার আশঙ্কায় কোন পক্ষে মত প্রদান করিতে বিরত হইলেন।

পরিশেষে সংশোধন-প্রস্তাব মহাসমিতির সমবেত প্রতিনিধিগণের বিবেচনার জন্য স্থাপিত হইলে প্রায় সমস্ত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক উহা পরিত্যক্ত হইল। এই সময় পূর্ব্বে যে সকল মুসলমান প্রতিনিধি উহাতে কোন মত দান করেন নাই তাঁহারাও উহার প্রতিকূলে মত প্রকাশ করিলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি সূচক গভীর আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। সমবেত প্রতিনিধিগণের উচ্ছ্বসিত আনন্দ ধ্বনির মধ্যে শ্রীযুক্ত নর্টন সাহেব কৃত প্রস্তাবের পঞ্চমাংশ মহাসমিতি কর্তৃক পরিগৃহীত হইল।

তৎপরে ষষ্ঠ সংশোধিত প্রস্তাবাংশ বাদানুবাদ ব্যতিরেকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

তদনন্তর সভাপতি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ, আপনারা এক্ষণে সম্পূর্ণ প্রস্তাবটির সমস্ত অংশগুলি অনুমোদন ও সমর্থন পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।" উপসংহারকালে সমবেত প্রতিনিধিগণের নিকট উল্লিখিত প্রস্তাব পুনরায় পাঠ পূর্ব্বক অবশিষ্ট কার্য্য তৎপরদিবসের আলোচনার জন্য রাখিয়া সভাভঙ্গ করিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে গভীর আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

উপসংহার।

২৮শে ডিসেম্বর—শনিবার।

আজি জননীর পূজার শেষ দিন। অন্যান্য বর্ষে চারি দিনে মহাযজ্ঞের সমস্ত কার্য্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এ বৎসর সকল সম্প্রদায়স্থ প্রতিনিধিবর্গের সুবিধার জন্য

তৃতীয় দিবসেই মহাযজ্ঞের উপসংহার স্থিরীকৃত হইয়াছে। এগারটা বাজিবা মাত্র মহাসমিতির পুনরধিবেশন হইল। সর্ব্বাগ্রে সভাপতি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে জ্ঞাপন করিলেন যে মহাসমিতির আলোচ্য অনেক অত্যাবশ্যক বিষয় এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে, সময়ের অল্পতাবশতঃ অবশিষ্ট প্রস্তাবগুলির বিস্তৃত রূপ আন্দোলনের পরিবর্ত্তে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রার্থনীয়। জাতীয় মহাসমিতির ভবিষ্যৎ আকার ও কার্য্যপ্রণালী নিরূপণ বিষয়ক কতকগুলি প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে, তৎসমুদায় আলোচিত হইতেও অনেক সময় অতিবাহিত হইবে, অতএব সমস্ত বিষয় যথা সম্ভব সংক্ষেপে আলোচনার জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করিলেন।

অনন্তর বঙ্গদেশের সুবক্তা শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দণ্ডায়মান হইয়া সুযুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় নিম্নলিখিত একত্র গ্রথিত প্রস্তাব নিচয়ের অবতারণা করিলেন।

৩য় প্রস্তাব।

গত কয়েক বৎসরের মহাসমিতিতে নিম্নলিখিত যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, বর্ত্তমান মহাসমিতি এতদ্দ্বারা তৎসমুদায় পুনরনুমোদিত ও নির্দ্ধারিত করিতেছেন :—

(ক) শাসন-বিভাগ (ফৌজদারী) হইতে বিচার-বিভাগ (দেওয়ানী) সম্পূর্ণরূপে পৃথক করণ একান্ত আবশ্যক, কোন ক্রমেই এই দুই বিভাগের ভার একজন কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত না হয়।

(খ) দেশের যে সকল স্থানে এক্ষণে জুরির বিচার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তথায় উহার প্রচলন।

(গ) ১৮৭২ সালে সর্ব্ব প্রথমে জুরির বিচার দ্বারা অপরাধীদিগের নিষ্কৃতি রহিত করিবার যে ক্ষমতা হাইকোর্টের উপর প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার অপনয়ন।

(ঘ) ওয়ারেণ্ট মকর্দ্দামায় আসামীর ইচ্ছানুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক বিচারের পরিবর্ত্তে সেশন আদালতে উক্ত মকর্দ্দামার বিচার জন্য ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

(ঙ) পুলিস বিভাগের বর্ত্তমান অসন্তোষজনক অবস্থার অপনয়ন এবং উহার আমূল সুসংস্কার।

(চ) ভারতবাসিগণ ভারতীয় সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট হইবার জন্য যে স্থানে যুদ্ধ বিদ্যায় অভ্যস্ত হইতে পারে, ভারতবর্ষে এরূপ সামরিক বিদ্যালয় সংস্থাপন, এবং যাহাতে কোন বিপদের সময় ভারতবাসিগণ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্যদান করিতে সমর্থ হয়, উপযুক্ত নিয়ম ও নিষেধের সহিত তদনুরূপ ভলণ্টিয়ার সৈন্য প্রথা প্রবর্ত্তন।

(ছ) আয় কর (Income tax) বিভাগের বিশেষতঃ এক হাজার টাকার ন্যূন আয় সম্বন্ধে উহার কার্য্য প্রণালীর বর্ত্তমান একান্ত অসন্তোষ জনক অবস্থা পরিবর্ত্তন এবং উক্ত পরিমাণ টাকা অর্থাৎ এক হাজার টাকার উপর আয়ের প্রতি উক্ত কর স্থাপনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।

(জ) শিক্ষা বিভাগের সমস্ত অংশে ব্যয় সঙ্কোচের পরিবর্ত্তে উহা বৃদ্ধির একান্ত আবশ্যকতা, এবং উহার একটি অত্যাবশ্যক বিভাগ শিল্প শিক্ষার উন্নতি বিধান এবং দেশের শ্রমজীবীদিগের বর্ত্তমান অবস্থা নির্দ্ধারণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী লোক লইয়া একটি অনুসন্ধান সমিতি সংগঠন।

(ঝ) দেশে সাধারণতঃ গভীর শান্তির সময় ইতিপূর্ব্বে লবণ শুল্ক অবিচার পূর্ব্বক অন্যায়রূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সুতরাং ঐ করের অব্যবহিত হ্রাস সম্পাদন, এবং তজ্জন্য আয়ের যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণের জন্য পুনরায় তুল্যাংশ আমদানি শুল্ক প্রচলন।

(ঞ) দেশের সৈনিক বিভাগের জন্য পুনঃপুনঃ ব্যয় বর্দ্ধনের পরিবর্ত্তে উহা হ্রাস করণের আবশ্যকতা বিধান।

বক্তার সুমধুর ও তেজস্বী বক্তৃতায় সমবেত প্রতিনিধি বর্গ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন।

তিনি উপবিষ্ট হইলে বোম্বাই নগরের সুপ্রসিদ্ধ নারায়ণ গণেশ চন্দ্রবরকার এই প্রস্তাবগুলির অনুমোদন করিলেন এবং সুস্পষ্ট রূপে জ্ঞাপন করিলেন যে গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত প্রস্তাবের অনেক বিষয়ের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন; বোম্বাইনগরের সেনাপতি মহামান্য ডিউক-অব-কনট ভারতবর্ষে সৈনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উপযোগিতার অনুকূলে স্বাভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তত্রত্য ভলণ্টিয়ার সৈন্যদলের অধিনায়ক মাননীয় জষ্টিশ বেলি সাহেব ভারতবাসীকে ভলণ্টিয়র সৈন্য দল ভুক্ত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দান করিয়াছেন। অনন্তর তিনি গভর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত লবণ করের অপকারিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন যে ইংলণ্ডবাসীর পক্ষে চা, চিনি, কাফি, ও কোকো প্রভৃতি দ্রব্য যেমন নিত্য ব্যবহার্য্য ও আদরণীয় ভারতবাসীর পক্ষে লবণ তদপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। ইংলণ্ডের কোন রাজস্ব সচিব পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুলির প্রতি কর স্থাপনে সাহসী হইবেন না, কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশনেই শেষোক্ত দ্রব্যের প্রতি অযথা কর স্থাপন বিধিবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সৈনিক বিভাগ সম্বন্ধীয় ব্যয় দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে—পূর্ব্বে যে বিভাগে ১৬,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় নির্দ্ধারিত ছিল, এক্ষণে তাহা ২০,০০০,০০০ পাউণ্ড মুদ্রায় পরিণত হইয়াছে! দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যে অর্থ সঞ্চিত হইতেছিল তাহাও এই বিভাগে বৃথা অপব্যয়িত হইয়াছে।

তদনন্তর মান্দ্রাজের অন্তর্বর্ত্তী তিনাবেলীর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত এস, বি, শঙ্কররাম এই

এই প্রস্তাবের সমর্থন জন্য দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন যে তিনি স্বয়ং উত্তর সরকারের পুরোহিত বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণ। অল্প দিন হইল তিনি মান্দ্রাজের সৈনিক কর্ম্মচারিগণের অনুগ্রহে তত্রত্য ভলণ্টিয়ার সৈন্য দলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় আরও অনেক নিরীহ ব্রাহ্মণ সন্তানকে সেনাদলে প্রবেশাধিকার দান করা হইয়াছে। অতি অল্পকাল মধ্যে তিনি সামরিক বিদ্যায় এমন নিপুণতা লাভ করিযাছেন যে, তিনি উক্ত সৈনিক বিভাগে একটি সম্মান জনক পদ লাভ করিয়াছেন। সেনাপতি তাঁহার গুলি চালনায় দক্ষতা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি ভলণ্টিয়রগণকে গুলি চালনা শিক্ষা দিয়া থাকেন। অল্প সময়ের মধ্যে যদি শান্তিপ্রিয় পুরোহিত বংশোদ্ভূত কোন ব্যক্তি যুদ্ধ বিদ্যায় এরূপ পারদর্শী হইতে পারে তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতীয় সন্তানগণ রীতিমত শিক্ষা পাইলে কেন না উক্ত বিদ্যায় নিপুণতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে ?

তিনি উপবিষ্ট হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তৃতীয় প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল !

অনন্তর মান্দ্রাজের প্রতিনিধি রেভরেণ্ড জি, এম, কোব্যান্ দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্থ প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন।

চতুর্থ প্রস্তাব ঃ—শ্রীযুক্ত কেন্ ও স্মিথ্ এবং অন্যান্য যে সকল সভ্য "হাউস্-অব্-কমন্স" সভায় ভারতবর্ষীয় আবকারী ও একসাইস্ বিষয়ক মাদক দ্রব্য সম্বন্ধীয় আন্দোলনে তাঁহাদের সহিত মত দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে এই মহা সমিতি অন্তরেব সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আবকারী বিভাগে যে সকল উন্নতি জনক প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তজ্জন্য সম্পূর্ণ রূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেও মহাসমিতির আন্তরিক আশা এই যে, "কমন্স" সভার মন্তব্য অনুসারে কার্য্যারম্ভ হওয়ার পক্ষে আর অধিক বিলম্ব না হয়। তিনি সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় সুরা ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের অপকারিতা বিশেষ রূপে প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন।

বোম্বাইনগরের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত দিনসা ইদল্জী ওয়াচা এবং দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধি রেভরেণ্ড আর, এইচ্ হিউম্ সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বক্তৃতায় উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন ও সমর্থন করিলেন। অনন্তর সুপ্রসিদ্ধ সুরাবৈরী রেভরেণ্ড ইভান্স সাহেব উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন জন্য দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীর স্বরে তেজস্বী ভাষায় একটি সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা দান করিলেন। প্রবল সুরাস্রোতে দেশ কি রূপে প্লাবিত হইতেছে, উহার অনিবার্য্য প্রভাপে দেশের কি ঘোরতর সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে—লক্ষ লক্ষ নর নারী উহার বিষময় গ্রাসে পতিত হইয়া কি রূপ শোচনীয় দুর্গতি ও অবনতির চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে—উহার করাল আক্রমণে কত শত পরিবার কি রূপে ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা তিনি জলন্ত ভাষায় ঘোরতব

উৎসাহের সহিত ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার উদ্দীপনা পূর্ণ বক্তৃতায় মহাসমিতিতে কখনও গভীর অট্টহাস্য, কখনও বিকট ঘৃণা এবং কখনও বা মর্ম্মভেদী ক্ষোভ, বেদনা ও অনুতাপের কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি উল্লেখ করিলেন যে ইংলণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ৫,০০০,০০০ পঞ্চাশ লক্ষ নরনারী সুরা বা কোন রূপ মাদক দ্রব্য সেবনে সম্পূর্ণ রূপে বিরত। হাউস্ অব্ কমন্স সভায় ত্রিশ জন্য সভ্য সম্পূর্ণ রূপে সুরা ও মাদক দ্রব্য সেবনের বিরোধী, 'হাউস্ অব্ লর্ডস্' সভাতেও এরূপ অনেক লোক আছেন। ইংলণ্ডবাসীর দোষগুলি কাহার অনুকরণ করা উচিত নহে, তাঁহাদের গুণ গুলির অনুকরণই একান্ত প্রার্থনীয়। তাঁহাদের মধ্যে মহৎ গুণরাজি বিদ্যমান আছে—তাঁহারা স্বাধীনতাপ্রিয়, সত্যবাদী ও বিশ্বাসী—তাঁহাদের এই সকল ধর্ম্ম অনুকরণ করাই উচিত, তাঁহাদের দোষ ও অপকার্য্য সকল অনুকরণ কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। সকলে যাহাতে সুরাবিদ্বেষী হন এবং সুরা ও মাদক দ্রব্যের প্রভাব চূর্ণ ও উহার গতিরোধ পূর্ব্বক যাহাতে সকলে আপন আপন সন্তানগণের উন্নতি ও স্ব স্ব গৃহের পবিত্রতা সাধন করেন তজ্জন্য সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে অন্তরের সহিত অনুরোধ করিলেন। তৎপরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে চতুর্থ প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল।

অনন্তর মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সালেম রামস্বামী মুদ্‌লিয়ার পাব্‌লিক্ সার্ভিশ কমিসনের ফল অসন্তোষজনক হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ভারতবাসীর কোন বিশেষ হিতসাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই, এই বিষয় সকলের নিকট জ্ঞাপন করিবার জন্য নিম্নলিখিত পঞ্চম প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন।

পঞ্চম প্রস্তাবঃ—ভারতবর্ষীয় সিভিল্ সার্ভিশ পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থিগণের বয়ঃক্রম ১৯ বৎসরের পরিবর্ত্তে ২৩ বৎসর ধার্য্য করণ জন্য যদিও এই মহাসমিতি ভারতেশ্বরীর গবর্ণমেণ্টকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন, তথাপি পাব্‌লিক্ সার্ভিশ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অবশিষ্ট নিয়মাবলীর স্থূল মর্ম্মানুসারে ভারতবাসিগণের পূর্ব্বতন রাজনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে বলিয়া এই মহাসমিতি আন্তরিক দুঃখ ও নৈরাশ্য প্রকাশ করিতেছেন, এবং পাব্‌লিক সার্ভিশের সমস্ত সিভিল্ বিভাগের জন্য ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে সমসাময়িক পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত না হইলে কোন ক্রমেই ভারতবর্ষের প্রতি প্রকৃত প্রস্তাবে ন্যায় বিচার প্রদর্শিত হইবে না, মহাসমিতি, এই জাতীয় দৃঢ় বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত মুদলিয়র স্বয়ং পাব্‌লিক সার্ভিশ কমিসনের নির্দ্দিষ্ট সভ্যগণের মধ্যে একজন সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তৎকালে তাঁহার সহযোগী সভ্যগণের সহিত যুক্তির সহিত বিবেচনা পূর্ব্বক যে সকল বিষয় পরিবর্ত্তন ও প্রবর্ত্তন জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন সেক্রেটারি অব্ ষ্টেট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ইহাতে ঘোর

নৈরাশ্য অনুভব করিয়া আজি তিনি প্রাণ খুলিয়া উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন জন্য বহুবিধ সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় সকলের অনুরাগ আকর্ষণ করিলেন।

তিনি উপবিষ্ট হইলে পুনার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত গোখেল, মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত জন্ ম্যাডামস্ শ্রীযুক্ত থপর্দ্দি এবং বোম্বাইর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আলি মহম্মদ ভীমজী একে একে দণ্ডায়মান হইয়া হৃদয়গ্রাহী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় উল্লিখিত প্রস্তাবের অনুমোদন ও সমর্থন করিলেন। তৎপরে সর্ব্বসম্মতি অনুসারে উহা পরিগৃহীত হইল।

অনন্তর মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত জে, ম্যাডাম দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত ষষ্ঠ প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাবঃ—ভারতবাসিগণ একান্ত রাজভক্ত, অথচ অস্ত্র আইনের বর্ত্তমান কঠোরতায় তাহাদের যে অনর্থ ঘটিয়াছে এবং তাহাদের প্রতি অন্যায় রূপে যে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে, তজ্জন্য উক্ত আইনে অস্ত্ররক্ষণ ও উহার ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল নিষেধ আছে, তাহা ভারতের অধিবাসিগণের ও পর্য্যটকবর্গের উপর সমভাবে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত আইনের পরিবর্ত্তন জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হউক, এবং যে সকল স্থানে হিংস্র জন্তুগণ প্রায় সর্ব্বদাই মনুষ্য হত্যা, পশু হত্যা, অথবা শস্য নাশ করে, তথায় অস্ত্র রক্ষণ ও ব্যবহার জন্য বিনা আপত্তিতে যথেষ্ট পরিমাণে লাইসেন্স প্রদত্ত হয়, একবার এই নিয়মানুসারে প্রদত্ত 'লাইসেন্স' চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট ও যে প্রদেশে উহা প্রদত্ত হয় তথাকার সর্ব্বত্র উহা সমানভাবে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইতে পারে, উহার অপব্যবহারে উহা প্রত্যাহৃত হইবে, এবং বৎসবান্তে অথবা ছয় মাসান্তর উহা পরিবর্ত্তন ও পুনঃ গ্রহণ করিতে না হয়, এই মর্ম্মে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করা হউক।

অস্ত্র আইনের কঠোরতার প্রাদুর্ভাবে ভারতের যে কি অশেষ অমঙ্গল সাধিত হইতেছে এবং ভারতবাসিগণ কিরূপে দিন দিন নিস্তেজ, উদ্যম শূন্য ও মনুষ্যত্ব বিহীন হইয়া পড়িতেছেন, তাহা তিনি সার গর্ভ বক্তৃতায় বিশদরূপে প্রদর্শন করিলেন।

তিনি উপবিষ্ট হইলে পঞ্জাবের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লালা ভগবান দাস অযোধ্যার প্রতিনিধি হিদায়ৎ রসুল, মাননীয় পণ্ডিত অযোধ্যানাথ এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি সৈয়দ ওয়াহিদ আলি রিজিউই একে একে দণ্ডায়মান হইয়া সংক্ষেপে উল্লিখিত প্রস্তাবের অনুমোদন ও সমর্থন করিলেন। অনন্তর উহা সর্ব্ব সম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল। পূর্ব্ব দিনে যে মুসলমান প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উপলক্ষে স্বজাতীয় গর্ব্বপ্রকাশ ও হিন্দুর নিন্দাবাদ পূর্ব্বক অনেক ভ্রান্তি মূলক অসার কথার অবতারণা করিয়াছিলেন, আজি তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এবং তাঁহার ভ্রান্ত মত অধিকাংশ মুসলমান সভ্যের মত বিরুদ্ধ জানিয়া অস্ত্র আইন বিষয়ক প্রস্তাবের সমর্থন উপলক্ষে তাঁহার পূর্ব্বদিনের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন এবং সুস্পষ্ট

রূপে প্রকাশ করিলেন যে ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু সভ্যের সংখ্যা অধিক হইলেও তাঁহাদের দ্বারা মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন অনিষ্ট লাভের আশঙ্কা নাই। সহসা মেঘাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডল উজ্জ্বল আলোক-ছটায় উদ্ভাসিত হইলে যেমন চারিদিক নয়নরঞ্জন সুবিমল কান্তিধারণ করে, আজি তাঁহার এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব প্রস্তাবে মহাসমিতির চতুর্দ্দিকে সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময় প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল—চারিদিক হইতে অপ্রতিহত বেগে আনন্দের লহরী উথলিয়া উঠিতে লাগিল। এমন সময় একজন সহৃদয় হিন্দু দণ্ডায়মান হইয়া আনন্দের সহিত বলিলেন, "হিন্দুগণ মুসলমানদিগের নাম লইয়া আনন্দ ধ্বনি করিতেছেন।" তিনি উপবিষ্ট হইতে না হইতেই একজন মুসলমান প্রতিনিধি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "মুসলমানগণও হিন্দুর নাম লইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।" হিন্দু ও মুসলমানের উচ্ছ্বসিত আনন্দ কোলাহলে বিরাট মণ্ডপ কম্পিত হইতে লাগিল—উহার গভীর প্রতিধ্বনি আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। পূর্ব্বদিনে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মতভেদ জনিত যে অনৈক্য ও বিচ্ছেদের আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, আজি তাহা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইল। ইহার পর অর্দ্ধঘণ্টার জন্য সমিতির কার্য্য স্থগিত রহিল।

অর্দ্ধ ঘণ্টাকালের বিশ্রামের পর বঙ্গদেশের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন দণ্ডায়মান হইয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রধান প্রধান বিভাগে বঙ্গদেশের ন্যায় ভূমির রাজস্ব সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্ত্তন উদ্দেশে নিম্নলিখিত প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন।

৭ম প্রস্তাবঃ—ভারতবর্ষের যে যে স্থানের লোক সংখ্যা অধিক এবং যেখানে কৃষিকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়, তত্তৎস্থলে প্রজা বর্গের সুবিধার জন্য গভর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্বের চিরস্থায়িত্ব রক্ষা হেতু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রচলন জন্য গভর্ণমেণ্ট পুনরায় উহা অবিলম্বে সম্যক্‌রূপে কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, এই মর্ম্মে গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হউক।

তিনি সুন্দর যুক্তি সহকারে উহার আবশ্যকতা প্রদর্শন করিলেন, এবং ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে উক্ত প্রথা বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত হইবার সময় হইতে তত্রত্য ভূম্যধিকারী এবং কৃষিজীবী প্রজাবর্গের কিরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বিশেষ রূপে উল্লেখ করিলেন। অনন্তর অযোধ্যার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হামিদ আলি উর্দ্দু ভাষায় উল্লিখিত প্রস্তাবের মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করিলেন।

তৎপরে মান্দ্রাজের প্রতিনিধি এবং ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভ্য শ্রীযুক্ত এস, সুব্রহ্মণ্য আয়ার সুযুক্তি পূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতায় উল্লিখিত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। অনন্তর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি মুন্সি বদরুদ্দীন আমেদ তেজস্বী উর্দ্দু-ভাষায় একটি সুদীর্ঘ ও সার গর্ভ বক্তৃতায় উক্ত প্রস্তাবের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করি-

লেন, তিনি উপবিষ্ট হইলে বারাণসীর প্রতিনিধি নসিরুদ্দীন আমেদ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি মুন্সি মহম্মদ সথাবৎ হুসেন উর্দ্দূ ভাষায়, এবং দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধি রেও সাহেব জনার্দ্দন রঘুনাথ নিমকার মারহাট্টী ভাষায় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা সহকারে উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। তদনন্তর উহা সর্ব্ব সম্মতি অনুসারে পরিগৃহীত হইল।

ভারতবর্ষ হইতে যে সকল রৌপ্য নির্ম্মিত বাসন বিলাতে রপ্তানি হয় তৎপ্রতি অযথা পরিমাণে মাসুল ধার্য্য করাতে ভারতবর্ষের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা উল্লেখ করিবার জন্য বোম্বাইর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত দিনসা ইদলজী ওয়াচা নিম্ন লিখিত ৮ম প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন।

৮ম প্রস্তাবঃ –ইতপূর্ব্বে রৌপ্যের মূল্য যেরূপ হ্রাস হইয়াছে, এবং তজ্জন্য ভারতীয় রৌপ্য মুদ্রার বিনিময় মূল্য যে পরিমাণে কমিয়াছে, তাহাতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণ জন্য রৌপ্য ব্যবহার পক্ষে গভর্ণমেণ্টের কোনরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করা একান্ত অযৌক্তিক ; এতৎ সম্বন্ধে শুদ্ধ ভারতবর্ষের প্রতি ন্যায় বিচার প্রদর্শন উদ্দেশে নহে, (যাহা পুনঃ পুনঃ ভারতেশ্বরীর মন্ত্রীবর্গের গোচর করা হইয়াছে) কিন্তু ভারত সাম্রাজ্ঞীর বৃটিশ ও ভারতীয় উভয় প্রজাগণের মঙ্গলার্থে রৌপ্য নির্ম্মিত পান-ভোজন-পাত্রের শুল্ক অবিলম্বে রহিত করা একান্ত কর্ত্তব্য, এবং উক্ত বাসনাদির অকৃত্রিমতা ও মূল্য নির্দ্ধারণ জন্য হল্ মার্ক—(Hall marking) প্রস্তুতকারিগণের সুবিধা ও ইচ্ছানুসারে প্রদত্ত হইবার ব্যবস্থা দান করা প্রার্থনীয়।

অযোধ্যার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হামিদআলি উর্দ্দূ ভাষায় উক্ত প্রস্তাবের অর্থ ও উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত করিলেন।

গুজরাটের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রামচাঁদ লাল ছোটে লাল উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন পূর্ব্বক বলিলেন যে স্বাধীন বাণিজ্যে উৎসাহ দান ও উন্নতি সাধন জন্য ভারতবর্ষজাত দ্রব্যের প্রতি ইংলণ্ডীয় অবৈধ শুল্ক রহিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। অনন্তর এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আর বাদানুবাদ উত্থিত না হইয়া সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে উহা পরিগৃহীত হইল।

অনন্তর ভারতবর্ষের আয় ব্যয় বিষয়ক হিসাব অসময়ে পার্লামেণ্ট মহাসভায় উপস্থাপিত না হইয়া যাহাতে যথা সময়ে উহার সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা ও আন্দোলন হয় তৎ বিষয়ক প্রস্তাবের অবতারণা জন্য বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও মহাত্মা হিউমের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ মাননীয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দণ্ডায়মান হইলেন ; অমনি সভা গৃহে বিপুল আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। তিনি সংক্ষিপ্ত হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতায় নিম্নলিখিত নবম প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

৯ম প্রস্তাব ঃ—এই মহাসমিতি বিনীতভাবে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন যে ভারতবাসিগণের মঙ্গলার্থে, "কমন্স" সভার বক্তা আসন পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে

ভারতীয় ব্যক্তিগণের অভাবমোচন জন্য কোন আবেদন উক্ত সভায় উপস্থাপিত করিবার এবং কমিটিতে ভারতবর্ষের বার্ষিক আয় ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণ (Annual Budget) প্রদর্শন করিবার যে ক্ষমতা পূর্ব্বে সভ্যগণের ছিল, সেই ক্ষমতা উক্ত সভার বর্ত্তমান সভ্যগণকে এক্ষণে পুনরায় অবিলম্বে প্রদত্ত হউক, এবং ইহাও মহাসমিতির আন্তরিক আশা যে, 'কমন্স' সভা এমন সময়ে ভারতীয় বার্ষিক আয় ব্যয়ের বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন যাহাতে তদ্বিষয়ে সম্যক্‌রূপে যথোচিত আন্দোলন হইতে পারে, এবং এই প্রস্তাবের মর্ম্মানুসারে একখানি স্বতন্ত্র আবেদন পত্র 'কমন্স' সভায় উপস্থাপিত করিবার জন্য মহাসমিতির মাননীয় সভাপতি সার্ উইলিয়ম ওয়েডার্‌বারণকে উক্ত আবেদন পত্রে মহাসমিতির পক্ষে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

বেহারের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সরিফুদ্দীন্ এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিনিধি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবিয় উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন ও সমর্থন করিলেন। পণ্ডিত মদনমোহনের উদ্দীপনা পূর্ণ বক্তৃতায় সমবেত প্রতিনিধি বর্গ বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে সকলের সম্মতি অনুসারে উক্ত প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির শাসনকর্ত্তা লর্ড রিয়ের সুশাসন গুণে তত্রত্য অধিবাসিগণের যে কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তজ্জন্য উক্ত ন্যায়পর, সমদর্শী ও সুদক্ষ শাসনকর্ত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সমুচিত সম্মান প্রদর্শনার্থে বোম্বাই নগরীর ভূত পূর্ব্ব সেরিফ শ্রীযুক্ত জাবেরীলাল উমিয়াশঙ্কর যাজ্ঞিক নিম্ন লিখিত প্রস্তাব উল্লেখ করিলেন।

১০ম প্রস্তাব :—লর্ড রিয়ের ভারতবর্ষ পরিত্যাগের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এই সুযোগে, তিনি ভারত-শাসন কার্য্যে যেরূপ কার্য্যদক্ষতা ন্যায়পরতা ও অপক্ষপাতিতার পরিচয় দান করিয়াছেন, তজ্জন্য শুদ্ধ বোম্বাই বিভাগের নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের গভীর আনন্দ, এবং তিনি ভারতবাসিগণের প্রত্যেক মহৎ আশায় ও অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা যেরূপ উৎসাহের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য সমগ্র ভারতবর্ষের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এই মহাসমিতি চিরস্মরণীয় রূপে লিপি বদ্ধ করিতেছেন। তৎপরে তিনি তাঁহার সৎকার্য্য ও মহৎ গুণগ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান এবং তাঁহার প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন।

বঙ্গদেশের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বাবু নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী গভীর আনন্দের সহিত উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন এবং মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সি, শঙ্কর নেয়ার, রাজকোটের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হরমস্‌জী এ, ওয়াদিয়া, বোম্বাইর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত এ, এম, ধরমসি, ও পঞ্জাবের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লালা মুরলিধর একে একে দণ্ডায়মান হইয়া বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে উহার সমর্থন করিলেন; অনন্তর সকলের সম্মতি অনুসারে উল্লিখিত প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল।

মান্দ্রাজের প্রতিনিধি সুবিখ্যাত নর্টন্ সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় প্রস্তাবের অনির্দ্দিষ্ট বিষয় স্থিরীকরণ উদ্দেশে নিম্নলিখিত প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন।

১১শ প্রস্তাব :—ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার ও পুনর্গঠন সম্বন্ধীয় ২য় প্রস্তাবে যে একটী স্থূল প্রণালী গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে যে যে কারণে ভারতবাসিগণ (১) ভোটদাতা, (২) প্রতিনিধি (৩) প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং (৪) গভর্ণর জেনারলের সভার সভ্য হইবার উপযুক্ত কিম্বা অনুপযুক্ত হইবেন, প্রস্তাব-নির্ব্বাচন-কমিটি (Subjects Commitee) তাহা স্থির করিবার জন্য, এবং পার্লামেণ্টের সভ্য শ্রীযুক্ত চার্লস্ ব্র্যাড্‌ল সাহেব উক্ত সভা সম্বন্ধীয় যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছেন তাহা গঠনের সুবিধার জন্য তাঁহাকে উক্ত কমিটির এতদ্বিষয়ক রিপোর্ট অর্পণ করিতে উপদেশ দান করা হউক।

সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে উহা পরিগৃহীত হইল।

অনন্তর মাননীয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া আনন্দের সহিত বলিলেন, "ভদ্র মহোদয়গণ, এক্ষণে আমি এমন একটী প্রস্তাবের উল্লেখ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছি যাহা বিনা অনুমোদনে সর্ব্বদা গভীরতম উৎসাহ আনন্দের সহিত পরিগৃহীত হইয়া থাকে। উহা আমাদের সকলের পুরাতন সহৃদয় ও সুদক্ষ নেতা শ্রদ্ধাস্পদ হিউম্ সাহেবের সাধারণ সম্পাদক-পদে পুনর্নিয়োগ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব। প্রস্তাব কর্ত্তা আর অধিক অগ্রসর হইতে না হইতেই মহাসমিতির মধ্যে মহা আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল—বহু সংখ্যক প্রতিনিধি শিরস্ত্রাণ ও পাগড়ী উন্মোচন পূর্ব্বক মহাত্মা হিউমের নাম উচ্চারণে তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর নিম্নলিখিত দ্বাদশ প্রস্তাব মহোৎসাহের সহিত পরিগৃহীত হইল।

১২শ প্রস্তাব : -শ্রীযুক্ত এ, ও, হিউম, সি, বি, আগামী বর্ষের জন্য ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির সাধারণ সম্পাদকের পদে পুনরায় নিযুক্ত হউন।

অনন্তর সভাপতি মহাশয় জাতীয় মহাসমিতির আকার নিরূপণ, উহার ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধন এবং কার্য্য-পরিচালন বিষয়ক বিবিধ হিতকর প্রস্তাবের অবতারণার জন্য বঙ্গদেশের সুবিখ্যাত বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ত্রয়োদশ প্রস্তাব উল্লেখ করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি আনন্দের সহিত বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া জ্বলন্ত উৎসাহ ও গভীর উদ্দীপনা পূর্ণ তেজস্বী বক্তৃতার সহিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন।

১৩শ প্রস্তাব।

(ক) বর্ত্তমান বর্ষে প্রতিনিধির সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং পূর্ব্ব কয়েক বৎ-

সরে উহা যেরূপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে দেখা গিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এই বিবেচনায় স্থিরীকৃত হয় যে ভবিষ্যতে প্রত্যেক সমিতি-কেন্দ্র (Congress Circle) ১০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে একটী প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন, প্রত্যেক কেন্দ্র অবস্থানুসারে তাহার নির্দ্দিষ্ট নির্ব্বাচন স্থান সমূহের মধ্যে কত সংখ্যা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা সুবিধাজনক, তাহা স্থির করিয়া দিবেন।

(খ) শ্রীযুক্ত হিউমের ইংলণ্ড-গমনের দিন হইতে মাননীয় শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ সহকারী সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহাকে আবশ্যকানুসারে অন্য সহকারী সম্পাদক নিয়োগ, কেরাণী, ডাক খরচ, টেলিগ্রাফ, মুদ্রণ ইত্যাদি অত্যাবশ্যক কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ৫,০০০ টাকা প্রদত্ত হয়, এবং এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গদেশের জন্য, শ্রীযুক্ত ফেরোজসা মেটা বোম্বাই প্রদেশের জন্য, এবং শ্রীযুক্ত আনন্দ চার্লু মান্দ্রাজের জন্য, সহকারী সাধারণ সম্পাদকের নির্দ্দিষ্ট পরামর্শদাতা (Standing Counsel) নিযুক্ত হয়েন।

(গ) মহাসমিতির প্রকৃতি ও কার্য্য অবধারণ জন্য যে সকল পরীক্ষণীয় নিয়মাবলী সর্ব্ব প্রথমে মান্দ্রাজে বিবেচিত হইয়াছিল, এবং যাহাতে সময়ে সময়ে বিবিধ নূতন নিয়ম সংযোজিত হইয়াছে, তৎসমস্ত বিষয় নির্দ্দিষ্ট কংগ্রেস্ কমিটি (Standing Congress Commitee) দ্বারা আগামী বর্ষে সম্পূর্ণরূপে বিবেচিত হইয়া মহাসমিতির পর অধিবেশনে নিশ্চিতরূপে অবধারিত হয়।

(ঘ) ইংলণ্ডে ভারতীয় রাজনৈতিক কার্য্যালয়ের কার্য্যপ্রণালী পরিচালন, উহার ব্যয় নির্দ্ধারণ এবং আবশ্যক বোধে কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ এই মহাসমিতি, মাননীয় সার্ উইলিয়ম্ ওয়েডারবারণ, শ্রীযুক্ত কেন, এম্, পি, শ্রীযুক্ত ম্যাক্লারেন্, এম, পি, শ্রীযুক্ত এলিস্, এম, পি, শ্রীযুক্ত দাদাভাই নারোজী ও শ্রীযুক্ত জর্জ্জ ইয়ুল, মহাশয়গণকে কমিটির সভ্যস্বরূপে নিয়োগের অনুমোদন ও অবধারণ এবং এই সমস্ত মহাশয়গণ ও কার্য্যালয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত উইলিয়ম্ ডিগ্বী মহাশয় ভারতবর্ষের যে অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

(ঙ) জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্যনিচয় ইংলণ্ডে বিশেষরূপে প্রকাশ করিবার জন্য এবং উহার সঙ্কল্পিত রাজনৈতিক সংস্কারসমূহের আবশ্যকতা ইংলণ্ডের লোক সাধারণের বিবেচনার জন্য সম্যক্‌রূপে প্রদর্শন উদ্দেশে, এই মহাসমিতি শ্রীযুক্ত জর্জ্জ ইয়ুল্, শ্রীযুক্ত হিউম্, শ্রীযুক্ত এ্যাডাম্, শ্রীযুক্ত আর্ড্‌লে নর্টন্, শ্রীযুক্ত ফেরোজসা মেটা, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সরিফুদ্দীন, শ্রীযুক্ত মুদলকার এবং শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণকে ভারতের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতেছেন।

(চ) আগামী বর্ষে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে মহাসমিতির কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য ৪৫,০০০ টাকা সংগৃহীত হউক এবং ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট কমিটি সকল (Standing Committees) আপন আপন দেয় অংশের অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা তিন মাসের মধ্যে এবং অবশিষ্ট অংশ ছয় মাস মধ্যে সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

তাঁহার বক্তৃতার এমনই আকর্ষণী শক্তি যে উহা সমবেত প্রতিনিধিবর্গের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া সকলকে উন্মাদিত ও স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত করিয়াছিল। বক্তৃতার শেষ ভাগে তিনি আগামী বর্ষের জন্য মহাসমিতির এবং ইংলণ্ডস্থ ভারতীয় রাজনৈতিক কার্য্যালয়ের অত্যাবশ্যক ব্যয়ভার নির্ব্বাহার্থে অন্যূন ৪৫,০০০ হাজার টাকার প্রয়োজন এবং তদভাবে সমস্ত কার্য্য বিফল হইবে, এই কথা সকলকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য বাগ্মীবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন ;—“মহাশয়গণ, আমাদের সুবিখ্যাত সাধারণ সম্পাদক (শ্রীযুক্ত হিউম্) প্রতি বর্ষে এই সমিতির কার্য্য সৌকর্য্যার্থে দশ সহস্র হইতে পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা স্বীয় ধন ভাণ্ডার হইতে ব্যয় করিবেন, ইহা কখনই ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না। আমার স্বদেশীয় দেশানুরাগী ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা বড়ই অগৌরবের বিষয় যে এই অন্যায় প্রথা বর্ষে বর্ষে প্রবর্ত্তিত হইবে। অতএব আমি আশা এবং ভরসা করি যে, অতঃপর ভারতীয় রাজনৈতিক কার্য্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রয়োজনীয় অর্থ সহজেই সংগৃহীত হইবে। মহাশয়গণ এতদ্বিষয়ে আমি আপনাদের নিকট বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করি যে, আমাদের সকলেরই আত্মোৎসর্গের শিক্ষা লাভ করা উচিত। মহাসমিতিতে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দান এবং মন্তব্য-পরিগ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হইল না, স্বদেশের মঙ্গল উদ্দেশে স্বার্থ ত্যাগ, এবং আমরা যে পবিত্র ব্রতে মন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছি তৎসংসাধনার্থে আত্ম-বিসর্জ্জন শিক্ষা করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। অধম নিগ্রো জাতির কৃতদাসগণের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য ইংলণ্ড অকাতরে বিশ কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন, আর আমরা বিদেশীয় কৃতদাসগণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নহে, কিন্তু স্বস্ব রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য ৫০,০০০ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দানেও কি কাতর হইব? যদি আমরা উহাতে অসমর্থ হই, তাহা হইলে এই জাতীয় মহাসমিতি একটী অর্থ শূন্য বৃথাড়ম্বর স্বরূপে পরিগণিত হইবে, যদ্দ্বারা অভিলষিত কোন মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমি আশা ও ভরসা করি যে, আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহে কোন অসুবিধা জন্মিবে না। …”

মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আর্ড্লে নর্টন্ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় উল্লিখিত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

অনন্তর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, “বিবেচনা করি আমি এক্ষণে উক্ত প্রস্তাব সর্ব্ববাদী সম্মত জ্ঞানে গ্রহণ করিতে পারি। তাঁহার কথায় একজন প্রতিনিধি বলিলেন, অগ্রে অর্থ গ্রহণ করুন পরে প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবে। এই কথা বলিবা-

মাত্র সর্ব্বাগ্রে পঞ্জাবের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত মুরলিধর সভাপতি মহাশয়ের সম্মুখস্থ টেবিলের উপর ৫৫৫ টাকা স্থাপন করিলেন। উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতে না করিতেই চতুর্দ্দিক হইতে শত শত প্রতিনিধি গভীর উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে দ্রুতগতি বেদীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, রাশি রাশি নোট ও টাকা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন জ্বলন্ত উৎসাহ আর কখনও প্রদর্শিত হয় নাই; ক্ষণকালের মধ্যে শ্রীযুক্ত হিউম্ শ্রীযুক্ত ওয়েডার বারণ, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণের টুপি রাশি রাশি অর্থে পরিপূর্ণ হইল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে নগদ ৯,১৭৯॥৶৭ টাকা সংগৃহীত এবং ৫৬,২২৬ টাকা প্রতিশ্রুত ও স্বাক্ষরিত হইল! এক উদ্যো টাকার পরিবর্ত্তে ৬৫,৪০৫॥৶৭ টাকা সঞ্চিত হইল! ৬½ ঘটিকার সময় মহাত্মা ব্রাড্‌ল সাহেবকে অভিনন্দন পত্র দান করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, এ জন্য সকলে সত্বর অর্থ গ্রহণ বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন; অন্যথা আর অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল এ জন্য অতিবাহিত হইলে, এই মহা সুযোগে লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই,

অনন্তর সমবেত প্রতিনিধিবর্গের সম্মতি অনুসারে উল্লিখিত প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল।

তৎপরে মাননীয় শ্রীযুক্ত হিউম সাহেব বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি দণ্ডায়মান হইবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে গভীর আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল—সকলে প্রাণ খুলিয়া প্রীতির প্রবাহ দানে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। আনন্দ কোলাহল নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিলে তিনি বলিলেন, "মহাশয়গণ, আমি প্রচলিত প্রথানুসারে আপনাদের নিকট আমার ক্ষুদ্র বার্ষিক প্রস্তাবের অবতারণার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছি; কিন্তু উহা পাঠ করিবার পূর্ব্বে আপনারা আমাকে যেরূপ সদয়ভাবে অভিবাদন দান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দান না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যদি আমি আপনাদেরই জন্য কঠিন পরিশ্রম করিয়া থাকি—আমি সত্য সত্যই গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছি—যদি আমি আপনাদের কার্য্যেই অত্যন্ত খাটিয়া থাকি, যদি আমি আপনাদিগকে ভালবাসিয়া থাকি, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, আপনারা আমার প্রতি হৃদয় খুলিয়া এই যে গভীর সম্মানের চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন তদ্দ্বারাই তাহার যথেষ্ট প্রতিশোধ দান করিয়াছেন। চারিদিক হইতে সকলে পুনরায় গভীর আনন্দের সহিত বলিলেন "কিছুই প্রতিশোধ দান করা হয় নাই!" তিনি বলিলেন, "মহাশয়গণ, আমরা এই বিষয় লইয়া তর্ক করিব না; আমরা সকলে পরস্পরের ভ্রাতৃস্থানীয়।"

সময়ের অল্পতাবশতঃ বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত ব্রাড্‌ল সাহেবকে অভিনন্দন পত্র দানের সময় আগত-প্রায় দেখিয়া আর অধিক কিছু না বলিয়াই নিম্নলিখিত চতুর্দ্দশ প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন।

১৪শ প্রস্তাব :—আগামী ১৮৯০ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গদেশের কোন স্থানে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ষষ্ঠ অধিবেশন হইবে; অধিবেশন স্থান পরে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

সর্ব্বসম্মতি ক্রমে উক্ত প্রস্তাব পরিগৃহীত হইল।

অনন্তর জাতীয় মহাযজ্ঞের প্রধানাচার্য্য শ্রীযুক্ত সার্ উইলিয়ম্ ওয়েডার্‌বারণ সাহেবকে মহাসমিতির পক্ষ হইতে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদানার্থে মান্দ্রাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আনন্দ চার্লু বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন।

১৫শ প্রস্তাব :—ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আগমন জনিত রাজনৈতিক কার্য্য-ক্ষতি ও স্বকীয় বিস্তর ত্যাগ-স্বীকার, এবং এতদ্দেশের জনৈক প্রধান রাজ কর্ম্মচারী স্বরূপে অমায়িকতা, অপক্ষপাতিত্ব ও অক্ষুণ্ণ সহানুভূতি প্রভৃতি যে সকল মহৎ গুণের জন্য তিনি সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন, বর্ত্তমান মহাসমিতির কার্য্যাবলী পরিচালনে সেই সকল অসাধারণ গুণের পরিচয় দান হেতু এই পঞ্চম মহাসমিতি, উহার মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত সার্ উইলিয়ম্ ওয়েডার্‌বারণ মহাশয়কে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। সকলে গভীর আনন্দের সহিত উল্লিখিত প্রস্তাব অনুমোদন করিলে সাধারণ সম্পাদক কর্ত্তৃক উহা পরিগৃহীত হইল।

অনন্তর মহাযজ্ঞের প্রধানাচার্য্য দণ্ডায়মান হইয়া মহাসমিতির প্রতিনিধিগণকে আনন্দের সহিত ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক, এই তিন দিন উহার কার্য্য পরিচালনে এবং উহার প্রধান প্রধান নেতৃগণের জলন্ত অনুরাগ এবং প্রতিনিধিবর্গের উৎসাহপূর্ণ একাগ্রতা দর্শনে যে গভীর তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, তজ্জন্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং উহা ভবিষ্যতে আলোকময় হইয়া এ দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে, এই আশা প্রকাশ পূর্ব্বক আনন্দের সহিত ব্যক্ত করিলেন যে তিনি যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন তিনি এই মহাসমিতির পঞ্চম মহাযজ্ঞের প্রধান-আচার্য্য স্বরূপে যে সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহার গৌরবময় স্মৃতি চিরকাল হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে পোষণ করিবেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে মাননীয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তদীয় স্বদেশবাসী ভ্রাতৃগণের মুখপাত্র স্বরূপে বঙ্গদেশে জাতীয় সমিতির আগামী বর্ষের অধিবেশনে উপস্থিতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় সমবেত প্রতিনিধিগণকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন।

পরিশেষে প্রধান আচার্য্য মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বোম্বাই নগরের অভ্যর্থনা সমিতির যে সকল ভদ্র মহাশয়গণ প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনার জন্য সুন্দর রূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক মহাযজ্ঞের উপসংহার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শক মণ্ডলী মুক্তকণ্ঠে ভারতে-

শ্বরীর জয় গান ও আনন্দ কোলাহলে নিমগ্ন হইলেন। আনন্দ কোলাহল প্রশান্ত ভাব ধারণ করিতে না করিতেই পঞ্চম মহাযজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইল।

মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার অপার করুণায় নবভারতের বিভিন্ন জাতীয় পঞ্চম মহাযজ্ঞ অবাধে মহা সমারোহে সম্পাদিত হইল। তাঁহার মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদের অব্যর্থ ফল স্বরূপ বর্ত্তমান বর্ষে উহার সমধিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। স্বদেশ প্রেমিক সন্তান-গণ এক মনে তাঁহারই অনন্ত করুণা ও অত্যাশ্চর্য্য মহিমা ধ্যান করিলে পুনরায় সকলে এক বৎসর পরে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া দুঃখিনী জননীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতে পারিবেন। কবে এমন সুদিন আসিবে, যে দিন কোটি কোটি সন্তান একপ্রাণে মিলিত হইয়া দুঃখিনী জননীর চরণতলে জ্বলন্ত আত্মবিসর্জ্জনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে সমর্থ হইবেন এবং তাঁহাদের মহাসাধনার প্রভাবে তাঁহার হৃদয়ের বিষাদ বিলুপ্ত ও ললাটের কালিমা প্রক্ষালিত হইবে! দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়, বিপন্নের বন্ধু, ছিন্ন ভিন্নের নেতা, করুণাময় পরমেশ্বর, করযোড়ে সকাতরে প্রার্থনা করি, একবার এই হতভাগ্য দেশের অধম সন্তানগণের প্রতি কৃপা কটাক্ষ প্রদান কর—তোমার আশী-র্ব্বাদে আমাদের প্রাণের বাসনা পূর্ণ হউক! এ দেশের অস্তমিত গৌরব রবি পুনরায় অভিনব উজ্জ্বল ছটায় সমুদিত হইয়া দিক্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করুক!

সমাপ্ত।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।

প্রেম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

আমাদের দেশীয় সাহিত্যে সাধারণতঃ যে সকল কাব্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই প্রেমের কথা লইয়া। প্রেমের বৈচিত্র্য, তরঙ্গভঙ্গ এদেশের কবিরা যেরূপ সুন্দররূপে বুঝিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য কবিরা বোধ করি সেরূপ বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের কাব্যের বিরহ, অভিসার, মানাভিমান ব্যাপার পাশ্চাত্য কাব্যে কোথায়? পাশ্চাত্য দেশে কি প্রণয়-বন্ধনের মধ্যে বিরহ দেখা দেয় না? প্রণয়িনী কি ভুলিয়াও মান করিয়া বসিয়া থাকেন না? তবে সে দেশের কাব্য বিরহ-বিলাপ-ধ্বনিময় নহে কেন? মানভঞ্জনের গুরুতর ব্যাপার লইয়া পাশ্চাত্য কবি গীত-রচনা করেন নাই কেন? প্রকৃতি, শিক্ষা, স্বাধীনতা, এবং অন্যান্য নানা অবস্থাভেদে পাশ্চাত্য দেশে বোধ হয় বিরহের এরূপ জ্বালাময়ী দারুণতা নাই। ইংরাজদিগের মধ্যে যে ভালবাসার অভিনয় খেলা প্রচলিত আছে, তাহাই হয়ত আমাদের মানভঞ্জনের

কতকটা অনুরূপ। কিন্তু মানভঞ্জন অনুষ্ঠানের মধ্যে হৃদয়ের যথার্থ অনুরাগ প্রচ্ছন্ন, আর ইংরাজ জাতির flirtation প্রেমের অভিনয় মাত্র—তাহাতে সত্যের সম্পর্ক নাই। সুতরাং মানভঞ্জনে স্বভাবতই কবিতার প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে পারে।

ইংরাজী সাহিত্যে বিরহের ভাবপ্রকাশক একটীও কথা শুনা যায় না। বিচ্ছেদের ইংরাজী প্রতিশব্দ খুঁজিয়া মিলে, কিন্তু বিরহের প্রতিশব্দ নাই। বিরহের অভাবে সুতরাং মিলনেরও অবিকল প্রতিশব্দের ইংরাজী ভাষায় অভাব আছে। আমাদের মিলনের হৃদয়ে কতদিনকার বিরহের অশ্রুজল প্রচ্ছন্ন, কত দীর্ঘ নৈরাশ্যের রুদ্ধ নিশ্বাস সমাহিত। পাশ্চাত্য মিলন কেবল মিলন মাত্র—তাহার মধ্যে বিরহের কাব্য রচিত হয় নাই, পথ পানে চাহিয়া কাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা জাগিয়া নাই, আমাদের মিলনের মত সে মিলন অতীতের অগাধ সমুদ্রমথিত নহে। আমাদের বিরহ মিলনে এ দেশের প্রকৃতির প্রভাব অনুভব হয়। অপরদেশে সুতরাং ঠিক সেইরূপ কিছু আশা করা যায় না।

প্রেমবাচক শব্দও আমাদের ভাষায় অধিক মিলে। স্নেহ, ভক্তি প্রভৃতি বিশেষ ভাব সকল বাদ দিয়াও কত কথা—প্রেম, প্রণয়, অনুরাগ, ভালবাসা, প্রীতি, পিরীতি। ইহারা সব যে সম্পূর্ণ এক ভাবই ব্যক্ত করে তাহা নহে। কিন্তু ইংরাজীতে একমাত্র প্রতিশব্দ—Love। প্রেম, ঈশ্বর-বিষয়ে প্রয়োগ না হইলেও, প্রণয় অপেক্ষা নিষ্কাম। প্রেম ইংরাজী Love শব্দের মত বিস্তৃত এবং সঙ্কীর্ণ উভয় ভাবেই ব্যবহৃত হয়। প্রণয়ের প্রেমের মত বিস্তৃতি নাই। প্রণয় মানবের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না। প্রেমের বিনাই-য়াহ সুখ; প্রণয় প্রতিদান চাহে। অনুরাগ প্রণয়ের মূলে। প্রণয় অনুরাগাপেক্ষা গাঢ়। প্রীতি হইতে পিরীতির উৎপত্তি বটে, কিন্তু কালক্রমে উভয়ের ভাবে বিস্তর প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে পিরীতির প্রীতির মত গাম্ভীর্য্য নাই। প্রেমের, প্রত্যেক সূক্ষ্ম ভাবগুলি আমাদের ভাষায় সমধিক পরিস্ফুট। ইংরাজী Love শব্দ কোথাও অনুরাগ, কোথাও প্রণয়, এমন স্পষ্ট নহে।

কেহ না মনে করেন যে, পাশ্চাত্য ভাষায় প্রেমের ভাল কবিতা নাই। প্রেমের কবিতা সকল ভাষাতেই আছে। বিশেষতঃ ইংরাজ কবিরা প্রেমিকের হৃদয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু প্রেমের কবিতা যথেষ্ট থাকিলেও ইংরাজীতে আমাদের দেশের মত বিচিত্র প্রেম-কাব্যের অভাব আছে বোধ হয়। এ দেশের কবিরা প্রেমকে সমগ্রভাবে এক করিয়া এবং স্বতন্ত্রভাবে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ ভাগ করিয়া বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন। পাশ্চাত্য কবিরা প্রেমের প্রত্যেক অধ্যায় সেরূপ ভাবে দেখেন নাই। আমাদের বৈষ্ণব কবিদিগের সঙ্গীতে প্রেমের অতৃপ্তি, আকুলতা, আকাঙ্ক্ষার ভাব সুন্দর পরিস্ফুট। শুধু তাহাই নহে, প্রকৃতির সহিত প্রেমের সম্বন্ধ, প্রেমের উপর প্রকৃতির প্রভাব তাঁহারা সুন্দর

বুঝিতেন। তাঁহারা প্রেমের সুর ধরিয়াছিলেন; সেরূপভাবে কোনও পাশ্চাত্য. কবি বোধ করি প্রেমের সুর ধরিতে পারেন নাই। প্রেমকে তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গীন আয়ত্ত করিয়াছেন। সেই জন্যই ত বংশীধ্বনির সহিত প্রেমভাবের নীরব সম্বন্ধ এমন দক্ষতার সহিত গাঁথিয়া দিতে পারিয়াছেন। এ দেশে প্রেমের তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ হইয়াছে। প্রেমেই আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারি।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রেমের কাহিনী বৈচিত্র্য বিস্তর - নানা ঘটনার সমাবেশে। কিন্তু তাহাতে প্রেমভাবের সাধারণ বৈচিত্র্য তেমন ব্যক্ত হয় নাই। মানব-চরিত্রের বিভিন্নতায় প্রেমের প্রগাঢ়তার তারতম্যই তাহাতে ভাল বুঝা যায়। পাশ্চাত্য প্রেমেও অধীরতা, উৎকণ্ঠা দেখা যায়; কিন্তু প্রাচ্য কবির মত সে ভাব পাশ্চাত্য কবি ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ বোধ হয়, অধীরতা উৎকণ্ঠার সহিত বিরহেরই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। বিরহ-বিষয়ে আমাদের কবি অদ্বিতীয়। বিরহ বেদনা সকল দেশেই আছে—প্রণয়ীবিরহে প্রণয়িনী অধীরা। না থাকিবে কেন? অন্য দেশেও ত এই মানবেরই বাস, তাহাদের হৃদয়ও ত মানবেরই মত। কিন্তু আমাদের কাব্য বিরহাচ্ছন্ন। বিরহকে বিশ্লেষণ করিয়া দেশীয় কবি তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা পর্য্যন্ত বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রেমের মূলে সৌন্দর্য্য উভয় সাহিত্যেই। আমাদের বৈষ্ণব কবিরা এই সৌন্দর্য্যে তন্ময়। সেই জন্যই ত তাঁহাদের প্রেম-সঙ্গীতে তরঙ্গে তরঙ্গে সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যের হৃদয়ে ডুবিতে ডুবিতে তাঁহাদের আর আশ মিটে নাই—যত ডুবিয়াছেন ততই আরও আরও। তাঁহারা কিছুতেই জুড়াইতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য কাব্যে সৌন্দর্য্যের গভীর অগাধে এরূপ নিমজ্জন দেখা যায় কি না সন্দেহ। বৈষ্ণব কবির ভাষা কেবলই সৌন্দর্য্যময়ী, আকুলতাময়ী। পাশ্চাত্য কবি সৌন্দর্য্যে আকুল হইয়া গাহিয়াছেন বটে, কিন্তু সে আকুলতা আর এ আকুলতা বিস্তর তফাৎ। সৌন্দর্য্য-প্রেমে বৈষ্ণব কবি তুলনা রহিত। সে গভীরতা এবং বিস্তৃতি অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য।

বৈষ্ণব কবির প্রেম জগন্ময়। প্রেমে তাঁহাদের স্থিতি, গতি, জীবন। প্রেম জীবনের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি। তাঁহাদের প্রেমচর্চ্চায় প্রেমের সকল রস ধরা দিয়াছে। তাহা কেবলই সুখ-প্রধান নহে। বৈষ্ণব কবির সঙ্গীতে প্রেমের সহিত দুঃখ, জ্বালা, সহিষ্ণুতা। প্রাচ্য সাহিত্যের এই প্রেম-জ্বালা পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিরল। আমাদের কবি প্রেমের সহিত জ্বালার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ব্যক্ত করিয়াছেন। যত তীব্র জ্বালা, তত গভীর প্রেম। প্রেমকে সহিতে হয়। সে সুখ চাহে না, বিনিময় নহিলে মরিয়া যায় না, কেবল ভালবাসে। তাহার আইন আদালত নাই, কুলমর্য্যাদা নাই; যেখানে তাহার আবির্ভাব হয়, অনিবার্য্য বলিয়া—না হইলে নয় বলিয়া। পাশ্চাত্য কবিও এ ভাব অবশ্য বুঝেন। কিন্তু আমাদের কাব্যে ইহা কি পরিস্ফুট!

পাশ্চাত্য কাব্যে প্রেমের একটা অনির্দ্দেশ্যতা অনুভব করা যায়। এই অনির্দ্দেশ্য অনুভবনীয় ছায়া-ভাব আমাদের সাহিত্যেও বিরল নহে। আমাদের বংশীধ্বনিময়ী আকুলতায় এ ভাব তরঙ্গায়িত। শুধু তাহাই নহে, মিলনের পূর্ণতার মধ্যেও আমাদের কবিরা একটা আকুল অনির্দ্দেশ্য কি-জানি-কি ভাব ধরিতে পারিয়াছেন। প্রাচ্য কবিতায় এভাব অনেকস্থলে দেখা যায়। ভারতের কবিইত প্রথম মিলনের মধ্যে সুখ কি দুঃখ ঠাহরাইয়া উঠিতে না পারিয়া আকুল হৃদয়ে গাহিয়া উঠিয়াছিলেন। সে ভাবের প্রতিধ্বনি বর্ত্তমান শতাব্দীর পাশ্চাত্য সাহিত্যেই খুঁজিলে মিলিতে পারে। অন্যত্র মিলে কি না জানি না।

প্রেমের একটী ভাব আমাদের ভাষায় সুন্দর ব্যক্ত। সে ভাব আধ—আধ চাহনি, আধ হাসি, আধ চরণে আধ চলন। কটাক্ষের তীব্রতা এখানে বিলুপ্ত, হাস্যের ভঙ্গী নাই, গমনে হেলিয়া দুলিয়া ঢলিয়া পড়ার ভাব নাই; অথচ ইহার মধ্যে প্রেমের ঢল ঢল সৌন্দর্য্য পূর্ণ অভিব্যক্ত। আড়নয়নের অপেক্ষা আধ চাহনিতে যেন শ্রী আছে, কোমলতা আছে। আভিধানিক সংজ্ঞায় তাহা স্পষ্ট বুঝান যায় না। আধ হাসির হৃদয়ে তীব্র বিদ্যুচ্চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় না, তাহাতে কেবলই একটী মাধুরীর সন্নিবেশ। পাশ্চাত্য ভাষায় এই ভাবের অবিকল অনুবাদ মিলে কিনা বলা সহজ নহে। তবে প্রেমের চাহনি, প্রেমের হাসি, প্রেমের চলন পাশ্চাত্য সাহিত্যে অনেক আছে। নহিলে অতবড় সাহিত্য টিঁকে?

প্রেমের বাঁশী কিন্তু আমাদের মত আছে কাহার? বাঁশীর প্রেম পাশ্চাত্য কবি আমাদের মত বুঝেন না। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির রাধাময়ী কাতরতা তাঁহারা বুঝিবেন কিরূপে? বৈষ্ণব কবিই সে বাঁশীর মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন—কারণ তাঁহার হৃদয়ে সে বাঁশী বাজিত। বৈষ্ণব কবি বাঁশীর স্বরে বিষামৃতের একত্রীকরণ অনুভব করিয়াছেন, তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ভাব ধ্বনিত হয় তাহার সন্ধান লইয়াছেন, স্বভাবের সহিত তাহার মধুর সামঞ্জস্য বুঝিয়াছেন। প্রকৃতির সুর সম্বন্ধে তাঁহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি লতাকুঞ্জের শিরায় শিরায় কেমন একটা কম্পিত অধীরতা বিকশিত করিত, যমুনার ঘন নীল তরঙ্গে তরঙ্গে কি প্রবাহময় চাঞ্চল্য স্পর্শ দিয়া যাইত, বৈষ্ণব কবিই তাহা ধরিয়াছেন। আর রাধার হৃদয়ের উপর সে বাঁশীর প্রভাব? তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। প্রেমের শব্দ, স্পর্শ, সৌন্দর্য্য, রস, সকলই বৈষ্ণব কবি বুঝেন। প্রেমের অতীন্দ্রিয়তাও তাঁহাদের অজ্ঞাত নহে। বৈষ্ণব কবির কাব্যইপ্রেম।

প্রাচ্য সাহিত্যে প্রেমের সহিত প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পূর্ব্বেই আভাস দেওয়া হইয়াছে। কোকিল মলয় বসন্ত, মেঘ বৃষ্টি বর্ষা, ইত্যাদি উদাহরণ। পাশ্চাত্য সাহিত্যেও প্রণয়কাল May। May আমাদের বসন্তের সহিত কতকটা মিলে। আমাদের

বর্ষার ব্যাপার পাশ্চাত্য সাহিত্যে না মিলিবারই কথা। এ দেশের কবিরা ঋতুতে ঋতুতে প্রেমের ভাব আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশে এত ঋতুভেদ বোধ কবি নাই, সুতরাং ভাবেরও প্রতিদিন পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু যে কয় ঋতু আছে, তাহার প্রত্যেক পরিবর্ত্তনে প্রেমের ভাবের পবিবর্ত্তন কি সে দেশে এরূপ আলোচিত হইয়াছে? জানি না ত। এ দেশে বসন্ত বর্ষাব বিরহেব প্রভেদ অনেক দিন হইতেই আলোচনা হইয়া আসিতেছে। কোন কোন বৈষ্ণব কবি সকল ঋতুরই ভাব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

কালিদাসের মেঘদূতের অত সৌন্দর্য্য—বাহ্য প্রকৃতির সহিত হৃদয়েব ভাবের সম্মিলনে। অত কথায় কাজ কি, মেঘকে বিবহের দূত না করিলে তাঁহার সকলই বার্থ হইত। কালিদাসের মেঘদূতে মধ্যে মধ্যে বহিঃপ্রকৃতিতে প্রেমেব অভিব্যক্তি প্রায়ই দেখা যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যেও এভাব অনেক স্থলেই দেখা যায়। শেলীর প্রেমতত্ত্ব ত এই ভাব লইয়া রীতিমত তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইযাছে। পাশ্চাত্য কাব্যে আরও উদাহরণ মিলিতে পারে। বাহুল্যভয়ে এইখানেই নিবৃত্ত হইলাম।

প্রেমের স্বাধীন মুক্তভাব পাশ্চাত্য সাহিত্যে যেরূপ মিলে, আমাদেরও কি সেইরূপ? বৈষ্ণব কবিদিগকে ছাড়িয়া দিলে আমাদের মুক্ত ভাব অল্পই। সংস্কৃত কবিরাও দাম্পত্য-প্রণয়ের সঙ্গে অনেক সময় মুক্তভাব যোগ করিয়া দিয়াছেন। মুক্তভাবে বৈচিত্র্য সুব্যক্ত। ইদানীন্তন বঙ্গসাহিত্যের কবিরা প্রেমকে বদ্ধ করিয়া পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছেন। প্রেমের শিক্ষা হয় নাই, অথচ তৃষ্ণা প্রবলা; সুতরাং স্বভাবতই উচ্ছৃঙ্খলতার আবির্ভাব। উদাহরণ—বিদ্যাসুন্দর। মুক্তভাবে যে সুগভীর সংযত শিক্ষা হয়, প্রাচীর-বেষ্টিত বিলাসের মধ্যে তাহা হয় না। বৈষ্ণব সাহিত্যই আমাদিগের মুখ রক্ষা করিয়াছে। নহিলে, কেবল সংস্কৃত সাহিত্যেব দুই চারি খানি প্রেম-কাব্য লইয়াই আমাদের নাড়াচাড়া করিতে হইত। কৃষ্ণনগরের রাজসভা-বর্দ্ধিত সাহিত্যেব ত আর উল্লেখ করিয়া আমাদের গৌরব করা চলিত না।

প্রাচ্য সাহিত্যে প্রেমের সহিত একটা বিশেষ লজ্জাব ভাব জড়িত। পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রেম নির্লজ্জ নহে বটে, কিন্তু আমাদের দেশের মত তাহা একেবারে লজ্জা আচ্ছন্ন কি না জানি না ত। হয়ত উভয়দেশে লজ্জার প্রকৃতি ভিন্ন। সেই জন্য আমাদের প্রেমকে যেরূপ সলজ্জ মনে হয়, পাশ্চাত্য প্রেমকে সেরূপ মনে হয় না। Blush করা কিন্তু উভয় দেশেরই সাধারণ প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়।

পাশ্চাত্য প্রণয়াপেক্ষা আমাদের প্রণয়ে সহচরী সান্ত্বনার যেন কিছু আধিক্য দেখা যায়। বিরলবাস উভয় সাহিত্যেই। সখীসমাগমে আমাদের সাহিত্যে কণ্ঠধ্বনিটা অনেক সময় জমে ভাল। সখীরা থাকায় অনুরাগ ব্যক্ত করিবার সুবিধা মন্দ নয়। তাই বলিয়া সকল সময়ে সখীসঙ্গ অসহ্য। আমাদের কবিরা কোন্ অবস্থায় সখীকে

রাখিতে হইবে, কোন্ অবস্থায় বা বিদায় দিতে হইবে বুঝেন। মানসিক অবস্থার উপরেই তাহা নির্ভর করে। পাশ্চাত্য সাহিত্য যে একেবারে সখীবিবর্জ্জিত তাহা বোধ হয় না, তবে আমাদের সখীসমাগমে কিছু জমাট্ অধিক। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এতটা নহে।

প্রাচ্য সাহিত্যের কে জানে-কাহাকে অভিশাপ ভাব কি পাশ্চাত্য সাহিত্যে আছে? বোধ হয় না। আমাদের রাধার এ অনির্দ্দেশ্য অথচ সুস্পষ্ট অভিশাপ অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যে, প্রেমের কতকগুলি সূক্ষ্ম শিরায় তাড়িতস্পর্শ অনুভব করা যায়। তাহাতে প্রেমের মৃদু অব্যক্ত সৌন্দর্য্য অনেকটা প্রকাশ পায়। তাহা হইতে অবশ্য এমন প্রমাণ হয় না যে, প্রেমের সূক্ষ্ম ভাবগুলি এদেশের কবিরা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তবে ভাববিশেষ পাশ্চাত্য সাহিত্যেই সমধিক ব্যক্ত।

যে তরুণ সাহিত্যে এই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য প্রেমবৈচিত্র্যের শুভ-সম্মিলন, সে সাগরসঙ্গম সাহিত্যের ভবিষ্যৎ না জানি কি উজ্জ্বল! সে সাহিত্য হইতে যে প্রেম স্রোত প্রবাহিত হইয়া জগতের হৃদয় সিক্ত করিবে, তাহাতে ধরণীর সমস্ত রক্ত চিহ্ন মুছিয়া গিয়া এক শান্ত আনন্দের আবির্ভাব হইবে। প্রেমের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আর নব্য সাহিত্যের অভ্যুদয় সম্ভাবনা নাই। এখন কেবলই সেই প্রেম চাহি—প্রেম আর প্রেম।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনাথিনী

ভাঙ্গা গৃহ ভাঙ্গা ঘরে,
ভাঙ্গা বুক মনে পড়ে,
মনে পড়ে তার সেই, বিষাদের অশ্রুধার,
মনে পড়ে অবলার মর্ম্মভেদী হাহাকার।
সে ত নহে কঠিন-হৃদয়;
তার কেন নাহিরে আশ্রয়!
কোমল লতিকা হতে,
তার মায়া অধিক কোমল;
উষার আলোক হতে,
তার হাসি অধিক উজল।

হৃদয়ের গলা ধরে,
সে শুধু কাঁদিতে চায়,
নাম করে ডেকে উঠে,
দেখে যদি পরাণ জুড়ায় !
সব তার আপনার
যে তাহারে স্নেহ করে ;
মিলনের মন্ত্র যেন
মুখখানি তার, স্বার্থের-সংসারে।
তার মুখ মলিন হেরিলে,
প্রাণ যেন শুকাইয়া যায় ;
তার বুক দুঃখেতে কাঁদিলে,
মুছাইতে কেহ নাহি হায় !
একবার চেয়ে দেখি,
করুণ মুখানি পানে !
একটি সান্ত্বনা কথা
বলি তার কাণে কাণে !
ধূলা নিয়ে খেলিতাম,
হাসিতাম সুখে,
অশ্রুজল তার শুধু
বাজিত এ বুকে।
ঘুমন্ত মুখানি তার,
ভাবিতাম কথায় কথায়,
তাও আজ ঢেকে যাবে,
আঁধারের ছায় !
হৃদয় হৃদয় ! শেষে,
কি করিলি হায় !
একটি আশ্রয় ছিল—
তাও তুমি ভেঙ্গে দিলে, একটি কথায়।
জলন্ত পরাণ তার,
জ্বলিবে রে রাতি দিন ;
কেহ না বুঝিবে ও গো,
কি দুঃখে সে দীন হীন !

হৃদয় হৃদয়, শেষে,
কি করিলি হায়!
একটি আশ্রয় ছিল—
তাও তুই ভেঙ্গে দিলি—কঠোর কথায়

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

চিন্তা-পাদপ।

নির্জ্জনে থাকিলেই ভাবনা আসে, আজ আমি একাকী শুইয়া কি ভাবিতেছিলাম—জান? ভাবিতেছিলাম যেমন বটের ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে তাহার প্রকাণ্ড কাণ্ড শাখা প্রশাখা, দীর্ঘ নমনা, ক্রোশ ব্যাপৃত ছায়া লুক্কায়িত; ভাবুক ব্যক্তি মাত্রেই তেমনি অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন যে, নির্জ্জনে মানব-হৃদয়োত্থিত এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী চিন্তা-পাদপের বীজও অতি সামান্য। হয় ত তাহা কোন সময়ে একটী ক্ষুদ্র পাখীর ডাক, কি একটী ক্ষুদ্র কথা, কি কাহারও একখানি ম্লান মুখ, কিম্বা একটী শুষ্ক পত্রের পতন। প্রথম, ইহা হইতেই আরম্ভ হয়, কিন্তু পরে এই চিন্তা বৃক্ষের গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত যদি দৃষ্টি চালনা করা যায়, তাহা হইলে বিস্মিত, স্তম্ভিত, চমকিত হইতে হয়, সময়ে সময়ে হাসিও আসে। কিন্তু বটের কাণ্ডের সহিত, তাহার শাখা-প্রশাখা, জটা, পল্লব, তাহার সকলের সঙ্গেই সকলের যোগ আছে দেখা যায়, আমাদের এই চিন্তা তরুর মূলের সহিত শাখার সংশ্লিষ্টতা কোথায়? এই ত কাণ্ড, কোথায় পুকুর পাড়ের আম্রবৃক্ষের শুষ্ক পত্র পতন—আর কোথায়, আমার দূর প্রবাসী বন্ধুর কমল সন্নিভ আনন, কোথায় প্রাসাদের চব্বিশ কৌটার ভিতরে ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে শয়ন করিয়া পূর্ণিমার পূর্ণালোকে চন্দ্রলোকে পরিভ্রমণ? এই ত চিন্তা তরুর শাখা কাণ্ডের ঘনিষ্ঠতা! ইহাকে অনেকেই ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ্‌টাকার স্বপন, বলিতে পারেন, কিন্তু এই ছেঁড়া কাঁথার সঙ্গে লাখ্‌টাকার, শুষ্ক পত্রের সঙ্গে বন্ধুর মুখের, আর আমার ক্ষুদ্র গৃহের সঙ্গে সৌর জগতের, যে বিশেষ ঘনিষ্টতা আছে তাহা নিশ্চিত বলিতে পারি, তবে, বুঝাইতে হইলে অনেক টীকা, ভাষ্য ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আবশ্যক, দুর্ভাগ্যক্রমে তত ক্ষমতা আমার নাই। এখন যাহা বলিতেছি বলা যাক্, যেমন, পথিকেরা বৃহৎ বৃক্ষ মূলে আসিয়া কেহ রাঁধিয়া খায়, কেহ বা তাহার বিস্তৃত সুশীতল ছায়ায় বসিয়া শীতল সমীরণে ও বিহঙ্গ কূজনে শ্রান্তি দূর করে, আর কেহ বা তাহার শীতল মূলদেশে উত্তরীয় বিস্তৃত করিয়া নিদ্রায় তাহার বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত স্বপ্ন সমাগম লাভ করিয়া থাকে, (কে জানে, ঐ ক্ষণপরিচিত বান্ধবগণের জীবন-

পথে আর কখনও দেখা হয় কি না? দেখা না হইলেও যেমন তাহাকে মিথ্যা বলা যায় না) তেমনই আমরা এই জীবন মধ্যাহ্নে শোক, দুঃখ, ভয়, বিস্ময়, পরিপূর্ণ সংসার পথে ভ্রমণ করিতে করিতে এই চিন্তা পাদপের ছায়ায় আসিয়া কখন বিশ্রাম, কখন স্বপ্ন, আবার কখন কখন অনাহুত অপরিচিত ক্ষণিক বান্ধব সংমিলন লাভ করিয়া থাকি, (বোধ করি অনেকেই অনুভব করিয়া থাকিবেন।)। সেই যে, সময়ে সময়ে আমাদের চিন্তামগ্নতার মধ্যে মুহূর্ত্তমাত্র কোন অদৃষ্ট-পূর্ব্ব স্থানের ছায়া, ছায়াবাজির চিত্রপটের মত আমাদের মনের সাম্‌নে চোখের সাম্‌নে আসিয়া উপস্থিত হয় আবার চকিতে সরিয়া যায়, তাহা কি? এই যে ক্ষণিক পূর্ব্বে অস্পষ্ট ছায়ার মত, বিস্মৃত স্বপ্ন দৃশ্যের মত এক একটী অপরিচিত মুখচ্ছবি মনে আসিতেছিল উহারা কে? উহাদের কি পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছি? না পরে কখন দেখিব? ইহার মূলে কি কিছু মাত্র সত্য নাই? এক্ষণে দেখা যাউক, মিথ্যা কাহাকে বলে? আমাদের স্বভাব, যাহা ক্ষণিক, যাহা অদৃশ্য, তাহাকেই মিথ্যা বলিয়া তৃপ্ত। (এখানে সত্যের অপলাপ মিথ্যার কথা হইতেছে না)। আমরা প্রত্যক্ষ বাদী, স্থূলবাদী সুতরাং সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হইতে পারি না। কিন্তু সময়ে সময়ে স্বতোদিত চিন্তামালার মধ্যে যে অনেক সত্য নিহিত আছে তাহাতে সন্দেহ নাই, উহার মূলে যে কোন সত্য নাই এমনও মনে হয় না। জানি না কে আমাকে হস্ত সঙ্কেতে এই কুহেলিকাচ্ছন্ন অভিনব জগতের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে বলিতেছে।

ক্রমশঃ

মা'কে।

কে তুমি একেলা দেবি দাঁড়ায়ে আঁধারে,
গণিছ নিমেষ পল বিশ্রামের তরে?
কেহ কি চাহে না তোর মুছাতে ক্রন্দন?
হেরিতে চাহেনা পুণ্য মলিন বদন?
কেহ কি নাহি গো তব হৃদি-পারে আর?
সবাই কি গেছে ছেড়ে মারে আপনার!
তবে ওগো একেলা আমারি তুমি মা;
ফিরায়ে ও ম্লান মুখ মোরি পানে চা।

তবুও কি ফুটিবেনা হাসি ও বয়ানে ?
তবুও কি চাহিবে না এ নয়ন পানে ?
যা কিছু আমার আছে ক্ষুদ্র এই হৃদে,
ভক্তি মাল্য উপহার সাজায়েছি দিতে
সকলি লহগো দেবি সকলই তোমার,—
তবু ফুটিবে না হাসি ? সেই অশ্রুধার ?
যারা গেছে ছেড়ে তোরে তাহাদেরি চাস—
যাহা কিছু আছে আর সকলি কি পাঁশ ?
তবে তুমি দেবি ওগো উর্দ্ধপানে ধাও ;
সেইখানে পাবে গিয়ে যাহা কিছু চাও।
পুণ্য সেই হস্ত হতে পাইবে সকলি;
মিটিবে ও পরাণের বিমল ব্যাকুলি।

মহিলা শিল্পমেলা।

গত ১২রই চৈত্র হইতে ১৫ই চৈত্র পর্য্যন্ত ২৯৭ নং অপার সাবকুল্যার রোডের বাগানবাটীতে মহিলাশিল্প মেলার দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

এক বৎসরের মধ্যে শিল্পমেলা সম্রান্ত মহিলাগণের কিরূপ আদরের কিরূপ উৎসবের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা মনে করিতেও হৃদয় আহ্লাদ পূর্ণ হয়।

মেলার বহুপূর্ব্ব হইতে চারিদিক হইতে প্রশ্ন উঠিতেছিল 'কবে মেলা হইবে ?" এই প্রশ্নে এবং শিল্পী মহিলাদিগের শিল্প প্রস্তুত উদ্যমে—অবশেষে মেলার মহিলা সমাগমে, মহিলাদিগের ইহার নিমিত্ত যে আগ্রহ যে উৎসাহ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে মেলার উদ্দেশ্য সফল জ্ঞান করা যায়। এই উৎসাহের ফলে, এইবার মহিলাশিল্পমেলা প্রচুর ও উৎকৃষ্ট মহিলাশিল্পে সজ্জিত হইয়া নিজ নামের সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। বলিতে কি একটি সুপ্রশস্ত গৃহ এবার কেবলমাত্র মহিলাদিগের চারু শিল্প দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

গতবারের ন্যায় ধানচালের, পুঁথির, কাগজের, কাপড়ের, খয়েরের নানারূপ অলঙ্কার ও চিত্র, রেশম, পশম, জরী ও সূতার সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও সুন্দর অঙ্কন-চিত্র ব্যতীত কৃষ্ণ নগরের মৃত্তিকা চিত্রের অনুরূপ কতকগুলি পাহাড় পর্ব্বত, পৌরাণিক ও প্রাকৃতিক দৃশ্য যে কিরূপ সুনির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না৷ প্রধান শিল্পী শ্রীমতী

ভুবনমোহিনী ও গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। ইঁহারাই শিল্পের নিমিত্ত প্রথম পুরস্কার পাইবেন।

মহিলা নির্ম্মিত কতকগুলি অতি উচ্চদরের মনোহারী অঙ্কনচিত্রও মেলায় প্রদর্শন জন্য আসিয়াছিল।

এইখানে আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে আর দুএকটি কথা বলিয়া আমরা প্রস্তাব শেষ করি।

আমাদের দেশের রমণীগণের নিকট কেবল নহে; লেডি ল্যান্সডাউন লেডি বেলি প্রমুখ সম্ভ্রান্ত বিদেশীয় মহিলাদিগের নিকটে পর্য্যন্ত, এবং স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পুরুষদিগের নিকট পর্য্যন্ত সমিতি যে সহানুভূতি ও সহায়তা লাভ করিয়াছে তজ্জন্য তাহার আহ্লাদ ও কৃতজ্ঞতার সীমা নাই।

লক্ষ্ণৌয়ের ডাক্তার রামলাল চক্রবর্ত্তী, আগরা কলেজের শ্রীযুক্ত হরিদাস শাস্ত্রী, চুনারের শ্রীযুক্ত হনুমান প্রসাদ, মিউজিয়ামের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, মিরার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, পুলিস কমিসনার শ্রীযুক্ত ল্যাম্বার্ট, কাশীপুরের হর্টিকলচরের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, ল্যাজারাস কম্পানির শ্রীযুক্ত লারমোর, ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত নর্টন, উইলসনের হোটেলের ম্যানেজার সাহেব, রায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, ভারতী ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়, নারিকেলডাঙ্গার নর্শরীর অধিকারী শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি যাঁহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে তাঁহারাই অকুণ্ঠিত চিত্তে কেহ প্রাণপণ পরিশ্রমে কেহ বা দ্রব্যাদি দানে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সর্ব্বাগ্রগণ্য রূপে এই মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে কেবল প্রাণপণ যত্নে মেলার আয়োজন করিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন এরূপ নহে, নিজ ব্যয়ে আপন নর্শরি হইতে সরঞ্জাম দ্রব্যাদি আনিয়া মেলার ফুল-গৃহ সাজাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার ফুল-গাছ ও টব প্রভৃতি বিক্রয়ে শতাধিক পরিমাণ যে মুদ্রা লাভ হইয়াছে তাহাও মেলাকে প্রদান করিয়াছেন।

আমাদের দেশের লোকের মধ্যে কিরূপ উদারতা লুক্কায়িত দেশহিতকর কার্য্যের জন্য তাঁহারা কিরূপ সর্ব্বান্তঃকরণে যত্ন করিতে পারেন এই কার্য্যেই তাহার পরিচয়; এবং এই পরিচয়ে সমিতি কিরূপ কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্লাবনে প্লাবিত তাহা অব্যক্তব্য।

সর্ব্বশেষে পূজনীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার দীনবৎসলতার চিহ্ন-স্বরূপ সমিতিকে ৫০০ শত টাকা দান করিয়া ও উদার হৃদয় মহারাজ বিজয়নগ্রাম মেলাশেষে ৭০০ শত টাকারও অধিক মূল্যের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া সমিতির যে উপকার করিয়াছেন সে জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া প্রবন্ধ শেষ করি। আমরা অন্যস্থলে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে দান প্রাপ্তির তালিকা প্রকাশ করিতেছি।

জীবন জলের মত।

জীবন জলের মত অবিরত চলে যায়,
কালের সাগর নীরে সঁপিতে আপন কায়;
তীরে বসে অন্ধ নর! ঢেউ গুণে কিবা ফল?
কত কায আছে পড়ে কে করিয়ে দেবে বল?
উর্ম্মির উপর উর্ম্মি কত ওই গেল চলে,
পশ্চাতে সাজিয়ে কত রয়েছে যাইবে বলে;
ওই শোন, গগনের কোন দূর প্রান্ত হতে
কি আদেশ আসিতেছে ভাসিয়ে সমীর স্রোতে।
'বহে যাও, ব'হে যাও' গম্ভীরে ভাষিছে স্বর,
পালিতে সে মহা আজ্ঞা ছুটিয়াছে চরাচর;
কেন তবে বসে একা? বহিয়া যে যায় বেলা!
এই বেলা খেলে লও খেলিবে তুমি যে খেলা।
পশ্চাতে ফিরিয়ে চাও, মরণের চির নিশি,
অগ্রসর হইতেছে আঁধারিয়ে দশদিশি।
অন্তহীন মহাকাল, সাগর সদৃশ কায়
প্রসারি', সম্মুখে ওই দাঁড়ায়ে রয়েছে হায়!
জীবনের শেষ ঢেউ আরপি' ও সিন্ধু পায়,
মিশে যাবে তুমি নর! মৃত্যুর আঁধার গায়।
এই তো রে পরিণাম! তবে কি ভুলেতে ভুলে,
শূন্যে চেয়ে বসে আছ জীবন নদীর কূলে?
করিতে এসেছ যাহা ত্বরা করে শেষ কর,
জীবন জলের মত চলে যায় নিরন্তর।

শ্রীবিনয়কুমারী বসু

—০—

১২৯৬ সালের মহিলা শিল্পমেলার দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	৫০০
শ্রীমতী প্রতিভা দেবী	ঐ	৫
,, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	ঐ	৫
,, সুশীলা বসু	ভবানীপুর	২
,, কাদম্বিনী ঘোষ	ঐ	৪
,, দক্ষবালা দেবী	সাধুহাটী	১
কোন বন্ধু	ভবানীপুর	১০
মিশেস আর, ডি, মেটা	কলিকাতা	১০
শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী	বাঁকীপুর	৫
এচ্ বেভারিজ এস্কয়ার	আলিপুর	২৫
শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	কলিকাতা	২৫
শ্রীমতী প্রমদা দেবী	সাধুহাটী	৪
মিশেস পি, এন, বসু	কলিকাতা	২০
,, এস্, এন, ঘোষ	মেদিনীপুর	৫
,, বি, এল গুপ্ত	ফরিদপুর	২৫
,, এস, বি, মুখো	ভাগলপুর	১০
শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী	কলিকাতা	৪
মিশেস আর, সী, দত্ত	ঐ	২৫
শ্রীমতী নলিনীবালা রায়	ঐ	৫
,, কুমুদিনী খাস্তগির	ঐ	২
,, মনোমোহিনী পাল	ঐ	৫
,, সুশীলাবালা দেবী	ঐ	৫
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অযোধ্যানাথ	এলাহাবাদ	২০
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী	কলিকাতা	৫
বাবু যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ	৪
শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাস	ঐ	৫
,, হেমলতা দেবী	ঐ	১০
,, কুমুদিনী দেবী	ঐ	৫
,, বিনোদিনী দেবী	ঐ	২
,, শরৎকুমারী দেবী	ঐ	৫
,, মৃণালিনী দেবী	ঐ	২
,, সুরবালা দেবী	ঐ	৫
দান প্রাপ্ত—মাং মিশেস ও,সী,মল্লিক	ঐ	২০
শ্রীমতী মোহিনী সেন	ঐ	৪
,, হিরণ্ময়ী দেবী	চুচুড়া	১২
বাবু নবীনচাঁদ বড়াল	কলিকাতা	২০
মিশেস জি, সী, রায়	ঐ	৫
শ্রীমতী লালমণি বসু	ঐ	৫
মিশেস এম্ ঘোষ	কলিকাতা	১০
,, ও, সী, মল্লিক	ঐ	৫
বাবু দীনেন্দ্রকুমার রায় ও কয়েকটি বন্ধু	কৃষ্ণনগর	৪
শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী	কলিকাতা	৫
মিশেস সী, সী দত্ত	ঐ	৫
শ্রীমতী বারাহি দেবী	ঐ	২০
মিশেস হরিবল্লভ বসু	কটক	১০
,, জানকীনাথ বসু	ঐ	২
বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ রায়চৌধুরী	ঐ	২
শ্রীমতী গোলাপকুমারী দাসী	ঐ	১
কোন বন্ধু	ঐ	২
কোন বন্ধু	ঐ	২
বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষ	পাণ্ডুয়া (কটক)	২
,, ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস	ঐ	১
,, মহিমাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১
,, নিবারণচন্দ্র মজুমদার	ঐ	১
শ্রীমতী সুকুমারী দেবী	ভবানীপুর	৫
শ্রীযুক্ত রাজাবাহাদুর	মুক্তাগাছা	২৫
মিশেস এ, মিত্র	কাশ্মীর	১০
আর, মুখুর্জ্জি এস্কয়ার	ঐ	৫
কোন বন্ধু	ঐ	৫
৺বৈদ্যনাথ মন্দীরের প্রধান মহন্ত	বৈদ্যনাথ	১০
শ্রীমতী নিস্তারিণী বসু	ঐ	২
বাবু গিরিজানন্দ ওঝা	ঐ	১
,, তিনকোড়ী রায়	ঐ	॥০
,, কানাইলাল দে	ঐ	॥০
শ্রীমতী শিবসুন্দরী মিত্র	কলিকাতা	১০
,, ভুবনমোহিনী দাসী	ঐ	১০
,, ভুবনমোহিনী দাসী	ঐ	৪
জনৈক বন্ধু	ঐ	৫
শ্রীমতী চণ্ডীমণি দাসী	ঐ	১
মিশেস পি, ঘোষ	ইটালি	৫
,, আহাম্মদ	কলিকাতা	৫
শ্রীমতী বিধুমুখী বসু ও তাঁহার ভগিনী	ঐ	৪
,, অন্নদাসুন্দরী দেবী	ইনাতপুর	২
,, শ্রীশমোহিনী দেবী	মিরট	৫

শিল্প।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী	লক্ষ্ণৌ	পুতুল ৮ ডজন ২ হিঃ	১৬
বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	সোলাপুর	সোলাপুরে কাপড়	২১
শ্রীমতী প্রমীলাসুন্দরী দেবী	সাধুহাটী	পশমের শিল্প ৩ টি	
শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	কলিকাতা	বিবিধ শিল্প	৫০
শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দাসী	ঐ	ঐ ঐ	৫০
শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী	চুচুড়া	ঐ ঐ	২০
শ্রীমতী দিক্‌বাসিনী বসু	বরাহনগর	ঐ ঐ	২
শ্রীমতী আমোদিনী দাসী	মজিলপুর	১টি শিল্প	

মূল্য প্রাপ্তি

বাবু কালীপ্রসন্ন রায়	নড়াইল	৬
„ নিখিলকান্ত নাগ	ঢাকা	৩।৵০
„ তেজেন্দ্রনাথ রায়	আরা	৩।৵০
মিশেস নবীনচন্দ্র দত্ত	দ্বারভাঙ্গা	৩।৵০
বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩
„ শ্রীনাথ পাল	কাশীমবাজার	৬৸০
„ নিমাইচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়	উলা	৩।৵০
কে, বি, মজুমদার এস্কয়ার	কুচবিহার	৩।৵০
মিশেস জি, সি সাহা	পাবনা	৩।০
বাবু সূর্য্যনারায়ণ সিংহ	ভাগলপুর	৩।৵০
„ ললিতমোহন সিংহ	বাঁশবাড়ীয়া	১৩॥৵০
„ সতীশচন্দ্র বসু	বালেশ্বর	৩।৵০
„ সতীন্দ্রমোহন ঠাকুর	কলিকাতা	৩
„ হেমচন্দ্র ভড়	ঐ	২
„ চণ্ডীচরণ মিত্র	ইন্দোর	৩।৵০
কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী	গোলকপুর	৬৸০
বাবু চন্দ্রনাথ ঘোষ	কৃষ্ণনগর	৩।৵০
„ বীরেশ্বর পালিত	কুচবিহার	১০
„ কালীমোহন ঘোষ	ডেরাডুন	১০
„ কৃপানাথ দত্ত	টালা	৩
কুমার গিরীন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	কলিঃ	৩
শ্রীমতী বিরাজমোহিনী চট্টোঃ	ব্রহ্মপুর	৩।৵০
বাবু প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বেরিলী	৩।৵০
বাবু গুরুচরণ সেন	তিল্লি	৩।৵০
„ নারায়ণচন্দ্র সেন	কটক	৪৸০
„ উপেন্দ্রনাথ সেন	গৌহাটী	৩।৵০
„ রঘুনাথ দাস প্রহরাজ	গোপীবল্লভঃ	১০
শ্রীমতী ক্ষীরোদকামিনী ঘোষ	বানিয়াজুড়ি	১৸৵০
শ্রীমতী রাজবালা রায়	হরিনাভী	৩।৵০
বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র	মধ্যহিংলি	১০৵০
রাজাশশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর	তাহেরপুর	৩।৵০
বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্র	মুঙ্গের	৩৸৴০
কুমার ভুবনরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	লক্ষ্ণৌ	৬॥০
বাবু ব্রজনাথ আচার্য্য	শিমলা	৩।৵০
„ মোহনকিশোর রায়	বালিপাড়া	২।৵০
„ যতীন্দ্রনাথ বসু	ঘোড়ামারা	২
„ ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	মৈনপুরী	৩
„ বিপিন বিহারী মিত্র	কটক	৩।৵০
„ যদুনাথ সেন	জয়পুর	৩।৵০
„ উপেন্দ্রনাথ বসু	মুন্সীগঞ্জ	৩
„ ক্ষেত্রনাথ সেন গুপ্ত	কলিকাতা	১
„ মহেন্দ্রনাথ রায়	রামকৃষ্ণপুর	৩
„ কেদারনাথ বসু	কলিকাতা	৩

ক্রমশঃ।

গ্রাহকগণের প্রতি।

আমাদের প্রেসের কম্পোজিটার ও প্রেসম্যানেরা প্রায় সকলেই ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় বর্ত্তমান সংখ্যক "ভারতী ও বালক" নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই বিলম্ব দোষ মার্জ্জনা করিবেন।